দলিল

শওকত আলী

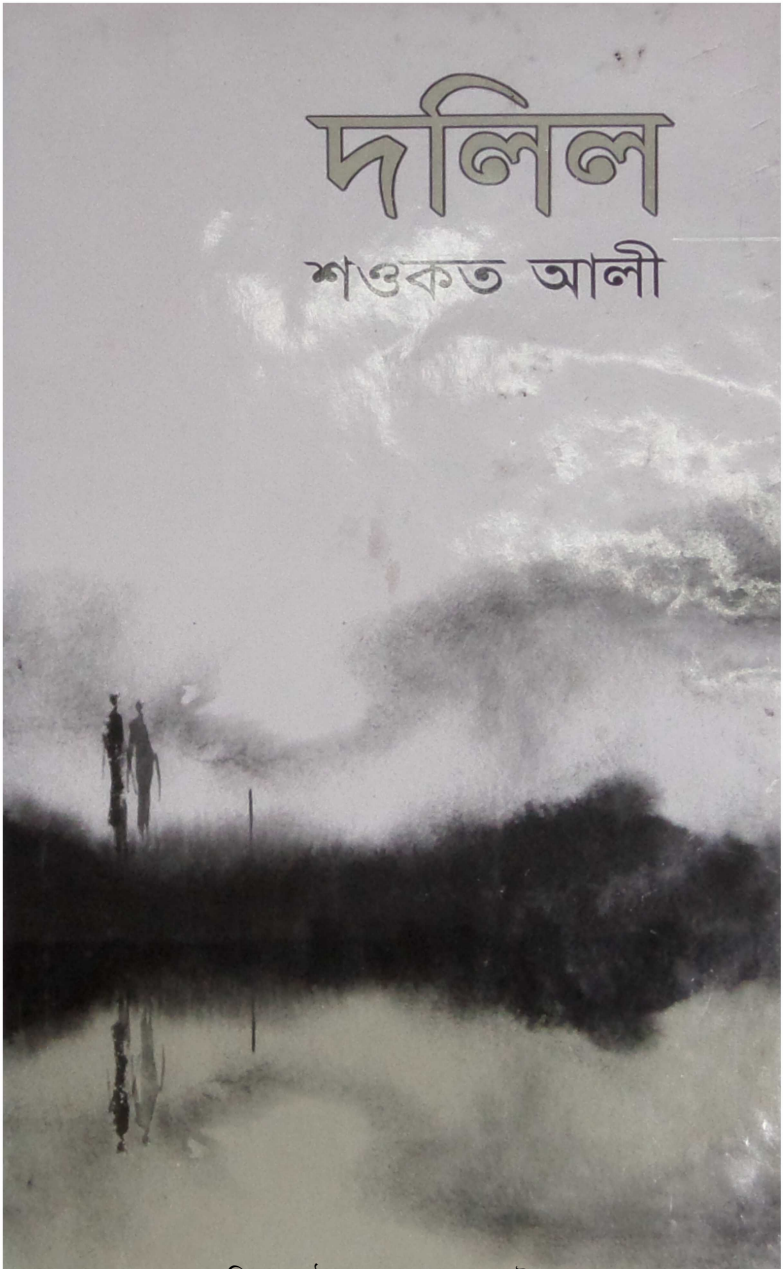

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

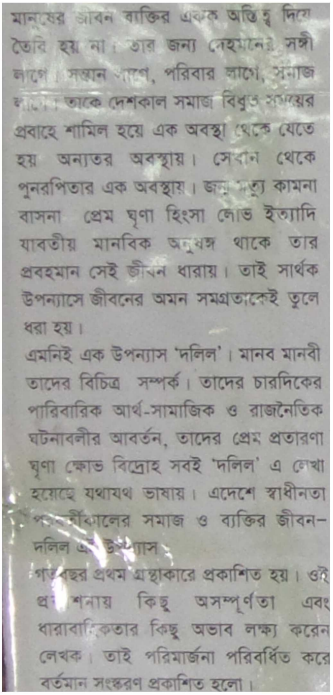

মানুষের জীবন ব্যক্তির একক অস্তিত্ব দিয়ে তৈরি হয় না। তার জন্য লেখকের সঙ্গী লাগে। সন্তান লাগে, পরিবার লাগে, সমাজ লাগে। তাকে দেশকাল সমাজ বিশ্ব ও সময়ের প্রবাহে শামিল হয়ে এক অবস্থা থেকে যেতে হয় অন্যতর অবস্থায়। সেখান থেকে পুনরপিতার এক অবস্থায়। জন্ম মৃত্যু কামনা বাসনা প্রেম ঘৃণা হিংসা লোভ ইত্যাদি যাবতীয় মানবিক অনুষঙ্গ থাকে তার প্রবহমান সেই জীবন ধারায়। তাই সার্থক উপন্যাসে জীবনের অমন সমগ্রতাকেই তুলে ধরা হয়।

এমনিই এক উপন্যাস 'দলিল'। মানব মানবী তাদের বিচিত্র সম্পর্ক। তাদের চারদিকের পারিবারিক আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনাবলীর আবর্তন, তাদের প্রেম প্রতারণা ঘৃণা ক্ষোভ বিদ্রোহ সবই 'দলিল' এ লেখা হয়েছে যথাযথ ভাষায়। এদেশে স্বাধীনতা পরবর্তীকালের সমাজ ও ব্যক্তির জীবন– দলিল এক উপন্যাস।

গত বছর প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ওই প্রকাশনায় কিছু অসম্পূর্ণতা এবং ধারাবাহিকতার কিছু অভাব লক্ষ্য করেন লেখক। তাই পরিমার্জনা পরিবর্ধিত করে বর্তমান সংস্করণ প্রকাশিত হলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

দলিল

শওকত আলী

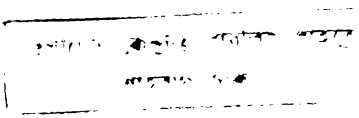

বিদ্যা প্রকাশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

প্রকাশক
মজিবর রহমান খোকা
বিদ্যাপ্রকাশ
৩৮/৪ বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০
প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০০২
প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ
বর্ণবিন্যাস
দীপ্তি কম্পিউটারস
৩৮/২খ বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০
দাম
তিনশত টাকা
ISBN 984-422-005-X
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

উৎসর্গ

আতাউস সামাদ
বন্ধুবরেষু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

এ উপন্যাসের কাহিনী ও চরিত্র কাল্পনিক। যদি বাস্তবের সাথে কেউ মিল খুঁজে পান তাহলে তা লেখকের অনভিপ্রেত বিবেচনার জন্য অনুরোধ করা হলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম — লেখক

কস্য দলিল লিখনং কার্যাঞ্চাগে প্রজাপত্তনী পত্রমিদং শ্রী চন্দ্রমোহন ঘোষ, পিতা শ্রী ঈশান চন্দ্র ঘোষ, পেশা জোতদারি, সাং পূর্ব পাড়া, মৌজা ফুলবাড়িয়া, থানা সাভার, জিলা ঢাকা নিম্ন তফসিলভুক্ত সমুদয় জমিনের মৌরসি মুকররার স্বত্বে স্বত্ববান মালিক বটেন, তস্য প্রজা শ্রী লালচাঁদ কর্মকার, পিতা শ্রী ফটিকচাঁদ কর্মকার, পেশা কর্মকারি ও গৃহস্থী, সাং মৌজা থানা জিং ইত্যাদি পূর্ববৎ সপরিবারে বংশানুক্রমে মালিকের সেবা করিয়া আসিতেছে, বাগবাগিচা নহর পুষ্করিনি জমি জায়দাদ পাহারা দেয়, বাড়িঘর নাটমন্দির কাছারি ইত্যাদি পয়পরিষ্কার রাখে, তীর্থ যাত্রায়–

এই পর্যন্ত পড়তে পারে রায়হান, তারপর আর পারে না। কারণ বাকি অংশটা পানিতে চুপসে ঝাপসা, অক্ষর চেনা যায় না। জমির মালিক বৃন্দাবন কামার সামনে দাঁড়িয়ে। কৃপাপ্রার্থী খাতক প্রজার মতো সবিনয়ে হাত দু'খানি জোড় করা। রায়হান বুড়ো মানুষটাকে ওইভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে রীতিমতো বিব্রত বোধ করে। বলে, আপনি দাঁড়িয়ে কেন ? বসুন।

বৃন্দাবন বিনয়ের ভারে আরও নুয়ে পড়ে। বলে, আইজ্ঞা ঠিক আছে, আপনে পইড়া দ্যাহেন।

এ আর কী পড়বো, রায়হান দলিলের দিকে নজর রেখে বলে, লেখা তো একেবারেই পড়া যায় না। দলিলপত্র কি কেউ ভেজায় ? আপনার দলিল ভিজলো কীভাবে ?

বৃন্দাবন হাত দু'খানি কচলায়। বলে, হুজুর বানে ভাইসা গেছিলো ঘরখান, ঐ স'ম ভিজছে। কী করুম কন ?

রায়হানের সঙ্গী বাহারউল্লাহ মুনশি হাসে। বলে, পুরান দলিল সবাই পড়তে পারে না, দ্যান আমি দেহি।

মুনশি দলিলখানা হাতে নিয়ে থেমে থেমে পুরোটাই পড়ে ফেলে। রায়হানের জমিজমার দলিলপত্র সংক্রান্ত জ্ঞান খুবই সামান্য। তবু সে জিজ্ঞেস না করে পারে না। বলে, আপনার কাকা-জ্যাঠাদের নাম কোথায় ? লালচাঁদ তো আপনার ঠাকুরদার নাম, ঠিক না ?

আইজ্ঞা–

দেখা যাচ্ছে, আপনার ঠাকুরদার কাজে-কর্মে সন্তুষ্ট হয়ে বিনা সেলামিতে জোতদার চন্দ্রমোহন ঘোষ এক টাকা সাড়ে তের আনা বার্ষিক খাজনা ধার্য করে জমিখানা প্রজাপত্তনী দিয়েছিলেন–

আইজ্ঞা– বৃন্দাবন কামার সোৎসাহে মাথা দোলায়। বলে, সেই জমি আমার বাবা-কাকা-জ্যাঠারা ভোগ করছে। তারপর আমরা। মানে তাগো পোলাপানরা–

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

আপনার কাকা-জ্যাঠারা কোথায় ?

বৃন্দাবন ফের হাসে, যেন হাসির কথা জিজ্ঞাসা করা হয়েছে। বলে, তারা নাই, ময়ছে সেই ক-বে।

তাদের ছেলেরা ?

তারা নাই– ইত্তিয়া গেছে গিয়া– ভাগো অংশ বেইচ্যা দিছে।

কিন্তু বাঁটোয়ারা তো হয় নি– যার যার অংশ ভাগাভাগি হবে না ?

রায়হান মুনশির দিকে তাকিয়ে বলে, এ জমি তো এজমালি রয়ে গেছে– খাজনা-টাজনা দেয় কি না কে জানে।

তারপর সে বৃন্দাবনের মুখের দিকে তাকায়। বলে, নাম খারিজ, নাম জারি, পরচা, খতিয়ান এসব নতুন করে করান নি কেন ? আপনার বাবাও তো দেখছি নিজের অংশ আলাদা করে নেন নি।

বৃন্দাবন মাথা চুলকায়। বলে, আইজ্ঞা স্যার, আমরা মুরুখ্যু মানুষ, আমাগো কি সেই বুদ্ধি আছে– আমি কিছু কইতে পারি না– যহন যা পাইছি ঘরের চালের লগে পোটলা বাইন্ধা থুইছি– থাকলে আছে, নাইলে নাই।

রায়হান মুনশির দিকে তাকিয়ে বলে, এ জমি তো এখনো এজমালিই রয়ে গেছে– বৃন্দাবন আর কাশীরামই তো শুধু ওয়ারিশ নয়, ওদের কাকা গয়ারামের ছেলেরাও তো ওয়ারিশ– এ জমি কীভাবে বিক্রি করবে বৃন্দাবন ?

আচ্ছা কর্মকার মশাই, রায়হান বৃন্দাবনের দিকে ঘুরে দাঁড়ায়। বলে, খাজনা-টাজনা দেন প্রতিবছর, ঠিক মতো ?

হ্, তা তো দেওয়া লাগে–

কথাটা বলে বটে বৃন্দাবন– কিন্তু খানিক ইতস্ততঃ ভাবও দেখা যায় তার হাবভাবে। রায়হান দলিলখানা মুনশির হাত থেকে নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখে। সিল ছাপ্পর মারা ঠিক মতোই রয়েছে। তারিখও দেখা যাচ্ছে, সিলের ওপর, ১৪.৩.১৯৩৮– দলিল যে নির্ভেজাল সে সম্পর্কে নিঃসন্দেহ অবশ্যই হওয়া যায়। কিন্তু–

সে জিজ্ঞেস না করে পারে না, আপনার কাকা-জ্যাঠারা যে তাদের অংশ বিক্রি করলো, তাদের কাছে কি এসব দলিল ছিলো ?

আইজ্ঞা না, ক্যামে থাকবো কন ? বৃন্দাবন তার ভাঙা এবং ময়লা দাঁত বের করে হাসে। বলে, দলিল কাগজ-ঠাগজ গিনি তো আমার হাতে রইছে। আমি পাইছি আমার বাবার কাছ থিকা। সে পাইছে তার বাপের কাছ থিকা– আবার সে পাইছে তার–

থাক বলতে হবে না, রায়হান বাধা দিয়ে বলে, আমরা বুঝেছি।

বৃন্দাবনকে থামিয়ে দিয়ে সে দলিলখানা ফের মেলে ধরে এবং খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে। তারপর বলে, আপনার কাকা-জ্যাঠার ছেলেরা যাদের কাছে জমি বিক্রি করেছে তারা কখনো দলিল দেখতে চায় নি ?

বৃন্দাবনের চোখে মুখে বিভ্রান্ত একটা ভাব দেখা যায়। ব্যাপারটা সে যেন একেবারেই বুঝছে না। তার মাথা ডাইনে বাঁয়ে অস্পষ্ট নড়ে। মুখে বলে, সেইটা তো স্যার কইতে পারি না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

কী অদ্ভুত কাণ্ড! রায়হানের বিস্ময় থই পায় না। বলে, জমিজমা কেনাবেচা হয়েছে, টাকা-পয়সা লেনদেন হয়েছে, দলিলপত্র না দেখেই ?

স্যার, আমরা মুরুখ্যু মানুষ। বৃন্দাবন বলতে বলতে ফের দাঁত বের করে হাসে। তারপর ফের বলে, আমগো মুহের কতাতেই বিশ্বাস– আমার কাকার পোলা যুধিষ্ঠির বেইচ্যা দিলো তার অংশ– ওই আমগাছ বরাবর– আমরা চাইরাও দ্যাখলাম না– জমিন বেইচ্যা সীমানা দেহাইলে ব্যস, তারপর আর ভ্যাজাল থাহে না।

বাহ্, তাই বলে এজমালি সম্পত্তি বাঁটোয়ারা করতে হবে না ?

বৃন্দাবনের চোখে-মুখে ফের বিভ্রান্তির ভাব ফোটে।

রায়হান তখন বোঝায়। বলে, এজমালি সম্পত্তি বাঁটোয়ারা না হলে, নাম খারিজ করে নতুন নাম জারি না হলে, আপনি যে এখনো জমির মালিকই হন নি, তা জানেন ?

বৃন্দাবন একই ভঙ্গিতে তাকিয়ে থাকে। তার কানে কথাটা গেছে কি না তা-ই বোঝা যায় না।

ও মুনশি, রায়হান বলে, এটা তো এখনো এজমালি সম্পত্তি– আমি তো কিছুই বুঝছি না। এ জমি কীভাবে বিক্রি হবে।

মুনশি সম্ভবতঃ ক্রমেই বিরক্ত হয়ে উঠছিলো। তাকে ডাকা হলেও সে মুখ ফেরায় না– অদূরে একটা আমগাছের ডালের ওপর দিয়ে দুটি ফিঙে পাখির ওড়াওড়ি দেখছিলো, ঐ দেখতে দেখতেই বলে, হালার ফেউচ্চার কারবারটা দ্যাকছেন নি স্যার, দ্যাহেন, দ্যাহেন– কেমুন গোত্তা মাইরা নামে।

রায়হান ফের ডাকলে সে এগিয়ে এসে রায়হানের হাত থেকে দলিলখানা নিয়ে বৃন্দাবনের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বলে, অহন যাও কামারের পো, দলিল খান খুইয়া আহ– আমরা চিন্তা কইরা দেহি।

লোকটা নিজের বাড়ির দিকে পা বাড়ালে মুনশি নিচু গলায় বলে, স্যার, আপনেরে যে কী কমু, বুজি না– এমুন বাছাবাছি করলে আপনে জায়গা জমিন ক্যাম্নে খরিদ করবেন ? আপনে যেমুন চাইতাছেন, সেমুন ঠিক আছেনি এই পুরা এলাকার কুনো হালার দলিলপাতি? কারও জমির দলিল ঠিক নাই। খালি দ্যাখবেন, বাপ-দাদার নামগিনি ঠিক মতোন রইছে কি না– থাকলেই বুজবেন যতেষ্ট। কামারের পো আপনেরে জমি দখল দিয়া দিবো– রেজষ্টি দলিল রইলো, দখল রইলো– তারপর যাইবেন গিয়া বন্টন মামলা করতে, নাম খারিজ আর নাম জারি কইরা পরচা বাহির করতে আর কয়দিন লাগে ?

দম নিয়ে মুনশি ব্যাখ্যা করে বোঝায়। বলে, ক্যান যে আপনে ডরান, বুজি না– দলিল আর দখল থাকলে আপনের জমিন লইতে আইবো কুন হালায় ? আর আইলেই বা আপনে ছাড়বেন ক্যান ? মগের মুলুক নাকি ?

রায়হান মুনশির মুখে বিরক্ত ভাব দেখে আর অমন কথা শুনে অবাক হয়। লোকটা যে চোখ তুলে মুখোমুখি তাকিয়ে এমন সরাসরি কথা বলতে পারবে, এমনটা কখনো মনে হয় নি। লোকটার কথা শুনতে শুনতে একসময় তার হাসি পায়। বলে, আপনি মনে হচ্ছে রেগে যাচ্ছেন ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

মুনশি কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হয়। বলে, জ্বে না, তওবা, কী কন আপনে, রাগ হমু ক্যান? না, রাগ না- আপনে সাংবাদিক মানুষ, দুনিয়ার সব খবর আপনের জানা আর এইটা জানবেন না, ক্যাম্নে দ্যাশে জায়গা জমি ব্যাচা-বিক্রি হইতাছে?

রায়হান মনের ভিতরে কেমন একটা ঝাঁকুনি খায়- কথাটা মুনশি মন্দ বলেনি। এদেশে জমির মালিকানা কীভাবে বদলায়, কোন সময় বদলায়, বদলালে লাভক্ষতি কার হয়- এসব বিষয়ে হাজার রকমের কারচুপির ঘটনা তো আজকের নয়। তার মনে পড়ে, মোহনগঞ্জ থেকে আসবার সময় বাবা বাড়ির সামান্য অংশই বিক্রি করতে পেরেছিলেন- তাও কাউকে দিয়েছিলেন আমমোক্তারনামা- কাউকে বায়নানামা- আর পেয়েছিলেন কারুর কাছে অর্ধেক দাম, কারুর কাছে সিকি দাম- অথচ সে তো পরে দেখে এসেছে, পুরো বারো বিঘাই নানান মালিকের দখলে।

স্যার, কন তাইলে, মুনশি জিজ্ঞেস করে, বৃন্দাবনের জমিন কি লইবেন?

রায়হান তার নজর সামনের দিকে মেলে ধরে। কাঁঠাল গাছ ঘেঁষে খড়ো ঘরখানি দেখতে পায়। উঠোনের একপাশে বাসন কোসন মাজবার জায়গায় দু'টি হাঁস চরছে, দাওয়ার একটু খানি দেখা যায়- একটি বউ বোধহয় পা ছড়িয়ে বসে বাচ্চাকে দুধ দিচ্ছে। দাওয়ার খুঁটিতে হেলান দিয়ে হুঁকো হাতে বৃন্দাবন। চারদিকটা ভারী শান্ত। এইখানে কি আমার নিজের বাড়ি হবে? রায়হান নিজের কাছে জানতে চায়। কল্পনায় দেখে ছোট একতলা দালান, তার তিনখানি ঘর এবং বারান্দা- বারান্দায় বেতের টেবিল-চেয়ারের সবুজ রঙ এবং টেবিলের সাদা ঢাকনাটাও সে দেখতে পায়- এমনকি দরজা-জানালায় হালকা নীল রঙের পর্দা, বারান্দার পাশে উঠোন মতো খোলা জায়গায় খুটোয় বাঁধা দড়িতে শুকোতে দেওয়া জামা-কাপড় পর্যন্ত দেখে। পুরো ছবিটা সে সামনের কাঁঠাল গাছটার সঙ্গে জুড়ে দেয়। তাতে শহরতলির মধ্যবিত্ত বাড়ির চেহারাটি দেখতে একেবারে মন্দ লাগে না।

তবে এও আবার ঠিক, কল্পনার ওই বাড়ির লোকদের সঙ্গে নিজেকে সে আবার মেলাতে পারে না। কেমন করে পারবে? বারান্দায় চেয়ারে বসে যে লোকটি বিকেল বেলা চা খাবে, সে লোক তো সে নয়- কারণ বিকেলে তো তাকে অফিসে থাকতে হবে।

তয় স্যার, বৃন্দাবনরে কী কমু? মুনশি দ্বিতীয়বার তাগিদ দিলে সে জানায়, বুঝতে পারছি না মুনশি, আপনি যা ভালো মনে করেন বলে দিন।

একখান মুশকিল কি স্যার, মুনশি চিন্তিত মুখে বলে, আপনে অকখনই যে বাড়ি বানাইবেন, তা কিন্তু পারবেন না- কেমুন ফাঁকা চারো দিক, দ্যাহেন না? এমুন ফাঁকা জায়গায় বাড়ি বানাইয়া ক্যামনে বাস করবেন?

না, আমি ফাঁকা জায়গার কথা ভাবছি না, রায়হান জানায়। বলে, আমার চিন্তা হচ্ছে অন্যদিকের- ভাবছি, এজমালি সম্পত্তির অংশ কিনে ঝামেলায় না পড়ে যাই। আমার তো আর কোনো জমি নেই- যা কিছু জোগাড় হয়েছে, সব তো ঢালবো এই জমিতে- এই একই দাগ নম্বরের অন্য অংশের মালিকরা যদি বলে, এই জমি আমার, আপনি ওই নিচের দিকে যান? টাকা-পয়সা খরচ করে কি হাঙ্গামা হুজ্জোতের মধ্যে পড়বো!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

তাইলে আর কী করা ! মুনশি লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে ঘুরে দাঁড়ায়। তারপর চিৎকার করে বৃন্দাবনকে ডেকে বলে, বিন্দাবন, তোমার লগে পরে কথা হইবো, বুঝলা ? আমরা অহন গেলাম।

ফের রাস্তায় নামা। রাস্তাটা যে পুরনো এবং আগেও আধ পাকা ছিলো তা বেশ বোঝা যায়। কারণ ইতস্ততঃ খোয়া ছড়ানো এবং জায়গায় জায়গায় বুড়ো মানুষের দাঁতের মতো ভাঙা ইট বসানো। তবে আধপাকা হলেও গেঁয়ো চরিত্র ঠিকই আছে রাস্তার। এর বাড়ির ভিটে ঘেঁষে, ওর বাড়ির উঠোন ছুঁয়ে, তারপর কখনো সবজি ক্ষেত, কখনো গোয়ালঘর, কখনো বা কলতলা পাশে রেখে, আম কাঁঠালের বাগবাগিচা আর বাঁশ ঝাড়ের ভেতর দিয়ে এঁকে বেঁকে কোন দিক দিয়ে যেন কোথায় চলে গেছে। হাঁটতে রায়হানের মন্দ লাগে না। এলাকাটা তার মোটামুটি পছন্দই হচ্ছে। মনে মনে সে হিসাবও করে। ঢাকা শহর থেকে এমন কিছু দূর নয় এই ফুলবাড়িয়া গ্রাম। ঢাকার গুলিস্তান এলাকা থেকে মিনিবাসে চাপলে ৪০/৪৫ মিনিটে দিব্যি চলে আসা যায়। এখান থেকে সামান্য এগোলে সাভার টাউন আর সামান্য পিছোলে হেমায়েতপুর। সেখান থেকে মিরপুরের ব্রিজ বলতে গেলে এক দৌড়ের রাস্তা। সুতরাং শহরতলির মধ্যেই পড়ে জায়গাটা মিরপুর ১২নং সেকশন বা পল্লবীতে বসবাস করে যদি ঢাকায় চাকরি ব্যবসা কিংবা স্কুল-কলেজ করতে পারা যায়, তাহলে এই ফুলবাড়িয়া থেকেই বা কেন পারা যাবে না ? আরও দূর উত্তরা কিংবা জয়দেবপুর এলাকায় বাড়িঘর করে কি মানুষ বসবাস করছে না ?

সেপ্টেম্বরের দুপুর, তায় গরমও পড়েছে অত্যধিক। রায়হানের জামা ঘামে ভিজে জবজবে। মুনশি কয়েক কদম এগিয়ে। তার চলনে ঢিলেঢালা গা-ছাড়া ভাব। কোত্থেকে যেন একখানা কঞ্চি কুড়িয়ে হাতে নিয়েছে আর গাঁয়ের অল্প-বয়সী বাচ্চাদের মতো থেকে থেকে বাড়ি মারছে রাস্তার ধারের ঝোঁপে ঝাড়ে। আর কথাও বলে চলেছে আপন মনে। এমনিতে লোকটাকে একটু বেশি সরল মনে হয়। কিন্তু রায়হানের অনুমান, ওই সরল ভাবটাই ওর ব্যবসার আসল পুঁজি। সে লক্ষ্য করে দেখেছে, দালালদের কোনো না কোনো রকমের গুণ থাকতে হয়। না থাকলে মানুষ তার কথায় বিশ্বাস করে লেনদেন কেন করবে ? মুনশির গুণ ওই সহজ সরল আচরণ। সাধারণত জমির দালালরা কোন কোন খদ্দেরকে সস্তায় ভালো জমি কিনিয়ে দিয়েছে, কিংবা কোন দালালের খপ্পরে পড়ে কোন লোক বিপদে পড়েছে– এইসব গল্প বেশি করে। কিন্তু বাহারউল্লাহ মুনশি ঐসব কৃতিত্বের কথা কখনো বলে না। বরং দেখা যায়, তার ঝোঁক অন্য ধরনের বিষয় নিয়ে গল্প জমাবার দিকে। সাভার এলাকার চেয়ারম্যান ইলেকশনের সময় কেমন কারচুপি হয়েছে, সেই বৃত্তান্তটা যে সে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কতোবার বয়ান করেছে তার হিসেব নেই। মাঝখানে একদিন অবশ্যি উপজেলা নির্বাহী অফিসার লোকটা কেমন ভালো, সেটা বয়ান করার চেষ্টা করেছিলো, কিন্তু শেষে ফের তার গল্পের প্রধান বিষয় হয়ে উঠেছে চেয়ারম্যানের প্রসঙ্গ। গত দু'দিন ধরে তো সে চেয়ারম্যানের দুই মস্তান ছেলের নানান কাণ্ড কীর্তি বর্ণনা করে চলেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

থেকে থেকেই বলছিলো, স্যার এমুন পাপ আল্লায় সইয্য করবো না, দেইক্যেন, হালারা কেমুন বিপদে পড়ে। ইস্‌রে! কেমন জুলুমটা না করে কুত্তার বাচ্চাগিনি, না দ্যাখলে বিশ্বাস যাইবেন না।

রায়হান চুপচাপ শুনে যায়। কিছু বলে না। বীথির খালাতো বোন মুশতারির বর এনামুলকে সে জায়গা কিনে দিয়েছে গতবছর– সেই সুবাদে যোগাযোগ এবং বাড়ি পর্যন্ত আসা। গতবছর থেকেই জমির খবর দিচ্ছে। রায়হান বাসায় থাকলেও আসে, না থাকলেও আসে। আর বসবার ঘরে মোড়ায় বসে বীথি, নয় তো ছেলেদের কারুর সঙ্গে গল্প করে। মওসুম বুঝে কখনো কাঁঠালের এঁচর কিংবা আচারের জন্য আম বা কুল অথবা কামরাঙা জলপাই– এইসব জিনিস পোঁটলা বেঁধে নিয়ে আসে। বলে, আপা রাহেন, আমার বাড়ি থিকা দিছে, তাই আনলাম–

একবার গল্প জুড়লে সে গল্প আর ফুরোয় না। বীথি বেশিক্ষণ বসতে পারে না কিন্তু মঞ্জু আর টুকুকে সে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে। প্রথম দিকে মাসে দু'একবার আসতো– এখন বলতে গেলে প্রায় প্রতি সপ্তাহেই একবার না একবার দেখা দিচ্ছে। বীথি সম্ভবত জমি কেনার আগ্রহ দেখিয়েছিলো, সেই থেকে তার অমন উৎসাহ। ইতিমধ্যে বার তিনেক সে রায়হানকে জায়গা দেখিয়ে এনেছে। নন্দীগ্রামের প্লটটা দেখে তো সে একরকম রাজিই হয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু কী বুঝে মুনশিই পিছিয়ে গেলো, বললো, থাউক স্যার, ওই জমিনে বাড়ি কইরা সুখ পাইবেন না– অহনো রাস্তাঘাট হয় নাই– বাদ দ্যান।

দালাল নিজেই যখন উল্টো কথা বলে, তখন আর সেই জমি কেমন করে কেনে মানুষ!

কথা বলতে বলতে কিছুক্ষণ হাঁটলে তারা বাজার মতো একটা জায়গায় গিয়ে পৌঁছায়। একটা চায়ের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে মুনশি বলে, স্যার, এক কাপ চা খাইলে হইতো না?

কিন্তু এদিকে আপনার জমি কোথায়? রায়হান পাল্টা জিজ্ঞেস করে।

আরে, কী কয়। মুনশি হাত তুলে সামনের দিকে দেখায়। বলে, ওই তো ট্যাঙর খান দ্যাহেন না, বগলের বাড়িগিনি, তার বামে, বহেন চা খাইয়া লই।

দোকান মানে মাথার ওপর টিন-বাঁশের চালা এবং সামনে একখানা বাঁশের মাচা, বেঞ্চের মতো। দুটো কাঠের প্যাকিং বাক্সের ওপর কয়েকটা ছোট সাইজের কাচের গ্লাস আর চিনামাটির কাপ, খান কয়েক পিরিচ, একটা চিনির কৌটো, তার পাশে কাপড় বাঁধা ছাঁকনি আর জ্বলন্ত উনুনের একদিকে দুধের কড়াই আর অন্যদিকে ফুটন্ত কেটলি। চায়ের বেলা সম্ভবত তখন গড়িয়ে গিয়েছিলো। তাই দোকানদার খদ্দের বসার জায়গায় হাঁটুর ওপর ঠ্যাং তুলে আরাম করে বিড়ি টানছিলো, ওই সময় দু'জনে গিয়ে সামনে দাঁড়ায়। মুনশি বলে, অ-ই ইজ্জত আলী, দুই কাপ চা হইবো?

চা-অলা হাঁটুর ওপর থেকে পা নামিয়ে হাঁকে। বলে, ক্যান হইবো না– আপনে মেজবান লইয়া আইলেন– চায়ের লগে কিছু খাইবেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

মুনশির জন্যে বিস্কুট বের করে চা-অলা পিরিচে রাখে– মুনশি তাতে হাত তুলে নিষেধ করলে বলে, তাজা মোয়া আছিলো, দুইডা দেই ?

এবার মুনশি রায়হানের মুখের দিকে তাকায়। রায়হান মুখ ফিরিয়ে নিলে বলে, না থাউক ইজ্জত আলী ভাই, মোয়াটোয়া লাগবো না– তোমার খবর কও হুনি।

ব্যক্তিগত খবর থেকে শুরু। অল্পক্ষণের মধ্যেই মহল্লা এবং এলাকার খবর এসে যায়। কোন এক মাতবরের ছেলে নাকি ছ'মাস ধরে লাপাত্তা– নয়ারহাটের ওষুধ কারখানায় যেসব মেয়েরা কাজ করে, তারা নাকি সাইকেল চেপে আজকাল গাঁয়ের পথে ঘোরাঘুরি করে– কয়েকটি মেয়ে শোনা যায় আজকাল বড় মোটর গাড়িও চালাচ্ছে– ওদিকে সাভার কলেজে ছাত্রদের ইলেকশন নাকি সামনের মাসে। এবার নাকি রক্তারক্তি কাণ্ড হবে– কারণ জমির চেয়ারম্যানের ছেলে জসিম নাকি এবার ভিপি হবেই।

চা ফুরিয়ে গিয়েছিলো অনেক আগেই– রায়হান দু'জনের আলাপ শুনছিলো; আর তার সাংবাদিক মননের ভেতরে নানান আঁচড় পড়ছিলো। নয়ারহাটের ওষুধ কম্পানি মানে অবশ্যই গণস্বাস্থ্য– আজকাল গণস্বাস্থ্যের মেয়েদের সাইকেলে চেপে ঘোরাফেরা গ্রামের লোকদের মনে নানান চিন্তা জাগিয়ে তুলছে– এদিকে আবার মফস্বল টাউনের কলেজেও ছাত্রদের ইলেকশনে মারামারি আর খুনাখুনির আয়োজন– কে জানে, কালাম মাতবরের ছেলেটিকে খুন করে তার লাশ গুম করে ফেলা হয়েছে কিনা। সে মনে মনে হিসেব করে ১৯৮৭ সাল মানে বাংলাদেশের বয়স এখন ১৬– এই ষোল বছরে শহরতলী এলাকার এই চেহারা– ১৬ বছর আগে কি এই এলাকার মেয়েরা সাইকেল চড়ে বেড়াতো ? সাভারে কি কলেজ হয়েছিলো ? হলেও ছাত্রদের ইলেকশনে খুনাখুনির আশঙ্কা করতো মানুষ ? ১৬ বছরে তাহলে এই রকমই উন্নতি হয়েছে, একদিকে মেয়েরা সাইকেল চেপে গাঁয়ের রাস্তায় চলাফেরা করে আর অন্যদিকে স্কুল-কলেজে মারামারি-খুনোখুনি হয়।

মুনশিরও বলবার মতো কথা সম্ভবতঃ ফুরিয়ে এসেছিলো। সে তখন কোন এক কুতুবউদ্দিনের খোঁজ করে। জিজ্ঞেস করে, কুতুবউদ্দিনের বাড়িত পাওয়া যাইবো ?

ইজ্জত আলী ডানদিকের বাড়ি ঘরগুলোর ওপর দিয়ে নজর মেলে দিয়ে বলে, কইতে পারি না, যান দ্যাহেন গিয়া, বুইড়া আছে, না শহরে গেছে।

মুনশি সামনের দিকে পা বাড়ায়। বলে, স্যার তাইলে চলেন, আমরা আউগাই। মিনিট দশেক হাঁটার পর তারা গাছপালা ঘেরা বাগান মতো একটা জায়গায় গিয়ে পৌঁছায়। হাঁটতে হাঁটতে রায়হান লক্ষ্য করে, আমগাছগুলো বেশ পুরনো আর সবগুলো গাছই কলমের– অল্প উঁচু কাণ্ড থেকে দু'ভাগ-তিন ভাগ হয়ে উপরে উঠেছে। রায়হানের খানিক অবাক লাগে, এলাকাটা খুব উঁচু নয়, তবু এমন একটা শৌখিন আমবাগান কীভাবে তৈরি করা হলো, সে আন্দাজ করতে পারে না। অমন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কলম আমের গাছ তাকে রীতিমতো ধাঁধায় ফেলে দেয়। ফজলি আমের গাছগুলো সে দিব্যি চিনতে পারে। সে জিজ্ঞেস করে, এই বাগানটা কার জানেন ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

হ, জানি। মুনশি জবাব দিয়ে বলে, ক্যান আপনি ঘোষ বাবুগো নাম হোনেন নাই ? আরও মিনিট পাঁচেক হাঁটলে বাগান থেকে বেরুনো যায় এবং সামনে দেখতে পায় প্রকাণ্ড একটা পুরনো দালান। ভেতরে মানুষজন আছে বলে মনে হয় না। মুনশি বলে, দ্যাহেন স্যার, ঘোষ বাবুগো বসতবাড়ি কেমন আছিলো ? রায়হান দাঁড়িয়ে যায়। দেখে, বেশ অনেকখানি জায়গা জুড়ে বাড়ি, দোতলা এবং দো মহলা। গেটও ছিলো প্রকাণ্ড– দু'দিকের দুই থামের মাথায় দু'টি সিংহ। একটির মাথার অর্ধেক এবং একখানি পা আর অন্যটির কোমর থেকে নিচের দিকে ল্যাজসুদ্ধ উধাও। রায়হানের পা এগোয় না– এ জায়গায় যে এমন বনেদি বাড়িঘর থাকতে পারে সে কল্পনাও করতে পারে না। সামনের দিকে নজর মেলে দিলে একটু দূরে রাস্তার উল্টো দিকে আরও একটি প্রকাণ্ড দালান দেখতে পায়। দূর থেকে মনে হয় সেটিও জরাজীর্ণ এবং পরিত্যক্ত। ডাইনে বাঁয়ে তাকিয়ে সে কাছাকাছি কোনো লোক আবিষ্কার করতে পারে না। তবু বুঝতে অসুবিধা হয় না যে একসময় বেশ বড় ধনী লোকদের বাস ছিলো এ জায়গায়। গেটের মাথায় যে ফলক লাগানো, তাতে বড় করে খোদাই করা ওঁ, আর তার নিচে ১২৬৫। তার মানে, রায়হান মনে মনে হিসেব করে। সিপাহী বিদ্রোহের সময় দালানটা তৈরি করা হয়। সেই হিসেবে দালানটার বয়স ১৩০ বছর। তার খানিক অবাকই লাগে। এতোবড় দালানের ১৩০ বছরে এমন দুর্দশা হওয়ার তো কথা নয়। ব্যাপারটা তার কাছে ধাঁধার মতো লাগে।

মুনশি ওই সময় নিজের জ্ঞান বুদ্ধির ভান্ডার উজাড় করে দিতে আরম্ভ করে। বলে, স্যার, ঘোষ বাবুগো ছিলো এইটাই আদি বসত। এককালে আছিলো জমিদার– ক্যান্নে জমিদার হইছিলো কেউ কইতে পারে না। তয় দেখছি শ্যাষ পুরুষে ছিলো তিন ভাই– ছোডো দুইজন জজ বালিষ্টারি করতো– আর বড় জন ললিত মোহন দ্যাশে থাকতো। হুনছি জবর ধনী লোক আছিলো চন্দ্রমোহন ঘোষ, হ্যাগো পরদাদা। হাতি ঘোড়া ফিটন বজরা যে কত আছিলো তার ঠিকঠিকানা নাই। সায়েব সুবারা আছিলো সব ইয়ার দোস্ত– ফুর্তির কুনো হিসাব থাকতো না। হুনছি নিজেরা যেমুন ফুর্তি করতো, তেমুন জুলুম করতো পরজাগো উপর। এই দালানের ভিৎরে একখান জেলখানার মতোন ঘর আছে– ঐ ঘরে যে কতো লোকেরে পিটাইতে পিটাইতে মাইরা ফালাইছে তার হিসাব নাই। একদিকে মাইনষের জীবন লইতো আর অন্যদিকে ফুর্তি আর ফুর্তি– বাঈজি আইতো পচ্ছিম থিকা– ঢাকা শহরে আইলে এই জমিদার বাড়ি না আইয়া হ্যাগো উপায় থাকতো না। তয় স্যার, আমরা ওইসব দবদবা দেহি নাই– খালি কিচ্ছা হুনছি। আমরা যহন দেখছি, তহন তো পড়তি অবস্থা। তবু সেই অবস্থাও কি কম! আমরা দেখছি, পূজার সম ১০ হাত লাম্বা দেবী বানাইতো– আর দেবীর সাজ কি! না দেখলে বিশ্বাস যাইবেন না। ধুমধাম এমুন হইতো যে সাত গেরামের মানুষ ঘুমাইতে পারতো না– কইলকাতা থিকা যার্তাপার্টি আইতো– সাত রাইত পালা চলতো– বুজেন ক্যান্নে ঘুমাইবেন ? আমরা তহন পিচ্চি পোলাপান হইলেও ট্যার পাইতাম যে বাবুগো পড়তি শুরু হইয়া গেছে। জমিদারি নিলাম হইয়া গেলেও নাই নাই কইরাও একেবারে কম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

আছিলো না। তহনও হাতি পালতো, ধলা রঙের দুইখান ঘোড়ার ফিটন আছিলো– হাতির উঁচা ঘরখান আমরাও দেখছি বাগানবাড়ির পিছে।

বড় বাবু ললিত মোহন বাড়ি থিকা বাইরাইতো খুব কম। সয়সম্পত্তি দেখাশুনা করতো নায়েব মশায় চণ্ডীচরণ দে– মাইনষে কইতো, চণ্ডীমরণ দে– এমুন জুলুম করতো, যে কওন যায় না। ব্যাটা আছিলো বদমাইশের তাড়ি, আমরা দ্যাখছি বাবুগো অবস্থা কেরমেই পড়ে আর হালা নায়েব মশায়ের অবস্থা কেরমেই বাড়ে। কিন্তু হইলে কি, বাবুর কুনো খেয়াল নাই। সয়সম্পত্তি গেলেই কি আর থাকলেই কি। দুই ভাই তো দিল্লী বোম্বাই বসত করে– বচ্ছরেও একবার আহে না– ইদিক বাবুর পোলা নাই। স্যার, পোলা না থাকলে মাইনষের বড় কষ্ট। বাবুর মনে বড় দুঃখ। পরিবার লইয়া কখনো গয়া-কাশী যায়। কখনো যায় কামরূপ-কামিখ্যা, কিন্তু পোলা আর বাইরায় না পরিবারের প্যাট থিকা– খালি মাইয়া। একখান দু'খান না, পাঁচ পাঁচ খান মাইয়া বাবুর– আর যা সোন্দর না! কী কমু! রোজ বৈকালে ছাতের উপ্রে হাওয়া খাইতো। দূর থিকা দ্যাখলে মনে হইতো য্যান আসমান থিকা পরী নাইমা আইছে। হ্যাষে পাকিস্তান হয়-হয় স'ম বাবু বাইরাইলো। না বাইরাইয়া কী করবো ক'ন ? ঢাকার শহরে রায়টখান কেমুন লাগছিলো– ঢাকায় যদি রায়ট লাগে তো এইদিক লাগতে আর কয়দিন! বাবু আইজ কইলকাতা যায়। কাইল ঢাকা যায়, পরশু মৈমনসিং যায় আর ঘুইরা ফিরা সম্পত্তি ব্যাচে। জমিদারি তো নাই। খাস জমি গিনি বেইচ্যা দেয়। তয় পরথম পরথম কিছু বেচতে পারলো– হ্যাষে আর পারে না। ঐ স'ম কে কার জমি কিনে কন, সব বাবু খালি জমি বেচতে চায়। বাবুগো উত্তর চকের ব্যাকটি জমি বেইচা দিলো পানির দামে। কিন্তু পাকিস্তান হইয়া গেলে তা-ও পারে না। মাইনষে কয় হিন্দুগো জমি ট্যাহা দিয়া ক্যান কিনতে হইবো, এ্যামেই পাওয়া যায় কতো!

এই পর্যন্ত অনর্গল বলে যাওয়ার পর মুনশি থামে। তারপর ভারী বিষণ্ন একটুখানি হাসে। শেষে, উদাস গলায় বলে, কি দিন গ্যাছে স্যার ওই স'ম, মাইনষে কী করে আর কী না করে, ঠাহর করা যায় না। ওইসব দিনের কথা স্মরণ হইলে মনে হয়, কিসের জায়গা জমি আর কিসের বাড়িঘর। দ্যাকতে না দ্যাকতে কত মানুষ ফকির হইয়া গেলো। আর কতজন আঙুল ফুইলা হইয়া গেলো এক্কেবারে কলাগাছ তার আর হিসাব নাই ?

রায়হান মুনশির গল্প শুনতে বাধ্য হয়। তার বলার নাটকীয় ভঙ্গী শুধু নয়– মনে হয়, নিজের জানা ঘটনাগুলোই সে বলে চলেছে। মুনশি চুপচাপ কয়েক কদম সামনে পা ফেললে সে কৌতূহলী হয়। বলে, ঘোষবাবুরা কি তারপর চলে গেলো ?

হ, স্যার কেমুন যে ঘটনা না, এক্কেরে আশ্চর্য ব্যাপার– হঠাৎ একদিন ভোর বেলা হুনি, বাবু নাই, পাঁচ মাইয়া আর পরিবার লইয়া কইলকাতা ভাগছে। ক্যামে গেলো, কী বিত্তান্ত, কুনো মানুষ ট্যারও পাইলো না– চিন্তা কইরা দ্যাহেন, বিষয়টা কেমুন! চৌদ্দ পুরুষের ভিটামাটি হালাইয়া মানুষ ক্যামে পলায় ? মাইনষে কইতো, কই যাইবো, গিয়া খাইবো কী ? ফিরত না আইয়া উপায় আছে ? কিন্তু স্যার আইলো না, রায়ট টায়ট শান্ত হইয়া গেলো কিন্তু বাবু আর ফিরত আইলো না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

মুনশির উদাস স্বর আরো খাদে নামে– বিষাদে আরও ভারি হয়। বলে, ক্যাম্নে আইবো ক'ন? বাবু তো মনের দুঃখে দুইন্যা থিকা বিদায় লইছে। পাকিস্তান আমলে কুনো খবর পাওয়া যায় নাই– দ্যাশ স্বাধীনের পর বাবুর দুই ভাতিজা আইছিলো– কিন্তু সুবিদা করতে পারে নাই। ক্যাম্নে ক্যাম্নে য্যান সাডারের আম কাডলের বাগানখান ব্যাচতে পারছে– বাড়িঘরের কুনো ব্যবস্থা করতে পারে নাই। পাকিস্তান আমলের শ্যাষ দিক এক মাউরা বিহারী শত্রুসম্পত্তি ঘোষণা করাইয়া দখল লইছিলো– কিন্তু সে-ও আর কয়দিন! দ্যাশ স্বাধীনের স'ম সেই ব্যাটাও পলাইলো– তারপর দখল করলো বিল্লাল চেয়ারম্যান– কিয়ের চেয়ারম্যান কেউ জানে না, হ্যায় নাকি মুক্তিযোদ্ধা আছিলো, কই যে যুদ্ধ করছে তাও কেউ কইতে পারে না। এ্যার সম্পত্তি, তার বাড়ি-ঘর, অর দোকানপাট সব দখল করে, মানী লোকের মাইয়ারে উঠাইয়া লইয়া যায়– হালায় কতডি যে বিয়া করছিলো তার হিসাব নাই– ব্যাটার জোর কিয়ের? না পার্টি করে– হ্যাষে পার্টির দরদবা কমলো, হালায় খুনের কেইসে ফাঁইসা গেলো– অহন জেলের ভাত খায়– অহন ওই বাড়ির মালিক যে কে, কেউ দখল কইরা থুইছে না উদলা রইছে, কিচ্ছু বুঝবার কায়দা নাই– আর দক্ষিণচকের জমিগিনি আবাদ করতো যারা, জরিপের স'ম হ্যারাই জাল কবলা দলিল দ্যাহাইয়া ঘুষঠুস দিয়া নিজেগো নামে লিখাইয়া লইছে– ব্যস, ঘোষ বাবুগো কিচ্ছা খতম।

রায়হান গল্প শুনতে শুনতে ঘোষবাড়ির ধ্বংসাবশেষ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে, আর মনে মনে মেলায়– এই রকম পোড়ো বাড়ি সে কিষনগঞ্জের ইব্রাহিমপুরে দেখেছে– মোহনগঞ্জের কমলাপুরেও ছিলো এমন বাড়ি– চৌধুরীরা পাকিস্তানে চলে যাওয়ার পর একই দশা হয়েছিলো তাদের বাড়ির। এমনকি নিজের শ্বশুরবাড়ির কথাও তার মনে পড়ে। বীথির বাবা কলকাতা ভবানীপুরের বাড়ির কথা বলতে বলতে শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছেন– একথা কি সে জীবনে কখনও ভুলতে পারবে? রোগশয্যায় শুয়ে থেকে থেকেই বলতেন, ভবানীপুরে ৭নং কাটুয়াকুটি লেনে এখনও আছে আমাদের বাড়ি, একবার পারলে চোখের দেখা দেখে এসো বাবা– আমার বাপজানের নাম কেউ জানে না এখন। আমাদের নামও বোধহয় কেউ শোনে নি– পারলে শুধু বাড়িটার বাইরের চেহারাই দেখে এসো– শুনেছি এক শিখ সরদারজি বাড়িটা দখল করে রেখেছে।

পাকিস্তানে আসার পর দিনাজপুরেও দেখেছে। তবে একেবারে পরিত্যক্ত কিংবা বেদখল ছিলো না– কলেজের নতুন বন্ধু রঞ্জনরা এমন এক ভাঙাচোরা প্রকাণ্ড দালানবাড়িতে থাকতো।

মুনশির গল্প বলা শেষ হলে সে জিজ্ঞেস না করে পারে না। বলে, ঘোষ বাবুদের আত্মীয়স্বজন কেউ নেই এদেশে?

উঁহু। মুনশি মাথা নাড়ায়।

কেউই নেই এদেশে? আপনি ঠিক জানেন?

স্যার কী যে কন! আমি কী কাম করি বুজেন না? জমির দালালি আমার কাম। এই পুরা এলাকার ব্যাকটি মানুষের হাঁড়ির খবর না রাখলে আমার কারবার চলবো?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

কন ? আমি সব জানি– পাকিস্তান আমলে সেই পাকিস্তান-হিন্দুস্থান যুদ্ধের আগে বনমালী দত্ত নামে এক লোকেরে পোলা মাইয়া লইয়া কিছুদিন বসবাস করতে দ্যাখছি– ব্যাটার আড়তদারি ব্যবসা ছিলো সাভার বাজারে– তো হেই ব্যাটাও যে কই গেলো, কেউ কইতে পারে না। আর ক্যামে থাকে কন ? পাকিস্তানে মুসলমান গো রাজত্ব, হিন্দু হইয়া কি থাকতে পারে ? সমাজ সামাজিকতা আছে, মরণ বাঁচন আছে, পোলা মাইয়ার বিয়াশাদি আছে– খুব মুশকিল অগো এই দ্যাশে থাকা।

বাহ্, পাকিস্তান হওয়ার পর কি এদেশে হিন্দু ছিলো না ? এখন নেই ? রায়হান প্রতিবাদ করে। বলে, এসব আপনি কী বলেন ? কাছেই তো সাভার, ওখানে হিন্দু নেই? ধামরাইতে তো এখনো হিন্দু বেশি। মানিকগঞ্জের পুরো এলাকাতেই তো হিন্দু বসতি, বাংলাদেশে হিন্দুর সংখ্যা জানেন ?

মুনশি হাসে। বলে, এগো কথা তো আমি কই নাই স্যার। আমি কইতাছি উঁচা জাতের ধনী হিন্দুগো কথা, যারা সমাজের মাথা ছিলো– যারা রইছে তাগো কেউ মাইন্য কইরা বাবু ডাকতো না– ধনীগিনি চইলা গেছে বইলাই তো অহন এগো মাইন্য কইরা বাবু কয়– কচু বনে হিয়াল রাজা আর কি ?

রায়হান স্বীকার করতে চায় না। বলে, এটা আপনার ভুল ধারণা– উঁচু জাতের হিন্দু এদেশে এখনো বহু আছে।

হ, আছে, কইতে পারেন, কিন্তু বেশি নাই– কুনো কুনো গেরামে একজনও পাইবেন না। শহর বন্দরে কিছু থাকতে পারে–

বলতে বলতে মুনশির গলায় শ্লেষ ঝরে পড়ে। বলে, হ, কথা ঠিক আপনের– কিন্তু খোঁজ নিয়া দ্যাহেন, হ্যাগো বউ পোলাপান এই দ্যাশে নাই। বউ পোলাপান বর্ডারের ঐ পারে থুইয়া এই পারে থাহে রুজি রোজগারের ধান্দায়। এহনও কতজনরে দেহি– এই দ্যাশের রুজি রোজগার থুইয়া আহে ওই দ্যাশে– আমি স্যার বহুত দ্যাকছি– ঐ যে কইলাম জমিজমার দালালি যারা করে মাইনষের হাঁড়ির খবর না রাখলে তাগো কারবার চলে না।

আপনি দেখছি হিন্দুদের ওপর বেজায় চটা, রায়হান কথাটা না বলে পারে না।

জ্বে না, মুনশি মাথা নাড়িয়ে শান্ত গলায় জানায়। বলে, না স্যার অগো উপ্রে আমার কুনো রাগ নাই, আমি হইলে অগো মতন আমিও করতাম– পোলা মাইয়ার বিয়াশাদির কথা তো কইলামই, ধর্ম কর্ম নাই ? তা ছাড়া ভবিষ্যতের চিন্তা কে না করে কন ? আর ডর নাই কার ? এককালে যাগো শাসন করছে, তাগো অধীন থাকতে কার মন কি চায় ?

রায়হান এবার আর প্রতিবাদ করে না। কারণ জানে, প্রতিবাদ করে লাভ হবে না। মুনশি নিজের বক্তব্যের পেছনে একশো একটা উদাহরণ তুলে ধরবে। অমন রঞ্জনের উদাহরণের ঘটনা তো তার নিজেরও কম দেখা নেই। বন্ধু রঞ্জনের কথা কি ভোলা যায় ? রঞ্জনদের বাড়ির সবাইকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিলো মালদা'র দিকে– ওধু থেকে গিয়েছিলেন ওর বাবা। দিব্যি চুটিয়ে প্র্যাকটিস করতেন দিনাজপুর কোর্টে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

কিছুদিন পর রঞ্জনও ফিরে আসে মাকে নিয়ে– বেশ কিছুদিন থেকে যায়– ইন্টারমিডিয়েট পাসও করে, তারপর ফের চলে যায়। ওর বাবা যান আরও বছর তিনেক পরে– ইতিমধ্যে বাড়িটাও বিক্রি করে দিয়েছিলেন, থাকতেন মারওয়াড়িপট্টির এক বাসায়? শেষে রঞ্জনের দিদি আর দাদা চাকরিতে ঢুকলে– ততদিনে দমদমের কাছে নিজেদের বাড়িও হয়ে গিয়েছিলো– রঞ্জনের বাবা দিনাজপুর ছেড়ে পাকাপাকি ভাবে চলে যান। শুধু কি রঞ্জনরা? বিমলরা, সুকুমাররা, তপনরা? কারা নয়? কালিতলা, বালুবাড়ি, পাহাড়পুর, রামনগর, রাজবাড়ি সব এলাকার উকিল, মোক্তার, ডাক্তার, ব্যবসায়ী, ইস্কুল মাস্টার, কলেজ শিক্ষক– সবারই একই ঘটনা– সবাইকেই চলে যেতে দেখা গেছে– কিন্তু হঠাৎ করে একদিনে হুড়মুড় করে যায় নি ওরা– গেছে ধীরে সুস্থে, হিসেব মতো, গোছগাছ করে।

রায়হানের স্মৃতিতে ওই মুহূর্তে একখানা মুখ চমকে ওঠে– হ্যাঁ বহুকাল পরে সুমিতার কথা মনে পড়ে। সুমিতারাও তো গিয়েছিলো অনেক পরে। ওদের চলে যাওয়ার কারণ কি সে নিজেও ছিলো না খানিকটা? রায়হানের স্মৃতিতে সুমিতার মুখ অনেকক্ষণ ধরে জ্বলজ্বল করে।

ওদিকে মুনশি ফের বলতে শুরু করে। বলে, স্যার হিন্দুগো নিয়া এই এক মুশকিল কি জানেন? হ্যারা রোজগারের টাকা পয়সাগিনি এই দ্যাশে থুইবো না– আপনে যতোই কন।

রায়হান হাসে। বলে, ইণ্ডিয়ার মুসলমানদের নিয়েও তো একই মুশকিল– তারাও তো ওই রকমই করে।

উঁহু, মুনশি ডাইনে বাঁয়ে মাথা নাড়ায়– কথাটা স্যার ঠিক কইলেন না– স্যার আপনে দ্যাকছেন কেউরে? আমিতো দেহি নাই কুনো ইণ্ডিয়ার মানুষ ওই দ্যাশের রোজগারপাতি আইন্যা এই দ্যাশে জমাইতেছে– পাকিস্তান আমলের কথা কইতে পারি না, দু'একজন অমন লোক পাইলেও পাইতে পারেন– কিন্তু অহন তো এক্কেবারে না– অসম্ভব।

রায়হান স্মরণ করিয়ে দেয়। বলে, এসব কথা নিয়ে তর্ক করা ঠিক নয় মুনশি– মানুষের জীবন মরণ নিয়ে কথা– খোঁজ নিয়ে দেখুন। ইণ্ডিয়ার যেসব লোক এদেশে বাড়িঘর করেছে– সবই ওদেশের জমিজমা বিক্রি করে অথবা বদল করে– খোঁজ করলেই বহু লোক পাবেন।

আহ্হা, মুনশি এমন ভঙ্গি করে যেন সে অল্পবয়সী কোনো ছেলেকে বোঝাচ্ছে। বলে, আপনেরে আমি ক্যাম্নে বুজাই কন? বাড়িঘর সয়সম্পত্তি বেইচ্যা বুইচ্যা ট্যাকা পয়সা আনতে না পারলে বাড়িঘর ক্যাম্নে বানাইবো– আমি স্যার হেই কথা তো কই নাই, কইছি ফ্যামিলি বর্ডারের ওই পারে– আর এই পারে বাবু চাকরি করে, নাইলে ব্যবসা করে– আমি এই কিসিমের কেইসের কথা কইছি– এমুন বহুত মাইনষের লগে আমার চিন পরিচয় আছে।

রায়হান বুঝতে পারে না, সে কেমন করে বোঝাবে যে মাইনরিটি সাইকোলজি বলে একটা ব্যাপার আছে– তার ওপর সে যদি যথেষ্ট সচ্ছল না হয়– তাহলে অবশ্যই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

সে রোজগার করবে সেই জায়গায়– যেখানে রোজগারের সুবিধা বেশি, আর বউ ছেলে মেয়েকে কে না নিরাপদ জায়গায় রাখতে চায়! সে মুনশির বিষয়টা নিয়ে আর কথা বাড়াতে যায় না। কারণ সে খুব ভাল করে জানে। মাইনরিটি হওয়ার অভিজ্ঞতা না থাকলে মাইনরিটি সাইকোলজি কী বস্তু তা কারুর পক্ষেই বোঝা সম্ভব নয়। সে দেখেছে শিক্ষিত লোকেরাও ব্যাপারটা বুঝতে পারে না।

মুনশির কী যেন হয় ওই মুহূর্তে। কোনো ঘটনা বোধহয় স্মরণ হয় তার। নজর মেলে রাখে দূরের বাড়িঘরগুলোর দিকে। তারপর বলে, স্যার কী কমু, কী অবস্থা মাইনষের ওই স'ম আহহারে– দূর থিকা দ্যাখছি ইষ্টিমার ঘাটে ভিড়ে না– কী ? না রায়ট লাগছে– আগুন দেহি, আর দেহি মানুষ পলায়, পলাইন্যা মানুষরে পিছ থিকা ক্যান্নে কোপায় দ্যাকছি স্যার। পিচ্ছি পোলাপানের গলায় কোপ ঝাড়ে আর মাথাডা নারিকোলের মতন মাটিতে পইড়া গড়াইয়া যায়– স্যার কী কমু, ছোট বয়স, তহনও ভালো বুজি না– কিন্তু যা দ্যাকছি, স্যার স্মরণ হইলে শরীলের পশম খাড়াইয়া যায়। একটা কথা স্যার অহনও মনে আছে– একজন আর একজনরে কইতাছে, এক কোপে কাটবি– জবাই করবি না।

গল্প বলতে বলতে মুনশির কেমন যেন ঘোর লেগে যায়। বলে, স্যার বুড়া হইয়া গেলাম, কিন্তু যা দ্যাকছি ভুলতে পারি না এতোদিনেও।

রায়হানও প্রায় একই রকম দৃশ্য দেখতে পায় স্মৃতির পটে– মুংগের-এ মনু পিসীমা ছাতের চিলেকোঠায় তাকে লুকিয়ে রেখেছিলেন, বন্ধ জানালার ফাঁক দিয়ে সে স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলো, সামনের একটা বস্তি ঘিরে বহু লোকের ভিড়– বহু লোকের চিৎকার শোনা যাচ্ছিলো আর থেকে থেকে হুঙ্কারের মতো স্লোগান জয় মা কালী, জয় শিব শঙ্কর, হর হর মহাদেব– এইসব তার সঙ্গে আরও যেন কী কী স্লোগান হচ্ছিলো সে বুঝতে পারে নি– আগুনও জ্বলে উঠেছিলো ঘরবাড়িতে– ঐ ধোঁয়া, চিৎকার আর মানুষের ছুটোছুটির মধ্যে সে হঠাৎ দেখে, একটি বাচ্চা ছেলের দুই পা ধরে শূন্যে ঘুরিয়ে লোহার ল্যাম্পোস্টে মাথাটা আছড়ানো হলো– লোহার ওপর কোনো শক্ত জিনিসের ঘা লাগলে যেমন আওয়াজ হয়– আওয়াজটা তেমন তীব্র নয় বরং ছিলো খানিকটা ভোঁতা– কিন্তু স্পষ্ট শুনতে পেয়েছিলো সে শব্দটা। ওই একটি বাচ্চাকেই নয়, দু'তিনটি বাচ্চার পা ধরে মাথার ওপর ঘোরাতে দেখেছিলো সে। তারপর ল্যাম্পোস্টে আছাড় মেরে মাথা ভাঙার আওয়াজ ক'টাও সে স্পষ্ট শুনতে পেয়েছিলো। পরে রাস্তার ওপর তিনটে বাচ্চার রক্তাক্ত লাশ সে পড়ে থাকতে দেখে। আর কাটিহার রেলওয়ে কলোনীর পাশের বস্তিটা জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিলো সেটাও তো তার নিজের চোখেই দেখা।

মুনশি বোধহয় কিছু অনুমান করে। বলে, আমি স্যার অগো দোষ দেই না– জানের ডর বড় ডর– জানের ডর লইয়া মানুষ কতোদিন বসবাস করতে পারে কন ? য় আমার কথা হইলো, যেগিনির সামর্থ্য আছিলো তারা গ্যাছে গিয়া– আগে হউক রে হউক। যেগিনির সামর্থ্য ছিলো না, পরেও হয় নাই– তারা রইয়া গেছে– এই ার কি!

রায়হান মুনশির কথার পিঠে আর কথা বলে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

দুই

রাস্তাটা বাগান ঘেঁষে একটা বাঁক নিয়েছে। ঐ বাঁকটুকু ঘুরতে না ঘুরতেই দেখে সামনে আরও একটা প্রকাণ্ড দালান বাড়ি। ঐ বাড়ির কাছাকাছি দাঁড়িয়ে লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে মুনশি। বলে, 'স্যার দুনিয়াদারি আর ভালো লাগে না। মাইনষে যে ক্যামে বিষয়-সম্পত্তির লাইগা পাগল হয় বুজি না– ঘোষ বাবুরা কেমুন মানুষ আছিলো নিশ্চয়ই আন্দাজ করতে পারেন– অহন দ্যাহেন তাগো নাম-নিশানা পর্যন্ত নাই। কয় পুরুষ ভোগ করতে পারছে কন ? ঘোষ বাবুরা তবু ৩/৪ পুরুষ ভোগ করছে– কিন্তু এই সাহা বাবুর কথা চিন্তা করেন– নন্দ গোপাল সাহা দিয়া শুরু– শ্যাষ দুইটাই। সাহার বংশে কেউ নাই– কিন্তু দ্যাহেন, কেমুন বিশাল একখান বাড়ি পইড়া রইছে।

ঢোকার সময় লক্ষ্য করে রায়হান। গেটের মাথায় একটা ফলক লাগানো। তাতে লেখা শ্রী শ্রী হরিসহায় বঙ্গাব্দ ১৩৫১। তার মানে ঘোষ বাবুদের বাড়ির তুলনায় সাহাদের বাড়ির বয়স অনেক কম।

বাড়ি দেখতে দেখতে নন্দ সাহার গল্প জুড়ে দেয় মুনশি। বলে, স্যার, এই বাড়ির মালিক নন্দ সাহা– বানাইছেনও তিনি– এই বাড়িতে থাকতে থাকতে ফের তার জীবনও শ্যাষ– তার মানে এক পুরুষেই কিচ্ছা কারবার খতম।

ভেতরের উঠোনে গিয়ে পড়লে দরদালান এবং চওড়া সিঁড়ির দিকে নজর রেখে মুনশি ফের বলে, নন্দ সাহার কথা স্যার কী কমু– খুবই সাধারণ মানুষ আছিলো সাহার পো– বাপও যে খুব ধনী লোক তা নয়। মানুষটা আছিলো ছোটখাটো, হাসিমুখে কথা কইতো আর জোয়ানকালেই দেখছি, ঠাকুর ঘরের সামনে খাড়াইয়া টুনটুনি বাজাইতো আর হরেকিষ্ণ হরেকিষ্ণ গান করতো– মাছ গোস্ত খাইতো না– কাপড়ে-জামায় বাবুগিরি করছে কুনো সময় এমনও আমরা দেহি নাই– কিন্তু হইলে কী। হালার কারবারখানই ছিলো সুদের। সুদের কারবার কি ভালো, কন ? সুদের কারবার কেমুন তা তো স্যার জানেন– আকালের স'ম হইলেই মাহাজনের জিভলা লাম্বা হইয়া যায়। টানের স'ম, আকালের স'ম ট্যাকা-পয়সা কর্জ লইতো মানুষ– তারপর আর শোধ করতে পারতো না– সুদও না, আসলও না। চক্র বিরৃধি সুদ কেমুন হয় তা তো স্যার আপনে জানেন– হ্যাষে বন্ধকী জমি নিলামে চড়াইয়া কিন্যা লইতো মাহাজন। আকালের স'ম মাত্র দুই বছরে পুব চকের ব্যাবাক জমির মালিক হইয়া গেলো সাহার পো– বেশি দিনের কথা কিন্তু না– বিটিশ আমলে জার্মান-জাপান যুদ্ধের স'ম যে বড় আকাল– পঞ্চাশের আকাল কই আমরা– সেই আকালের স'ম সাহার পো ধনী হইয়া গেলো– অবস্থা ভালো ছিলো, আগে পাকা বাড়িও ছিলো– কিন্তু ওই ঘটনার পর সাহার পো– এক্কেরে ফুইল্যা উঠলো– আমাগো চক্ষুর সামনে ঘটছে সব– তয় স্যার হালায় জব্বর কিরপনও আছিলো। কেউরে কিছু দিত না। হরেকিষ্ণ গানের আসর বসাইয়া কিছু খরচ করতো– কিন্তু ব্যস ওই পর্যন্ত– অন্য কিছুতে একটা ছ্যাঁদা পয়সা খরচ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

করতে কেউ দ্যাহে নাই। এক পোলা আর দুই মাইয়া– পোলাডা বড়। কিন্তু ওহ্, এমুন জবর খাচ্চর আছিলো না, যে কওন যায় না– সুযোগ পাইলেই গরিব হিন্দু ঘরের বৌ-ঝিগো সব্বনাশ কইরা ছাড়তো। হালার মরণও হইলো ওই লুচ্চামি করতে গিয়া। রাইতের বেলা ঢুকছিলো সাধু জাউলার বাড়ি– ভাবছিলো জাউলায় বাড়িত নাই, মাছ মারবার গেছে– এই একটা সুযোগ। সত্য সত্যই জাউলা বাড়িত ছিলো না– কিন্তু হ্যায় না থাকলে কি, হ্যার বউ কি কম ? যেমুন লাম্বা তেমুন পাশ– জবরদস্ত বউ সাধু জাউলার। ওই জবরদস্ত বউ মাইছা দাওখান দিয়া ঝাইড়া দিছে একখান কোপ– ব্যস তাতেই কাম সারা। তয় লগে লগে মরে নাই হালায়– আন্ধারে জাইলানি কোপখান ঠিক মতোন বহাইতে পারে নাই আর কি। তবু ধারাল দাওয়ের কোপ কেমুন হইতে পারে আন্দাজ করেন। গোঙাইতে গোঙাইতে কুনোমতে বাড়ির দুয়ার পর্যন্ত আইতে পারছিলো মাত্র– তারপর দুয়ারে পইড়াই শ্যাষ। নিশুত রাইতের ঘটনা– নন্দ সাহা টের পায় নাই, হ্যার পরিবার না, মাইয়ারা না– কেউ কিছু হোনে নাই– সকালে যহন নন্দ দ্যাহে– তহন আদরের পোলা মইরা শক্ত হইয়া রইছে।

দু'জনে বাড়ির বেশ ভেতরে ঢুকেছে ততক্ষণে। চক মিলানো দালানের ভেতরে বাঁধানো উঠোন আর ঠিক মাঝখানে বেদীর মতো উঁচু বাঁধানো দোলমঞ্চ। ঐ উঠোনেই আবার কল্কে ফুলের গাছ– ঝুঁকে পড়া ডাল থেকে ঝরে পড়া রাশ রাশ কল্কে ফুল দিয়ে নিচের দিকটা বিছানো। ফুলের বাসি এবং টাটকা গন্ধ একই সঙ্গে মেশামেশি হয়ে বাতাসে ভাসছে– দিনাজপুরে ঐ মুহূর্তে বোস্টমদের পরিত্যক্ত আখড়াটার ছবি তার চোখের সামনে বার দুই ভেসে ওঠে।

মুনশির, গল্প তখনও ফুরোয় নি। সে তখনও বলে চলেছে, পোলা মরলো জাউলানির হাতে, লুচ্চামি করতে গিয়া– তবু বাপের শিক্ষা হয় না। সুদের কারবারটা আর ছাড়ে না। মাইনষে কইতো– সাহা মশায়, বহুত হইছে, আর কতো? এইবার খ্যামা দ্যান, সুদের কারবার আর কইরেন না। তো সাহার পো ওই কথা কানেই লয় না– হালার প্যাটে প্যাটে জিলাপীর প্যাঁচ। উল্টা কইতো, আমি তো অন্য কারবার বুজি না ভাই– আমারে তো কিছু একটা কইরা খাইতে হইবো। হোনেন কথা, হালায় কয় কি ? হ্যার যেমুন খাওনের অভাব! পাকিস্তান হয় হয় স'ম গেরামের মাইনষেরে ডাইকা কইলো, ব্যাবাক জমি আমি বেইচা দিমু, আহ কে কিনবার চাও– তো ঐ স'ম কিনবার মানুষ কই পাইবো ? ইদিক ফের ছোট মাইয়া বীনাপানি সাভারের এক নাপতা পোলার লগে ভাইগা গেল। গেল তো গেলো– এক্কেরে কইলকাতা। নন্দ সাহা মুহে চুনকালি লইয়া সেই যে বাড়ির ভিতর হান্দাইলো আর বাইরাইতে পারে না– পারে না– চায়ও না। কোন মুহে বাইরাইতে চাইবো কন ? বড় মাইয়া সুভাষিণী তো তহনও আবিয়াতি। মাইয়ার ক্যান্নে বিয়া দিবো চিন্তা কইরা বাপে দিশ দুয়ার দ্যাহে না। হ্যাষে ঢাকার তাঁতিবাজার থিকা এক পাগল ছ্যাড়ারে ধইরা আনলো হ্যার হালা– বিনোদ কুণ্ডু। ছ্যাড়া পাগল নামেই, ভিৎরে ভিৎরে জবর সেয়ানা– ওস্তাদি কম জানতো না। পরথম পরথম মুখ বুইজা থাকতো– বিয়া শাদিও ঠিক মতনই করলো। মাইয়ার প্যাটও একখান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বানাইয়া দিলো। তারপর ট্যাহা-পয়সা সোনাদানা লইয়া কই যে ফুইটা গেলো, তার হদিস আইজও কেউ দিবার পারে না। আইজও গেলো তো কাইলও গেলো। হ্যাশে মাইয়া মরলো পোলা বিয়াইতে গিয়া আর বাপে মরলো বাস এ্যাকসিডেন্টে। আরিচার রাস্তায়– নন্দ সাহার পরিবার মাইয়ার বাচ্চাডা লইয়া কিছুদিন ছিলো এই বাড়িতেই। কিন্তু ঐ বাচ্চারে বাঁচাইয়া রাখন কি সোজা কাম, কন ? নাতি মরলো তারপর বুড়িও গেলো– এক বচ্ছরেই ব্যাক গেলো। নন্দ সাহার বিষয়-আশয় দেখবার আর কেউ রইলো না। জ্যাতা থাকতে থাকতেই নন্দ বাড়ির পিছন দিকটা বিন্দাবন জাউলারে থাকতে দেয়– জাউলা-জাউলানী পোলা-মাইয়া লইয়া অহনও রইছে ঐ পুষ্কর্নী ঘাটের দিক। স্যার, দ্যাহেন দুনিয়াদারি কেমুন জিনিস– পোলারে যে খুন করছে, তারেই বাড়ত জায়গা দিতে হইলো। সরকার তো শত্রু সম্পত্তি ঘোষণা দিছিলো– মনে হয় হাত ছিলো আইদর আলী মেম্বারের। কিন্তু তাতে কি! সাভারের নকুল চন্দ্র বোস্টম দিছে মামলা ঠুইকা, যে মরার বহুত আগে নন্দ সাহা বিষয় সম্পত্তি আশ্রমে দান কইরা দিছে– সেই মামলা ফয়সালা কবে হইবো কেউ জানে না– নকুল তো মরছে, হ্যার পোলা কী করে, কে জানে!

দীর্ঘ কাহিনী শেষ হয়। বাড়ির পেছন দিকে আম বাগানে গিয়ে পৌছালে মুনশি সামনের দিকে হাত তুলে দেখায়। বলে, আরও দেখবেন ?

রায়হান দাঁড়িয়ে পড়ে। বলে, নাহ্ থাক।

তবে দেখতে অনিচ্ছা প্রকাশ করলে কী হবে, হাঁটতে হাঁটতে বেশ ভেতরে ঢুকে পড়েছিলো তারা। মুনশি হাত তুলে দেখায়। বলে, ঐ দ্যাহেন পুষ্কর্নী। রায়হান মুখ ফেরালে অদূরে পাড়ের কলাগাছ, বাঁধানো ঘাটে এক বুড়িমতন মেয়ে মানুষ আর পুকুরের কালো পানি দেখতে পায়।

মুনশি প্রায় জোর করেই রায়হানকে পুকুর ঘাটে নিয়ে যায়। সেখানে ঘাটের পৈঠায় দেখতে না দেখতে বসেও পড়ে। চারদিকে অসম্ভব চুপচাপ– বেলা প্রায় দুপুর শেষ– ভাদ্রের রোদে তাপ ক্রমেই বাড়ছে। হঠাৎ কী হয় মুনশির– সোজা হাঁটু পানিতে নেমে দাঁড়ায়। তারপর মুখে গলায় মাথায় পানি দিতে দিতে বলে, স্যার, এই পুষ্কর্নীরও একখান জবর কিচ্ছা আছে– হুনবেন ?

রায়হান মাথা নাড়ায়। বলে, থাক, কাজের কাজ তো কিছুই করলেন না– খামোকা গল্প জুড়ে দিলেন।

গল্প তো না স্যার, কী যে কন আপনে, সব তো সইত্য ঘটনা।

মুনশি বিশ্বাস যোগ্যতা প্রমাণ করতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। বলে, খালি আমি না– স্থানীয় লোক যারে জিগাইবেন সেই এই গিনি ঘটনার কথা কইবো– আরও দ্যাখবেন এই সব ঘটনার কারণেই তো জমিজমার দলিলপাতির ভিৎরে ভেজাল ঢুইকা রইছে।

রায়হান কোন্নে মন্তব্য করে না। মুনশির বয়ান যে সত্যি, তা রায়হানের চাইতে ভালো আর কে জানে ? ললিত মোহন ঘোষকে চিনতে তার একটুও অসুবিধা হয় না। তার বাবা মোরশেদ আলী প্রধান যেমন পালিয়ে এসেছিলেন পাকিস্তানে– সবার নজর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

এড়িয়ে একইভাবে ললিত মোহন ঘোষও পালিয়েছেন ইণ্ডিয়ায়। মোহনগঞ্জে নিজেদের বাড়িঘর, জমিজমার যে হাল হয়েছিলো, সেই একই হাল হয়েছে এখানকার লোকদেরও।

নন্দ লাল সাহাকেও সে কল্পনায় দেখতে পায়। গোলগাল মানুষটি, গলায় কণ্ঠির মালা, কপালে, বাহুতে চন্দনের রসকলি, চাঁছা মাথার পেছনে পুরুষ্টু শিখায় একটি ফুল বাঁধা, ঘাড়ে নামাবলী জড়ানো, হলুদ কঙ্কে ফুলের সাজিটি নিয়ে হেঁটে চলেছেন, দোলমঞ্চের দিকে– কারণ একটু পরই অষ্টপ্রহর নামকীর্তন আরম্ভ হবে এবং সেখানে পৌঁছে তিনিও ধুতির কোঁচাটি ছেড়ে দিয়ে ঘাড়ে জড়ানো নামাবলীর খুঁটি দু'টি দু'হাতে ধরে, মুখখানি ঈষৎ ওপরের দিকে তুলে অন্যদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে নামগান জুড়ে দেবেন।

রায়হান কল্পনায় পুরো দৃশ্যটা দেখতে পায় ক্ষণিকের জন্যে। তবে কোথায় দেখেছে সেটা কিছুতেই স্মরণ করতে পারে না– মোহনগঞ্জে কি ? গোপাল পণ্ডিতের আশ্রমের দৃশ্য ওটি, না কি দিনাজপুরে কালিতলার হরিসভার ? নাকি স্মৃতির কোনো ব্যাপার নয়– মুহূর্তের জন্যে সামনের দরদালানে একটি অনুষ্ঠান জীবন্ত হয়ে উঠেছিলো– এক্ষুণি ফের মিলিয়ে গেলো। এ রকম তো হয়– হয় না ? রায়হান নিজেকেই জিজ্ঞেস করে।

মোহনগঞ্জে বাড়ির খোলানে দাদী তো দিব্যি দেখতে পেতেন তাজিয়া বানানোর আয়োজন। তাজিয়া বানানো বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো সেই কবে– কিন্তু দাদী তো দিব্যি দেখতে পেতেন।

মুনশি তখনও দু'হাত পানিতে ডুবিয়ে আঁজলা ভরে পানি নিয়ে মাথায়-ঘাড়ে-গলায় দিচ্ছে। চুল দাড়ি ভিজলে অদ্ভুত চেহারা হয় মানুষের। দূর থেকে মনে হয়, মানুষটা যেন গলে গলে গড়িয়ে পড়ছে নিজেরই শরীরের কাঠামো বেয়ে।

রায়হান পুকুর পাড়ে দাঁড়িয়ে পানি, ঝুঁকে পড়া নারকেল গাছ, আর অদূরের গাঢ় আম বাগান দেখছিলো। মুনশি ভেজা চুল-দাড়ি নিয়ে উঠে এলে সে বলে, জায়গাটা কিন্তু বেশ, এখানে একটুখানি জায়গা পেলে কাজ হতো– কেউ বেচবে না ?

মুনশি হাসে। বলে, স্যার যে কী কন! মালিক থাকলে না জমির ব্যাচাকিনি হইবো– মালিকেরই পাত্তা নাই– একবার এ কয় আমার, একবার ও কয় আমার।

সাহা বাবুর কি কেউ-ই ছিলো না ? রায়হান ফের জিজ্ঞেস করে।

কইলাম তো স্যার, হ্যার পোলা মাইয়ার কথা– বীনাপানির তো কেউ হদিসই বাইর করতে পারলো না। কেউ থাকলে কি আর সাহা বাবু সাধু চরণ জাউলারে থাকতে দিতো, কন ?

তা হলে সাধু চরণের কাছে নিশ্চয়ই দলিলপত্র কিছু আছে।

আরে নাহ্– মুনশি তাচ্ছিল্য ভরে মাথা নাড়ায়। বলে, সাধু চরণের হাতে দলিল থাকলে কি আর ওই সম্পত্তি এ্যানিমি প্রপার্টি হয় ? নকুল বোষ্টম তো একখান দলিলও দ্যাহাইছিলো– কিন্তু কাম হয় নাই– ক্যামে হইবো কন ? নকুলের আশ্রম রইলো কই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ধামরাই আর সাহা বাবুর বাড়ি রইছে কই– ত্রিশ মাইল ফারাক– দলিলেরও তো হিসাব লাগে– কন, লাগে না ?

এখনও কি এটা এ্যানিমি প্রপার্টি ? রায়হান জানতে চায়।

না, কেউ কিছু কইতে পারে না এইটা কেমুন প্রপার্টি– মুনশি জানায়। বলে, পাকিস্তান আমলে এক মাউরা সাহেব নাকি লিজ লইছিলো, কারখানা বহাইবো– কিন্তু পারলো কই! দ্যাশ স্বাধীনের দাবি উইঠা গেলো, সাহেব পলাইতে দিশা পায় না। স্বাধীনের পর দখল লইছিলো তারা মিয়া ক্যাপ্টেন। হালায় আস্তা ডাকাইত– হালায় নাকি মুক্তি বাহিনীতে আছিলো মাস দুই– হের লাইগা ক্যাপ্টেন নাম জুইড়া লইছিলো। লুটপাট কইরা দ্যাশ-গেরামের কিছু আর থোয় নাই। হালার কথা কি কমু– চারখানা বউ সব সময় রাখতো। কত মাইয়ারে যে ইজ্জত নাশ করছে হারামজাদা তার হিসাব নাই। মানুষের রাগ বইলাও জিনিস আছে স্যার, সর্বহারা পার্টির লোকেরা একদিন ভার্কুতার হাটে ধইরা হালারে দিলো জব কইরা। ঐ ঘটনার পর নন্দ সাহার এই বাড়ি আর কেউ দাবি করে না। জানে, দাবি করলেই আরও দাবিদার খাড়াইয়া যাইবো।

মুনশি হাঁটতে হাঁটতে ফিরে ফিরে তাকায় আর বলতে থাকে– হায়রে সম্পত্তি! দশাখান কেমুন তর ? কেউ তরে রাখতে পারে না, ভোগ তো দূরের কথা– এক পুরুষেই তার কিচ্ছা খতম হইয়া যায়।

রায়হানও হাঁটতে হাঁটতে মুখ ফিরিয়ে তাকায়। তারও অবাক লাগে। এক পুরুষেই একটা বসত একেবারে পুরোপুরি পরিত্যক্ত হয়ে গেলো ? তার চিন্তা হয়, সে যদি এই জায়গায় বসত গড়ে তোলে, তা হলে সেটা থাকবে কয় পুরুষ ? মোহনগঞ্জের বসতটা কতো প্রাচীন ছিলো কেউ ঠিক মতো জানতো না– তবে তার প্রাচীনত্ব সম্পর্কে কারও সন্দেহ ছিলো না। অনেকে মনে করতো, ওই বসত ভিটা তৈরি হয় কম্পানি আমলে। জালাল প্রধানকে দেওয়া একখানা পত্তনী দলিল বাবা দেখেছিলেন তাঁর দাদীর সিন্দুকে। কিন্তু পুরনো বসত ছেড়ে যে নতুন বসত গড়লেন, তার প্রয়োজন তো এক পুরুষেই ফুরিয়ে গেলো। এখন সে নিজে যে বসত গড়তে চাইছে সেটাই বা কতদিন টিকবে ? বাহারউল্লাহ মুনশি লম্বা নিঃশ্বাস ছেড়ে বলে, স্যার কী করবেন কন? দুনিয়ার নিয়মই অমুন– এই কূল ভাঙে তো ওই কূল গড়ে। মানুষ খামাখা স্থায়ী জিনিস পাইতে চায়– স্থায়ী তো দেহি কিছুই থাহে না– আমি কতো লোকেরে বাড়ি-ঘর জায়গা-জমিন কিন্যা দিছি– কেউ রাখতে পারছে ? কেউ পারে নাই– কেউ নিজে রাখতে পারলেও হ্যার পোলা আর পারে নাই– বাপের সম্পত্তি বেইচ্যা খাইছে। হেই বড় আক্কালের স'ম কতো মানুষ যে আসামে চইল্যা গেলো তার হিসাব নাই– এই গেরামেই কতো জনের বাড়ি-ঘর আছিলো, বুজেন সাত পুরুষের ভিটা– বেইচ্যা-বুইচ্যা এক্কেরে সাফা। অহন হুনি হ্যাগো খেদাইয়া দিতাছে।

রায়হানের ইতিহাস জ্ঞান কিঞ্চিৎ নাড়া খায়। মানুষের ঠাঁই বদলের ঘটনা কি একবার– দু'বার ? মহামারি, দুর্ভিক্ষ, রাষ্ট্রবিপ্লব, যুদ্ধ, দুঃশাসন– সবই তো ভিটেমাটি ছেড়ে পালাবার কারণ। কখনো পুব থেকে পশ্চিমে, কখনো পশ্চিম থেকে পুবে–

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

উত্তরের মানুষ দক্ষিণে নেমে এসেছে– কখনো কখনো আবার দক্ষিণ থেকে উত্তরেও চলে গেছে। জলদস্যুর হামলায়, ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে, কম্পানির দুঃশাসনে, দুর্ভিক্ষে, দাঙ্গায়, দেশভাগে, যুদ্ধে, খালি তো ঠাঁই বদলেরই ঘটনা। কেউ যেন তার মনের ভেতরে জিজ্ঞেস করে, তুমি কতোদিন বাস করবে এখানে বাড়ি করলে ? বলো, কতোদিন ? বিক্রমপুরের হাওলাদাররা আসামে ঠাঁই গেড়েছিলো, কিন্তু ক'দিন থাকতে পেরেছে ? কিংবা নগেন দত্ত, দিনাজপুরে ঠাঁই গেড়ে ওকালতি করতেন, জমজমাট প্র্যাকটিস– কিন্তু কতোদিন ? খুব জোর বছর পঁচিশেক। এক পুরুষও তো থাকতে পারেন নি। তা হলে বাড়ি করার জন্যে এতো অস্থির হওয়ার কী মানে ? রায়হানের নিজেকে করা প্রশ্ন নিজের ভেতরেই নিরুত্তর থেকে যায়।

হাঁটতে হাঁটতে চৌরাস্তা মতো জায়গায় পৌঁছায়। একপাশে ঘোষ বাড়ির আমবাগান, তার পাশে বেশ উঁচু ডাঙ্গা জমি– তার ওপাশে আবার বাড়িঘর।

রায়হান জায়গাটার ওপর দিয়ে নজর বুলাতে বুলাতে দাঁড়িয়ে যায়। মুনশি তার দিকে তাকালে বলে, এ জায়গাটাও কিন্তু বেশ– এখানে অন্য কারুর জায়গা নেই ? সবটাই ঘোষ বাড়ির এলাকা ?

জ্বে না, সবই অন্য লোকের জায়গা– কিন্তু কেউ বেচবো না– ক্যামে বেচবো– কাগজপাতি ঠিক থাকলে তো বেচবো ? কতোবার যে মালিকের নাম বদল হইছে– তার হিসাব নাই– তহশিল অফিসে গেলে বুজবেন।

এই যে দ্যাহেন, মুনশি হাত তুলে দেখায়। বলে, এই যে বাগানের লাগা জমিখান– কতোটি আম-কাডলের গাছ দ্যাহা যায়। আমরা জানতাম, ঘোষ বাবুগো জমি। কিন্তু পরে দেহি কফিলদ্দিন ওই জায়গার গাছ থিকা ফল পাড়ে– আমাগো বয়স তহন বেশি না– হবায় দাড়িমোচ জালাইতাছে। জিগাই, কিরে চুরি করস ক্যা ? তো হালায় চেইত্যা উইঠা কয়। কিয়ের চুরি ? এই জমিন তো আমাগো। পরে হুনি ওই জমিন নাকি লিইখ্যা দিছে কফিলের বাপরে– ললিত মোহন ঘোষ স্বয়ং। কারবারখান কেমুন বুজেন, বাবুরা গেছে সেই ক-বে। এতোকাল কেউ কিছু হোনে নাই– দশ বছর পর কইতাছে, জমি নাকি সাফ কবালা কইরা বাবু লেইখা দিছে– জরিপের সময় নামজারি পর্যন্ত নাকি হইয়া গেছে। খতিয়ান পরচা, দাখিলা, সব জায়গায় কফিলের বাপ আইয়ুব আলীর নাম।

স্যার, এই দিক দ্যাহেন, মুনশি এবার বাম দিকের জমি দেখায়। বলে, ওই দিক কফিলদ্দিনের জমি আর এই দিকে মালিক সবদর আলী। একই লগে দুইজনে ঘোষ বাবুগো জমি হাতাইয়া লইছে। কিন্তু অহনই দ্যাহেন কফিলদ্দিনের অবস্থা খারাপ আর সবদর আলী কেরমেই উপ্রে উঠতাছে। হ্যার বড় পোলা ম্যাট্রিক পাস দিয়া সাবরেজষ্টি অফিসের পেশকার– কাপড়জামা ঝাড়া দিলেই ট্যাকা পড়ে আর ছোটপোলা ল্যাহাপড়া শিখে নাই। বেবিটেসকি কিন্যা দিছে বাপে– দিনে ২/৩ শ' টাকা কামায়, জমিনের রোজগারে হাত পড়ে না– হ্যার সম্পত্তি না বাইড়া উপায় আছে ? আর কফিলদ্দিন হালার চার চারখান মাইয়া বিয়া দিতে দিতেই জান শ্যাষ– বিয়া লাগলেই ব্যাচো জমি আর কুনো কথা নাই। একটা পোলা, তো হেই পোলাও বাদাইম্যা, কই কই থাহে–

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

কই কই ঘুরেঘারে কেউ কইতে পারে না। হোনা যায়, ব্যাটা ফেনসিডিল খাওন ধরছে– তা হলেই বোজেন– কফিলদ্দিন ক্যাম্নে জমি রাখবো– কিন্তু ওই জমি কে কিনবো– বোজেন, কে কিনবো ?

যেন ধাঁধা জিজ্ঞেস করে মুনশি। আর ওই ধাঁধার জবাবের মধ্যেই ফের বুঝিয়ে দিতে চায় শুধু জমির ওপর নির্ভর করে গ্রামের মানুষ সচ্ছল হতে পারছে না।

হাঁটতে হাঁটতে দু'জনে খানিক এগোলে বাগানের পাশে উঁচু জমির ঢালে বেশ খোলামেলা জায়গা দেখায় মুনশি। বলে, স্যার দ্যাহেন জমিখান পছন্দ হয় কি না– এক্কেরে রাস্তার উপ্রে জায়গা, মাটি ফালাইয়া ভিটি বান্ধবেন তারপর শৌখিন একখান বাড়ি বানাইবেন।

কিন্তু জমিটা তো বেজায় নিচু, মাটি পাওয়া যাবে কোথায় ?

কী যে কন স্যার, মুনশি রায়হানের কথায় খানিক বিরক্ত হয়। বলে, জায়গা জমিন লইয়া নাড়াচাড়া করেন না, তাই বুঝতে পারেন না– আরে বসতবাড়ির জায়গা জমিন কি উঁচা থাকে ? উঁচা থাকে টিলা ট্যাঙর– বসতের জায়গা উঁচা কইরা লইতে হয়। ভিটির পিছে গাতা খুদাইবেন একখান বড় কইরা– ওই গাতার মাটি ভিটিতে দিবেন– ব্যস বাড়ির ভিটি উঁচা হইলো ফের পুষ্কর্নিও হইলো– এক যার্তায় দুই লাভ– তেলাপিয়া মাছের চাষ করলে সংসারে কিছু আয়ও বাড়বো– হাঁসও পালতে পারবেন– গৈ গেরামে বসবাসের ওই তো মজা– মাছ, ডিম, দুধ, সবজি সব ফেরেশ খাইবেন– এক্কেবারে বাড়ির জিনিস।

রায়হান উৎসাহবোধ করে না– তবু হাসে। বলে, আপনাকে তো আমি প্রথমেই বলেছি এমন জমি দেখাবেন, যেখানে সরাসরি ঘর তোলা যায়– মাটি কেটে ভিটা উঁচু করতে গেলে তো বহুত ঝামেলা।

মুনশির উৎসাহ নিভে যায়। কপালে চিন্তার রেখা দেখা যায়। বলে, কথাটা ঠিকই কইছেন স্যার– আপনার যে দেখা শোনা করার লোক নাই সেইটা আমার খেয়াল আছিলো না– আর কনটাকদার দিয়া কাম করাইলে তো সর্বনাশ, পাঁচ হাজার টাকার কামে দশ হাজার লাগাইবো। যাক, বাদ দ্যান।

মাথা ঝাঁকিয়ে সামনের দিকে পা বাড়ায় অবশ্যি মুনশি, কিন্তু হাঁটতে হাঁটতে কয়েকবারই পেছনে তাকায়, আর বলে, জায়গাখান কিন্তু মন্দ আছিলো না স্যার, আর দলিলপত্রও পরিষ্কার, দামও কম, টাকা থাকলে কিন্যা রাখতে পারতেন– পরে কামে লাগতো।

রায়হান ওই কথার পর দাঁড়িয়ে যায়। বলে, আপনি তাহলে কিনতে বলছেন ? বেশ চলুন, কথাবার্তা বলতে যাই।

তখন আর রাজি হয় না মুনশি। বলে, না স্যার থাউক গিয়া, আপনের পোলারা কতো ভালো, ল্যাহাপড়া করে– এমুন মাটি খুইদা বাড়ি বানাইতে বহুত টাইম লাগবো। মায়েরে লইয়া আইতে হইবো তাগো, ঘন ঘন আইলে পড়ার ক্ষতি– নাহ্ বাদ দ্যান, জায়গার কি অভাব আছে ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

মুনশি ঘুরে দাঁড়ায়। বলে, এইবার স্যার ফিরত যার্তা।

তার গলার স্বরে সুন্দর কৌতুক ফোটে। বলে, যেইখান থিকা যার্তা শুরু শ্যাষও সেইখানে– বাস ইস্টিশনের বগলে, জমির মালিক, জমি সব একলগে দ্যাখবেন।

রায়হান অবাক হয়, তাহলে ওই জমি আগে দেখালেন না কেন?

মুনশি হাসে। বলে, ঘটনা তো স্যার একই, ওই জমি পরথমে দ্যাহাইলে কি পছন্দ করতেন? করতেন না, কইতেন আরও জমি দ্যাখাও– এ্যতো কষ্ট কইরা যহন এ্যতোদূর অইছেন, চারো দিক দেইখ্যা-হুইন্যা লওয়া কি ভালো না, আপনেই কন?

মাথার ঠিক ওপরে সূর্য, নিজেদের ছায়া বেঁটে মতো দেখতে লাগে। কব্জি ঘুরিয়ে ঘড়ির দিকে নজর রাখে রায়হান। বেলা একটা, তার মানে তিন তিনটা ঘণ্টা তাদের ঘুরতে ঘুরতে কেটেছে। মুনশির দিকে তাকিয়ে সে জিজ্ঞেস করে, মুনশি জমি খুঁজতে কতোদিন লাগে?

মুনশি হাসে। বলে, স্যার, এই কয়দিনেই হয়রান হইয়া পড়লেন? আমির হোসেন পরফেসররে আমি দুই বচ্ছর জমি দ্যাহাইছি– হাঁ, পুরা দুই বচ্ছর।

রায়হানও মুনশির কথায় হাসে। বলে, তাহলে এ জীবনে আমার জমি কেনা হবে না।

ক্যান? মুনশি বোধহয় ঠাট্টাটা বুঝতে পারে না। বলে, ক্যান জমি কিনা হইবো না?

আরে আমি কি দু'বছর বাঁচবো? শোনেন নি, আমার হার্টের অসুখ?

মুনশি কথাটা শুনে দাঁড়িয়ে পড়ে। খবরটা সে কার কাছে পেয়েছিলো সেটা বোধহয় স্মরণ করে। তারপর মাথা নাড়িয়ে বলে, না স্যার আপনের জমি কিনতে দেরি হইবো না– অহনই দ্যাখবেন, আব্বাস মিয়ার জমি আপনের ঠিক পছন্দ হইবো– নতুন বসত সবই তো ওই দিক। ওই দিক কুনো হিন্দু বাড়ি নাই– মসজিদটাও বগলে পাইবেন।

রায়হান হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করে, কবরস্থান কাছে তো? আর বিয়ে পড়ানোর কাজী অফিস? বলছেন যখন সব খবরই নিয়ে রাখি।

জায়গায় পৌঁছতে ঠিক পনেরো মিনিট লাগলো। বাসস্ট্যাণ্ড, ৬/৭ জন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে– তা স্পষ্ট দেখা গেলো। আলপথ ধরে খানিক এগোবার পর গাছপালার আড়াল পার হতেই কয়েক ঘর বসত চোখে পড়লো। রায়হানের অবাক লাগে, বাস থেকে নেমে এই একই পথে গেছে অথচ এই বাড়িঘরগুলো তখন চোখে পড়ে নি। পথের ধারে একটা শিমুল গাছ দেখে তার খুব ভালো লেগে যায়। লক্ষ্য করে বাড়িগুলোর চারদিকে আনাচে কানাচে নানান ধরনের গাছগাছালি– আম, কাঁঠাল, জাম, লিচু এসব তো আছেই– আরও আছে গাব, কামরাঙা, কুল, আমড়া, করমচা, কাগজি লেবু– এই সব নানান ফলফলাদির গাছ। বাড়িগুলোর বাইরের উঠোন দিব্যি নজরে পড়ে– দরজা জানালার পর্দা বাতাসে উড়তে দেখা যায়। এক বাড়ির দাওয়ায় দেখা গেলো দু'জন বুড়ো মানুষ খুব জমিয়ে গল্প করছেন, ওদিকে একটি অল্প বয়সী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বাচ্চা কাপড় উঠোনে মেলে দিয়ে গেলো। আমগাছের ছায়ায় একটা গরু ঝিমুতে ঝিমুতে জাবর কাটছে। একটা ছাগল অলসভঙ্গিতে হেঁটে হেঁটে ঝরে পড়া আম কাঁঠালের পাতা খেয়ে বেড়াচ্ছে– এই ধরনের শান্ত-স্নিগ্ধ দৃশ্য রায়হানের মনকে অন্যরকম করে দেয়। নিজেকে তার ওই মুহূর্তে ক্লান্ত লাগে– কোথাও একটু বসতে ইচ্ছে করে। বলে, মুনশি, কোথাও একটু বসলে হতো না ?

মুনশি মুখ ঘুরিয়ে তাকায় সঙ্গীর দিকে। তারপর বলে, একটু আউগাই স্যার, বাস ইস্টিশনের লগেই চায়ের দোকান আছে।

কেন, জমির মালিকের বাড়িতে বসা যাবে না ?

যাইবো, ক্যান যাইবো না। আব্বাস আলীর চৌদ্দগুষ্টি ধইন্য হইয়া যাইবো আপনে মেজবান হইলে।

আসলেই বেশিক্ষণ হাঁটতে হলো না। টিনের ছাপড়াঅলা এক বাড়ির বাইরের উঠোনে দাঁড়িয়ে মুনশি– আব্বাস, বাড়িতে আছো, ও আব্বাস মিয়া বলে ডাকাডাকি জুড়ে দেয়। সাড়া না পেয়ে বলে, মানুষটা স্যার এমুন আইলসা যে কওয়া যায় না, এক জায়গায় বইলো তো বইয়াই রইলো– উঠাউঠির নাম নাই– হ্যারে মাইনষে গাব গাছ কইয়াও ডাকে।

আব্বাস, ও আব্বাস মিয়া।

বেশ কয়েক মিনিট ডাকাডাকি হলেও ভেতর থেকে কোনো সাড়া শব্দ পাওয়া যায় না। বরং উল্টো দিকের রাস্তা থেকে একটি অল্পবয়সী মেয়ে বাড়িতে ঢুকতে ঢুকতে বিরক্ত হয়ে বলে, আপনে ক্যাডা ? চিল্লান ক্যা ?

আব্বাস নাই ? মুনশি জিজ্ঞেস করে।

না, নাই। বিয়ান বেলা সাভার গেছে।

আইবো না ?

মেয়েটি দু'পা এগিয়ে মুনশির মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, আপনে ক্যাডা ? কইত্থে আইছেন ?

আমারে তুমি চিনবা না, মুনশি গম্ভীর হয়ে বলে, ভিত্তরে গিয়া কও যে বাহার মুনশি আইছে, আব্বাস মিয়ারে দরকার।

মেয়েটি অন্দরের দরজা পর্যন্ত যায়– কিন্তু ভিতরে ঢোকে না, ওই দরজা থেকেই ভিতরের দিকে গলা বাড়িয়ে চিৎকার করে। বলে, অ দাদী, দাদী-ঈ। বাহারের এক বুড়া মুনশি আইছে গো– দেইখ্যা যাও, কইতাছে দাদার লগে দরকারি কাম আছে– লগে একজন মানুষ আছে, হ্যাও বুড়া।

রায়হানের বেশ মজা লাগে মেয়েটিকে দেখে। গাছ কোমর বেঁধে পরা রঙিন ছাপা শাড়ি, মাথার চুলে বিনুনি, চোখেমুখে ধারাল ভাব– ঠোঁটের কোণে, চিবুকে, ভুরুতে একই সঙ্গে রাগ-বিরক্তি-কৌতুক মেশামেশি হয়ে আছে।

ভেতর থেকে ঐ মুহূর্তে কেউ বোধহয় কিছু বলে। আর তা শুনে মেয়েটি জানায়। আপনেরা পরে আইয়েন– দাদার আইতে দেরি আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

রায়হানের ছেলেমানুষি করতে ইচ্ছে করে। বলে, একটু জেনে এসো, কখন আসলে পাওয়া যাবে।

অ মা, কী কয় গো! ক্যান হোনেন নাই আমার কথা ? বয়রা নি আপনে ?

চোখ গোল গোল করে মেয়েটি এমনভাবে তাকায় যে রায়হানের হাসি চেপে রাখা দায় হয়ে ওঠে। যখন ফের জিজ্ঞেস করে, ক্যান আপনে কানে হোনেন না ? তখন সে সত্যি সত্যি হেসে ওঠে।

অ মা! হাসে ক্যা মানুষডা ? একই ভঙ্গিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে যখন মেয়েটি বলে, সত্য সত্যই পাগল নি আপনে, হাসেন ক্যা ? হাসার কী হইছে ?

রায়হান বেশ শব্দ করে হেসে ওঠে ওই কথায়। হাসতে হাসতেই বলে, হ্যাঁ আমি পাগল– আমার মতো পাগল আগে দেখেছো ?

মেয়েটি একটুও ঘাবড়ায় না। তার কাছে আগন্তুক দু'জন ততক্ষণে বিস্ময়ের বস্তু। একই ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকে সে কিছুক্ষণ, তারপর ভেতরের দিকে লক্ষ্য করে বলে, অ দাদী, দাদী গো– তুমি বাইরাও, পাগলের লাহান হাসে, ফের সুদ্ধ কথা কয়– মনে হয় ঢাকাথে আইছে।

জবাবে ভেতর থেকে কী যেন বলা হয়, আর তাতে মেয়েটি জানতে চায়, আপনেরা ক্যান আইছেন ? কী চান ?

মুনশির বিরক্তি লাগে বোধ হয়। বলে, চলেন স্যার, যাইগা– পাগল ছেমড়ির লগে কথা কইয়া লাভ নাই–

কী-ঈ, আমারে পাগল কইলেন, এতো বড় সাহস! মেয়েটি দু'পা এগিয়ে আসে। রায়হানের হাসি পেলেও কেমন আশঙ্কা হয়, বলা যায় না পাগলি মেয়ে, কোন কেলেঙ্কারি করে বসে। সেও দু'পা এগিয়ে যায়। তারপর শান্ত গলায় বলে, না মা, তুমি পাগল কেন হবে। তুমি লক্ষ্মী মেয়ে– নাম কী তোমার ?

ওই কথা শুনে মেয়েটি খানিক অপ্রস্তুত বোধ করে। ঐ মুহূর্তে ..াথা নিচু করলে তার মুখে লাজুক একটা ভঙ্গি ফোটে এবং কি আশ্চর্য কাণ্ড, গলার স্বরটাও যায় নরম হয়ে। সে শান্ত গলায় বলে, আমার নাম নাসিমন্নেছা।

বাড়ি কোথায় ? এটাই তোমাদের বাড়ি ?

জ্বে না, মাথা নাড়িয়ে পেছনের দিকে হাত তুলে দেখায়। বলে, আমাগো বাড়ি ওইটা।

স্যার চলেন, দেরি হইতাছে, ঐ সময় মুনশি হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে পড়ে। বলে, আব্বাস মিয়ার লগে পরে কথা হইবো– আপনে জায়গা দ্যাহেন আগে– তেমুন বুঝলে অরে আপনের বাসায় নিয়া যামু।

মেয়েটি এ সময় জানতে চায়, দাদায় আইলে কী কমু ?

না, কিচ্ছু কওয়া লাগবো না, মুনশি জবাব দিয়ে রাস্তার দিকে পা বাড়ায়।

অগত্যা ফের রাস্তা। রায়হান বলে, মুনশি, আজ দেখছি আমার কপালটাই খারাপ, যেখানেই যাচ্ছি, কাজ হচ্ছে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

না স্যার, কী কন, মুনশি হাসে। বলে, বাড়িঘর করা কী দু'একদিনের কাম। কুনো না কুনো জায়গায় দেরি হইবোই।

কয়েক পা হাঁটতেই রাস্তার ধারে একটা কদম গাছ দেখতে পায়। কদমফুলের মিষ্টি গন্ধ ঘ্রাণ এসে লাগলে রায়হান দাঁড়িয়ে পড়ে। কেমন মনে হয়, ছেলেবেলার মোহনগঞ্জে সে এসে পড়েছে– নাকি দিনাজপুরের বালুবাড়ি? ভেজাভেজা গাছ তলায় রোদের ভাপ এবং কদমফুলের গন্ধ এক সঙ্গে বাতাসে ভাসছে। গাছতলায় দাঁড়ালে পাশের ঢালু মতো জমিটা দেখিয়ে মুনশি বলে, পুবের ওই উঁচা দিকটা কুতুবউদ্দিনের, আর এই নিচের দিকটা আব্বাস মিয়ার– আপনে স্যার দেইকা লন– পুরা ৫ কাঠার প্লট– দামও বেশি চায় না।

রায়হান উঁচু দিকটায় নজর রেখে বলে, ওদিকের জমি, বিক্রি হবে না?

মুনশি মাথা নাড়ায়। বলে, ওই জমি বায়না হইয়া রইছে। কে জানে, হয়তো বেচাবিক্রিও শ্যাষ। এই দিক, মানে রাস্তার দিক জমি লইলে স্যার জমি এট্টু নিচাই হইবো, ভালো কইরা বুইজা দ্যাহেন স্যার।

এদিকে না হোক, বাসস্ট্যান্ডের কাছে হতেই হবে, এমন কথা নেই। তবে রাস্তার ধারে হলে ভালো– রায়হান বলতে বলতে সামনের দিকে এগোয়। শেষে বলে, আজ বরং থাক মুনশি, দেরি হয়ে যাচ্ছে– পরে একদিন আসা যাবে।

মুনশি ঐ কথায় দাঁড়িয়ে যায়। বলে, পরে আর কবে আইবেন– আইজ আইছেন, দেইখ্যা শুইন্যা যান– চলেন না দেহি– কুতুবউদ্দিন কী কয়– ওই জমির বায়নার শ্যাষ তারিখ তো পার হইছে কবে! জিগাইয়া দেহি শ্যাষ পর্যন্ত রেজষ্টি হইছে কি না– হ্যার বাড়ি বেশি দূর না– ওই শিমুল গাছটার লগে।

ডাকাডাকি করতে হয় বেশ কিছুক্ষণ– কারণ মানুষটা খেতে বসেছিলো। ভেতরে থেকে বেরুলো একেবারে শহরে যাবার পোশাকে। মাথায় কাচাপাকা চুল তেল দিয়ে পরিপাটি করে আঁচড়ানো, পরনে পায়জামা আর হালকা সবুজ রঙের পাঞ্জাবি, পায়ে প্লাস্টিকের জুতো, ঘাড়ে একটা ব্যাগ ঝোলানো। মুখোমুখি হয়ে বললো, বাইসাব, আমি ম্যালা করছি, ঢাকা যামু।

ঠিক আছে, যান– আমরাও যাইতাছি, কিন্তু আপনের জমিখান রেজষ্টির কী হইল শ্যাষ পর্যন্ত, হেইডা তো কন নাই।

জমিখানের অবস্থা একই রকম। কুতুবউদ্দিন চিন্তিত মুখে বলে, ওই বায়নাই হইয়া রইছে। কথা ছিলো তিন মাসের মইদ্যে রেজষ্টি করবে, কিন্তু সাবে ব্যারামে পড়লো– পক্ষাঘাতের অসুখে ডাইন দিক পইড়া গেছে। কিছু কইতেও পারি না, তাগাদা দিলে বিবিসাবে খালি কইতো, টাকা জোগাড় পরায় হইয়া গেছে। এক হপ্তা বাদ আহেন, অহন কয় ট্যাকা জোগাড় হয় নাই, পারলে বায়নার ট্যাকা ফিরত দ্যাও। আমি অহন ট্যাকা কই পামু কন দেহি, মাইয়ার বিয়া গেলো, ট্যাকা পয়সা কি থাকে? এই দিক আবার জামাইরেও দুবাই যাওনের খরচ দিতে হইবো।

কুতুবউদ্দিনের দীর্ঘ বয়ান শেষ হলে মুনশি বলে, তাইলে কন, জমিখান রেজষ্টি অহনও হয় নাই।

মুনশির কথায় কুতুবউদ্দিন একটু যেন থমকায়। তারপর কেমন যেন গা ঝাড়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

দিয়ে ওঠে মানুষটা। বলে, লেনদেন না হইলে ব্যাচা বিক্রি আর ক্যামনে হয় কন ? আইজ যাইতাছি, এক্কেরে সিধা কথা কমু, হ্যারা জমি রেজষ্টি করলে করবো, নাইলে আমি অন্য কেউরে জমি বেইচ্যা দিমু।

রায়হানের নজর লোকটার চোখমুখ থেকে সরে না। লক্ষ্য করে, তার কথায় আর তাকাবার ভঙ্গিতে, অদ্ভুত এক ধরনের বিষাদ এবং বিপন্নতা মেশামেশি হয়ে আছে। মনে হচ্ছে, লোকটা বোধহয় বেশি রকম বুড়ো। তার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একসময় এও মনে হয়, লোকটা কি তার চেনা ? মোহনগঞ্জের আকালু শেখ-এর চেহারা কি এমনই ছিলো না ? এমনই থুতনিতে সামান্য দাড়ি ছিলো তার। একটু ঝুঁকে ঝুঁকে হাঁটতো। সামান্য কিছু এদিক ওদিক হলেই ঘাবড়ে যেতো– মানু মিস্তির তার এক বিঘা জমির বায়না নামা রেজিস্ট্রি করে তার জমিটা আটকে রেখেছিলো, তার স্পষ্ট মনে পড়ে, কুতুবউদ্দিনের চেহারা হুবহু আকালু শেখ-এরই মতো।

মুনশির সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে কুতুবউদ্দিন রাস্তা পর্যন্ত চলে যায় কিন্তু তাদের কথায় ছেদ পড়ে না– কিসের যেন দরদাম করে তারা। রায়হানের কানে আসে তাদের আলাপের খানিকটা, তবে খানিকটা আবার আসেও না।

বড় রাস্তায় পৌছানোর পরও একই আলাপ চলতে থাকে। কুতুবউদ্দিনের মুখ দিয়ে বলা চল্লিশ সংখ্যাটির জবাবে মুনশি কতো বলে, তা রায়হান বুঝতে পারে না– তবে তার কথার স্বরে খানিক যে ধমকের ভাব থাকে, সেটা সে দিব্যি বুঝতে পারে। মুনশি বলে, দূর মিয়া, যে দামে বায়না হইছে তার বেশি ক্যামনে চাও ? এইডা কুন দেশি বিচার এ্যাঁ ? মগের মুল্লুক নাকি ?

ওদিকে বাস হর্ন দিচ্ছিলো। কুতুবউদ্দিন কথা শেষ না করেই তড়বড় করে দৌড়াতে দৌড়াতে গিয়ে বাসে উঠলো। শেষ পর্যন্ত ফয়সালাটা কী হলো, সেটা রায়হান আন্দাজ করতে পারে না। তবে তার অনুমান, দরদামে বোধহয় বনে নি। তবু যেটুকু কানে এসেছে সেটুকু দিয়েই সে হিসাব করে। চল্লিশ হাজার টাকা হলে তিন কাঠা জমিতে লেগে যাবে প্রায় সওয়া লাখ টাকা। অসম্ভব ? রায়হান জমি কেনার চিন্তাটাকে মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলতে চায়।

বাসস্ট্যান্ড-এ পৌছে মুনশি জিজ্ঞেস করে, বুইজ্যা দ্যাহেন স্যার, ওই উঁচা জমিটা কি রাখবেন ?

নাহ্। রায়হান মাথা নাড়ায়। বলে, অতো টাকা কোথায় পাবো ? বাদ দিন– ওই নন্দীগ্রামের দিকেই যাবো।

আরে কী মুশকিল! মুনশি মুরুব্বির ভঙ্গিতে বলে, ট্যাকার কথা কে জিগাইছে আপনেরে ? আমি কই, ওই উঁচা জমিখান যে দ্যাখলেন, ওই জায়গার জমি কি আপনার পছন্দ হয় ?

পছন্দ হলেই বা কী ? আপনার কি মাথা খারাপ ? সওয়া লাখ-দেড় লাখ টাকা দিয়ে আমি জমি কিনবো ?

মুনশি বোধহয় বিরক্ত হয়। বলে, আমি কই কী, আর আপনে হোনেন কী, আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

জিগাই ওই জমি কি সত্যই আপনের পছন্দ হইছে ?

বললাম তো, রায়হান বিরক্ত হয়ে বলে, আপনার ইয়ার্কি মশকরা আমার ভালো লাগছে না।

ঠিক আছে, মুনশি বলে, ভালো না লাগলে, না লাগলো– জমিখান তো পছন্দ হইছে– এইবার কন, আপনে কত দিতে পারবেন ?

কতো আর পারবো, রায়হান জানায়, ধরুন হাজার পঞ্চাশেক।

মুনশি হাসে। বলে, মশকারি ক্যান করেন স্যার, সত্য সত্য কন, তারপর দেহি কী করা যায়।

রায়হান চিন্তায় পড়ে যায় এবং হিসাবও করে মনে মনে। সাহাবউদ্দিন হুণ্ডি করে পাঠিয়েছে মাত্রই ত্রিশ হাজার, তার নিজের কাছে আছে হাজার ত্রিশেক। হাজার ত্রিশেক তোলা যাবে প্রভিডেন্ট ফাণ্ড থেকে– ব্যস এই তো মোট হিসেব। চাইলে অবশ্য বীথি তার গয়নাগুলো এগিয়ে দেবে কিংবা অফিস থেকেও হয়তো ৬ মাসের এ্যাডভান্স পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু ওসবে সে আপাতত হাত দিতে চায় না। বীথির গয়না তো সে এমনিতেই ছোঁবে না। কারণ এক রতি সোনাও সে এখন পর্যন্ত দেয়নি বউকে। আর এ্যাডভান্সের টাকাটা সে কাজে লাগাতে চায় বাড়ি বানাবার সময়। সুতরাং জমি কেনার জন্যে ৭০/৮০ হাজারের বেশি সে বের করতে পারবে না।

মুনশি কী বোঝে সেই জানে! বলে, স্যার বেশি চিন্তা কইরা লাভ নাই, জায়গা জমিনের দাম কেরমেই বাড়তাছে– ইরাকে যুদ্ধ লাগছে দেইখ্যাই না দাম অহনও কিছু কম। কিন্তু সামনের বছর আইতে না আইতে দ্যাখবেন জমির দাম কই উঠে– হ্যার লাইগা কই, পারলে কষ্টমষ্ট কইরা জমিখান কিন্যা থোন। অন্য জমি হইলে কইতাম না। কুতুবউদ্দিন সৎ মানুষ, কাগজে-পত্রে কুনো ভ্যাজাল নাই।

কিন্তু অতো দাম কেমন করে দেবো, অত টাকা পাবো কোথায় ?

আপনে শ্যাষ পর্যন্ত কত দিতে পারবেন, সেইটা তো কইলেন না।

কতো আর পারবো ? রায়হান মনে মনে হিসেব করে বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে ধার পাবার সম্ভাবনা জুড়ে অনুমান করে বলে, কতো আর পারবো ? ধরুন, যা বলেছি তার উপর আরও ২০/২৫ হাজার।

এই তো। মুনশি খুশিতে হেসে ওঠে। বলে ৭০/৭৫ হাজার মানে তো পৌনে এক লাখ তাইলে পুরা লাখের আর বাকি রইলো কী ? আর আমি কইলাম, আপনে জমি কিনতে পারবেন– হ্যাঁ ওই জমিই, এইবার টাকা রেডি করেন ?

মুনশি কুতুবউদ্দিনের সঙ্গে কথা বলতে বলতে হিসেবটা করলো, না কি আগে থেকেই করা ছিলো রায়হান ঠিক ধরতে পারে না। তবে হিসেবটা যখন বাসস্ট্যান্ড-এ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে বোঝায়, তখন রায়হান মনোযোগ না দিয়ে পারে না। পুরো দশ কাঠা জমির দাম যদি হয় আড়াই লাখ আর তার মধ্যে বায়না দেওয়া যদি থাকে পঞ্চাশ হাজার, তাহলে বাকি থাকে কতো ? দু'লাখ তো ? ওই দু'লাখের এক লাখ যদি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

খদ্দেরের যোগাড় হয়ে থাকে। তাহলে বাকি এক লাখ সহজেই যোগাড় হতে পারে ৪ কাঠা জমি বিক্রি করে দিলে। কুতুবউদ্দিনই ব্যাপারটা ফয়সালা করতে পারে খদ্দেরের সঙ্গে কথাবার্তা বলে– যদি না পারে, তাহলে মুনশি তো রয়েছেই।

হিসেবটা দুর্বোধ্য কিছু নয় এবং টাকার অঙ্কটাও এখন তার কাছে অসম্ভব কিছু মনে হচ্ছে না। মুনশির মতো তারও মনে হচ্ছে, ৭০/৭৫ হাজার যদি যোগাড় হয়, তাহলে এক লাখও যোগাড় করা সম্ভব হবে।

টাকার ব্যাপারটা তার সমস্যা মনে হয় না। তবে একজনের বায়না করা জমির মধ্যে ভাগ বসাতে যাওয়া, যাদের সঙ্গে ভাগাভাগি করে জমিটা কেনা হবে, তারা কেমন মানুষ, জমির সীমানা ঠিক করার সময় ঝামেলা হবে কি না– এসব তার মগজের ভেতরে কুটকুট করে কামড়াতে শুরু করে। সে লম্বা নিঃশ্বাস নিয়ে মুনশিকে ডেকে বলে, মুনশি, আপনি কেন ঝামেলার মধ্যে আমাকে ঢোকাতে চান?

মুনশি জবাবে বিরক্তি গোপন করে না। বলে, স্যার, আপনে ক্যান যে এমুন ডরান, বুজি না! জমিজমার ব্যাচাকিনি ঝামেলা ছাড়া হয়? কুনোসময় দ্যাখছেন?

আচ্ছা আপনি কাগজপত্র দেখেছেন? রায়হান মুনশির চোখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে।

না দেহি নাই, মুনশিও চোখে চোখ রেখে জবাব দেয়। বলে, আপনে চিন্তা কইরা দ্যাহেন, কাগজে কুনো দোষ থাকতে পারে না, যারা বায়না দিছে, তারা কি কাগজপত্র না দেইকাই বায়নানামার দলিল করছে?

একটু থেমে ফের বলে মুনশি, সার ওইসব চিন্তা বাদ দিয়া থোন, আমি কই কুতুবউদ্দিনের ওই জায়গাখানই আপনার লাইগা ভালা হইবো– কেমুন উঁচা জায়গা, মাটি ফালাইবার দরকার নাই। ৪ কাঠার মধ্যেই ২ কাঠার উপ্রে ৪ কামড়ার ভিত দিয়া ঘর উঠাইবেন। আর বাকি ২ কাঠা ফাঁকা থাকবো ফুলবাগান সবজিবাগান হইবো– খালি রেজষ্ট্রিটা হোক, তারপর দ্যাখবেন কুন দিক দিয়া বাড়ি কইরা ফালাইবেন ট্যারও পাইবেন না।

রায়হান জমিখানার দিকে ঘুরে তাকায়– বেশ দূর বাসস্ট্যাণ্ড থেকে, কিন্তু স্পষ্ট দেখা যায়। ঘোষেদের আমবাগানের পাঁচিল দেখতে পাচ্ছে, পাশের পুকুরের পাড়টাও চোখে পড়ে। পাশ ঘেঁষে আলের ওপরকার জিগা গাছগুলো সবুজপাতায় ছাওয়া। ওই জায়গাতে একটা বাড়ি উঠবে। কেমন হবে বাড়িটা? টিনের চৌচালা পাকা দেয়াল, নাকি পাকা ছাদের একতলা? উঠোন থাকবে কি গ্রামের বাড়ির মতো? নাকি শহরের মতো বাড়ি হবে এক দালানের মধ্যেই, ড্রয়িং ডাইনিং বেড বাথ বারান্দা দিয়ে মেলানো। আর থাকবে বাইরে লন, যেখানে গোলাপ আর রজনীগন্ধা ফুটে থাকবে– নাকি শখ করে লাগানো হবে চাঁপা আর শিউলী– বীথির তো চাঁপার গন্ধ খুব ভালো লাগে। নাকি ফুল গাছ বলতে কিছুই থাকবে না, লনের জায়গায় সবজি চাষ হবে।

বাড়িটা সে কল্পনায় দেখে, একেবারে মন্দ লাগে না, তবে নিজেকে সে ওই বাড়িতে দেখতে পায় না। শুধু নিজেকে নয়, বীথিকেও দেখতে পায় না। ওই বাড়িতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

রঞ্জু মঞ্জু টুকু আছে বলে তার মনে হয় না। বরং হঠাৎ দেখে, একটি চঞ্চল কিশোর বাড়ির ভেতর থেকে ছুটে বাইরে বের হলো। কে ছেলেটি ? টুকু ? নাহ্ টুকু কেমন করে হয় ? সে কি অতো ছোট ? তাহলে কে ? কল্পনায় সে কাকে দেখছে ? পরের প্রজন্মের কাউকে ? হাফ শার্ট হাফ প্যান্ট পরনে কেডস পায়ে শ্যামলা রঙের ছেলেটি কে ? কে ছুটে বাইরে বেরিয়ে এসেছে ? মঞ্জুর ছেলে, নাকি রঞ্জুর ?

মেনে নিতে কষ্ট হয় রায়হানের, তবু সে উপায়ান্তর দেখে না– অতীতের ওপর যেমন তার হাত ছিলো না, তেমনই হাত নেই তার ভবিষ্যতের ওপরেও। তবু উপায় কি ? সে রাজি হয়ে যায়। বলে, মুনশি, ঠিক আছে, আপনি কাগজপত্র দেখাতে বলুন কুতুবউদ্দিনকে। আমি টাকার ব্যবস্থা করি।

তিন

মাহফুজকে সন্ধ্যার আগে পাওয়া যায় না। তাই রায়হান সন্ধ্যা পার করে রওনা হলো তার চেম্বারের দিকে। কিন্তু তবু দেখা গেলো, তখনও মাহফুজ চেম্বারে পৌছায় নি। তার দুই জুনিয়রের একজন বললো, স্যার বোধহয় পার্টি মিটিং শেষ করে তারপর চেম্বারে আসবেন।

রাজনীতি করে মাহফুজ সেটা জানা ছিলো, কিন্তু সেটা যে এমন জড়ানো বাঁধানো ব্যাপার হয়ে পড়েছে, সেটা তার জানা ছিলো না। তাই সে বললো, ফিরতে কি খুব দেরি হবে ?

বলা মুশকিল, তরুণতর উকিলটি চিন্তিত মুখে বলে।

তাহলে কি আগামীকাল আসবো ?

তরুণ উকিলটি এবার হেসে ফেলে। বলে, কালও তো একই অবস্থা হতে পারে। আপনি বরং টেলিফোন করে আসুন।

রায়হান পাল্টা হাসে। বলে, আপনাদের সব ক্লায়েন্টদের কি টেলিফোন আছে ? তাছাড়া দুপুরেও কি চেম্বারে থাকেন আপনাদের সিনিয়র ?

বাহ্ তখন চেম্বারে কেন থাকবেন! একজন গলা উঁচিয়ে বলে, দুপুরে তো তিনি কোর্টে থাকেন।

তাহলে ?

রায়হানের অমন নাছোড় প্রশ্ন শুনে মাহফুজের তরুণ সহকারী দু'টি বেশ বিরক্ত হয়। বলে, অতো কথার কী দরকার ? আপনার কাজ থাকলে আবার আসতে হবে আপনাকে, পরজটা কার ?

কাল কি ওঁর পার্টি মিটিং থাকবে না ?

রায়হানের প্রশ্ন শুনে দুই জুনিয়রই ভ্রূ কুঁচকে তাকায়। তারপর একজন বলে, বললাম তো ভাই, ঠিক করে বলা মুশকিল, আজকাল প্রায়ই পার্টি মিটিং থাকে।

অমন কথার পর বসে থাকা অর্থহীন। অগত্যা উঠতে হয়। উঠে দরজার কাছে পৌছেছে, ওই মুহূর্তে মাহফুজ চেম্বারে ঢোকে। পুরনো বন্ধুর সঙ্গে বহুকাল পরে দেখা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

হওয়ায় দু'জনে মিলে খুব একচোট জড়াজড়ি, জাপটা জাপটি করে গলাগলি আর বুক মেলানো হয়। তারপর সাধারণ কুশলাদি বিনিময় শেষ হলে রায়হান হাতের কাগজপত্রগুলো এগিয়ে ধরে। বলে, সামান্য একটুখানি জমি কিনতে যাচ্ছি, কাগজপত্রগুলো যদি একটু দেখে দাও, তো বড় ভালো হয়।

মাহফুজ যান্ত্রিক ভঙ্গিতে বাড়িয়ে ধরা কাগজপত্র হাতে নিয়ে টেবিলের ডান দিকে রাখে। তারপর বলে, কী খাবে, ঠাণ্ডা না গরম ?

রায়হানের বেশ সঙ্কোচ হয়। বলে, নাহ্ ওসবের কী দরকার ? আমি তো চা খেয়েই বেরিয়েছি ?

তার মানে ? বাসা থেকে ? আজ নাইট ডিউটি ?

না, তা নয়, অফিস থেকে তোমার এখানে– রায়হানের কথা শেষ হওয়ার আগেই মাহফুজ জুনিয়রদের দিকে তাকিয়ে বলে, এই যে কামাল, মনির, তুমিও শোনো, এঁকে চেনো ?

তরুণ দু'টি রায়হানকে দেখতে দেখতে চিনতে চেষ্টা করে। কিন্তু পারে না, শেষে মুখে বিব্রত ভাব নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। মাহফুজ তখন পরিচয় দেয়। ইনি হচ্ছেন রায়হান আলী, সাংবাদিক– এঁর লেখা নিশ্চয়ই পড়েছো–

জ্বী, একজন জানায়, 'গণ একতা'য় আছেন– ওঁর বিরুদ্ধে সরকার প্রেস কাউন্সিলে মামলা করেছিলো– 'স্বল্পভাষী' ছদ্মনামে অন্য কাগজেও পলিটিক্যাল বিষয় নিয়ে লেখেন।

বক্তার মুখ উজ্জ্বল দেখালে রায়হান মনে মনে খুশি হয়। সে নিশ্চিত হয় তরুণটি আসলেই তার লেখা পড়েছে।

হ্যাঁ, শোনো, রায়হান আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন– এখনও আমার বন্ধু, ব্যস্ত থাকেন বলেই দেখা সাক্ষাত কম হয়, কিন্তু আমাদের পুরনো সম্পর্ক ঠিকই আছে।

এখন অবশ্যি একটা কাজ নিয়ে এসেছেন– সেটা আমরা পরে দেখছি, তার আগে কিছু মুখে দেয়া দরকার।

জ্বী অবশ্যই–

হাসতে হাসতে দুই তরুণই চেম্বার থেকে বেরিয়ে যায়। ওদের বেরিয়ে যেতে দেখে মাহফুজ বসতে বসতে বলে, এখন এতকাল পরে তুমি জায়গা কিনছো ? তারপর বাড়ি কখন করবে ?

বন্ধুর প্রশ্নের জবাবে রায়হান হাসে। বলে, আগে তাগিদ বোধ করি নি, তাছাড়া, আমার রোজগার কেমন, তা তো তোমার অজানা নয়।

হ্যাঁ, তুমি সেই একই রকম থেকে গেলে– মাহফুজ সামনের দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে বলে, সাংবাদিকদের মধ্যে কতজন আখের গুছিয়ে ফেললো। আর তুমি এতকাল পরে বাড়ি করার জন্য জায়গা কিনতে যাচ্ছো– কেন ডিআইটির প্লট বাগাতে পারো নি ? সিনিয়ার জার্নালিস্টরা তো সবাই আজকাল বাড়ি-গাড়ির মালিক– কি, ঠিক না ?

রায়হান জবাব দেয়ার আগেই সে চেয়ারের পিঠে ফের হেলান দেয় এবং বলে, থাক ওসব, এবার অন্য খবর বলো, পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখাটেখা হয় ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

নাহ্ তেমন আর কোথায় ! রায়হান জানায়। বলে, এমনিই কারুর কারুর সঙ্গে হঠাৎ হঠাৎ দেখা হয়ে যায়– সবাইকেই তো ব্যস্ত থাকতে হয় নিজের নিজের ধান্দায়।

রাজনীতির লোকদের সঙ্গে যোগাযোগ আছে ? মাহফুজ প্রসঙ্গ পাল্টায়।

রায়হান হাসে উত্তর দেয়ার সময়। বলে, নাহ্ রাজনীতি করলে তো যোগাযোগ থাকবে।

কোনো খবরই রাখো না ?

তা যদি বলো তো, হ্যাঁ রাখি, খবরের কাগজে কাজ করি। প্রফেশনাল কারণে কিছু কিছু খবর তো রাখতেই হয়।

মাহফুজ ফের প্রসঙ্গ পাল্টায়। সিগারেটের প্যাকেট টেবিলের ওপর রেখে জিজ্ঞেস করে, ধূমপান করো ?

না।

রায়হানের অমন এক কথার জবাব শুনে হেসে ওঠে মাহফুজ। বলে, এই একটা দিকে তুমি বদলেছো। সেই সময় দেখতাম প্রচুর ধূমপান করতে। কী যেন ব্র্যাণ্ড ছিলো খুব কড়া। বক, বগলা, তাই না ? লাল রঙের লম্বা ঠ্যাংঅলা বকের ছবি থাকতো প্যাকেটের ওপর। হ্যাঁ মনে পড়ছে, সাংবাদিক-লেখকরা ওই সিগ্রেট খুব খেতো– ইংরেজী নাম ছিলো কিং স্টর্ক। অমন সিগ্রেট তুমি একটার পর একটা টানতে। সেই তুমি এখন সিগারেট খাও না। সত্যি কল্পনা করা যায় না। কেন, ধূমপান করো না কেন ? শরীরে কি গোলমাল হয়েছে কোথাও ?

হ্যাঁ, আর কতো, রায়হান জানায়। বলে, পুরনো যন্ত্র অনেকদিন তো চললো। হাক এ সেক্কুরি– চিন্তা করে দেখো।

রায়হানের কথা শুনে মাহফুজ চোখে চোখে তাকিয়ে বলে, তোমার কথা চিন্তা করলে আমার অবিশ্বাস্য মনে হয়। কলেজে পড়ার সময় রাজনীতি ছিলো তোমার ধ্যান-জ্ঞান, মিছিল লীড করতে, বক্তৃতা দিতে। কতবার আণ্ডারগ্রাউন্ডে গেলে, জেল পর্যন্ত খাটলে, বিএ পরীক্ষা তো জেল থেকেই দিয়েছিলে, তাই না ? সেই তুমি এখন বলছো, রাজনীতির সঙ্গে তোমার সম্পর্ক নেই– ভাবা যায় ?

অদ্ভুত কিছু নয়, অদ্ভুত কেন হবে, রায়হান জবাব দেয়। বলে, ধরে নাও এও এক রকমের বদলানো। সবাইকে দিয়ে সব কিছু হয় না। তুমি ল'ইয়ার হবে, এমন কথা কেউ ভাবতে পারতো ? এই যে এখন রাজনীতি করো, এও কি কেউ কখনও কল্পনা করেছিলো ?

রায়হান লম্বা নিঃশ্বাস ছাড়ে একটা। তারপর বলে, যাক ভাই, বাদ দাও ওসব পুরনো কথা। ওসব নিয়ে যত ভাববে, ততই খারাপ লাগবে– হ্যাংওভার অব দ্য পাস্ট ইজ এ ডেঞ্জারাস থিং। আমার কাজটা যদি একটু করে দিতে–

আরে কী মুশকিল! মাহফুজ একটু আহত হয় বোধহয়। বলে, বললাম তো কাজটা করে দেবো। তবে এক্ষুণি করা যাবে কি না বলা যাচ্ছে না। কাল আমরা সবাই ব্যস্ত থাকবো, তুমি পরশু একবার এদিকে আসতে পারবে ? আচ্ছা, ঠিক করে বলো তো, কী দেখতে হবে ? জমিটা কেনা যায় কি-না, এই তো ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

হ্যাঁ, শুধু ওইটুকুই।

মাহফুজ দু'মিনিট উল্টে পাল্টে দেখে কাগজগুলো। তারপর এক জুনিয়রের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে, কামাল এই কাগজপত্রগুলো একটু দেখে দাও তো। অরিজিনাল দলিল, বায়া দলিল, দাখিলা, পরচা, সবই আছে মনে হচ্ছে। দেখে দিও রাইট আর পজেশনের দিকটা ঠিক আছে কি না।

কামাল আগ্রহভরে কাগজগুলো হাত বাড়িয়ে নিলে মাহফুজ বলে, যদি কিছুক্ষণ বসতে পারো, তাহলে খবরটা আজই জেনে যেতে পারবে। কোনো তাড়া নেই তো?

না, আমার তাড়া নেই, রায়হান জানায়। বলে, তোমার অসুবিধা না হলে, আমার বসতে আপত্তি কেন থাকবে?

তাহলে বসো, চা খাও।

অল্পক্ষণের মধ্যে চা এসে যায়। তার সঙ্গে বিস্কুটও।

তোমার অসুখটা কী? চায়ে চুমুক দিয়ে মাহফুজ জিজ্ঞেস করে।

অসুখ কোথায়? রায়হান হাসে। বলে, বয়সের দোষ বলতে পারো, সবারই হয়, আমারও হয়েছে।

তবু অসুবিধাটা কোথায়? মাহফুজ জানার জন্যে রীতিমতো জেদ করে। বলে, একটা অসুবিধা নিশ্চয়ই কোথাও আছে।

তা আছে, রায়হান স্বীকার করে। বলে, ঐ যে বললাম, সবার বেলাতে যা হয়, আমারও তাই হয়েছে– হার্টে গোলমাল।

কী বললে? মাহফুজ সোজা হয়ে বসে। জিজ্ঞেস করে, ওটা কি তাহলে এনজিনা পেকটোরিস?

রায়হানের হাসি পায়। বলে, ও রোগের নাম তুমি কার কাছে শুনলে? তোমার চেনাজানা কারও হয়েছে?

না, তা হয় নি, মাহফুজ জানায়। বলে, সেই যে হাসির গল্প পড়েছিলাম রাজশেখর বসুর, তখন থেকে মনে আছে– তোমার কি ওই অসুখ?

রায়হান বলে, তা তো জানি না। এনজিনা বলে বটে, তবে ওটা পেকটোরিস কি না বলতে পারবো না।

তাহলে কি এসকেমিয়া? কার্ডিয়াক এ্যারেস্ট?

রায়হান এবার জোরে হেসে ওঠে। বলে, তুমি ডাক্তারিও প্র্যাকটিস করছো নাকি আজকাল? একটু থেমে ফের বলে, আমার একটা এ্যাটাক হয়ে গেছে, খানিকটা ইনফার্কশনও আবিষ্কার করেছে ডাক্তার।

বন্ধুর কথা শুনে মাহফুজ একটু গম্ভীর হয়। মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলে, এই বয়সে অমন ঝামেলা বাধিয়ে বসলে? কাজটা কিন্তু ঠিক করোনি।

আরে বাদ দাও তো ওসব, রায়হান হালকা গলায় বলে ওঠে। তারপর চায়ে শেষ চুমুকটা দিয়ে বলে, শরীর থাকলে অসুখও থাকবে– তা তোমার শরীর কেমন?

জানি না, মাহফুজ হাসে। বলে, এতো ব্যস্ত থাকি যে ওদিকে খেয়াল রাখার সুযোগ পাওয়া যায় না– মনে হয়, ঠিকই আছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

খানিক পর মাহফুজের কী যেন চিন্তা হয়। মুখের ভাব কেমন বদলে যায়। বলে, রায়হান, একটা কথা জিজ্ঞেস করবো ?

বাহ্ কেন করবে না, কী কথা ?

তেমন কিছু না, যা সবাই ভাবছে, সে সবই আর কি– চারদিকের অবস্থা তো দেখছো, কী মনে হয় তোমার ?

কোন বিষয়ে ?

কেন, দেশের বিষয়ে! তুমি সাংবাদিক মানুষ। তোমাকে আমি অন্য আর কী জিজ্ঞেস করবো ? দেশ স্বাধীন হওয়ার পর দেড় যুগ চলে গেলো– অথচ যেদিকে তাকাই শুধুই ফেইলিওর– বলতে পারো আমাদের ভবিষ্যত কী ?

রায়হান ডাইনে বাঁয়ে মাথা দোলায়। ও ব্যাপারে আমি স্পষ্ট করে কিছু বলতে পারবো না– শুধু আমি কেন, কেউই বলতে পারবে না। আমার তো ভাই মনে হয়, এদেশের অবস্থা একই রকম রয়ে গেছে– ভবিষ্যতেও তাই থাকবে।

তার মানে ? মাহফুজকে ঈষৎ উত্তেজিত মনে হয়। বলে, এই রকম একটা দমবন্ধ অবস্থা– এই অবস্থা একই রকম থাকবে ? এমন কি থাকে ? নাকি থাকতে পারে ? এ তুমি কী বলছো, এত অন্যায় চারদিকে– মানুষ কতোদিন সহ্য করবে ?

রায়হান বন্ধুর উত্তেজিত মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। আর মনে হয়, মাহফুজ নিশ্চয়ই আজকাল পাবলিক মিটিংয়ে বক্তৃতা করে। সে বলে, হ্যাঁ তোমার কথা ঠিক– মানুষ অবশ্যই মুখ খুলবে, প্রতিবাদও করতে পারে– চাই কি এখনকার শাসকদের ক্ষমতা থেকে ফেলেও দিতে পারে।

তাহলে ? মাহফুজ সাগ্রহে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে। রায়হান তখন বলে, শাসকরা হয়তো বদলে যাবে– একই ক্লাসের একসেট মানুষ চলে গিয়ে আর একসেট মানুষ ক্ষমতায় আসবে– তাতে আমার কী ? আমার অবস্থার তো কোনো হেরফের হবে না– হবে কি ? তুমিই বলো। তোমরা যারা এখন অপোজিশনে আছো, তোমরা কি ক্ষমতায় ছিলে না ? তোমাদের হটিয়ে এলো একদল, তাদের হটিয়ে এলো আর এক দল– কিন্তু আমার অবস্থার তো কোনো পরিবর্তন হয় নি। '৬৯-এর পরে হয় নি, '৭১-এর পরে হয় নি, '৭৫-এর পরে হয় নি, '৮২র পরেও হয় নি– হয়েছে ? বলো।

তুমি কি নিজের কথা বলছো ? মাহফুজ সরাসরি প্রশ্ন করে।

না শুধু নিজের কথা কেন বলবো ? রায়হানও সরাসরি জবাব দেয়। বলে, আমি সবার কথা বলছি– যারাই ক্ষমতায় যায়, তারাই দেশের উন্নয়নের ঢাকঢোল পেটায়– কিন্তু শেষ ফল কী ? গত ১৫ বছরে ভূমিহীনের সংখ্যা বেড়েছে না কমেছে ? বেকারের সংখ্যা ? বস্তির সংখ্যা ? অপরাধের সংখ্যা ? দারিদ্র্য ?

রায়হান খুব শান্ত ঠাণ্ডা গলায় কথাগুলো বলে। বলে বন্ধুর দিকে তাকিয়ে থাকে। তাতে কেমন একটু যেন অপ্রস্তুত হওয়ার ভাব ফোটে মাহফুজের মুখে। তবু সে বলে, তুমি কিন্তু সিনিক্যাল কথা বলছো। হিউজ পপুলেশনের দেশ আমাদের– কত রকমের প্রব্লেম, আমাদের দল ক্ষমতায় মাত্রই তো ছিলো সাড়ে তিন বছর– ওই সময়ের মধ্যে কতো আর করা সম্ভব বলো ? কাজে হাত দিতে না দিতেই ষড়যন্ত্র আর কীলিং শুরু হয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

গেলো– পলিটিক্যাল লিডারশিপের পুরোটাই এলিমিনেট করে ফেললো। তারপর থেকে তো একই ব্যাপার চলছে– সেই উর্দিঅলাদের দাপট– কোনোরকম ইনস্টিটিউশন গড়ে উঠতে পারছে না, সিভিল সোসাইটি বলতে কিছু নেই, এভাবে কি দেশ চলতে পারে ? মানুষ প্রতিবাদের ভাষা পর্যন্ত ভুলে যাচ্ছে– বলো, আমরা কি শেষ পর্যন্ত বোধবুদ্ধিহীন রোবটের মতো হয়ে যাবো ?

মাহফুজের কথা শুনতে শুনতে হাসি পায় রায়হানের। তার বলতে ইচ্ছে করে দুর্ভিক্ষের কথা আর রাজনৈতিক নেতাদের ধনী হওয়ার কথা, বাকশালে যোগ দেয়ানোর জন্যে চাপ তৈরি করার কথা, লুটপাটের কথা, ব্যাংক ডাকাতির কথা, বামপন্থীদের খতম করার কথা– এসব তার স্মরণ হয় ওই মুহূর্তে, কিন্তু বলে না সে। বরং লক্ষ্য করে, মাহফুজ যা বলছিলো সবই ক্ষোভের কথা– কিন্তু অবাক কাণ্ড, তার গলার স্বরে ক্ষোভ হতাশা রাগ ইত্যাদি কিছুই ফুটছিলো না। শেষে যখন বললো, রায়হান, দেশের এমন অবস্থাতেও কি তোমাদের চিন্তা হয় না ? তোমাদের মতো মানুষও যদি দেশের কথা চিন্তা না করে তাহলে দেশ কেমন করে থাকবে ?

রায়হান এবার হাসে। বলে, চিন্তা করে কোনো লাভ আছে ? বলো ? এতোক্ষণ যা বললে সবই তো আমার কথার মতোই– সবই হতাশার কথা– তুমিও তো কোনোরকম আশার কথা শোনাতে পারছো না– পারছো, বলো ?

মাহফুজ ঐ কথার পর খানিক যেন গম্ভীর হয়। বলে, শোনো রায়হান, এসব কথা সবার কাছে বলি না। শুধু তোমার কাছেই বলছি– তুমি কী ভাবছো, সেটা আমার জানা দরকার, তোমার চিন্তা ভাবনার ক্ষমতা আমাদের অনেকের চাইতে বেশি। ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় তুমি যা বলতে, তখন মনে হতো না যে ঠিক বলছো– তোমার কথায় পাত্তা তো দিতামই না, বরং হাসাহাসি করতাম। কিন্তু পরে দেখলাম, তোমার কথা হুবহু মিলে যাচ্ছে। বলতে, পাকিস্তান টিকবে না– কথাটা কোন সালের মনে আছে ?

বাহ্, মনে থাকবে না ? রায়হানের হাসি পায় সামান্য– মাহফুজ পাকিস্তানের পক্ষে কথা বলতে বলতে রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে উঠতো। চিৎকার করে বলতো, পাকিস্তান হ্যাজ কাম টু স্টে– তোমরা যতই লম্ফঝম্ফ করো, যতই ইণ্ডিয়ার দালালি করো, পাকিস্তানের একটা পশমও ছিঁড়তে পারবে না।

রায়হানের স্পষ্ট মনে পড়ে ১৯৫৭তে কাগমারি সম্মেলনের পর ইউনিভার্সিটির আমতলায় মারামারির ঘটনাটা। ছাত্র ইউনিয়নের হালকা পাতলা সাত্তারকে এমনভাবে পেটানো হয়েছিলো যে, বলার কথা নয়। সে মাহফুজের চোখের দিকে তাকিয়ে ঘটনাটা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার লোভ সামলাতে পারে না। বলে, '৫৭তে আমতলায় সাত্তারের মতো দুর্বল মানুষটাকে কিভাবে পেটানো হয়েছিলো মনে আছে তোমার ? নিশ্চয়ই স্মরণ করতে পারো সেই ছাত্রটিকে যে প্রক্টর অফিসের মেহগনি কাঠের কালো রঙের টেবিলটা ভেঙে তার একখানা পায়া ওপরে তুলে নাচাতে নাচাতে ছুটে গিয়েছিলো আমতলার দিকে। কিভাবে ওই পায়া দিয়ে ঘা দেওয়া হয়েছিলো বেকসুর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ছেলেদের পিঠের ওপর- নিশ্চয়ই তোমার মনে পড়ে। কারণ ওই ছাত্রনেতাটি পরে সমাজের এলিটদের একজন হয়ে গেছে- মন্ত্রীও তো হয়েছে। হয় নি, বলো ? অথচ মারামারিটা হয়েছিলো কেন ? বাংলার মানুষ ভবিষ্যতে আসসালামো আলাইকুম জানাবে পাকিস্তানকে, এই কথাটা বলেছিলেন কাগমারি সম্মেলনে মওলানা ভাসানী। আর সেজন্য ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে মওলানা ভাসানীর বিচার দাবি করা হয়েছিলো আর সেই দাবির প্রতিবাদে সভা করেছিলো ছাত্র ইউনিয়ন। রায়হান লক্ষ্য করে মাহফুজ মুখ ফিরিয়ে দরজার দিকে তাকিয়ে আছে। আর ঠিক ওই মুহূর্তে সে তার ঘাড়ের কাছে বহুদিনের পুরনো ব্যথাটাকে অনুভব করে- সেদিন ওই আমতলায় মারামারির সময় ভারী জিনিস দিয়ে তার ঘাড়ে কে যেন খুব জোরে একটা বাড়ি মেরেছিলো। ওই ঘা খেয়ে সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলো। মাহফুজের মুখ ফিরিয়ে নেওয়া দেখে তার সন্দেহ হয় হঠাৎ ওই ঘাটা কি মাহফুজই দিয়েছিলো ? তার ডান হাত আপনা থেকে বাম ঘাড়ে চলে যায় এবং আঙুলগুলো জায়গাটা ডলতে শুরু করে। কী হলো ? মাহফুজ জিজ্ঞেস করে। ওখানে কি ব্যথা হয় এখনও ?

নাহ্, তেমন কিছু না, রায়হান হাসে।

হ্যাঁ, কতো ঘটনাই না ঘটলো, মাহফুজের গলা কিঞ্চিৎ উদাস হয়। বলে, অথচ দেখো, মাত্র কয়েক বছর পরই পার্টি ঠিক উল্টো দিকে চলে গেলো। বলা হতো ৯৮% স্বায়ত্তশাসন পেয়ে গেছে বাঙালিরা- সেই পার্টিই বলতে শুরু করেছিলো পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন আমাদের প্রধান দাবি।

রায়হান জিজ্ঞেস করে। ঐ সময়ের কথা তোমার খুব মনে আছে ?

বাহ্ মনে থাকবে না ? মার্শাল ল' হওয়ার পর তুমি হল থেকে বেরিয়ে গা ঢাকা দিয়েছিলে, দু'মাস পর দেখা হলো এক সন্ধ্যায় শান্তিনগরের এক গলিতে। তখনও তোমার মুখে ওই এক কথা- পাকিস্তান থেকে বেরিয়ে না এলে বাঙালির কোনো ভবিষ্যত নেই।

মাহফুজের কথা শুনে রায়হানের আরও নানান কথা মনে পড়ে। ওই সময়, ওই ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খানের মার্শাল ল' জারি হওয়ার পর, সত্যিই সে হল ছেড়ে চলে গিয়েছিলো। পরীক্ষাটা হয়ে গিয়েছিলো বলে রক্ষা, না হলে তার এমএ ডিগ্রীটা জুটতো কি-না সন্দেহ। পালাবার কারণ, তার সন্দেহ হয়েছিলো তখন। মাহফুজের সঙ্গে তর্ক হতো, কিন্তু তাকে কখনো বিপজ্জনক মনে হয় নি বরং ভয় লাগতো শাহাবুদ্দিনকে একেবারে চুপচাপ শান্ত টাইপের ছেলে, কিন্তু গুজব ছিলো ও আসলে পুলিশের ইনফর্মার, রাজনীতির খবরাখবর ওর ডিআইবি ইন্সপেক্টর মামার কাছে দিয়ে আসে।

তুমি সেদিন বলেছিলে, এই আইয়ুব খানই পাকিস্তানের বারোটা বাজিয়ে দেবে, তোমার মনে নেই ?

রায়হান খুব জোরে হেসে ওঠে। বলে, বাদ দাও- ওসব পুরনো কাসুন্দি ঘেঁটে এখন কী লাভ- পাকিস্তান চলে গেলেও তো লাভ হয় নি কিছু- মানুষের দুর্দশা তো একই রকম রয়ে গেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

রায়হান টেবিলের কাচের নিচে রাখা এশিয়ার ম্যাপ-এ বাংলাদেশ অংশটা দেখতে দেখতে বলে, এই এতোটুকু জায়গার দেশ, কতো মানুষ, হাজার রকমের সমস্যা, সম্পদ বলতে কিছু নেই,– যেটুকু আছে সেটুকু সদ্ব্যবহারের ব্যবস্থা হয় না, বরং উল্টো পাচার হয়ে যায়, এমন একটা অবস্থার কথা কি কেউ চিন্তা করেছিলো ?

কথাগুলো খুব নিচু গলায় উচ্চারিত হয় চিন্তামগ্ন মানুষের আত্মকথনের মতো, কিন্তু ওই কথাতেই মাহফুজ একেবারে পেয়ে বসে। বলে, সেই কথা তো আমারও– দেশটার ভবিষ্যৎ বলতে কি কিছুই নেই ?

. রায়হান ফের বন্ধুর মুখোমুখি তাকায়। তারপর খুব ধীরে ধীরে বলে, আমি ঠিক জানি না– তবে ১১/১২ কোটি মানুষের একটা দেশ, যুদ্ধ করে স্বাধীন হয়েছে কি ধ্বংস হয়ে যাবার জন্য ? আমার বিশ্বাস হয় না।

তাহলে ? মাহফুজ ফের টেবিলের ওপর সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে।

রায়হান হাসে। বলে, আমি কি ভবিষ্যদ্বক্তা জ্যোতিষী ? তবে এমন অবস্থা থাকতে পারে না– একটা অদলবদল নিশ্চয়ই হবে– ৬৮/৬৯-এর আগের দু'বছরের কথা তোমার মনে নেই ?

মাহফুজের ভুরুতে ভাঁজ পড়ে, চোখে মুখে খুশি ঝলসে ওঠে। বলে, সত্যি সত্যি এখনকার অবস্থা তোমার অমন মনে হচ্ছে ?

রায়হান কিছু বলার আগেই মাহফুজের জুনিয়ার কামাল এসে দলিলের কপিগুলো টেবিলের ওপর মেলে ধরে বলে, স্যার দেখলাম সব কিছু, মনে হলো ঠিকই আছে কাগজপত্র, কিন্তু ফিফটি ওয়ান-এ কি হিন্দু প্রপার্টি সরাসরি সেল ডীড হতো না ?

আহা, সে খোঁজে তোমার কী দরকার ! মাহফুজ যেন একটু বিরক্ত হয়। বলে, আমমোক্তার নামাটা তো ঠিক আছে, না কী ?

জ্বী সেটা ঠিক আছে, কামাল জানায়। বলে, আইনউদ্দীন মিয়াকে পাওয়ার অফ এটর্নি দেন ললিত মোহন ঘোষ। পরে আইনউদ্দীন সেল ডীড করে দেন কুতুবউদ্দিনের বাপ খতিবউদ্দিনকে।

ব্যস, তাহলে তো হয়েই গেলো। মাহফুজ লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে। তারপর বলে, তবু জমি রেজিস্ট্রির আগে আশেপাশের লোকজনকে জিজ্ঞেস-টিজ্ঞেস করে নিও– ওদিকে শুনছি একই জমি ২/৩ বার বিক্রি হয়ে যায়।

কিন্তু একটা কথা, এবার রায়হান খোলাসা করে বলে, জমিটা বিক্রির জন্য কিন্তু একটা বায়না হয়ে রয়েছে, কিছু টাকাও পেমেন্ট দেখানো হয়েছে বায়নানামায়।

কিন্তু এ বায়নানামা তো রেজিস্ট্রি হয় নি, কামাল জানায়। বলে, তাছাড়া বায়নানামার শেষ তারিখ পার হয়ে গেছে ৬ মাস আগে– ওটার কোনো ভ্যালিডিটি নেই এখন স্যার।

রায়হান মাহফুজের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। মাহফুজ তখন বায়নানামাখানা পড়ে মনোযোগ দিয়ে। তারপর বলে, আইনগত ভাবে ক্লেইম খুব শক্ত হবে না– কিন্তু টাকা তো পেমেন্ট হয়েছে– তুমি তো এই বায়না করা জমিরই অংশ কিনতে যাচ্ছো, তাই তো, না কী ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

রায়হান মাথা হেলায়। মুখে বলে, হ্যাঁ। তারপর বলে, যাঁরা বায়না করেছেন, তাদের সঙ্গে একই দিনে রেজিস্ট্রি হবে, একই সঙ্গে।

ওদের সঙ্গে কথা হয়েছে তোমার ?

এখনও হয় নি, তবে হবে।

ওদের সঙ্গে আগে কথা বলে নাও, মাহফুজ বলে, পারলে বায়নানামাখানা নতুন করে লেখাও। আর তাতে যেন তোমার নাম থাকে। কোনোরকম টাকা-পয়সা লেনদেন হয়েছে তোমার সঙ্গে ?

না, রায়হান মাথা নাড়ায়।

তাহলে ঠিক আছে, জমি রেজিস্ট্রির সময় টাকা দিও, তার আগে নয়।

তবে যা বলছি, সবই সাবধানে করবে, এমনিতে কাগজপত্র ঠিকই আছে– জমি রেজিস্ট্রির ব্যবস্থা করলে আমাকে জানিও।

মাহফুজের কথা শেষ হলে রায়হান উঠে দাঁড়ায়। বলে, এবার তাহলে চলি ?

তাহলে ফের কবে দেখা হচ্ছে ? মাহফুজ হাত ধরে জিজ্ঞেস করে।

প্রশ্নটা রায়হান ঠিক বুঝতে পারে না। বলে, আমাকে কি আবার আসতে হবে ?

আরে নাহ্, মাহফুজ হাসে। বলে, তোমার দলিলের ব্যাপার নয়– রাজনীতির আলাপটা তো শেষ হলো না, সেই কথা বলছি।

রায়হানও হাসে। বলে, এসে যাবো একদিন– তুমি যে সন্ধ্যার পরও সত্যি সত্যি অফিসে থাকো, তা তো জানতাম না– এখন আসবো।

দু'পা এগিয়ে সে ফের ঘুরে দাঁড়ায় আর বলে, ওই পলিটিক্যাল আলাপের জন্য নয়– ও আলাপের তো শেষ নেই।

না রায়হান, মাহফুজ দু'পা এগিয়ে এসে হাত ধরে। বলে, তুমি জানো না, আমাদের পার্টির ভেতরে বাজে রকম একটা তর্ক শুরু হয়ে গেছে– ইলেকশানে যাওয়ার কথা ছিলো না, তবু শেষ মুহূর্তে আমরা ইলেকশানে গেলাম– রাস্তা ছেড়ে পার্লামেন্টে ঢোকার ফলে যারা রাস্তায় রইলো, তারাই হয়ে গেলো আসল অপোজিশন– তাই জিজ্ঞেস করছি, আসলেই কি ৬৮/৬৯-এর মতো ঘটনা ঘটবে– তোমরা সাংবাদিকরা কী ভাবছো ? তোমরা কী আলাপ করো নিজেদের মধ্যে ?

রায়হান রাস্তায় নেমে হাঁটতে হাঁটতে মাহফুজের প্রশ্নটা নিয়ে ভাবে। আসলে সত্যি সত্যি কি ৬৮/৬৯-এর ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে ?

তার নানান ঘটনার কথা স্মরণ হয়। নানান স্মৃতি মনের পর্দায় ত্বরিৎ ছায়া ফেলে যায়। সে নিজেই কি সেই রায়হান আছে ? আহসানও কি আছে আগের মতো ? সে নিজে না হয় ঘোরতর সংসারী হয়ে গিয়েছিলো, কিন্তু আহসান তো ছিলো ফুল টাইমার– চাকরি বাকরি করতো না। সেই আহসান এখন কী করছে ? সে এখন ইভেন্টিং এর ব্যবসা করছে। শোনা যায়, নতুন ব্যবসা ম্যান পাওয়ারের ব্যবসাতেও তার পুঁজি খাটে। শুধু মানুষ নয়। জায়গাগুলোও তো আর সে রকম নেই– ইউনিভার্সিটি এ চহারা বদলে গেছে। আটষট্টিতে প্রেসক্লাব কেমন ছিলো !

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

সেই সাংবাদিকতা কি এখন দেখা যায়? সেই টগবগে তেজী সামাদ, ঝকঝকে ধারাল এনায়েত, ধীর স্থির কামাল, হুল ফোটানো রহিম। সে মনে মনে হিসেব করে। এখনকার তরুণদের চেহারাগুলোও মেলায় কিন্তু উঁহু অমন কাউকে খুঁজে পায় না। তাহলে কি মানুষ নয়, সময়ই হলো আসল। সময়ই মানুষকে তৈরি করে নেয়। সময় কি তবে আসে নি এখনও?

না কি সে নিজেই সময়ের বাইরে চলে এসেছে, তাই সময়কে সে দেখতে পাচ্ছে না– রাজনীতিতে না, সাংবাদিকতাতেও না।

আসলেই কি তুমি তোমার সময়কে চেনো? নিজেকে প্রশ্ন করে সে, কিন্তু জবাব খুঁজে পায় না।

আসলেই তো সে চেনে না। না সময়কে। না মানুষকে। তরুণ সাংবাদিকরা কে কী করছে, তার কিছুই সে জানে না। সিনিয়ারদের খবরাখবর সে পুরো জানে না। তবে কেউ কেউ যে সরকারের দালালি করছে, সেটা সে বুঝতে পারে– বিদেশে এ্যাম্বাসিতে প্রেস কাউন্সিলার হবার জন্য কে কে হন্যে হয়ে উঠেছে, সে খবর তার অজানা নয়– কেউ কেউ আবার সেক্টর কর্পোরেশনগুলোর কর্তাদের কাছ থেকে ব্ল্যাকমেইল করে ঘুষের বখরা আদায় করে আর বিদেশী দূতাবাসগুলোতে কারা ঘুরঘুর করে বেড়ায় তাও তার কানে আসে। এসব খবর নিয়ে ফিস ফিস করে কানাকানি হয়– কিন্তু প্রতিবাদ হয় না। প্রতিক্রিয়া হয় না। তাহলে?

রায়হান নিজেকেই প্রশ্ন করে, তাহলে ৬৮/৬৯-এর মতো ঘটনা কে ঘটাবে?

কেন, ছাত্ররা, কে যেন কোনখান থেকে বলে ওঠে।

রায়হানের হাসি পায়। কারণ ইউনিভার্সিটির টিচাররা কে কোন ধরনের এনজিও প্রজেক্টে কাজ করছে সবই তো তার জানা– সরকারের সমর্থনে গ্রুপিং করছে কারা, তাও তার জানা, এমনকি ছাত্রনেতা কারা হয়, কীভাবে আর্মড ক্যাডার বানানো হয়– পরে তারা কীভাবে চাঁদা তোলে, লাইসেন্স হাতায়, কন্ট্রাক্ট বাগায়, সবই তার জানা। ৬৮/৬৯-এ শুধু খোকা আর পাঁচ পাণ্ডুর-এর মতো ২/৩টি নাম শোনা যেতো– এখন তো গন্ডায়গন্ডায় অমন নাম শোনা যায়। তাহলে?

সে ৬৮/৬৯-এর ঘটনা ঘটবার যক্তি খুঁজে পায় না। কিন্তু তবু কেউ যেন মনের খুব গভীর ভেতরে থেকে থেকে বলতে থাকে। ঘটবে ঘটনাটা, দেখো তুমি।

পল্টনের মোড়ে পৌছলে তার খুব ইচ্ছে করে একবার প্রেসক্লাবে গিয়ে ঢুঁ মেরে আসে। কিন্তু ঘড়ির দিকে নজর পড়লে সে দমে যায়। রাত দশটার সময় প্রেসক্লাবে গেলে সে বাড়ি ফিরবে কখন? তাছাড়া রাত ১১/১২টা পর্যন্ত বাইরে সময় কাটাবার মতো বয়স কি তার এখনও আছে? না শরীরে তার সইবে? সে হাঁটতে হাঁটতে বুকের বাঁদিকটায় হাত চেপে ধরে জিজ্ঞেস করে, কী ব্যাপার দোস্ত, তুমি কি এ্যালাউ করবে? হাতটা চেপে ধরে থাকে সে বেশ কিছুক্ষণ, কিন্তু যন্ত্রটা 'হ্যাঁ' বলে, না 'না' বলে সেটা সে বুঝতে পারে না। সে মাথা ঝাঁকিয়ে একসময় বলে, ওকে ওকে– আমি বাড়িতেই যাচ্ছি। ঐ সময় সে জিপিও'র মোড়টা বেশ ফাঁকা দেখতে পায় এবং গুনগুন করে ওঠে পুরনো দিনের গান– মন চলো নিজ নিকেতনে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

হ্যাঁ অবশ্যই তাকে বাসায় ফিরতে হবে এবং যথারীতি খাওয়া দাওয়া করে বিছানায় যেতে হবে তারপর ঘুমিয়ে পড়তে হবে। কারণ কাল থেকে তার নতুন কাজের আয়োজন শুরু হতে যাচ্ছে। মাহফুজের কথা মতো যেহেতু জমির কাগজপত্র ঠিক আছে– সেহেতু বায়না করেছে যে লোক, তার সঙ্গে যোগাযোগ করে ফয়সালাটা করে ফেলতে হবে– তারপর টাকার জোগাড়। শেষে জমি রেজিস্ট্রি। মুনশি ওদিকে বেশ কাজের লোক। বায়না করেছেন যে ভদ্রলোক তার সঙ্গে যোগাযোগ করে রেখেছে, এখন সে নিজে গেলেই কাজটা এগোবে। যদি ভদ্রলোক রাজি থাকেন এবং তৈরিও হয়ে যান রেজিস্ট্রি করার জন্য, তাহলে তো তাকে তাড়াতাড়ি টাকার ব্যবস্থা করতে হবে– আর দেরি নয়– কে জানে, এটাই হয়তো তার শেষ সুযোগ। এমন সুযোগ সে কেমন করে নষ্ট করে? মুনশি যেদিন খবরটা দেয় যে ওই বায়না করা জমি পুরোটা রাখতে চান না ভদ্রলোক। সেদিন থেকেই তার মনস্থির করা মোটামুটি শেষ। বীথির উৎসাহ ছিলো প্রথম থেকেই। তার বিশ্বাস, ফুলবাড়িয়ার জমিটা সত্যি সত্যি তার কর্তা কিনতে যাচ্ছে।

হাঁটতে হাঁটতে কাজের ছকটা সে মনে মনে তৈরি করে– শাজাহানপুরে গিয়ে ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করার পরই তার প্রথম কাজ অফিসের এ্যাকাউন্ট্যান্টের কাছ থেকে জানা, ঠিকঠিক কতো টাকা সে প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে তুলতে পারবে– হিসেবটা জানা গেলে দরখাস্তটা সে তখন তখনই জমা দেবে। তারপরের কাজ ম্যানেজিং এডিটরের সঙ্গে দেখা করা– সেটা কাল হবে না, সম্ভবত পরশু সে সোজাসুজি দে া করে ছয় মাসের বেতন এ্যাডভান্স চাইবে– ভদ্রলোককে তুষ্ট করার জন্য যা করতে হয় সবই সে করবে– অতীতে যা কখনো করে নি, এবার সে তাও করবে। না করে উপায় কী? তবে তার মনে হয় না ভদ্রলোক তাকে বিমুখ করবেন– কারণ অতীতে অন্য সাংবাদিকদের তো এ্যাডভান্স তিনি দিয়েছেন। তাছাড়া তার একটা দাবি অবশ্যই আছে, কারণ লালমাটিয়ায় ফ্ল্যাটের জন্য দরখাস্ত করেছিল– মিরপুরে ফ্ল্যাট দেওয়ার সময়ও তার নাম সুপারিশ করা হয় নি, সুতরাং তার অনুরোধ ম্যানেজিং এডিটর অবশ্যই ফেলবেন না।

কিন্তু যদি না দেয় শেষ পর্যন্ত? তার মনের ভেতরে অচেনা কে একজন বলে ওঠে। আর তখন সে থমকে দাঁড়ায়। আর ঐ মুহূর্তেই বীথির গয়নাগুলো মনের ভেতরে ঝলমল করে ওঠে। পরক্ষণেই অবশ্যি সে নিজেকে ধিক্কার দেয়, এই রায়হান, ছি! তোর লজ্জা করবে না?

গুলিস্তানের মোড়ে পৌঁছে দেখলো, রাত সাড়ে দশটা কিন্তু হলে কী হবে ফেরিঅলাদের ভিড়, হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি সমানে চলছে। আকাশে অল্প অল্প মেঘ, বৃষ্টি হতে পারে। রায়হান দ্রুত হেঁটে প্রেসিডেন্ট হাউসের পাশের রাস্তায় পৌঁছে যায়। এদিকটায় আবার ভিড় নেই– পুরনো রেললাইন তুলে সেখান দিয়ে রাস্তা হওয়াতে নিচের পুরনো রাস্তার ভিড় বলতে কিছুই নেই। সে ডাইনে বাঁয়ে তাকাতে তাকাতে আয়েসী ভঙ্গিতে হাঁটছিলো, ওই সময় হঠাৎ রঙচঙে কাপড়জামা পরা তিনটি মেয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়। সে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিলো কিন্তু পারলো না, একজন গলা উঁচিয়ে ডাকলো, ও সার, ও সার আপনে কি কেউরে বিছরান ?

রায়হান মেয়ে তিনটির মুখের দিকে তাকিয়ে স্পষ্ট বুঝতে পারে, আসলে ওদের কী মতলব। এ রাস্তায় বহুদিন পর আসছে বলেই হয়তো তার জানা নেই যে রাস্তাটির আসলে কী রকম উন্নতি হয়েছে– এবং রাস্তাটা রাতের বেলা কাদের দখলে থাকে। রাস্তাটা পার হওয়ার জন্য সে পা বাড়ায় আর তখনই অন্য আর একটি মেয়ে তার সামনে এসে দাঁড়ায় আর চটুল আদুরে ভঙ্গিতে সুর করে বলে ওঠে, এই যে আমি আইয়া পড়ছি।

আচ্ছা মুশকিল তো ? রায়হানের খুব বিরক্ত লাগে মেয়েটার অমন গায়ে পড়া আদুরে ভাবভঙ্গি। তার সস্তা পাউডার ছোপানো কালো মুখে বানিয়ে তোলা হাসি দেখে এক নজর। লাল ফিতে দিয়ে বাঁধা চুলের বিনুনি দু'টিও তার চোখে পড়ে এমন কি ল্যাম্পোস্টের আলোতে নকল সোনার গয়নার ঝিলমিলানিটুকুও তার নজরে আসে। বেশ খারাপ লাগে তার। কিন্তু তবু তার মুখ দিয়ে ধমক বেরিয়ে আসে– এ্যাই মেয়ে ভাগো এখান থেকে, মানুষ চেনো না !

মেয়েটি ধমক খেয়ে খানিক ভড়কে যায়। ওদিকে ল্যাম্পোস্ট ঘেঁষে দাঁড়ানো তিনজনের একজন গলা উঁচিয়ে বলে ওঠে। আইয়া পড় লো, আইয়া পড়– বুইড়া ব্যাটা তর রসের নাগর হইতে চায় না, বুজস না ? আইয়া পড়।

রায়হান ফের ডাইনে বাঁয়ে তাকায়। ভয়ানক চুপচাপ সমস্তটা রাস্তা, দূরে ল্যাম্পোস্টে আর পাঁচিলে হেলান দিয়ে কয়েকটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার বুঝতে অসুবিধা হয় না যে এ রাস্তায় ট্রাফিক বন্ধ করে দেওয়াতে– সারা রাত এই সব ভাসমান মেয়েদের আড্ডা হয়ে পড়েছে এলাকাটা। তার একটুখানি হাসিও পায়– হায়রে। রাষ্ট্রপতির নিরাপত্তার জন্য ট্রাফিক বন্ধ, তা এখন ভালো মতোই নিরাপত্তা রক্ষা করছে এই মেয়েরা।

বাসায় পৌছতে পৌছতে রাত এগারোটা। কাজের মেয়েটি দরজা খুললো। ওপরে উঠলে দেখা গেলো, বীথির মুখ বেজায় গম্ভীর। মঞ্জু বললো, এতো দেরি করলে কেন ?

বাহ্ দেরি হবে না ? রায়হান কৈফিয়ত দেওয়ার মতো করে বলে, উকিলের কাছে গেলে সঙ্গে সঙ্গে কাজ হয় ?

তুমি বলে যেতে পারতে যে ফিরতে দেরি হবে ? বীথির গলার স্বরে যথেষ্ট ক্ষোভ প্রকাশ পায়। বলে, ওষুধটাও তো সঙ্গে নাও নি– খামোকা কেন যে তুমি চিন্তায় ফেলো মানুষকে।

রায়হান তার ওষুধের ছোট শিশিটা টেবিলের ওপর দেখতে পায়। ভেতরে ভেতরে সে যথেষ্ট বিব্রতও বোধ করে। কিন্তু সেটা বাইরে প্রকাশ হতে দেয় না। বরং মনে মনে তৈরি হয়, পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়ার জন্য। বলে, মাহফুজের দোষ নেই– এতোগুলো দলিল ঘাটাঘাটি করে দেখার ব্যাপার, দেরি না হয়ে পারে ? তাছাড়া–

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

হয়েছে হয়েছে, বীথি বাধা দিয়ে বলে ওঠে। যথেষ্ট হয়েছে, এবার খেয়ে নিয়ে উদ্ধার করো– মোমেনা আর কতোক্ষণ জেগে থাকবে ?

কথাটা মিথ্যা নয়। সে দেখতে পায় কাজের মেয়ে মোমেনা জেগে থাকবার জন্য কচলে কচলে নিজের চোখ দু'টিকে লাল করে ফেলেছে।

খাওয়া শেষ করে ছেলে দু'টি উঠে গেলে বীথি স্বামীর মুখোমুখি তাকায়। বলে, উকিল কী বললো ?

রায়হান টেবিল থেকে উঠতে উঠতে জবাব দেয়, দলিল টলিল দেখে তো ভালোই বললো– তাড়াতাড়ি রেজিস্ট্রি করে নিতে হবে, একথাও বললো।

বীথি স্থির হয়ে দাঁড়ায় এক মুহূর্ত। স্বামীর মুখের ওপর থেকে তার নজর সরে না। জানতে চায়, টাকায় কুলোবে ?

রায়হান বারান্দার বেসিনে হাত ধুতে ধুতে বলে, দেখি না চেষ্টা করে।

স্বামী ঘরের দিকে চলে গেলেও বীথি বারান্দাতেই দাঁড়িয়ে থাকে। মনের ভেতরে বহুদিনের পুরনো প্রশ্নটা কেমন ঝাপটা দিয়ে ওঠে– অনিশ্চিত একটা অবস্থা থেকে কি সত্যি সত্যি কোনো রকম নিশ্চিত অবস্থায় যেতে পারবে সে তার সংসার নিয়ে ? বিশেষতঃ এতোকাল পরে ? সে আকাশের দিকে তাকায়। দিগন্তের চাঁদ কখন ফের মেঘের আড়ালে চলে গেছে, কেউ টেরও সম্ভবত পায় নি। তার ফলে মধ্য আকাশের তারাগুলো বেশি ঝকঝকে দেখাচ্ছে।

আশ্বিন কি এখনও আছে ? সেপ্টেম্বরের আজ কতো ? তার অবাক লাগে। আজ সেপ্টেম্বরের পঁচিশ, সকাল থেকে সে মানুষটার মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে– কিন্তু কোনো রকম হুঁশ নেই। বিকার নেই, খেয়াল নেই, রোজকার মতোই দুপুরে অফিসে চলে গেলো। যাওয়ার সময় সে বললো পর্যন্ত যে দেরি করো না– কিন্তু কার কথা কে শোনে ! সেই যে গেলো, ফিরলো রাত এগারোটায়। সে কাঁদবে না হাসবে বুঝতে পারে না। মানুষটা কি অতীতের কিছুই মনে রাখে না ? অথচ তার হাত ধরে সে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে পা বাড়িয়েছিলো– দেখতে দেখতে কতো বছর পার হয়ে গেলো– কিন্তু অনিশ্চয়তার দশা তার কাটলো না। বড় ভাই দু'জনার সম্পর্ক জানবার পর প্রথম খুব ধমকে দিয়েছিলো। তবে পরে আর ধমকাতো না, বোঝাতে চাইতো। বলতো, দেখ জার্নালিস্টের চাকরি কোনো চাকরি নয়– মাইনে কম, আজ আছে তো কাল নেই– তুই মারা পড়বি। বুবু বলতো, দেখ বীথি, বোকামি করিস না। তোর দুলাভাই তোর জন্য একটা ভালো ছেলে পছন্দ করে রেখেছে। ব্যাংকের চাকরি– খুব সুখে থাকবি। বড় ভাই, বুবু, মামা এঁদের কথার জবাবে সে হুঁ হাঁ জবাব দিয়ে পাশ কাটাতো। শেষে যখন আব্বা জেদ করতে শুরু করলেন, সপ্তাহে একবার করে সাজগোজ করিয়ে ড্রয়িং রুমে বসাতে শুরু করলেন– তখন সে কী আর করে– চোখ কান বুঁজে ঝাঁপ দিলো– সেই অনিশ্চিতের বুকেই– রায়হান একটু গাঁইগুই করেছিলো– বলেছিলো, অবজারভারে আমার চাকরিটা হোক, একটু দেরি করা যায় না ?

না, বীথির তখন এক কথা। ঘটনাটা তো ঘটিয়েছিলো এমনই এক শরৎকালের দিনে সেপ্টেম্বরের ২৫ তারিখে। রাতের বেলা বন্ধুর বাড়ির চিলেকোঠায় নিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

তুলেছিলো মানুষটা। হোটেলে যাওয়ার পয়সা ছিলো না। সাহসও ছিলো না। হ্যাঁ, যখন চিলেকোঠার জানালার কাছে দাঁড়ায়, তখন এমনই জোছনা ছিলো আকাশ ভরা, টিনের চাল থেকে শিশির ঝরার খুব মৃদু আওয়াজ কানে আসছিলো। কি অদ্ভুত কাণ্ড মানুষটার ! সেসবের কি কিছুই মনে পড়ে না ? পারে মানুষ ভুলে যেতে ? গতবারও সে মনে করিয়ে দিয়েছিলো। কিন্তু এবার না, সে মনে মনে ঠিক করে, আজকের তারিখটার কথা সে কিছুতেই বলবে না– কোনো কথাই স্মরণ করিয়ে দেবে না– কোনো তারিখ না, কোনো ঘটনাও না।

চার

ক্লাস শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মঞ্জু বেরিয়ে পড়ে। ওদিকে শহীদুল্লাহ হলের পেছনের পুকুরের দিক থেকে দু'টি মেয়ে আসছিলো। একটি তার ক্লাসেরই– শীলা, অন্যটিকে সে চিনতে পারে না। হাসতে হাসতে শীলা জিজ্ঞেস করলো কী ব্যাপার, তুমিও কি ক্লাস করো নি?

মঞ্জু হ্যাঁও বোঝায় নাও বোঝায় এমন এক ভঙ্গিতে মাথা হেলিয়ে সামনের দিকে পা বাড়ালো। কয়েক দিন থেকেই একটা চিন্তা তার মাথার ভেতরে কিট কিট করছে। নজরুল স্যার ক্লাসে প্রায়ই কালচারাল জিওগ্রাফির কথা তোলেন। আর ঘুরেফিরে একটা কথা বলেন যে, বাংলাদেশ এলাকাটা নাকি দুনিয়ার হার্থ অফ সিভিলাইজেশনের ৮টির মধ্যে একটি। অন্য সব ছেলেমেয়েদের মতো সেও চুপচাপ শুনে যায় স্যারের কথা। অন্যেরা কী বোঝে সে বলতে পারবে না তবে সে শুনেছে, স্যার নাকি নানান বিষয়ে কথা বলতে ভালোবাসেন এবং তাঁর সেসব কথা নাকি স্রেফ গুল। যখন শুনতে পায় অমন মন্তব্য, তখন তার খুব রাগ হয়। বিশ্বাস হয় না যে, কোনো মানুষ বানানো কথা অমন জোর দিয়ে দিনের পর দিন বলে যেতে পারে। একেক দিন তার খুব ইচ্ছে হয় প্রশ্ন করতে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সাহসে কুলোয় না। গতকাল থেকেই সে ভেবে রেখেছে তরফদার স্যারের ক্লাস না নেওয়ার নোটিশ দেয়ার পর যে, দশটার ক্লাস শেষ হওয়ার পরপরই সে ব্রিটিশ কাউন্সিলে যাবে। তাই আজ তার ক্লাস শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বেরুনো।

বাগানের গাছতলায়, রাস্তার ধারে, সর্বত্র ছেলেমেয়েরা ঘোরাফেরা করছে। জোড়ায় জোড়ায় আলাপ করতেও দেখলো সে কয়েকজন চেনা ছেলেমেয়েকে– তারা হাত তুলে ডাকলোও কিন্তু সে দাঁড়ালো না।

কার্জন হলের পশ্চিম গেট দিয়ে বেরুনোর সময় ডান দিকের কাঠবাদাম গাছতলায় দাঁড়ানো কিছু লোকের জটলা দেখে সেও দাঁড়িয়ে পড়ে। লক্ষ্য করে সবাই দূরে মেডিক্যাল কলেজের গেটের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওদিকে আবার কী ? তার মনে খটকা লাগে। অন্যদের মতো সেও নজর করে দেখতে চেষ্টা করে। দূর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

থেকে আলো দেখা যায় না। তবু যেটুকু নজরে পড়লো তাতে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, গেটের ভেতরের দিকে মিছিলের মতো কিছু হচ্ছে– স্লোগানের আওয়াজও স্পষ্ট শোনা গেলো। এদিকে আবার বাইরে শহীদ মিনারের দিকটা একেবারেই ফাঁকা।

ব্যাপারটা আসলে কী, জানার জন্যে মঞ্জুর কৌতূহল হয়। সে এক পা দু'পা করে এগোয়। কারণ ব্রিটিশ কাউন্সিলে তো জগন্নাথ হলের পশ্চিম গেট দিয়েও যাওয়া যায়। খানিক এগোবার পর হঠাৎ পেছনে মোটরবাইকের আওয়াজ শুনতে পায়। মুখ ফিরিয়ে দেখে, দোয়েল চত্বর ঘুরে পাশাপাশি দু'খানা বাইক খুব জোরে ছুটে আসছে। এবং দেখতে না দেখতেই তাকে পাশ কাটিয়ে গেলো। দুই বাইকেরই কেরিয়ারে একজন করে বাড়তি আরোহী। আর সবার মাথায় হেলমেট আঁটা। নীল রঙের বাইকখানা দেখে তার ফেরদৌসের কথা মনে পড়ে। যে ঐ বাইকটা চালাচ্ছে সেই কি ফেরদৌস? নাকি যে পেছনের কেরিয়ারে বসে আছে, সে?

ওদের মধ্যে কেউ যদি ফেরদৌস হয়, তা হলে খুব ভালো হয়। কারণ কতোদিন হয়ে গেলো, দেখা হয় না। ভর্তি পরীক্ষার সময় সেই যে দেখা হলো, তারপর আর পাত্তা নেই– আগে কখনো কখনো রাস্তায় ওর আব্বার সঙ্গে দেখা হয়ে যেতো, আজকাল তাও হয় না। ইউনিভার্সিটিতে যে ও ভর্তি হয়েছে সে বিষয়ে তার সন্দেহ নেই– কারণ সে শুনেছে, পরীক্ষা দেয়ার সময়ই ওদের জন্য স্পেশাল ব্যবস্থা রাখা হয়েছিলো। তাছাড়া ফেরদৌস তো ছাত্র হিসাবে কখনও খারাপ ছিলো না। রিটেন পরীক্ষাও ওর ভালো হয়েছিলো আর ভাইভার সময়ও যে ওদের দিকে খেয়াল রাখা হয়েছিলো, সেটাও সবার জানা।

ভাইভার পর মঞ্জু কার্জন হলের দিকে এসেছিলো, তখনই দেখা। পেছন থেকে নিঃশব্দে এসে ঘাড়ে হাত রেখেছিলো ফেরদৌস। জিজ্ঞেস করেছিলো, কেমন হলো ভাইভা?

এক রকম, মঞ্জু জবাব দিয়ে পাল্টা জিজ্ঞেস করেছিলো, তুই কেমন দিলি?

হেসে উঠেছিলো তখন ফেরদৌস, ভালোই– আমার পরীক্ষা ভালো না হয়ে উপায় নেই।

তুই আর কোনো গ্রুপে পরীক্ষা দিসনি? মঞ্জু কৌতূহল প্রকাশ না করে পারে নি।

নাহ্ কী দরকার। দারুণ তাচ্ছিল্যের ভাব ফুটে উঠেছিলো ফেরদৌসের গলার স্বরে। বলেছিলো, একটাতেই কতো ঝামেলা।

যদি সিলেকটেড না হোস?

হবো, সে হেলমেটটা এক হাত থেকে অন্য হাতে নিতে নিতে বলেছিলো– আমি এমনিতেই সিলেকটেড হবো– যদি কোনো কারণে না হই– স্পোর্টসম্যান কোটায় অবশ্যই হবো– আমাদের ভর্তি না করে ইউনিভার্সিটির উপায় নেই।

ফেরদৌসের গলায় শীতল একটা ভাব ছিলো। বলে উঠেছিলো, আমরা হচ্ছি ইউনিভার্সিটির নাট বল্টু, বুঝলি? আমরা থাকলেই কর্তাদের কর্তৃত্ব থাকবে, না থাকলে থাকবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

নাট বল্টু বদলাবে না ? মঞ্জু প্রশ্নটা না করে পারে নি।

হ্যাঁ বদলাবে, ফেরদৌস স্বীকার করে। তারপর বলে– কিন্তু কোনো না কোনো রকম নাট বল্টু থাকতেই হবে– মোনেম খানের সময় ছিলো, স্বাধীনতার পরে ছিলো, তারপরও আছে।

সেদিন ওর নীল রঙের মোটরবাইকখানা কার্জন হলে ঢোকার সিঁড়ির সামনে গাছতলায় হেলান দিয়ে দাঁড় করানো ছিলো, হাঁটতে হাঁটতে বাইকের কাছাকাছি পৌঁছে বলেছিলো, যাই রে, ফের দেখা হবে, খালা আম্মাকে আমার কথা বলিস।

চলতে চলতে সে হেলমেটটা ফের মাথায় বেঁধে নিয়েছিলো। তারপর বাইকে স্টার্ট দিয়ে খুব জোর স্পীডে কার্জন হল থেকে বেরিয়ে যায়।

মঞ্জু নীল রঙের বাইকখানা মনে মনে খোঁজে। সামনের দিকে তাকিয়ে আর এক পা এক পা করে সামনের দিকে এগোয়।

মোড়ের কাছে এসে দেখে শহীদ মিনারের সামনে দু'খানা মোটরবাইকই পাশাপাশি দাঁড়ানো, আরোহীরা বাইকে বসে রাস্তার মাটিতে পা ঠেকিয়ে রেখেছে।

মঞ্জুর মনে হলো, একজন বোধহয় ফেরদৌস। কিন্তু ফের খটকাও লাগে তার– ফেরদৌস কি চশমা ব্যবহার করতো ? ওর কি দাড়ি ছিলো ? গালভর্তি না কামানো দাড়ি, সানগ্লাস, মাথায় হেলমেট আঁটা, পরনে ব্লু জীনস, পায়ে হাই বুট– অমন বেশবাস কি ফেরদৌসের হতে পারে ? তার বিশ্বাস হতে চায় না। তাই ডাকতে চাইলেও সে ডাকতে পারে না।

এদিকে রাস্তার মোড়ে দেখতে না দেখতে পুলিশের ট্রাক এসে যায়। লাফিয়ে লাফিয়ে নামে পুলিশ, প্রত্যেকের হাতে বেতের ঢাল, লাঠি আর কারো কারো হাতে টিয়ার গ্যাসের সেল ছোঁড়ার বন্দুক।

পুলিশের লোকেরা দেরি করে না– গাড়ি থেকে নেমেই সার বেঁধে পজিশন নিয়ে নেয়।

ট্রাকটা একইভাবে দাঁড়িয়ে থাকে আরও কিছু রাইফেলধারী পুলিশ নিয়ে।

পুলিশের গাড়ি আর লোকদের এমন কাণ্ড দেখে মঞ্জুর বুকের ভেতরটা হ্যাঁৎ করে ওঠে। তাহলে ব্যাপারটা কি গুরুতর রকমের কিছু ? গত মাসেই না একটা গোলমাল গেলো ওদের।

তাতে পুলিশের হামলা হয়েছিলো, মাথায় আর হাতে-পায়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা মেডিক্যাল ছাত্রদের ছবি বের হয় পরের দিনের খবরের কাগজে। আজ কি আবার এমন কোনো কাণ্ড ঘটতে যাচ্ছে ? মঞ্জুর মনে দুশ্চিন্তার ছায়া পড়ে। সেদিন না হয় ভাইয়া বাড়িতে ছিলো মায়ের অসুখের জন্য, কিন্তু আজ ? আজ তো ভাইয়া হোস্টেলে– এখন হয়তো ও কলেজে। মঞ্জুর রীতিমতো চিন্তা হয়। ঘটনাটা কী, জানবার জন্য সে তাড়াতাড়ি সামনের দিকে পা বাড়ায়।

মোড় পার হয়ে গেটের কাছে পৌঁছেই তাকে দাঁড়িয়ে পড়তে হয়। দেখে হাসপাতালের বারান্দার সামনের চত্বরটা একেবারে ফাঁকা। তার ওপারে কলেজের গেটের কাছে ছাত্রদের প্রকাণ্ড একটা জটলা– থেকে থেকে জোর স্লোগান হচ্ছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

একজন সার্জেন্ট কোত্থেকে যে আসে বোঝা যায় না। এসেই মঞ্জুকে প্রচণ্ড ধমকে ওঠে। এখানে কী, এ্যাঁ ? এখানে কেন এসেছেন, যান এখান থেকে।

ধমক খেয়ে মঞ্জু চুপচাপ বাঁ দিকের রাস্তা ধরে। ঐ সময় লক্ষ্য করে, কিছুক্ষণ আগে দেখা মোটরবাইক দু'খানা আর তার আরোহীদের সে দেখতে পায় না। ভারী অদ্ভুত তো ? তার ভীষণ অবাক লাগে। একি ভেল্কিবাজি নাকি ? বাইক দু'খানা কীভাবে আরোহীসুদ্ধ নিঃশব্দে হাওয়া হয়ে গেলো। তাহলে কি একটু আগে সে যা দেখেছিলো সবই ভুল। একটু আওয়াজও হবে না, এ কেমন কথা !

শহীদ মিনারের সামনের চত্বরে সে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে। হাতে ঢালঅলা পুলিশরা মোড়ে এখনও দাঁড়িয়ে। কিন্তু কিছুক্ষণ আগে যে টানটান ভাবটা ছিলো এখন তা নেই– ওদিকের স্লোগান ট্রোগানও আর কানে আসছে না, রাইফেলঅলাদের নিয়ে পুলিশের ট্রাকখানাও খানিক পরে চলে গেলো। তার মানে, মঞ্জু অনুমান করে, উত্তেজনা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। সে সামনের দিকে পা বাড়ায়, বুঝে নেয় ভাইয়াদের কলেজে আজ খারাপ কিছু আর ঘটবে না।

ভাইয়ার জন্য তার যে খুব চিন্তা হয়, তা নয়। শুধু সে কেন, বাড়ির কেউই ওর জন্য চিন্তায় পড়ে না। কারণ বরাবর দেখে আসছে। কেমন করে যেন ও সব কিছু গুছিয়ে নিতে পারে। মেডিক্যালে ভর্তির সময় তো কেউই ভরসা করতে পারে নি যে ও ভর্তি হতে পারবে। আব্বা মুখ ভার করে ছিলেন বেশ কয়েকদিন। কারণ ভাইয়া বুয়েটে পরীক্ষা দেয় নি, ম্যাথে ওর লেটার ছিলো, তবু না। এমনকি ইউনিভার্সিটিতে ফিজিক্সে পরীক্ষা দিয়েই সে বেঁকে বসলো। আমি আর পরীক্ষা দেবো না– দু'জায়গায় দিয়েছি, আর কতো ?

মা বলেন, সে কি রে ! যদি ও দুটোতে পাস করতে না পারিস ?

করবো, তুমি দেখে নিও, ভাইয়ার খুব শান্ত জবাব।

আব্বা বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন। বলেছিলেন, এটা কি ছেলেখেলা নাকি ? এ্যাঁ ? তুমি বুয়েটে কেন পরীক্ষা দিতে গেলে না !

ইঞ্জিনিয়ারিং আমার ভালো লাগে না আব্বা।

বড় ছেলের মুখে অমন কথা শুনে খুব চিন্তায় পড়ে যান আব্বা আর মা– সম্ভবত আশঙ্কা হয়েছিলো, ছেলেটার ভবিষ্যত বুঝি গেলো নষ্ট হয়ে।

কিন্তু দেখা গেলো, ভাইয়া সত্যি সত্যি মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হওয়ার জন্য সিলেকটেড হয়ে গেলো। শুধু তাই নয়, পেয়ে গেলো ঢাকায় থেকে পড়ার সুযোগ। তবে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে হলো না, হলো স্যার সলিমুল্লাহ মেডিক্যালে।

তার মানে মিটফোর্ড ! মা খুশিতে একেবারে আটখানা, পাশের বাড়িতে মিষ্টি পর্যন্ত বিলিয়ে বসলো।

কিন্তু হলে কী হবে, দেখা গেলো আসল মানুষটিরই মুখ ভার। কী ? না সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজ বাবুর পছন্দ নয়। ভর্তি হলো, কিন্তু ছেলে ক্লাস করার ব্যাপারে গা করে না। পীড়াপীড়ি করলে বলে, আহা ঐ কলেজে তো আমি পড়বো না, খামোখা ওখানে ক্লাস করে কী লাভ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

তার মানে ? মা আব্বা দু'জনেরই ধাঁধা লেগে যায় ছেলের কথা শুনে।

মানে আর কিছু নয়, পরে ব্যাপারটা জানা যায় যে, যারা ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের জন্য সিলেকটেড হয়েও ভর্তি হয় নি সেই সব খালি সীটে ভর্তি করা হবে সলিমুল্লাহ কিংবা অন্য কলেজে ভর্তি হওয়া ছাত্রদের, মেধার ভিত্তিতে।

গোটা ব্যাপারটা খুব শান্ত গলায় ঠাণ্ডা মাথায় সবাইকে বুঝিয়ে দেয় ভাইয়া। সবাইকে নিশ্চিন্ত করে ভর্তি হওয়ার প্রথম দিন থেকেই ভাই ক্লাস করতে আরম্ভ করে। যে ছেলে সলিমুল্লাহতে ক্লাস করতে যেতে চাইতো না, সেই ছেলেই ঢাকা মেডিক্যালে সকাল-সন্ধ্যা কাটাতে আরম্ভ করলো।

মঞ্জুর মনে পড়ে হোস্টেলে যাবার ব্যাপারেও একই রকম কাণ্ড করে তার ভাই। ফার্স্ট ইয়ারেই তার সীট হয় হোস্টেলে– কিন্তু সে ঐ সীট নেয় না। সব ছেলেই হোস্টেলে থেকে ক্লাস করে, কিন্তু রঞ্জু কেন সেভাবে ক্লাস করছে না ? তো রঞ্জুর পাল্টা প্রশ্ন, হোস্টেল কি বাড়ির চাইতে ভালো ? তাছাড়া যে হোস্টেলে জায়গা হয়েছে সেখানে খুব পার্টি পলিটিক্স হয়।

তা, তুই কি পলিটিক্স করিস না ? মা স্মরণ করিয়ে দেন। বলেন, তোর ঘরে তো দেখি খালি লেনিন, মাও আর চে গুয়েভারার বই।

ওরা তো মা অমন পলিটিক্স করে না। রঞ্জু ব্যাখ্যা করে বোঝায়। বলে, ওরা নিজেদের পার্টি নিয়ে দলাদলি করে। হয় শেখ মুজিব, না হলে জিয়া, নয়তো এরশাদ– এইসব লীডারদের গ্রুপে গ্রুপে কম্পিটিশন।

এবং সত্যি সত্যি রঞ্জু পুরোটা বছর হোস্টেলে না গিয়ে বাড়িতে থেকে ক্লাস করলো– পরের বছর অর্ধেক পার হয়ে গেলো, তখনও না। শেষে পরের বছরের শেষ দিকে ফার্স্ট এমবিবিএস পরীক্ষা শেষ হলে সে বললো, মা এবার আমি হোস্টেলে গিয়ে থাকি, তোমরা কী বলো ?

মঞ্জু মনে মনে নিজের তুলনা করে পিঠাপিঠি বড় ভাইয়ের সঙ্গে। সে দেখেছে, কিছুতেই ভাইয়ার মতো হতে পারে না। ঝামেলার ব্যাপার হলেই সে ভেতরে ভেতরে কেমন যেন গুটিয়ে যায়। হয় ভয় পায়, নইলে নার্ভাস হয়– তাতে কাজের কাজ কিছুই হয় না– বরং কাজের যেটুকু হয়েছিলো সেটুকুও যায় ভণ্ডুল হয়ে। অথচ ওদিকে ভাইয়া কেমন করে যেন সব কিছু ঠিক ঠিক মতো ম্যানেজ করে। হোস্টেলের নতুন বিল্ডিংয়ে সীট পাওয়ার পরে রুমমেটদের সঙ্গে বন্ধুত্ব জমে উঠলে সে বিছানা বালিশ বইপত্র নিয়ে বাসা থেকে বের হয়।

হাঁটতে হাঁটতে রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের পাশ দিয়ে যাবার সময় বাঁ দিকের একটা ভাঙা গাছের গুঁড়ির দিকে তাকিয়ে সে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। এই গাছটিই কি– আব্বা বলেছিলেন, অর্জুন গাছ, ঝড়ে গাছটার ডাল ভেঙে শুধু গুঁড়িটা ছিলো– অনেক দিন– যেটা দেখছে, সেটাই কিনা সে ঠিক করে বলতে পারবে না। তবে তার কেবল মনে হয় রাস্তার পশ্চিম দিকের এই গাছের গুঁড়িটাই হবে– এই গুঁড়িটা দেখিয়ে আব্বা বলেছিলেন, এই গাছ বরাবর ওপর দিকে পাশের বিল্ডিংয়ের দোতলার জানালা দিয়ে জগন্নাথ হলের কিলিংয়ের ছবি তুলেছিলেন মুভি ক্যামেরা দিয়ে ডঃ নুরউল উলা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

জগন্নাথ হলের মাঠে দাঁড় করিয়েছিলো কয়েকজন মানুষকে পাকিস্তান আর্মি– মঞ্জু দেখেছে, ছবিটা টেলিভিশনে দেখানো হয়েছিলো।

দৃশ্যটা তার স্পষ্ট মনে আছে। দাঁড় করানো লোক ক'জনার মধ্যে একজন বারবার মাটিতে বসে পড়ছিলো আর পা জড়িয়ে ধরছিলো রাইফেলঅলাদের। শুধু ঐ একজনই, অন্য সবাই বোধবুদ্ধিহীন পাথরের মতো চুপচাপ সার বেঁধে দাঁড়িয়ে ছিলো– একটুও নড়ছিলো না, যখন আর্মির লোক তিনজন রাইফেল উঁচিয়ে সামনে দাঁড়াল, তখনও না। তার জানা ছিলো না যে গুলি খাওয়া মানুষ অদ্ভুতভাবে খুব ধীরে হাঁটু ভেঙে মাটিতে পড়ে যায়। মনে হয়, শরীরের জোড়গুলো কেমন যেন খুলে আলগা করে দিয়েছে কেউ। ঝাঁকুনি খেয়ে মানুষগুলোর অমন ধীরে স্লোমোশন ফিল্মের ছবির মতো গা এলিয়ে পড়ে যাবার দৃশ্যটা সে কখনোই ভুলতে পারে না। ভাইয়া অবশ্যি বলে যে ২৬ মার্চ সকালে কলেজ গেটের মোড়েও গ্রামের তিনজন লোককে একইভাবে গুলি করে মেরেছিলো পাকিস্তানী আর্মি– তখনও নাকি একইভাবে হাত-পায়ের জোড় খুলে যাওয়া পুতুলের মতোই মানুষগুলো রাস্তার ধারে লুটিয়ে পড়েছিলো। ভাইয়া বলে, জানালা দিয়ে দৃশ্যটা সবাই নাকি দেখেছিলো। ভাইয়ার বয়স তখন পাঁচ আর তার তিন, ভাইয়ার সব মনে আছে তার মনে কিছু কিছু আছে। সেকেণ্ড ক্যাপিটেলে ডাক্তারদের কোয়ার্টারে চাচার সঙ্গে ছিলো তারা তখন, সেটা মনে আছে। ২৭ মার্চ সকাল বেলা পায়ে হেঁটে যে গ্রামের দিকে রওনা হয়েছিলো সেটাও মনে আছে– কিন্তু কলেজ গেটের হত্যাকাণ্ডের দৃশ্যটা তার মনে নেই। আব্বা বলেন, এখন নাকি ঐ ঘটনাটার কথা কেউই স্মরণ করতে পারে না। মঞ্জুর মনে পড়ে তার দাদুকেও তো পাকিস্তান আর্মি গুলি করে মেরেছে। দাদুও নিশ্চয়ই তানু চাচাদের বাড়ির সামনে গুলি খেয়ে একইভাবে ছবির মতো নিঃশব্দে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছিলো।

পুরনো রেজিস্ট্রার বিল্ডিংটা এখন জগন্নাথ হলের লোকেরা কোন কাজে ব্যবহার করে কে জানে। এই বিল্ডিংয়ের উত্তর দিকের দোতলার মাথার দিকে একটা ফোঁকর ছিলো, মঞ্জুর মনে পড়ে আব্বা ঐ ফোঁকরটাও তাকে দেখিয়েছিলেন, আব্বার বন্ধু সামাদ চাচার বইতেও ঐ ফোঁকরটার উল্লেখ আছে। আব্বা বলেছিলেন ওটা নাকি ২৫ মার্চে কামানের গোলা লেগে তৈরি হয়েছিলো। সে বারবার করে পেছন ফিরে ফিরে দেখে। না এখন ফোঁকরটার কোনো চিহ্ন নেই। ইঁট বসিয়ে পলস্তারা করে কামানের গোলার দাগ মুছে ফেলা হয়েছে।

পায়ে পায়ে হেঁটে সে ডান দিকে মোড় নেয়। রাস্তার ডাইনে দাঁড়ানো প্রকাণ্ড তেঁতুল গাছটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে। গাছের গুঁড়িখানা যেমন মোটা তেমন লম্বা। অনেকখানি ওপর দিয়ে তিনটে ডালে ভাগ হয়ে গেছে গাছটা। হ্যাঁ, দেখবার মতোই একটা গাছ বটে। আব্বা যখন ইউনিভার্সিটিতে পড়তেন, তখনও নাকি একই রকম দেখতে ছিলো গাছটা– তবে তখন নাকি পেছনের দালানকোঠাগুলো ছিলো না, তাই সবার নজরে পড়তো– এখন পড়ে না। রাস্তার বাঁ দিকে উত্তরে এসএম হলের সীমানা। লোহার গ্রেটিং দেয়া বেড়া ঘেঁসে এক সার জারুল গাছ। সীজন শেষ, তবু কোনো কোনো ডালে বেগুনী রঙের ফুল দেখা যায়। সে অনেকক্ষণ ধরে কখনো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

তেঁতুল গাছ, কখনো ঐ গাঢ় সবুজ জারুল গাছগুলো দেখে। ঐভাবে দেখতে দেখতে সে এক সময় মনে মনে কাঠবেড়ালিও খোঁজে– রাস্তার দু'দিকেই। এই তেঁতুল গাছের একডাল থেকে আর একডালে কাঠবেড়ালিদের ল্যাজ তুলে লাফিয়ে বেড়াবার কথা। কিন্তু কোথায়? আঁতিপাতি খুঁজেও সে কাঠবেড়ালির একটু ল্যাজও আবিষ্কার করতে পারে না। ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হবার পর কয়েকবারই সে এসেছে এই পথে এবং যতোবার এসেছে ততোবারই আব্বার বন্ধু হাসান চাচার লেখা উপন্যাসের বর্ণনাটা মনে পড়েছে। কিন্তু ঐ বর্ণনার কাঠবেড়ালি সে একদিনও দেখলো না। আসলেই কি ঢাকা শহরে কাঠবেড়ালি আছে? তার বিশ্বাস হতে চায় না।

আরও কতোক্ষণ ঐভাবে কাটতো তার জানে না। ওই সময় হঠাৎ একখানা নীল রঙের মোটরবাইক এসে দাঁড়ায় তার পাশে। আরোহীটি হেলমেটখানি খুলে নিলে ফেরদৌসের হাসিমুখ বেরিয়ে পড়ে– আর সঙ্গে সঙ্গে নিজের গলা দিয়ে বিস্ময়ের স্বর বেরিয়ে পড়তে শোনে সে। বলে, ফেরদৌস তুই? তুই কোত্থেকে?

ফেরদৌস জবাব না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করে, তুই এদিকে কোথায়? শহীদ মিনারে মোড়ের কাছে দেখলাম, তারপর আর খুঁজে পাই না– তোর ক্লাস ছিলো না?

না, স্যার ক্লাস নেবেন না। তুই এখন কোথায় থাকিস?

ফেরদৌস বাইক রাস্তার পাশে রেখে মঞ্জুর হাত ধরে বলে, আমি এখন হলে থাকি– শহীদুল্লাহ হলে।

শেষ পর্যন্ত কীসে ভর্তি হলি? পাবলিক এ্যাডেই? মঞ্জু জিজ্ঞেস না করে পারে না।

ফেরদৌস হাসে। বলে, সায়েন্সের কোনো সাবজেক্টে ভর্তি হতে পারতাম, সোর্স ছিলো– কিন্তু হলাম না– এখন আমি যেভাবে চলাফেরা করি, তাতে প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস করা মুশকিল হবে– বন্ধুরা সবাই বললো পাবলিক এ্যাডে ভর্তি হয়ে যা– কোনো মতে একটা ডিগ্রী নেয়া শুধু।

চলতে চলতে ডাইনে বাঁয়ে তাকায় কয়েকবার, কী দেখে কে জানে। তারপর বলে, পরে আলাপ করবো এক সময়, আমাকে এক্ষুণি যেতে হবে– যে জন্য তোকে খুঁজছিলাম সেটা বলি। তোকে আমি মেডিক্যাল কলেজের মোড় থেকে ফলো করছি, আমার সঙ্গে আরও কয়েকজন ছেলে ছিলো বলে তোর সাথে কথা বলি নি। শোন, রঞ্জু ভাইকে হোস্টেল থেকে বাড়ি চলে যেতে বলবি– ওদের হোস্টেলে খুব জোর গোলমাল হবে– ওখানে আমরা সুবিধা করতে পারছি না বলে ছাত্রলীগ আর ছাত্রদলের মধ্যে মারামারি লাগিয়ে দেয়ার চেষ্টা হচ্ছে– আমার কথা বুঝতে পারছিস তো?

কথা ওখানেই শেষ করে না ফেরদৌস। ফের বলে, আমি শুনেছি রঞ্জু ভাই ছাত্রদলের সাপোর্টার– ঐ দলের এক পাণ্ডা ওর রুমমেট। দু'জনে নাকি খুব বন্ধু–

এই পর্যন্ত বলেই সে মোটরবাইকে স্টার্ট দেয়। ঐ সময় দেখা যায়, দু'তিনখানা মোটরবাইক খুব জোর স্পীডে এসএম হলের দিকে যাচ্ছে। ফেরদৌস যেতে যেতে চিৎকার করে বলে, খবরটা আজই জানাস– দেরি করিস না।

কথা শেষ হতে না হতেই তার বাইক রাস্তার মোড়ে পৌঁছায় এবং বাঁক ঘুরে এসএম হলের দিকে চলে যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

মঞ্জু বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ফেরদৌসের চলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে থাকে। ছেলেবেলার নানান কথা মনে পড়ে ঐ মুহূর্তে। ফেরদৌস কেমন ছিলো আর এখন কেমন হয়েছে, চিন্তা করা যায় না। কেজিতে পড়ার সময় থেকে বন্ধু। তখন থাকতোও একই পাড়ায়। স্কুলে পড়ার সময়ও গলাগলি ভাব। একটা চড়ুই পাখির ছানা কাকের মুখ থেকে পড়ে গিয়েছিলো ওর সামনে– ছানাটাকে বাঁচাবার জন্যে দু'বন্ধুর সে কি চেষ্টা! যেদিন মরে যায়, সেদিন কাঁদতে কাঁদতে দু'জনে চোখমুখ ফুলিয়ে ফেলেছিলো। '৭৪-এর দুর্ভিক্ষের সময় কতোই বা বয়স হবে– ৬ কি ৭। পাড়ার অলিতে গলিতে তখন হাড্ডিসার মানুষের ভিড়। চোখ খোঁদলের ভেতরে ঢুকে যাওয়া, গাল চুপসে চোয়াল আর দাঁত বেরুনো, হাঁটতে গেলে পা টলমল করে এমন সব লোক এ বাড়ি ও বাড়ির দরজায় পড়ে থাকে– ভিক্ষে চাওয়ার শক্তিটুকু পর্যন্ত নেই। ঐ সময় রোজ সকালে দুই বন্ধুতে মিলে বাড়ি বাড়ি রুটি ভিক্ষা করতে বেরুতো। নাস্তা হয়ে যাবার পর সব বাড়িতে যে এক আধখানা রুটি বাঁচতো, সেই সব রুটি এক জায়গায় জড়ো করে দু'জনে বিলিয়ে দিতো। কলেজে পড়ার সময়ও দু'জনে বন্ধু– একই কলেজে একই ক্লাসে ছাত্র– কম্বিনেশনও এক। কিন্তু তারপরই যেন কী ঘটতে শুরু করলো। ওদের বাড়িতে নাকি ঝগড়া। ওর বাবা মা খালি ঝগড়া করে আর ফেরদৌস মন খারাপ করে এখানে ওখানে একা একা ঘুরে বেড়ায়। টেস্ট পরীক্ষার আগে আগে এমন অবস্থা হয়েছিলো যে ও বাড়িতেই থাকতো না। ঐ সময় থেকেই একটু একটু করে দূরে যাওয়া শুরু হলো। তখন থেকে ও নতুন বন্ধুদের সঙ্গে ঘোরে– মোটরবাইকও একখানা জুটে গেলো নতুন বন্ধুদের কৃপায়, ওর টাকা পয়সার অভাব আছে তা ওকে দেখলে কেউই বলতে পারবে না। এমন অবস্থা এখন ওর যে, চেনাই যায় না। কোথায় কোথায় ঘোরে ফেরে, কোথায় থাকে, কী করে, সবই ওর রহস্যে ঢাকা। বললো শহীদুল্লাহ হলে থাকে, কিন্তু রুম নম্বর কতো, তা বললো না, বাসায় কেন থাকে না, তা বললো না। ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কোনো ছাত্র হলে সিট পায় না কিন্তু ও কীভাবে পেলো সেটাও জানালো না।

ওর সম্পর্কে এখন যা ধারণা হচ্ছে তার সবই অন্যের কাছ থেকে শোনা আর অনুমান। শুধু এটুকু সে জানে যে, যারা সরকার দখল করেছে, তারা একটা দল করেছে– সেই দলকে সমর্থন করার জন্য ছাত্রদের মধ্যেও দল তৈরি করা হচ্ছে– এরা ইউনিভার্সিটির হলগুলোতে আছে, জগন্নাথ কলেজে আছে, সোহরাওয়ার্দী কলেজে আছে। এই রকম তেজগাঁ কলেজ, আবুজর গিফারী কলেজ, ঢাকা কলেজে পর্যন্ত আছে। এদের সঙ্গেই ভিড়েছে ফেরদৌস– এই পর্যন্ত সে জানে। টেস্ট পরীক্ষার আগে তাকে কিছু টাকা রাখতে দিয়েছিলো, তাতে কি বিপদেই না পড়েছিলো সে। মনে পড়লে এখনও ভয়ে তার বুক কেঁপে ওঠে। মায়ের সে কি কান্নাকাটি। আব্বা কথা বলেন না, ভাইয়া অদ্ভুত চোখে তার দিকে তাকিয়ে থাকতো। সে কি দিন গেছে তার! তারপর থেকেই ফেরদৌস একেবারে দূরে চলে গেলো। সে বুঝে উঠতে পারে না এখনও ওকে বন্ধু বলা যাবে কিনা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

কিন্তু ফের এও মনে হয়, বন্ধুই যদি না হবে, তাহলে তার ভাইয়ের বিপদ হতে পারে এমন কথা জানিয়ে সাবধান করবে কেন ?

একবার মনে হয়, এক্ষুণি চলে যায় ভাইয়ার হোস্টেলে। কিন্তু ঘড়ির দিকে নজর পড়লে তার মন সায় দেয় না। বরং সন্দেহ জাগে। বেলা ১২টার সময় অবশ্যই ওকে হোস্টেলে পাওয়া যাবে না। হয় ক্লাসে থাকবে না হয় লাইব্রেরিতে কিংবা ক্যান্টিনে। আর যদি মিটিং মিছিলে যারা গেছে তাদের সঙ্গে থাকে, তাহলে তো ধারে কাছে পৌছানো যাবে না– ভিড়ের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি করে কি সে কাছাকাছি পৌছতে পারবে? সুতরাং যদি যেতে হয় তাহলে তার যাওয়া উচিত ২টার পরে। কারণ খালি পেটে ক্লাস, লাইব্রেরি, মিটিং-মিছিল, স্লোগান, বক্তৃতা কিছুই করা যায় না।

সে ফের সামনের দিকে পা বাড়ায়। আর ঠিক ঐ সময়ই অবিশ্বাস্য দৃশ্যটা দেখতে পায়। বড়সড় ইঁদুরের মতো একটা প্রাণী তেঁতুল গাছের নুয়ে পড়া ডাল থেকে ঝুপ করে মাটিতে পড়লো, তারপর পড়েই লাফাতে লাফাতে দৌড় দিলো একটা। লাফাবার সময় লম্বা ভাবে দাগানো ল্যাজখানা উঁচানোই রইলো– তবে ল্যাজের ডগাটুকু নুয়ে নুয়ে মাটি ছুঁয়ে গেলো। প্রাণীটার কাণ্ড দেখে সে হেসে ফেললো। তার চিনতে একটুও অসুবিধা হয় না। তবে চিড়িয়াখানায় দেখা, ছবিতে দেখা কাঠবেড়ালিকে খোলামেলা জায়গায় দেখতে অন্যরকম কেন লাগছে, সে ভেবে পায় না।

রাস্তা পার হয়ে কাঠবিড়ালিটা ঝোপ ঝাড়ের ভেতর দিয়ে এসএম হলের পাঁচিলের ওপর উঠে যায়। তারপর পেছনের দুই পা আর ল্যাজের ওপর ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ায়– তারপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ডাইনে বাঁয়ে তাকাতে তাকাতে সামনের পা দু'খানি মুখের কাছে তুলে কি যেন খায়। আসলে কিছু খায়, না মুখ মোছে বোঝা যায় না।

দেখতে ভারী মজা লাগে মঞ্জুর। ছোট্ট একটা প্রাণী, তবু পাঁচিলের ওপর অমন অদ্ভুত ভঙ্গিতে বসে, না দাঁড়িয়ে, বলা মুশকিল, কী যেন খেয়ে যাচ্ছে তো খেয়েই যাচ্ছে– খাওয়া তার শেষ হয় না। অথবা মুখ মুছছে তো মুছেই চলেছে, মুখ মোছা আর শেষ হয় না। মঞ্জু পায়ে পায়ে হেঁটে রাস্তার পীচঢালা বিস্তারটুকু পার হয়ে একবারে মাটি আর ঘাসের ওপর গিয়ে দাঁড়ায়, কিন্তু তবু কাঠবিড়ালির হুঁশ হয় না– একইভাবে পেছনের পা আর ল্যাজের ওপর ভর দিয়ে বসে অথবা দাঁড়িয়ে সামনের দুই পা মুখের কাছে নিয়ে অজানা কোনো খাদ্যবস্তু খেয়ে চলে অথবা নিজের সরল মুখখানা, অনবরত মুছতে থাকে। কতোক্ষণ ধরে ঐ ভাবে দৃশ্যটা সে দেখছিলো, খেয়াল ছিলো না। হঠাৎ মেয়েলি হাসির শব্দে তার সম্বিৎ ফেরে আর কানে আসে কে যেন সাগ্রহে বলছে কাকে, দ্যাখ দ্যাখ কেমন অদ্ভুত কাণ্ড! দেখতে পাচ্ছিস না ?

ওমা, ওটা কী রে! এ্যাঁ ? ভারি মজার তো! আর একজন বোধহয় পাশ থেকে বলে। মুখ ঘুরিয়ে তাকালে মঞ্জু দু'টি মেয়েকে দেখতে পায়, তারা তারই মতো রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে। আবার একজন বলে, ওমা, চলে যাচ্ছে, দ্যাখ সত্যি সত্যি চলে যাচ্ছে।

একজনের কথায় হতাশ হওয়ার ভাব ফুটলে মঞ্জু দেখে, কাঠবিড়ালিটা বেড়ার ওপর দিয়ে ল্যাজ তুলে লাফাতে লাফাতে জারুল গাছের ঘন ডালপালার আড়ালে ঢুকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

গেলো। তার মানে খেলা শেষ। মঞ্জু সামনের দিকে এগোবার জন্য পা বাড়াতে না বাড়াতেই কাঠবেড়ালিটা লাফ দিয়ে বেরিয়ে আসে আড়াল থেকে। একটি মেয়ে উচ্ছ্বাসে চিৎকার করে ওঠে, ওমা দ্যাখ বেরিয়ে এসেছে, ঈশ্ কী সুন্দর!

ততোক্ষণে একেবারে খোলা জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে কাঠবেড়ালিটা এবং একইভাবে দাঁড়িয়ে ডাইনে বাঁয়ে মুখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কী যেন দেখতে থাকে।

মেয়ে দু'টির একজন বলে, ওভাবে কি দ্যাখে বল তো? আমাদের? আচ্ছা ওটা কী বল তো? ফের প্রশ্ন করে মেয়েটি। বলে, ইঁদুর? আচ্ছা ইঁদুরের মতোই তো দেখতে লাগছে, তাই না?

যাহ্ ইঁদুর কেন হবে, পাশের মেয়েটি নিজের জ্ঞান জাহির করে। বলে, কেন, জু-তে দেখিস নি? স্কুইরেল-এর কথা ইংরাজি কবিতা লিইজার-এ পড়িস নি! ঝোপের আড়ালে স্কুইরেলদের নাট্স লুকিয়ে রাখার বর্ণনা মনে নেই?

কী যে বলিস! দ্বিতীয় মেয়েটিও কম যায় না। বলে, ইংরাজি কবিতায় কাঠবেড়ালি কেন খুঁজতে হবে? নজরুলের কবিতায় কাঠবেড়ালি আছে পড়িসনি?

আচ্ছা ওটা কি অনেকক্ষণ ধরে ওখানে আছে? আপনি তো দেখেছেন।

মঞ্জু এবার মুখোমুখি হয়। কারণ প্রশ্নটা তাকেই করা।

সে একটু থতমত খায়। একেবারে অচেনা মেয়ে তার সঙ্গে এভাবে সোজাসুজি কথা বলবে, তার অবিশ্বাস্য লাগে।

সে খানিক আমতা আমতা করে, তোৎলায়ও– অস্বাভাবিক কিছু হলেই ওকে তোতলামিতে পায়। তবু থেমে থেমে সে বলে হ্যাঁ, অনেকক্ষণ হয়ে গেলো এই তেঁতুল গাছটায় ছিলো। গাছ থেকে লাফিয়ে নেমে দৌড় দিলো একটা। তারপর উঠলো পাঁচিলের ওপর।

আপনি আগেও দেখেছেন, তাই না? দ্বিতীয় মেয়েটি এবার দু'পা এগিয়ে এসে মুখোমুখি হয়। তারপর চোখের দিকে তাকিয়ে জানতে চায়, এখানেই দেখেছেন, এই ভাবেই?

না, আগে দেখি নি, আজই প্রথম।

কি অদ্ভুত! ভাব তো? প্রথম মেয়েটি খুশিতে জ্বলজ্বল মুখে বলে, ঢাকায়, মানে একেবারে দ্য ক্যাপিটাল সিটি অব এ সভারেন কান্ট্রি– সেই ক্যাপিট্যাল সিটির পশ এরিয়ায় ওয়াইল্ড স্কুইরেল লাফিয়ে বেড়াচ্ছে। জু-তে নয়। একেবারে ওপেন জায়গায় ঝোপ ঝাড়ের মধ্যে– উহ্ কী অদ্ভুত! ভাবতেই কেমন লাগে।

মঞ্জুর হাসি পায় মেয়েটির অমন উচ্ছ্বাস দেখে। সে লোভ সামলাতে পারে না। বলে সিটির সবচাইতে পুরনো এলিট পিপলের এরিয়াতে কিন্তু বানরও আছে।

কী বললেন? দুই সখী সামনের দিকে পা বাড়িয়েও থেমে যায়।

একজন বলে, সত্যি বলছেন? পুরনো ঢাকায় বানর আছে? মানে, বনে জঙ্গলে যেমন থাকে, ওয়াইল্ড?

মঞ্জুর হাসি পায়। তবু সে বলে, হ্যাঁ, পুরনো ঢাকার গেণ্ডারিয়া-নারিন্দা এলাকায় অনেক বানর দেখা যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ওদিকে কি অনেক বন জঙ্গল ? মেয়েটি ফের জানতে চায়। আর তাতেই যেন প্রথম মেয়েটির চোখেমুখে কৌতুক ঝিলিক দিয়ে ওঠে। মুখটিপে এক চিলতে হাসে প্রথমে তারপর মঞ্জুকে বলে, আপনি ওদিকেই থাকেন ?

তার মানে ? মঞ্জু থমকায়। ভাবে, মেয়েটা কি তাকে বানর বললো ? তার আফশোস হয়, বানরের খবরটা না জানালেই পারতো।

মেয়ে দু'টি সামনের দিকে হাঁটতে শুরু করে। মঞ্জু মনে মনে স্মরণ করতে চেষ্টা করে। কার্জন হল এলাকায় ওদের কখনও দেখেছে কিনা। উঁহু, তার স্মরণ হয় না। অনুমান করে, তাহলে কি বুয়েট-এর ছাত্রী ? না ইডেনের ? নাকি আর্টস বিল্ডিং-এর ?

সে জিজ্ঞেস করতে পারে না। ততোক্ষণে ওরা অনেক দূর এগিয়ে গেছে।

দুপুরে বাইরে থেকে ঢুকলে বৃটিশ কাউন্সিলের ভেতরটা খুব ঠাণ্ডা লাগে। রীডিং রুমের দিকটা ঠাণ্ডাও আবার চুপচাপও। তবে একেবারে যে নিঃশব্দ তা কিন্তু নয়। খুব দূরে নিচু গলায় কারা যেন অনবরত কথা বলে যায় আর সেই কথা বলার আওয়াজ খুব ধীর লয়ে বৃটিশ কউন্সিলের ভেতরে বাতাসে ভেসে বেড়ায়, কখনো আবার ঠাণ্ডা মেঝেতে লুটোপুটি খায়। হারমেন ব্লিৎস-এর হিউম্যান জিওগ্রাফি বইখানার নাম্বার ক্যাটালগে খুঁজে বার করতে তার না হলেও মিনিট পনেরো সময় লেগে যায়। তারপর বই নিয়ে টেবিলে বসতে বসতে আরও দশ মিনিট লাগে। বই খুলে নজরুল স্যারের উল্লেখ করা হার্থ অব সিভিলাইজেশন চ্যাপ্টার বার করে তার ম্যাপখানার দিকে সে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে। দেখে সত্যি সত্যি পৃথিবীর ম্যাপের ওপর ৮টি জায়গায় চিহ্ন দেয়া রয়েছে– তার একটি চিহ্ন একেবারে ঠিক ঠিক বাংলাদেশ এলাকার ওপর। তার মানে বাংলাদেশের সভ্যতা খুবই প্রাচীন। কতো প্রাচীন ? প্রত্ন প্রস্তর যুগের আরম্ভ কি এই এলাকায়ও হয়েছিলো ? প্লেইস্টোসেন যুগের প্রথম দিকে ? নাকি মাঝামাঝি সময়ে, নাকি একেবারে শেষের দিকে ?

নজরুল স্যার ক্লাসের বাইরে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে নানান বিষয় নিয়ে আলাপ করেন। তাঁর প্রিয় বিষয় এ্যানথ্রোপলজি, কতো রকমের যে কথা বলেন, আদি মানুষের কাণ্ড কীর্তি নিয়ে সে সবের অনেক কিছুই সে বুঝতে পারে না– কিন্তু বলেন এমন সুন্দর করে যে, মনোযোগ না দিয়ে পারা যায় না– আর ঐ সূত্রেই তার কৌতূহল। বইয়ের ভেতরকার ম্যাপখানা ছোট, তবু সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে। নাইল, ইউফ্রেতিস, তাইগ্রিস, ইন্ডাস, সিকিয়াং, ভোলগা– সমস্ত বড় নদীর ভ্যালিগুলোর ওপর চিহ্নগুলো দেয়া। গ্যাঞ্জেস ভ্যালির ওপরকার চিহ্নটাকে সে মনোযোগ দিয়ে দেখে। চিহ্নটা কি গোটা বাংলাদেশ জুড়ে পড়বে ? নাকি একটা অংশে পড়বে, যদি কোনো অংশে পড়ে, তাহলে সেটা কোন অংশে ? পুবে না পশ্চিমে ? সে মনে মনে ঠিক করে স্যারকে সে জিজ্ঞেস করবে গ্যাঞ্জেস ভ্যালিও যদি হার্থ অব সিভিলাইজেশন হয়ে থাকে তাহলে সভ্যতার সেই রান্নাঘরটা কোনদিকে ? পুবে না পশ্চিমে উৎসের কাছে, না সমুদ্র সঙ্গমের কাছে ?

বইয়ের একটা করে পৃষ্ঠা উল্টে উল্টে সে চোখ বোলাতে থাকে। কতোক্ষণ পৃষ্ঠা উল্টেছে জানে না, হঠাৎ দরজার কাছে চাপা স্বরের ডাক শুনে সে ঘুরে তাকায়। দেখে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

একটি ছেলে পারভেজ নাম ধরে কাকে যেন ডাকছে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পাশের টেবিলের ছেলেটি উঠে দাঁড়ালে চাপা গলায় বলে, মেডিক্যালে খুব মারামারি হচ্ছে, শিগগির চল। এক সেকেণ্ডও দাঁড়ায় না তারপর– দু'জনেই খুব তাড়াতাড়ি ছুটে বের হয়।

মঞ্জু তখনও পৃষ্ঠা উল্টে চলেছে। নাইল ভ্যালিতে সভ্যতার সূচনা কোন সব ভৌগোলিক কারণের জন্য হয়েছিলো– সেগুলো পড়ে দেখছিলো এক এক করে। কিন্তু ছেলে দু'টি ঐভাবে চলে যাওয়ার পর সে আর মনোযোগ দিতে পারে না। সে ডাইনে বাঁয়ে তাকালো কয়েকবার। একবার দেখলো গাঢ় লাল আর সবুজ রঙের স্কার্ট পরা একটি মেয়ে বুকের কাছে মোটা-সোটা কয়েকখানা বই ঘরে রেখে কাউন্টারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে– আবার দেখলো, তেঁতুল তলায় কিছুক্ষণ আগে যাদের দেখেছিলো– ওরাই কাউন্টারের লোকটির সঙ্গে কী কী যেন বলে চলেছে– একটি ছেলে হঠাৎ ত্রস্তব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে গেলো।

সে ঘড়ির দিকে তাকায়, বেলা একটা। কিছুক্ষণ আগে ছেলে দু'টিকে অমন তাড়াতাড়ি যেতে দেখলো বটে, কিন্তু তার বিশ্বাস হতে চায় না। কারণ মেডিক্যাল কলেজের গেটের কাছে কী হয়েছে, সেটা তো সে দেখে এসেছে, কতোক্ষণ আগে আর? এই তো ঘণ্টা খানেক কি ঘণ্টা দেড়েক আগে। এরই মধ্যে আবার মারামারি লেগে যাবে? নাহ্ তার বিশ্বাস হতে চায় না।

ফের মনে হয়, মারামারিটা তো আপনা থেকে লাগবে না, ওটা লাগানো হবে। তাহলে মারামারি তো লাগবেই– আর যদি লাগে, তাহলে সেই মারামারিতে কি ভাইয়া থাকবে ? যদি থাকে ?

তার বুকের ভিতরে ধড়াস করে ওঠে। ফের পরক্ষণে মনে হয়, নাহ্ ভাইয়া কেন ছাত্রলীগ আর ছাত্রদলের মারামারির মধ্যে থাকবে– ও চাঁদা টাদা যা তোলে সব তো বামপন্থীদের জন্যে। ওর রুমমেট যা-ই করুক, ও ছাত্রদল ছাত্রলীগ কোনোটাই করবে না। কথাটা মনে হওয়াতে সে আশ্বস্ত বোধ করে। কিন্তু সে আর কতোক্ষণ ? খানিক পরই ফেরদৌসের কথা মনে পড়ে। আর তখনই চিন্তা হয় যদি সত্যি সত্যি ও রুমমেটের সঙ্গে চলে গিয়ে থাকে ঐ মারামারির সময় ? কিংবা এমনও তো হতে পারে, ও কোথাও যায় নি তবু শুধু মনিরের সঙ্গে বন্ধুত্ব থাকার জন্যেই ওর ওপর হামলা হয়ে গেলো। হতে পারে না কি ?

চিন্তাটা মনের ভিতরে পাক খেয়ে উঠলে সে আর বসতে পারে না। বইখানা নিয়ে কাউন্টারে রাখে। আর সঙ্গে সঙ্গে পাশ থেকে তেঁতুল তলায় দেখা মেয়ে দু'টির একজন বলে ওঠে, আরে, আপনি ? এখানে রোজ আসেন ?

আপনি কি সত্যি সত্যি সেই গেণ্ডারিয়া না গণ্ডারিয়া কি যেন বললেন জায়গাটার নাম, সেই ওখান থেকে আসেন ?

দ্বিতীয় মেয়েটির কথা শুনে মঞ্জু হাসে– কিছু বলে না জবাবে। তবে প্রথম মেয়েটির প্রশ্নের জবাব সে দেয়। বলে, না রোজ আসি না– আপনি ?

আমিও না, মেয়েটি জবাব দিয়ে জানতে চায়, আপনি কী পড়েন ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

জিওগ্রাফি, আপনি ?

হিস্ট্রি।

মঞ্জু আর কথা বাড়ায় না। বলে, আচ্ছা এখন যাই, আমার একটু তাড়া আছে, কিছু মনে করবেন না।

কথা ক'টি বলেই সে ছুটতে ছুটতে বের হয়।

প্রথমে যায় হোস্টেলে। গিয়ে দেখে হোস্টেল খুব চুপচাপ। একজন দু'জন করে ছাত্র অথবা ইন্টার্নি ডাক্তাররা ঘরে ফিরছে। সে ভাইয়ার রুমের দরজায় মস্ত একটা তালা ঝুলছে দেখতে পায়। তখন কী করবে বুঝতে না পেরে বারান্দার কার্নিশে হাত রেখে সে দাঁড়ায়। তাকে ঐভাবে দাঁড়াতে দেখেই সম্ভবত পাশের রুমের একজন বেরিয়ে এসে বলে, রাজিব ক্লাস থেকে ফেরে নি এখনও, তুমি রুমে গিয়ে বসো। মনে হয় এক্ষুণি এসে যাবে।

কলেজে শুনলাম মারামারি হয়েছে ? মঞ্জু জিজ্ঞেস না করে পারে না।

হ্যাঁ, বেশ গোলমাল হয়েছে, ছাত্রদল আর ছাত্রলীগের ক্ল্যাশ– একজন স্ট্যাবড। পাঁচজনের মাথা ফেটেছে, দু'জনের অবস্থা বেশ খারাপ।

আমার ভাই ? মঞ্জু ছেলেটির মুখের দিকে তাকায়।

না, ওর কিছু হয় নি, ছেলেটি জানায়। বলে, মনিরের রুমমেট আর বন্ধু বলে ওর উপরেও হামলা হতে পারতো, তবে হয় নি– অবশ্যি এখনও কিছু বলা যাচ্ছে না– কারণ লীগ-এর ছেলেরা কলেজের ভেতরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

মঞ্জু বেশ দিশেহারা বোধ করে। তার থেকে থেকেই মনে হয়, ভাইয়ার নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে– কিছু না হলে অন্য সবার মতো ওরও তো রুমে ফিরে আসার কথা।

সে জিজ্ঞেস করে, সত্যি জানেন, আমার ভাই কোনো ঝামেলায় পড়ে নি ?

ছেলেটিকে ইতস্ততঃ করতে দেখে মঞ্জু আর দাঁড়ায় না। ছুটতে ছুটতে মেডিক্যাল কলেজের দিকে রওনা হয়। নার্সেস কোয়ার্টারের পেছন দিকের গেট দিয়ে মেডিক্যাল কলেজের গেটে পৌছাতে পারে। তারপর আর ভিতরে যেতে পারে না। গেটের মাঝখানে আর্মড পুলিশ দু'হাত মেলে ধমকে ওঠে। বলে, ভেতরে যাবেন না– ভেতরে যাওয়া নিষেধ।

দেখা যায় গেট থেকে ভিতরের গাছের ছায়ায় ঢাকা রাস্তাটা একেবারেই ফাঁকা– কলেজের ভেতরে মানুষ আছে কিনা বোঝা যায় না। টহলদার পুলিশ ক'জন ছাড়া একটা মানুষও চোখে পড়ে না।

হঠাৎ কলেজের ভেতরে কোন দিক থেকে যেন একটা চিৎকার শোনা যায়। তারপরই মনে হয় দোতালার বারান্দায় কারা যেন ছুটোছুটি করছে– কাচ ভাঙার শব্দ হয়। প্রচণ্ড শব্দে একটা পটকা ফাটে ভেতরেই কোথাও। পুলিশের লোকদের বন্দুক উঁচিয়ে ভেতরে যেতে দেখা যায়।

মঞ্জু মনে মনে অস্থির হয়ে পড়ে। বুঝতে পারে না, কীভাবে খবর পাবে– ভাইয়া কলেজ বিল্ডিং-এর ভেতরে না বাইরে। ঐ মুহূর্তে তার একটা কথাই মনে হয় যে, খবরটা আব্বাকে এক্ষুণি জানানো দরকার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

কথাটা মনে হতেই সে ঘুরে দাঁড়ায় এবং দেখে রঞ্জু তার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

অদ্ভুত ছেলে তুই, রঞ্জু বলে, এখানে কেন এসেছিস?

মঞ্জু ভাইয়ের চোখের দিকে তাকিয়ে বলে, হোস্টেলে পেলাম না, তাই–

হুঃ কী বুদ্ধি। রঞ্জু ফের বলে, ছাগল কোথাকার। কলেজে মারামারি হচ্ছে, আমরাই আসি না, তুই এসেছিস কোন সাহসে?

মঞ্জু বলে, দরকার আছে, তাই এসেছি, শোন, ওদিকে চল।

মানুষের জটলা থেকে বেরিয়ে ফাঁকা জায়গায় এসে দাঁড়ায় দু'জনে। এবার বল, কী? রঞ্জু ছোট ভাইয়ের হাত ধরে। ভাইয়ের শুকনো মুখচোখ দেখে বোধহয় মায়া হয়। বলে, কিছু খেয়েছিস? আয় ক্যান্টিনে যাই। ছোট ভাইয়ের ঘাড়ে হাত রেখে সে হাসপাতালের ক্যান্টিনের দিকে পা বাড়ায়।

যেতে যেতেই কথাটা বলে মঞ্জু। বলে, তোকে ওরা ছাত্রদলের সাপোর্টার ভাবে, তোর রুমমেটের ওপর হামলা করবে– তখন যদি তোকে পায়, তাহলে তোকেও ছাড়বে না।

হুঁ। রঞ্জু কিছুক্ষণ কথা বলে না। তারপর সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে বলে, তোকে কে বললো খবরটা।

ফেরদৌসের নাম বলতেই রঞ্জু দাঁড়িয়ে পড়ে। ভাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, এখনও তুই ঐ রাস্কেলটার সঙ্গে মেলামেশা করিস? তোকে না আব্বা মা দু'জনেই বলেছেন ওর সঙ্গে না মিশতে!

মঞ্জু কোনো কথা বলে না, বেশ কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে চারদিকের খেতে আসা মানুষ দেখে। তারপর বলে, ফেরদৌসের সঙ্গে ৫/৬ মাস পর আজ দেখা– ও-ই দেখা করে খবরটা বললো– তাই তোকে জানালাম এখন শুনলে শুনবি, না শুনলে না শুনবি।

ক্যান্টিনে বসায় বটে ভাইকে, কিন্তু তার গম্ভীর রাগী মুখ দেখে রঞ্জুর বিরক্তি লাগে। বলে, ফেরদৌসের সঙ্গে মিশতে বারণ কেন করি তুই বুঝতে পারিস না? খবরের কাগজ পড়িস না? হাইজ্যাক, ছিনতাই, মিটিং ভাঙা, মানুষ খুন করা, এসব কারা করে জানিস না?

সব দলেই আছে অমন লোক, মঞ্জু মুখ নিচু করে বলে।

হ্যাঁ আছে। থাকবে, তাই বলে ওদের সঙ্গে মিশতে হবে?

ভাইয়ের কথার জবাবে মঞ্জু কিছু বলে না, একইভাবে গুম হয়ে বসে থাকে।

ঐ সময় খাবার আসে– দু'টুকরো কেক আর দুটো সিঙ্গাড়া– দুই ভাই মিলে চুপচাপ খায়। তারপর চা আসে, তাও খাওয়া হয়ে যায়– কিন্তু কথা হয় না খাওয়ার পুরোটা সময় জুড়ে।

চায়ে শেষ চুমুক দিয়ে ঘড়ির দিকে তাকালে রঞ্জু জিজ্ঞেস করে, কোথাও কি যাবি?

না, ক্লাস আছে, কথাটা বলেই মঞ্জু উঠে দাঁড়ায়। তারপর দরজার দিকে পা বাড়াতে বাড়াতে বলে, তুই কি হোস্টেলেই থাকবি? মাকে কী বলবো?

রঞ্জু ভাইয়ের চোখে চোখে তাকিয়ে বলে, মাকে আব্বাকে কিচ্ছু বলবি না– হোস্টেলের অবস্থা কেমন হবে সেটা আমি ভালো বুঝি। তোর ঐ ভাড়াটে মাস্তান বন্ধু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

আর কতোটুকু খবর রাখে ? আমি তোকে আরও খবর দিতে পারি। ওকে বলিস, ওদের দলের ভেতরেই খুনোখুনি শুরু হয়ে যাবে শিগগির– ও যেন সাবধানে থাকে।

ছোট ভাইকে হাসপাতালের বড় গেট পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে রঞ্জু ফের হোস্টেলের দিকে ফেরে।

সকাল থেকেই বড্ড ধকল যাচ্ছে রঞ্জুর। এক তো মনিরকে সামলানো দায় হয়ে উঠেছে। খবিরউদ্দিন সাজিদকে ছুরি মারার পর থেকেই ও ভয়ানক ক্ষেপে উঠেছে। বলছে, ওরা ছুরি মারামারি করতে পারে, আমি পারি না ? চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ থেকে তদ্বির করে ট্রান্সফার নিয়ে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হওয়ার পর থেকেই খবিরউদ্দিন দল পাকাচ্ছে। একে মারে, ওকে অপমান করে, তার জিনিস নিয়ে গায়েব করে দেয়– এই রকম একটার পর একটা ঘটনা ঘটিয়ে চলেছে। এতোকাল সন্দেহ করা হতো, ওর সঙ্গে সরকারী দলের যোগাযোগ আছে– এখন তো দেখা যাচ্ছে, সন্দেহটা একেবারে অমূলক নয়। মেডিক্যালের ছাত্রলীগ তো মারামারির মধ্যে ছিলো না– খবিরউদ্দিন আসার পর এখন মারামারি আরম্ভ হয়ে গেছে। ফেরদৌসের দেয়া খবরটা জানার পর তার মনে হচ্ছে– খবিরউদ্দিনের সরকারী দলের পক্ষ হয়ে কাজ করাটাই আসল ঘটনা।

মনিরকে খুঁজে পেলো সে হোস্টেলের রুমে। তিন জন বন্ধুকে নিয়ে আড্ডা দিচ্ছিলো। দু'জন ইউনিভার্সিটির, একজন বুয়েট-এর। সবাই ছাত্রদল করে। রঞ্জুর সঙ্গে ওদের ভালো জানাশোনা। সবারই মুখে এক প্রশ্ন– ছাত্রলীগের এমন হঠাৎ মারমুখী হয়ে ওঠার কারণ কী ?

রঞ্জুর কাছে তারা জানতে চায়। কিন্তু তার ভালো লাগে না বারবার এক কথা বলতে। সে কেমন করে বোঝাবে যে, দেশ শাসনের গোড়াতে যারা বসে আছে তাদের পেছনেও লোক আছে। আর তারাই নানা কায়দায় আসল কলকাঠি নাড়ায়। সরকারের বিরোধী শক্তি সবাই যদি এক হয়ে যায়, তাহলে তাদের মুশকিল। সেই জন্যেই তারা কিছু লোক এ পার্টিতে যদি রাখে তো, ও পার্টিতেও তাদের লোক রাখতে হয়। সুতরাং মারামারি লাগানোর কাজটা করার জন্য লোক এখন সব পার্টিতেই পাওয়া যাবে। মঞ্জুর কাছ থেকে শোনা খবরটা সে একটু অন্যভাবে জানায়। বলে, ছাত্রলীগের বড় একটা সেকশন মারামারি করার পক্ষে।

তাহলে আমরাও কি হাত গুটিয়ে বসে থাকবো ? ইউনিভার্সিটির পান্না বলে ওঠে। বলে, ওদের আর্মড ক্যাডার আছে, আমাদের নেই ? ওরা মার দিতে এলে আমরাও যে মার দিতে পারি, সেটা কি ওরা বোঝে না ?

না, বোঝে না, রঞ্জু হাসতে হাসতে বলে, বুঝলে অবশ্যই মারামারি করার কথা ভাবতো না। ইলেকশনের আগে কী ছিলো অপজিশন-এর অবস্থা চিন্তা করো ? এখন কি তেমন আছে ?

বাহ্ কেমন করে থাকবে ? একদল তো চলে গেলো ইলেকশন করতে–

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

মনিরের কথার জবাবে বুয়েট-এর হাসিব বলে ওঠে, কিন্তু এখন ? এখন তো ওরা পার্লামেন্ট-এ যাচ্ছে না– রাস্তায় আছে, এখন মারামারি কেন হবে ?

হ্যাঁ, ঐখানেই আসল ব্যাপার, রাস্তার ইউনিটি যেন না হয়– রাস্তায় রাস্তায় যেন মারামারি হয়, তারই ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

রঞ্জুর কথা শুনে সবাই তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। সে ফের বলে, দেখে নিও তোমরা ২/৪ দিনের মধ্যে সব জায়গায় দু'দলে– মারামারি শুরু হয়ে যাবে।

কথা বলতে বলতে সন্ধ্যা হয়ে যায় আর তখন বিদায় নেয় বন্ধুরা। রঞ্জু মনিরকে নিয়ে দোতলা থেকে নিচে নামে। গেটের কাছে দেখা হয়ে যায় আলাউদ্দিনের সঙ্গে। ওকে দেখলেই মনির ক্ষেপে যায়। আজও ক্ষেপলো, কারণ দেখলো ইডেনের সেই মেয়েটিকে নিয়ে সে হোস্টেল থেকে বেরুচ্ছে। যাকে নিয়ে সে নানান জায়গায় ঘোরে ফেরে। বলে, ও নাকি খালাতো বোন।

হুঃ খালাতো বোন! মনির ফুঁসতে ফুঁসতে বলে, শালা মেয়েটাকে নিয়ে হোটেলে দুপুর কাটায়– আর বলে খালাতো বোন!

কেন, খালাতো বোনকে বিয়ে করা যায় না ? রঞ্জু হাসতে হাসতে বলে, ও তো বিয়ে করার জন্যে খালাতো বোনকে হোটেলে নিয়ে যায়!

তুমি বিশ্বাস করো রাস্কেলটাকে ? মনির ফের ফুঁসে ওঠে।

তবে মনির মুখোমুখি কিছু বলে না। আজও বললো না। আলাউদ্দিন দু'জনকে একসঙ্গে দেখে দাঁত বের করে হাসলো। তারপর খালাতো বোনের হাত ধরে রিকশায় উঠে কোথায় যেন চলে গেলো।

নিচতলার বারান্দায় ঐ সময়ই রঞ্জুর চোখে পড়ে এক সঙ্গে তিনজনকে– ওদের মধ্যে দু'জনই ইউনিভার্সিটির এবং ছাত্রলীগের। একজন হাসু। একজন মিনার। তৃতীয় জনকে সে চেনে না। রঞ্জুর খটকা লাগে। বলে, ওরা আজ এখানে কেন ? দুপুরে অতো কাণ্ড ঘটে যাবার পর ওদের তো এখানে আসার কথা নয়।

দূর, তোমার যতো বাজে চিন্তা, মনির বিরক্ত হয়ে বলে, বন্ধুবান্ধবের কাছে আসবে না ?

রঞ্জু হাসে। বলে, হ্যাঁ, গত মাসে যেমন তোমরা গিয়েছিলে ওদের হোস্টেলে, ঠিক না ?

গত মাসেই প্রথম গোলমালটা শুরু হয়, ফজলে রাব্বি হল থেকে– সেই গোলমালের মধ্যে মনিরও ছিলো। রঞ্জু স্মরণ করিয়ে দিলে মনির লজ্জা পায় কিছুটা। কিন্তু তবু বলে, সে যা হবার, সে তো হয়ে চুকে বুকে গেছে সেদিনই– আমাদের দিক থেকে তো আর কিছু হয় নি, হয়েছে, বলো তুমি ?

রঞ্জু যতোবার হুঁশিয়ার হবার ইঙ্গিত দেয় ততোবারই মনির হাসে। বলে, আমাকে কেন সাবধানে থাকতে হবে বলো ? আমি তো চাঁদা তুলি না, টেণ্ডার বাগাই না, ভাড়া খাটি না– শুধু শুধু আমি কেন ভয় পাবো ?

মনির ভয় পায় না। রঞ্জুরও মনে হয়, আসলেই বোধ হয় ভয় পাবার মতো কিছু ঘটে নি। সে রাতে তারা তাড়াতাড়ি বাতি নিভিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। কারণ সারাদিনের ছোটাছুটি আর উত্তেজনায় শরীর মন দুই-ই হয়ে পড়েছিলো অবসাদে ভারী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

আর সেদিনই মাঝরাতে দরজায় ধাক্কার আওয়াজ পেয়ে দু'জনেই জেগে ওঠে। মনির কিছু বুঝতে পারে না– কিন্তু রঞ্জু ঠিকই বুঝতে পারে। বাইরে জ্যোৎস্না ছিলো, গাছপালার ফাঁক গলে সেই জ্যোৎস্না জানালা দিয়ে ঘরের ভিতরেও এসে পড়েছিলো– ঐ মধ্যরাতে আবার আশ্বিনের বাতাসও বয়ে যাচ্ছিলো খুব জোরে।

ওই সময় নিঃশব্দে দরজা খুলে পিছনের ব্যালকনিতে বেরিয়ে আসে দুই ছায়ামূর্তি, তারপর রেলিং ধরে ঝুলে পড়ে নিচের দিকে। ৯/১০ ফিট উপর থেকে নিচে মাটিতে পড়লে আওয়াজ হয় কিনা নিজেরাই টের পায় না। তারপর মধ্যরাতের নির্জন রাস্তা ধরে দৌড়ে গিয়ে পৌছায় হাসপাতালে। তখন ডিউটির ডক্টরস কেবিনে বসে হাঁপাতে হাঁপাতে রঞ্জু বলে, মঞ্জুর দেওয়া খবরটা সত্যি ছিলো মনির।

মনির বিভ্রান্ত চোখ তুলে জিজ্ঞেস করে, কোন খবর ? কি খবর দিয়েছিলো মঞ্জু ?

রঞ্জুর হুঁশ হয় তখন। এক মুহূর্ত ভাবে, বলবে কী বলবে না– ফেরদৌসের সঙ্গে মঞ্জুর বন্ধুত্বের খবরটা জানানো কি ঠিক হবে ? সিদ্ধান্ত নিতে তার দেরি হয় না। বলে, নাহ্ বাদ দাও– এটা অন্য খবর। আমাদের ফ্যামিলির ব্যাপার– তোমাকে জানাবার মতো কিছু নয়।

পাঁচ

বসার ঘর বেশ বড়, ডবল সোফা সেট, ডিভান, মাঝখানে কার্পেট; কয়েকটা মোড়াও আছে এ কোণে ও কোণে। দেওয়ালে বেশ বড় ছবিঅলা ক্যালেণ্ডার– সী বীচে বিকিনি পরা দু'টি মেয়ে পিছন ফিরে তাকিয়ে হাত নাড়ছে। এক দিকে একোরিয়ামও দেখা যায়, সেখানে সবুজ পানিতে লম্বা ল্যাজঅলা কয়েকটা আর কয়েকটা লম্বা পাখনাঅলা মাছ অলস ভঙ্গিতে চরে বেড়াচ্ছে। বাঁধানো বইভর্তি বুককেসের ওপর কিছু মাটির পুতুল। গোটা দুই নকশা করা কলসী, আর একখানা মাস্তুলঅলা স্পানিশ, না ব্রিটিশ, নাকি ওলন্দাজই হবে হয়তো, খেলনা জাহাজ সাজানো। ডান দিকের এক কোণে টিভি, ট্রলির মতো তাকঅলা টেবিলের ওপর, নিচের তাকে ভিসিআর অথবা ভিসিপি জাতীয় চৌকোনা চ্যাপ্টা বাক্স দেখা যায়। টিভির ওপরে দেয়ালে রবীন্দ্রনাথ আর নজরুলের ছবি– পাশাপাশি ছবি দু'খানা কেন লটকানো আন্দাজ করা মুশকিল। বাঁ দিকে ছোট চৌকিমতো পাতা– ওপরে সতরঞ্জি বিছানো তার ওপর একদিকে বায়া তবলা আর অন্যদিকে তানপুরা, মাঝখানে হারমোনিয়াম রাখা। তারই পাশে দেয়াল ঘেঁষে আবার একটা ক্যাকটাস গাছও।

রায়হান ডাইনে বাঁয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। বাড়ি চিনতে কষ্ট হয় নি। ঢোকার রাস্তায় মানুষ আর দোকানপাটের ঘিঞ্জি ভিড়, কিন্তু সাদেক সাহেবের নাম করতেই এক সঙ্গে ৩/৪ জন সামনের দিকে ডাইনে বড় গেটটা দেখিয়ে দিয়েছে– ৩২ বাই সি নম্বরটা উল্লেখ করার দরকার হয় নি। গেটটা বেশ বড়। সামনে একটু লন মতোও দেখলো, সেই সঙ্গে এক চিলতে ফুলের বেডও তার চোখে পড়েছে– রোগা রোগা কটা কসমসের চারাসুদ্ধ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

রায়হান নজর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে আর ভাবে, কী বলা যাবে এই গেট লন বাড়িঘর লিভিং রুম– হ্যাঁ, লিভিং রুমেই অতিথিকে বসাতে বললেন এক মহিলা তার ভারী গলার স্বরে– সেই লিভিং রুমে বাঁধানো বইভর্তি বুককেস, তার ওপরকার খেলনা কলসী জাহাজ, দেয়ালে রবীন্দ্রনাথ-নজরুল, বিকিনি পরা মেয়ের ছবি, টিভি, ভিসিপি, মাছ সাঁতার কাটা একোরিয়াম, সতরঞ্জি পাতা চৌকির উপরে রাখা বাঁয়া তবলা তানপুরা আর ক্যাকটাস চারা দিয়ে মিলানো রুচিকে কী বলবে ? বনেদী মধ্যবিত্ত রুচি ? নাকি উঠতি মধ্যবিত্ত রুচি ? বুর্জোয়া রুচি কি বলা যাবে ? রায়হান মনে মনে হিসাব মিলায়। বীথি সেতার শিখতো, কিন্তু সেতার বাঁয়া তবলা সে কখনোই বসার ঘরে রাখতে দেয়নি। আলাদা ঘরের ব্যবস্থা করা যায় নি বলে ছেলেদের ঘরের মেঝেতে পাটি বিছিয়ে মাস্টারের কাছে সেতার শিখতো।

আচ্ছা এরা কি বইটই পড়ে ? নাকি শুধু সাজিয়েই রাখে– আর ওই বাঁয়া তবলা তানপুরা আর হারমোনিয়াম ? রায়হানের মনের ভিতরে কৌতূহল জমা হতে থাকে। দেখতে দেখতে প্রায় পনেরো/কুড়ি মিনিট পার হয়ে যায়। কিন্তু কেউ সামনে আসে না, রীতিমতো অদ্ভুত লাগে তার। হঠাৎ করে উটকো মতো সে এসে পড়ে নি– রীতিমতো টেলিফোন করে আসা। মহিলা নিজের মুখে বললেন, আপনি একবার এলে ভালো হয়– তাই সে এসেছে। অথচ এদিকে প্রায় আধঘন্টা হতে চললো– একটি মেয়ে সেই যে আপনি একটু বসুন, বলে বসিয়ে রেখে চলে গেলো, তারপর আর কোনো লোকের সাড়াশব্দ বলতে কিছুই নেই– এমন ব্যবহার করে কী করে মানুষ!

সাত পাঁচ নানান কথা চিন্তা করতে করতেই হঠাৎ তার কানে চাপা গোঙানির আওয়াজ আসে এবং একই সঙ্গে আবার মেয়েলি গলার ধমক আর চিৎকারও শোনা যায়। গোটা ব্যাপারটা তার কাছে রহস্যময় লাগতে শুরু করে। সাদেক সাহেব শরীরের ডান দিকে প্যারালাইজড হয়ে বিছানায় পড়ে আছেন এবং কখনও কখনও রেগে উঠলে গোঁ গোঁ করে চিৎকার করেন– এসব তার জানা। কিন্তু এমন মুখ বাঁধা জানোয়ারের মতো চিৎকার করবেন আর কেউ চিৎকার করে ধমকাধমকি আর গালাগালি করবে, এমন সে কল্পনাও করে নি।

কিন্তু এভাবে কতোক্ষণ ? তার বোধহয় চলে যাওয়াই উচিত। যখন সে উঠে পড়বে বলে ভাবছে, ঐ সময় বারান্দায় একটা ছায়া দেখা গেলো এবং পরমুহূর্তেই এক মহিলা পর্দা সরিয়ে ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়ালেন। তারপর হাত কপালের কাছে তুলে সালাম জানিয়ে বললেন, কেমন আছেন, ভালো ?

মহিলা মাঝারি গড়নের, শরীর একটু মোটার দিকে– রং শ্যামলা, কিন্তু উজ্জ্বল– মাথার ওপরে আলতো করে কাপড় তোলা। ঝকঝকে মাজা মুখ, পরনে ফিনফিনে সুতির শাড়ি, স্লিভলেস ব্লাউজ। নিচু গলায় যতোদূর পর্যন্ত উঠেছে ঠিক তার ওপরে একটা বড় আকারের লকেট, শাড়িতে ঢাকা থাকলেও দিব্যি দেখা যাচ্ছে। হাতে চ্যাপ্টা সোনার পাতির চুড়ি ২ গাছা করে– কানে দুটো করে ফুলের মতো– হীরে বসানো বোধহয়– নাকের ফুলেও হীরে সুন্দর ঝিলিক দিয়ে উঠছে। ভারী ধীর, ভারী শান্ত মহিলার নড়াচড়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

আর কথা বলার ভঙ্গি– মুখের হাসি হাসি ভাবটা যেন মুখের মধ্যে সর্বক্ষণ সাঁটা। রায়হানের রীতিমতো ধাঁধা লাগে– এই মহিলারই তো গলার চিৎকার শোনা গেছে একটু আগে– নাকি একই গলার স্বর আরও কোনো মহিলার আছে এ বাড়িতে?

আপনার বাসা চিনতে অসুবিধা হয় নি তো? মহিলা আলাপ আরম্ভ করেন। বলেন, আমরা এ পাড়ায় বহুদিন ধরে আছি, তাই সবাই আমাদের চেনে। আর চেনা জানা মানুষ থাকলে বসবাসের কতো সুবিধা তাতো অবশ্যই জানেন, তাই আমরা পাড়া বদল করি নি, বাসাও না। আর প্রতিবেশী ভালো না পাওয়া গেলে সে আর এক মুশকিল– আমাদের বাসা বদল না করার এও এক কারণ– তাই মুনশি যখন আপনার কথা বললো, পরিচয় দিয়ে বললো, তখন–

রায়হান মহিলার মুখের দিকে হাসি হাসি মুখ করে তাকিয়ে থাকে। মনে মনে সে তারিফ না করে পারে না। আলাপের শুরুতে মনে হয়েছিলো মহিলা সাত খণ্ড রামায়ণ খুলে বসতে যাচ্ছেন কিন্তু কতো সহজে আর সংক্ষেপে মূল কথায় চলে এলেন। কথা বলার ধরনটাও কম আকর্ষণীয় নয়– শুধু যে মূল কথায় চলে এলেন তাই নয়– একটু তোষামোদ আর প্রশংসাও করলেন সদ্য পরিচিত অতিথির। কি সুন্দরভাবে বললেন সে একজন সাংবাদিক হবার সুবাদে ভালো প্রতিবেশীও হবে।

আমার মনে হলো, জার্নালিস্ট, টিচার, শিল্পী এঁদের মতো প্রতিবেশী পাওয়ার সৌভাগ্য ক'জনের হয়। তাই আপনার সঙ্গে কথা বলার জন্য খুব আগ্রহ হয়েছিলো আমার। কিন্তু একটু চিন্তাও হচ্ছিলো, আপনি কী মনে করেন।

তো যাক সে কথা, মহিলা এবার একটু নড়ে বসেন। হাঁটুর ওপর হাঁটু রেখে, সোফার পিঠে খানিক বোধহয় হেলানও দেন। তাতে মহিলার শরীর বেশ স্পষ্ট হয় রায়হানের চোখের সামনে। মহিলা বলেন, আমার সমস্যার কথা তো আপনি নিশ্চয় শুনেছেন, ফুলবাড়িয়ার গোটা জমিটাই, মানে পুরো দশ কাঠাই আমরা কিনবো বলে কথা ছিলো। সেই হিসাবেই বায়না করা হয়েছে– মানে আমার হাজব্যাণ্ড একটু শৌখিন ধরনের মানুষ তো, ছোটখাটো পুকুর, বাড়ি, ফলের বাগান– সব মিলিয়ে একটা বাগানবাড়ি মতো কিছু করবেন এমন চিন্তা ছিলো– কিন্তু হঠাৎ উনি, মানে সাদেক সাহেব, অসুখে পড়ে গেলেন– তারপর তাঁকে নিয়ে টানাটানি চললো কয়েক মাস– শেষে, বুঝতেই পারেন স্ট্রোক-এর রোগী নিয়ে কী সমস্যা হয়, কোনো কিছুই করা যায় না ইচ্ছেমতো– শখটখ তো বাদ দিয়ে দিতে হয়– অথচ ছেলেমেয়েরা আছে, তাদের লেখাপড়া আছে–

মহিলার চেহারায় ঐ সময় ভারী করুণ ভাব ফোটে, নিজের দুর্ভাগ্যের কথা বলতে বলতে মাথা নিচু করে রাখেন কিছুক্ষণ। পরে ঐ অবস্থাতেই বলতে থাকেন, মেয়েটা ইউনিভার্সিটিতে পড়ছে, ছেলে দু'টি ক্যাডেট কলেজে– ছোটটি মেয়ে, এবার এসএসসি দেবে– এখনও বেতন দিচ্ছে অফিস থেকে কিন্তু সে আর ক'দিন– এক বছরের মধ্যে জয়েন না করলে বেতন বন্ধ হয়ে যাবে– তখন যে কী অবস্থায় পড়বো, চিন্তা করতে পারি না। অথচ দেখুন, সাদেক সাহেব অবুঝের মতো জেদ করছেন–

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

এখন তো ভয় হচ্ছে কুতুবউদ্দিন যদি বায়নানামার তারিখ পার হয়ে গেছে বলে পুরো জমিটাই অন্যের কাছে বিক্রি করে দেয়, তাহলে তো বায়নার পুরো টাকাই গচ্চা যাবে– উনি কিছুতেই বুঝতে চান না।

মহিলার বোধহয় কথা শেষ হয়ে যায়। রায়হানের মুখের দিকে চুপচাপ স্থির চোখে তাকিয়ে থাকেন।

কী বলা যায় মহিলাকে, রায়হান ভেবে পায় না। বেচারীর দুঃখ অবশ্যই গভীর, কিন্তু রায়হানেরই বা কী করার আছে! বড়জোর সে জায়গা কেনার একজন অংশীদার হতে পারে। তা-ও ঐ ৩ কাঠাই; বেশি নয়।

আমি কি সাদেক সাহেবের সঙ্গে কথা বলবো? রায়হান এক ফাঁকে বলে ফেলে।

বলবেন? মহিলা একটু যেন ইতস্ততঃ করেন। তারপর বলেন, আপনি কী যে বলবেন আর উনি যে কী বুঝবেন, জানি না– তবু বলে দেখুন, দেখা যাক কী হয়।

ভদ্রলোকের মাথা বালিশে ডোবানো। মাথার অর্ধেক সাদা চুল, অর্ধেক টাক। দাড়ি বড় হয়েছে। বোঝা যায়, শেভ করানো হয় না। ঘরে আলো কম। জানালা দিয়ে বিকেল রোদের আলো ঘরে আসায় শান্ত ঠাণ্ডা একটা ভাব টের পাওয়া যায়। মহিলা স্বামীর বাহুতে হাত রেখে বলেন, এই দ্যাখো, কে এসেছেন। ইনি রায়হান সাহেব, মনে আছে? কুতুবউদ্দিন বলেছিলো, এক সাংবাদিকের কথা বলেছিলো, মনে পড়ে?

সাদেক সাহেবের চোখে মুখে বিভ্রান্ত আর অবোধ ভাবটা তবু লেপটে থাকে। চোখের মণিতে আলো ফোটে না, ঘষা কাচের মতো দেখায় দু'চোখের তারা। বোঝা যায়, ডান দিকটা তাঁর পঙ্গু, বাম হাতে খাটের বাজু ধরে উঠে বসার চেষ্টা করলে রায়হান ভদ্রলোককে বসিয়ে দেয়। তাতে বোধহয় খুশি হন। বাঁকানো মুখে হাসি বীভৎস হয়ে ফোটে। কী মনে করে রায়হানের হাত চেপে ধরে স্ত্রীর দিকে তাকান, তখন মহিলা ফের রায়হানের পরিচয় দেন– এবং এবারে যেন ভদ্রলোক স্মরণ করতে পারেন, চোখে মুখে সহজ একটা ভাব ফোটে। ডান হাতে হতাশার ভঙ্গি দেখিয়ে কপাল চাপড়ান দু'বার। বোঝা যায়, নিজের দুর্ভাগ্যের কথা বলছেন। তারপর বাম হাতে কী যেন ইঙ্গিত করেন, মুখ দিয়েও একটা বিচিত্র স্বর বের হয়। রায়হান বুঝতে না পেরে মহিলার দিকে তাকালে মহিলা বলেন, আপনার শরীরের কথা জিজ্ঞেস করছেন।

রোগ কাতর বিকৃত মুখখানার দিকে তাকিয়ে রায়হানের খুব খারাপ লাগে। মুহূর্তে মনে হয় মানুষটার একজন সমব্যথী দরকার। সে সাদেকের ঘাড়ে হাত রেখে নিজের বুকের বাঁ দিকটা দেখিয়ে বলে, এখানে ঠিক নেই, ব্যথা হয়, রোজ ওষুধ খাই।

কী হয় কে জানে, এ কথার পর সাদেক স্ত্রীকে ডেকে কিছু যেন বলার চেষ্টা করেন। নুলো হাত এবং খোঁড়া অসাড় পা নিয়ে তাঁর খুব কষ্ট হয়। কিন্তু তবু অবোধ্য স্বরে বাম হাত নেড়ে নেড়ে কী যেন বোঝাতে চেষ্টা করেন। আর মহিলা মাথা নাড়িয়ে নাড়িয়ে বার বার করে বলেন, হ্যাঁ দেবো, এক্ষুনি দিচ্ছি, তুমি অস্থির হচ্ছো কেন? হ্যাঁ মিষ্টিও দেবো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

রায়হানের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে তাকে সাদেকের পছন্দ হয়েছে, তাই আপ্যায়নের জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন ভদ্রলাক।

কোত্থেকে যে কী হয় বোঝা যায় না। ছোট মেয়েটি সত্যি সত্যি প্লেটে করে মিষ্টি নিয়ে হাজির হয়। মহিলা নিজের হাতে বোতল থেকে গেলাসে কোক ঢালতে শুরু করেন এবং সেই প্লেটের মিষ্টি এবং গেলাসের কোক তাকে খেতেও হয়।

খেতে খেতে লক্ষ্য করে রায়হান, ভদ্রলোক খুব খুশি হয়েছেন। ঐ অবস্থাতেই সে বলে, আপনার বায়না করা জমির অংশ আমাকে কিনতে দেবেন?

ভদ্রলোক খুশি হয়ে মাথা হেলান, স্ত্রীকে ডেকে হাত নেড়ে নিজের সম্মতির কথা জানান।

কিন্তু উনি তো মাত্র ৩ কাঠা নেবেন। বুঝেছো, ৩ কাঠা।

স্ত্রীর কথা শুনে সাদেক ভ্রূ কুঁচকে তাকান রায়হানের দিকে। তারপর ডান হাত তুলে চারটা আঙুল মেলে ধরেন। তার মানে, ৪ কাঠা জমি কেনার জন্য অনুরোধ করছেন ভদ্রলোক। রায়হানের বুঝতে একটুও অসুবিধা হয় না।

ঠিক আছে, রায়হান হাসিমুখে মাথা হেলায়। বলে, আপনার কথাই থাকবে।

রায়হান কেন রাজি হয় নিজেই বুঝতে পারে না। ১ কাঠা জমি বেশি হওয়া মানে ২৫ হাজার টাকা বেশি দেওয়া। চিন্তা যে হয় না তা নয়, কিন্তু ঐ মুহূর্তে একজন পঙ্গু রোগগ্রস্ত লোকের সামনে দাঁড়িয়ে তাঁকে খুশি এবং আশ্বস্ত দেখে তার কেমন বিশ্বাস জেগে ওঠে মনের ভেতরে যে, ৭৫ হাজার যদি জোগাড় হতে পারে তাহলে ১ লাখ জোগাড় হয়ে যাওয়াও অসম্ভব কিছু নয়।

তারপর আরও কিছুক্ষণ বসার ঘরে বসে গল্প হয়। মিসেস সাদেক খুবই সহজ হয়ে ওঠেন। নিজের নাম যে মেরি সেটা খুব কৌশলে জানিয়ে দেন। এমনকি তাঁর ছেলেবেলা যে দিনাজপুরে কেটেছে তাও জানাতে ভোলেন না।

মেরি ওঠেন, দাঁড়ান, ঘরের একদিক থেকে আর একদিকে চলে যান। বাইরে বেলা একেবারে পড়ে গেলে ঘরের ভেতরে ছায়া ছায়া অন্ধকার জমতে থাকলে বাতি জ্বালিয়ে দেন। শাড়ির আঁচল ব্যস্ততার কারণে কতোবার পড়ে যায়, কতোবার তুলে ঘাড়ে রাখেন, তাঁর খেয়াল থাকে না, রায়হানও মনে রাখতে পারে না।

মেরি ইউনিভার্সিটিতে পড়া মেয়ে চন্দনাকে ডেকে এনে পরিচয় করিয়ে দেন। ছোট মেয়ে মিহিনকে কাছে বসিয়ে তার ঘাড়ে হাতের ভর রেখে দিনাজপুরের গল্প করেন। তারপর যখন সন্ধ্যা হয়ে যায়, তখন রায়হান ওঠে। বলে, আমি এবার যাই। মহিলা সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠেন, আপনি আবার আসবেন তো? ফের কবে আসছেন বলুন, মিসেসকেও আনতে হবে, হ্যাঁ, ওঁকে আমার খুব দেখতে ইচ্ছে করে। বাহারউল্লাহ মুনশির মুখে ওঁর খুব প্রশংসা শুনি। বলতে বলতে একসঙ্গে পা ফেলে সিঁড়ি দিয়ে নামেন। আর নামতে গিয়েই তাঁর পা হড়কাবার মতো হয়। কিন্তু পুরো হড়কে যায় না মহিলার পা। শুধু মুখ দিয়ে 'ও মাগো' বলে আর্তনাদ বার করেন– তখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

দু'হাতে জড়িয়ে ধরে তাঁর পতন রোধ করে রায়হান। তাতে একটা বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয় তার। চল্লিশোর্ধ ভারী শরীরের এক মহিলাকে জড়িয়ে ধরে রাখার ফলে নারী শরীরের মাংসল স্ফীতি যে দেহের স্নায়ুকোষে ঝঙ্কার তুলতে পারে সেটা তার জানা ছিলো না। যখন সে সিঁড়ির শেষ ধাপ থেকে নিচে নামছে, তখনও পেছন থেকে মেরির উচ্ছল গলা তার কানে আসে, আবার আসবেন কিন্তু– শুনছেন, আমি আবার আসতে বলছি।

সাদেক সাহেবের বাড়ি যাওয়ার অভিজ্ঞতাটা সে ভুলতে পারে না। কেউ যেন তার মনের ভেতরে বলে, রায়হান সাবধান! কী করছো, ভেবে দেখো। গোটা ব্যাপারটা চিন্তা করলে আবার হাসিও পায়। নিজেকে ক্লাউনের মতো লাগে। তার বয়স এখন পঞ্চাশ, হ্যাঁ পুরোপুরি পঞ্চাশ– তার ৩টি পুত্র সন্তান– তাদের মধ্যে একজন যে প্রেম করতে শিখে গেছে সেটা তো তার ভালো রকম জানা, আর সে কি না ওই ছেলের বাপ হয়ে বয়স্কা চার সন্তানের মায়ের সঙ্গে প্রেম হয়ে যাবার সম্ভাবনার কথা ভাবছে?

নারী সংসর্গ যে তার একেবারেই হয় নি তা তো নয়। কলেজে পড়া আর রাজনীতি করার সময় সদ্য ম্যাট্রিক পাস করা মুকুলের সঙ্গে তার চিঠি লেখালেখি আর চুমু খাওয়াখাওয়ি পর্যন্ত হয়েছিলো। ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় হাত ধরাধরি, চিঠি লেখালেখি, পার্কে বেড়ানো এইসব হয়েছিলো নাঈমা নামে একটি মেয়ের সঙ্গে। তারপর তো বীথি– না, পরে নয়, বলা যায়, প্রথম থেকে বীথিই ছিলো, মাঝখানে এরা এসে পড়েছিলো। হঠাৎ হঠাৎ। চাটুজ্যে বাড়ির মুকুলকে ওর গার্জেনরা পাঠিয়ে দেয় কলকাতায়। নাঈমার পুরনো প্রেমিক কোত্থেকে হঠাৎ উড়ে আসে। আর তাতে রায়হানের সঙ্গে সদ্য গড়ে ওঠা সম্পর্কটা যায় কেঁচে। আর এদিকে বীথির সঙ্গে সম্পর্কটা গাঢ় হতে হতে এক সময় জীবনে মরণে জড়িয়ে যায়। সুতরাং নারী সংসর্গের ব্যাপারে সে একেবারে আনাড়ি কখনও ছিলো না এবং এখনও নয়।

তবে এও ঠিক যে সংসর্গ মানে তার বেলাতে চিঠি লেখা, হাত ধরাধরি করে পার্কে বেড়ানো কিংবা লুকিয়ে চুরিয়ে একটা দুটো চুমু খাওয়া পর্যন্তই সে যেতে পেরেছে। তার বেশি সে কখনো পারে নি– সুযোগের অভাবের জন্যে হতে পারে, আবার এও হতে পারে যে তার সাহসের অভাব। তাছাড়া বয়স্কা মহিলার সঙ্গে মেলামেশার অভিজ্ঞতা তার নেই। আর সেজন্যই সে ভেবে পায় না, বয়স্কা মহিলারা কি সবাই সাদেক সাহেবের স্ত্রীর মতো? অতিথির পাশাপাশি সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় পা হড়কে পড়ে যেতে চায়?

রাতে বীথিকে সাদেক সাহেবের বাড়ির অভিজ্ঞতাটা বলার সময় সে মিসেস সাদেকের প্রসঙ্গটা বেমালুম এড়িয়ে যায়। তবে যতোটুকু বলে, অর্থাৎ ৩ কাঠার জায়গায় ৪ কাঠা কেন কিনতে রাজি হলো, সেটা বুঝিয়ে বললে তাতেই বীথি আহা আহা করে ওঠে। বলে, ঠিকই তো, ভদ্রলোক কতো আশা করে জমি কেনার বায়না করেছেন, সেই জমি ভাগাভাগি করে নিতে হলে তাঁর খারাপ লাগবে না? তুমি ঠিক করেছো রাজি হয়ে। টাকায় না কুলোলে আমার গয়না বিক্রি করে দেবো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ফের গয়নার কথা– তোমাকে না বলেছি–

রায়হান রাগটা পুরোপুরি প্রকাশ করতে পারে না। তার আগেই বীথি বলে ওঠে, আচ্ছা গয়না বিক্রির কথা বললে তোমার গা জ্বলে কেন?

বীথি মিটিমিটি হাসে আর চোখে চোখ রেখে বলে, বউয়ের জিনিস নিতে পুরুষ ইগোতে খোঁচা লাগে, তাই না? এটা যে মধ্যযুগীয় মানসিকতা সেটা বোঝো?

রায়হান গম্ভীর হয়ে যায় আরও। বলে তোমাকে আমি বহুবার বলেছি, গয়না বিক্রির কথা বলবে না– ওতে আমার খারাপ লাগে।

বীথি তারপরও চোখে চোখে তাকিয়ে থাকে। বলে, এটা তোমার কোন ধারণা আমি বুঝি না– বিপদ আছে, আপদ আছে, ছেলেদের ভবিষ্যত আছে– দরকার হলে মানুষ সোনাদানা বিক্রি করে না? বলো? দরকারের সময় যদি কাজেই না লাগলো, তাহলে ওসব জিনিস রাখা কেন? ওসব জিনিস কি আমি ব্যবহার করতে পারছি? বলো, পারছি? কেউ কি সোনার গয়না পরে আজকাল বাইরে বের হয়? বের হতে পারে? বলো তুমি? রায়হান চুপচাপ শুনে যায়। আসলে তার নিজের দিক থেকেও গয়না বিক্রি করতে না দেওয়ার পেছনে যথেষ্ট যুক্তি নেই। সে মনের খুব ভেতরের দিকে এক ধরনের জোর তো অবশ্যই পায়। এক কথায় চাকরি ছেড়ে দিতে যে পারে সে, তার পেছনে কি বীথির গয়নাগুলো নেই? বরাবরই তো সে মনে মনে ভরসা করে এসেছে ঐ গয়নাগুলোর ওপরে– মুখে যাই বলুক।

তবে নিজের পৌরুষে লাগবার কারণ সে একেবারে যে বোঝে না, তা নয়।

আসলে বীথির গয়নায় হাত দিতে গেলেই তার নিজেকে খুব ছোট ছোট লাগে। জীবন তো পার হতে বসেছে, একখানা গয়নাও যে সে বীথিকে কিনে দিতে পারে নি সেটা সে কেমন করে ভুলবে?

রাত গভীর হয়েছে ততোক্ষণে। ছেলেদের ঘরে বাতি নিভে যাবার শব্দ কানে আসে। রায়হান চিৎ হয়ে ঘুরন্ত ফ্যানটার দিকে তাকিয়ে ছিলো। বীথি ঘাড়ে হাত দিয়ে স্বামীকে টেনে নিজের মুখোমুখি করে। তারপর বলে, এই রাগ করেছো?

রায়হান বউয়ের ভ্রূর দিকে তাকায়, কপালের দিকে তাকায়, চিবুকের দিকে তাকায়। কী উজ্জ্বল ছিলো গায়ের রঙ। ডানদিকের ভ্রূর আরম্ভের কাছে একটা ঘূর্নি আছে, সেখানে চুলগুলো খাড়া হয়ে থাকে। তাতে সুন্দর দেখায় বীথির কপাল– হ্যাঁ, এখনও দেখায়। ফর্সা রঙের ওপর রোদ পোড়া এবং বয়সের তামাটে ছাপ পড়ার পরও। রায়হান স্ত্রীর দু'গালে দু'হাত রেখে কপালে চুমু খায়। চোখের পাতায় চুমু খায়, ঘাড়ে চুমু খায়। তারপর কোমরে হাত রাখে। ঐ অবস্থায় ঠোঁটে গাঢ় চুমু খেলে বীথি দু'হাতে ঠেলে ধরে স্বামীকে। বলে, এ্যাই, পাগলামি করো না। তোমার বুকে ব্যথা হবে।

স্বামীকে সংযত করতে যায় বটে; কিন্তু তাতে বেচারী নিজেই সংযম হারায়– রায়হানের মুখ নিজের বুকের মধ্যে দু'হাতে চেপে ধরে। কেন ধরে নিজেই জানে না। ঐ অবস্থায় অস্ফুট স্বরে বলে, তুমি এতো মিষ্টি কেন এ্যাঁ? এতো বুড়ো হয়ে গেলে তবু তোমাকে আমার আগের মতোই মিষ্টি লাগে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

রায়হান মাথা তুলে ফের বালিশে রাখে। বলে, এ্যাই, আমার বুকে ব্যথা হলে কিন্তু আমি জানি না, হ্যাঁ, তখন তোমার দোষ হবে।

ওদিকে পেটা ঘন্টায় সময়ের হিসেব শোনায় পুলিশ ফাঁড়ি।

বীথি হাত বাড়িয়ে বেড সুইচ অফ করে বলে, দুটো বাজলো, নাও অনেক হয়েছে, এবার ঘুমোও।

জানালা দিয়ে দক্ষিণের আকাশ বেশ কিছুদূর পর্যন্ত দেখা যায়। টিফিনের পর থেকেই দেখছে– দিগন্তে মেঘ জমছে, কিছুটা পূর্বে ব্যাপ্টিষ্ট মিশনের ছাত্রদের বোর্ডিং, তার ওপারে কয়েকটা গাছ, কৃষ্ণচূড়াও আছে বোধহয় দুটো একটা। কারণ লাল রঙের থোপা থোপা ফুল নজরে পড়ে। ঐ পাতা আর ফুলের ওপরে শুধুই আকাশ, আর সেই আকাশে প্রথমে হালকা ধূসর মতো মেঘ দেখা গেলো– তারপর তা কালো আর ভারী হতে আরম্ভ করলো। এখন, মানে টিফিনের পর, জিওমেট্রি ক্লাস শেষ করে স্যার চলে যাবার পর, আকাশের ওদিকটা মিশমিশে কালো হয়ে উঠেছে।

ত্রিভূজের বৃহত্তর বাহুর বর্গক্ষেত্র কীভাবে অন্য দু'বাহুর বর্গক্ষেত্রের সমষ্টির সমান হয় সেই তত্ত্ব তখনও বুঝতে চেষ্টা করছে।

টুকু ঘাড়ে হাত দিয়ে একটু ঠেলা দিয়ে বললো, ওই দ্যাখ, খুব জোর বৃষ্টি নামবে, দ্যাখ ওদিকে। শাহিন মুখ তোলে না। আরও ঝুঁকে পড়ে জ্যামিতি বইয়ের ওপরে।

টুকু ওর কাণ্ড দেখে হাসে। বলে, বাড়ি ফিরতে দেরি হবে আজ, বুঝলি ? খুব জোর বৃষ্টি নামবে এক্ষুনি।

শাহিন বন্ধুর দিকে না তাকিয়ে মাথাটা ওপরে নিচে দোলায়। তার মাথা নিচু অবস্থাতেই জানতে চায়, এই উপাদ্যটা তুই বুঝেছিস ? পীথাগোরাস কে রে ? স্যার কী যেন বললেন, গ্রীক না রোমান– একবার বললেন দার্শনিক, আবার বললেন গাণিতিক, আমি কিছু বুঝলাম না।

টুকু আকাশের মেঘ দেখতে দেখতেই বলে, জ্যামিতি আমারও মাথায় কিছু ঢোকে না। তাই আমি বোঝাটোঝার ধার দিয়ে যাই না, সোজাসুজি মুখস্থ করি।

শাহিন মুখ তুলে এক মুহূর্তের জন্যে সহপাঠী বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে। কী দেখে সেই জানে, তারপর ফের বইয়ের দিকে মনোযোগী হয়।

বাইরে তখন হাওয়া বইতে শুরু করেছে। টুকু দেখে, কালো মেঘের বুকে আরও কিছু ধোঁয়াটে এবং ফিকে রঙের মেঘ ওলটপালট করছে। এদিকে রাস্তার টুকরো কাগজ, ধুলো, শুকনো আবর্জনা সব শূন্যে উড়ে উঠলো– শোঁ শোঁ বাতাসের শব্দ শোনা যেতে লাগলো, জানালার পাল্লায় পাগলা বাতাসের ঝাপটা এসে লাগতে দেরি হলো না, পুরনো দালানের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জানালার খড়খড়িঅলা পাল্লা আছাড় খেতে শুরু করলো একের পর এক। ভূগোলের কাসেম আলী স্যার ক্লাসে ঢুকছিলেন। কিন্তু কী হলো কে জানে, ভেতরে না ঢুকে বারান্দায় দাঁড়িয়ে গেলেন। তারপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মনের সুখে ঝড় দেখতে লাগলেন। তাঁর দেখাদেখি ক্লাসের অনেকেই গিয়ে বারান্দায় দাঁড়ায়। কিন্তু টুকু আর শাহিন একইভাবে নিজের জায়গায় বসে একজন ঝড় দেখতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

থাকে আর অন্যজন জ্যামিতির বইয়ের ওপর ঝুঁকে থাকে। জানালা দিয়ে খুব জোর বাতাস আসে, তবু জানালাটা বন্ধ করে না। আর তাতে ঝড়ো হাওয়ার ঝাপটা এসে ঘরের ভেতরকার বইখাতার পৃষ্ঠা উল্টে ফরফর আওয়াজ তুলে কারও কারও বইখাতা বেঞ্চ থেকে মেঝেতে ফেলে দিয়ে একটা লণ্ডভণ্ড কাণ্ড ঘটিয়ে দিতে থাকলে ঝড়ের শোভা দেখতে থাকা স্যারের হুঁশ হয় এবং তিনি চিৎকার করে ওঠেন, এ্যাই ছেলেরা, বন্ধ করো, জানালাটা বন্ধ করো।

শাহিনের কানে হুকুমটা পৌঁছায়'। তাতে সে লাফিয়ে গিয়ে জানালাটা বন্ধ করার চেষ্টা করে। কিন্তু কাঠের চারখানা বেশ চওড়া পাল্লাকে একসঙ্গে কিছুতেই মিলিয়ে ধরে রাখতে পারে না। আবার ঐ সময়ই হেড স্যারের ধমক শোনা যায়। কাকে যেন গলা চড়িয়ে বলতে থাকেন, এমন ঝড় হচ্ছে, আপনি ছেলেদের বাইরে আসতে দিয়েছেন কেন, এ্যাঁ ? জানেন না খোলা বারান্দায় টিনফিন উড়ে এসে পড়তে পারে ? এ্যাকসিডেন্ট হলে তার জন্য দায়ী কে হবে, এ্যাঁ ? কাণ্ডজ্ঞান বলতে কি আপনার কিছুই নেই ? যান ক্লাসে যান।

হেড স্যারের ধমকে কাজ হয়। কাসেম স্যার ক্লাসের ভেতরে চলে আসেন। কিন্তু চেয়ারে বসেন না। টেবিলে হেলান দিয়ে দাঁড়ান। আর হেড স্যারকে শুনিয়ে শুনিয়েই সম্ভবত মৌসুমী বায়ু পড়াতে আরম্ভ করে দেন। অথচ পড়াবার কথা ছিলো ভূগঠনের কথা। বলেন, তোমাদের মৌসুমী বায়ুর কথা আগের দিন বলেছিলাম, মনে আছে ? শীতকালে আমাদের দেশে বাতাস বয় কোনদিক থেকে ? লক্ষ্য করলে দেখবে শীতের হিম হিম ঠাণ্ডা বাতাস হিমালয় পার হয়ে উত্তর দিক থেকে বয়ে আসে। তবে সোজাসুজি আসতে পারে না, কারণ পৃথিবী ঘুরছে, তাই সোজাসুজি দক্ষিণ দিকে না বয়ে একটু পূর্বদিকে বেঁকে যায়। তার মানে শীতের মৌসুমে বাতাসটা বয় উত্তরপূর্ব দিক থেকে। আর গ্রীষ্মকালে ভূ-পৃষ্ঠে গরম বাতাস হালকা হয়ে ওপরে উঠে গেলে দক্ষিণে সমুদ্র থেকে–

এই পর্যন্ত বলেই স্যার থেমে যান, তারপর পেছন ফিরে দরজার দিকে তাকিয়ে নেন একপলক। যখন বুঝতে পারে যে হেড স্যার চলে গেছেন, তখন লম্বা নিঃশ্বাস নিয়ে ঘুরে দাঁড়ান। তারপর বলেন, গত দিন যেন কী পড়িয়েছিলাম তোমাদের ?

একজন হাত তুলে বলে, ভূগঠন স্যার।

হ্যাঁ, ভূগঠন–

পড়ানো আরম্ভ করতে না করতেই তাঁর চোখ পড়ে শেষের বেঞ্চে। গলা উঁচিয়ে দেখতে দেখতে বলেন, এ্যাই ছেলে কী হচ্ছে ওখানে, কী করো তুমি ?

টুকু স্যারের কথা শুনছিলো, সে কিছু বুঝে উঠতে পারার আগেই দেখলো স্যার খুব রাগী চোখে তাকাতে তাকাতে আসছেন তারই বেঞ্চের দিকে। পাশে শাহিন তখনও তার জ্যামিতি বইয়ের ওপর ঝুঁকে রয়েছে।

কী পড়ছো তুমি, এ্যাঁ ? বলে সোজাসুজি শাহিনের চুলের মুঠো ধরে দাঁড় করিয়ে দিলেন। তারপর একইভাবে চুল ধরে শাহিনের মাথাটা ঝাঁকালেন কয়েকবার। বললেন, ক্লাসে গল্পের বই পড়া হয়, তাই না ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

না স্যার, গল্পের বই না–

এই পর্যন্তই বলতে পারে শাহিন, তারপর আর পারে না। কারণ ঐ মুহূর্তে তার মাথাটা ধরে আরও কয়েকবার ডাইনে বাঁয়ে ঝাঁকুনি দেওয়া হয়। তারপর কী ভেবে কাসেম স্যার শাহিনকে ছেড়ে তার বইখানা হাতে তুলে নিয়ে দেখেন কিছুক্ষণ, শেষে গজগজ করতে করতে নিজের জায়গায় ফিরে যান। যেতে যেতে বলেন, সব বজ্জাত, ক্লাসের পড়া শুনবে না– আর খালি নকল করবে। খালি নকল করবে।

শাহিন একইভাবে দাঁড়িয়ে থাকে।

স্যার ওরদিকে তাকিয়ে ফের বলতে থাকেন, জ্যামিতি বুঝতে না পারলে জ্যামিতি ক্লাসের স্যারকে বলবে– তাঁকে যদি না পাও তো আমার বাসায় আসো– ভূগোল ক্লাসে কেন! জ্যামিতি পড়ার কী দরকার। হুঃ, একেবারে হয়েছেন পড়নদাজ!

স্যার বোধহয় ক্লাসের ভেতরকার পরিবেশটা হালকা করার জন্য কথাটা বলেন। বলে দাঁত বের করে খানিক হাসেনও। কিন্তু কেউ হাসে না।

ওদিকে বাইরে বৃষ্টি থেমে আসে। স্যার চেষ্টা করেও তাঁর হাসির মৌসুমী বায়ু ক্লাসে আনতে পারেন না। সেটা দক্ষিণ-পশ্চিমেই কোথাও আটকে থাকে। স্যার বোধহয় আরও কিছু বলতে চান। কিন্তু তার আগেই ঢং ঢং করে ছুটির ঘণ্টা বেজে যায়।

শাহিনের চুল এলোমেলো, মুখ থমথমে, চোখ লাল– টুকু ওর বইপত্তর গুছিয়ে ব্যাগে ভরে দেয়। তারপর বলে, চল এবার বাড়ি যাই।

ক্লাস রুম থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে টুকু ফের বলে, কাসেম স্যারটা যেন কেমন তাই না? আমার মনে হয় পাগল। নাহলে খামোকা তোকে মারলো?

শাহিন কিছু বলে না। গেটের কাছে পৌঁছে দেখে তখনও ঝিরঝিরে বৃষ্টি হচ্ছে। সে বৃষ্টির মধ্যেই বেরিয়ে যাচ্ছিলো, টুকু হাত ধরে থামালো। বললো, ভিজবি তো, দাঁড়া এক সঙ্গে যাই।

দু'জনে তারপর রিকশায় ওঠে। রিকশায় উঠে শাহিন বলে, কাসেম স্যার তোকে ওঁর কোচিং-এ ভর্তি হওয়ার কথা বলেছেন?

টুকু মাথা নাড়ায়। বলে, না, তোকে বলেছেন?

হ্যাঁ, শাহিন জানায়। বলে, ওঁর কোচিং-এ যদি ভর্তি না হই তাহলে নাকি ভালো রেজাল্ট কেউ করতে পারবো না। একটু থেমে ফের বলে, দেখিস তোকেও বলবে।

রিকশাটা কোর্ট কাচারি এলাকা পার হয়ে নবাবপুরের মোড়ের কাছে এলে টুকু জিজ্ঞেস করে, তুই কি ভর্তি হবি?

নাহ্। শাহিন বলে, অনেক টাকা নেন স্যার। মা অতো টাকা কোত্থেকে দেবে? দেখতে না দেখতে রিকশাটা বাঁয়ে মোড় নিতে গিয়ে ট্রাফিক জ্যামে আটকে যায়। ঝিরিঝিরি বৃষ্টি তখনও পড়ছে।

আচ্ছা তোকে যদি কাসেম স্যার কোচিং-এ ভর্তি হতে বলে, তুই ভর্তি হবি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বন্ধুর প্রশ্নে জবাব দিতে পারে না টুকু। তখন শাহিন ফের বলে, তুই যদি ভর্তি না হোস, তাহলে দেখিস, কোনো ছুতো পেলেই স্যার তোকেও মারবে।

স্যার গুলো খুব খারাপ, তাই না ? টুকু সামনের দিকে রিকশার জড়াজড়ি ভিড় দেখতে দেখতে বলে। তারপর জানায়। আমি আজই মাকে বলে রাখবো। দেখি মা কী বলে।

তোদের তো কোনো প্রব্লেম নেই। শাহিন বলে, আমার আব্বার মতো তোর আব্বার চাকরি তো চলে যায় নি।

টুকু মুখ ফেরায় না। যেমন সামনের দিকে তাকিয়ে ছিলো তেমি তাকিয়েই থাকে। সে জানে শাহিনের আব্বার চাকরি নেই বেশ কিছুদিন থেকে। এক জুট মিলে চাকরি করতেন– জুট মিলটা উঠে গেছে, তাই বছর খানেক হলো ভদ্রলোক বেকার। শুধু বেকারই নন, ভদ্রলোকের আরও দোষ আছে– খুব মদ খান। শাহিন স্বীকার করতে চায় না কিন্তু খবরটা ক্লাসের প্রায় সব ছেলেই জানে। গত বছর কালামের সঙ্গে একদিন খুব ঝগড়া হয়েছিলো শাহিনের। ঐ দিন রেগে মেগে কালাম চিৎকার করে বলে দিয়েছিলো, তোর আব্বা তো মাতাল, মদ খেয়ে রাস্তায় পড়ে থাকে। শাহিনের সেদিন এতো রাগ হয়েছিলো যে একটা ইট তুলে নিয়েছিলো দু'হাতে, অন্য বন্ধুরা না ধরলে ঠিক কালামের মাথায় মেরে বসতো। ওকে থামানো হলে সেকি কান্না। শাহিন তারপর দু'দিন স্কুলে আসে নি।

টুকু সেই দিন থেকে শাহিনের বাড়ির লোকজনের কথা কখনও তোলে না।

রিকশা একসময় ফের চলতে শুরু করে। দেখা যায় দু'জন লুঙ্গিপরা লোক হাতে চ্যালা কাঠ নিয়ে রিকশাঅলাদের ধমকে ধমকে এক লাইনে চলতে দিয়ে রাস্তার ভিড় পরিষ্কার করছে। চ্যালা কাঠ দিয়ে টুকুদের রিকশার পিঠে খামোকা জোরে একটা বাড়ি মারলে রিকশাঅলা ধমকে ওঠে। আবে ওই হালায় হিরঞ্চি, মারিস ক্যান ?

রিকশাঅলার কথা শুনে শাহিন ফিক করে হেসে ফেলে। টুকুকে বলে হিরঞ্চি মানে জানিস ?

না, টুকু বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে পাল্টা জিজ্ঞেস করে, তুই জানিস ?

হ্যাঁ, শাহিন বলে, হিরঞ্চি মানে যারা হিরোয়িন খেয়ে নেশা করে।

তুই হিরোয়িন দেখেছিস ?

হ্যাঁ, শাহিন জানায়। আমাদের পাশের বাড়ির হাকিম ভাই খায়, শাদা গুঁড়োর মতো–

কীভাবে খায় ? পানিতে গুলে ?

জানি না, কখনো খেতে দেখি নি, শাহিন জানায়। বলে, শুনেছি ইঞ্জেকশান নেয় কেউ কেউ– কেউ সিগারেটের মধ্যে ভরে খায়।

যাহ্ গুঁড়ো জিনিস কীভাবে সিগারেটের ভেতরে পুরবে, টুকুর বিশ্বাস হতে চায় না।

কী জানি, কীভাবে খায়। শাহিন বলে, তবে হাকিম ভাই বলে ওটা খেলে নাকি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

মনে হয় আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে।

নেশা কেটে গেলে মাটিতে পড়ে যাবার মতো ব্যথা লাগে না ? জিজ্ঞেস করিস নি ?

সত্যি সত্যি রাস্তা পরিষ্কার হয়ে যাওয়ায় শাহিন বলে, দেখেছিস, কেমন কাজের ট্রাফিক পুলিশ ?

না ট্রাফিক পুলিশ না, বল হিরঞ্জি পুলিশ।

টুকুর কথায় শাহিন হাসতে হাসতে টিপু সুলতান রোডের মাঝামাঝি ভূতের গলির মোড়ে লাফ দিয়ে নামে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নামতে পারে না, কারণ টুকুর বুক পকেটে আটকে যায় শাহিনের ব্যাগের বকলস। বকলসটা ছাড়াতে মিনিট খানেক লেগে যায়। তারপরই দু'হাতে ব্যাগটা মাথার ওপরে তুলে ঝিরিঝিরি বৃষ্টির মধ্যেই সে এক দৌড়ে গলির ভেতরে ঢুকে যায়। খুব ইচ্ছে করে টুকুর শাহিনদের বাসায় যেতে। কিন্তু শাহিন কখনোই ওকে ওদের বাড়ি নিয়ে যায় না। ক্লাসের কোনো বন্ধুকেই ও বাড়িতে নিয়ে যায় না।

বাসার গেটের কাছে টুকু রিকশা থেকে নেমে পকেট হাতড়ে টাকা খুঁজে পায় না। তার মাথায় চক্কর দেয়, গেলো কোথায় নোটখানা ? প্যান্টশার্টের সবগুলো পকেট এক এক করে খোঁজে কিন্তু উঁহু। দশ টাকার নোটখানা কোথাও নেই।

বীথি ঘুমিয়ে পড়েছিলো ঝড় থেমে যাওয়ার পর। দরজায় ধাক্কাধাক্কির আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেলে দরজা খুলে দেখে আধভেজা ছোটছেলে বাসায় ঢোকার জন্যে দাঁড়িয়ে আছে। মাকে দেখে বললো, তুমি ঘুমোচ্ছিলে ?

হ্যাঁ কেন ?

রিকশা ভাড়ার টাকা দাও।

সে কিরে! আজ না যাওয়ার সময় একখানা দশ টাকার নোট দিলাম তোকে– সব খরচ করে ফেলেছিস ?

টুকু কিছু বলতে পারে না। সে দশ টাকা থেকে একটা পয়সাও খরচ করে নি। আর্ট পেপার আর চাইনিজ ইংক কেনার জন্য রেখে দিয়েছিলো বুক পকেটে– সেই টাকা খুঁজে পাচ্ছে না। তার বিশ্রী লাগতে আরম্ভ করে। সে মনে মনে স্মরণ করার চেষ্টা করে। আজ তো টিফিনের সময় ছোটাছুটি, দৌড়াদৌড়ি কিছুই করে নি। বাংলাবাজার কাগজের দোকানে রওনা হয়েছিলো। তার আগেই টিফিন ফুরোবার ঘন্টা বেজে যায়। তারপর তো বৃষ্টি হয়ে চলেছে। আজ কারো পাশে বসেছিলো বলেও তার মনে পড়ে না। তাহলে ?

কি হলো ? গেটের কাছে ঘন ঘন রিকশার ঘন্টা শুনে বীথি বলে ওঠে, টাকাটা খেয়ে ফেলেছিস ?

রাগে গজ গজ করতে করতে মা ড্রয়ার খুলে নিজের ব্যাগ থেকে ৫ টাকার একখানা নোট নিয়ে ছেলের হাতে দেয়।

টুকু সঙ্গে সঙ্গে নোটখানা নিয়ে নেমে যায়। ছেলের কাণ্ড দেখে বীথির চিন্তা হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

এই ছোটটাও দিনে দিনে কেমন যেন সমস্যা হয়ে উঠছে। আগে এমন ছিলো না, ক্লাস নাইনে ওঠার পর ক্রিকেট খেলার নাম করে কোথায় কোথায় যেন চলে যায়। ছুটির দিনে দুপুর পার করে বিকেল বেলা ফেরে– কোনো কোনো শুক্রবার বাড়ি ফেরে একেবারে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার পর। প্রাইভেট টিউটরের কাছে পড়ার জন্য আবদার ধরেছে কিছুদিন থেকে– তারপর এই এক উৎপাত একদিন দু'দিন যেতে না যেতেই ৫ টাকা ১০ টাকা দরকার বাবুর। জিজ্ঞেস করলে নির্বিকার ভঙ্গিতে বলে, রিকশা ভাড়া দিয়েছি। ক্লাস নাইনে পড়া ছেলে তবু ওয়ারী থেকে সদরঘাট পর্যন্ত হাঁটতে পারে না।

বীথি বসার ঘরে গিয়ে দেখে ছেলে বইয়ের ব্যাগ উজাড় করে ঢেলে বই খাতার পৃষ্ঠা উল্টেপাল্টে টাকা খুঁজছে। তার রাগ হয়। বলে, থাক অনেক হয়েছে, এবার মুখ হাত ধুয়ে খাবার ঘরে যাও।

টুকু কিছু বলে না। কারণ বলে কোনো লাভ নেই। সে জানে, মা বিশ্বাস করবে না যে, তার কাছ থেকে দশ টাকার নোটখানা সত্যিই হারিয়ে গেছে। তার স্পষ্ট মনে পড়ে। বুক পকেটে রেখেছিলো সে নোটখানা। বুক পকেটে অন্য কিছু সে কখনো রাখে না, কলম পেনসিলও না– সব থাকে তার বইয়ের ব্যাগে।

খাওয়ার টেবিলে খেতে বসলে মা দুধ খই গুড় দেয়। বড় বাটিতে নিয়ে চামচ দিয়ে ছেলের মুখে তুলে দিতে দিতে বীথি ফের জিজ্ঞেস করে। টাকা কী করেছিস, বললি নাতো ?

টুকু হাসে। বলে, খেয়ে ফেলেছি।

কী খেলি ?

কেক খেলাম, কোক খেলাম।

একলা খেলি ? বন্ধুদের কাউকে না দিয়ে খেতে পারলি ? তুই তো দেখছি ভারী ছোঁচা।

বাহ্ আমি কেন অন্যকে খাওয়াবো– ওরা কেউ কি আমাকে খাওয়ায় ?

বীথি ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে এবার দিব্যি বুঝতে পারে যে ছেলে বানিয়ে কথা বলছে।

বাটির দুধ খই ফুরিয়ে এলে বীথি ফের জিজ্ঞেস করে, হ্যাঁ রে, বললি নাতো, টাকাটা কী করেছিস ?

বাহ্ বললাম না। টুকু মায়ের মুখের দিকে এক পলক তাকিয়ে ফের নজর এবং মাথা নিচু করে। বলে, টিফিনের সময় কোক আর কেক খেয়েছি। তিন টাকার এক পিস কেক। আর ছ'টাকার কোক।

তাহলে ১ টাকা ফেরত দে। বাকি টাকাটা তো খাস নি। নাকি তাও খেয়ে ফেলেছিস।

টুকুর চোখেমুখে মিছে কথা বলতে চেষ্টা করার ভাব ফোটে। সে মায়ের চোখে চোখে তাকাতে পারে না। দু'বার চোখ নামিয়ে নিয়ে সে তৃতীয়বার মায়ের চোখের দিকে তাকায়। তারপর বলে, তোমাকে কিছু বলে তো লাভ নেই– তুমি তো বিশ্বাস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

করবে না।

বীথির বুকের ভেতরে তখন স্নেহ ছল ছল করে ওঠে। মনটা ভরে যায় তার। বলে, কে বললো যে তোকে বিশ্বাস করবো না?

মা, সত্যি টাকাটা আমি খুঁজে পাচ্ছি না, কোথায় যেন হারিয়ে ফেলেছি।

কেউ পকেটে হাত দিয়ে বের করে নেয় নি তো?

মায়ের কথায় টুকুর বুকের ভেতরে ধক করে ওঠে। তাহলে কি শাহিন? আপনা থেকে সে যেন প্রশ্ন করে বুকের ভেতরে। আবার সঙ্গে সঙ্গেই কে যেন ধিক্কার দেয়, ছি! টুকু ছি!

ছেলের মুখে কষ্টের চিহ্ন দেখে বীথি তাকে বুকের মধ্যে চেপে ধরে। হ্যাঁ, তার বিশ্বাস হচ্ছে এখন, সত্যিই ছেলে টাকাটা হারিয়ে ফেলেছে। ঐ অবস্থাতেই সে ছেলেকে বলে, ওভাবে টাকা পয়সা রাখলে কি চলে? বল? আমরা কি বড় লোক? কত হিসেব করে চলতে হয় আমাদের, বুঝিস না?

এমনই সংসার বীথির। প্রথম যখন সংসার পাতলো, তখন কত বয়স? ১৮? হ্যাঁ, ১৮ই। বড় ভাই তো মামলা করার জন্য তৈরি। বলেছিলো, বদমাশটাকে জেলের ভাত যদি না খাইয়েছি তো আমার নাম তোমরা বদলে রেখো। আব্বারও সায় ছিলো। মেজ ভাই কিছু বলে নি। তবে একটা অপরাধ করার ভাব চোখে মুখে ফুটিয়ে আব্বা আর বড় ভাইর কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকতো। কারণ ওরই সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিলো রায়হানের। শুধু বুবু বলতো, কেন? মামলা মোকদ্দমা করার কী দরকার? মামলা করলে খুব সম্মান বাড়বে তোমাদের তাই না? বেশ, করলে না হয় মামলা, ছেলেটাকে জেলেও পাঠালে, কিন্তু তারপর?

সাংবাদিকের বিরুদ্ধে মামলা– খবরের কাগজে উঠবে না ঐ মামলার খবর? তারপর মেয়েটার বিয়ে হবে? বলো, দিতে পারবে বিয়ে?

আব্বা বুবুর মুখে অমন কথা শুনে মিইয়ে যান। তারপর যখন বীথির ম্যাট্রিক সার্টিফিকেট খানা খুঁজে পাওয়া যায় না আব্বার তালা দেয়া আলমারির ড্রয়ারের ভিতরে, তখন আব্বা আরও রেগে যান। বড় ভাইকে ডেকে বলেন, যা ফারুক, রাস্কেলটাকে ডেকে এনে বিদায় করে দে তোর বোনকে। ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বলবি, কোনোদিন যেন এ বাড়িতে না ঢোকে– ওকে বলবি আমরা মনে করি, এ বাড়ির ছোট মেয়ে মরে গেছে।

কথাটা বলতে বলতে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠেছিলেন আব্বা। তাঁকে অমন কাঁদতে দেখে বীথির খুব কষ্ট হচ্ছিল মনে। আব্বার পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ার জন্য সে ছুটে বেরুতে যাচ্ছিলো। কিন্তু পারে নি। বড় বুবু ধরে ফেলেছিলো দরজার কাছে। ধরে ঘরের ভেতরে টেনে এনে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলো। ধমক দিয়ে বলেছিলো খবরদার যাবি না পোড়ারমুখী, একবার তো মুখ পুড়িয়েছিস আবার কপালও পোড়াতে চাস?

বীথির মনে আছে, বয়স নিয়েই মাথা ঘামাচ্ছিলো বড় ভাই। খুব মন দিয়ে হিসেব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

করা হচ্ছিলো, বারবার করে আব্বাকে জিজ্ঞেস করছিলো, কোন বছর ওর জন্ম ? ম্যাট্রিক সার্টিফিকেটে কোন সাল দেয়া আছে ? আব্বা স্মরণ করতে পারেন না। বড় বুবু পারেন না। সে একখানা কাণ্ড বটে। বীথির হাসি পায় ঘটনাটা স্মরণ করে। মেজ ভাইকে বগুড়া পাঠানোর কথা পর্যন্ত উঠেছিলো। কারণ বগুড়া গার্লস স্কুলের ছাত্রী ছিলো বীথি। শেষে কে যেন বলে ম্যাট্রিক সার্টিফিকেটের বয়সের জন্য বগুড়া যাওয়ার কী দরকার, একখানা ডুপ্লিকেট সার্টিফিকেট বের করলেই ঝামেলা চুকে যায়।

গোটা ব্যাপারটা ঘটে বিয়ের পর রায়হানের বন্ধু আসাদের বাড়ির চিলেকোঠায় দু'দিন কাটিয়ে বাসায় ফেরার পর। আসাদ অবশ্য সেই রাতেই খবরটা টেলিফোনে জানিয়ে দিয়েছিলো আব্বাকে। আসাদই বীথিকে পাঠায়। কাবিননামাখানা হাতে নিয়ে বীথি বাড়িতে ঢোকে। পা কাঁপছিলো তার। আব্বা বারান্দায় বসে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। বীথি কী করবে বুঝতে পারছিলো না, প্রথমে সে আব্বার পা ছুঁয়ে সালাম করতে যায়। তারপর হাতের ভাঁজ করা কাবিননামাখানা এগিয়ে ধরে। আব্বা পা সরিয়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু না বুঝেই সম্ভবত কাবিননামাখানা হাতে নিয়ে খুলে দেখেন এবং তারপর একইভাবে বসে থাকেন কিছুক্ষণ। চোখে মুখে হতভম্ব ভাব, চোখের পলক পর্যন্ত পড়ে নি।

সম্ভবত আসাদের দেয়া টেলিফোনের খবরটা তাঁর বিশ্বাস হয় নি– পরে শুনেছে, আব্বা ভাইয়াকে থানায় পাঠান ডায়েরি করার জন্য। কিন্তু থানা থেকেই মেয়ের বয়স জানতে চাওয়া হয়। তখন থেকেই বয়স নিয়ে খোঁজখবর শুরু হয়ে যায়।

বীথির স্পষ্ট মনে আছে, যা নিয়ে অতো খোঁজখবর, যার ওপর নিজের ভবিষ্যত নির্ভর করছিলো সেটা কি কেউ ভুলতে পারে ? বয়স তখন ১৮ পার হয়ে বেশ কয়েক মাস বেশি। ১৫তে ম্যাট্রিক, ১৭তে ইন্টারমিডিয়েট, পরের বছর ময়মনসিংহ থেকে আব্বা বদলি হলেন, ফোর্থ ইয়ারে উঠে ইডেনে ভর্তি হতে হলো। ডিসেম্বরে টেস্ট হওয়ার কথা ছিলো, তার আগেই, সেপ্টেম্বরে, ঘটনাটা ঘটাতে হলো। এমনিতে আব্বা এক মাস দু'মাস পর পরই মেয়ে দেখাতেন। সেটা কোনো মতে সয়ে যাচ্ছিলো। কিন্তু একদিন কোত্থেকে জুটিয়ে আনলেন এক বন্ধুর ছেলেকে। প্রথম সাক্ষাতেই লোকটা একেবারে গায়ের ওপর গলে গলে পড়তে লাগলো। একেকদিন কলেজের গেটে দাঁড়িয়ে থাকতো। বীথি বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে সামনে এসে দাঁড়াতো। আর দাঁত বের করে হাসতে হাসতে বলতো, তোমরা সবাই ভালো ? যদি সঙ্গে কেউ থাকতো বীথির, তো আগ বাড়িয়ে বলতো। আমার নাম মনসুর আহমদ, বিএসসি, আপার ডিভিশন ইন দ্য সেক্রেটারিয়েট, বীথি আমার আত্মীয়, আপনার সঙ্গে দেখা হলো, খুব ভালো লাগলো।

একদিন দু'দিন নয় প্রায়ই ঘটতে লাগলো অমন ঘটনা। বীথির সঙ্গে কেউ থাকলেই হলো। তার সঙ্গে গায়ে পড়ে আলাপ সে করবেই। কিছুদিনের মধ্যেই মনসুরকে দেখলেই তার ক্লাসের মেয়েরা বলতে শুরু করলো, ঐ যে তোমার আপার ডিভিশন আসছে। বুবুকে বলা হলে বুবু বললো, ও যা খুশি করুক, তুই ওদিকে কান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

না দিলেই হলো। আব্বাকে বললো তো আব্বা বললেন, একটু ছেলেমানুষ টাইপ, খুব সরল তো, তোকে বোধহয় ওর পছন্দ হয়েছে। ছেলেটা খুব ভাল, ওদের ফ্যামিলিও খুব বনেদী।

আব্বার কথা শুনে তার মাথার ভেতরে চক্কর দিয়ে উঠেছিলো। বুবুর কাছে গিয়ে সে কেঁদে পড়েছিলো। কিন্তু তবু ভরসা করতে পারে নি। কারণ বুবু আবার কথাটা তুলেছিলো বড় ভাইয়ের কাছে। আর বড় ভাইয়ের কি মত সেটা তো তার আগে থেকেই জানা। ওকে বলা হলে উল্টে বুবুকেই ধমক লাগালো। বললো, কেন, আপার ডিভিশন ক্লার্ক খারাপ কি ? ঐ জার্নালিস্ট-এর চাইতে একশ' গুণ ভালো। যাও বলে দাও ওকে। ওর পাস টাস করে দরকার নেই, এবার সংসারের কাজ শিখুক। অমন অবস্থায় সে আর কী করে। তাকে অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যেই ঝাঁপটা দিতে হয়েছিলো। এবং বয়সটা ঐ আঠারো বছরই। একেবারে কাঁচা বয়স তা কেউ বলবে না। কিন্তু হলে কী হবে! সংসার করা যাকে বলে তার তো সে কিছুই জানতো না। মা মারা যান ছেলে বেলায়। বড় বুবু তখন ক্লাস নাইনে পড়ে, মেজ বুবু বোধহয় সিক্স-এ। সংসার বড় বুবুও দেখতো না। রান্নার জন্য লোক ছিলো– কালুর মা আর ছিলো তানজি ফুফু; আব্বার চাইতে বয়সে বড় কোন সম্পর্কে যেন মামাতো বোন। মহিলা বারান্দায় বসে বসে হামানদিস্তায় পান ছেঁচে খেতেন আর কালুর মাকে এটা ওটা হুকুম করতেন। আসলে আব্বাই দেখতেন সবকিছু। সংসারের সে জানবেই বা কী আর বুঝবেই বা কী! মশলা বাটা, মাছ তরকারি কোটা, রান্না করা, ঘরদোর ঝাঁটপাট দেওয়া, কাপড় কাচা, সেলাই করা– কিছুই তাকে কখনো করতে হয় নি, তাই জানতোও না সে কিছু।

ফল হলো ভয়াবহ। ১৯৬২ সালে ঢাকা শহরের পাশে নতুন উঠতি এলাকাগুলোতে সর্বত্র কেরোসিনের চুলো চালু হয় নি। চুলো জ্বালাতে গিয়ে একেকদিন তার দু'চোখ জবা ফুলের মতো লাল হয়ে যেতো– ভাত হতো আধাসেদ্ধ, নইলে হয়ে যেতো জাউ-এর মতো। মাছ কুটতে গেলে আঙুল কেটে রক্ত বেরুতো ফিনকি দিয়ে।

দুই কামরার একটা বাসা ভাড়া নেওয়া হয়েছিলো। কিন্তু পর্দা কেনার পয়সা ছিলো না বলে গামছা, নয়তো কাচা কাপড় ঝুলিয়ে শুকোতে শুকোতে আব্রু রক্ষা করা হতো। ওরই মধ্যে পেটে এসে গেলো রঞ্জু। যেদিন নাইট ডিউটি থাকতো রায়হানের সেদিনের রাত যে কীভাবে কাটতো, সে কথা স্মরণ করলে এখনো তার গা হিম হয়ে আসতে চায়। ভাগ্যিস কিছুদিনের মধ্যেই জমিলার মাকে পাওয়া গিয়েছিলো– নইলে নির্ঘাত সে মারা পড়তো– হ্যাঁ, ভয় পেতে পেতেই তার মরণ হতো।

কিন্তু সবকিছু কেমন করে যেন সয়ে গেলো। হ্যাঁ, সমস্ত কিছু– উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা, ভয়, অনিশ্চয়তা, অভাব– সবকিছু সয়ে গেলো। আবার ওরই মধ্যে এক ফাঁকে সে পরীক্ষা দিয়ে বিএটা পাসও করে ফেললো। রান্নাবান্না শিখলো– বাটনা বাটা, ফুটনো কোটা, সেলাই-ফোঁড়াই করা, ঘরদোর ঝাঁটপাট দেওয়া, মাস কাবারি বাজারের হিসাব রাখা– বলা যায় সমস্ত কিছু সে শিখে ফেললো বছর দুয়েকের মধ্যেই। হ্যাঁ, মঞ্জু যখন পেটে তখন সে একেবারে পাকাপোক্ত গিন্নী। এমনকি ঐ অল্প সময়ের মধ্যেই সে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

কর্তাটিকে শাসন পর্যন্ত করতে শিখে গেছে। তখন সে বলতে পারে, আজ স্যুট পরো, কি আজ স্যুট নয়, পাজামা-পাঞ্জাবি পরো। কোনো কোনো দিন বলতো, অফিস শেষ করে আজ আড্ডা দিতে পারবে না, সোজা বাসায় চলে এসো। নাইট থাকলে বলতো, দেরি করে যাও– রাতটা অফিসেই থেকে যেও। বাসায় আসার দরকার নেই– মাঝরাতে ঘরের দরজা কে খুলবে ?

ছয়

বীথির আজকাল এই এক বাই হয়েছে– খালি পুরনো দিনের কথা স্মরণ হয়। সেকি বুড়ো হয়ে গেলো ? আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে একেকদিন সে নিজেকেই দেখে আর শুধায়, চুল কি তার সাদা হয়ে যাচ্ছে ? মুখে ওসব কিসের দাগ ? গায়ের রঙ তো তার এমন ছিলো না। হাতের আঙুল ? হাতের দিকে তাকিয়ে নিজের হাতকেই তার অচেনা লাগে। রায়হান একেকদিন হাত ধরে থাকতো আর থেকে থেকেই চুমু খেতো। জয়দেবপুরে পিকনিকে গেলে চাঁপা গাছের ডাল ভেঙে ফুলের কলি আঙুলের পাশে ধরে ছেলেদের ডেকে বলতো, দেখো তোমাদের মায়ের আঙুল কী রকম। একবার বড় বুবুর মেয়ে কৃণনের বিয়ের সময় দুধ আর আলতা এক জায়গায় মিশিয়ে ছেলেদের ডেকে বলেছিলো, দুধে আলতা রঙ কেমন হয় দেখো– এমনই ছিলো তোমাদের মায়ের গায়ের রঙ। একেবারে বেহায়া মানুষটা। রঞ্জু তখন এসএসসি দিচ্ছে– ছেলে লজ্জা পায় কিন্তু বাপের সেদিকে যদি কোনো রকম হুঁশ থাকে ?

পাগল, একেবারে পাগল স্বভাবের মানুষ। বীথি পুরনো দিনের কথা স্মরণ করতে করতে ভারী সুখের হাসিটি হাসে আপন মনে।

দূর থেকে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকা ছোট ছেলেটিকে দেখে আর মনে মনে নিজেকেই শুধায়, ওরা কি ওদের বাবার মতো হবে ? আহা, যদি হয়, তো বড় ভালো হয়।

বীথির সংসার হয়েছে, সংসারে তার সুখও হয়েছে। কিন্তু ঠাঁই ? ঠাঁই-এর ব্যাপারে সে নিশ্চিত নয়। সাংবাদিকতার চাকরি– কিছুদিন এ কাগজে, তো কিছুদিন ও কাগজে। আবার এমনও হয়– কিছুদিন কোনো কাগজেই হয়তো রইলো না। অথচ মাসে ভাড়ার টাকা ঠিকই গুনতে হচ্ছে। নইলে বাড়িঅলার গাল খেতে হয়– মাথা নিচু করে হাঁটতে হাঁটতে বাচ্চাদের মন পর্যন্ত ছোট হয়ে যায়। একটা পোক্ত ঠাঁই তার হলো না– সে তো জানে, টাকা পয়সার হিসেবটাও ঠাঁইয়ের ওপর নির্ভর করে। পোক্ত একখানা ঠাঁই না থাকলে সংসার টিকে থাকতে পারে না, আর সংসার টিকে না থাকলে সুখই বা কোথায় থাকে আর শান্তিই বা কোথায় থাকে ?

একই সঙ্গে পড়তো মীরা, কুষ্টিয়ার মেয়ে, বাবা বিয়ে দিয়েছিলো স্কুলে পড়ার সময়। মেয়েকে যখন ঢাকায় পড়তে পাঠালেন, তখন জামাই বাবাজি খায়রুল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

তরফদার ডাক্তারি পাস করে চাকরিতে ঢুকেছেন। দু'জনে সে কি মিল। রোজ বিকেল বেলা ইডেন হোস্টেলের গেটের কাছে খামোকা পায়চারি করতো। বউ-এর ছুটি হবে, তারপর না সে হোস্টেলে ফিরবে। সে সব হিসেব নেই, বাবু হা প্রেয়সী, হা প্রেয়সী, বলে গেটের বাইরে লেফট রাইট করে একবার ডাইনে যাচ্ছেন, আবার একবার বাঁয়ে যাচ্ছেন। ওদিকে মীরার উর্দুর শেষ ক্লাস ফুরোতে ফুরোতে পাঁচটার বেশি হয়ে যায়। কারণ প্রফেসর কাজমী শুধু শের পড়ান না, নিজে শায়রিও করেন পড়াবার ফাঁকে ফাঁকে। মাত্র তিনটি ছাত্রী তাঁর, সেই জন্যই কি না কে জানে, ভদ্রলোক দু'ঘণ্টা ধরে ক্লাস নিতেন। খায়রুলের তবু ধৈর্যচ্যুতি ঘটে নি কখনো।

তারপর খায়রুল বদলি হলো সিলেট, একবার যশোর, তারপর আবার সিলেট। তখন মীরার মাসে একবার স্বামীর সঙ্গে দেখা হয় কিনা বলা মুশকিল। কলেজের ভ্যাকেশনে অবশ্য দু'জনে এক সঙ্গে থাকতে পারে। তবে থাকতে পারলে কী? ছেলেপুলে যাতে না হতে পারে সেদিকে ডাক্তার সায়েরের কড়া নজর। তার যুক্তি কী? না বউয়ের লেখাপড়া শেষ হবে। তারপর দু'জনে বাসা ভাড়া করবে, তারপর এক ঠাঁই হয়ে বসবাস করা।

এদিকে কী হলো কেউ বুঝলো না, কোত্থেকে ঢাকা মেডিক্যালেরই একটি নার্সের মাঝখানে এসে পড়ার খবর পাওয়া গেলো। তারপর আর দেরি হয় নি। অস্ট্রেলিয়ার একটি তরুণ সাংবাদিক ঢাকায় এসেছিলো, কীভাবে যেন মীরার সঙ্গে চেনাজানাও হয়ে গিয়েছিলো। কেউ বুঝতে পারে নি। শেষে দেরি সইলো না মীরার। সে চলে গেলো সিডনী আর সেখানে থেকে পাঠানো তালাকের নোটিসটা পায় খায়রুল ডাক্তার। সুতরাং পোক্ত ঠাঁই দরকার, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দরকার– না হলে সংসার হয় না। হলেও টেকে না। অন্তত বীথির বরাবর তা-ই বিশ্বাস। স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কও হয়তো রয়ে গেলো কিন্তু সন্তান গেলো আলগা হয়ে– ঠাঁই হলো সেই জায়গা যেখানে স্বামী স্ত্রী আর সন্তান একসঙ্গে মিলতে পারে। আসলে তিনটারই দরকার, একটা না থাকলেই সব যায় ভেস্তে। পাখির নীড়ের মতো বনলতা সেন-এর আসল তত্ত্ব ওইখানে– বীথির হাসি পায়। কে যেন বলেছিলো কথাটা? মাজেদা আপা, হ্যাঁ মাজেদা আপাই, তার বেশ মনে পড়ে। স্বামীটি ছিলেন সাংবাদিক। আপার বোধহয় তখন পেটে বাচ্চা, স্বামী ভদ্রলোক হাত ধরে আস্তে আস্তে রিকশা থেকে নামিয়ে টিচার্স রুমে এনে বসিয়ে দিয়ে যেতেন। আপা তখন বাপের বাড়ি থাকতেন– আর গোলমালটাও বোধহয় তখনই শুরু হয়। ওই সময় কবিতার বক্তব্য আর উপমা উৎপ্রেক্ষা নিয়ে আপা খুব বাঁকা বাঁকা কথা বলতেন। তখনই ঠাট্টা করে পাখির নীড়ের ওই ব্যাখ্যাটা দিয়েছিলেন। অন্য মেয়েরা হেসেছিলো খুব কিন্তু বীথির হাসি পায় নি। কারণ তার মা ছিলো না বলেই কি না সে জানে না– নিজেদের বাড়িটা তার ভালো লাগতো না। কেমন জংশন স্টেশনের মতো মনে হতো। আব্বা নিজেও তাঁর জীবনের শেষ দিকে ওই বাড়িতে থাকতে চাইতেন না। বড় ভাইয়ের কাছে চিটাগাং চলে যেতেন। নইলে বড় বুবুর কাছে গিয়ে থাকতেন খুলনায়। ভাবী ভালো ব্যবহার করতেন না। দুলাভাইও শীতল ব্যবহার করতেন। তবু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

শেষ যে বার হাসপাতালে যান, সেবার মনে মনে একেবারেই ভেঙে পড়েছিলেন। রায়হানের হাত ধরে বলেছিলেন, তোমাকে আমি মনের দিক থেকে গ্রহণ করতে পারি নি। তাই তোমার বাড়িতে গিয়ে আমি থাকি না। আমি জানি না, তুমি আমাকে গ্রহণ করেছো কি-না। তবু বলছি, এবার হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আমি তোমার বাসায় গিয়ে উঠবো– ওখানেই আমি আমার শেষ দিন ক'টা কাটাবো। আব্বার কথা বলার সময় রায়হানের চোখের কোণে পানি দেখতে পেয়েছিলো বীথি। হাসপাতালে গিয়ে আব্বার ভেঙে পড়া অসহায় অবস্থা দেখে বীথির নিজেরও কান্না পেয়েছিলো। রায়হানকে বলেও ছিলো, চলো আমরা আব্বার সঙ্গে গিয়ে থাকি। রায়হান রাজিও হয়েছিলো সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কাউকেই কিছু করতে হয় নি। আব্বাকে আসতে হয় নি বাড়ি থেকে পালিয়ে বিয়ে করা ছোট মেয়ের সংসারে। আর বীথিকেও যেতে হয় নি আব্বার বাড়িতে।

বীথি বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ানো ছোট ছেলের দিকে তাকিয়ে মনে মনে ভাবে, আমাদেরও কি শেষ পর্যন্ত আব্বার মতো অবস্থা হবে ? আমার আর রায়হানের ? সংসার থেকে আলাদা হয়ে যায় কি মানুষ ? স্বামী-স্ত্রীর মাঝখানে মৃত্যু এসে গেলে কি আর সংসারের ঠাঁইয়ের কোনো মূল্য থাকে ?

বীথি মন থেকে কোনো প্রশ্নেরই জবাব পায় না।

পোস্টটা লেখা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, ঐ সময় টেলিফোন। রিসিভার কানে তুলতেই গাঢ় মেয়েলি গলার স্বর শুনতে পায়। খুবই অন্তরঙ্গ গলায় মিসেস সাদেক বলেন, দু'দিন ধরে অপেক্ষা করলাম। কিন্তু আপনার কোনো খবর নেই। শেষে আমিই টেলিফোন করলাম।

একটু থেমে ফের বলেন মহিলা, কী, চিনতে পারছেন না ? আমি মেরি বলছি।

বুঝতে পারছি, রায়হানের গলা দিয়ে অল্প হাসির স্বর বের হয়। বলে, বাহ্ আপনাকে চিনব না ? কী খবর বলুন, কী মনে করে ?

না, কিছু মনে করে নয়, বাহার মুনশির খবর জানতে চাইছি, ও কি আপনার ওখানে গিয়েছিলো ?

নাতো, রায়হান জানায়। বলে, ও এলে বাসায় যায়– আর বাসায় গিয়ে থাকলে খবরটা অবশ্যই আমি পেতাম।

না অফিসে নয়, পরশুদিন আপনার সঙ্গে অফিসে দেখা করার কথা বলেছিলো।

রায়হানের চিন্তা হয় একটু। বলে, উঁহু, অফিসে আসে নি– এলে কেউ না কেউ আমাকে ঠিকই জানাতো– কিন্তু কেন ? রায়হান জিজ্ঞেস না করে পারে না। বলে, ওর খোঁজ কেন করছেন ? কোনো খবর আছে ?

হ্যাঁ, ও তো বলে গেলো তাড়াতাড়ি জমিটা যেন রেজিস্ট্রি করে নিই– জমির মালিক কুতুবউদ্দিনের নাকি টাকার খুব দরকার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

রায়হান কী বলবে, বুঝতে পারে না। তবু বলে, মালিকের তো দরকার হতেই পারে–

দরকার না পড়লে কি কেউ জমি-জমা বিক্রি করে? এদিকে আমরা তৈরী কী না, সেটাই প্রশ্ন– যদি আমার কথা বলতে বলেন তাহলে তো বলবো, আমি তৈরী নই– আমার সপ্তাহ খানেক আরও সময় লাগবে।

তাছাড়াও একটা কথা, মেরি প্রসঙ্গ বদলে ফেলে। বলে, জমিটা আমি এখনও দেখিনি– আমরা কীভাবে কে কোন দিকে নিচ্ছি। সেটাও তো জানা দরকার– আমার হাজব্যাণ্ড বারবার করে এই কথাটাই বলতে চাচ্ছেন।

রায়হান ফের হাসে। বলে, ও নিয়ে ভাবতে নিষেধ করুন, যেদিকে দেবেন, সেদিকেই আমি নেবো– শুধু গাড়ি চলবার রাস্তা থাকলেই হলো।

না তা কেন? মেরি ফের গাঢ় স্বরে হাসে। বলে, আমরা প্রতিবেশী হচ্ছি। দু'জনের সুবিধা-অসুবিধা না দেখলে কি আমাদের চলবে? আপনি কি একবার এদিকে আসতে পারবেন।

রায়হান বুকের ভিতরে চমকে ওঠে। কথাটা কানে যেতেই তার বিচিত্র রকমের অনুভূতি হতে থাকে। ক'দিন আগের প্রথম সাক্ষাতের ঘটনাটা মনে পড়ে। নিষিদ্ধ একটা আকর্ষণও বোধ করতে থাকে সে।

কী হলো, আসতে পারবেন না? বাহারউল্লাহ মুনশি সম্পর্কে একটু আলাপও হওয়া দরকার– ওর কাজকর্ম দেখে আমার সন্দেহ হচ্ছে– আসছেন তো?

রায়হান হ্যাঁ না বলতে পারে না। শুধু পাল্টা জিজ্ঞেস করে, মুনশি কী করেছে সেটা তো বললেন না।

মেরি ঠাণ্ডা গলায় জানায়, কী করেছে সেটা নিজের কানে শুনে যান– ফোনে ওসব কথা বলে বোঝানো যাবে না।

রায়হান তখনও ইতস্ততঃ করে। কারণ তার হাতের কাজটা শেষ করতে আরও কিছুক্ষণ সময় লাগবে। তারপর চীফ এডিটরের সঙ্গে মিটিং-এ বসতে হবে সুতরাং আজ, এখন, সে কেমন করে যায়?

কী হলো, আসতে পারবেন? মেরির গলার স্বর এবার বেশ রুঢ় শোনায়। তাতে রায়হান হেসে ওঠে। বলে– মনে হচ্ছে আপনি রেগে যাচ্ছেন?

না, রাগ কেন করবো, রাগের কী হয়েছে, এবার রীতিমতো শীতল স্বর মেরির গলায়।

বলে, মুনশি লোকটার চরিত্র সম্পর্কে একটা খারাপ খবর পেয়েছি– সেজন্যেই আসতে বলছিলাম; ও নাকি আমাদের বায়নাটা বাতিল করে ওই জমি অন্যের কাছে বিক্রি করে দেয়ার চেষ্টা করছে– আপনি কি আসবেন?

হ্যাঁ আমি অবশ্যি আসবো, রায়হান বলে, তবে এক্ষুণি আসতে পারবো না– এখন আমি একটা কাজ করছি। লেখালেখির কাজ, বুঝতেই পারেন, একটু সময় বেশি লেগে যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ও, তাই ? মেরি একটু যেন আশ্বস্ত হয়। বলে, আমি ভাবলাম কী না কী– আসুন তাহলে সময় করে একবার। বিকালের আগে আসতে পারবেন না ?

রায়হান ঘড়ির দিকে তাকায়। এখন বাজে একটা, মহিলা বিকালের আগে কেন যেতে বলছেন ? তার মনে খটকা লাগে। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপার আছে কি ? সে মনের ভিতরে ফের আকর্ষণ বোধ করে।

বাসভাড়া বেড়ে যাওয়া নিয়ে, যে লেখাটা লিখছিলো, ফোন নামিয়ে রেখে, ফের সেটা ধরলো।

কিছুক্ষণ লেখার পর পুরোটা যখন পড়লো দ্বিতীয়বার, তখন লেখাটা তার নিজের কাছেই ভালো লাগলো না। বাসভাড়া বাড়ানোর জন্যে ক'দিন আগে যে মালিক আর চালকরা বাস ধর্মঘট করেছিলো, সেটা সে ভালোভাবেই ব্যাখ্যা করেছে– কিন্তু বাসভাড়া বাড়ানোর ফলে পাবলিক যে ক্ষেপে যেতে পারে, সেই হুঁশিয়ারিটা তার লেখায় ভালো রকম স্পষ্ট হয় নি। সে বোঝে, শাজাহানপুরে যাওয়ার চিন্তাটা তার মগজের ভেতরে ঘুরপাক খাওয়ার কারণে লেখাটার দশা এমন দাঁড়িয়েছে। লেখাটা যখন লিখছিলো, তখন থেকে থেকেই মনে হচ্ছিলো, ভর দুপুরের নির্জন বাড়িতে সাদেক সাহেবের বাসায় যাওয়া কি তার উচিত হবে ?

লেখাটা শেষ করে সে কম্পোজে পাঠিয়ে দিয়ে বেয়ারাকে চা দিতে বলে। চা খেয়ে সে বেরিয়ে পড়বে। ঘড়ির দিকে তাকালে দেখে, দুটো বাজে। তার মানে শাজাহানপুর থেকে আলাপ সেরে সে ৩টা/৪টা নাগাদ বাসায় পৌঁছে যাবে। সে ভেবে পায় না, মহিলা কেন ডাকছেন। বাহারউল্লাহ মুনশি সম্পর্কে যা বলার কথা তা তো বলেই ফেললেন। তারপরও কেন যাবার তাগিদ ?

চা খেতে খেতেই সে নিউজ রুমের দিক থেকে কয়েক জনের উত্তেজিত গলার স্বর শুনতে পায়। সে উঠছিলো, ঐ মুহূর্তে নতুন রিপোর্টার সালেহউদ্দিন এগিয়ে এসে বলে, খবর শুনেছেন রায়হান ভাই ?

কী ?

মেডিক্যাল ছাত্রদের ওপর পুলিশ টিয়ার গ্যাস ছুঁড়েছে, লাঠিচার্জও করেছে ক্যাজুয়ালটি অনেক, বহু এ্যারেস্ট করেছে।

সে কি! রায়হানের বুকের ভিতরে ধড়াস করে ওঠে। বলে, তুমি হাসপাতালে গিয়েছিলে ? জখম কতো ? কী ধরনের ?

তেমন সিরিয়াস নয় বলে জানালো– কিন্তু দেখলাম, জনা পাঁচেকের মাথায় ভালো রকম জখম– ব্যাণ্ডেজ ভিজে যাচ্ছে ব্লিডিং বেশি হওয়ায়। একজন তো অজ্ঞান হয়ে আছে– ডাক্তাররা খুব ব্যস্ত– সংখ্যা তো অনেক– বোধহয় পঞ্চাশের ওপরে।

নাম পেয়েছো ?

না সবার নাম পাই নি– ওদের ক্লাসমেটরা জানালো– কথাটা বলে রায়হানের দিকে নোট বই খানা এগিয়ে দেয় সালেইউদ্দিন। রায়হান একনজর দেখে নেয় নাম পাঁচটা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

আমি কিন্তু ভাই বুঝলাম না, সালেহউদ্দিন বলতে থাকে, পুলিশ মেডিক্যাল ছাত্রদের পেটালো কেন ? আমি সামনেই ছিলাম, মনে হচ্ছিলো যেন মোষ, গরু পেটাচ্ছে– আহাম্মক না হলে কোনো মানুষ ওভাবে পেটাতে পারে ? ওদের অসুখ হবে না ? এ্যাকসিডেন্ট হবে না ? তখন ?

ওরা কিন্তু ডাক্তার নয়, ছাত্র। পেছনে থেকে শিফট ইনচার্জ আব্দুল্লাহ বলে ওঠে।

তাতে কি, সালেহউদ্দিন বলে, এরাই তো ডাক্তার হবে দু'দিন পর। আমি তো শুনে এলাম ইন্টার্নি ডাক্তাররাই ছিলো সামনের দিকে। তাদের মধ্যেও কয়েকজন জখম হয়েছে।

আরও কী কী কথা হয়, রায়হান খেয়াল রাখতে পারে না। সালেহউদ্দিনকে সে বারবার জিজ্ঞেস করে, এ্যারেস্ট হয়েছে ক'জন ? নাম পেয়েছো ?

নিজের লেখাটার প্রুফ দেখার জন্য সে আর অপেক্ষা করতে পারে না। শাজাহানপুরে যাওয়ার কথাও তার আর মনে নেই তখন। সে এক এক করে ইত্তেফাক, দৈনিক বাংলা, সাংবাদ সব খবরের কাগজের নিউজ সেকশনে ফোন করে জখম আর গ্রেফতার হওয়া ছাত্রদের নাম খোঁজ করে।

কিন্তু পায় না। কেমন করে পাবে ? নাম কি অতো তাড়াতাড়ি আর নিউজ টেবিলে আসে ? সে নিজেই জানে রিপোর্টারের লেখা শেষ হলে চীফ রিপোর্টারের হাত ঘুরে তারপর খবরটা নিউজ টেবিলে আসে।

কিন্তু তার মন মানতে চায় না। মাঝখানে সে একবার দৈনিক বাংলা থেকে ঘুরেও আসে। মঞ্জুরের সঙ্গে দেখা হয়, কিন্তু সেও আটক ছেলেদের সবার নাম বলতে পারে না। বলে, প্রেস রিলিজ না বেরুনো পর্যন্ত সবার নাম পাওয়া মুশকিল হবে রায়হান ভাই।

একখানা নামের লিস্ট সে অবশ্যি দেখায়, কিন্তু তাতে সে রঞ্জুর নাম দেখতে পায় না। তবু তাতেও মনের ভেতরকার উদ্বেগটা কাটে না, বরং আরও বেশি করে ঘোঁট পাকাতে থাকে। কেবলি আশঙ্কা হতে থাকে যে, রঞ্জু হয় ধরা পড়েছে, নইলে জখম হয়ে কোথাও পড়ে রয়েছে। অফিসে ফিরে এসে সালেহউদ্দিনের তৈরি করা জখম আর আটক ছেলেদের নামগুলো সে পায় কিন্তু তবু তার বিশ্বাস হতে চায় না। মনের ভেতরকার উদ্বেগটা গুড়গুড় করতেই থাকে। সে হাসপাতালের দিকে রওনা হচ্ছিলো ঐ সময় টেলিফোন আসে– দৈনিক বাংলার মঞ্জুর জানায় না, রায়হান ভাই রঞ্জুর কিছু হয়, নি ওর এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলো– তবে তিনটি ছেলের জখম বেশ সিরিয়াস, একজনের তো বোধহয় স্কালই ভেঙে গেছে, এমন ইনহিউম্যান ব্রুটলিটি, চিন্তা করে দেখুন, দেশের সব চাইতে ব্রিলিয়ান্ট ছেলে যারা, তাদের সঙ্গে পুলিশের এমন ব্যবহার, এই সরকারের দিন ঘনিয়ে এসেছে, আপনি দেখবেন।

মঞ্জুরের সঙ্গে কথা বলার পর রায়হানের মন থেকে উদ্বেগটা চলে যায় বটে, কিন্তু একই সঙ্গে ঘটে একটা উল্টো ব্যাপার। তার ভীষণ রাগ হয়– মগজের চিন্তা একেবারে উল্টো দিকে চলতে শুরু করে। সে ফিরে গিয়ে লেখার টেবিলে বসে পড়ে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

আগামীকাল তার যে এডিটরিয়ালটা লেখার কথা, সেটাই সে লিখতে বসে যায়। এই বিষয়ের ওপর তাকে লিখতে বলা হবে কিনা তার ঠিক নেই, কিংবা হয়তো এডিটর নিজেই লিখবেন কালকের প্রথম এডিটরিয়াল, তবু সে লিখতে আরম্ভ করে। সরকারী হুকুম, পুলিশের বাড়াবাড়ি এসব নিয়ে বেশ কিছুটা সে লিখেও ফেলে। কিন্তু তারপরই তাকে থামতে হয়। কারণ কোন সব দাবিতে মিছিলটা করেছিলো মেডিক্যালের ছাত্ররা, সেটাই তার ভালো করে জানা নেই। ডাক্তারদের চাকরির সংখ্যা খুব কম এমন একটা দাবির কথা সে শুনেছিলো। কিন্তু সেই দাবি নিয়েই কি আজকের মিছিল ? সে ঠিক জানে না। খবরটা নেয়ার জন্য সে নিউজ টেবিলের দিকে যায় কিন্তু তখন আর সে সালেউদ্দিনকে পায় না। যে নতুন ছেলেটি কাজ করছিলো, সে জানালো, সালেহ ভাই পুলিশ কন্ট্রোল রুমের দিকে গেছে।

সুতরাং আবার ফেরা নিজের টেবিলে। এতোকাল ধরে কাজ করছে। কিন্তু স্বভাবটা তার বদলালো না। রাগ হলেই সে লেখার টেবিলে গিয়ে বসে– তখন লিখতে ইচ্ছে করে তার, লেখাটা ছাপানো যাবে কিনা, এডিটর পছন্দ করবেন কি না– সেসব কথা তখন তার মনে থাকে না। ৭৪/৭৫-এ এমন হয়েছিলো কয়েকবার– '৮১তেও হয়। ভিয়েতনাম দিবসে ইউসিস-এর সামনে পুলিশের গুলিতে একটি ছেলে মারা গেলে ঐদিনই সে এডিটরিয়ালটা লিখে প্রেসে পাঠিয়ে দিয়েছিলো, লেখাটা কম্পোজও হয়ে গিয়েছিলো। কপাল ভালো যে লেখাটা মাহমুদ সাহেবের নজরে পড়েছিলো– নইলে চাকরিটা তার সেদিনই চলে যেতো। কারণ কাগজের মালিক পক্ষ তাদের কাগজে অমন এডিটরিয়াল সহ্য করতো না। হাসান ভাইকে তো সেবার দৈনিক বাংলা থেকে বেরই করে দেয়া হয়। '৮২ তেও সে একই কাণ্ড ঘটিয়েছিলো। সামরিক বাহিনী ক্ষমতা কেন নেবে ? এমন নাম দিয়ে একটা পোস্ট সে লিখে ফেলেছিলো– এডিটরের অনুমতি ছাড়াই।

নিজের শেষ না করা লেখাটা সে বসে বসে দেখে কিছুক্ষণ। পুরনো একটা কথা তার ফের মনে পড়ে। জেলখানায় প্রফেসর হক তাকে বলেছিলেন। সেই একেবারে প্রথম দিকে, ১৯৫৪ তে ৯২ক ধারা জারি হয় যখন। বলেছিলেন, তুমি খামোকা রাজনীতি করতে এসেছো– তোমার কাজ তো রাজনীতি নয়– লেখালেখি– ওটা নিয়ে থাকো তাতে কাজ হবে। সে মনে মনে খুব চটে গিয়েছিলো স্যারের ওপর। কিন্তু পরে দেখেছে, স্যারের কথাটা মিথ্যে ছিলো না। আসলেই তার সাহস শক্তি কিছুই নেই যে প্রতিবাদ করবে– তাই সে রাগ হলেই লিখতে বসে যায়। কলমের মুখ দিয়ে সে মনের ঝাল ঝাড়ে। নিজেকে তার স্বাভাবিক মানুষ বলে মনে হয় না– কেবলই ধিক্কার দিতে ইচ্ছে করে নিজেকে।

হঠাৎ তার খেয়াল হয়, অফিসটা যেন ব্যস্ত হয়ে উঠছে। পিয়ন বেয়ারা কথাবার্তা বন্ধ করে দেয়। নিউজ টেবিলের হাসাহাসি থেমে যায়, দু'জন লোক বারান্দায় আড্ডা মারছিলো। প্রুফ সেকশনে হুড়োহুড়ি করে ঢুকতে গিয়ে দু'জনেই ধাক্কা খায়। রায়হান নিজের আসন থেকে কাচের ভেতর দিয়ে আমানউল্লাহ খানকে খেতে পায়। খান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

াহেব সোজাসুজি নিউজ টেবিলে চলে যান। আব্দুল্লাহকে কী যেন বলেন। হাসতে হাসতেই বলেন কিন্তু আব্দুল্লাহর মুখে পাল্টা হাসি দেখা যায় না। আমানউল্লাহ তারপর সোজা চলে আসেন রায়হানের দিকে। ভেতরে ঢুকে বলেন, আজ তো আপনার পোস্ট লেখার কথা, তাই না ? লেখাটা নিশ্চয় হয়ে গেছে ?

জ্বী, রায়হান মাথা হেলায়।

একটা সুখবর আছে, আমানউল্লাহ হাসতে হাসতে বলেন, আপনার এ্যাডভান্স রেডি, এ্যাকাউন্টস থেকে চেকটা নিয়ে যাবেন।

ঐ ক'টি কথা বলেই আমানউল্লাহ বেরিয়ে যান। এদিকে আব্দুল্লাহ ধীর পায়ে রায়হানের কামরায় ঢোকে। তারপর কাছে এসে বলে, এটা কেমন ব্যাপার, রায়হান ভাই ?

কোনটা ? রায়হান ঠিক বুঝতে পারে না।

উনি বললেন, মেডিক্যাল ছাত্রদের ওপর পুলিশের হামলাটাকে ফোর্থ লীড করতে। আর রিপোর্টে যেন কোনোভাবেই ঘটনাটাকে স্লো আপ না করা হয়– এটা নাকি বড় কর্তার হুকুম।

রায়হানের ভ্রূ কুঁচকে ওঠে। ক'দিন আগে আমানউল্লাহ খানের লেখাটার কথা তার মনে পড়ে। এখন বুঝতে অসুবিধা হয় না। ভদ্রলোক কেন নিজের নামে অমন একখানা লেখা ছাপাবার জন্য পাগল হয়ে উঠেছিলেন।

দেখতে দেখতে বেলা গড়িয়ে যায়। আকাশে মেঘ জমেছে, রায়হান অফিস থেকে বের হবার সময় লক্ষ্য করে।

রিকশা ডাকবে, এমন সময় আব্দুল্লাহ পাশে এসে দাঁড়ায়। বলে, রায়হান ভাই কি বাসায় যাচ্ছেন ?

হ্যাঁ, তুমি ?

একটু প্রেস ক্লাবে যাবো ভাবছি– যাবেন ?

যাবো ? রায়হান মনে মনে হিসাব করে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে, দুটো দশ। রঞ্জুর খবরটা নেওয়া উচিত তার। সেজন্যে প্রথমে বাসায় যাওয়ার দরকার। কারণ মঞ্জুরের খবরটা যদি ঠিক হয়, তাহলে ওর বাসায় থাকার কথা। কিন্তু যদি বাসায় ওকে না পাওয়া যায়, তাহলে আবার ওকে খুঁজতে বেরুতে হবে। ফের যেতে হবে ওর হোস্টেলে, নয়তো কলেজে। সে আব্দুল্লাহর মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, ঠিক আছে, চলো, প্রেস ক্লাবেই যাই।

কথাটা বলার সময় শাজাহানপুরে যাওয়ার কথা তার স্মরণ হয় বটে তবে মনের দিক থেকে সে কোনো রকম তাগিদ বোধ করে না।

দুপুরের প্রেস ক্লাব মানে একেবারে জমজমাট কারবার। তরুণদের ভিড়টাই বেশি– চারদিকে তাকিয়ে পাকা চুল তার নজরে পড়ে না। দুপুর বলেই বোধহয় বুড়োরা তার মতোই কম আসে। কোথাও বসবে কি না যখন ভাবছে, তখনই সালেহউদ্দিন কোত্থেকে যেন সামনে এসে দাঁড়ায়। বলে, দুপুরে হঠাৎ আপনি রায়হান ভাই ? কী মনে করে ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

না, কিছু মনে করে আসিনি– হঠাৎ চলে এলাম আর কী ? মেডিক্যাল ছাত্রদের ব্যাপারটা কী হলো, খবর নিয়েছো ? ক্যাজুয়ালটি কতো ?

জ্বী ৫০– এ্যারেস্ট ১৭। না রাজিব রায়হান নামে কেউ কোনো লিস্ট-এ ই নেই।

তুমি নামটা কীভাবে জানলে ? রায়হান অবাক হয়।

ও-ই বললো, সালেহউদ্দিন জানায়।

বললো মানে ? ওর সঙ্গে দেখা হয়েছে তোমার ?

জ্বী, ও-ই আমাকে এক পাশে ডেকে নিয়ে পুরো খবরটা জানায়। তারপর আপনার নাম বলে নিজের পরিচয় দেয়। একেবারে খাঁটি খবর– পুলিশের কাছেও এমন ডিটেল খবর নেই, একেবারে সরকারের ইনভলভ্‌মেন্ট পর্যন্ত।

রায়হানের খারাপ লাগে শুনে– কারণ যে খবরটা সালেহউদ্দিন যোগাড় করেছে তার কিছু ছাপানো হবে না 'গণ একতা' কাগজে।

একই সঙ্গে আবার চিন্তাও হয় মনে, রঞ্জু কি রাজনীতির সঙ্গে পুরোপুরি জড়িয়ে পড়লো ?

ফেরার পথে সারাটা রাস্তা চিন্তাটা মগজের অলিগলি জুড়ে ছেয়ে রইলো, রঞ্জুর কি রাজনীতির সঙ্গে নিজেকে জড়ানো উচিত ? ডাক্তারি পাস করে ওর তো আরও ওপরের দিকে যাওয়ার কথা– সার্জারির দিকে ঝোঁক। চেষ্টা করলে কি ভালো সার্জন হতে পারবে না ? নিশ্চয়ই পারবে ? ওর কী দরকার রাজনীতিতে জড়ানোর ? এখনকার যা রাজনীতি। এই দলবাজির সঙ্গে ওর স্বভাবের মিল নেই– ও মিথ্যে কথা বলতে পারে না। মানুষের মন বুঝে চলতে পারে না। কাউকে কথা দিলে সেটা প্রাণপণ রাখার চেষ্টা করে। কোনোদিন কারুর সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ কিংবা মারামারি করে নি– ও কেমন করে রাজনীতি করবে ? বিশেষ করে এখনকার আর্মড ক্যাডারঅলা ছাত্র-রাজনীতি ?

বাসার সামনে রিকশা থেকে নেমে ভাড়া মেটানোর পর ওপরের দিকে মুখ তুললে ব্যালকনিতে রঞ্জুকে দেখতে পায়। রাস্তার মোড়ের দিকে তাকিয়ে আছে– চোখে মুখে দুশ্চিন্তার ছায়া।

দরজা খুলে দেয় বীথি। ঘরে পা রাখতেই বলে, মঞ্জুর সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে ? রায়হানের বুকের ভেতরে ধড়াস করে ওঠে। সে বলে, না দেখা হয় নি– কিন্তু কেন ?

সকাল দশটার দিকে রঞ্জুদের কলেজে গোলমাল হওয়ার খবরটা দিয়ে সেই যে ছুটে বেরুলো, তারপর আর পাত্তা নেই।

রঞ্জু কখন এসেছে ? রায়হান জিজ্ঞেস না করে পারে না।

এই তো কিছুক্ষণ আগে– মঞ্জুটা এতো জ্বালায়। আর ভালো লাগে না। বুঝেছো।

রায়হান পাখার নিচে বসলে রঞ্জু সামনে এসে দাঁড়ায়। বলে, আব্বু খবর জানো।

হ্যাঁ, শুনলাম, কিন্তু পুলিশ ডাক্তারদের ওভাবে পেটালো কেন ? খোঁজ নিয়েছো ?

না, তবে শুনলাম গভর্ণমেন্ট নাকি কোনোরকম প্রোটেস্ট সহ্য করবে না– এই পুলিশ এ্যাকশনটা পীপলকে টেরোরাইজ করার জন্য।

তুমি মিছিলে ছিলে, রায়হান ছেলের চোখের দিকে তাকায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

রঞ্জুর মুখে হালকা হাসির আভাস দেখা যায়। বলে, হ্যাঁ, ছিলাম।

থাকা উচিত হয় নি– তুমি কিন্তু পলিটিক্সে জড়িয়ে পড়ছো!

না আব্বা, পার্টি ফার্টি করি না আমি– রঞ্জু ব্যাখ্যা করে বলে, এটা তো প্রফেশনের ব্যাপার– তুমি নিশ্চয়ই জানো ৫ হাজারের মতো ডাক্তার বেকার– অথচ হাসপাতাল গুলোতে ডাক্তার নেই, ওষুধ নেই, ডিসিপ্লিন বলে কিছু খুঁজে পাওয়া যায় না– কিছু না কিছু তো করতেই হবে, আর ডাক্তারদের সমস্যার কথা কি অন্য কেউ তুলবে কখনও, বলো ?

কিন্তু তোমার ভ্রাতাটি কোথায় গেলেন ? রায়হান দরজার দিকে নজর রেখে প্রশ্নটা করে।

বলে, ওদিকে আবার ইউনিভার্সিটিতে কিছু হলো কি না কে জানে।

না, ইউনির্ভার্সিটিতে– মানে কার্জন হলে, কিছু হয়নি।

তুই ঠিক জানিস ? পাশ থেকে বীথি বলে ওঠে।

বাহ্ জানবো না, রঞ্জু জানায়। বলে, আমি নিজেই তো কার্জন হলের ভিতর দিয়ে এলাম– তবে শুনলাম আর্টস বিল্ডিং-এ নাকি মিছিল হয়েছে। টিএসসির দিকেও বেশ ভারী মতো টেনশন ছিলো।

তা হলে ? বীথি ভীত গলায় বলে ওঠে।

তাহলে কী ? রঞ্জু ঠিক বুঝতে পারে না।

তাহলে তোরা বাপবেটাতে মিলে খোশগল্প করছিস কীভাবে– তোদের একটু দুশ্চিন্তাও হয় না– আমার মনের ভিতরে খালি কেন যেন কু ডাকছে।

মায়ের কথার জবাবে রঞ্জু কিছুই বলতে পারে না। তারও চিন্তা হয়, মঞ্জুর কিছু হয়ে যায়নি তো ? সে তবু বলে, তুমি খামোকা চিন্তা করছো মা, ওর কিছু হয় নি, আমি এক্ষুণি বেরুচ্ছি।

ওকি কোনো দলে ঢুকেছে ? রায়হান প্রশ্নটা না করে পারে না– এই মেজো ছেলেটাকে তার একটু হাবাগোবা ধরনের বলে মনে হয়।

রঞ্জু বাবার প্রশ্নের জবাবে কিছু বলতে পারে না। নিশ্চিত করে কিছু জানলে তো বলবে !

সে বলে, আমি যাই, দেখি খোঁজ করে।

কোথায় খোঁজ নিতে যাবে! ইউনিভার্সিটিতে ?

না, রঞ্জু মাথা নাড়ায়। বলে, বিকাল বেলা ইউনিভার্সিটিতে কাউকে পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। পুরানো পল্টনে আমার দুই বন্ধু থাকে। ওরা ইউনিভার্সিটির ছাত্র, ওরা বলতে পারবে দুপুর বেলা ইউনিভার্সিটির দিকে কোনো গোলমাল হয়েছে কি না।

কথাটা বলেই রঞ্জু বেরিয়ে যায়।

বীথি অস্থির হয়ে বারবার বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ায়। তার মনের ভিতরে ছেলের জন্য উদ্বেগ কাঁপে আর মঞ্জুর মুখখানা বারবার ভেসে ওঠে। ঐ সময় আবার টুকু ফেরে স্কুল থেকে। বাড়িতে অসময়ে আব্বাকে দেখে সে রীতিমতো অবাক হয়। বলে আব্বা, তুমি অফিসে যাও নি ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

প্রশ্নের জবাব না পেয়ে আর বাবার মুখ গম্ভীর দেখে বারান্দায় দাঁড়ানো মায়ের কাছে গিয়ে সে নিচু গলায় জানতে চায়, কী হয়েছে মা ?

মঞ্জু এখনও আসেনি।

আসে নি তো কী হয়েছে ? বন্ধুদের সাথে কোথায় হয়তো গেছেটেছে।

বীথি ছোটছেলের কথা কানে না নিয়ে বলে, যাও মুখহাত ধুয়ে খেয়ে নাও। টেবিলে খাবার ঢাকা আছে।

দেখতে দেখতে ওদিকে বিকেলও ফুরিয়ে আসে। টুকুও খানিক পর বেরিয়ে যায়। বলে, দেখে আসি কাজল ভাইকে পাওয়া যায় কি না– ও নিশ্চয়ই কিছু বলতে পারবে।

কাজল কে ? রায়হান স্ত্রীর দিকে তাকায়। বীথি মাথা নাড়ায়। বলে, জানি না, হবে হয় তো বন্ধুটন্ধু।

না, বন্ধু না, টুকু জানায়। বলে, কাজল ভাইও ভূগোলের ছাত্র, এক বছর সিনিয়র।

সারা বাড়ি চুপচাপ হয়ে যায় তারপর। বেলা শেষ হতে দেরি নেই, পশ্চিমাকাশে এখনও মেঘ, তাই তাড়াতাড়ি অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে।

বীথি বলে, তুমি কি ঠুঁটো জগন্নাথের মতো বসে থাকবে ? বীথির গলার স্বরে উদ্বেগ এবং অভিযোগ দুই-ই ফোটে।

আচ্ছা এতো চিন্তার কী হয়েছে, রায়হান স্ত্রীকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করে। বলে, ওতো আগেও এমন দেরি করেছে, করে নি ?

না, এমনভাবে না– দুপুরে খাওয়া দাওয়া করে বেরিয়ে একেকদিন তার ফিরতে রাত হয়েছে– কিন্তু এভাবে নয়। রঞ্জুদের কলেজে গোলমাল হয়েছে খবরটা আমাকে জানিয়েই সেই যে ছুটে বেরুলো, তারপর আর পাত্তা নেই। বলো, এমন হয়েছে কখনও ? ভাইকে ভালোবাসে বলেই না অমনভাবে ছুটে বেরিয়ে গেলো– সেই ছেলে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডায় জমে থাকবে ? ও ছেলেকে আমি পেটে ধরেছি, ওকে আমি চিনি না ? এ তুমি কী বলো ?

রায়হানের মনের ভিতরটাও তোলপাড় করে ওঠে– তারও ভেতরে ভেতরে অস্থির লাগে। বলা যায় না, ছেলেটার বিপদ হতেও তো পারে– যা দিনকাল। এমনিতে ছেলেটা বড় চাপা– তবে বুক ভরা ওর ভালোবাসা। ছোট থাকতে মায়ের ড্রয়ার থেকে পয়সা চুরি করে ভিকিরিকে ভিক্ষা দিতো। একবার ঐভাবে ভিক্ষা দেওয়ার সময় ধরাও পড়েছিলো। '৭৪ এ দুর্ভিক্ষের সময় বাড়িবাড়ি ঘুরে রুটি ভিক্ষা করে গ্রাম থেকে আসা ক্ষুধার্ত লোকদের কাছে বিলি করার ঘটনাটা তো খবরের কাগজে ছাপাও হয়েছিলো। রায়হান বেরুবার জন্য তৈরি হয়।

রঞ্জু সাব্বিরকে পায় না। তবে শাকিলকে পায়। সে টিভি দেখছিলো। তাকে সব কথা খুলে বলা হলে সে থানায় খোঁজ নিতে বলে।

কেন, থানায় কেন খোঁজ নিতে যাবো ? রঞ্জু ঠিক বুঝতে পারে না।

যেসব মেডিক্যাল ছাত্রকে ধরা হয়েছিলো তার মধ্যে ১৭ জনকে রেখে অন্য সবাইকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। শাকিল ব্যাখ্যা করে বলে, কিন্তু যারা মেডিক্যাল-এর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ছাত্র নয় অথচ স্পষ্ট ছিলো তাদের আটকে রাখা হয়েছে– ওদের বিরুদ্ধে পুলিশ কেস দেবে।

কিন্তু ওতো অনেক পরে গিয়েছিলো, তাও আমাকে খুঁজতে।

কিছু বলা যায় না, শুনলাম পরেও, মানে বেলা ১২টা/১টার দিকেও কয়েকজনকে এ্যারেস্ট করা হয়েছে– তুমি বরং রমনা আর লালবাগ থানায় খোঁজ নাও। তবে হ্যাঁ, শাকিল সাবধান করে দেয়। বলে, মেডিক্যাল-এর ছাত্র জানতে পারলে ওরা তোমাকেও ধরে রেখে দিতে পারে। রঞ্জু মুশকিলে পড়ে যায়। বাসায় গিয়ে থানায় খোঁজ নেয়ার কথাটা আব্বাকে বলবে কি না, বুঝে উঠতে পারে না। আব্বার হার্টের প্রব্লেম সেটা যেমন মনে পড়ে, তেমনি মায়ের কান্নাকাটির কথাও তার স্মরণ হয়। তাই সে তক্ষুণি বাসায় ফেরার চিন্তাটা বাদ দেয়। বরং মনে মনে ঠিক করে, আব্বার বন্ধুদের কাউকে গিয়ে ধরবে প্রেসক্লাবে গিয়ে। খবরের কাগজের লোকদের ওপর পুলিশ চটা থাকলেও ওদেরকেই যে তারা সমঝে চলে একথা কে না জানে।

আসাদ চাচাকে পাওয়া যায় না, জামান চাচাকেও না, তবে কামালউদ্দিন চাচাকে দেখতে পায় এক কোণের টেবিলে বসে বন্ধুর সঙ্গে চা খেতে খেতে গল্প করছেন।

রঞ্জু কাছে গিয়ে দাঁড়ালে কামালউদ্দিন আড়চোখে এক নজর তাকিয়ে নিয়ে ফের বন্ধুর কথার দিকে মনোযোগী হন।

রঞ্জুকে তখন একটু কাশতে হয়, তারপর নিচু গলায় চাচা সম্বোধন করে ডাকতেও হয়– বলতেও হয়, আমাকে চিনতে পারছেন না। আমার নাম রঞ্জু, আপনার বন্ধু রায়হান আলী–

ও-ও, আরে কি কাণ্ড! কামালউদ্দিন উঠে দাঁড়িয়ে বন্ধু-পুত্রের ঘাড়ে হাত রেখে কাছে টানে। তারপর চেয়ারে বসিয়ে বলে, কী খবর তোমার, আঙ্কেল ?

রঞ্জু খবরটা জানালে, কামালউদ্দিনের কপালে সামান্য ভাঁজ পড়ে। তবে পরক্ষণেই আবার মিলিয়ে যায় সেই কপালের ভাঁজ। বলেন, মনে হয় না, চিন্তা করার মতো তেমন কিছু হয়েছে। ওর বন্ধুবান্ধবদের কাছে খোঁজ নিয়েছো ?

মিছিলে পুলিশের হামলা হওয়ার পরে যে আবার একবার ধরপাকড় হয়েছে দুপুর বেলা, সে খবরটা জানালে কামালউদ্দিনের ভ্রূ ফের কুঁচকে ওঠে। জানতে চান, তুমি শিওর ?

জ্বী, রঞ্জু জানায়। বলে, বেলা ১২টা/১টার দিকে কয়েকজনকে এ্যারেস্ট করা হয়েছে।

কামালউদ্দিন বন্ধু-পুত্রের উদ্বিগ্ন মুখ দেখে সাহস দেয়ার জন্য বলেন, আরে অতো ঘাবড়াবার কী হয়েছে– পুলিশ ধরে নিয়ে থাকলে তো বরং নিশ্চিন্ত থাকা যায়। কিন্তু যদি তা না হয়– গ্রুপে গ্রুপে খুনোখুনি হচ্ছে– বলা যায় কিছু ?

ও তো চাচা কোনো পার্টি করে না। রঞ্জু কথাটা না জানিয়ে পারে না। তাতে কামালউদ্দিনের ভ্রূর ভাঁজ ফের মিলিয়ে যায়।

সঙ্গের বন্ধুটিকে বিদায় দিয়ে লাউঞ্জে গিয়ে বসেন কামালউদ্দিন। তারপর বলেন, কী যেন নামটা ? রঞ্জ নাম জানালে কামালউদ্দিন টেলিফোন করেন, প্রথমে রমন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

থানায়। তারপর লালবাগে। মাহীব রায়হান নামটা বলার পরে কিছুক্ষণ রিসিভারটা কানে ধরে রাখেন কামালউদ্দিন। মনে হয়, খুব মনোযোগ দিয়ে কিছু যেন শুনছেন। তারপর খুব শান্ত গলায় জানতে চান, কেন ধরা হয়েছে, জানেন ?

প্রশ্নটা করেই কামালউদ্দিন নিজের পরিচয়টা দেন। তখন বোধহয় কিছু বলা হয় তাঁকে। কথা শেষ করে রিসিভারটা নামিয়ে রেখে কামালউদ্দিন উঠে দাঁড়ালে রঞ্জু তাঁর চিন্তিত মুখের দিকে তাকায়। তখন বলেন, ও পড়ে ইউনিভার্সিটিতে ও কেন মেডিক্যাল কলেজের দিকে গিয়েছিলো ? এখন যে ঝামেলাটা হবে, সেটা পোয়াবে কে? আমার কথা তো সরকারী দলের লোকেরা শুনবে না– তোমার বাবার কথাও শুনবে বলে মনে হয় না।

রঞ্জুর মুখ দিয়ে কোনো কথা বের হয় না, একইভাবে সে কামালউদ্দিন চাচার মুখে দিকে তাকিয়ে থাকে।

তুমি এক কাজ করো, কামালউদ্দিন রঞ্জুর ঘাড়ে হাত রেখে বলেন, প্রথমে সোজা চলে যাও থানায়– দেখো, চার্জ কী দিচ্ছে– আমি এদিকে দেখছি, কোন উকিলকে পাঠানো যায়– পারলে থানা থেকেই জামিনের ব্যবস্থা করতে হবে।

রঞ্জুর দিশেহারা অবস্থা হয়। কী করতে হবে, এমন অবস্থায় মানুষ কী করে, কিছুই তার জানা নেই। অমন দিশেহারা অবস্থাতেই সে থানার দিকে রওনা হয়। যেতে যেতে বারবার মনে হয়, মঞ্জুটা একেবারেই গাধা। ওর মতো সেন্টিমেন্টাল ছেলে আর কেউ আছে বলে তার মনে হয় না। বেছে বেছে যতো ঝামেলা সব ও-ই বাধাবে। মনে মনে সে রাগে আর আপসায়। যদি কোনোভাবে থানা থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে আজ, তাহলে থাপ্পড় মেরে যদি দুই গালই ওর ভেঙে না দিয়েছে তো নিজের নামটাই সে বদলে ফেলবে– ইউনিভার্সিটিতে পড়ছে তবু যদি আহাম্মকটার একটু আক্কেল জ্ঞান হয়।

রিকশা থেকে নেমে থানায় ঢুকতে যাবে, ঐ সময় সে মঞ্জুর গলায় ভাইয়া ডাকটা শোনে। আর তারপরই কোন দিক থেকে যেন, বোধহয় ওপর থেকেই হবে, মঞ্জু এসে তার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

রঞ্জু ঐ মুহূর্তেই লক্ষ্য করে ফেরদৌস অদূরে দাঁড়িয়ে আছে। সে মুখোমুখি তাকিয়ে দেখে ছেলেটার দিকে। খুব ডগডগে লাল রঙের কালারঅলা গেঞ্জি আর জিনস পরনে, পায়ে হাইবুট। তার কেমন সন্দেহ হয়, ফেরদৌসই কি তাহলে মঞ্জুকে ছাড়িয়ে আনলো ?

রঞ্জু ভাই, ফেরদৌস বলে, ওকে মেডিক্যাল কলেজের দিকে যেতে নিষেধ করে দেবেন– শুনছি আরও নাকি ধরপাকড় হবে– আপনিও সাবধানে থাকবেন– এখন কিছুদিন আপনার হোস্টেলে না থাকাই ভালো।

কথাটা বলেই ফেরদৌস চলে যাচ্ছিলো। রঞ্জু ডাকলো, ফেরদৌস শোনো।

ফেরদৌস ফিরে এসে মুখোমুখি হলে রঞ্জু বলে, জামিন কে নিলো মঞ্জুর ?

না, জামিন নয়। এমনি ছেড়ে দিয়েছে– আপনি ওকে নিশ্চিন্তে বাসায় নিয়ে যান– কোনো কেস হবে না। ফেরদৌস ফের ঘুরে দাঁড়ায় এক মুহূর্তের জন্য। তারপরই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

সামনের দিকে পা বাড়ায়। রঞ্জু দেখে, থানার গেট পার হয়ে লম্বা শরীরের ছেলেটা আরও লম্বা লম্বা পা ফেলে আবছা অন্ধকারে রাস্তার দিকে চলে যাচ্ছে।

রঞ্জুর ঐ মুহূর্তে জানতে ইচ্ছে করে, কেন ফেরদৌস মঞ্জুকে ছাড়িয়ে আনলো, ওর তো কোনো লাভ নেই। বরং ওকে এক রকম এড়িয়েই চলে সবাই। তবু কেন এমন কাজ করলো ছেলেটা ? তাহলে কি ফেরদৌস এখনও নষ্ট হয়ে যায় নি ? নাকি মস্তানদেরও বন্ধু থাকে ?

ব্রিটিশ কাউন্সিলে মেয়ে দু'টির সঙ্গে বেশ কয়েকবারই দেখা হয়েছে মঞ্জুর। দেখা হলেই বেশি ফর্সা মেয়েটি ফিক করে হাসে। হাসিটা সঙ্গে সঙ্গে চেপে ফের গম্ভীর হতে চেষ্টা করে। ওর অমন কাণ্ড দেখে মঞ্জুরও মজা লাগে। তার অনুমান, তাকে দেখলেই মেয়েটির হাসি পায়, কিন্তু ঐ হাসি পাওয়াটা সে আবার কাউকে জানতে দিতে চায় না। আর যে মেয়েটি একটু শ্যামলি সে তাকে না দেখার ভান করে। মঞ্জুর ধারণা, নিশ্চয়ই তার কথায় কিংবা চেহারায় কিছু আছে, যা দেখে মেয়েটির আপনা থেকে হাসি পায়। তার চটে যাওয়া উচিত, কিন্তু সে চটে না। চেনে না, জানে না, কথাবার্তা হয় না– খামোকা অমন মানুষের ওপর কেন সে চটতে যাবে ?

মাঝখানে ফর্সা মেয়েটিকে নিজেদের ডিপার্টমেন্টে দেখলো একদিন, একই ইয়ারের মেয়ে রাখির সঙ্গে। ডিপার্টমেন্টের অল্প দু'একজন যাদের সঙ্গে তার কথাবার্তা হয়, রাখি তাদের মধ্যে একজন। রাখিরা পুরানা পল্টনে থাকে, ওর বাবাও সাংবাদিক– সেই কারণেই বোধহয় মঞ্জুর সঙ্গে সে সহজভাবে কথা বলতে পারে। সেদিনই রাখি হাসতে হাসতে বললো, তিমলিকে তুমি চেনো ?

মঞ্জু অবাক হয়। বলে, কোন তিমলি ?

ঐ যে, তখন আমার সঙ্গে কথা বলছিলো, হিস্ট্রিতে পড়ে ?

ও, মঞ্জু এবার চিনতে পারে। বলে, হ্যাঁ, চিনি, কিন্তু ওর নাম জানতাম না– ওর নাম কি তিমলি ? নাহ্, মঞ্জু বিশ্বাস করতে না চাওয়ার ভঙ্গিতে বলে ওর নাম কেন তিমলি হবে ? ও কি তিমি মাছের বাচ্চাদের মতো মোটা ? ওর নাম তো হওয়া উচিত ফিংলি। ফড়িং-এর মতো হালকা পাতলা মেয়ের নাম তিমলি কেন হবে ?

রাখি হাসে খুব। বলে, ঠিকই আছে, রতনে রতন চেনে।

কী রকম ? মঞ্জু বুঝতে পারে না।

রকম একই, তুমি ওর নাম নিয়ে ঠাট্টা করছো। ও-ও তোমার নাম দিয়েছে গণ্ডার।

কী ? মঞ্জু আঁৎকে উঠে বলে, আমার নাম গণ্ডার কেন হবে ?

কে জানে, তোমার চামড়া বোধহয় মোটা, অনেক কিছু টের পাও না।

মঞ্জুর মনে পড়ে, গেণ্ডারিয়া নামটা বলেছিলো প্রথম দিন। সে বুঝে নেয় ঐ গেণ্ডারিয়া শব্দটা থেকে তার অমন নাম বার করেছে, কিন্তু সে বুঝতে পারে না, চামড়া মোটা হওয়ার কথা কেন বলছে রাখি। সে বলে, জিজ্ঞেস করো তো ফিংলিকে আমি কোন জিনিসটা টের পাই নি ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

রাখি এবার চোখে চোখ রেখে হাসে। বলে, অন্যকে জিজ্ঞেস করতে যাবো কেন ? আমার কি চোখ নেই ?

তার মানে ?

মানে কঠিন কিছু নয়, খুবই সোজা। ক্লাসমেটদের কম্পানি দেওয়া উচিত ছেলেদের, সেটা নিশ্চয়ই টের পাও না, সেদিন যে বললাম, আমি নিউমার্কেটে যাচ্ছি বই কিনতে। তুমি গিয়েছিলে ? তোমার ঐ সেন্স আছে ?

মঞ্জু বেকারদায় পড়ে যায় রাখির কথা শুনে। কৈফিয়ত দেয়ার জন্য বলে, আমার কাজ ছিলো– তাছাড়া তুমি যে তক্ষুণি যাচ্ছো, তা কিন্তু বলো নি।

রাখি হাত তুলে বলে, থাক, হয়েছে, সাফাই গাইতে হবে না– রাখির সঙ্গে কারুর যাওয়ার দরকার নেই, রাখি মিত্তির একাই সব কিছু পারে– একটা উদাহরণ দিলাম আর কি যে, তোমার চামড়া গণ্ডারের মতোই পুরু, তিমলিরা ঠিকই বুঝেছে।

আরও হয়তো কিছুক্ষণ অমন হালকা কথাবার্তা হতো। ঐ সময় হঠাৎ দূর থেকে ইশারা করে ফেরদৌস ডাকে। কাছাকাছি গেলে জিজ্ঞেস করে, প্রেম করছিস ?

যাহ্, মঞ্জু রীতিমতো লজ্জা পায়। বলে, ক্লাসমেট তো–

জানি, ফেরদৌস বলে, হিন্দু মেয়ে– ওদের সঙ্গে প্রেম করা খুব রিস্কি। বাবা-মা টের পেলে সঙ্গে সঙ্গে ইন্ডিয়া পাঠিয়ে দেয় মেয়েকে, খুব সাবধান, প্রেম-ট্রেম করিস না ওদের সঙ্গে।

ডাকলি কেন ? মঞ্জু জিজ্ঞেস করে।

না, কোনো কাজে নয়– এমনি, চল একটু হাঁটি।

হাঁটতে হাঁটতে দু'জনে দোয়েল চত্বর পার হয়। তারপর মাজারের পাশ দিয়ে পুকুর পাড়ের মানুষ দেখতে দেখতে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের গাছপালার নিচ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে যায়। ফেরদৌসই কথা বলে– সব ছেলেবেলার কথা। ওর মায়ের কথা, ওর আব্বা কতো আদর করতো সে কথাও বলে– তারপর বলে, কে জি স্কুলে পড়ার সময় অনীতা নামে একটি মেয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছিলো, সেই অনীতার গল্প অনেকক্ষণ ধরে করে সে। অনীতারা নাকি আমেরিকা চলে গেছে সেই খবরটাও তার জানা। চলতে চলতে বাগানের আরও ভেতরের দিকে যায় দু'জনে। ভেতরে বাইরের আওয়াজ কম, বাতাসে পাতা নড়ার আওয়াজ আর পাখির ডাক শোনা যায়। দূরে দূরে গাছের গুঁড়ির আড়ালে ছেলেমেয়েদের বসে কথা বলতে দেখা যায়। ফেরদৌস বলে, আমি হারিয়ে গেছি মঞ্জু। আমি আমার মা, আমার বাবা, আমরা সবাই হারিয়ে গেছি। আমার বাবা চাকরির ফাঁকে ফাঁকে শখের ফটোগ্রাফি করতেন, ঐ পর্যন্তই ঠিক ছিলো। কিন্তু তারপরই মুভি ক্যামেরা ধরলেন, এ্যাডফার্ম করলেন, তারপর থেকেই শুরু হলো গোলমাল– বাবা একদিকে তো মা আর একদিকে। মাকে দোষ দিই না– বাবাই সব কিছু ভেঙেচুরে দিলেন– আমি যে ছিটকে কোনদিক থেকে কোনদিকে চলে গেলাম নিজেই জানি না– এখন দেখছি, ফেরার পথ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না– আমি এবার চলে যাবো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

কোথায় ? কোথায় যাবি ? মঞ্জু জিজ্ঞেস না করে পারে না।

দেখি, ফেরদৌস হাঁটতে হাঁটতে বলে, হয়তো অস্ট্রেলিয়া। কিংবা কানাডা। এনি ড্যাম প্লেস ইজ বেটার দ্যান দিস রটেন কান্ট্রি– আমি চান্স পেলেই চলে যাবো।

হাঁটতে হাঁটতে তারা টিএসসির গেটে পৌঁছে যায়। মঞ্জু জিজ্ঞেস করে, আরও হাঁটবি।

নাহ্। চল এবার ফিরে যাই। আমি হলে যাবো, গিয়ে ঘুমাবো।

পা বাড়িয়েছে দু'জনে, ঐ সময় পেছন থেকে ডাক– ফেরদৌস। ফেরদৌস ?

একটু পরই কাছে এসে যায় আরও দু'তিনজন। একদল বলে, কোথায় যাস, চল, আজাদ ভাই ডাকছেন, আলাপ আছে।

মঞ্জু বলে, আমি তাহলে যাই–

ফেরদৌস মঞ্জুর হাত ধরে বলে, আরে সিরিয়াস কিছু না, এমনি আলাপ আর কি। চল বেশিক্ষণ দেরি হবে না।

মঞ্জুর কৌতূহল হয় আবার সঙ্কোচও হয়।

মধুর ক্যান্টিনের কাছে একটা জটলা ছিলো। সেটা পাশ কাটিয়ে ডাকসুর সামনে গিয়ে দাঁড়ালে দেখতে পেলো আরও একটা জটলা, নতুন নেতা তারিকুল আজাদ বসে আছে একদিকে, তার সামনে বেশ কয়েকজন। রঙিন গেঞ্জি, জিনস, কেডস, মাথায় ক্যাপ, কারো মাথায় রঙিন রুমাল ফেট্টির মতো বাঁধা। সিগ্রেট টানছিলো কেউ কেউ। হাসাহাসি হচ্ছিলো থেকে থেকে। ফেরদৌসকে দেখে আজাদ ভাই বলে উঠলো, আরে তুমি! এসো এসো– ভালোই হলো, এখন তো দেখছি সবাইকেই পাওয়া গেল। শোনো ভাই তোমরা– এটা প্রাথমিক আলোচনা, পরে আমরা আরও বড় নেতাদের সঙ্গে বসবো, কথা হচ্ছিলো, আমাদের প্রোগ্রামের সাকসেস নিয়ে– আমরা দেখেছি, শুধু ছাত্রকর্মীদের নিয়ে প্রোগ্রাম সাকসেসফুল করা যায় না। জনগণের সঙ্গে মিলেমিশে যেতে পারলেই ভালো কাজ হয়– সুতরাং আমরা যে যে এলাকার মানুষ সেই এলাকায় আমাদের বেস থাকতে হবে। কথাটা শেষ হওয়ার আগেই হাততালি পড়ে। খুব উৎসাহ দেখা যায় যাদের মধ্যে, তাদের দু'জনকে দেখে মঞ্জু রীতিমতো চমকে যায়– কি আশ্চর্য, নীলা আর টাটা এখানে কেন ? তার অস্বস্তিবোধ হতে থাকে। ইউনিভার্সিটি ছাত্রদের সমাবেশে তাদের পাড়ার ঐ দুই মাস্তান কীভাবে এসে যোগ দেয় সে কিছুতেই বুঝতে পারে না।

মঞ্জু উশখুস করতে করতে বলে, ফেরদৌস আমি বরং যাইরে, তোদের পার্টির বিষয় নিয়ে আলাপ হচ্ছে, আমার যাওয়াই ভালো।

ফেরদৌস কিছু বলে না, শুধু তার হাত ধরে রাখে। ঐ সময় পাশের একজনকে দেখে তার বন্ধুর জিনসের হাঁটু বরাবর এমব্রয়ডারি করা একটা খরগোসের ওপর হাত বোলাচ্ছে আর বলছে, ওহ্ মাই সুইট লিটল বেবি। সুইট লিটল বাম্বি। সুইট লিটল র‍্যাবি।

এ্যাই, পাগলামি করবি না, খরগোসঅলা ছেলেটি হাত সরিয়ে দেয় বন্ধুর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ক্যান, হাত ক্যান সরামু এ্যাঁ, তোমার হুকুমে চলবো ? তুমি ক্যাটা ?

বলতে বলতে সে কোমর থেকে পিস্তল বের করে। বলে, বেশি রওয়াব দ্যাহাবি না কইলাম, গুল্লি মাইরা দিমু।

দূর হালা খাটাস। নেশা কইরা আইছস দুপুর বেলা।

কথাটা বোধহয় অন্য কেউ বলে, আর তখনই হাসতে আরম্ভ করে পিস্তলঅলা ছেলেটি। ঐ হাসতে হাসতেই হাঁটুতে পিস্তলের নল ঠেকিয়ে ট্রিগার টিপে দেয়। আওয়াজ হয় তাতে, ডাইনে বাঁয়ে গুলির আওয়াজ হয় কয়েকটা– ফেরদৌস মঞ্জুর বাহু দু'হাতে টান দিয়ে লাফিয়ে ওঠে, তারপরই দু'জনে ছুট লাগায়। ছুটতে ছুটতে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের ভেতরে ঢুকে তারপর হাঁফ ছাড়ে।

ফেরদৌস বলে, তোকে নিয়ে যাওয়া আমার উচিত হয় নি। আর কখনো তুই আমার সঙ্গে কোথাও যাস না, বুঝলি, আমি বললেও না।

সাত

দেখতে দেখতে কয়েকদিনের মধ্যে টাকার ব্যবস্থা হয়ে গেলো। কিন্তু জমি রেজিস্ট্রি আর হয় না। নাটের গুরু বাহারউল্লাহ মুনশি যে কোথায় উধাও হলো কিছুই আন্দাজ করা যায় না। এদিকে আবার মাঝখানে ২/৩ দিন বাস স্ট্রাইক গেলো। তারপর হাঙ্গামা মেটে নি। বাস শ্রমিকদের বিক্ষোভ ভেতরে ভেতরে লেগেই আছে– কখন যে কী করে বসে কিছুই আন্দাজ করা যায় না। দূরের যাত্রায় তাই মানুষ আজকাল আর বাসের ওপর ভরসা করতে পারে না। তাই মুনশির খোঁজে যে কাউকে পাঠাবে তার উপায় নেই।

এদিকে অফিসেও ঝামেলা বেড়ে গেছে। তিনজন লীড রাইটারের মধ্যে একজন ছুটিতে। আমজাদ ভাইয়ের জটিল অসুখ। কেউ বলে মাদ্রাজ যাবে, কেউ বলে সিঙ্গাপুর যাবে। কেউ আবার বলে, আরে নাহ্ অতো সোজা। আগে কলকাতা পর্যন্তই যাক, তারপর না মাদ্রাজ আর সিঙ্গাপুরের কথা। সুতরাং অফডে বলে রায়হানের আপাতত কিছু নেই।

লেখালেখি করার লোকেদের নিয়েই যে শুধু সমস্যা, তা নয়। ম্যানেজমেন্ট, এ্যাকাউন্টস, প্রুফ রিডিং, সিকিউরিটি, সব সেকশনের লোকেদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ। দু'বছর হয়ে গেলো অতোবড় একটা কাণ্ড ঘটলো ২৬ দিন কাগজ বন্ধ, ভাবা যায় ? কোন সভ্যদেশে খবরের কাগজ অতোদিন ধরে টানা বন্ধ থাকে ? সেই দাবিদাওয়া মেনেও নিয়েছে শেষ পর্যন্ত সরকারও মালিকপক্ষও। কিন্তু দাবি পূরণের বেলাতেই যতো টালবাহানা। 'গণ একতা'র মালিক আজ দিচ্ছি, কাল দিচ্ছি, করে প্রায় দু'বছর পার করে দিলো। সুতরাং সাংবাদিক হোক আর কর্মচারী হোক, কাজকর্মে কার মন থাকবে ? ওদিকে রাজনৈতিক উত্তেজনাও বাড়ছে। আওয়ামী লীগ নির্বাচনে যাওয়ায় মনে হচ্ছিলো, গোলমাল বোধহয় মিটে যাবে। কিন্তু এখন তো মনে হচ্ছে সবই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

দুরাশা। কারণ দেখা যাচ্ছে, পার্লামেন্টের চাইতে আওয়ামী লীগের আন্দোলনের দিকে নজর বেশি। ইউনিভার্সিটি এলাকায় নিত্যনতুন হাঙ্গামা লেগেই আছে। রায়হান চারদিকের অবস্থা দেখে কেবলই হতাশ হয়। তবে হ্যাঁ, সংসারে একটা ভালো কাজ হয়েছে। ফোন নেয়া হয়েছে বাসায়– তাতে এখন সবারই দুশ্চিন্তা কিছুটা কম হয়।

মিসেস সাদেকের যে কী হয়েছে কে জানে। পর পর দু'দিন ফোন করলেন। তারপর ক'দিন ধরে একেবারেই চুপ। ওদিকে বাহারউল্লাহ মুনশিরই বা কিছু হয়ে গেলো কি না, তাই বা কে বলবে।

এদিকে বীথির রোজ এক তাগিদ, জমি রেজিস্ট্রির কী হলো? রায়হান আর কতো দেরি করবে। টাকা পয়সাগুলো ফুরিয়ে গেলে তবে সায়েবের টনক নড়বে! একদিন তো স্বামীকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে বিচিত্র চোখে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর ঠোঁট টিপে বাঁকা হাসি হাসতে হাসতে বললো, সত্যি করে বলো তো? আসলেই কি তুমি বাড়িঘর কিছু করবে, নাকি আমাদের নিয়ে খেলা করছো?

রায়হান স্ত্রীকে নিজের ব্যস্ততার কথাটা যেমন– তেমনি বাইরে যাতায়াতের অবস্থাটা কতো খারাপ, তা বোঝাতে পারে না। বীথি বিশ্বাসই করে না যে, তার সময়ের বড় অভাব। দু'জনের কাজ তাকে একলাই করতে হচ্ছে। অফডে তো দূরের কথা, সাপ্তাহিক ছুটি বলেও এখন তার কিছু নেই। আর যদি বলে যে, ফুলবাড়িয়ায় বাসে কিংবা বেবিট্যাক্সিতে হয়তো সে যেতে পারে, কিন্তু তাকে ফিরতে হবে পায়ে হেঁটে, তাহলে বীথি হাসতে হাসতে বলবে তাই যাও না গো একদিন– আমরা দেখি, তুমি কতো সুন্দর হাঁটতে পারো।

তবু ওরই মধ্যে একদিন সে ফুলবাড়িয়া গেলো। কিন্তু সেখানে গিয়ে বাহারউল্লাহ মুনশির হদিস আর করতে পারে না। জমির মালিক কুতুবউদ্দিনের সঙ্গে সহজেই দেখা হয়, চাঅলা ইজ্জত আলীর সঙ্গেও কথা হয়– এমন কি আব্বাস মিয়ার বাড়িতে নাসিমন্নেসার সঙ্গে পর্যন্ত দেখা হয়ে যায় তার– কিন্তু মুনশির টিকির নাগাল পায় না। কেউ তার খবর জানে না। তখন শুরু হলো খোঁজ। খোঁজ করতে করতে সাভার বাজারের কাছে পাওয়া গেলো তার ডেরা। তার বিবির সঙ্গেও দেখা হলো। বেশ মহিলা, পান চিবুতে চিবুতে কথা বললো– কিন্তু স্পষ্টভাবে কিছুই বোঝা গেলো না। একবার বলে সিলেটের মাজারে গেছে, তারপর বলে, না সিলেট না– সিরাজগঞ্জ যাইতে পারে, রাজশাহীতেই গেলো কি না, তারই বা ঠিক কি। তবে ফির হুনছিলাম ফরিদপুর যাইবো– কুন এক কামেল পীর নাকি কই থিকা উইড়া আইয়া বইছে।

স্পষ্ট বোঝা যায় না, মানুষটা কোথায় গেছে, তবে এটা ঠিক যে, সে ফুলবাড়িয়ায় নেই। অগত্যা ফের চলো ফুলবাড়িয়া। সাভার থেকে ফিরলে পর কুতুবউদ্দিনের সঙ্গে দেখা হয়– রায়হান তার সঙ্গেই সরাসরি কথা বলতে চায়। কুতুবউদ্দিন খুব খাতির করে বসায় তার বাড়িতে। কথা বলতে বলতে চোখে পড়ে একটি মেয়ে, কার বাড়ি থেকে যেন কাপ প্লেট আনছে আঁচলের আড়ালে লুকিয়ে। চোখে চোখে পড়লে মেয়েটি লজ্জা পায়। খানিক পরই কুতুবউদ্দিনের ছেলে আইনুদ্দিন এসে দাঁড়ায় সামনে। বলে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

স্যার, আপনেরে কতো যে বিসরাইছি তার হিসাব নাই– হালার মুনশিরে কইছি আমারে লইয়া চলো, তো হালায় হোনে না– কী করি, বাবায় খালি আপনার কথা কয়– এক বিবি সাবের ঠিকানা দিলো, গেলাম তার কাছে, তিনি কয়, মুনশিরে আনো– যত কই, মুনশি কই গেছে কেউ জানে না, আপনে জমি রেজষ্টারি করেন– তো খালি মাথাডারে লড়ায়, আর কয়, মুনশিরে না আনলে কথা নাই। কতো বুজাই যে এই মুনশি তো মক্তব মসজিদের মুনশি না– এই মুনশি হইল দালাল, পয়সা পাইবো যে দিক, লৌড় দিবো সেই দিক– বিবি সাবে কিছু বুঝতে চায় না– হ্যাষে কী আর করি, হয়রান হইয়া ফিরলাম, কামের কাম কিছুই হইল না।

রায়হান তখন নিজের বাড়ির ঠিকানা দেয়, অফিসের ঠিকানা দেয়। তারপর জিজ্ঞেস করে নেয়, আমার নাম জানেন তো ?

জ্বে, আইনুদ্দিন জানায়। বলে, স্যার, মুনশিরে বাদ দিয়াই কাম সারতে হইবো। আপনে ঐ বিবি সাবরে বুজাইয়া কন।

কথা বলতে বলতে চা এসে যায়, গাঢ় দুধের রঙটাই নজরে পড়ে বেশি, চায়ের সামান্য গন্ধ পাওয়া যায় শুধু। বিস্কুটের চেহারা ভালো, কিন্তু কবেকার প্যাকেট খোলা কে জানে, মুখে দিলে একটা ন্যাতানো পদার্থ তালুতে চেপ্টে লেগে থাকে। অমন চা-বিস্কুট খেতে খেতেই আরও কথা শুনতে হয়। কুতুবউদ্দিন বলে, জমির দাম কিন্তু কেরমেই বাড়তাছে কইলাম– রাস্তার লাগা জমি, বায়না করা না থাকলে ব্যাচা বিক্রি হইয়া যাইতো ক-বে, আমারে খামাখামা ঘুরাইতেছেন আপনেরা।

আহা আমরা তো রেডি, কেউ কি বলেছি যে জমি নেবো না ? আপনারাই তো যোগাযোগ করেন না, মুনশি যায় নি, আপনি যান নি।

রায়হানের মুখে পাল্টা অনুযোগ শুনে কুতুবউদ্দিন বোধহয় কিছুটা আশ্বস্ত হয়।

ফেরার পথে রায়হান ফের একবার জমি দেখতে যায়। দেখে রাস্তার দিকে ডানহাতি দিকটা উঁচু– বাঁহাতি দিকটা সেই তুলনায় বেশ নিচু। ডান দিকে উঁচু দিকটার লাগা ঘোষ বাবুদের বাগান, সেদিকটা পশ্চিম দিক, আর বাঁ দিকটা পূর্বদিক এবং সেদিকে একটা পুকুর– সে মনে মনে পূর্ব দিকটাই পছন্দ করে। তার অনুমান সাদেক সাহেবের স্ত্রী উঁচু জমি দিকটাই পছন্দ করবেন।

বিদায় নেয়ার আগে জমি রেজিস্ট্রির তারিখ, ভেণ্ডারের কাছ থেকে স্ট্যাম্প কেনা, দলিল লেখার জন্য মুহুরী ঠিক করা, এসব বিষয় নিয়ে কথা হয়। তবে পাকা সিদ্ধান্ত দেয়া যায় না– কারণ সাদেক সাহেবের স্ত্রীর সঙ্গে কথা না বলে পাকা কথা সে দেয় কেমন করে ? আইনুদ্দিন বলে, হ, ঠিক কথা। তিনিরা আসল পার্টি, তিনিরা রাজি না থাকলে তো কিছুই হইতে পারে না।

কথা বলতে বলতে বাসস্ট্যান্ডের দিকে যেতে থাকলে, একটা মাঝারি সাইজের গাঁট্টাগোট্টা লোক এসে যোগ দেয়। লোকটার মুখে চাপ দাড়ি, পরনে ফুলপ্যান্ট আর হাওয়াই শার্ট, পায়ে মোটা ধ্যাবড়া সাইজের চক্কর বক্কর কেড্‌স– শ্বশুরের সঙ্গে পাশাপাশি হবার জন্য জোর পা চালালে বেচারা বেশ জোরে একবার হোঁচট খায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

কুতুবউদ্দিন ডেকে বলে, স্যার আমার মেয়ার জামাইরে তো আপনে আগেও দ্যাকছেন- আমার মেয়া বদরুন্নেসার লগে বিয়া দিছি- নাম সফর আলী।

সফর আলী সালাম করে সোৎসাহে বলে, স্যার আমি মালয়েশিয়া যাইতে চাই- কিন্তু এক দালালে আমার টাকাগিনি মাইরা লইছে- দুবাই পাঠানের কথা ছিলো- সেই পঁচিশ হাজার ট্যাকা ফিরত দেয় না। ভর্দলোক ম্যানপাওয়ারের বিজনিস করে। সরকারী অফিসের বড় চারকিও করে। হ্যার অফিস এলিফ্যান্ট রোডে স্যার, ট্যাকা চাইতে গেলেই মাস্তান দ্যাহায়।

রায়হান দাঁড়িয়ে পড়ে কথাটা শুনে। বলে, একবার ঠকেছেন, তারপরও যেতে চান?

কী করি স্যার, সফর আলী হাঁফাতে হাঁফাতে বলে, দ্যাশে তো চারকি নাই- আইজ তিন বছর হইল আমি বেকার- শ্বশুরবাড়ি পইড়া থাকতে কেমুন লাগে আপনে নিশ্চয় বুজেন।

সফর আলী কেন হাঁটতে হাঁটতে ওভাবে দুঃখের গীত গাইছে রায়হান বুঝতে পারে না। তবু বলে, এবার ফের যদি টাকা নষ্ট হয়?

হে লাইগ্যাই তো কইতেছি স্যার, এই ম্যানপাওয়ারের এজেন্সিটার খোঁজখবর লইতে। আপনে সাংবাদিক মানুষ, খালি যদি এট্টু টেলিফোন কইরা খবর লইতেন তাইলেই কিন্তুক ব্যাডারা শায়েস্তা হইয়া যাইতো।

রায়হান লোকটার দিকে আড়চোখে তাকায় কয়েকবার। তার গলায় রূপোর চৌকোণা তাবিজ ঝুলতে দেখে। সোৎসাহে হাঁটতে থাকা মানুষটার দিকে তাকিয়ে সে বলে, দেশের ভেতরেই ব্যবসা ট্যাবসা করলে ভালো হতো না? আরও যদি টাকা পয়সা নষ্ট হয়? ফের যদি টাকা নষ্ট হয়?

দ্যাশে তো স্যার ব্যবসা নাই, সফর আলীর গলায় ক্ষোভ শোনা যায়। বলে, পারলে বেলাক করতে হইবো, নাইলে মুদীর দোকান, গেরামে মুদীর দোকান চলব? কন?

রায়হান সফর আলীর কোনো কথারই জবাব দেয় না। কী জবাব দেবে? আমলারা যে ম্যানপাওয়ার ব্যবসার সঙ্গে জড়িয়ে গেছে এটা তো মিথ্যা নয়, বহুলোক যে সর্বস্বান্ত হচ্ছে এসব ব্যবসায়ীদের ভাঁওতায়- সে খবরও তো তার কম জানা নেই- কিন্তু সব কথা কি লেখা গেছে কাগজে? যা লেখা হয়েছে, তার কোনো প্রতিকারই হয় নি- সুতরাং সফর আলীকে সে কোন কথা বলবে?

বাসস্ট্যান্ড-এ পৌছলে সামনে দাঁড়িয়ে দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে ঝুঁকে প্রণাম করে এক ধূতি পরা লোক। একটু চেনা চেনা লাগে। তারপর যখন লোকটা অমন ঝুঁকে থেকেই বলে, স্যার আমি বিন্দাবন কামার। তখন চিনতে আর অসুবিধা হয় না- বুঝতে পারে, ফর্সা জামা কাপড় পরণে থাকায় লোকটাকে চিনতে তার অসুবিধা হয়েছে।

রায়হান হাসতে হাসতে বলে, কী খবর বৃন্দাবন বাবু, ভালো আছেন?

আইজ্ঞা, ঠাকুর ভালোই রাখছে, আপনে কি স্যার জমিন কিইন্যা ফালাইছেন? বৃন্দাবনের হাত দু'খানি তখনও জোড় করা। বলে, মুনশি তো স্যার পরে আমারে আর কিছু কইলো না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

রায়হান কী বলবে বুঝতে পারে না। মুখে হাসি ঝুলিয়ে রাখে কিছুক্ষণ। তারপর অপ্রিয় কথাটা বলেই ফেলে। বলে, আপনার জায়গা তো ভালো। কিন্তু কাগজপত্র যে ঠিক নেই ? লোকে জমি কেনার সময় কাপগজপত্র দেখবে না ? বলুন ?

বৃন্দাবন হাঁ করে মুখ মেলে রায়হানের মুখের দিকে তাকিয়ে কী দেখে, সে-ই জানে– মুখ দিয়ে তার কথা বের হয় না।

বাস আসতে কেন যে দেরি হয় কেউ আন্দাজ করতে পারে না। ১০/১২ মিনিট পর পর বাস আসে এ পথে– কিন্তু ১ ঘণ্টা নাকি পার হয়ে গেছে আগের বাস যাওয়ার পর। যাত্রীরা জল্পনা-কল্পনা করে নয়ারহাটে নিশ্চয়ই কিছু গোলমাল হয়েছে ছাত্রদের সঙ্গে– ওখানে না হলে গোলমালের আর এক জায়গা সাভার– ওখানেই কিছু হয়ে গেলো কি না কে জানে।

এদিকে একজন দু'জন করে এসে জুটতে জুটতে যাত্রী সংখ্যা এখন অনেক– যদি বাস আসেও তাতে সবার জায়গা হবে কি না, সেই সমস্যার কথা বলাবলি করে যাত্রীরা। রায়হান কান দেয় না। তার নজর অদূরে বাড়িঘর, বাগান আর গাছপালা, চষা জমি আর খিলক্ষেত, চলন্ত মানুষ আর চরে বেড়ানো গরু-ছাগলের ওপর দিয়ে ঘুরে আসে। মনের ভেতরে যেন কেউ জানতে চায়, এখানেই কি থাকবে তুমি ? এইসব গাছপালা মানুষজন আলপথ চষা জমি আর ঘাস মাটির সঙ্গে মিলেমিশে ? থাকতে পারবে কি ?

মনের ভেতর থেকে সে জবাব পায় না। বৃন্দাবন কর্মকার ফের এগিয়ে এসে বলে, স্যার আপনের কুনো চিনা লোক যুদি জমিন কিনবার চায় তো দেইখেন, আমার স্যার ট্যাকার খুব দরকার।

লোকটার মুখের দিকে তাকালে প্রথম দিন যেমন মনে হয়েছিলো, কোনো জোতদার মহাজনের সামনে খাতক প্রজা দাঁড়িয়ে আছে, আজও তাকে তেমনই মনে হচ্ছে। সে কৌতূহলী হয়ে সামনের দিকে দু'পা এগিয়ে কাছাকাছি হয়। তারপর বলে, বৃন্দাবন বাবু, আপনার কাকা জ্যাঠার ছেলেরা ইণ্ডিয়া চলে গেলো, আপনি কেন গেলেন না ?

ক্যাম্বে যাই স্যার, ঐ দ্যাশে যাইতে হইলে ট্যাকা দরকার। খালি হাতে যাইয়া তো কুনো লাভ নাই– '৭২ সালে যুদ্ধের পর দ্যাশ স্বাধীন হওয়ার পরও যহন দ্যাকলাম দুশমনি অত্যাচার কমলো না, তহন তো গেছিলাম আমরা– কিন্তু লাভ হইল কই ? ঐ দ্যাশে কামারের কাম করণের লোক বিত্তর, হ্যারাই কাম পায় না– কে আমারে কাম দিবো কন ? ১ বচ্ছর বাদে ফিরা আইতে হইছে– নদীয়া জিলায় ছিলাম ৮ মাসের মতন। রিফিউজি খাতায় নামও লিখাইছিলাম, কিন্তুক কিয়ের কী ? পাঠায়া দিলো দণ্ডকারণ্য না কই, উড়িষ্যার জঙ্গলে– ছুডো পোলাটা মারা গেলো কলেরায়। হ্যাষে আর কী করি–

রায়হানের পুরো কাহিনী শোনার ধৈর্য থাকে না। সে জানতে চায়, যদি ইণ্ডিয়া না যান, তাহলে জমিজমা বিক্রি কেন করবেন ? বিক্রি করে দিলে চাষাবাদ করবেন কীভাবে ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বৃন্দাবন হাসে। বলে, আমরা তো স্যার হাইল্যা চাষা না, কর্মকারের বংশ আমাগো, আমাগো হাপর নেহাই হাতুড়ি আর একটা চুলা থাকলেই হইল। চাষের জমি আমাগো লাগে না, আর আজকাল চাষ করতে গেলে পুঁজিও তো লাগে!

এই পর্যন্ত বলে বৃন্দাবন আরও এক পা এগিয়ে ডাইনে বাঁয়ে তাকিয়ে নিচু গলায় বলে, স্যার আমার জমিখান লন, কম দামে পাইবেন।

রায়হানের খারাপ লাগে মানুষটার কাকুতি মিনতি দেখে। কিন্তু ঐ মুহূর্তে কিছু বলে না। হাসি হাসি মুখ করে। পায়চারি করার মতো কয়েক পা সামনে যায় ফের ঘুরে কয়েক পা পেছনে যায়। অমন সামনে পেছনে পায়চারি করতে করতে সে একবার নজর করে, দেখতে চেষ্টাও করে গাছপালা আর ঘরবাড়ির ফাঁক দিয়ে বৃন্দাবন কামারের বাড়িটা দেখা যায় কি না।

স্যার, বৃন্দাবন ফের বলে, কাগজপাতি কারও ঠিক নাই স্যার। কাগজ দেইখ্যা এই এলাকার জমি কিনতে পারবেন না।

রায়হান কথাটা কানে তোলে না। কারণ কথাটা এখন সবাই জানে, এখানে প্রথম দিনই মুনশি কথাটা তাকে বলেছে। ঐ সময় আবার কুতুবউদ্দিনকে হন্তদন্ত হয়ে আসতে দেখা যায়– এবার সঙ্গে জামাই ছেলে কেউই নেই। কাছে এসে বুড়ো হাঁফাতে হাঁফাতে বলে, আপনেরে একটা কথা কওয়া হয় নাই। রায়হান আগ্রহে ঝুঁকে পড়লে বলে, আমার পোলা আইনুদ্দিন কার লগে জানি জমি বিক্রির কথাবার্তা কইছে হুনছি, আপনেরা দেরি কইরেন না কইলাম।

রায়হান সোজা হয়ে দাঁড়ায়। মিসেস সাদেকের সন্দেহ হওয়ার কথাটা তার মনে পড়ে। মেরি মুনশিকে সন্দেহ করে কিন্তু এখন দেখছে আসল সন্দেহের পাত্রটি বেশ শক্তপোক্ত।

কুতুবউদ্দিন ফের বলে, আর একখান কথা। রায়হান ঘুরে দাঁড়ালে বলে, টাকা আমারে ক্যাম্নে দিবেন?

ক্যাম্নে দিবো মানে? রায়হান ঠিক বুঝতে পারে না। বলে, টাকা পয়সা যেভাবে লেনদেন হয়, সেভাবেই দেবো।

আমার কিন্তু স্যার এট্টু অসুবিধা আছে, কুতুবউদ্দিন জানায়। বলে, নগদ ট্যাক না দিয়া চেক দিতে পারবেন না?

বাহ্ কেন পারবো না, রায়হান খুশি হয়ে বলে, তাহলে তো ঝামেলা আরও ক হয়।

রায়হানের কথা শুনে কুতুবউদ্দিনের মুখে স্বস্তির ভাব ফিরে আসে। বলে, সাভা থন বেশি ট্যাকা আননের বহুত অসুবিধা, ট্যাকা গিনি থোওয়ারও ঝামেলা। ডাকাইতি ছিনতাই কেমুন বাড়ছে সবই তো জানেন।

আপনার ব্যাংক এ্যাকাউন্ট নেই?

আছে, কিন্তু সেটা মিরপুরে, কুতুবউদ্দিন জানায়। বলে, সাভার থন মিরপুর কম দূর, চিন্তা করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

রায়হানের কৌতূহল হয়। বলে, বায়নার সময়ও তো অনেক টাকা পেয়েছিলেন সে টাকা কি করেছিলেন ?

বায়নার টাকা তো বাড়িত দিয়া গেছে সাদেক সাব।

তা তখন ঐ টাকা কোথায় রেখেছিলেন ?

কুতুবউদ্দিন করুণ হাসি হাসে একটুখানি। বলে, সেই ট্যাকা আর রাখতে পারলাম কই, তিরিশ হাজার লইলো পোলায়, কইলো ব্যবসা করবো– দশ হাজার গেলো মাইয়ার বিয়ায়, বাকি দশ হাজার ক্যামে ক্যামে কী হইল ট্যারও পাইলাম না।

কিসের ব্যবসা করে আপনার ছেলে ? রায়হানের কৌতূহল হয়।

আর কইয়েন না, লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে নিচু গলায় বলে কুতুবউদ্দিন, আর কইয়েন না, হারামজাদা বাইদ্যামি কইরা বেড়ায় অহন– কিয়ের য্যান ব্যবসা করবো– হুনলাম, ইন্ডিয়ান মালের ব্যালাকি কারবার করে, তারপর কী হইল, কই যে পালাইয়া রইলো ৩ মাস, কুনো উদ্দিশ নাই, হ্যাষে বাড়ি আইলো, দেহি পিন্দনে ছিঁড়া লুঙ্গি ছিঁড়া জামা। কয়, কায়কারবার শ্যাষ– পুলিশের ধাওয়া খাইয়া ইণ্ডিয়া পলাইছিলো।

কুতুবউদ্দিনের কথা শেষ হওয়ার আগেই বাস আসতে দেখা যায়। তাতে মানুষের জটলাটা চঞ্চল হয়ে ভেঙে ছড়িয়ে যায়। কুতুবউদ্দিন পেছন থেকে বলে, আমরা কাইল পরশু আইতেছি, বিবি সাবেরে কইয়া দিয়েন।

অদ্ভুত কাণ্ড যে, এতো দেরিতে এলেও বাসে যাত্রী একেবারেই কম, সবারই জায়গা হয়ে গেলো এবং মুনশির সাহায্য ছাড়াই সেদিন রায়হান ফুলবাড়িয়ার কাজটা সেরে আসে।

তবে মুনশির উধাও হয়ে থাকার ঘটনাটা তার কাছে রহস্য ঘেরাই থেকে যায়। অন্যকে জমি বিক্রি করে দেয়ার যে সন্দেহের কথাটা মিসেস সাদেক বলেছিলো, সেটা তার বারবার মনে পড়ে। আইনুদ্দিন যে নতুন খদ্দের জোটাচ্ছে, সেটা কি মুনশিকে দিয়েই ? আর সে জন্যেই মুনশি নিজেকে আড়াল করে রেখেছে ? তার নিজের মনের ভেতরেও সন্দেহ উঁকিঝুঁকি মারে।

শহরে ফিরতে ফিরতে ২টা/৩টা বেজে যায়। সরাসরি বাসায় না ফিরে সে প্রথমে অফিসে যায়। কারণ দ্বিতীয় সম্পাদকীয়টা লেখার কথা তার। বিষয় ঠিক করে দেয়া হয়েছিলো– পরিবহন নিরাপত্তা। লেখাটা শেষ করতে প্রায় ২ ঘন্টার ওপর লেগে গেলো। লাগতো না, যেহেতু বাস-ডাকাতি, রাস্তায় ছিনতাই, রাস্তার দুর্ঘটনা এসব ঘটনার সংখ্যা বার করার জন্য গত ২/৩ মাসের কাগজ ঘাঁটতে হলো, তাই বেশি সময় লাগলো।

লেখাটা শেষ হলে কম্পোজে পাঠিয়ে সে শাজাহানপুরে টেলিফোন করে। মিসেস সাদেকের সঙ্গে কথা হওয়া দরকার। সবই যখন তৈরি, তখন জমি রেজিস্ট্রির কাজটা ঝুলিয়ে রাখার কী মানে! মিসেস সাদেকই টেলিফোন ধরেন। বলেন, কী ব্যাপার হঠাৎ হঠাৎ কেন হবে, জানেনই তো জমিজমা নিয়ে কারবার, সর্বক্ষণের চিন্তা আমারও আপনারও। সকাল থেকেই আপনার সঙ্গে কথা বলার কথা ভাবছি– আপনারা ভালো ?

আর ভালো, দীর্ঘশ্বাস ফেলে বোধহয় মহিলা। বলে, রোগী নিয়ে আর কতো ভালো থাকা যায়, মুনশির খবর পেয়েছেন ?

না, পাওয়া গেল না, আজ সকালের দিকে সাভার পর্যন্ত গিয়েছিলাম, মুনশি বোধহয় কোনো মাজারে গেছে– ওর বউ ঠিক মতো বলতে পারলো না কোন মাজারে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

গেছে। একবার বললো, সিলেট। ফের বললো সিরাজগঞ্জ, আবার ফরিদপুরের নামও করলো।

বোধহয় ফরিদপুরেই হবে। মেরি জানায়, কারণ, নতুন এক পীর সাহেবের কথা শোনা যাচ্ছে, আটরশি নামে ফরিদপুরের এক জায়গায়– খুব নামডাক তাঁর, নামীদামী লোকেরা তাঁর মুরিদ হওয়ার জন্য পাগল।

কে জানে, রায়হান মন্তব্য করে, আমাদের বাহারউল্লাহ মুনশিও হয়তো খুব শিগগির নামীদামী লোক হয়ে যাবে।

মেরি পীরের প্রসঙ্গটা লম্বা না করে সরাসরি জিজ্ঞেস করে, জমির মালিকের সঙ্গে কথা হয়েছে?

হ্যাঁ, দেখা করলাম, ওদের খুব তাড়া। কাল-পরশুর মধ্যে মালিক ঢাকা আসবে রেজিস্ট্রির তারিখ ঠিক করতে।

ওদিক থেকে কিছুক্ষণ সাড়া শব্দ পাওয়া যায় না। মেরি বোধহয় কিছু চিন্তা করে। তারপর বলে, কিন্তু আমার যে জায়গাটা দেখা হলো না– জায়গাটা কি আমার দেখা উচিত নয়, বলুন?

বেশ তো! রায়হান জানায়, বলে, কাল একবার দেখে আসুন, বেশি দূরে তো নয়। বেবিট্যাক্সি চেপে যাবেন, ফের বেবিট্যাক্সি চেপেই ফিরে আসবেন– আর যদি গাড়ি যোগাড় করতে পারেন, তাহলে তো কথাই নেই। সব মিলিয়ে খুবজোর ঘন্টা দেড়/দুই লাগতে পারে।

মেরির সাড়া না পেয়ে রায়হান ফের জিজ্ঞেস করে, কী হলো? কালই যাচ্ছেন তো?

কাল বাদ দিলে হয় না? মেরি অনিশ্চিত সাড়া দিয়ে বলে, আমার তো ওদিকের পথঘাট চেনা নেই। সঙ্গে একজন লোক না যোগাড় হলে কীভাবে যাবো।

কিন্তু কাল বিকেলে যদি কুতুবউদ্দিন নাও আসে, পরশু দিন তো আসবেই– সেদিন অবশ্যই আমাদের রেজিস্ট্রির দিন-তারিখ পাকা করতে হবে।

রায়হানের কথা শুনে মেরি চুপ হয়ে যায়। মেরিকে ফের সে বলে। দেখুন মিসেস সাদেক, ব্যাপারটা প্লীজ একটু চিন্তা করে দেখুন।

মেরির গলায় অস্পষ্ট হাসির শব্দ শোনা যায়। বলে, আপনি তো বলছেন আপনার কথা। আমার দিকটা তো ভাবছেন না– আমাকে তো জায়গাটা দেখেশুনে নিতে হবে। বলুন, হবে না? জমি রেজিস্ট্রি হয়ে গেলো, টাকা-পয়সা লেনদেনও হয়ে গেলো অথচ আমি দেখতেই পেলাম না, কোথায় জমি, কেমন জমি, কী বৃত্তান্ত। বলুন, এটা কি ঠিক?

রায়হান জবাবে কিছু বলতে পারে না। তাকে কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করতে হয়। তারপর বলে, তাহলে এক কাজ করুন, কাল যখন কুতুবউদ্দিন আসবে, ওর সঙ্গে চলে যান– জমি দেখেশুনে ওকে তারিখটা বলে দিন– আপনি যা বলবেন তার ওপর আমি আর কিছু বলবো না।

মেরি এবার জোরে হেসে ওঠে। বলে, হুঁ এমন না হলে সাংবাদিক– খুব ভালো পরামর্শ। লোকটা আসবে বিকেলে, তো বিকেলের পর যদি প্রায় অচেনা একটা লোকের সঙ্গে যাই, তো ফিরবো কখন? ফেরার সময় সঙ্গে কে থাকবে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

রায়হানকে চিন্তা করতে হয় ব্যাপারটা। শেষে সে খোলাখুলি বলে, শুনুন, আমার কাল খুব কাজ অফিসে, একটা মিটিং আছে, লেখালেখি আছে, তারপর একজন বিদেশী ভদ্রলোকের পার্টিতে যেতে হবে– বুঝেছেন ?

জ্বী।

কাল আমার পক্ষে যাওয়া মুশকিল, রায়হান সরাসরি জানায়।

মেরি ফের হাসে। বলে, ঠিক আছে, কাল পারবেন না, তাহলে কবে পারবেন সেটা বলুন ?

ঐ মুহূর্তে কী যেন হয় রায়হানের। মেরির অযথা আদিখ্যেতা দেখানোর জন্য বিরক্তিতে হতে পারে কিংবা নিজের দিক থেকে তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্যেও হতে পারে। সে গা ঝাড়া দিয়ে ওঠে। বলে, শুনুন, আগামীকাল সকাল ৯টায় যেতে পারবেন ?

কে নিয়ে যাবে, আপনি ? মেরি নিজের গলার স্বরে কিশোরীর কৌতুক ফোটাতে চায় সম্ভবত। শুনতে বিশ্রী লাগে রায়হানের।

বলে, জ্বী হ্যাঁ, আমি– তৈরি থাকবেন, সকাল বেলা, ঠিক ৯টা– কারণ ১২টার মধ্যে অফিসে ফিরে আমাকে কাজে বসতে হবে।

বাসায় ফিরলে তার চেহারায় সম্ভবত কাহিল ভাব দেখতে পায় বীথি। বেশ ব্যস্ত হয়ে ওঠে সেজন্য। মুখে কিছু বলে না, কিন্তু রায়হান সোফায় বসে গা এলিয়ে দিলে ফ্যানটা ছেড়ে দেয়, বারান্দা থেকে ঘাম মুছবার জন্য শুকনো তোয়ালে এনে ধরে সামনে, তারপর ২/৩ মিনিটের মধ্যে ঠাণ্ডা পানির সঙ্গে গেলাসে চিনি মিশিয়ে তাতে লেবুর ফালি চিপতে চিপতে সামনে এসে দাঁড়ায়।

কথা হয় না তারপরও। চিনি পানিটুকু শেষ করে মুখ মুছতে মুছতে রায়হান জানায়, আজ ফুলবাড়িয়া গিয়েছিলাম।

দেরি দেখে আমিও তাই ভাবছিলাম, ফোন করে জানালে পারতে।

বেশি কৌতূহল প্রকাশ করে না বীথি– কখনোই করে না। কারণ তার বিশ্বাস রায়হান তাকে সমস্ত কিছু বলবে। এবং খানিক পর রায়হান বলেও। মুনশির উধাও হয়ে থাকার কথা তো বলেই। এমনকি আগামীকাল যে ফের যেতে হবে মিসেস সাদেককে নিয়ে, তাও জানায়। শেষে রায়হান জিজ্ঞেস করে, তুমি যাবে ?

ওমা, কোথায় ? বীথি রীতিমত অবাক হয়।

কেন, ফুলবাড়িয়ায়, যেখানে জমি কিনছি।

কখন ?

সকাল বেলা, ৮টা/৯টার দিকে।

নাহ্, এমন ভঙ্গি করে বীথি যে, মনে হয় তার কাছে অসম্ভব কোনো প্রস্তাব করা হয়েছে। বলে, তখন মোমেনার মা আসবে। সংসারের কতো কাজ। ছেলেরা স্কুল-কলেজে যাবে– নাহ্ ফের মাথা নাড়ায় বীথি। বলে, আমি গিয়ে কী হবে– কাজে যাচ্ছো, বেড়াতে তো আর যাচ্ছো না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

রায়হানের নিজেকে ছোট মনে হয়। বীথির বিশ্বাস করার এই এক অসাধারণ ক্ষমতা। তার অবাক লাগে, কেমন করে পারে বীথি। অমন সুনিশ্চিত বিশ্বাস কি সে কখনও কাউকে করতে পেরেছে ? বীথিকেও কি পেরেছে ? পুরনো কথা মনে পড়ে তার– রাজনৈতিক কর্মী তরুণ সাংবাদিক তারিক সদ্য জেল থেকে ছাড়া পেয়ে তার বাসায় আশ্রয় নিয়েছিলো ক'দিনের জন্য। খুবই মিশুক ছেলে, রঞ্জু মঞ্জু দু'জনেই তখন ছোট। দু'জনকেই দুই ঘাড়ে চাপিয়ে নিয়ে সে বাড়িময় দাপাদাপি করতো– বীথি খুব স্নেহ করতো ওকে। কিন্তু ওর স্নেহটাকেই রায়হান সন্দেহের চোখে দেখতো। মুখে কিছু বলে নি কখনো, কিন্তু মনে মনে সন্দেহটা অনেকদিন পর্যন্ত ছিলো। কিংবা কায়সার! এক বাড়িতে বসবাস। ওপর তলায় তারা। নিচের তলায় কায়সাররা। বউ চাকরি করতো বলে দুপুর পর্যন্ত সে বাচ্চা আর বাড়ি পাহারা দিতো। যে সপ্তাহে তার নাইট থাকতো সে সপ্তাহের সাতদিনই সে দিনের পুরো সময়টাই বাসায় কাটাতো– ওপরতলায়-নিচতলায় আসা-যাওয়া ছিলো, বাচ্চাটা তখন ছোট। একেকদিন ওপরতলায় বীথির কাছে রেখে যেতো। তখনও তার বীথিকে সন্দেহ হতো। আসলেই সে মনের দিক থেকে ছোট, একেবারেই ছোট এবং নোংরা।

বীথির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে এক সময় সে চোখ বুঁজে ফেলে। এসব কথা সে কখনও বলে নি কাউকে। বীথিকে তো নয়ই। সে জানে, থিকথিকে নোংরার মধ্যে ডুবিয়ে কোনো জিনিস তুলে আনলে তার চেহারা যেমন হয়, আসলে তার মনের চেহারাও ঐ রকম।

সোফার পেছনে দাঁড়িয়ে তখন বীথি তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলো। সে বলে উঠলো, এবার কি উঠবে ? কাপড়-জামা ছেড়ে মুখ হাত ধোও– বেলা তো শেষ!

একটু পরই সিঁড়িতে দুড়দাড় আওয়াজ হয়। সেইসঙ্গে পাওয়া যায় টুকুর গলার আওয়াজ। কি হয়েছে কে জানে। টুকুর গলার মা ডাকে আজ উচ্ছ্বাস যেন কিছুটা বেশি। বলে, মা, ওমা, দেখো। সে একটা ঠোঙ্গা এগিয়ে ধরে, বলে, দেখো তোমার জন্য কী এনেছি।

বীথি ছেলের হাত থেকে কাগজের ঠোঙ্গাটা নিয়ে খুলে দেখে, ভিতরে হলদেটে রঙের টলটলে রসভর্তি ৪টা বেশ বড় সাইজের কামরাঙ্গা।

তার হাসি পায় ছেলের কাণ্ড দেখে। ঐ টুকু ছেলে, তারও জানা হয়ে গেছে মা কী খেতে ভালোবাসে। সে বলে, কোত্থেকে আনলি, পয়সা পেলি কোথায় ?

না মা, কেনা না, আমার বন্ধু আরমানকে চেনো তো। এই তো ক'দিন আগে এসেছিলো, ওদের বাড়ি তো গেণ্ডারিয়ায়– ও বলেছিলো, ওদের বাড়িতে নাকি বাঁদরের খুব উৎপাত, তাই দেখতে গিয়েছিলাম। ওদের মস্ত বাগান, আর কতো যে গাছ, অনেক গাছের নামও জানি না। দুটো কামরাঙ্গা গাছ, কতো কামরাঙ্গা, তাই ওর মা দিলেন।

ছেলের উৎসাহ কমে না, চোখে-মুখে কথা বলতেই থাকে। বলে, মা জানো, গেণ্ডারিয়ায় সাধনা ঔষধালয় নামে একটা কবরেজি ওষুধের মস্ত কারখানা আছে, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড উঁচু পাঁচিল আর ঐসব উঁচু উঁচু পাঁচিলের ওপর সার বেঁধে বাঁদরগুলো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ল্যাজ ঝুলিয়ে বসে থাকে– যদি তুমি দেখতে, বাচ্চা বুড়ো নানান সাইজের বাঁদর। খুব ছোট বাচ্চারা মায়ের বুক আঁকড়ে ধরে ঝুলে থাকে। মায়েরা লাফিয়ে লাফিয়ে এ পাঁচিল থেকে ও পাঁচিলে যায়, কিন্তু বাচ্চাদের কিছু হয় না– মা তুমি দেখলে বুঝতে।

হয়েছে হয়েছে, বীথি ছেলের উচ্ছ্বাস থামাতে গিয়ে বলে, বাঁদর দেখার আমার দরকার নেই। বাসায় যারা আছে তারা কম কিসে ? আর তোরই বা গেণ্ডারিয়া যাবার কী দরকার, বাঁদর দেখতে চাইলে আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেই পারিস!

না মা, তুমি খালি ঠাট্টা করো, সত্যিসত্যি আমি আরমানদের বাড়ি গিয়েছিলাম, তুমি খেয়ে দেখো একটা কামরাঙ্গা, খুব মিষ্টি। এমন কামরাঙ্গা বাজারে পাওয়া যায় না।

বীথি ছেলের চোখে মুখে অদ্ভুত মিষ্টি কৌতুক, বিস্ময় ভালোবাসা সব একসঙ্গে মেশামিশি হয়ে থাকতে দেখে। তার মনে পড়ে এমনই ছিলো মঞ্জু, তার আগে রঞ্জু। কিন্তু কেমন বদলে গেলো দেখতে দেখতে দু'জনই– এও বা আর ক'দিন ? ছোট ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখতে দেখতে সে মনে মনে হিসাব করে, '৭৪-এ জন্ম, ১২ পেরুলো সেদিন। খুব জোর আর বছর দু'তিন! তারপরই ছেলের বয়ঃসন্ধি পার হয়ে যাবে। মেয়েদের দিকে অন্য চোখে তাকাবে, রাজনীতির কথা বলতে শিখবে, প্রেমের কবিতা পড়বে লুকিয়ে লুকিয়ে, হয়তো সিগ্রেটেও টান দেবে দু'একটা। তখন? তখন আর মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে আবদার করবে না। ছেলেরা বড় হয়ে গেলে মায়েরা কি সত্যি সত্যি মা থাকে ?

তার আজকাল সন্দেহ হয়। সাইকোলজির একটা পেপার ছিলো তার বিএ-তে– এমন প্রশ্ন বইয়ের কোথাও দেখেছে বলে তার মনে পড়ে না। টুকু বুকের মধ্যে মুখ ঘষলে কিছুদিন আগেও তার দুই স্তনের শিরা উপশিরা তির তির করে উঠতো। মনে হতো, বোধ হয় দুধ এসে জমেছে বুকে। কিন্তু এখন আর অমন মনে হয় না। ছেলে দূরে সরে যাচ্ছে বলেই কি অমন হয়, না ?

মা হওয়ার সুখ কি শুধু মনে ? বীথি মনে মনে হিসাব করে। তার তো মনে হয়, মা হওয়ার সুখ থাকে শরীরেও। কথাটা সে কাউকে জিজ্ঞেস করে নি, বলেও নি– কিন্তু নিজের শরীর দিয়েই সে জানে, শরীরেও মা হওয়ার সুখ পাওয়া যায়।

টুকু মাকে অমন বিচিত্র ভঙ্গিতে তাকিয়ে থাকতে দেখে বলে, ওমা, কী ভাবছো? কী হয়েছে তোমার ?

বীথির চমক ভাঙে। সে হেসে বলে, না কিছু হয় নি, তুই মুখ হাত ধুলি না এখনও ? যা, খেতে যা, তোর বাবাকে ডাক।

আট

সকাল ৯টার আগেই পৌছায় শাজাহানপুরে। দরজা খুলে দেয় ছোট মেয়ে মিহিন। হাসি মুখে বলে, ভেতরে আসুন আঙ্কেল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ঐ সময় বড় মেয়ে ইউনিভার্সিটিতে যাবার জন্য বেরুচ্ছিলো, রায়হানকে দেখে বললো, আপনারা শুনলাম বাড়ির জায়গাটা দেখতে যাচ্ছেন ? মা বলছিলো।

হ্যাঁ যাচ্ছি, কেন তুমিও তো বোধহয় যাবে, না কি ?

না, মা আমাদের কাউকে নেবে না, আব্বার কাছে কে থাকবে তাহলে ? বললো, জায়গাটা নাকি খুব দূর, রাস্তাও খুব খারাপ– সত্যি আঙ্কেল ?

রায়হান হ্যাঁ না কিছুই বলতে পারে না। সে কেমন করে হ্যাঁ কিংবা না বলে ? সে কি জানে, মেয়েটির মা কোন কারণে তাকে সঙ্গে নিতে চাইছে না। তাই সে হ্যাঁ আর না'র মাঝামাঝি একটা ভঙ্গি দেখায়। বলে, কথাটা ঠিক, আসলেই বাস থেকে নেমে বেশ কিছুটা পথ হাঁটতে হয়। মাঠের মাঝখান দিয়ে উঁচু নিচু রাস্তা, একটা খালমতো জায়গা পেরুতে হয়, বেশ ঝামেলা মেয়েদের জন্য।

চন্দনা চোখ বড় বড় করে শোনে। মনে হয় খুশি হয়। বলে, ওসব বুঝি ঝামেলা? কী রকম থ্রিলিং না ? চারদিকে খোলামেলা, কাশফুল নুয়ে নুয়ে পড়ছে। গাঁয়ের মেয়েরা, ডুরে শাড়ি পরনে, ধানের বোঝা নিয়ে বাড়ি ফিরছে, নইলে ঢেঁকিতে পাড় দিচ্ছে ঢেঁকিশালে– আম গাছে বউ কথা কও পাখির ডাক– এই রকম সব সীন কামরুল হাসানের পেইন্টিংয়ে আছে, জসীম উদ্‌দীনের কবিতায় আছে– জানেন আঙ্কেল, আম্মা আমাদের কোথাও যেতে দেয় না– গ্রামে গিয়েছি সেই ছোটবেলায় তারপর আর যাই না।

মেয়ের কথা শুনতে শুনতেই রায়হান বিশ্রী গোঙানির শব্দ শুনতে পায়। আন্দাজ করে সাদেক সাহেব সম্ভবত অমন আওয়াজ করছেন। চন্দনা অমন শব্দ শুনেই কি না কে জানে, ভেতরে চলে যায়। আর তখনই সামনে এসে দাঁড়ায় মিসেস সাদেক। পরনে সুতির কোড়া জামদানী শাড়ি, জমিন আর আঁচলে লাল সুতো দিয়ে হালকা কাজ করা, চুল একটু ফাঁপানো, কানে জড়োয়া টাব, হাতে হালকা চুড়ি, গলায় চিকন চেন এবং পাথর বসানো লকেট, ঠোঁটেও হালকা রঙ দেখা যায়।

রায়হানের সামনে দাঁড়িয়ে বলে, চলুন।

উঠে দাঁড়ায় রায়হান। বলে, সাদেক সাহেবের সঙ্গে দেখা করবো না ?

মেরি হাসে। বলে, তাহলে তো দেরি হয়ে যাবে, আপনিই না বললেন, তাড়াতাড়ি ফিরবেন ?

তাছাড়া সকাল থেকেই আজ জেদ করছেন।

রায়হান দরজার দিকে পা বাড়ালে মেরি ডাকে। নিজের দিকে তাকিয়ে বলে, দেখুন তো ঠিক আছে কি না ?

কী জিজ্ঞেস করা হয়েছে, রায়হান বুঝতে পারে না। বলে, কী দেখবো ?

মেরি লাজুক চোখে পাল্টা তাকায়। বলে, না মানে দূরে যাচ্ছি তো, গয়নাটয়না বেশি হয়ে যায়নি তো ? বেশি পরিনি যদিও, তবু এতে কি অসুবিধা হবে ?

রায়হানের হাসি পায়। মেরি নিজেকে দেখানোর জন্য এই ছলনাটুকু না করলেও পারতো। বলে, না অসুবিধা আর কী, যখন অসুবিধা হবার তখন বেশি পরলেও হবে, কম পরলেও হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

তাহলে আপনি বলছেন ঠিক আছে, তাই না?

রায়হান এবারও মনের ভিতরে থমকায়, আজকাল বয়স্কা মহিলারাও কি অল্পবয়সী মেয়েদের মতো কথা বলতে আরম্ভ করেছে? সে মনে মনে খোঁজে, এমন ধরনের কথা সে অন্য কোনো মহিলার কাছ থেকে শুনেছে কি না। কোনো মহিলাকে তার মনে পড়ে না। অবশ্যি তার কারণও আছে। যেসব মহিলার সঙ্গে তার দেখা-সাক্ষাৎ হয় কখনো সখনো, তারা তো তাকে সাংবাদিক ধরে নিয়ে কথা বলে, মেরির মতো স্বামীর বন্ধু হিসাবে তাকে দেখে না। সুতরাং নিজের সাজগোজ কিংবা গয়নাগাটি কেমন পরেছে তা দেখিয়ে মতামত নেয়ার সুযোগ কোথায় তাদের। সুতরাং মিসেস মেরি সাদেকের আচরণ আর কথাবার্তা তুলনা করার মতো কোনো মহিলাকে সে খুঁজে পায় না।

সকাল ৯টা/সাড়ে ৯টা নামেই সকাল। রাস্তায় ইতিমধ্যে বেশ ভিড়। শহরমুখী বাস-ট্রাক করে ট্যাক্সি-টেম্পো বেবিট্যাক্সি রিকশার স্রোত উজিয়ে যেতে তাদের বেবিট্যাক্সির বেশ সময় লাগে। কলেজ গেট ছাড়াবার পর রাস্তা কিছুটা ফাঁকা পাওয়া যায়। কল্যাণপুরের ব্রিজ পার হওয়ার পরে যেন হাঁফ ছাড়ে মেরি। বলে, বাব্বাহ্ সকাল বেলাতেই এমন ভিড়– মানুষ বাইরে বেরুবে কীভাবে?

তার কথার পিঠে রায়হান কিছু বলে না। খানিক পর মেরি ফের বলে, রাস্তার ডান দিকটা কিন্তু একেবারেই ফাঁকা ছিলো– শুধুই ধানক্ষেত আর ধানক্ষেত।

কী হলো আপনার? মেরি এবার সরাসরি মনোযোগ দাবি করে। বলে, আমি বকবক করে যাচ্ছি, আপনি কিছুই বলছেন না?

রায়হান অপ্রস্তুত হয়ে বলে, না আমার কিছু হয় নি, আমি অন্য কথা ভাবছিলাম।

বাহ্, অন্য কথা কেন ভাববেন? একটা ছুতোয় বাইরে আসা গেছে, একটু হালকা খোলামেলা কথাবার্তা হলে কি সেটা ভালো হয় না? বলুন?

রায়হান হাসে। বলে, হ্যাঁ ঢাকা শহর যা ঘিঞ্জি হয়ে উঠেছে, তাতে–

হ্যাঁ, মেরি হাসে। বলে, সেই কথাই বলছিলাম, দেখুন দেখুন, জাল দিয়ে মাছ ধরছে– আপনি ঢাকা শহরের ভেতরে দেখেছেন? বলতে বলতে মেরি রায়হানের গায়ের ওপর চেপে গলা বাড়িয়ে মাছ ধরার দৃশ্যটা দেখতে থাকে।

রায়হানের রীতিমতো অস্বস্তি লাগে। বলে, কি আশ্চর্য, আপনি জাল দিয়ে মাছধরা দেখেন নি আগে? আপনি দেখছি এই বয়সেও ছেলেমানুষই রয়ে গেছেন।

ঐ কথায় মেরির যেন কী হয়, প্রায় ছিটকে সরে বসে, পলকের মধ্যে গম্ভীর হয়ে যায়। কিছুক্ষণ কোনো কথা বলে না। তারপর ধীর গলায় অনুযোগ করে, আমার ছেলেমানুষিটাই আপনাদের চোখে পড়ে, ভেতরে যে আমার কী জ্বালা, সেটা কেউ দেখে না– গত দুটো বছর একটা রুগী নিয়ে পড়ে আছি, কোথাও বেরুতে পারি না, ভালোমন্দ কথাবার্তা পর্যন্ত বলার সুযোগ হয় না– কই সে কথা তো কেউ বলে না?

রায়হান বেকুবের মতো তাকিয়ে থাকে মেরির দিকে– এই চল্লিশোর্ধ মহিলা যদি এখন কান্নাকাটি শুরু করে দেন, তো বিপদ।

মীরপুর ব্রীজ ছাড়াবার পর সত্যিসত্যি চোখে আঁচল চাপা দেয় মেরি। ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলে, আমার জীবনটা শেষ করে দিলো। পুরুষ মানুষ, মানুষ না, বুঝলেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

রায়হানের হাসি পায় মেরির ফোঁপানির ভেতর থেকে। অগত্যা সে কী আর করে– একটু ঘেঁষে বসে প্রথমে, তারপর সান্ত্বনা দেয়ার ভঙ্গিতে ঘাড়ে হাত রেখে বলে, আপনি সামান্য কথাতে রিঅ্যাক্ট করেন কেন ? আপনার স্ট্রাগল তো কম নয়– গোটা সংসারটা টিকিয়ে রেখেছেন, ছেলেমেয়েরা ভালো জায়গায় লেখাপড়া করছে। তারপর আবার নতুন বাড়িও করতে যাচ্ছেন– রুগ্ন, একেবারে বেডরিডেন স্বামীর সেবা শুশ্রূষা ক'রে, এমন ক'রে স্ট্রাগল ক'জন মহিলা করতে পারে বলুন ? হেমায়েতপুরের বাঁক ছাড়াতে ছাড়াতে মেরি রায়হানের ঘাড়ে মাথা হেলিয়ে দেয়।

তবে মাত্র মিনিট দুয়েকের জন্য। হঠাৎ যেন সম্বিৎ ফেরে তার। সরে বসে অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে বলে, একটু ইমোশনাল হয়ে পড়েছিলাম, কিছু মনে করবেন না প্লীজ, আসলেই বোধ হয় আমার মধ্যে এখনও কিছুটা ছেলেমানুষী আছে– ছি ছি, কি লজ্জার কথা– আপনি নিশ্চয়ই খারাপ ভাবছেন।

রায়হান হাসে। বলে, আরে নাহ্, এতে ভালো খারাপ ভাবার কী আছে– জীবনে দুঃখ কষ্ট থাকলে মানুষকে তা কোনো না কোনোভাবে প্রকাশ করতেই হয়, আমি কিছু মনে করি নি।

ফুলবাড়িয়া বাসস্ট্যাণ্ড থেকে বেবিট্যাক্সি ভেতরে যেতে রাজি হয় না প্রথমে, পরে বখশিসের লোভ দেখানো হলে ভেতরে যায় কিছুটা কিন্তু রাস্তার ধারের ঢালুতে আর নামে না, ওপরেই এক গাছতলায় দাঁড়িয়ে থাকে।

আর আশ্চর্য। হাসতে হাসতে মেরি রায়হানের হাত ধরে বেবিট্যাক্সি থেকে নিচে নামে। এখন একেবারে অন্য মানুষ। জমির চারদিকে তাকিয়ে দেখতে দেখতে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। বলে, কী সুন্দর জায়গাটা, তাই না ? আপনি কোন দিকে জমি নেবেন। ডান দিকে না বাঁ দিকে ?

কোনো একদিকে হলেই আমার চলবে, রায়হান জানায়। বলে, এখন তো চারদিকেই ফাঁকা।

না, তবু বলুন, মেরি পীড়াপীড়ি করে।

না, আমি কিছু বলবো না, মিঃ সাদেক যখন জমির বায়না করেন, তখন নিশ্চয়ই ভেবেছিলেন কোনদিকে বাড়ি হবে। কোনদিকটা ফাঁকা থাকবে, এ ব্যাপারে আলাপও করেছেন বাড়িতে।

ওর কথা বাদ দিন তো! মেরি বেশ বিরক্ত হয়। বলে, ও লোকের মনের ভেতরে কী ছিলো, আমিই কি তা কোনো দিন জানতে পেরেছি, আমাকে কি কখনও মানুষ ভেবেছে ও ? বুঝলেন, ভেতরে ভেতরে মানুষটা একেবারেই অন্যরকম– সারাটা জীবন আমাকে জ্বালিয়েছে।

কোন কথা থেকে কোন কথায় চলে যায় মেরি। রায়হান বুঝতে পারে না একজন শয্যাশায়ী রোগী স্বামীর বিরুদ্ধে মহিলা এভাবে ক্ষোভ কেন প্রকাশ করছে, বিশেষত তার মতো একজন মানুষের কাছে। সে অন্য কথা বলে। প্রস্তাব করে, চলুন তাহলে, কুতুবউদ্দিনের সঙ্গে কথাটা বলে যাই, কবে জমি রেজিস্ট্রি হবে।

মেরি রাজি হয় এবং দু'জনে কিছু দূর পর্যন্ত এগিয়েও যায়। আর ঐ সময়ই দেখতে পায় দূরে কুতুবউদ্দিন বুড়ো প্রায় ছুটতে ছুটতে আসছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

সামনে এসে হাঁফাতে হাঁফাতে বলে, আপনেরা যে আইবেন, কাইল কন নাই তো! আমি তো অহনই ম্যালা করছিলাম ঢাকার দিক।

একটু থেমে ফের বলে কুতুবউদ্দিন, বিবিসাব জমিখান দ্যাখলেন বুঝি?

হ্যাঁ, দেখলাম, মেরি জানায়। বলে, কবে রেজিস্ট্রি করতে চান?

আমি তো কাইলই চাই রেজষ্টারি হোক। কিন্তু ষ্ট্যাম্প দলিল খরিদের কাম সাইরা, মুহুরিরে দিয়া দলিল লিখাইয়া তারপর না রেজষ্টারি– দুই চার দিন তো লাগবোই।

তাহলে পরশুদিন দলিল লেখার কাজ শেষ করেন, রায়হান প্রস্তাব করে। বলে, কালই আপনি ঢাকায় আসুন, স্ট্যাম্প কেনার কাজটা সেরে ফেলুন।

কাজের কথা সবই একের পর এক হয়ে যায়। রায়হান ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে, প্রায় এগারোটা। সে মেরির দিকে তাকায়। বলে, এবার তাহলে আমরা রওনা হতে পারি– সব কথাই তো হয়ে গেলো।

এইডা কী কন, কুতুবউদ্দিন সামনে এসে হাত ধরে রায়হানের। বলে, বিবি সাহেবরে লইয়া আইছেন, অহনই ক্যান্নে যান– না-না তা হয় না, আমার বাড়ি বেড়াইবেন না?

রায়হানের বিরক্তি লাগে। দেখে, মেরি চুপচাপ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আড়চোখে তার দিকে দেখছে। মনে হয় কুতুবউদ্দিনের অমনভাবে খাতির জমাবার চেষ্টায় তারও সায় আছে। সে মাথা ঝাঁকায়, নাহ্ অসম্ভব! আমি দেরি করতে পারবো না।

কিন্তু কুতুবউদ্দিন হাল ছাড়ে না। বলে, সার আপনে ক্যান না করেন, বিবি সাবে তো কিছু কয় না।

রায়হান কিছু বলার আগেই মেরি বলে ওঠে, আহা বুড়ো মানুষটা বলছে এতো করে, একবার গেলে কী হয়, আপনার যতো বেশি বেশি ইয়ে!– কতোক্ষণই বা লাগবে।

অগত্যা কুতুবউদ্দিনের আবদার সহ্য করতে হয়। গতকালের চা খাওয়ার কথা তার মনে পড়ে। মনে মনে একটু হাসেও সে– মেহমান হওয়ার শখ মিটে যাবে, যদি একবার ঐ চা খায় বিবি সাহেব।

চায়ের আয়োজন কিন্তু হলো না। আপ্যায়নের জন্য এলো মুড়ির মোয়া আর পিঠা। ফলে অতিথি সৎকারে দেরি হলো না। বলা যায় আধঘণ্টাও লাগলো না, তার আগেই মেরি হাসতে হাসতে অন্দরের মেয়েদের সঙ্গে আলাপ সেরে বেরিয়ে এলো। তার পেছনে পেছনে বেশ কয়েকজন মহিলাকে দেখলো রায়হান, সবাই অতিথিকে বিদায় জানানোর জন্য বেরিয়ে এসেছে।

সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মেরি বেবিট্যাক্সির দিকে হাঁটতে শুরু করে আর হাসে। একেকবার হাসতে হাসতে একেবারে গড়িয়ে পড়তে চায়। বলে, কী কাণ্ড, আপনি বলেন নি, কুতুবউদ্দিন মিয়াও বলে নি, সবাই কি ভেবেছে জানেন? ওরা ভেবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

নিয়েছে আমি আপনার বউ। একজন তো বললো, জামাই সোন্দর তো বউ সোন্দর হইবো না ?

রায়হান হাসে না। বিরক্তি তার ক্রমেই বাড়ছে তখন– আহলাদিরও একটা সীমা থাকা দরকার। সে নিজে একটা বুড়ো ভাম আর মেরি ধাড়ি বকরি– তাদের বলে সুন্দর। সেই কথা আবার আহলাদি করে শোনায়। সে গম্ভীর হয়ে বলে, আমাকে অফিসে পৌছে দিয়ে তারপর বেবিট্যাক্সি আপনাকে বাসায় নিয়ে যাবে, বুঝলেন ?

ঢাকার পথে গাড়ি চলতে শুরু করলে রায়হান ঘড়িতে দেখে বেলা সাড়ে এগারোটা। সাড়ে বারোটায় এডিটরের কামরায় মিটিং বসার কথা– সে যদি মিটিং-এ না থাকে, তাহলে কেলেঙ্কারির এক শেষ হবে।

মেরি কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকে। তারপর কী হয় কে জানে, সে ফের হাসতে শুরু করে দেয়। বলে, আমার কিন্তু খুব মজা লাগছিলো–

আপনার টাকা-পয়সা রেডি আছে তো ? রায়হান স্মরণ করিয়ে দেয়।

আহা, কোন কথার পর কোন কথা! মেরি কপট বিরক্তি প্রকাশ করে। তারপর রায়হানের ঘাড়ে হাত রেখে অল্প ঝাঁকুনি দিয়ে বলে, আহা এতো চটবার কী হয়েছে, ঢাকায় তো ঠিক সময়ই পৌছবো আমরা।

পরশুদিন জমি রেজিস্ট্রির সময় আসতে পারবেন তো ?

দূর, কেমন মানুষ, কথা বোঝে না, মেরি খুব আপনজনের মতো গজগজ করে। বলে, আরে বাবা, ওসব কাজের কথা সবই তো পাকা হয়ে গেছে– একটু অন্য কথা বললে কী হয় ?

বলতে বলতে মেরি দু'হাতে রায়হানের বাহু ধরে বলে, আহা এতো রেগে আছেন কেন আপনি ? ভেবে দেখুন তো, কতোদিন পর আমি বাইরে এসেছি, একটু সহজ আর হালকা হবো না ?

রায়হান বেশ অসহায় বোধ করে। মেরির পরিপূর্ণ শরীর তার গায়ে এসে পড়ছে একেকবার। ছুটন্ত বেবিটাক্সি লাফিয়ে উঠলে একবার তো সে দু'হাতে রায়হানকে জড়িয়ে পর্যন্ত ধরলো এবং অদ্ভুত কাণ্ড যে, কোনো রকম বিকার নেই মহিলার। তার ভাবভঙ্গি দেখলে কে বলবে যে, দু'জনার দেখা-সাক্ষাত মাত্রই ২/৩ দিনের। বেবিট্যাক্সি ট্রাফিক জ্যামে আটকে যায় ২/৩ বার। রায়হান তখন উসখুশ করে আর হাতের ঘড়ির দিকে তাকায়। এখন ১২টা ১৫। মহিলাকে সে ঠিকই বাড়িতে পৌছে দেবে, মুখে যাই বলুক। শাজাহানপুর যাবে মগবাজার হয়ে, তারপর সেখান থেকে মতিঝিল। গাড়ি দ্বিতীয়বার জ্যামে আটকালে মেরি বলে, জমির কোন দিকটা শেষ পর্যন্ত পছন্দ করলেন, তা কিন্তু এখনও বলেন নি।

রায়হান মুখ না ফিরিয়ে বলে, আমি তো বলেছি, আপনারা যেদিকে দেবেন, সেদিকেই আমি নেবো।

আমি যদি ডান দিকটা নেই, তাহলে ? মেরির চোখে মুখে কৌতুক ঝিলিক দেয়।

বেশ তো নিন, ভালো হয় তাহলে, রায়হান শান্ত গলায় বলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বুঝে বলছেন তো ? মেরির গলার স্বরেও এবার কৌতুক ফোটে। রায়হান মুখ ফিরিয়ে বাইরের দিকে তাকায়। এই বয়সে অমন খুনসুটি করতে তার বিরক্ত লাগে।

মেরি বলে, আপনি কেমন সাংবাদিক এ্যাঁ ? আমার ডান দিক হলে আপনার কোনদিক হবে ? বাম দিক তো, বাম দিকে কার জায়গা, এ্যাঁ ? হৃদয়ের দিকে কার জায়গা, বলুন ?

বলতে বলতে খিলখিল করে হাসে মেরি।

কিন্তু অমন তৃতীয় শ্রেণীর ঠাট্টা শুনে রায়হানের একটুও হাসি পায় না বরং তার রাগ হয়। তবে মুখে কিছু বলে না, বাইরের দিকে মুখ ফিরিয়ে রাখে। কারণ সে বোঝে, যত রাগই হোক, যত বিরক্তিই লাগুক, জমিটা যদি তাকে কিনতে হয়, তাহলে সবই তাকে সহ্য করতে হবে।

মেরি কী বোঝে, সেই জানে, সেও কোনো কথা বলে না। বাকি পথ একেবারে চুপচাপ চলে আসে। বাসার গেটের কাছে বেবিট্যাক্সিটা দাঁড়ালে গম্ভীর মুখে নামতে নামতে বলে, আপনাকে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত। আপনি বিরক্ত হবেন জানলে আমি আপনার সঙ্গে যেতাম না।

তার রাগ হয়। তবে মুখে কিছু বলে না, বাইরের দিকে মুখ ফিরিয়ে রাখে।

মোটামুটি ঠিক সময়েই রায়হান অফিসে ফিরে আসে এবং এডিটরের মিটিং-এও হাজির হয়। মিটিং-এ লেখালেখির বিষয় ছাড়াও কাগজের প্রশাসন সম্পর্কেও কিছু আলোচনা হয়। তবে এডিটর সাহেব কথাবার্তা শুনে রায়হান অনুমান করে, আমানউল্লাহ খান সম্ভবত তাঁকে কিছুটা হলেও নিজের দিকে টানতে পেরেছেন। প্রেসিডেন্ট এরশাদ সম্পর্কে কথা ওঠে কয়েকবারই, কিন্তু তিনি কোনো রকম মন্তব্য করেন না।

মিটিংটা চলে প্রায় ঘণ্টা দেড়েক; তারপর সে লেখা নিয়ে বসে। কিন্তু লেখা আর এগোয় না। কয়েকবারই চিন্তার সূতো ছিঁড়ে যায়। এক চিন্তা গড়িয়ে যায় আর এক চিন্তায়। আর ফাঁকে ফাঁকে সকাল বেলার ঘটনাগুলো মনে পড়ে। প্রায় প্রৌঢ়া এক মহিলার উচ্ছ্বাস ভরা আচরণ, তার কথাবার্তা, তার গায়ের ওপর চেপে বসা, ঘাড়ে হাত রেখে কথা বলা, দু'হাতে গলা জড়িয়ে ধরা– এসব অভিজ্ঞতা তার চিন্তাভাবনাকে বিশ্রী একটা ঘোরের মধ্যে ফেলে দেয়। নিজের আচরণের জন্য তার একটু খারাপও লাগে। মহিলা রোগী স্বামীকে নিয়ে মাসের পর মাস বন্দী হয়ে আছে, এক ছুতোয় বাইরে বেরিয়ে একটু বেশি উচ্ছ্বাস প্রকাশ না হয় করলোই, তাতে অমন বিরক্ত সে না হলেও তো পারতো।

বাড়িতে ফিরে সে বীথিকে জমি রেজিস্ট্রি করার তারিখটা জানায়, জমির কোন দিকটা সে পছন্দ করেছে, তাও বলে, এমন কি বেবিট্যাক্সিতে গেলে যে তাড়াতাড়ি যাওয়া এবং আসা যায়, তাও বলে। সঙ্গে যে মিসেস সাদেক ছিলো সেটা সে জানায় কিন্তু মহিলা তাকে কী রকম বিরক্ত করেছে এবং তার কেমন রাগ হয়েছিলো সেটা সে জানায় না। এমনকি পরে যে তার নিজেরই খারাপ লেগেছে মহিলার ওপর রাগ হওয়ার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

জন্য, তাও সে জানায় না। আর তাতে নিজের কাছেই নিজেকে ছোট লাগে তার। বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালে, কি সোফায় বসে চোখের সামনে খবরের কাগজ মেলে ধরলে, অথবা ঘুমের ভান করে চোখ বুঁজে থাকলেও নিজের ভেতর থেকে কেউ যেন ধিক্কার দেয় আর বলে, ছিঃ এই তাহলে তুই, বুড়ো বয়সেও নিজেকে লুকোতে চাস ? ভেতরে ভেতরে তুই লম্পট, মেরির সঙ্গ উপভোগ করিস তুই ? ওর আকর্ষণ তোর কাছে ক্রমেই বাড়ছে আর সেই জন্য তুই গোপন রাখছিস সব কিছু; কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি গোপন থাকবে ? পারবি রাখতে ?

রায়হান দুশ্চিন্তা ঝেড়ে ফেলার জন্য মাথা ঝাঁকায়। নাহ্ কিছুই গোপন করবে না সে; সে বলবে বীথিকে, সবই খুলে বলবে। এই মুহূর্তে না পারুক রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে সে অবশ্যই বলবে। তাতে বীথি যদি কষ্ট পায়, তো পাবে কিংবা যদি খারাপ কিছু সন্দেহ করে, তো করবে। এমন কি তাকে যদি ঘেন্নাও করে, তাহলেও সে বলবে।

কিন্তু পারে না। কারণ দশটার দিকে রঞ্জু টেলিফোন করে যে তাদের হোস্টেলে জোর হাঙ্গামা শুরু হয়েছে এবং তার বন্ধুকে নিয়ে সে বাসায় আসছে।

তারপর ছেলে বাসায় না আসা পর্যন্ত দুশ্চিন্তা আর উদ্বেগ নিয়ে ঘর-বার করে বীথি। শেষে রাত ১২টার দিকে বন্ধুকে নিয়ে রঞ্জু বাসায় এসে পৌঁছলে কিসের হাঙ্গামা, মারামারি হয়েছে কি না, হলে কতোজন জখম– এই সব কথাবার্তা চলে অনেকক্ষণ ধরে। ওদিকে এরই মধ্যে খাবার দেয়া হয়, বিছানা পাতা হয়। শেষে সব কিছু চুকে বুকে যাওয়ার পর বীথি যখন বিছানায়, তখন রাত প্রায় ২টা আর তার এমন বিধ্বস্ত চেহারা যে ঐ সময় একজন বয়স্কা মহিলা কীভাবে তার সঙ্গে ঢলাঢলি করার চেষ্টা করেছিলো, সেই বয়ান শোনাতে রায়হান সাহস পায় না।

পরদিন সকালেই রঞ্জু আর মনির বেরুচ্ছিলো। ঐ সময় মঞ্জু মাকে ডেকে বলে, মা ভাইয়া চলে যাচ্ছে। বীথি শুনতে পেয়ে ছুটে ছেলের সামনে এসে দাঁড়ায়। জানতে চায়, কী ব্যাপার, এতো সকালে কোথায় ?

মনির ঘাড় চুলকাতে চুলকাতে বলে, আজ থেকে আমরা, মানে মেডিক্যালের ছাত্ররা, স্ট্রাইকের সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

বাহ্। কতো ছাত্র আটক রয়েছে শোনো নি ? রঞ্জু বলে, হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকলে ওদের ছাড়বে ?

যদি তোদেরও ধরে জেলে ঢুকিয়ে দেয়, তখন ?

বীথির পাল্টা প্রশ্ন শুনে মনির বলে ওঠে, না খালাম্মা আমাদের ধরে জেলে ঢুকিয়ে রাখা সোজা নয় ?

কেন, তোমাদের কি ল্যাজ গজিয়েছে যে লাফ দিয়ে পাঁচিল ডিঙিয়ে পালিয়ে যাবে ?

না মা, ল্যাজ গজায় নি, রঞ্জু বলে, তবে দেশের সব হাসপাতাল যদি বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে কী অবস্থা হবে চিন্তা করো ?

খুব ভালো হবে, বীথি রেগে যায়। বলে, মানুষ ডাক্তারদের ফুলচন্দন দিয়ে পূজো করবে ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

মা তুমি বুঝছো না, রঞ্জু বোঝাতে চেষ্টা করে। বলে, এটা ডাক্তারদের জীবন-মরণ প্রশ্ন।

বীথি অত কথা শুনতে চায় না। বলে, অত সব জানি না, যেখানে যাবে, বাপকে বলে যাও, খবরাখবর নিয়ে তারপর বের হও।

কিন্তু খবরাখবর আর কী পাওয়া যাবে? খবরের কাগজে মেডিক্যাল হোস্টেলের গোলমাল সংক্রান্ত কোনো খবরই নেই। এমনকি গোটা দেশের মেডিক্যাল কলেজগুলোতে স্ট্রাইক হতে যাচ্ছে সে খবরও নেই। রায়হান অনুমান করে, খবরটা সেন্সর আটকে দিয়েছে। গতকাল অনেকক্ষণ অফিসে ছিলো, তখনও কোনো খবর তার কানে আসে নি। একবার আব্দুল্লাহর কথা মনে হয়। কিন্তু পরক্ষণে মনে পড়ে, সে তো দু'দিন ধরে ছুটিতে। তার জায়গায় যে কাজ করছে, তাকে রায়হান নতুন দেখছে। তাছাড়া ওর ফোন নম্বর পাওয়া যাবে বলেও তার মনে হয় না। সুতরাং ফোনটোন করেও কোনো খবর সে যোগাড় করতে পারলো না। তার সামনে দিয়ে রঞ্জু আর মনির বেরিয়ে চলে গেলো। সে কিছুই বললো না, রঞ্জু বেরুবার সময় জানিয়ে গেলো যে, তারা স্ট্রাইক অর্গানাইজ করতে যাচ্ছে, তবু।

ছেলে বন্ধুকে নিয়ে বেরিয়ে গেলে বীথি এসে দাঁড়ালো সামনে। বললো, ওদের থামালে না?

বাহ্ কেমন করে থামাবো? রায়হান জবাব দেয়।

ছেলেটা পলিটিক্সের হাঙ্গামায় ফেঁসে যাবে, আর তুমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবে?

আহা, এটা তো পলিটিক্যাল ব্যাপার নয়, রায়হান বোঝাতে চেষ্টা করে। বলে, এটা ওদের প্রফেশনের দাবি নিয়ে আন্দোলন–

বীথি তবু গজগজ করে। কিসের প্রফেশনাল দাবি? এ দেশে প্রফেশনের জন্য আলাদা কিছু আছে? ছিলো কখনও? সবই তো শেষ পর্যন্ত পলিটিক্যাল দাবি হয়ে যায়– পেয়েছো তোমরা সহজ সরল সাধারণ মানুষকে, তাই যখন যা ইচ্ছে তা-ই বোঝাও।

রায়হানও দেরি করে না। আজ সকাল সকাল অফিস যাওয়া দরকার। কুতুবউদ্দিনের আসার কথা আজ স্ট্যাম্প কেনার জন্য।

তাড়াতাড়ি সে বেরিয়ে পড়ে। রিকশায় বসে যেতে যেতে মনের ভেতরে মৃদু উত্তেজনা বোধ করে। সত্যি সত্যি তাহলে জমি কিনতে যাচ্ছে সে। সাদেক সাহেবের বাড়ি থেকে টাকাটা কে আনবে সেটা অবশ্যি একটা সমস্যা রয়ে গেছে। গতকালই তার কথাটা বলে নেওয়া উচিত ছিলো। তাছাড়া কুতুবউদ্দিনের হাতেও বা অতগুলো নগদ টাকা সে কোন ভরসায় দেবে? সে যদি বলে, ঢাকায় স্ট্যাম্প কিনবো না, সাভারে কিনবো, তখন? তাহলে কি তাকে আজও সাভারে যেতে হবে কুতুবউদ্দিনের সঙ্গে?

অসম্ভব! সে মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয়। দরকার হলে কুতুবউদ্দিনকে সে আজ ফিরিয়ে দেবে।

অফিসে গিয়েই সে প্রথমে সাদেক সাহেবের বাসায় ফোন করে। ফোন ধরে সাড়া দেয় ছোট মেয়ে মিহিন। সে যা বলে তাতে রায়হানের আশা-ভরসা-উৎসাহ-আগ্রহ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

সব একসঙ্গে উবে যায়। কপালটাই তার মন্দ। না হলে বেছে বেছে আজই সাদেক সাহেব বিছানা থেকে পড়ে কোমরে চোট পেয়ে হাসপাতালে কেন যাবেন ?

মিহিন আরও জানায়, তার মা নাকি বলেছেন, রায়হান আংকেল যেন তাদের স্ট্যাম্প কেনার টাকাটাও দিয়ে দেন।

এ তো ভারী মজা। মহিলার কি কাণ্ডজ্ঞান কিছু নেই ? রায়হানের রীতিমতো রাগ হয়। কথা নেই, বার্তা নেই, অতগুলো টাকা সে হঠাৎ একদিনে কীভাবে যোগাড় করে ? সে জিজ্ঞেস করে, তোমার আব্বার শরীর কি খুব খারাপ ? জ্ঞান নেই ?

জ্বী জ্ঞান আছে, মিহিন জানায়। বলে, তবে হিপে খুব ব্যথার কথা বলছেন আর খুব জোরে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে উঠছেন। ডাক্তার সন্দেহ করছেন, পেলভিস বোনে ফ্রাকচার হতে পারে। খবরটা শোনার পর রায়হান মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয়– এমন অবস্থায় সে কেন মিছিমিছি ঝুঁকি নেবে ? এরপর মেরি যদি বলে, এখন আমার স্বামী বেশি অসুস্থ, এমন অবস্থায় জমিটমি কেনা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তখন ? কী করবে সে?

টেলিফোন নামিয়ে রেখে সে অফিসের গেট পর্যন্ত খোঁজ করে আসে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে বেলা এগারোটা। কুতুবউদ্দিনের আসার কথা। লোকটাকে বিদায় করে তারপর সে লিখতে বসবে। লেখার মাঝখানে বাধা পড়লে লেখাটা শেষ পর্যন্ত ভালো হয় না। গেটের কাছে দেখে সালেহউদ্দিন সিগ্রেট কিনছে। দৃশ্যটা দেখে তার মনে পড়লো, আহা কতকাল সে সিগারেট খায় না। ডাক্তার জালাল বীথির সামনেই তাকে সাবধান করে দিয়েছিলো। বলেছিলো, মরে যাবার ইচ্ছে থাকলে ঝট করে মরে যেতে পারেন, মরবেন ? আর সে ইচ্ছে যদি না থাকে তাহলে আজ থেকে স্মোকিং বন্ধ। কতদিন হলো যেন ? সে মনে মনে হিসেব করে। ১১ মাস, নাকি বছরটাই পার হয়ে গেলো। সঠিক তারিখটা স্মরণ হয় না।

সালেহউদ্দিন মুখোমুখি হলে বলে আরে আপনি, রায়হান ভাই, এখানে দাঁড়িয়ে কেন ?

রায়হান হাসে। বলে, তোমাকে দেখছি– সিগ্রেট খাবার সময় আসলে মানুষকে ভালো দেখায় না।

সালেহউদ্দিন পাল্টা হাসে। বলে, কখনও কি ভালো দেখাতো ?

হ্যাঁ, রায়হান মাথা হেলায়। বলে, চল্লিশের পর থেকে একেবারে সত্তরের দশক পর্যন্ত দেশী-বিদেশী সব সিনেমাতেই দেখবে, নায়করা খালি সিগ্রেটের ধোঁয়া ছাড়ছে। সিগ্রেটের ধোঁয়া মুখ দিয়ে বের করতে করতে নায়িকার সঙ্গে কথা বলাটা স্মার্টনেস, ম্যানলিনেস আর ম্যাসকিউলিন বিউটির অঙ্গ বলে মনে করা হতো।

কয়েক মিনিট হালকা কথা হয় দু'জনায়। সালেহউদ্দিন বলে, রায়হান ভাই। মেডিক্যাল কলেজের গোলমালটা বেড়েই চলেছে, এডিটর সাহেবকে বলে কিছু লীড স্টোরি ছাপাবার ব্যবস্থা করুন না ? ও নিয়ে একটা এডিটরিয়ালও তো লিখলেন না আপনারা– আমাদের ডাক্তার বন্ধুদের কাছে তো আমাদের মুখ থাকে না।

রায়হানের কৌতূহল হয়। জানতে চায়, আজ কিছু হয়েছে ওদিকে ? সালেহউদ্দিন মাথা নাড়ায়। বলে, ওদিকে এখনও যাই নি। তবে মনে হয় না, হলে খবর পেতাম– গত সন্ধ্যায় হয়েছিলো, রাতেও টেনশন ছিলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ঐ পর্যন্ত বলে সালেহউদ্দিন ভেতরে চলে যায়। রায়হানের মনে হয়, কুতুবউদ্দিন বোধহয় আজ আর আসবে না। তার রাগ হয়, খামোকা সে এতোক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে। গাঁয়ের লোকদের এই এক দোষ, সময়ের দাম তারা একদম বোঝে না।

রায়হান দারোয়ানকে কুতুবউদ্দিনের কথা বলে নিজের কামরায় ফিরে যায়। এবং ঠিক ১২টার সময় সে লিখতে বসে। লেখাটা শেষ করে কম্পোজে পাঠাবার সময় সালেহউদ্দিন এসে দাঁড়ায় সামনে। বলে, আজ মিটিং আমাদের ইউনিটের, জানেন তো?

হ্যাঁ জানি, রায়হান জবাব দেয়।

আপনি থাকবেন না?

মনে হয় না থাকতে পারবো, তবে আমি তো বলেছি, তোমাদের যা মত আমারও তাই মত।

রায়হানের কথা শুনে সালেহউদ্দিন হাসে। বলে, দেখবো, কতোদিন এভাবে পাশ কাটাতে পারেন।

সে বেরুচ্ছিলো, ঐ সময় পেছন থেকে আমানউল্লাহ খানের ডাক তার কানে আসে। ভদ্রলোক দরজা খুলে গলা বাড়িয়ে তাকেই ডাকছেন। কাছে গেলে বললেন, একটু ভেতরে এসে বসুন, কথা আছে।

মুখোমুখি হলে বলেন, কিছু দিই আপনাকে? ফ্লাস্কে গরম কফি আছে।

রায়হান মাথা নাড়ায়। বলে, না ধন্যবাদ, আমার একটু তাড়া আছে, এক জায়গায় যেতে হবে।

কেন মিটিং-এ থাকবেন না? আমানউল্লাহ নিচু গলায় বলেন।

জ্বী না, ওদের জানিয়ে দিয়েছি, ওরা যা সিদ্ধান্ত নেবে তাতেই আমার সমর্থন থাকবে।

আচ্ছা রায়হান সাহেব, এটা কি ঠিক হচ্ছে? আমানউল্লাহ চোখে চোখে তাকান।

কোনটা? কিসের কথা বলছেন? রায়হান ঠিক বুঝতে পারে না।

এই যে খালি ধর্মঘট ডাকা হচ্ছে। চিন্তা করে দেখুন, দেশে এখন কতবড় একটা ক্রাইসিস– ইলেকশন হয়ে গেলো। ডেমোক্রেসির একটা প্রসেস আরম্ভ হয়েছে– ইলেকটেড গভমেন্ট হয়েছে, একটা ভালো অপোজিশনও হয়েছে, এখন ধীরে ধীরে মার্শাল ল চলে যাবার কথা– অথচ দেখুন, চারদিকে কতো হাঙ্গামা। বলুন, লাভ হচ্ছে কার? যে প্রসেসটা আরম্ভ হয়েছে, সেটাকে তো কাজ করতে দিতে হবে। দেখুন চিন্তা করে, একটার পর একটা স্ট্রাইক। আবার দেখুন, বাইরে বলা হচ্ছে প্রেস ফ্রি নয়, কিন্তু আসলে কি তাই? বলুন? ভেতরে ভেতরে প্রেসের ফ্রীডম তো কেড়ে নেওয়া হচ্ছে ধর্মঘট করে আর আন্দোলন করে– আমার তো ভাই অসহ্য লাগছে।

আমানউল্লাহ খান তাঁর লম্বা বয়ান শেষ করলে রায়হান হাসে। হাসতে হাসতেই বলে, অসহ্য লাগলেও বা কী করবেন বলুন? অসহ্য তো সবারই লাগে, ইলেকটেড গভমেন্ট তো সেন্সরশিপটা তুলে দিতে পারে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বাহ্ সেন্সরশিপ থাকবে না ? এটা কী বলেন ? এ দেশে লিটারেসির কি হাল জানেন না ? এডুকেশনের স্ট্যাণ্ডার্ড কেমন, তাও নিশ্চয়ই জানেন, তাহলে চিন্তা করে দেখুন– সত্যি মিথ্যা যা তা লিখতে শুরু করে দেবে ভেস্টেড ইন্টারেস্ট কোয়ার্টারের সমর্থনে– তারপর কে সামলাবে ঝামেলা বলুন ? তাই কোনো না কোনো রকম সেন্সরশিপ রাখতেই হবে।

রায়হান মনে মনে নিশ্চিত হয় আমানউল্লাহ খানের কথা বলার ধরন দেখে। আইয়ুব আমলে যখন সে নতুন সাংবাদিক, তখন এই ভাবে কথা বলতো সরকারী আমলা আর মন্ত্রীরা। কোনো সাংবাদিকের মুখে এমন কথা সে তখন শোনে নি।

বলে লাভ হবে না বোঝে, তবু রায়হান বলে, আমানউল্লাহ ভাই এসব পুরনো তর্ক তুলে কোনো লাভ নেই– সব প্রফেশনের মতো জার্নালিজমেরও কোড অব কাণ্ডাক্ট আছে। সেখানেও বিচারবুদ্ধি বিবেক এসবের মূল্য আছে। ডাক্তারকে বিশ্বাস করতে পারেন, ল ইয়ারকে পারেন, সাংবাদিকরাই দোষ করে ফেললো ?

আহা, ও কথা তো আমি বলি নি– আমানউল্লাহ কথা ঘোরাতে চেষ্টা করেন। বলেন, আমি মীন করছি জার্নালিস্টরা প্রফেশনের মধ্যে কেন পলিটিক্যাল ভেস্টেড ইন্টারেস্টকে সার্ভ করবে ? তারা কি ননপলিটিক্যাল থাকতে পারে না ? যে গভমেন্টই আসুক, যে ভাবেই আসুক। আমরা কিছুদিন, ধরুন বছর পাঁচেক, অন্তত সরকারের বিরোধিতা করলাম না, সরকারের কাজের ক্ষতি হয় এমন লেখা লিখলাম না। মানে সব সময়ের জন্য নয়, মাত্রই বছর পাঁচেক চান্স দিলাম সরকারকে– হতে পারে না কি এ রকম ?

রায়হান উঠে দাঁড়ায়, এ লোকের সঙ্গে খামোকা কথা বলে সময় নষ্ট করা। সে বলে, আমার একটা জরুরী কাজ আছে, আপনার প্রস্তাবটা নিয়ে আলোচনা করে দেখি অন্য সবার সঙ্গে। ওরা কী বলে শুনি, তারপর ফের না হয় কথা বলবো।

আহ্হা, আমানউল্লাহও উঠে দাঁড়ান। বলেন, আমি আলোচনার কথা তো বলি নি– আমি বলেছি একটা নতুন আইডিয়ার কথা। ধরুন, আমরা একটা সেমিনার মতো করলাম– সেখানে আমরা মতামত জানালাম– থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রির প্রায় সর্বত্রই তো একই রকম ব্যাপার– সেই সব মতামত মিডিয়া পিকআপ করলো– তারপর দেশে বিদেশে প্রচার করলো– হতে পারে না কি এ রকম ?

রায়হান ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকিয়ে অনুমান করতে চেষ্টা করে, ক্ষমতার মইয়ের নাগাল কি পেয়ে গেছেন ভদ্রলোক ? যদি পেয়ে থাকেন, তাহলে ঠিক কতদূর পর্যন্ত এগোতে চান ?

কোনো দেশের এ্যাম্বাসিতে প্রেস কাউন্সিলার ? না কি দেশের ভেতরেই পিআইও হতে চান কিংবা ডেপুটি মন্ত্রী জাতীয় কিছু ? এ্যাম্বেসাডার হওয়ার সাধ কি তাঁর গজিয়েছে ইতিমধ্যে ? কিংবা বঙ্গভবনে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সঙ্গে থাকবার কোনো ইচ্ছে ?

সে আর কথা না বাড়িয়ে বেরুবার জন্য পা বাড়ায়।

আচ্ছা রায়হান সাহেব, আমানউল্লাহ খুব অন্তরঙ্গ স্বরে পেছন থেকে ডাকেন। বলে, আপনার জমি কেনার কতো দূর ? কিনেছেন ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

রায়হান মুখ ফিরিয়ে হাসে। বলে, জমির মালিক হওয়া কি অত সোজা ? তবে মনে হচ্ছে, এ সপ্তাহেই বোধহয় রেজিস্ট্রি হবে।

বাইরে এসে দেখে অফিসের বারান্দায় চেয়ার সাজানো হয়েছে। সে ঘড়ির দিকে তাকায়, বেলা ২-৩০টা, কুতুবউদ্দিন তাহলে আজ এলো না।

বারান্দা থেকে নামতে যাবে, ঐ সময় সালেহউদ্দিনের ডাক। সে ফেরে তখন। সালেহ বলে, আপনার ফোন, বাসা থেকে।

ফোন কানে তুললে বীথির গলা শুনতে পায়। বলে, তুমি কখন আসবে ?

কেন ?

এদিকে মুনশি এসে বসে আছে, তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায়।

বেশ তো, এখানে পাঠিয়ে দাও।

ও অফিসে কথা বলতে সাহস পাচ্ছে না, ভয় পাচ্ছে, তুমি যদি রাগারাগি করো ?

কথাটা বলেই বীথি হাসে। তারপর ফের বলে, কুতুবউদ্দিনের কি আজ আসার কথা ছিলো ?

হ্যাঁ, কিন্তু আসে নি, রায়হান জানায়।

ও আসবে না, মুনশির ঘাড়েই নাকি সব দায়িত্ব ও চাপিয়ে দিয়েছে। রাখি এখন, তরকারি চুলোয়।

ফোন রেখে রায়হান নিজের মনে হাসে। কোনদিক থেকে যে কী হয় আন্দাজ করাই মুশকিল, যে সব কাজ করার কথা তার আজ, তার কিছুই করা গেলো না।

সে ফের বেরুচ্ছিলো, সালেহউদ্দিন পেছন থেকে বলে, রায়হান ভাই, এতক্ষণ যখন রইলেন, তখন আর একটু থেকে মিটিংটা সেরে যান। ঘন্টাখানেক পরই তো আমরা বসছি। বিএফইউজে থেকে জামান ভাই আসবেন আর ডিইউজে থেকে আসবেন হাফিজ ভাই, আপনারা সিনিয়ররা থাকলে ভালো হয়।

রায়হানের মন একবার বলে থাকি, ফের বলে নাহ, আমার থাকার তো কোনো দরকার নেই– আমি তো ওদের সব কথাতেই হ্যাঁ বলবো। দোনামনা ভাবনা নিয়ে কয়েক পা এগোয় সামনের দিকে। ঐ সময় হাঁপাতে হাঁপাতে এসে ঢোকে নিউজের নতুন সাংবাদিক হামিদ। বলে, সালেহ ভাই চলুন– সমস্যা হয়েছে একটা, হেল্প চাই।

কী সমস্যা ? সালেহউদ্দিন বসতে বসতে জিজ্ঞেস করে।

আর বলবেন না, ইউনিভার্সিটিতে গুলি হয়েছে।

তাতে আর কি সমস্যা, ও তো রোজই হচ্ছে।

কিন্তু এ গুলি তেমন গুলি নয়– এ হচ্ছে গুলিখোরের গোলমেলে গুলি।

তার মানে ?

হ্যাঁ, ছাত্র সমাজের ছেলেরা নিজেদের মধ্যে মিটিং করছিলো, ওরই মধ্যে গোলাগুলি শুরু হয়ে যায়। জনাতিনেক জখম।

নাম এনেছো ?

হু, সে জন্যেই তো বললাম, হেল্প চাই। জখমিদের একজন আমাদের ম্যানেজিং এডিটর আমানউল্লাহ খানের ছেলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বলো কি ? রায়হান এসে বসে মুখোমুখি।

হ্যাঁ, কীভাবে গুলিটা শুরু হয়, কেউ ঠিকমতো বলতে পারে না– কারণ ঝগড়াঝাঁটি, তর্কবিতর্ক কিছুই হয় নি। বরং উল্টো হাসাহাসি হচ্ছিলো। তবে ওদের মধ্যে ড্রাগ এ্যাডিক্ট ছিলো কয়েকজন। একজন হাসতে হাসতেই নাকি প্রথম ফায়ার করে, তারপর যার যার হাতে আর্মস ছিলো সবাই এলোপাতাড়ি গুলি চালায়– একজনের অবস্থা খুব খারাপ, হাঁটু পর্যন্ত পা কেটে বাদ দিতে হবে।

রায়হান ঐ পর্যন্ত শোনে, তারপর আর পারে না। বুকের ভেতরে ধড়াস ধড়াস আওয়াজ শুনতে পায়, তারপর সে জোরে পা চালিয়ে বাসার দিকে রওয়ানা হয়। বাসায় টেলিফোন করে মঞ্জু ফিরেছে কিনা সে খবরটা সে নিতে পারতো কিন্তু নিলো না। যদি মঞ্জু বাসায় না ফিরে থাকে, তাহলে ফোন পাওয়ার পর বীথি দুশ্চিন্তায় পড়ে যাবে, তখন ?

নয়

অফিসে পৌঁছে রায়হান গেটের কাছে মুনশিকে দেখতে পায়। বেচারা তখন ভেতরে ঢোকার জন্য দারোয়ানের কাছে কাকুতি-মিনতি করছিলো। রায়হানকে দেখে যেন হাতে চাঁদ পেয়ে যায়, ছুটে এসে সামনে দাঁড়ায়। প্রথমেই দাঁত বের করে হাসে একমুখ। তারপর বলে, স্যার আমি আইয়া পড়ছি।

রায়হান পাত্তা দেয় না। বলে, হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি। আপনি এসেছেন।

ঐ ক'টি কথা উচ্চারণ করে সে সামনের দিকে এগিয়ে গেলে, মুনশি ফের ডাকে। বলে, স্যার আমি বিপদে পড়ছিলাম– ছাড়া পাইতে পাইতে দেরি হইয়া গেলো– কাইল আইছি। আইয়াই বাসায় গেছি। আপার কাছে সব হুনছি। আপনের খুব কষ্ট হইছে। বলতে বলতে মুনশি অপরাধীর মতো মাথা নিচু করে ফের বলে, আমি খুব অন্যায় করছি স্যার, আপনের কাম শ্যাষ না কইরা আমার যাওন ঠিক হয় নাই– অহন আপনে মাপ না করলে ক্যাম্নে চলবো কন ?

রায়হান লোকটার ওপর কেন যেন রাগতে পারে না। তার রাগ হওয়া উচিত, কিন্তু দেখে, তার রাগ হচ্ছে না। সে লোকটার কাঁচাপাকা দাড়িসুদ্ধ ওপরে তোলা মুখ, দাঁত বের করা হাসি, কথা বলার সময় বাবরি চুলসুদ্ধ মাথাটা দোলানো– এইসব দেখে। তারপর বলে, আপনি মানুষটা ভালো না, বুঝলেন ?

জ্বে, সেইটা আপনে কইতে পারেন– অবশ্যই কইবেন– আপনের কাম ফালাইয়া থুইয়া কই কই গিয়া রইলাম। কুনো খবর নাই– এমন মাইনষেরে কে ভালো কইবো কন ? আমি খারাপ কাম করছি এইটা আমি বুজি– কিন্তু ক্যান গেলাম, ক্যান দেরি হইল যদি কই–

থাক, ওসব বলতে হবে না। রায়হান বাধা দিয়ে পেছনে না তাকিয়ে সোজা অফিসের ভেতরে ঢুকে যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

স্যার আপনেরে না কইলে কারে কমু কন ? বলতে বলতে মুনশি রায়হানের পেছন পেছন একেবারে তার কামরার ভেতরে চলে যায়। তারপর টেবিলের সামনে পাতা চেয়ারের পিঠ ধরে দাঁড়ায়। বলে, স্যার হইছিলো কি, আপনেরে কই, আটরশি গেছি। হুজুরে দরবারেও যামু, ওই সময় হুনি, পেরসিডেন্ট এরশাদ আইছে। মানুষ ছুইটা বাইরাইলো। পেরসিডেন্টরে দেখবো, আমার মাতবর সাব, যার লগে আমি গেছি, হ্যায় হুড়াহুড়ি ধাক্কাধাক্কির মইদ্যে পইড়া–

রায়হানের বিরক্তি লাগে শুনতে। বলে, থাক ওসব শোনার দরকার নেই, আপনি এখন তাড়াতাড়ি জমি রেজিস্ট্রির ব্যবস্থাটা করুন।

হ স্যার, আমিও তাই কই, মুনশি মাথা দোলাতে দোলাতে বলে, আর দেরি করা যায় না। এ্যাম্নেই ম্যালা দেরি হইয়া গেছে– কুতুবউদ্দিন ভাইও কইল, হ্যারও ট্যাকা দরকার– তয় স্যার, একখান কথা কই ?

রায়হান মুনশির তোষামুদি করে কথা বলার ঢঙ দেখে বলে, ঠিক আছে বলুন।

আমি কই কি, স্ট্যাম্প দলিল কিনা, দলিল লিখা, এই কাম তো ঢাকায় বইয়া করা যায়–

ঢাকার মুহুরি সব কইরা দিবো আর খালি রেজষ্টারি হইবো সাভার রেজষ্টারি অফিসে– এ্যাম্নে কামটা করলে ভালো হয় না ?

জমি-জমা বেচা কেনা, রেজিস্ট্রি, দলিল লেখানো এসব বিষয়ে রায়হানের অভিজ্ঞতা নেই বললেই চলে। মোহনগঞ্জে জমি রেজিস্ট্রির জন্য দু'বার যাওয়া আর নানান হেনস্থার ঘটনাগুলো তার মনে পড়ে। সে বলে, কোথায় কী করবেন, কী করলে ভালো হয়, সেটা আপনি জানেন, তবে কাজটা তাড়াতাড়ি হওয়া দরকার, বুঝলেন ?

হ বুজছি, মুনশি পারলে খুশিতে লাফিয়ে ওঠে। বলে, আমি অহনই যাইতাছি, মুহুরি সাবরে ডাইক্যা আনি– আপনের সামনে কথা হইয়া যাক।

যাওয়ার কথা সোৎসাহে বলে মুনশি, কিন্তু কেন যেন যায় না, যেতে যেতে থামে এবং রায়হানের মুখের দিকে তাকায়।

রায়হানের মনে হয় লোকটা বোধহয় কিছু বলতে চায়। সে ডেকে বলে, কী ব্যাপার, আপনি কিছু বলতে চান ? জ্বে না, মুনশি জোর করে হাসে। তারপর মুখ কাচুমাচু করে বলে, না স্যার কী আর কমু, কওয়ার তো মুখ নাই স্যার। ৮/১০ দিন বাড়িত নাই, বুঝতেই পারেন সংসারের অবস্থা কী হইতে পারে, আপনে জ্ঞানী মানুষ–

রায়হান কোনো কথা না বলে পকেট হাতড়ে একখানা ৫০ টাকার নোট বের করে মুনশির হাতে দেয়। তারপর সত্যি সত্যিই দেরি হয় না। ঘন্টাখানেকের মধ্যেই একটি লোককে ধরে আনে মুনশি। বলে, এই যে স্যার মুহুরি সাবরে ধইরা আনছি, ইনি ষ্ট্যাম্প কিন্যা দলিল লিখবো।

লোকটি মাঝবয়সী, হাসি হাসি মুখ সর্বক্ষণ। বলে, সাফ কবলা বিক্রি দলিল হইবো তো স্যার– সাদেক সাহেবের নাম সাকিন তো বায়না নামার মইদ্যেই রইছে, আপনের নাম সাকিন একখান কাগজে লেইখ্যা দেন।

আর টাকা ? স্ট্যাম্প কিনতে টাকা লাগবে না ? রায়হান জিজ্ঞেস না করে পারে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ক্যান ট্যাকার কি হইল ? মুনশি বিভ্রান্ত চোখে তাকায়। বলে, ট্যাকার ব্যবস্থা হয় নাই ?

একটু যেন চিন্তা হয় মুনশির। তারপরই বলে, ঠিক আছে অহন দিলে ভালো, নাইলে বৈকালে দিবেন, কি মুহুরি সাব, ট্যাকা বৈকালে পাইলে চলবো না ?

রায়হানের মাথার ভেতরে চক্কর দেয় মুনশির কথা শুনে। প্রায় ১০/১২ হাজার টাকা ব্যাপার সেদিন শুনলো, মিসেস সাদেক তাকেই পুরো টাকাটা দিয়ে দিতে বলেছিল, আজ কী বলবে কে জানে– আর তার নিজের অংশেও তো কম লাগছে না, হাজার পাঁচেক তো অবশ্যই দিতে হবে।

সে জিজ্ঞেস করে, মুনশি, কতো টাকা লাগবে ?

ক্যান, আপনেরে কুতুবউদ্দিন কয় নাই ? মুনশি খানিক অবাক হয়। বলে, আমারে না কইলো যে, আপনের টাকা রেডি, আপনে তারে ট্যাকা লইয়া যাইতে কইছেন।

মুনশি মনে মনে হিসেব করে। মুহুরির সঙ্গে নিচু গলায় পরামর্শও করে কয়েক মিনিট। তারপর বলে, তা স্যার ১৬/১৭ হাজার তো লাগবো– ধরেন ১৮ হাজার সবসুদ্ধ মিলাইয়া।

রায়হানের বিরক্তি লাগে। বলে, আপনার এই ভাবে হুড় হাঙ্গামা করে কাজ দেখানোর দরকার ছিলো না– আজকে এসে আজকেই স্ট্যাম্প দলিল কেনার কাজটা করা কি ঠিক ?

বাহ্ আমার কী দোষ, মুনশি প্রতিবাদ করতে চায়। বলে, কুতুবউদ্দিন আমারে কইলো। যাও ট্যাকা রেডি আছে– সেই মতোন আমি আইছি, ক্যান আপনের ট্যাকা রেডি নাই ?

আরে আমার অংশের টাকা নিয়ে তো অসুবিধা নেই, রায়হান জানায়। বলে, সমস্যা তো সাদেক সাহেবকে নিয়ে, উনি তো ক'দিন ধরে হাসপাতালে– এখন যদি তাঁর বিবি বলেন যে, আজ পারবো না, তখন কী করবেন ?

মুনশি হতাশ ভঙ্গিতে মাথা একদিকে কাত করে লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে। তারপর অনুযোগের স্বরে বলে, এই তো স্যার, আপনে বিপদে ফালাইলেন, মুহুরি সাব ভেণ্ডাররে দিয়া ষ্ট্যাম্পের পিছে আপনেগো নাম তারিখ লিখাইয়া আনছে, কী মুশকিল হইল, কন দেহি, আমি অহন কী করি ?

রায়হানকেই অগত্যা বলতে হয়, মুনশি আপনি বরং এখনই চলে যান সাদেক সাহেবের বাসায়, দেখুন টাকাটা দেন কিনা, যদি না দেন, তাহলে কখন দেবেন, জেনে আসুন।

স্যার, আমারে কি দিবো ? মুনশি অনিশ্চিত স্বরে বলে।

কেন দেবেন না, ওঁদের জমি রেজিস্ট্রি হবে, স্ট্যাম্পের টাকা ওঁরা না দেবেন তো কে দেবে ?

তা-ও স্যার আপনে লগে থাকলে ভালো হয়, আপনে যাইতে পারবেন না ?

রায়হান মনে মনে হিসাব করে, আজ তার কাজ বেশি নয় ফার্স্ট এডিটরিয়ালটা লিখবেন সম্পাদক নিজে আর পোস্টটা লিখবেন আমানউল্লাহ খান, তিনি পরশু থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বলে রেখেছেন। শুধু সেকেণ্ড এডিটরিয়ালটা লেখার দায়িত্ব তাঁর। হিসাব করে নিজেকে তার ফ্রি-ই মনে হয়। তবু বলে, আপনি যান, আমি টেলিফোনে বলে দিচ্ছি।

টেলিফোনে মিসেস সাদেককে পাওয়া যায়। রায়হান প্রথমে সাদেক সাহেবের শারীরিক অবস্থার কথা জিজ্ঞেস করে। বলে, কেমন আছেন আজ সাদেক সাহেব?

ভালো, মেরি শান্ত গলায় জবাব দেয়। বলে, আপাতত কিছুদিন ওকে হাসপাতালেই থাকতে হবে, নতুন এক বিদেশী ফিজিওথেরাপিস্ট এসেছেন। তিনি হাসপাতালে রেখেই রোগীর ফিজিওথেরাপি দিচ্ছেন। তবে এমনিতে ভালো। খাওয়া-দাওয়া করছেন। পড়ে যাওয়াতে মেজর কোনো ক্ষতি হয়নি। আপনি কেমন, ভালো?

রায়হান তখন মুনশির কথা বলে। আর সেই সঙ্গে বলে স্ট্যাম্প কেনার টাকার কথা। শুনে মেরি খুব স্বাভাবিক গলায় বলে, হ্যাঁ, টাকা তো লাগবে, আমি জানি, কখন দিতে হবে? রায়হান দুপুরের কথা বললে, সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে যায় মেরি। তারপর যখন বলে যে একটা/দেড়টার দিকে মুনশিকে পাঠাচ্ছে টাকা আনার জন্য, তখন মেরির গলার স্বর একেবারে অন্যরকম হয়ে যায়। যেন রায়হানের কথা বুঝতে পারে নি এমন ভঙ্গিতে প্রশ্ন করে, কি বললেন?

মুনশি যাচ্ছে আপনার কাছে স্ট্যাম্প কেনার টাকা আনতে, রায়হান খুব স্পষ্ট করে বলে।

এ কী বলছেন! মেরির গলার স্বরে রীতিমতো বিরক্তি-ক্ষোভ দুই-ই প্রকাশ পায়। বলে, ওই মানুষের হাতে আপনি অতোগুলো টাকা দিতে বলেন? অদ্ভুত লোক কিন্তু আপনি– কয়েক মুহূর্ত থেমে ফের বলে মেরি, আচ্ছা, আপনি কেমন করে পারেন?

কী, রায়হান মেরির কথা ধরতে পারে না। বলে, কীসের কথা বলছেন?

বলছি, কেমন করে মানুষকে অতো সহজে বিশ্বাস করতে পারেন? লোকটার কথার কোনো ঠিক আছে? নিজেই তো দেখলেন, কোথায় না কোথায় ডুব দিয়ে রইলো। কতোদিন ওর বাড়ি পর্যন্ত গেলেন তবু ওর টিকির নাগাল পেয়েছিলেন? আর ঐ লোকের হাতে আমি অতোগুলো টাকা ক্যাশ দেবো? কেন, আপনি নিজে আসতে পারেন না?

রায়হান মহিলার অমন আক্রমণাত্মক কথা শুনে খানিক ঘাবড়ে যায় প্রথমে। তারপর ওর সঙ্গে ফুলবাড়িয়া যাওয়ার ঘটনা স্মরণ হলে এক ধরনের মজাও লাগে তার। সে বোঝে, আসলেই মহিলার আবেগটা বেশি। যেমন গায়ে পড়ে ঘনিষ্ঠ হতে পারে। তেমনি মানুষ ভুল করলে তাকে নির্দ্বিধায় বকাবকিও করতে পারে।

তাহলে কি আমাকেই যেতে হবে? সে গলা নামিয়ে জিজ্ঞেস করে।

ঠিক আছে, মেরির গলায় উষ্মা কমে না। তীব্র স্বরে বলে, আপনি না আসতে চান, আসবেন না? আমি না হয় যাবো, কোথায় যাবো, আপনার বাসায়, না অফিসে?

রায়হান এবার হেসে ওঠে। বলে, ঠিক আছে, বেশি রাগারাগি করবেন না, আমিই আসছি একটা/দেড়টার দিকে।

সে ফোন নামিয়ে রাখলে মুনশি উৎসুক মুখে জিজ্ঞেস করে, কুনসময় যাইতে কইলো? ঐ একটা/দেড়টার সময়? আপনে লগে যাইবেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

না মুনশি, রায়হান মাথা নাড়ায়। বলে, আপনার যাওয়ার দরকার নেই। আমাকেই যেতে হবে। আপনি বরং বিকেলের দিকে আসুন। কথাটা বলে সে নিজের অংশের টাকাটা ব্যাংক থেকে তুলে নেওয়ার জন্য একখানা চেক লিখে দিলে মুনশি তখনকার মতো বিদায় হয়।

দ্বিতীয় সম্পাদকীয়টা লিখতে তার দেরি হয় না। ১২টার দিকে লেখাটা কম্পোজে পাঠিয়ে দিয়ে উঠতে যাবে, ঐ সময় সালেহউদ্দিন এসে ঢোকে তার কামরায়। বলে, রায়হান ভাই, গতকাল তো ছিলেন না। আজ অন্তত আমাদের সঙ্গে বসুন। চার্টার অফ ডিমাণ্ড নিয়ে নতুন কথা উঠেছে। সিনিয়রদের মতামত খুব দরকার।

রায়হান সালেহউদ্দিনের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে। তারপর হাসে একটুখানি। শেষে বলে, চার্টার অফ ডিমাণ্ড বলো, আর ওয়েজবোর্ড বলো, আসল ব্যাপার হলো ইউনিটি। বুঝলে ? ওটা থাকলে সবই হবে, আইয়ুব খানের বইটা পড়েছো ? অতোবড় মিলিটারি লীডার তিনিও বলেছেন, ইস্ট পাকিস্তানের পলিসিতে তাঁর ভুল ছিলো, জার্নালিস্টদের তিনি হিসাবের মধ্যে ধরেননি– অন্যের কথায় বিশ্বাস করে বসেছিলেন যে, জার্নালিস্টদের ঠাণ্ডা করে দেওয়া যাবে– অমন মিলিটারি ডিক্টেটর উল্টে গেল। তাও কলমপেষা জার্নালিস্টদের ইউনিটির কারণে।

একটু থেমে ফের বলে রায়হান, বুঝেছো, ঐ ইউনিটিই আসল– আর আমার কথা যদি বলো, তো আমি সব সময়ই বলে এসেছি, আমাদের ইউনিট-এর মতই আমার মত।

সালেহউদ্দিন হতাশ হওয়ার ভঙ্গিতে বলে, রায়হান ভাই আপনি সব ব্যাপারেই পাশ কাটিয়ে যান কেন, বলুন তো ?

রায়হান হাসে। মনে মনে নিজেকে জিজ্ঞেস করে। সত্যি কি আমি পাশ কাটিয়ে যাই ? সালেহউদ্দিনকে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে বলে, তোমার তাই মনে হয় ? কী জানি ভাই, আমি তো জানি না, তবে সব ব্যাপারেই মনে হয়, সবই আলগা হৈ চৈ, যা হবার তা আপনা থেকেই হয়ে যায়– প্রসেসটা কোত্থেকে যে আরম্ভ হয় বোঝা যায় না, তারপর যখন আরম্ভ হয় তখন শেষ পরিণতিতে গিয়ে পৌছায়– সেই জন্যে আমার মনে হয় না হৈ চৈ করে দাবি তোলার দরকার আছে।

সালেহউদ্দিন কী বোঝে, সেই জানে। দেরি করে না। মুখে তাচ্ছিল্যের হাসি ঝুলিয়ে নিয়ে বেরিয়ে যায়। সে নিজেও দেরি করে না, অফিস থেকে বেরিয়ে পড়ে।

সঙ্গে সঙ্গে রিকশা পায় না, কিছুক্ষণ হাঁটতে হয়। হাঁটতে হাঁটতে সালেহউদ্দিনের অভিযোগটা স্মরণ করে। আসলেই কি সে পাশ কাটায় জীবনের সমস্যাকে ? এমন অভিযোগ অনেকেই করেছে। এই অভিযোগ জামাল করেছিলো, যখন সে পার্টির সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করে। বলেছিলো, পার্টি ভাগ হয়ে যাচ্ছে বলে তুমি পার্টির সঙ্গে সম্পর্ক রাখবে না, এটা তো পাশ কাটানো হলো– রিয়েলিটিকে পাশ কাটিয়ে তুমি কোথায় যাবে ? বরং পার্টির যে অংশ পছন্দ হয়, সে অংশের সঙ্গে থাকা যায় বলে মনে করো, সেই অংশে থেকে ফাইট করো। জামাল থেকে গিয়েছিলো। একাত্তরে ছিলো,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

তারপরেও ছিলো। শেষে কোথায় যে হারিয়ে গেল, জানাই গেলো না। কেউ বলে, ইপিসিপি এমএলদের সঙ্গে ছিলো। তারপর রক্ষীবাহিনীর হাতে খুন হয়েছে। কেউ বলে ক্যাম্পারে মারা গেছে। সেদিন তো একজন বললো, তবলীগ জামাতে যোগ দিয়ে সে চিটাগাং না আরাকান, নাকি বার্মা এলাকাতেই চলে গেছে। যদি দেখা হতো, তাহলে সে জিজ্ঞেস করতো, জামাল তুমি কি রিয়েলিটিকে ধরে রাখতে পেরেছিলে? তার কাছে প্রশ্নটা ধাঁধার মতো লাগে, কোথায় যে সে কী পাশ কাটালো একদম বুঝতে পারে না। এমন কথা বীথিও তাকে অহরহ বলে। তার ধারণা, তার স্বামী ঝামেলা এড়ানোর জন্যই বাড়িঘর বানাতে চায় না। তুমি কি পুরো জীবনটাকেই পাশ কাটিয়ে যেতে পারবে? এমন কথা বীথি যে কতোবার বলেছে তার হিসাব নেই। অনেকক্ষণ হাঁটার পর সে রিকশা পায়। বেলা একটাতেও রাস্তাঘাটে যথেষ্ট ব্যস্ততা। তবে ৮টা/৯টায় যেমন থাকে, তেমন নয়। কেমন ক্লান্ত একটা ভাব টের পাওয়া যায় এখনকার ব্যস্ততার মধ্যে। ঘামে ভেজা কাহিল রিকশাঅলা ভিড় ঠেলে এগোবার চেষ্টা করে না। ভিড়ের মধ্যে আটকে গেলে আটকে থাকে আর চোখ পিটপিট করে অপেক্ষা করে, কখন রাস্তা খুলবে। ঘর ফেরতা অথবা অফিসগামী মানুষ এখন পথে নেই। হকাররাও সম্ভবত আনাচে-কানাচে কোনো গাছতলায় অথবা ছাউনির নিচে খানিক বসে জিরিয়ে নিচ্ছে। মতিঝিল কলোনির মোড়ে ভারী রকমের ট্রাফিক জ্যাম-এ পড়তে হলো। তার রিকশাকে পাশ কাটিয়ে দুটো বেবিট্যাক্সি সামনে গিয়ে দাঁড়ালো, তারপর সমানে ধোঁয়া ছাড়তে শুরু করলো। তার হয়েছে এই মুশকিল, ধোঁয়ার জন্যে ডাক্তারের হুকুমে সে সিগ্রেট ছেড়ে দিলো। কিন্তু তবুও নিস্তার নেই, নিত্য তাকে রাস্তার ধোঁয়া খেতে হয়। তার ধারণা, ঢাকা শহরে ট্রাফিক জ্যাম আর পরিবেশ দূষণের কারণ রিকশা কিংবা বাস নয় বরং বেবিট্যাক্সি আর মিনিবাস। দু'ঘণ্টা রাস্তায় ঘোরাফেরা করা আর এক প্যাকেট সিগ্রেটের ধোঁয়া গেলা একই ব্যাপার। ট্রাফিক জ্যাম-এর মধ্যে আটকা থাকতে থাকতেই একঝলক ঠাণ্ডা বাতাস গায়ে এসে লাগে। তাতে বুক ভরে নিঃশ্বাস নেয় রায়হান। রিকশাঅলা উত্তরের দিগন্তে তাকিয়ে বলে, মনে হয়, ম্যাঘ নামবো।

পাশের রিকশাঅলা মন্তব্য করে, আষাঢ় মাস চইলা যায়, ম্যাঘ না নাইমা পারে। রায়হানও দেখে, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হাইরাইজ বিল্ডিং-এর ফাঁকে ফাঁকে সবুজ গাছপালার ওপর দিয়ে হাতির গায়ের মতো কালচে ধূসর মেঘ ক্রমেই বেশি ঘন হচ্ছে। ঐ মুহূর্তে ছেলেবেলার স্মৃতি মনের ভেতরে উঁকি দেয়। দাদী সুর করে ছড়া কাটতো– হাঁড়িয়া মেঘে ঝড় তুফান, পুরিয়া মেঘে নদীত বান। উড়াল মেঘে বত্তিশ বাও, কুড়াল মেঘে ভাসাও নাও।

শুধু দুটো শ্লোক মনে আছে, বাকিগুলো আর মনে আসে না। কিন্তু সুরটা সে স্পষ্ট শুনতে পায়। দু'হাতে তালি দিতে দিতে দাওয়ায় বসে দাদী ছড়াটা গাইতো মা-মরা চাচাতো ভাই আলমকে কোলে নিয়ে। মোহনগঞ্জের গোটা বাড়িটার ছবি দেখতে পায় সে মনের ভেতরে। একেবারে কলাগাছ, বাঁশবাগান আর আম-কাঁঠালের বাগিচাসুদ্ধ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

আচমকা একটা চিন্তা তার মনের ভেতরে উঁকি দিতে শুরু করে– ফুলবাড়িয়ায় যে জায়গা কিনতে যাচ্ছে, হয়তো তার বাড়িও হবে ওখানে, কিন্তু সেই বাড়ির বারান্দায় নাতিকে কোলে নিয়ে কি এমন বৃষ্টির গান গাইবে বীথি ? দৃশ্যটা কল্পনা করে সে এবং তাতে বেশ হাসি পায় তার। কেমন দেখতে লাগবে তখন বীথিকে ? দাদী ছিলেন শ্যামলা। আর বীথি হলো ফরসা– চুলগুলো সব পেকে গেলে কি ওকে দাদীর মতো দেখতে লাগবে ? রায়হান মনে মনে মিলিয়ে দেখে আর মাথা নাড়ায়। নাহ্ বীথিকে অন্যরকম লাগবে দেখতে। শুধু ফরসা বলে নয়, ওতো দাদির মতো লম্বাও নয়। আর যদি নাতিকে কোলে নিয়ে বর্ষার ছড়া গায়ও তাহলে সে ছড়া হবে অন্যরকম। তাতে হাঁড়িয়া মেঘ আর পুরিয়া মেঘের কথা থাকবে না। থাকবে, আয় বিষ্টি ঝেঁপে, ধান দেবো মেপে'র মতো ছড়া। আসলে যেদিন গেছে, সেদিন একেবারেই গেছে, কিছুই নেই তার বাকি। রায়হান নিজেকে বলে আর কালো হয়ে আসতে থাকা আকাশ দেখতে দেখতে আপন মনে হাসে।

দরজায় কড়া নাড়তে হয় কয়েকবারই। তারপর দরজা খোলে এবং মিসেস মেরি সাদেককে দেখা যায়। বলে, আসুন। রায়হান ভেতরে ঢুকলে দরজা বন্ধ করে মেরি হাসে। বলে, আমি আপনার জন্যে অপেক্ষা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

ঘুমিয়ে পড়েছিলেন ? এখন ? রায়হান অবাক হয়ে লক্ষ্য করে। সত্যি সত্যি মেরির দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে, বেশবাসে, এলো চুলে, শ্লথ আর শিথিল ভাব। মেরি বলে, কী করবো, বাসায় একা– দুই মেয়ের একজন স্কুলে, একজন ওর আব্বার কাছে হাসপাতালে।

বলতে বলতে মেরি বসার ঘরের পর্দা সরিয়ে ভেতরে যায়। রায়হান তখনও ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে। ভেতরটা অন্ধকার মতো। কেমন যেন গুমোট ভাব। তার মনে হয়, মেরি ভেতরে গেলো টাকা আনতে। সে বসে না, টাকাটা হাতে পেলেই সে চলে যাবে।

আরে! কী হলো, ভেতরে আসুন। মেরির ডাক শোনার পরও তার সঙ্কোচ যায় না। তার ভেতরে যাওয়া কি ঠিক হবে ? সে নিশ্চিত হতে পারে না– আর তাই তার পা-ও এগোতে চায় না। ঐ মুহূর্তে ফের তাগিদ আসে। মেরি বলে, কী মুশকিল। মানুষটা এমন করে কেন ? একেবারে নতুন পরিচয় তো নয়– আহা ভেতরে আসুন না।

অগত্যা পর্দা সরিয়ে ভেতরে ঢুকতে হয়। প্রথমেই প্যাসেজ, অন্ধকার এখানেও! বাইরে তাহলে কি মেঘ ছেয়ে গেছে আকাশময়! তার অনুমান হয়। ডান দিকের কামরায় বাতি জ্বলছে। সেই কামরা থেকেই ফের ডাকে মেরি। আরে কী খুঁজছেন আপনি, এই তো আমি এখানেই।

পর্দা সরিয়ে ভেতরে ঢুকলে কার্পেট দেখতে পায় মেঝেতে। সুতরাং খোলো এবার জুতো। প্যাসেজে জুতো রেখে সে ঘুরে দাঁড়ায়। দেখে কামরাটা বেশ বড়, প্রকাণ্ড এক বিছানায় বালিশে হেলান দিয়ে বসে আছে মেরি, এলো চুল ছড়ানো, মুখে হাসি। সামনে একটা টুল দেখিয়ে বলে, এবার বসুন, কথা বলি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

রায়হান বসে এবং বেকুবের মতো হাসেও। বলে, কথা আর নতুন করে কী বলবো। সবই তো শুনেছেন, আজ স্ট্যাম্প কেনা হবে, কাল দলিল লেখা হবে। তারপর পরশু দিন–

মেরি কথা শেষ করতে দেয় না। বলে, আচ্ছা মানুষ তো আপনি! ঐ একই কথা না কিছুক্ষণ আগেই বললেন– ঐ কথা ফের বলবেন? সবই তো বললেন টেলিফোনে, বলেন নি?

অপ্রস্তুত হতে হয় রায়হানকে। সে এখন বলেটা কী? ঘরের চারদিকে তাকিয়ে দেখে সে। হালকা নীল দেয়াল, একদিকে বেশ বড় সিংগার ফ্যান, তিনখানা আরশি জুড়ে বানানো। তার পাশে কাঠের আলমারির মতো, বোধহয় জামাকাপড় থাকে। একই লাগোয়া লোহার আলমারি, বোধহয় টাকাপয়সা সোনাদানা থাকে। কর্পোরেশন-এর এ্যাকাউন্ট্যান্টদের মাইনে কতো? তার জানতে ইচ্ছে করে। সে আর একবার নজর ঘোরায় চারদিকে।

আচ্ছা, আপনি কি আগে কখনো শোবার ঘর দেখেন নি? ঠিক আছে, দেখুন– কিন্তু ওভাবে বোবার মতো মুখ বুঁজে দেখার তো মানে হয় না। আলমারি ড্রেসিং টেবিল এসব আপনার বাসায় নেই?

রায়হান এবার সোজাসুজি তাকায়। আর তাকিয়ে সে মেরির কপালে এসে পড়া চুল দেখে, ঝকঝকে শানানো চোখের চাউনি দেখে, গলার লকেটের ঝিলিমিলি দেখে, গোল বাহুমূলের স্ফীতি দেখে, বুকের ওপরকার আঁচলে বড় বড় কলকার নকশা দেখে। শুধু দেখেই, কিছু বলে না– বলার মতো কথা খুঁজে পায় না। যা বলার, সবই তো বলা হয়ে গেছে। এক কথা সে কতোবার বলবে? তার কেমন ভয় ভয় লাগে, এ কেমন জায়গায় এসে পড়েছে সে? মেরি অমন ভঙ্গিতে হাসছে কেন? তার ভয় লাগে, আবার আকর্ষণও বোধ করে।

কী হলো, কিছু বলুন? মেরি ফের হাসে।

রায়হানও বোকার মতো হাসে। বলে, কী বলবো, বলুন? সবই তো বলে ফেলেছি। এবার আপনি বলুন।

আর ঠিক ঐ সময় কড়কড়াৎ শব্দে বাজ পড়ে বাইরে কোথাও আর সেই সঙ্গে দালান কাঁপানো মেঘের ডাকও শোনা যায়– তারপরই চলে যায় বাতি।

বাহ্, এবার? মেরির গলার কৌতুক সারা ঘরে ছড়িয়ে যায়। বলে, এবার না মজা, ঘর থেকেই বেরুতে পারবেন না। চুপচাপ এবার বসে থাকতে হবে– অন্ধকার হয়ে গেলে এই এক মজা। কথা ক'টা বলতে বলতে কেন যে খিলখিল করে হাসে মেরি, আন্দাজ করতে পারে না রায়হান। সে শান্ত গলায় বলে, মোমবাতি নেই?

নাহ্, কী দরকার, কেন, অন্ধকারে আপনার ভয় লাগে?

কিছু দেখা যায় না, নড়াচড়ার অস্পষ্ট আওয়াজ হয় সামান্য। তারপর সুস্পষ্ট মেয়েলি একখানা হাত পেছন থেকে রায়হানের গলা পেঁচিয়ে ধরে। মেরি বলে, ভয় লাগে তাই না? আমাকে এভয়েড করতে চাও এ্যাঁ? কিন্তু লোভী নজর দিয়ে আমাকে চাটতে খুব মজা, তাই না? কাওয়ার্ড কোথাকার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

একি! একি হচ্ছে? রায়হান বিপন্ন স্বরে বাধা দেয়ার জন্য কিছু বলতে চায়, কিন্তু পারে না। ঐ গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে বিচিত্র একটা উষ্ণ, স্ফীত, মাংসল দলন-মলনের মধ্যে পড়ে যায়, আর তাতে তার গলার স্বর গাঢ় কাথ ভর্তি অন্ধকার কূপের মধ্যে কোথায় যে ডুবে যায় সে নিজেই বুঝতে পারে না। একবার ভয় হয়, বুকের বাঁ দিকের ব্যথাটা হৃৎপিণ্ডটাকে বোধহয় খামচে ধরবে। কিন্তু দেখে, অমন কিছুই হয় না বরং দু'জনে বয়স্ক অভিজ্ঞতা দিয়ে হঠাৎ জেগে ওঠা শরীরের ঝড়ো আবেগটাকে নিপুণভাবে উপভোগ করে। বাইরে তুমুল বৃষ্টি তখন। কতোক্ষণ সময় পার হয়েছে দু'জনের কেউই বুঝতে পারে না। অনেকক্ষণ পর ক্লান্ত রায়হান মাথা তুললে মেরি ফিসফিস করে বলে, তুমি কি এখনই চলে যাবে?

ক'টা বাজে? রায়হান জানতে চায়।

এই, আর একটু থাকো না! মেরির হাত ফের রায়হানের গলা পেঁচিয়ে ধরে। তারপর গলা নামিয়ে ফিসফিস করে বলে, এই, তোমার ভালো লেগেছে?

রায়হানের গলা দিয়ে কোনো জবাব বের হয় না। চারদিকের অন্ধকার আরও গাঢ় হয়ে যায়। তার মনে তখন প্রশ্ন, সে কি এই অন্ধকার থেকে আর কখনও বের হতে পারবে?

এরপর থেকে তুমি আমাকে খারাপ ভাববে, তাই না? মেরি ফের বলে।

এবারও রায়হান কিছু বলতে পারে না। কান পেতে তুমুল বৃষ্টির শব্দ শোনে।

একটু পর ফের মেরির গলা শোনা যায়। সে বলে, খারাপ ভাবলে ভাববে– জীবন আমাকে কী দিয়েছে? কিছুই দেয় নি, বরং নিয়েছে। এমন এক স্বামী পেয়েছি যে চাকরির উন্নতির জন্য আমাকে বারবার ব্যবহার করেছে। কতোজনের বিছানায় যে আমাকে যেতে হয়েছে, আমি নিজেই এখন বলতে পারবো না। আমাকে নষ্ট করেছে ও, আবার ও-ই আমাকে ছুঁতো না– এখন তো কোনো মুরোদই নেই– কিন্তু আমার তো বয়স আছে, আমি রক্ত মাংসের মেয়ে মানুষ, আমি খারাপ হবো, বেশ করবো। আমার যা ভালো লাগে, তা আমি ছিনিয়ে নেবো, বুঝলে? তোমরা পুরুষ মানুষরা যা খুশি ভাবতে পারো।

মেরি হঠাৎ কেন রেগে যায় রায়হান বুঝতে পারে না। তার মনে হয়, তার কিছু বলা উচিত কিন্তু কী বলবে সে? মেরির অতীত জীবনে কী ঘটেছে না ঘটেছে তার তো সে কিছুই জানে না। কোন সান্ত্বনার কথা বলবে সে? কিছুক্ষণ আগে যে ঘটনা ঘটে গেলো দু'জনের মধ্যে তারপর অবশ্যই তার কিছু করা উচিত। মুখে অন্তত কিছু সে বলতে পারে। কিন্তু অদ্ভুত কান্ড, মুখ দিয়ে আর কোনো কথাই বের হয় না। তবে তার ডান হাতখানা আপনা থেকেই মেরির মাথা ঘাড় পিঠ বুলিয়ে দিতে থাকে।

এই, তুমি বরং সন্ধ্যা বেলা যেও, কেমন?

মেরিকে হঠাৎ যেন ছেলেমানুষিতে পেয়ে বসে। বলে, আজ তো বৃষ্টি হচ্ছে, সারাদিন বৃষ্টি পড়বে– আর আমরা এমনি সারাদিন শুয়ে থাকবো।

মেরির ছেলেমানুষিতে রায়হানের সম্বিৎ ফেরে। তার খেয়াল হয় যে মুনশি টাকার জন্য অফিসে এসে বসে থাকবে। সে উঠে হাতড়ে হাতড়ে আন্দাজ করে পর্দা সরিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

প্যাসেজে যায়, তারপর জানালার পাশে দাঁড়িয়ে হাতের ঘড়ি দেখে– সাড়ে তিনটা। তার মানে, দেড় ঘণ্টা ধরে সে মেরির সঙ্গে আছে। সে বলে, আমাকে এবার যেতে হবে।

এক্ষুণি যাবে ?

প্রশ্নটা করে সম্ভবত উঠে বসে মেরি। এবং বসা অবস্থায় থেকেই অস্ফুট গলায় বলে, আমার এখন যা ঘুম পাচ্ছে না– কী বলবো!

বলতে বলতেই খাট থেকে নামে, না খাটের ওপর থেকেই ঝুঁকে পড়ে কিছু করে, ধরা যায় না। ঐ মুহূর্তে হঠাৎ বাতি জ্বলে ওঠে ঘরের ভেতরে। রায়হান অবাক হয়, ঘরে চার্জার লাইটের ব্যবস্থা ছিলো, তবু সেটা জ্বালানো হয় নি কেন ?

মেরি ওদিকে ফের শুয়ে না পড়ে বিছানা থেকে নেমে শ্লথ পায়ে এগিয়ে গিয়ে আলমারি খোলে। এবং সম্ভবত টাকা বের করে। তারপর আলমারি বন্ধ করে ঘরের মাঝখানে দাঁড়ায়। বলে, বাইরে এতো বৃষ্টি, তবু কি রকম গরম দেখেছো।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মেরি রায়হানের দিকে তাকিয়ে দেখে। বলে, কী থেকে কী হয়ে গেলো, তাই না ? আসলে তোমার ওপর আমার খুব রাগ হয়েছিলো সেদিন। মেরি এগিয়ে গিয়ে হাত ধরে রায়হানের। তারপর বলে, যা হবার হয়ে গেছে, ও নিয়ে আর ভেবে লাভ আছে ? চলো কিছু খাবে।

রান্নাঘরেও ছোট একটা টেবিল পাতা। কেকের টুকরো আঙ্গুর আর একটা কোকের বোতল– এইসব বের করে। এগিয়ে দেয়। তারপর মুখে বলে ভাতটাত দিলাম না, ওসব গরম করতে মেলা ঝামেলা।

রায়হানের মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছে না তখনও। তার মনে হচ্ছে, যতো তাড়াতাড়ি পারা যায়, তার এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়া উচিত। এখানে থাকা মানেই পিচ্ছিল থিকথিকে কাদাভর্তি একটা গর্তের মধ্যে ক্রমাগত ডুবে যাওয়া। এখানে বেশিক্ষণ থাকলে হয়তো তাকে আর খুঁজেই পাওয়া যাবে না। এমন সব কথা তার মনে হয় বটে কিন্তু তবু সে দরজা খুলে বেরিয়ে যেতে পারে না। বরং উল্টো মেরির প্লেটে সাজিয়ে দেওয়া কেক আর আঙ্গুর হাত দিয়ে তুলে মুখে দেয়– এমনকি দিব্যি কোকের গ্লাসটা হাত দিয়ে তুলে নিয়ে তাতে চুমুকও দেয়।

পানাহার শেষ হলে মেরি ৫০০ টাকার নোটগুলো গুনে গুনে হিসেব করে রায়হানের হাতে দেয়। এবং রায়হান একটা একটা করে নোট গুনে গুনে বুঝে নেয়। তার মনে হয়, তাকে বাসায় আনবার জন্যই কি মেরি মুনশির হাতে টাকা দিতে চায় নি ? কথাটা তার মনে হয় কিন্তু কিছু বলে না। বললে ক্ষতি ছিলো না, হয়তো একটু হাসাহাসি হতো। কিন্তু রায়হান কিছুই না বলে, খুব ভদ্রলোকের মতো মেরির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রিকশা চেপে অফিসে ফিরে আসে। রাস্তায় কিছু হয় না, মনে কোনো চিন্তাও জাগে না। শুধু অফিসে ঢোকার সময় আব্দুল্লাহর মুখোমুখি হলে সে থমকে দাঁড়ায় এবং ভীষণ অপ্রস্তুত হয়ে বলে, না, কিছু হয় নি তো ? আমার আবার কী হবে ? যখন জিজ্ঞেস করে, রায়হান ভাই, কী হয়েছে আপনার ? তখন সে

আব্দুল্লাহ দু'মুহূর্ত বিচিত্র চোখে তাকিয়ে দেখে তার মুখের দিকে। তারপরই সে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে চলে যায়। ও চলে গেলে রায়হান চারদিকে তাকিয়ে দেখে, অন্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

লোকেরাও কি তাকে আব্দুল্লাহর মতো জিজ্ঞেস করবে যে তার কী হয়েছে ? আসলে সত্যিই কি তার চেহারায় অন্যরকম কিছু দেখা যাচ্ছে ? সে মনে মনে একখানা আয়না খোঁজে। তার খেয়াল হয়, এডিটর সাহেবের বাথরুমে আয়না আছে। সেখানে গেলে হয়। কথাটা খেয়াল হয় বটে, কিন্তু সে তক্ষুণি যেতে পারে না।

মুনশি অপেক্ষা করে ছিলো, টাকা নিয়ে সে চলে গেলে রায়হান নিজের চেয়ারে বসে থাকে। এ সময় বেয়ারা কালাম মিয়া এসে সামনে দাঁড়ায়। প্রথমে মুখোমুখি তাকিয়ে কী যেন দেখে, তারপর গলা নামিয়ে বলে, স্যারের শরীরডা কি ভালা না, চা আইন্যা দিমু ?

সে হাতের ইশারায় কালামকে চলে যেতে বলে। সে বুঝে উঠতে পারে না কাণ্ডটা কেন ঘটলো ? তার ভেতরেই কি আসলে লোভ ছিলো ? সে কি তাহলে ভেতরে ভেতরে লম্পট হয়ে উঠেছে ? নাকি অমন মেয়ে মানুষের পাল্লায় পড়ার জন্যই ঘটনাটা ঘটেছে। মেরি কি সেডাকট্রেস মেয়েছেলে ? বরাবরই লুজ ? কিন্তু তাইবা কেমন করে হয়! যে গল্পটা সে বললো সেটা যদি সত্যিও হয়, তাহলেইবা তার মতো একজন মানুষকে সে কেন পছন্দ করবে ? কোনো কাজে কি মেরি তাকে লাগাতে পারবে ? নাকি সে নিমফোম্যানিয়াক, বরাবরই এমন কাজ করে– মানুষ পছন্দ হলেই হলো।

সে যতোবার ভাবে, ততোবার ধাঁধায় পড়ে। সে কাজটা কেমন করে করতে পারলো ? ঘটনাটা ঘটবার আগেই কি সে ওখান থেকে চলে আসতে পারতো না ? অবশ্যই পারতো। আসলে সে-ই ভেতরে ভেতরে লম্পট। সে নিজেই মনে মনে চাইছিলো যে এমন কিছু একটা ঘটুক। দু'জনে একসঙ্গে যেদিন সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় মেরি পড়ে যাওয়ার মতো ঘটনাটা ঘটায়, সেদিন থেকেই সে মেরির দিকে মনে মনে এগিয়ে গিয়েছে। একসঙ্গে যেদিন ফুলবাড়িয়ায় গেলো, সেদিন বাইরে সে যতোই আলগা ভাব দেখাক, আসলে সে মনে মনে ঘনিষ্ঠ হতেই চেয়েছিলো। না হলে তার মতো একজন বয়স্ক মানুষ, একটা মেয়েছেলে জড়িয়ে ধরলো বলেই তার কাছে ধরা দিতে পারলো ? শুধু ধরাই দিলো না, রীতিমতো সাড়া দিলো এবং উপভোগ করলো ?

সে কেমন করে এখন বীথির সামনে দাঁড়াবে ? যদি বীথিও আব্দুল্লাহর মতোই তার চেহারায় অস্বাভাবিক কিছু দেখতে পায়, আর জিজ্ঞেস করে, তোমার কী হয়েছে ? তাহলে সে কী বলবে ? ছেলেদের মুখোমুখিইবা কেমন করে হবে ? ভবিষ্যতে সততার কথাইবা সে বলবে কীভাবে ?

নাকি সবই সে পারবে ? তার বুকের ভেতর থেকে কেউ যেন বলে ওঠে, সবই পারবে সে। সব মানুষই পারছে, সে কেন পারবে না ? পাপের মধ্যে ডুববার ইচ্ছে সব মানুষেরই নাকি গোপনে গোপনে থাকে– তারও আছে। আর ইচ্ছে থাকার জন্যই ঘটনাটা ঘটেছে। কেন সে স্বাভাবিক থাকতে পারবে না ? একশ' বার পারবে।

তাই যদি হবে, তাহলে কেন সে অন্যায় সুযোগ-সুবিধা নেয় নি ? ক্ষমতাসীনদের তালালি করা, গোপন খবর ফাঁস করে দেবো বলে সেক্টর কর্পোরেশনের কর্তাদের ব্ল্যাকমেইল করা বা সহকর্মীদের কনুইয়ের গুঁতো দিয়ে পেছনে ফেলে সামনে এগিয়ে যাওয়া, কিংবা রাজনীতির বাতাস বুঝে আখের গুছিয়ে নেওয়া। এসব সে কেন করে নি ? এসব না করার পরিণতি কি এই ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

তার অনুমান, নিশ্চয়ই তার চেহারা এখন অন্যরকম হয়ে গেছে– এ নিশ্চয়ই তার পাপের ছাপ– মুখের চামড়ায় এমন শক্ত হয়ে লেগে গেছে যে কোনোদিনই মুছবে না। আব্দুল্লাহ বা বেয়ারা কালাম যা দেখেছে এখন সবাই তা দেখতে পাবে।

সে এডিটরের রুমে চলে যায় তখন তখনই। বেয়ারা তখন ঝাড় পোঁছে ব্যস্ত ছিলো। সে নিশ্চিন্তে গিয়ে ঢুকে পড়লো বাথরুমে এবং গিয়ে সোজা দাঁড়ালো আয়নার সামনে। হ্যাঁ, এই তো রায়হান আলী, মাথার চুল অর্ধেক পেকেছে, গোঁফও, থুতনির নিচে গলার চামড়া ঝুলঝুল করছে, দু'চোখের কোণে কালি, চোয়াল কি একটু বসেছে ? হনুর হাড় কি বেশি উঁচু দেখা যাচ্ছে ? আগে কেমন দেখতে লাগতো, সে মনে মনে স্মরণ করার চেষ্টা করে। কিন্তু কিছুতেই মনে পড়ে না নিজের চেহারাটা কেমন দেখেছে। অথচ রোজ অন্তত একবার তো সে আয়নার সামনে অবশ্যই দাঁড়ায়।

ওদিকে বিকেল গড়িয়ে যায়। সন্ধ্যার দিকে আব্দুল্লাহ অফিসে এসে দেখে রায়হান তখনও একইভাবে বসে আছে। সে ধীর পায়ে কাছে এসে বলে, কী ব্যাপার, বলুন তো ? আপনার কী হয়েছে ?

নাহ্ কী হবে আমার! রায়হান হাসে। বলে, না কিছু হয় নি আমার।

তাহলে এভাবে বসে রয়েছেন কেন ? বাসায় যাবেন না ?

হ্যাঁ, যাবো। রায়হান লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ায়। বলে, মানুষের মন কি আর সব সময় এক রকম থাকে ভাই ?

কিন্তু তাই বলে এমন চেহারা হবে ? আব্দুল্লাহ মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, আচ্ছা সকাল বেলা আমানউল্লাহ সাহেব কি কিছু বলেছেন আপনাকে ?

কী বলবেন ? রায়হান একটু যেন কৌতূহলী হয়।

না, মানে, কাগজের পলিসির ব্যাপারে একটা কথা সবাইকে বলে বেড়াচ্ছেন তো–

রায়হান মাথা নাড়ায়। বলে, না ওসব কিছু নয়, আমার কিছু ব্যক্তিগত সমস্যা দেখা দিয়েছে, তাই চিন্তা টিন্তা হচ্ছে– এই আর কি !

আজ কিন্তু বিএফইউজে বসছে সন্ধ্যাবেলা। মনে হয় স্ট্রাইকের সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

রায়হান হাসতে চেষ্টা করে। বলে, ভালো, একটা কিছু এসপার ওসপার হয়ে যাওয়া উচিত।

তারপর সে বেরিয়ে পড়ে। মনের ভেতরে তখনও কে একজন অবিরাম বলে চলেছে, ছি, রায়হান ছি! তুই এতো লোভী। বীথি কি কারো চাইতে কম ? সে কি তোকে কম ভালোবাসে, সে কি কখনও অবিশ্বাসের কাজ করেছে ? তুই আপাদমস্তক একটা বিশ্বাসঘাতক, জঘন্য রকমের লম্পট। একটা মেয়েছেলে কি একটু ইশারা করলো আর এমনি তুই ঝাঁপিয়ে পড়লি, ছি!

মনের ভেতরকার ধিক্কার শুনতে শুনতে সে পথ চলে। রিকশা নেয় না, হাঁটে। আর ঐ সময় নেমে যায় তুমুল বৃষ্টি। রায়হান তখনও রিকশায় কিংবা বেবিট্যাক্সি চাপে না, এমনকি কোনো বারান্দায় বা ছাউনির নিচে দাঁড়ায় পর্যন্ত না। বৃষ্টির মধ্যেই হাঁটতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

হাঁটতে মতিঝিল থেকে হাটখোলা হয়ে উয়ারির দিকে একটানা হাঁটে। গায়ে জোরে বৃষ্টির ঝাপটা এসে লাগলে নিজেকে বলে, নামুক আমার ওপর আরও বৃষ্টি। এই বৃষ্টিতে ধুয়ে যাক আমার পাপ– এতো বৃষ্টিতে স্নান করেও কি আমি শুদ্ধ হতে পারবো না!

বীথি ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে ছিলো দুপুর থেকে। দূর থেকে বৃষ্টিতে রাস্তাঘাট মানুষজন ঝাপসা দেখালেও সে চিনতে পারে। তার অবাক লাগে, মানুষটা ওভাবে ভিজতে ভিজতে আসছে কেন? কাছাকাছি এলে মানুষটাকে খুবই ক্লান্ত দেখায়। সে ছুটে গিয়ে দরজা খোলে তারপর ফের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এসে তোয়ালে লুঙ্গি গেঞ্জি এগিয়ে ধরে। বলে, কী হয়েছে তোমার, এভাবে ভিজেছো কেন? কোথায় ছিলে সারাদিন? রায়হান জবাবে হাসে। তখন তাকে দেখতে বিশ্রী লাগে বীথির। বলে, যাক আর ঢঙের হাসি হাসতে হবে না।

রায়হান ফের হাসে। বলে, বহুদিন পর ভিজতে ইচ্ছে করলো, তুমি ছেলেবেলায় বৃষ্টিতে ভিজতে না?

বীথির রীতিমতো রাগ হয়। বলে, থাক বুড়ো বয়সে আর আদিখ্যেতা দেখাতে হবে না। গা-মাথা মোছো।

বলতে বলতে তোয়ালেটা স্বামীর মাথার ওপর ফেলে চুলে ঘষতে থাকে বীথি। বলে, বুড়ো হয়ে গেলে তবু ছেলেমানুষি গেলো না তোমার। এখন যদি অসুখ করে? ডাক্তার তোমাকে সেদিন বারবার করে বলে দিলো– অনিয়ম করবেন না। ঠিক সময় খাওয়া দাওয়া করবেন, ওষুধ খাবেন, তুমি কিছুই মানবে না?

রায়হান শোনে আর ভেতরে ভেতরে হিম ঠাণ্ডা হয়ে যায়। সত্যি সত্যি শীত লাগতে শুরু করে তার। বার দুই সে কেঁপেও ওঠে।

বীথি কাপড় বদলে নিতে বলে এবং লক্ষ্য করে মানুষটা রীতিমত কাঁপছে। তখন বলে, হলো তো, যা ভয় করেছিলাম, তাই হলো– এখন নিউমোনিয়া ব্রঙ্কাইটিস না হয়ে যায়। বলতে বলতে সে স্বামীকে বিছানায় শোয়ায়। তারপর আলমারিতে তুলে রাখা কাঁথা বের করে বিছিয়ে দেয় মানুষটার গায়ের ওপর।

ভাগ্য ভালো বলতে হবে, জ্বরটর আসে নি, রাতে খাওয়া দাওয়াও করেছে, কিন্তু ভেতরে ভেতরে কেমন যেন গুটিয়ে রইলো মানুষটা। বীথি যতোবার শুধায়, এই কী হয়েছে তোমার? অফিসে কোনোরকম গোলমাল হয়েছে, কারুর সঙ্গে ঝগড়া করেছো?

কোনো প্রশ্নেরই জবাব দেয় না রায়হান। খালি হাসার চেষ্টা করে। হ্যাঁ চেষ্টা করে– হাসে না, ঠোঁট দু'খানি দু'দিকে লম্বা করে শুধু। যখন বাসায় ঢুকলো, কাপড় জামা ভেজা অবস্থায়, তখন জিজ্ঞেস করেছে, রাতে করলো, সকালে চায়ের টেবিলেও জানতে চাইলো। কিন্তু ঐ এক ভঙ্গি– অন্যকথা বলে– কিন্তু ঐ কথা বলে না। স্নানটান সেরে, খাবার টেবিলে বসলো, তখনও তার ঐ একই ভঙ্গি। বীথি ভেবে পায় না, কী এমন ঘটলো একদিনে যে, মানুষটা চুপচাপ এমন নিজেকে ভেতরের দিকে গুটিয়ে নেবে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বাসা থেকে বেরুবার সময় যতোদূর পর্যন্ত দেখা যায় মানুষটাকে সে ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলো। ঐ মানুষের হাত ধরে সে বেরিয়ে এসেছিলো বাইরের অনিশ্চিত দুনিয়ায়। ওরই জন্যে এতোকাল মাথা উঁচু করে রয়েছে– টাকা পয়সা বাড়ি ঘর আরাম আয়েস শখ আহ্লাদ কিছুই হয় নি, কিন্তু তবু কখনোই তার নিজেকে ছোট মনে হয় না, কখনোই মাথা নিচু করার দরকার বোধ করে না। স্বামী আর সন্তান তার ভেতরটা এতোটুকু ফাঁকা রাখে নি– সব সময় তার নিজেকে পরিপূর্ণ মনে হয়।

স্বামী চলে গেলে সে ঘরের পর্দা আর সেলাই মেশিন নিয়ে বসে। কারণ পর্দাগুলোর সেলাই খুলে অবস্থা খুবই খারাপ, এখন তার একেবারেই একাকী অবসর। অন্যান্য দিন খবরের কাগজ পড়ে, নয়তো গল্পের বই। আজ সেলাই নিয়ে বসতে হলো। সেলাই মেশিনে হাত দিলেই তার পুরনো কথা মনে পড়ে– কবে যেন কেনা হয়েছিলো ? বেশ স্পষ্ট মনে আছে। রঞ্জু হয়েছে সবে, ওর ন্যাপকিন সেলাই নিয়ে মহা ঝামেলা আর ছেলেটা হিসুনিও ছিলো খুব বেশি। পুরনো কথা স্মরণ হলে বীথির আজকাল খুব ভালো লাগে। হ্যাঁ, মনে পড়ছে, আব্বা এসেছিলেন, মেয়ে আর নাতিকে নিয়ে যাবেন। জামাইকে তখনও আদর করতে লজ্জা পান। রঞ্জুর জন্যে কাঁথা সেলাই করা হয় নি, ন্যাপকিন সেলাই যে করিয়ে আনবে তাও হয় নি। শাজাহানপুরের আমতলায় যে দর্জি বসে, তাকে ব্যাপারটা বোঝানোই গেলো না। গাড়িতে ওঠার সময় শুধু বলেছিলো, একটা সেলাই মেশিন খুব দরকার, বুঝেছো ?

ঢাকা থেকে ঢাকা– এপাড়া ওপাড়া– আজিমপুর থেকে শাজাহানপুর। কিন্তু তবু যোগাযোগ আর হয় না। বীথির তখনও বাপের ওপর খুব রাগ। বলে, খবরদার তুমি ও বাড়িতে যাবে না– বড় ভাই মাফ চাইবে, তারপর যাবে। তো খুব কষ্ট তখন রায়হানের। ছেলে-বউকে দেখতে পায় না। এমন সময় একটা অনুবাদের কাজ হাতে পায়। তার বিল থেকে দুশ টাকা আর পঞ্চাশ টাকা ধার করে। সেই আড়াই শ' টাকা দিয়ে এই মেশিন কিনে শ্বশুরবাড়িতে বউয়ের কাছে পাঠিয়েছিলেন জামাই বাবু। কেন? না এই নতুন মেশিনে বাচ্চার ন্যাপকিন সেলাই হবে। পরম মমতায় বীথি মেশিনটার গায়ে হাত বোলায়।

ঘরদোর জানালা ঘষা মাজার কাজ যে করে না তা নয়। কিন্তু ওসব কাজ করতে তার ভালো লাগে না। অমন কাজে নিজেকে চাকর চাকর মনে হয়। কারণ ঐ কাজ করার সময় সর্বক্ষণ কেউ যেন তাকে খুঁচিয়ে বলে, এই মেঝেটা তো তোর নয়, আর এই জানালাটা মুছে কি হবে ? এটার মালিক তো অন্যলোক– দরজার পাল্লাতেই বা কেন রঙ লাগাবি, দরজাটার মালিক কি তুই ?

পর্দা সেলাই করতে যখন ব্যস্ত, তখনই হঠাৎ দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ তার কানে আসে। দেয়াল ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে. মোটে ১২টা। তার একটু খটকা লাগে, এখন তো কারো আসার কথা নয়। ছেলেদের মধ্যে কেউ নয়। হলে, মা, ওমা, বলে চিৎকার করে বাড়ি মাথায় তুলতো। তাহলে ? রায়হান কি ফিরে এলো ? সে সিঁড়িতে দু'ধাপ নেমে জিজ্ঞেস করে, কে ?

তো উত্তর পায় মেয়েলি গলায়। এক মহিলা বলেন, আপনি দরজা খুললে তো চিনবেন, আমি ভাই ডাকাত টাকাত নই। কথাটা বলে মহিলা খুব হাসে, হাসির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

আওয়াজ স্পষ্ট শোনা যায়। বীথি অবাক হয়। এমন ভাষায় কথা বলার মতো মহিলা তো তার চেনাজানার মধ্যে কেউ নেই। হাসির জন্য নয়, মহিলার পুরুষালি গলাও তাকে বেশ ধাঁধায় ফেলে দেয়। সে ফের জিজ্ঞেস করে, আপনি কোত্থেকে এসেছেন? কাকে চাই?

আহা দরজাটা খুলুনই না আপা, তারপর না কথা হবে। দরজা খুললে শ্যামলা রঙের ভারী গড়নের মহিলাটিকে দেখে তার রীতিমতো অবাক লাগে। মহিলা খুব অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে হাসছেন– যেন কতকালের চেনা। বলেন, চিনতে পারছেন না তো? ইস্ কী কষ্টে যে বাড়ির ঠিকানা যোগাড় করেছি, যদি জানতেন! আপনার কর্তাটি তো একেবারে বোম ভোলা মানুষ। কোনো দিকে হুঁশ জ্ঞান নেই। এক সঙ্গে জমি কিনছি, পাশাপাশি বাড়ি করে সুখে জীবন বসবাস করবো। সেই জন্যে দুই পরিবারের মধ্যে যে জানাশোনা হওয়া দরকার, সে জ্ঞান তাঁর নেই– এদিকে আমার কর্তাটি সারাক্ষণ বিছানায় শুয়ে থাকেন, অথর্ব মানুষ। সুতরাং আমাকেই আসতে হলো।

বীথি এতোক্ষণে চিনতে পারে। বলে, ও আপনি মিসেস সাদেক, তাই বলুন–

ঐ মিসেস টিসেস বলবেন না, আমার নাম মেরি, মনে করুন আমি আপনার ছোট বোন। মেরির অমন কথা শোনার পর বীথিও আর দূরত্ব রাখতে পারে না। সে অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে হাত ধরে এসে ঘরের ভেতরে বসায়। তারপর শুরু হয়ে যায় মেরির গল্প– বিষয় টিষয় কিছু নেই। একের পর এক গল্প বলে যায় মেরি– ফরিদপুর থেকে তার ঢাকায় আসার গল্প, বাড়ি ভাঙা নিয়ে সংসার পাতার গল্প। স্বামীটা যে কোনো কাজের নয়, সেই গল্প। দুই ছেলের ক্যাডেট কলেজে ভর্তি হওয়ার গল্প। মেয়ের ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার গল্প– গল্পের আর শেষ নেই। দেখতে দেখতে দুটো বেজে যায়। মাঝখানে যখন চা বানাতে যায় বীথি, তখন মেরি রান্নাঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়ায়, আর কী যেন দেখে। রান্নাঘরের আসবাবপত্র, নাকি বাসন কোশন, নাকি কলের বেসিন, নাকি বীথিকেই– আন্দাজ করা যায় না।

অবেলায় চা দেয়া হচ্ছে বলে বীথির সঙ্কোচের সীমা থাকে না, কিন্তু অন্য উপায়ই বা কী? রান্না যা হয়েছে, তা দিয়ে এমন নতুন অতিথিকে অন্তত আপ্যায়ন করা যায় না।

অবশেষে মেরি ওঠে। বীথির হাত ধরে বলে, পরশুদিন জমি রেজিস্ট্রি হচ্ছে। চলুন সাভারে যাই– রেজিস্ট্রির কাজ হবে, ওদিকে আমরা ঘুরেফিরে দেখেশুনে আসবো– আপনি তো দেখেননি, ফেরার সময় ফুলবাড়িয়ায় নেমে জমিটা দেখে আসবেন।

বীথি হ্যাঁ না কিছু বলতে পারে না। জমিজমার সে বোঝেই বা কী, আর জানেই বা কী– তাছাড়া বর্ষার দিনে অমন বাইরে পানি কাদার মধ্যে ঘুরে বেড়ানোর মধ্যে মজাটাই বা কোথায়, তা-ও সে বুঝতে পারে না।

মেরির পীড়াপীড়িতে শেষে বলে, দেখি ছেলেদের বলে, ওরা কী বলে, ছেলেরা কেউ সঙ্গে না থাকলে আমি কোথাও যেতে পারি না।

ঘাড়ে হাত রেখে কথা বলা, মুঠো ভরে দু'হাত ধরে রাখা, তারপর আপা আপনি এতো সুন্দর। আমি কল্পনাও করি নি– রায়হান ভাই খুব ভাগ্যবান– আপনাকে আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

আমার বাসায় নিয়ে যাবো– আমার মেয়েরা আপনাকে পেলে আর ছাড়তে চাইবে না– আমাদের কিন্তু একদিন সেতার বাজিয়ে শোনাতে হবে– একের পর এক এই রকম কথা বলা শেষ করে বেলা বিকেলে গড়ালে মেরি বিদায় নেয়।

বীথির বুক থেকে স্বস্তির নিঃশ্বাস বের হয়– যাক শেষ পর্যন্ত তাহলে গেলেন মহিলা।

দশ

রঞ্জুদের কলেজের অবস্থা এখনও স্বাভাবিক নয়। আটক ছাত্রদের তো ছাড়েই নি– উপরন্তু শোনা যাচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হবে। আটক ছাত্রদের মুক্তির দাবিতে মৌন মিছিল বেরুলো একদিন। সামনের সারিতে ছিলেন প্রফেসররা। ওদিকে রাস্তায় নীল পুলিশ ছিলো, খাকি পুলিশ ছিলো, রায়ট কার ছিলো। কিন্তু তবু কেমন যেন জমলো না। ঘোষণাতেই বলা হয়েছিলো মৌন মিছিল হবে– তবু অনেকেরই অনুমান ছিলো নামে মৌন হলে কী হবে, ও মিছিল শেষ পর্যন্ত মৌন থাকবে না। মনির তো জোর দিয়ে বলেছিলো, আমরা কিছু না করলে কী হবে, মুশফেক ভাই-এর যা মত জানা গেলো, তাতে জাসদ ছাত্রলীগ কনফ্রন্টেশনের দিকে যেতে যায়। ছাত্রদলেরও টান ঐ দিকেই ছিলো। রাস্তায় পুলিশের আয়োজন দেখে বোঝা গেলো, সরকারেরও সম্ভবত অনুমান ছিলো যে, মিছিল শেষ পর্যন্ত মৌন থাকবে না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মিছিলটা মৌনই থেকে গেলো।

রঞ্জু মিছিল শেষ হওয়ার পরপরই সবার চোখের আড়ালে কেটে পড়ে। তবে কলেজে যায় না, হোস্টেলেও না। তার মন বোধহয় একাকী হতে চাইছিলো। তাই সে শহীদ মিনারের বাঁধানো ঘাসে ঢাকা বেদীর ওপর গিয়ে পা ঝুলিয়ে বসে প্রথমে, তারপর মাথার ওপরকার হাওয়ায় দোলানো ডালপালা দেখতে দেখতে ঐ গাছতলাতেই লম্বা হয়ে শোয়। বেশ ক্লান্তি লাগে তার। গত দু'দিন ধরে ছোটাছুটির ফল আজকের এই ডাক্তারদের মৌন মিছিল। জাসদ ছাত্রলীগের ছেলেদের ইচ্ছে ছিলো জোরালো, কিছু একটা হোক। ছাত্রদলেরও ইচ্ছে ছিলো ঐরকমই– কিছু একটা হোক। কিন্তু প্রফেসর হামিদের বরাবর এক কথা– পলিটিক্যাল প্রোগ্রামের মতো আমাদের প্রোগ্রাম কখনোই হবে না– যদি কিছু করো, তাহলে আমরা সিনিয়াররা কিন্তু মিছিল থেকে বেরিয়ে যাবো। রঞ্জু মনির আর আতিককে সঙ্গে নিয়ে ছাত্রদল আর ছাত্রলীগের জোরালো প্রোগ্রামটা ঠেকিয়ে দিয়েছে। তাদের কথা মতোই আয়োজন হলো এবং মিছিলটাও ভালোমতো হয়ে গেলো। কিন্তু তার ফল কী ? না, মানুষজন ফিরেও তাকালো না। একসময় দেখা গেলো কাগজের ফটোগ্রাফার দু'একজন মিছিলের ফটো তুলছে– তারপরই তারা হাওয়া। মিছিল শেষে বক্তৃতা হলো, তখন কোনো সাংবাদিকের টিকিটি পর্যন্ত দেখা গেলো না।

তার মানে গোটা ব্যাপারটা তামাশার মতো দাঁড়িয়ে গেলো। শেষের দিকে দেখা গেলো সবারই মধ্যে কেমন একটা ঝিমানো ভাব। শুধু বিএমএ'র দুই নেতা সফিক ভাই আর তপন ভাই তখনও অটল। ডাইনে বাঁয়ে তাকাতে তাকাতে বললো, হ্যাঁ ঠিক আছে– এটাই ঠিক হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

রঞ্জুর গায়ে ঝির ঝিরে হাওয়া এসে লাগছিলো, ওপরে নীল আকাশের পর্দায় মেঘ এবং পাতাসুদ্ধ গাছের ডালের হেলা-দোলাও দেখতে পাচ্ছিলো। অন্যমনস্ক অবস্থায় কখন তার হাত ঘাসের ডগা ছিঁড়ে মুখে দিয়েছে এবং সেটা তার দু'পাটি দাঁত আর দুই চোয়াল চিবোতে শুরু করে দিয়েছে তার খেয়াল নেই। হঠাৎ তার সম্বিৎ ফেরে মেয়েলি গলার প্রশ্ন শুনে। কি ব্যাপার, এখানে শুয়ে কেন ? ছাগলের মতো ঘাস চিবোলে কি আন্দোলন হবে ?

রঞ্জু শুয়ে শুয়েই তার ক্লাসের নীলা আর শাহনির দিকে মাথা কাত করে তাকায়। আরে কি আশ্চর্য, আপনারা এদিকে কোথায় ?

আপনাকে খুঁজতে।

আমাকে ? রঞ্জু রীতিমতো অবাক হয়। বলে, আমাকে খুঁজতে কেন ? কে বললো যে আমি এখানে ?

কেন, ঐ যে হাসপাতালের গেটের কাছে যাদের দাঁড় করিয়ে রেখেছেন।

রঞ্জু এবার উঠে বসে। দেখে সত্যি সত্যি হাসপাতালের গেটের কাছে একটি ছেলে আর দু'টি মেয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করছে। তিনজনের কাউকেই তার চেনা মনে হলো না। ওরা কি ফার্স্ট ইয়ারের ?

রঞ্জুর প্রশ্ন শুনে শাহনি হাসে। বলে, এমন না হলে পলিটিশিয়ান ? নিজের সাপোর্টারদেরই চিনতে পারে না।

কে পলিটিশিয়ান ? রঞ্জু প্রশ্ন না করে পারে না।

বাহ্ ! পলিটিশিয়ান না ? না হলে এই মিছিলটা অর্গানাইজ করলো কে ?

শাহনির কথার জবাব দিতে ইচ্ছে করে না রঞ্জুর। এক কথা সে কতোবার বলবে ? তবু বলে, দেখুন, আমি কোনো পার্টি করি না– আমাদের প্রফেশনের দাবি নিয়ে আন্দোলন, তাতে যদি আমরা না থাকি, তাহলে কে থাকবে ?

হয়েছে, আমরা জানি কে কোন কাজ করে। শাহনি হাত তুলে রঞ্জুকে বাধা দিয়ে বলে, নীলা একটা খবর নিয়ে এসেছে, দয়া করে এখন সেটা শোনো।

রঞ্জু আগ্রহী হয়। কারণ নীলার বড় ভাই ডাক্তার আমজাদ হায়দার আটক-ডাক্তারদের একজন। সে বলে, কী খবর বলুন, নীলা নীচু গলায় বলে, ভাইয়া খবর পাঠিয়েছে, ছাত্রসমাজের নেতাদের সঙ্গে কথা বললেই নাকি সবাই ছাড়া পেয়ে যাবে– বাবলু বলে কে একজন নাকি লিডার আছে–

সবাই ছাড়া পেয়ে যাবে মানে ? রঞ্জু ঠিক বুঝতে পারে না। বলে, তার মানে কি সরকার ডাক্তারদের ৬ দফা দাবি মেনে নেবে ? সব খালি পোস্টে এপয়েন্টমেন্ট দেবে ? পোস্টের সংখ্যা বাড়াবে ?

নীলা একটু যেন ঘাবড়ায় রঞ্জুর কথা শুনে। আমতা আমতা করে বলে, তা আমি জানি না– ভাইয়া শুধু বললো ছাড়া পাওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে– অন্য ব্যাপারে কোনো কথা হয় নি– আপনাদের কাউকে জেল গেটে গিয়ে দেখা করতে বলেছে।

রঞ্জুর চিন্তিত মুখ দেখে শাহনি হেসে ওঠে। বলে, কী হলো ? পলিটিশিয়ানের গলা যে শুকিয়ে গেলো। নিশ্চয়ই এখন পানি খেতে হবে তোমার– না কি ভাবছো, ভিক্ষার দরকার নেই, এখন কুকুরটা কেউ সামলাক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ঠিক বুঝলাম না, রঞ্জু জানায়।

না বোঝার মতো কিছু কি বললাম ? শাহনির ঠোঁটে বাঁকা হাসি দেখা যায়। বলে, আসল দাবি শিকেয় উঠেছে– বিদ্রোহী-বিপ্লবীদের এখন জেল থেকে ছাড়িয়ে আনার দাবিটাকেই বড় করে তুলতে হবে।

রঞ্জু সোজাসুজি জবাব দেয় না। শুধু বলে, তোমার তাই মনে হচ্ছে ?

তার মুখ দিয়ে প্রায় বেরিয়ে এসেছিলো যে, সরকারী দলের এমপি'র চোখ দিয়ে দেখলে অমনই দেখা যায় বটে, কিন্তু আসলে ব্যাপারটা অমন নয়। সে বেদীর ওপর থেকে নেমে দাঁড়ায়। তারপর বলে, তুমি বরং দয়া করে একটু উপকার করো, তোমার এমপি মামাকে গিয়ে বলো, তিনি যেন আটক মেডিক্যাল ছাত্রদের ছাড়িয়ে আনার ব্যবস্থা করেন।

শাহনির বোধহয় রাগ হয় রঞ্জুর খোঁচা মারা কথা শুনে। বলে, আমি কেন বলতে যাবো ও কথা ? আমার কি দায় পড়েছে ? নেতাগিরি করে তোমরা ঝামেলা পাকাবে আর সেই ঝামেলা পোহাতে যাবে অন্য কেউ ?

বলতে বলতে শাহনি বেশ উত্তেজিত হয়ে ওঠে। তাতে রঞ্জুর একটু মজাও লাগে। সে ফের হাসি ফোটায় মুখে। বলে, আপনি কিন্তু বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন।

হ্যাঁ, তোমাকে বলেছে, গলায় শ্লেষ ঝরায় শাহনি। বলে, আমার উত্তেজনা অতো সস্তা নয় যে, তোমার কথায় আমি উত্তেজিত হবো।

দূর থেকে যারা দেখছিলো তাদের কাছে বোধহয় ব্যাপারটা গুরুতর কিছু বলে মনে হয়। বিশেষতঃ ছেলে আর মেয়েতে যদি তর্কাতর্কি বেধে যায়, তাহলে আশপাশের লোক সেদিকে নজর না দিয়ে পারে ? উপরন্তু দু'জনেই যখন সিনিয়র ষ্টুডেন্ট। হাসপাতালের গেটের কাছে দাঁড়িয়ে যারা গল্প করছিলো তারা তো এগিয়ে এলোই– সঙ্গে সঙ্গে আরও ২/৩ জন ছাত্রছাত্রী জুটে গেলো।

নীলা নিরস্ত করার চেষ্টা করে। বলে, আহা থাক না, এই শাহনি, তুই চটছিস কেন ?

আরে রাখ তো, শাহনি তীব্র গলায় বলতে থাকে, আমার মামাকে নিয়ে খোঁচা দেবে, আর আমি কিছু বলবো না। এ্যাঁ ? মজা পেয়েছে, মুখে যা আসবে তাই বলবে!

আরে কী হয়েছে, ও শাহনি আপা। দু'টি মেয়ে কাছে এগিয়ে গেলো, শাহনি নীলাকে সঙ্গে না নিয়েই রাগে গন গন করতে করতে সবাইকে পাশ কাটিয়ে কলেজের দিকে চলে যায়।

শাহনি চলে গেলে নীলা বলে, আমার জন্যেই এমন কাণ্ড ঘটলো, কিছু মনে করবেন না প্লীজ। রঞ্জুর নজর তখনও শাহনির দিকে। সে তখন হাসপাতালের গেট ছাড়িয়ে কলেজের গেটের দিকে হাঁটছে। নীলার কথা তার কানে যায় না। মনে হয়: মেয়েটা খামোকা তার সঙ্গে লাগতে এসেছিলো। আগেও একদিন ম্যাগাজিন কমিটির মিটিংয়ে তার সঙ্গে লেগেছিলো। সেদিন দাবি তুলেছিলো, কমিটির মেম্বারদের প্রত্যেকের আলাদা আলাদা ছবি আর বক্তব্য থাকতে হবে ম্যাগাজিনে। রঞ্জু সহ-সম্পাদক হিসেবে আপত্তি জানিয়ে বলেছিলো, অমনভাবে ম্যাগাজিন ছাপানো হলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

সেটা রুচির দিক থেকে খারাপ দেখাবে আর তাতে লোকে বিরূপ সমালোচনাও করতে পারে। ব্যাস, ঐ কথাতেই লেগে গেলো দু'জনায়। আবোল তাবোল কথা বলে সেদিনও রাগ দেখিয়ে চলে গিয়েছিলো শাহনি। সেদিনের পুরো ঘটনাটা মনে পড়ে রঞ্জুর। তবে আজ যেন শাহনি একটু বেশি বাড়াবাড়ি করলো বলে তার মনে হয়। ঘটনাটা যে একবারে আলগা আর আকস্মিক ছিলো না তার প্রমাণ পাওয়া গেলো ২/৩ দিনের মধ্যেই। শোনা গেলো, বিএমএ'র মিটিংয়ে কয়েকজন মেম্বার ছাত্রদের মুক্তির দাবিটা জোরেশোরে তুলেছে এবং মূল দাবির ব্যাপারে তাদের উৎসাহ দেখা যায় নি।

জাসদ ছাত্রলীগ আর ছাত্রদলের ছেলেদের মধ্যে খুব জোর প্রতিক্রিয়া দেখা গেলো– ওদিকে ইউনিয়ন তো মূল দাবির ওপর অটল ছিলোই। ফলে তিন দিক থেকেই প্রস্তাব উঠলো আরও বড় কর্মসূচির। ৬ দফা মূল দাবির সঙ্গে আটক ছাত্রদের মুক্তির দাবি জুড়ে দিয়ে দেশের সব মেডিক্যাল কলেজে ধর্মঘট ডাকা হলো। চারদিক থেকে তখন সাড়া আসছে– বোঝা যাচ্ছিলো, একটা কিছু এসপার-ওসপার হতে আর দেরি নেই।

রঞ্জুর আর দরকার হয় না, আন্দোলনের ব্যাপারটা যেন আপনা থেকেই চালু হয়ে গেলো। ঢাকা মেডিক্যাল-এর নেতৃত্ব কিন্তু মনে হচ্ছিলো সলিমুল্লাহর ছাত্রদের যেন উৎসাহ বেশি– পিজিতে ছাত্র কম, কিন্তু তাদেরও উৎসাহে কমতি নেই। স্ট্রাইক সেখানেও সমানে চলতে লাগলো।

এদিকে দেশের রাজনীতিতেও নতুন নতুন পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে– ৭ই মে পার্লামেন্ট নির্বাচন হয়ে গেছে। কিন্তু বিরোধীদল আওয়ামী লীগের সদস্যরা পার্লামেন্টে যায় না। রাজপথের আন্দোলনেই তারা বেশি ব্যস্ত। আর বিএনপি নির্বাচনে অংশ নেয় নি, তারা তো সর্বক্ষণ রাস্তায় রয়েছেই। মিল কারখানায় সরকারের ভাড়াটে শ্রমিকদের সঙ্গে সাধারণ শ্রমিকদের হাঙ্গামা একটার পর একটা হয়েই চলেছে। পার্লামেন্টের ৮ আসনে বাই-ইলেকশানে জাতীয় পার্টির লোকদের নির্বাচিত করানো হলো। নির্বাচনে সন্ত্রাস আর কারচুপি হয়েছে বলে শেখ হাসিনা জোর অভিযোগ তুললেও কোনো লাভ হলো না। এদিকে এরশাদ জাতীয় পার্টির সভাপতি হয়ে প্রেসিডেন্ট ইলেকশানে প্রার্থী হলেন। ৭ই মের পার্লামেন্ট নির্বাচনে আওয়ামী লীগ অংশ নিয়ে প্রধান বিরোধী দল হয়েছিলো, ৩ মাস যেতে না যেতেই তারা পার্লামেন্ট বর্জন করে নতুন নির্বাচনের দাবি তুললো। বিএনপি প্রেসিডেন্ট নির্বাচন প্রতিহত করার ডাক দিয়ে বসলো।

রঞ্জু পার্টি করে না, কিন্তু সে বুঝতে পারছিলো দেশের গোটা রাজনৈতিক পরিস্থিতিটাই উল্টে পাল্টে যেতে বসেছে। আর মেডিক্যাল কলেজের ভেতরে যে অস্থিরতা তৈরি হয়েছে সেটা বাড়বে বৈ কমবে না। শুধু মেডিক্যাল কলেজের কথাই বা ভাবছে কেন। ইউনিভার্সিটিগুলোর অবস্থা তো আরও খারাপ। টিচাররা সেই যে পালিয়ে গিয়েছেন, এখনো ফেরেন নি। কবে ক্লাস আরম্ভ করবেন কেউ জানে না। আটক মেডিক্যাল ছাত্রদের মধ্যে দু'একজনকে ছাড়া হলো বটে– কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নতুন আদেশ জারি হলো যে, এমবিবিএস কোর্সে ভর্তি বন্ধ থাকবে। কতোদিন বন্ধ থাকবে? না, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের হুকুম– ৩ মাস।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

এমন অবস্থায় আন্দোলনের কী হবে ? আন্দোলন কি চলবে ? বিএমএ'র মেম্বররা বলে, অবশ্যই চলবে– মুশফেক ভাই, হেলাল ভাই– দু'জনে দুই ছাত্রলীগের নেতা– তাঁরা জোর দিয়ে বলেন, আন্দোলন না চালিয়ে আমাদের উপায় নেই, ডাক্তারদের ভ্যাকান্ট পোস্ট মাত্রই ৫০০, ওদিকে বেকার ডাক্তারের সংখ্যা ৩ হাজার, আন্দোলন করবো না তো কী করবো ?

সুতরাং আন্দোলনে বাধা দেওয়ার মতো কেউ নেই। ইউনিভার্সিটি এলাকায় যেমন জাতীয় ছাত্রসমাজ নামে দল তৈরি হয়েছে। মেডিক্যাল কলেজে অমন দল অন্তত প্রকাশ্যে নেই। ইউনিভার্সিটি হল-এ অছাত্র ক্যাডারদের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে থাকতে দেয়া হয়– এখানে অমন সুযোগ কোথায়– ফলে এখানে ছাত্র সংগঠনের নামে চাঁদাবাজি, কন্ট্রাকটরি বাগানো, চুরি, ছিনতাই, রেপ, গ্রুপে গ্রুপে মারামারি-খুন-জখম, এসব এখনও হচ্ছে না। তবে তাই বলে মেডিক্যাল কলেজ এলাকা যে শান্ত আর নির্বিঘ্ন এমন সার্টিফিকেট কেউ দেবে না– হাসপাতালের শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়ন যারা করে, তাদের কাজও ইউনিভার্সিটি এলাকার নেতাদের মতোই। এমন অবস্থায় ছাত্রদের ধর্মঘট কতোদিন চালানো যাবে, সে ব্যাপারে কেউ নিশ্চিত নয়। মনিরকে খুঁজতে এলো সেদিন দু'টি সেকেন্ড ইয়ারের ছেলে। বললো, মনির ভাইকে সাবধানে থাকতে বলবেন–

রঞ্জু তখন বারান্দায় একাকী, রেলিংয়ে ঝুঁকে পড়ে রাস্তায় বস্তির ছেলেদের কাবাডি খেলা দেখছিলো। সে কথাটা কানে তুলছে না সন্দেহ করে ছেলেটি দ্বিতীয়বার গলা উঁচিয়ে বলে, ভাই, আমি কিন্তু একটা কথা বলেছি।

রঞ্জু মুখোমুখি তাকায় এবার। বলে, শুনলাম তো তোমার কথা। মনিরকে সাবধানে থাকতে বলবো।

ব্যাপারটা কিন্তু বেশ সিরিয়াস, ছেলেটি ফের বলে। জানায়, এই মাত্র খবর পেয়েছি, এসএম হলের ছাত্রদলের জিএসকে গুলি করা হয়েছে– মরে নি, গুলি হাতে লেগেছে– মনে হচ্ছে, এমন হামলা আরও হবে।

ছেলে দু'টি চলে গেলে রঞ্জুর চিন্তা হয়– যদি মেডিক্যাল-এর ছাত্র নেতাদের ওপর অমন হামলা হয়, কিংবা অমন হামলা হলো বিএমএ'র নেতাদের ওপর। তাহলেও কি আন্দোলন চলবে ?

খানিক পরে মনির আসে দুই বন্ধুকে নিয়ে। খবরটা দিতে গেলে সে বলে, শুনেছি ও খবর– ও নিয়ে আলোচনা হলো লীগের নেতাদের সঙ্গে। ওরা স্বীকার করে না যে, ওদের মধ্যে কেউ কাজটা করেছে, আসলাম নামে যে ছেলেকে অস্ত্র হাতে দেখা গেছে, সে নাকি বাইরের ছেলে, আর নীলুর ওপর হামলা করেছে পার্সোনাল কারণে।

কিন্তু ওদের কথা ঠিক নয়, মনিরের বন্ধুটি বলে, আমরা খবর পেয়েছি, নীলুর সঙ্গে ওর কোনো রকম যোগাযোগ কখনও হয় নি– সুতরাং হামলার কারণ যে পার্সোনাল নয় সেটা এস্টাব্লিশড্– কিন্তু হামলাটা কাদের পক্ষ থেকে করা হয়েছে সেটাই বোঝা যাচ্ছে না।

তিনজন মিলে তারপর নানান জল্পনা কল্পনা হয়– রঞ্জুর এক সময় ওসব কচকচি শুনতে ভালো লাগে না। সে ক্যান্টিনের দিকে চলে যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

চারদিকের ঘটনা এমন দ্রুত ঘটছিলো যে মনে হচ্ছিলো, কারুর কিছু করার নেই। যেন অদৃশ্য থেকে কেউ ঘটনাগুলো ঘটিয়ে চলেছে। রঞ্জুর এখন করণীয় বলতে কিছু নেই– সব মেডিক্যাল কলেজে ধর্মঘট চলছে এখন, বহু ছেলেমেয়ে আন্দোলনের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে। ওদিকে বিএমএতে জোর চেষ্টা হচ্ছে যাতে ডাক্তাররা ধর্মঘটে চলে যায়। সে এখানে-ওখানে ঘোরে আর শোনে কে কী বলছে– বাকি সময় কাটে তার লাইব্রেরিতে।

শাহনিও প্রায়ই লাইব্রেরিতে আসে আজকাল। কোনোদিন একা। কোনোদিন সঙ্গে থাকে নীলা। কোনোদিন আসা যাওয়ার পথে দেখতে পায় কোনোদিন দেখে বারান্দায় দাঁড়িয়ে সাজিদ নয়তো রফিকের সঙ্গে গল্প করছে। রঞ্জু পাশ দিয়ে গেলে ওরা দু'জন দুটো-একটা কথা বলে। কিন্তু শাহনি থাকে মুখ ফিরিয়ে। সেদিন রঞ্জু একটু আগে গিয়েছিলো। দেখে, বারান্দায় কেউ নেই, শাহনি রেলিঙে ঝুঁকে চড়ুই পাখিদের ওড়াউড়ি দেখছে। রঞ্জুর মনে হলো খামোকা মেয়েটা তার ওপর চটে আছে। একই ক্লাসে পড়ে– এভাবে রাগ করে থাকাটা ঠিক নয়। সে কিছুটা গায়ে পড়েই এগিয়ে গিয়ে বললো, আজ মনে হচ্ছে একা ? ওরা কেউ আসে নি ?

শাহনি মুখ ফেরায় না, একইভাবে মুখ ফেরানো অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকে। রঞ্জু শব্দ করে হাসে শাহনির কাণ্ড দেখে। বলে, তুমি কি আড়ি দিয়েছো আমার সঙ্গে ?

শাহনি কোনো সাড়া দেয় না। তখন রঞ্জু ফের বলে, মনে হচ্ছে, তোমার হোস্টেলে গিয়ে সবার সামনে ভাব করতে হবে– এখানে তোমার ভাব করতে আপত্তি আছে।

ঐ কথার পর শাহনি আর বারান্দায় থাকে না, লাইব্রেরির ভিতরে ঢুকে যায়।

রঞ্জু আর এগোয় না। তার এমন কি দায় যে তোষামোদ করে ভাব করতে যাবে ? সহপাঠী বলে সাধারণ ভদ্রতা রক্ষার জন্য সে কথা বলতে গিয়েছিলো, না বললে তার ভারি বয়েই গেলো ?

সে রেলিঙ ধরে ঝুঁকে দাঁড়ালে দেখতে পায় হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসছে রফিক। হাঁফাতে হাঁফাতে এসে বলে, দোস্ত এবার কেল্লাফতে– দেশের সব হাসপাতালের ডাক্তাররা ইনডেফিনিট পিরিয়ডের জন্য ধর্মঘটে যাচ্ছে।

খবরটা ভেতরে গিয়ে বলার কারণেই সম্ভবতঃ ভেতর থেকে সব ছেলেমেয়ে বেরিয়ে আসে এবং একে অন্যের কাছে নানান ধরনের মতামত জানায়। ঐ সময় রফিক আর শাহনির মুখোমুখি পড়ে যায় রঞ্জু। রফিক বলে, মুশফেক ভাই'র সঙ্গে আজ আমরা সন্ধ্যায় বসছি, তুমি কি আসবে ?

রঞ্জু মাথা নাড়ায়। বলে, নাহ্। আমি গিয়ে কী করবো ?

রফিকের ভ্রু কুঁচকে যায়। বলে, তার মানে ? তোমার অতো উৎসাহ– সব ফুরিয়ে গেলো ?

হ্যাঁ, আমি এখন শুধুই দর্শক– তোমরা যা করবে, আমি তা শুধু দেখবো।

কথা বলতে বলতে সামনের দিকে নজর তুললে রঞ্জু দেখতে পায় শাহনি তার দিকে তাকিয়ে আছে।

রফিক চলে যায়। তাকে সিঁড়ির মুখ পর্যন্ত এগিয়ে দেয় শাহনি। কী যেন বলেও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। তারপর ফিরে এসে ফের বারান্দায় রেলিঙে ভর দিয়ে দাঁড়ায়। রঞ্জু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

তাকে পাশে এসে দাঁড়াতে দেখে সরে যাচ্ছিলো, ঐ সময় শাহনি ডাকে এই রাজিব, শোনো ?

রঞ্জুকে দাঁড়াতে হয়।

তুমি কি তখন আমাকে কিছু বলেছিলে ?

রঞ্জু পাল্টা প্রশ্ন করে, তোমার কী মনে হয় ? কিছু কি বলেছিলাম ?

না, মানে তখন খেয়াল করতে পারি নি, মনটা আমার ভালো নেই। শাহনি বিব্রত স্বরে বলে, পরে মনে হলো, আমি তোমার কথায় কান না দেওয়ায় অন্যায় হয়েছে। তুমি রাগ করতে পারো।

রঞ্জু তখনও সহজ হতে পারে না। বলে, তুমি তাহলে এখন আমার রাগ ভাঙাতে এসেছো। আমার সৌভাগ্য বলতে হবে।

শাহনির ভ্রু কুঁচকে ওঠে রঞ্জুর কথা শুনে। বলে, তুমি কি বাঁকা না করে কোনো কথাই বলতে পারো না ?

ঐ কথার পর রঞ্জু সহজ না হয়ে পারে না, মুখখানা ভেংচি দেওয়ার মতো বাঁকা করে বলে, আমার মুখটা যে বাঁকা– কী করবো, বলো ?

শাহনিও এবার সহজ হয় এবং হাসে। বলে, মেয়েদের মন পাবার জন্যে খুব তো ভাঁড়ামি করতে জানো, ক্লাউন কোথাকার।

রঞ্জু বলে, থ্যাংক য়ু ম্যাডাম।

কেন ? থ্যাংক য়ু কেন ?

ফর দ্য কমপ্লিমেন্ট।

ক্লাউন বললে সেটা কি কমপ্লিমেন্ট হয় ?

শব্দটা না হোক। কিন্তু আমি যে আপনার মন পাবার মতো কাজ করে সাকসেসফুল হয়েছি সেটা যখন স্বীকার করলেন, তখন সেটা আমার কাছে নিশ্চয়ই কমপ্লিমেন্ট।

ও মা, এ কী কথা। শাহনি কপালে চোখ তোলে। বলে, ওকথা আমি কখন বললাম ?

রঞ্জু ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলে, ঠিক দু'মিনিট আগে– এক ঘণ্টা আগে যখন আমি আপনার সঙ্গে কথা বলতে গেলাম, তখন ম্যাডাম পাত্তা না দিয়ে চলে গেলেন, তারপর এই একটু আগে, মানে ঠিক দু'মিনিট আগে আমার সঙ্গে কথা বললেন এবং ঠাট্টা করে আমাকে ক্লাউন বললেন– আপনার মন যে আমি পেয়েছি এটা কি তার প্রমাণ নয় ?

আরও কতোক্ষণ হালকা কথাবার্তা চলতো কে জানে। শাহনির যে কী হয়। হঠাৎ সে রঞ্জুর মুখোমুখি তাকায় এবং তখন তার চেহারা একেবারে অন্যরকম লাগে। সে বলে, শোনো, তোমার সঙ্গে সেদিন আমি খামোকা খারাপ ব্যবহার করেছিলাম। পরে দেখলাম, তোমার কথাই ঠিক– আমার মামার কাছেই শুনলাম। গভর্নমেন্ট হেলথ সার্ভিসের জন্য আলাদা ক্যাডার করতে চায় না– সিভিল সার্ভিসের লোকেরাই আসলে বাধা দিচ্ছে আর এরশাদ গভর্নমেন্ট আমলাদের অমতে কিছুই করতে যাবে না– ভ্যাকান্ট পোস্টগুলো হয়তো ফিলাপ করবে। কিন্তু পোস্ট-এর সংখ্যা কিছুতেই বাড়াবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

কথা বলতে বলতে দু'জনে বারান্দা দিয়ে হেঁটে সিঁড়ির মুখে দাঁড়ায়। ঐ সময় নীলার কথা তোলে শাহনি। বলে, নীলা এখন খুব আনন্দে আছে ওর ভাই ছাড়া পাওয়াতে- বেচারি খুব বিপদে পড়ে গিয়েছিলো ভাই জেলে থাকাতে- ওর তো বিয়ে!

বিয়ে? রঞ্জু হেসে ওঠে। বলে, কথাটা সেদিন বলো নি কেন? ভাগ্যবানটি কে? আমরা চিনি?

না, শাহনি বলে, না, আমরা কেমন করে চিনবো, বুয়েট থেকে পাস করে বেরিয়েছে আমজাদ ভাইয়ের বন্ধু।

দু'জনের সিঁড়ি বেয়ে নামবার সময় রঞ্জু মন্তব্য করে, নীলার তাহলে এখন খুব ভালো সময় যাচ্ছে।

শাহনি কোনো মন্তব্য করে না। রঞ্জুকে তখন ছেলেমানুষিতে পেয়েছে। সে হিসেব করে বলে, দু'মাস আগে গেলো রুমা, তারপর আয়ষা, এখন যাচ্ছে নীলা, তারপর আর কে?

শাহনি হাসে। বলে, আমি কি আড়ি পেতে বেড়াই নাকি যে বলতে পারবো।

নীলার ঘনিষ্ঠ বান্ধবীদের মধ্যেই কারুর তো পরের জন হওয়ার কথা।

শাহনি দাঁড়িয়ে যায়। রঞ্জুর মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, কে? বিলকিস?

রঞ্জু হাসে। বলে, নীলার ঘনিষ্ঠ বান্ধবী কে তা কি আমি জানি?

শাহনি এবার চোখে চোখে তাকায়। বলে, আমার সঙ্গে অমন বাজে ঠাট্টা কখনও করবে না।

রঞ্জু মাথা হেলায়। বলে, ঠিক আছে, কখনও করবো না।

ফের ঠাট্টা? শাহনি এবার যেন সত্যি সত্যি রাগে।

রঞ্জু শান্ত গলায় জানায়, না ঠাট্টা নয়- সত্যিই অমন ঠাট্টা কখনও করবো না- কারুর সঙ্গেই না।

দু'জনে কলেজ থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হাসপাতালের গেট দিয়ে বের হয়ে শহীদ মিনারের চত্বরে আসে। শাহনি বলে, এ জায়গাটা তোমার খুব প্রিয়, না?

শুধু আমার একার কেন হবে, রঞ্জু হাত তুলে দেখায়। বলে, দেখছো না, কতো জন শুয়ে বসে আছে।

তাহলে চলো, আমরাও কিছুক্ষণ বসি, শাহনি প্রস্তাব করে।

দু'জনে গিয়ে বসে। কিন্তু গল্প আর জমে না, ছেঁড়া ছেঁড়া কথা হয়, থেকে থেকে। দু'জনেই নিজেদের ভিতরে ডুবে থাকে। রঞ্জুর মনের ভিতরে বহুদিন পর খুকুর হাস্যোজ্জ্বল মুখ ভেসে ওঠে। সে মনে মনে তুলনা করে, খুকুও কি এমন হঠাৎ হঠাৎ রেগে যেতো? উঁহু, তার মনে পড়ে না। তার জানতে ইচ্ছে করে বিশ্বজিতের সঙ্গে খুকুর প্রেম নিশ্চয়ই আরও গাঢ় হয়েছে- ওদেরও কি শীঘ্রই বিয়ে হতে যাচ্ছে?

রঞ্জু শাহনিকে যেন একটু বেশি চুপচাপ দেখতে পায়। বলে, তুমি কি ফের লাইব্রেরিতে যাবে?

না, শাহনি মাথা নাড়ায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

তাহলে হোস্টেলে ? নাকি কোনো বাসায় ?

না আমি এখন কোথাও যাবো না, আপাতত এখানেই কিছুক্ষণ বসে থাকবো– তুমি কি এক্ষুণি চলে যাবে ?

রঞ্জু মাথা নাড়ায়। বলে, না এক্ষুণি যাবো না, কিন্তু তুমি কথা বলছো না কেন ?

শাহনি ম্লান হাসে। বলে, কী বলবো ?

ঝগড়া করো অন্তত। সেদিনের মতো–

শাহনির দু'চোখ ক্ষণিকের জন্য ঝিকিয়ে ওঠে। বলে, যাক তবু আমাকে তোমার মনে থাকবে– ঝগড়া করে একটা লাভ হয়েছে আমার।

আচ্ছা তোমার কি মন খারাপ ? রঞ্জু এবার ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ তোলে।

শাহনি মাথা দোলায়। বলে, কিছুটা, মন খারাপ না, দুশ্চিন্তা বলতে পারো–

রঞ্জু অপেক্ষা করে, আরও কিছু হয়তো শুনতে পাবে। কিন্তু শাহনি আর কিছু বলে না– ফলে রঞ্জু আর ও বিষয়ে কথা তোলে না।

আচ্ছা, স্ট্রাইক কতো দিন চলবে, বলতে পারো ?

রঞ্জু মাথা নাড়ায়। বলে, জানি না– মনে হয় কেউ-ই জানে না– ইউনিভার্সিটির টিচাররা কতোদিন হয়ে গেলো স্ট্রাইক করছে– কিছু কি হয়েছে ?

আমাদের স্ট্রাইকও কি অতোদিন ধরে চলবে ?

জানি না।

সত্যিই জানো না ? আমি তাহলে দেশের বাড়ি থেকে ঘুরে আসতে পারি ? কি বলো?

দেশের বাড়ি ? রঞ্জু জিজ্ঞেস না করে পারে না।

হাঁ দেশের বাড়ি, যশোর।

কথাটা বলার পরই কেমন যেন বদলে যায় শাহনির চেহারা। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেলে মানুষের চেহারায় যেমন জড়তা ভাঙার সহজ ভাব দেখা যায়– শাহনির চোখে মুখে তেমনি ভাব ফোটে। সে বলে, তোমার কাছে কার্ড ফোন আছে ?

রঞ্জু পকেট হাতড়ে বলে, আছে– কেন তোমার লাগবে ?

হ্যাঁ, এক্ষুণি– চলো।

দু'জনে ওঠে। রঞ্জু কলেজের দিকে যাচ্ছিলো, শাহনি হাত ধরে থামায়। বলে, ওদিকে না– এখানে।

তার মানে হাসপাতালের আউট ডোরের ফোন বুথ-এ ঢুকতে চায় শাহনি।

বেশিক্ষণ দাঁড়াতে হয় না। একটি মাত্র লোক ছিলো বুথের ভেতরে বাইরে কেউ নেই। বেলা তিনটার সময় এমনিতেই লোকজন কম থাকে। শাহনি ভেতরে ঢোকে, রঞ্জু দাঁড়ায় দরজার কাছে।

সে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ডাইনে বাঁয়ে তাকায়। লক্ষ্য করে আউটডোরে লোকজন খুবই কম। একটু পর তার মনে হয়, শুধু আউটডোর নয়, পুরো হাসপাতালেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

মানুষজন কম। মেডিক্যাল কলেজে না হয় স্ট্রাইক, কিন্তু তাতে হাসপাতালে মানুষজন কম আসবে কেন ? সে কারণ খুঁজে পায় না। একটু পর ফের মনে হয়, তার নিজের হিসেবেও ভুল হতে পারে। দুপুরের দিকে হয়তো হাসপাতালে লোকজন এমনিতেই কম থাকে, আগে কখনো খেয়াল করে নি বলে আজ মানুষজন কম মনে হচ্ছে। সে পেছন ফিরে ফের একবার তাকায় আর শাহনিকে দেখতে পায়। দেখে শাহনি ফোন বুথ থেকে বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু ওভাবে পিলারে হেলান দিয়ে দাঁড়ালো কেন ? আর চোখমুখই বা অমন থমথম করছে কেন ? ফোনে কি কোনো দুঃসংবাদ পেলো ?

সে ছুটে গিয়ে পাশে দাঁড়ায়। জিজ্ঞেস করে, কী খবর শাহনি ? কী হয়েছে ?

কোনো জবাব দিতে পারে না শাহনি, কেমন যেন থর থর করে কেঁপে ওঠে। তারপর নিজের ঠোঁট কামড়ে ধরে আবেগ সামাল দেয়ার চেষ্টা করে। রঞ্জু হাত ধরলে, নিজেকে তখন আর সামলাতে পারে না, সে দু'হাতে রঞ্জুর গলা জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে ওঠে। কাঁধে মাথা রেখে কাঁদে কয়েক মিনিট, তারপর কাঁদতে কাঁদতেই বলে, আমার ভাইয়াকে ওরা মেরে ফেলেছে।

রঞ্জু শাহনিকে জড়িয়ে ধরে একইভাবে দাঁড়িয়ে থাকে আরও কিছুক্ষণ। সহপাঠী এই মেয়েটির বাড়িঘরের খবর তার কিছুই জানা নেই। শুধু জানে, যশোরে ঝিকরগাছার দিকে বাড়ি, ঢাকায় এক মামা থাকেন, ছুটির দিনে একেকদিন ওকে মামার বাড়ি যেতে দেখা যায়। ওর যে মামা সরকারী দলের এমপি, তিনি আপন মামা নন। মায়ের মামাতো ভাই। উনি যশোরেই থাকেন। পার্লামেন্ট বসলে তখন ঢাকায় এসে এমপি হোস্টেলে থাকেন। সে জিজ্ঞেস করে, তুমি কি এখন হোস্টেলে যাবে ?

শাহনি কাঁদতে কাঁদতে মাথা নাড়ায়। বলে, আমি বাড়ি যাবো।

তোমার মামার বাসায় চলো তাহলে ? যাবে ?

না, শাহনি খুব জোরে মাথা ঝাঁকায়। কোনো কথা না বলে সে রঞ্জুকে ছেড়ে দিয়ে আউটডোর ডিসপেনসারির চাতালে একটা পিলারে হেলান দিয়ে বসে।

বেশ বিপদে পড়ে যায় রঞ্জু। সে এখন করবেটা কী ? এমন অবস্থায় কি মেয়েটাকে ছেড়ে যাওয়া যায় ? সে বুঝতে পারে, ও স্বাভাবিকভাবে চিন্তা করতে পারছে না অমন একটা দুঃসংবাদ পাওয়ার পর কে স্বাভাবিক থাকতে পারে ? শাহনির মনের অবস্থা সে আন্দাজ করতে পারে, কিন্তু এমন অবস্থা হওয়া সত্ত্বেও সে মামা বাড়িতে কেন যেতে চায় না, সেটাই সে বুঝতে পারে না। থেকে থেকে খালি একটা কথাই তার মনে হয়, কতোক্ষণ এভাবে তাকে মেয়েটার সঙ্গে থাকতে হবে! সে কিছুক্ষণ আরও চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। পাশে গিয়ে বসে কয়েক মিনিট। তারপর ধীর শান্ত গলায় বলে, যশোরে যেতে চাইলে গোছগাছ করতে হবে না! এখন হোস্টেলে চলো, পরে তোমাকে আমি গাবতলী নিয়ে গিয়ে বাসে তুলে দেবো।

শাহনি ফের ফুঁপিয়ে ওঠে। রঞ্জু ঘাড়ে হাত রাখলে ফের সে রঞ্জুর গলা জড়িয়ে ধরে ওই অবস্থায় রঞ্জুর ঘাড়ে মুখ ঘষতে ঘষতে বলে, কেন ওরা ওপথে গিয়েছিলো, বলো তুমি তো রাজনীতি করো, বলো ওরা কেন অমন রাজনীতি করতে গিয়েছিলো !

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

রঞ্জু শাহনির কথা বুঝতে পারে না, সে তার পিঠে সান্ত্বনার হাত বোলায়। কোনো মেয়ে এভাবে তাকে জড়িয়ে ধরে কখনো কাঁদে নি– আর কাউকে এভাবে সান্ত্বনাও দিতে হয় নি– ভারী বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয় তার। শাহনি যা বলছিলো তাও তাকে চিন্তায় ফেলে দিলো। কোন রাজনীতির কথা বলছে ও? ওর ভাই কি সরকারী দল করতো? নাকি ছিলো অপজিশনের কোনো দলে? প্রশ্নটা তার মনে জাগে বটে, কিন্তু সে জিজ্ঞেস করতে পারে না। ওর অমন বিপর্যস্ত অবস্থায় ওসব কথা কেমন করে জিজ্ঞেস করে মানুষ?

শাহনি ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলে, বিপ্লব তো দুই দলই করতে চায়– দুই দলই আণ্ডারগ্রাউন্ডে, কিন্তু তবু কেন এক দলের লোককে অন্য দলের লোকেরা খুন করে বলতে পারো?

রঞ্জুর কাছে ব্যাপারটা এবার খানিক যেন খোলাসা হয়। শাহনির ভাই যে আণ্ডারগ্রাউন্ড পার্টির কর্মী বা নেতা ছিলো সেটা জানতে পেরে তার শরীর-মন থমকে যায় কয়েক মুহূর্তের জন্য। তারপর সে শাহনিকে তুলে দাঁড় করায়। বলে, সত্যিই তুমি হোস্টেলে যাবে না?

না, মাথা নাড়ায় শাহনি। বলে, মামার বাসাতেও যাবো না– মামা কিছুই করে নি। ভাইয়াকে যে ধরে নিয়ে গেছে, সে খবর জানানো হয়েছিলো– মামা কি কিছু করতে পারতো না? একজন জয়েন্ট সেক্রেটারি কি ডিস্ট্রিক্ট অথরিটিকে মুভ করাতে পারে না? বলো?

রঞ্জুর ঠিক জানা নেই, একজন জয়েন্ট সেক্রেটারি ডিস্ট্রিক্ট অথরিটিকে মুভ করাতে পারে কিনা, আর পারলেও আণ্ডারগ্রাউন্ড পার্টির খুনোখুনি বন্ধ করার ক্ষমতা ডিস্ট্রিক্ট অথরিটির কতোখানি আছে, কিংবা থাকলেও সেটা তারা কাজে লাগাতে চায় কিনা। শাহনির কথার পিঠে সে কোনো কথাই বলতে পারে না– সে একইভাবে দাঁড়িয়ে থাকে আর শোনে, ওর আব্বা কথা বলছেন না, ওর বড় বোন ঘন ঘন অজ্ঞান হয়ে পড়ছেন, ওর বড় ভাইকে নাকি পুলিশ খুঁজতে এসেছিলো– শাহনি ফোঁপাতে ফোঁপাতে ফোনে ছোট বোনের সঙ্গে কী কী কথা হয়েছে তা বলে যায় এক এক করে। অন্য জায়গায় একটি যুবতী মেয়েকে ওভাবে এক যুবকের গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে দেখলে কী হতো বলা যায় না, তবে হাসপাতালের বারান্দায় ওই দৃশ্য সম্ভবত অস্বাভাবিক লাগছিলো না। কারণ হাসপাতালে মানুষ মরতেই পারে, আর সে জন্য আত্মীয়-স্বজন কাঁদবে এতে আর দেখার কী আছে। কিন্তু তবু রঞ্জুর অস্বস্তি লাগছিলো আর তাই সে ডাইনে বাঁয়ে তাকাচ্ছিলো– যদিও কলেজের সহপাঠীদের এই সময় এদিকে আসার সম্ভাবনা কম, তবুও বলা যায় না, যদি চেনা জানা কারুর সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, তাহলে নানান কথা জিজ্ঞেস করবে– আর তাতে শাহনির ঝামেলা বাড়বে বই কমবে না। বেচারি খুলে বলতে পারবে না যে, কীভাবে তার ভাই মারা গেছে।

সে হাত ধরে শাহনির। বলে, এখান থেকে চলে যাওয়া উচিত আমাদের। চেনাজানা কেউ দেখলে নানান কথা জিজ্ঞেস করবে– চলো এখান থেকে বের হই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

রঞ্জু হাত ধরে টানলে শাহনি ফের বলে, আমি হোস্টেলে যাবো না– ওখানে গেলে সবাই মিলে আমাকে নানান কথা জিজ্ঞেস করবে, আমাকে তুমি বাসে তুলে দাও।

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রঞ্জু বলে, এভাবে যেতে পারে কেউ ? মনটাকে শক্ত করো। চিন্তা করে দেখো, এমন মানসিক অবস্থায় কীভাবে তুমি অতো দূরের জার্নি করবে ? তাছাড়া এখন বাসও তো পাওয়া যাবে না– আর যদি বাস পাও টিকিট কি পাবে ?

আমি বাসস্ট্যান্ডে অপেক্ষা করবো, ধরা গলায় শাহনি বলে। ওড়নার আঁচল দিয়ে ওই মুহূর্তে সে লাল হয়ে ওঠা ভেজা দুই চোখ মোছে। রঞ্জু খুব কাছ থেকে ওর লাল হয়ে ওঠা চোখমুখ দেখতে দেখতে ঘাড়ে হাত রেখে বারান্দা থেকে নামিয়ে গেটের দিকে এগোয়। যেতে যেতে জিজ্ঞেস করে, টিকিটের টাকা আছে সঙ্গে ?

শাহনি মাথা নাড়ায়। বলে, বোধহয় পুরো টাকা নেই, তবে বাসস্ট্যাণ্ডে গেলে যশোরের কোনো চেনা লোক নিশ্চয় পাবো।

ওর কথা শুনে অমন অবস্থার মধ্যেও রঞ্জুর হাসি পায়। মনে হয়, বাসস্ট্যাণ্ড যেন ওর কলেজের ক্যান্টিন অথবা গ্রামের হাট। যেখানে চেনাজানা লোক ওর চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তবে টিকিট কিংবা টাকার বিষয়ে সে আর কিছু বলে না। কারণ বোঝে, বলে কোনো লাভ হবে না– শাহনির পক্ষে এখন স্বাভাবিকভাবে চিন্তা করা সম্ভব নয়– বাড়ি যাওয়াটাই এখন ওর কাছে বড়, অসুবিধা কী হতে পারে, সে বিষয়ে সে আদৌ ভাবছে না।

গেটের বাইরে এসে দু'জনে দাঁড়ায়। রঞ্জু এতোক্ষণে বুঝতে পারে আসলে বড় রকমের ঝামেলার মধ্যে সে জড়িয়ে পড়েছে। কী ব্যবস্থা সে করতে পারবে, তার কিছুই তার মাথায় খেলছে না। এক হতে পারে, সে বলতে পারে, শাহনি তুমি হোস্টেলে চলে যাও, ওখানে নিশ্চয়ই তুমি সাহায্য পাবে। কিংবা নিজেই সঙ্গে করে কোনো স্যারের বাসায় কিংবা চেম্বারে শাহনিকে গছিয়ে দিতে পারে। আর এক হতে পারে, ইউনিয়ন অফিসে গিয়ে পৌঁছে দিয়ে এলো।

কথাগুলো তার মনে হয় বটে, কিন্তু নিজের মনের ভেতর থেকেই ধিক্কার শুনতে পায়। কেউ যেন বলে, ছি রঞ্জু ছি! তুই এতোই কাপুরুষ যে, একটি শোককাতর মেয়ের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে পারিস না ? অগত্যা গাবতলী যাওয়াটাকেই তার অনিবার্য বলে মনে হয়। আর সেটা মনে হওয়াতেই খেয়াল হয় যে, ৫টার আগে তো কোনো বাস ছাড়বে না। সঙ্গে সঙ্গে ফের এও মনে হয়, নাইট কোচে যাওয়া কি ওর ঠিক হবে? একা একা কীভাবে যাবে ও ? ভাইকে ধরে নিয়ে গিয়ে যারা খুন করতে পারে– তাদের বিশ্বাস কি ? বোনকে রাতের বেলা একাকী পেলে ছেড়ে নাও দিতে পারে– তখন ?

সে প্রস্তাব করে, চলো আপাতত আমার রুমে যাই। শাহনি একটু যেন চমকায়। মুখোমুখি তাকিয়ে জানতে চায়, তারপর ?

মনিরের কাছ থেকে টাকা নিয়ে গাবতলীতে গিয়ে টিকিট করবো– তুমি কি নাইট কোচে সত্যি সত্যি যাবে ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ওই প্রশ্ন শুনে এবার বোধহয় শাহনির কিছুটা হুঁশ হয়। সে অসহায় আর বিভ্রান্ত চোখে রঞ্জুর মুখের দিকে তাকায়। তারপর বলে, আমি জানি না– কী করবো। তবে হোস্টেলে নিয়ে যেও না– তোমাদের হোস্টেলেও না। বেশি জানাজানি হলে আমার এখানেও বিপদ হতে পারে।

ওই মুহূর্তে হঠাৎ রঞ্জুর মুখ দিয়ে বের হয়ে যায়, তুমি আমাদের বাসায় যাবে? গেলে খুব ভালো হয়, যাবে?

শাহনি ফের বিভ্রান্ত চোখ তোলে। মুখে কিছুই বলে না? রিকশায় উঠে বসলে ফের শাহনি কান্নায় ভেঙে পড়ে। রঞ্জুর কাঁধে মুখ চেপে থেমে থেমে বলে, জানো, আমাকে বলেছিলো, আগামী ডিসেম্বরে চলে আসবে– ওই পার্টির রাজনীতি আর করবে না। শুধু ও একা নয় ওদের পার্টির অনেকেই আন্ডারগ্রাউন্ড থেকে বেরিয়ে আসবে– বলো, এমন কেন হলো?

সর্বহারা পার্টির লিডারদের কাউকে তুমি চেনো?

সারাটা পথ শাহনি রঞ্জুর ঘাড়ে মাথা রেখে কাঁদলো আর আক্ষেপ করে চললো।

বীথি টেবিলে খাবার সাজিয়ে রেখে বিছানায় গা এলিয়ে দিয়েছিলো। কর্তার আজ আসতে দেরি হবে, এদিকে মেজো আর ছোটরও ফিরতে দুপুর গড়িয়ে যাবে। সুতরাং খাওয়া দাওয়ার পাট আজ বিকেলের আগে চুকবে না। সে খবরের কাগজ মেলে ধরেছিলো সামনে। মেডিক্যাল ছাত্রদের স্ট্রাইক-এর খবরটা সে কয়েকদিন ধরেই পড়ছে– একটু দুশ্চিন্তা যে হচ্ছে না তা নয়। যদি বড় রকমের গোলমাল লেগে যায় তাহলে রঞ্জু কি নিজের গা বাঁচিয়ে চলতে পারবে? ওদিকে আবার ইউনিভার্সিটিতেও নিত্যি গোলমাল– কখন কী হয় কিছুই বলা যায় না। ইউনিভার্সিটি যাওয়ার সময় মঞ্জুকে সে রোজ বলে, খবরদার ঝামেলা টামেলার মধ্যে যাবে না, তেমন দেখলে ইউনিভার্সিটি এলাকা ছেড়ে সোজা বাসায় চলে আসবে।

একটু বোধহয় তন্দ্রামতো এসেছিলো। ওই সময় বাইরে ডাকাডাকি– মা, ওমা দরজা খোলো। রঞ্জুর গলা, হঠাৎ রঞ্জু কেন? এমন সময় তো ওর আসার কথা নয়। বীথি ছুটে গিয়ে দরজা খুললো। আর দেখলো একটি মেয়ের ঘাড়ে হাত রেখে ছেলে ঘরে ঢোকার জন্য অপেক্ষা করছে। মেয়েটির ফর্সা মুখ থমথমে, চোখের কোলে আর গালে চোখের পানি শুকিয়ে যাবার অস্পষ্ট ছোপ ছোপ দাগ, মাথার চুল এলোমেলো।

বীথির মুখ দিয়ে বিস্ময় আর উদ্বেগাকুল স্বর একসঙ্গে বের হয়। বলে, তুই! কোত্থেকে? কী হয়েছে?

মা, এর নাম শাহনি, রঞ্জু তখন জানায়। বলে, আমার সঙ্গে পড়ে। বাড়ি যশোরের ঝিকরগাছায়– এখানে হোস্টেলে থাকে।

বলতে বলতে শাহনিকে আলতোভাবে ঠেলে ঘরের ভেতর নিয়ে আসে। তারপর বলে, আজই একটু আগে খবর পেয়েছে, ওর মেজো ভাই মারা গেছেন– তাই–

বীথি মেয়েটির মুখের দিকে আর একবার তাকিয়ে দেখে। কী দেখতে পায় মুখে কে জানে, বুকের ভেতরটা তার মুহূর্তের মধ্যে হা হা করে ওঠে। সে মেয়েটিকে পরম মমতায় জড়িয়ে ধরে বলে, আহারে! আর ওই স্বর শুনে শাহনির নতুন করে কান্না পায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

এবং সে ডুকরে কেঁদে ওঠে আর থর থর করে কাঁপে। বীথি শাহনির মাথায় পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে বলে, কাঁদে না মা, কাঁদে না, আল্লাহকে ডাকো।

বলতে বলতে সে মেয়েটিকে নিয়ে সোফায় বসে। আর বসে একইভাবে তার মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে থাকে।

এগারো

একটু পর রায়হান ফেরে। বাসায় একটি অচেনা মেয়ে এবং তার কান্নাকাটি দেখে প্রথমে বেশ ঘাবড়ে যায়। বীথি কিছু জানায়– কিন্তু তাতে কিছু বুঝতে পারে না সে। তখন রঞ্জুকে ডেকে তার কাছ থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব কিছু শোনে। রঞ্জু যখন বলে, ও আজই রাতের কোচে বাড়ি যেতে চাইছে, তখন সঙ্গে সঙ্গে রায়হান আপত্তি জানায়। বলে, মাথা খারাপ নাকি ? এই অবস্থায় কীভাবে নাইট কোচে যেতে দেবে– পথে যদি কোনো বিপদ হয় ?

সে বীথিকে ডেকে বলে দেয়, ওকে তুমি যেতে দিও না– দু'দিন আমাদের এখানে থাক।

বিকেল হয়ে যায় মঞ্জু আসতে আসতে– টুকু ফেরে আরও পরে। কিন্তু বাড়ির অবস্থা দেখে তারাও কেমন মিইয়ে থাকে। জোরে কথা পর্যন্ত বলে না– খিদে থাকলেও কারুর সাহস হয় না যে খাবার টেবিলে গিয়ে বসে।

টুকু একেকবার শাহনির দিকে তাকায়। ফের তাকায় বড় ভাইয়ের দিকে। তার মাথায় কিছুতেই ঢোকে না। কেন ভাইয়া অমন একটা মেয়েকে বাসায় নিয়ে এসেছে– হোক ক্লাস ফ্রেণ্ড, ভাই মরে যাওয়ার খবর পাওয়ার পর অন্য কোথাও কেন যাবে ? সোজা বাড়িতে যাবে– যদি সঙ্গে সঙ্গে রওনা হতে না পারে, তাহলে যেখানে থাকে, সেই হোস্টেলেই থাকবে। আর যদি হোস্টেলে থাকার অসুবিধাটা থাকে তো কোনো বান্ধবীর বাড়ি ছিলো না ? একেবারে ছেলে বন্ধুর বাড়ি আসতে হবে ?

মেয়েটির জন্য তার কষ্ট হয় মনে, মা যে ওকে আদর করছেন সেটাও তার দেখতে ভালো লাগে– কিন্তু তবু মনের ভেতরে খটকাটা তার থেকেই যায়।

এক সময় সমবেদনার উচ্ছ্বাস থিতিয়ে যায়। রায়হান শাহনির সঙ্গে থাকে আর তিন ছেলেকে খেতে বসায় বীথি। ওরা খেতে আরম্ভ করলে বীথি ফের পা বাড়ায় বসার ঘরের দিকে। মঞ্জু তখন জিজ্ঞেস করে, ওদিকে কোথায় যাচ্ছো ?

যাই একটু দেখে আসি– আহারে! মা মরা মেয়ে। মায়ের অমন আক্ষেপ শুনে রঞ্জু ভেতরে ভেতরে যেন একটু চমকায়– শাহনির যে মা নেই এ খবরটা তার জানা ছিলো না।

মঞ্জু বড় ভাইয়ের দিকে চোখ তুলে বলে, সর্বহারা পার্টি কি যশোরের দিকে খুব স্ট্রং ? আমি তো শুনেছিলাম নরসিংদীর দিকে সর্বহারা আর জাসদের গণবাহিনীর সঙ্গে খুনোখুনি লেগে গেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

রঞ্জু অবাক চোখে তাকায় ভাইয়ের মুখের দিকে। তার বেশ অবাক লাগে, মঞ্জু আণ্ডারগ্রাউন্ড পার্টির খবর কীভাবে পায়!

সে জিজ্ঞেস করে, তোর কি কারুর সঙ্গে জানাশোনা আছে?

মঞ্জু কোনো জবাব দেয় না। মাথা নিচু করে একসঙ্গে মুখে ভাত তোলে।

টুকু হঠাৎ জিজ্ঞেস করে, ভাইয়া, উনি কি তোর বান্ধবী?

রঞ্জুর হাসি পেয়ে যায় টুকুর কথা শুনে। সে পাল্টা জিজ্ঞেস করে, এক ক্লাসে পড়লে তাকে কী বলা হয় জানিস না?

হ্যাঁ জানি, ক্লাসফ্রেন্ড– কেউ কেউ ক্লাসমেটও বলে।

বাহ্! তাহলে তো জানিসই, খামোকা জিজ্ঞেস করছিস কেন?

টুকু হয়তো আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলো। মঞ্জু তখন চোখ পাকিয়ে তাকায় তার দিকে। বলে, অতো কথা বলিস কেন খাওয়ার সময়? শিগগির খেয়ে ওঠ, আব্বা আর মা বসে আছেন, ওঁরা খাবেন না?

তিন ভাই উঠে গেলে মোমেনা এঁটো থালাবাটি সরিয়ে নেয়। আর তখন শাহনিকে সঙ্গে নিয়ে বীথি আর রায়হান খাওয়ার ঘরে ঢোকে। রায়হানের মনে হয় মেয়েটি বেশ কিছুটা সামলে উঠেছে– এখন খাওয়া দাওয়া করতেও পারে।

কিন্তু দেখা গেলো, খেতে পারছে না মেয়ে। টেবিলে বসলো, পাতে ভাত তুলে দেয়া হলে থালাখানা কাছে টেনেও নিলো। কিন্তু দু'তিন লোকমা মুখে দেয়ার পরপরই কেমন হাল ছেড়ে দেয়ার মতো হাত নামিয়ে রাখলো। বীথি দেখলো, রায়হান দেখলো, কিন্তু কেউই খাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করলো না। কেন করবে? প্রিয়জন মারা গেলে মানুষ কি স্বাভাবিক থাকতে পারে? দু'জনেই বোঝে, ওকে আরও কাঁদতে দেয়া উচিত– না কাঁদলে ও স্বাভাবিক হবে কীভাবে?

খাবার ঘর থেকে ওকে নিয়ে ফের বসার ঘরে বসানো হয়। বলে, তুমি এখানে বসো। আমি ওদিকটা দেখে আসি। শাহনি ছলছল চোখ তুলে তাকিয়ে বলে, আপনি আমার জন্য ব্যস্ত হবেন না– আমি ঠিক আছি।

বীথির বুকের ভেতরে ফের আবেগের তোলপাড় হয়। বলে, কোথায় ব্যস্ত হলাম– আমি ব্যস্ত হই নি। তুমি একটু শান্ত হয়ে বসো। ওদিকে রঞ্জু বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলো। বীথি ধমকের স্বরে ডাকলো, এই। এদিকে আয়। এর কাছে বস কিছুক্ষণ।

নিজের ঘরে গেলে রায়হান তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, কী বুঝলে, আগামীকাল নাগাদ সামলে উঠতে পারবে?

কী জানি, বীথি ঠোঁট ওল্টায়। বলে, যে নিয়ে এসেছে তারই না ওসব বুঝবার কথা! ওর তো দেখছি কোনো রকম গা নেই, ছেলেটা হাবা নাকি? একবার নিজের ঘরেও তো নিয়ে গেলো না– বীথির গলার স্বরে যেন খানিক কৌতুক এসে মেশে। রায়হান হাসে না, কিন্তু বলে, তাহলে ওকেই বলো, বাসায় নিয়ে এসেছে, ভালো কথা, বাপ মায়ের ওপর দায় চাপানো কেন, ও নিজেই সামাল দিক।

একটু থেমে বীথি মন্তব্য করে, কী জানি বাপু, আমি বুঝতে পারি না। হয়তো অমন ধরনের সম্পর্কই হয় নি, আমরা খামোকা ভেবে মরছি। আসলে এমনি এমনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

মায়া হয়েছে বলে নিয়ে এসেছে, আজকালকার ছেলেমেয়ে তো– কিছুই বোঝা যায় না।

আর ওই সময় আসে টেলিফোন, ফলে আলাপটা আর সামনের দিকে এগোয় না। রায়হান টেলিফোন ধরে কথা বলতে বলতে বিচিত্র ভঙ্গিতে স্ত্রীর দিকে তাকায়।

টাকা পয়সা আর চেক-এ পেমেন্ট আর মুহুরির দলিল লেখা এসব নিয়ে আলাপ শুরু হলে বীথির বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, আগামীকাল দলিল রেজিস্ট্রির ব্যাপারে কথা হচ্ছে– কিন্তু কথাটা হচ্ছে কার সঙ্গে, সেটাই সে আন্দাজ করতে পারে না।

কথা বলতে বলতে এক ফাঁকে রায়হান জিজ্ঞেস করে, তুমি কাল সাভারে যাচ্ছো, তাই না? বীথি মাথা নাড়ায়। বলে, নাহ্, কে বললো?

তুমি নাকি মিসেস সাদেককে কথা দিয়েছো যে যাবে?

বীথির মনে পড়ে। বলে, না যাবো বলি নি, বলেছি ছেলেদের সঙ্গে কথা বলে দেখি, ওরা যদি যায় তো দেখবো চেষ্টা করে। তা এখন তো নিজের চোখেই দেখছো কী অবস্থা। মেয়েটা অমন কান্নাকাটি করছে ওকে একা বাসায় রেখে কোথাও যাওয়া যায়? বলো, আমার কি সাজে বেড়াতে যাওয়া?

বীথি ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। বাইরে তখন বিকেলের শেষ আলো ওয়ারির গাছপালায় শেষ পরশ বুলিয়ে যাচ্ছে। একটা দোয়েল তখন দিনের শেষ ডাক ডাকছিলো। তবে বীথির কান-মন-নজর কিছুই থাকছিলো না বাইরের দিকে। তার কান পাতাছিলো বসার ঘরের দিকে– ওদিক থেকে ছাড়া ছাড়া অস্পষ্ট কথা কানে আসছিলো– বোঝা যাচ্ছিলো না কিছুই। একবার সে আড়চোখে দু'জনের দিকে তাকিয়ে দেখেও। বাতির আলোয় দু'জনকে পাশাপাশি দেখে বেশ লাগে তার। যদিও বাতি জ্বলছিলো, তবু মনে হয় রঞ্জুর পাশে মেয়েটিকে ভালোই মানাবে। কিন্তু খুশি হতে পারে না সে, বরং খটকা লাগে। আসলে কি তেমন কোনো সম্পর্ক গড়েই ওঠে নি এখন পর্যন্ত? মনে মনে ছেলেকে সে বকে, গাধা কোথাকার! সোফার দু'দিকে দু'জনে কেমন বসে আছে– ওরে হাবা, হাত ধরে সান্ত্বনা দে, মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বল, চেখের পানি মুছে দে– শোকের সময়ই তো মানুষের আপনজন হয়ে ওঠার সুযোগ বেশি থাকে।

রায়হানেরও খুব মায়া হচ্ছিলো শাহনিকে দেখে। একেকবার মনে হচ্ছিলো, সে নিজেই ওকে যশোরে পৌছাবার ব্যবস্থাটা করে দেয়। কিন্তু কী করবে! তখন তার শিরে সংক্রান্তি অবস্থা। দলিল রেজিস্ট্রির ঝামেলা ঘাড়ের ওপর চেপে রয়েছে। গতকাল ঝামেলা গেছে লেনদেনের ব্যবস্থাটা পাকা করতে। আজ সকালটা ব্যস্ত ছিলো মুহুরিকে নিয়ে দলিলের মুসাবিদা নিয়ে। বিকেল থেকে ফের সে অস্থির হয়ে পড়েছে– কখন দলিল লেখক অভিমন্যু দাস দলিলের খসড়াটা এনে তার হাতে দেয়। কারণ ওই খসড়া নিয়ে তাকে ছুটতে হবে মাহফুজের কাছে। মাহফুজই তাকে সাবধান করে দিয়েছে– ওদিকে জমি রেজিস্ট্রির সময় নাকি দলিলে নানা ফাঁক-ফোকর রেখে দেয়া হয়– পরে জমির ক্রেতা নানান ঝামেলায় পড়ে যায়– অমন কথার পর মাহফুজকে দলিলের খসড়া না দেখিয়ে পারে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

অভিমন্যু দাস এসে পৌছায় একেবারে সন্ধ্যার সময়– তখন পাশের মসজিদে আজান হচ্ছে। রায়হান রীতিমতো বিরক্তি প্রকাশ করে। বলে, এতোক্ষণে সময় হলো আপনার, বলেছিলাম না বিকেলে আসবেন।

হ্যাঁ স্যার বলছিলেন তো, কিন্তু রাস্তায় তিন জায়গায় জাম, আমার কি দোষ– সায়েন্সল্যাবরেটরীর মোড়ে একবার, তারপর প্রেসক্লাব, সেখানে দেখি আওয়ামী লীগ মীটিং করে– শ্যাক হাসিনার ভাষণে খুব তেজ স্যার, তারপর ফের বায়তুল মোকাররমের উত্তর গেট– সেইখানে মৌলবি সায়েবগো ভীড়– পুরা দুইটা ঘন্টা লাগলো রায়ের বাজারে থেইকা আসতে।

রায়হান মানুষটার শুদ্ধ ভাষায় কথা বলার চেষ্টা দেখে মজা পায়। বলে, মিটিং শুনলেন না ?

নাহ্ ওই সব শুনে আমাগো প্যাটে ভাত জুটবে, বলেন ?

রায়হান খসড়াটা নিয়ে টেবিলের ওপর রাখে। তারপর খুব মনোযোগ দিয়ে পড়ার চেষ্টা করে। লক্ষ্য করে এই দলিলের গৎ যেন একটু অন্যরকম। দলিল দাতা আর দলিল গ্রহীতা দুই পক্ষে নির্দিষ্ট করে চুক্তিপত্রের মতো সাজিয়ে জমির বিবরণ আর লেনদেনের শর্তগুলো লেখা।

থানা সাভার চাষী ডাঙা জমি বিক্রয়ের সাফ কবালা, মূল্য, ১,০০,০০০/- এক লক্ষ টাকা।

জনাব মোহাম্মদ রায়হান আলী পিতা মরহুম জনাব মোহাম্মদ মোর্শেদ আলী প্রধান সাং দিনাজপুর শহর। হালসাকিন লারমিনি স্ট্রীট, পোঃ উয়ারী, থানা সূত্রাপুর, জিলা ঢাকা দক্ষিণ, জাতি মুসলমান, পেশা চাকুরি। দলিল গ্রহীতা।

জনাব মোহাম্মদ কুতুবউদ্দিন বেপারি, পিতা মরহুম জনাব মোহাম্মদ খবিরউদ্দিন বেপারি, মৌজা ফুলবাড়িয়া, ইউনিয়ন ঐ, পোঃ ঐ, থানা সাভার, জিলা ঢাকা, জাতি মুসলমান, পেশা গৃহস্থী। দলিল দাতা।

কস্য দখলিয়া স্বত্বের ডাঙা জমি বিক্রয়ের সাফ কবালা দলিল পত্রমিদং কার্যাঞ্চাগে আমি ২৪-৪-৪৮ ইং তারিখে সাভার সাব রেজিস্টারি অফিসে রেজিস্টারিকৃত ৩৭২৪ নং সাফ কবালা মূলে সাভার থানার এলাকাধীন ফুলবাড়িয়া মৌজা নিবাসী মৃত জনাব শ্রী কৃষ্ণমোহন ঘোষের ওয়ারিশান সূত্রে মালিক ও দখলদার জনাব শ্রী ললিতমোহন ঘোষ-এর নিকট হইতে খরিদ সূত্রে মালিক ও দখলদার থাকাবস্থায় নিম্ন তফশিল বর্ণিত জমি অন্যের নিরাপত্যে ও নির্বিবাদে ভোগ দখল করিয়া আসিতেছি। বর্তমানে অর্থের বিশেষ প্রয়োজন হওয়ায় আমার স্বত্ব দখলিয় নিম্ন তপশিল বর্ণিত জমির ৪ কাঠা পরিমাণ জমি বিক্রয়ের ঘোষণা দিলে আপনি দলিল গ্রহীতা ইহা খরিদ করিতে ইচ্ছুক হইয়া বর্তমান বাজার দরানুসারে ইহার সর্বোচ্চ মূল্য ১,০০,০০০/- এক লক্ষ টাকা বলিলে আপনার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া অদ্য তারিখে হাজিরানে মজলিসের মোকাবেলা ধার্য্যকৃত মূল্যের সম্যক মং ১,০০,০০০/- এক লক্ষ টাকার ব্যাংক ড্রাফট (ব্যাংকের নাম....নং....) আপনার নিকট হইতে বুঝিয়া পাইয়া নিম্ন তফশিল বর্ণিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

জমি আপনার নিকট সাফ বিক্রয় করিয়া ইহার দখল অদ্য তারিখে আপনার বরাবরে বুঝাইয়া দিয়া পুত্র পৌত্রাদি ওয়ারিশান ও স্থলবর্ত্তী গণক্রমে সম্পূর্ণরূপে নিঃস্বত্ববান হইলাম।

এই পর্যন্ত পড়ে রায়হান, তারপর আর পড়ার দরকার মনে করে না। তবে দাগ নং খতিয়ান নং এবং চৌহদ্দী ঠিকমতো লেখা হয়েছে কিনা সেটা দেখে নেয়। দলিলপত্র কীভাবে লেখা হয় সেটা তার ভালোভাবে জানা না থাকলেও মনে হয় দলিলের মুসাবিদা সম্ভবত ঠিক মতোই করা হয়েছে। তবু সে অভিমন্যু দাসকে জিজ্ঞেস করে, দলিলে সব কিছু ঠিক ঠিকমতো উল্লেখ করেছেন তো?

জবাবে অভিমন্যু হাসে। বলে, কী যে বলেন স্যার, আমি ছয়তিরিশ বছর ধরে এই কাজ করতেছি, কেউ আমার লিখা দলিলে কুনো ভ্যাজাল বাইর করতে পারে নাই।

রায়হান লোকটার ঘোলাটে চোখের দিকে তাকিয়ে বলে, আমি কিন্তু উকিলকে না দেখিয়ে রেজিস্ট্রি করবো না।

হ্যাঁ, অবশ্যই দেখাইবেন, ক্যান দেখাইবেন না, তবে ওই যে বললাম, ছয়তিরিশ বছরের এক্সপিরেন্স কুনো জজ বালিস্টার আমার দলিলে ভুল পায় নাই– একবার কী হইল শুনেন– অভিমন্যু দাস নিজের কৃতিত্বের গল্প ফাঁদতে চায়। বলে, সেবার হইল কি– নয়ারহাটের মাতবর তালেবালি মুনশি জমি কিনবো এক হিন্দু বাবুর। তখন কিন্তু বুজেন ইণ্ডিয়া-পাকিস্তান যুদ্ধের পর শত্রু সম্পত্তি আইন পাস হইয়া গেছে– আমারে কইলো অকুরু দত্তের জমি কিনুম, ব্যবস্থা কইরা দ্যাও। মুনশি আমার বন্ধু মানুষ আর অকুরু দত্ত মশয়রে আমি কাকা ডাকি– কাকারও আমার উপ্রে বহুত ভর্সা– তখন দিলাম একখান ব্যাক ডেট-এর দলিলের ব্যবস্থা কইরা– সেই জমি মুনশি এখনও ভোগ করতেছে। কুনোদিন কুনো ভ্যাজাল হয় নাই।

অভিমন্যু দাসের কথা রায়হানের ভালো লাগে না। লোকটাকে পাক্কা ধড়িবাজ মনে হয়। তাকে পরের দিন সকালে আসতে বলে সে মাহফুজের কাছে যাবার জন্য তৈরি হয়। এই সময় বীথি এসে সামনে দাঁড়ায়। বলে, এই যে শুনছো, তোমার ছেলে টাকা চায়।

কিসের টাকা? রায়হান বুঝতে পারে না, মাসের শেষে টাকা দরকার কেন? সে জানতে চায়। বলে, টাকা দিয়ে কী করবে জিজ্ঞেস করেছো?

প্রশ্নের জবাব দিতে বীথি ইতস্ততঃ করতে থাকলে রায়হানের বিরক্তি লাগে। বলে, কী যে বলো না তুমি, কিছু বোঝা যায় না– ও কি বই টই কিনবে? ওদের ডাক্তারি বইয়ের যা দাম!

না বই নয়, বীথি জানায়, মেয়েটির কাছে নাকি টিকিটের পয়সা নেই– তাই–

ও! রায়হান একটু যেন হাসি চাপে। বলে, তা দিয়ে দিতে টাকাটা, কতো আর লাগবে, শ'দুয়েক বোধহয়– ও টাকা তো তোমার কাছেই আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

না, তা নয়, বীথিও হাসি চাপে। বলে, তোমার কাছে কে টাকা চাইলো, মনে হলো, কথাটা তোমাকে জানানো দরকার।

রায়হান স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে কয়েক মুহূর্তের জন্য স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। মনের ভেতরে কেউ যেন জিজ্ঞেস করে, মনে আছে তোমার ? পাবনা কলেজে ইন্টারভিউ দিতে যাবার সময় তোমার হাতে টাকা ছিলো না– গলার চেন থেকে লকেট খুলে বিক্রি করে দিয়েছিলো বীথি– তখনও কিন্তু বিয়ে হয় নি তোমাদের, মনে পড়ে ?

বীথিরও কেমন অদ্ভুত লাগে। ছেলের কাণ্ড দেখে দু'জনেরই মনে থিতিয়ে যাওয়া পুরনো স্মৃতি নাড়া খেয়ে তোলপাড় করে ওঠে আর সেটাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তারা অনুভব করে।

এক সময় বসার ঘরের দিকে তাকিয়ে জানতে চায় বীথি, মেয়েটাকে কেমন লাগছে তোমার ? ভালো না ?

ভালো তো বটেই, রায়হান হাসতে হাসতে বলে, কিন্তু আসলেই দু'জনের মধ্যে কিছু ঘটেছে কিনা সেটা আগে জানো– মোহনগঞ্জে কী কাণ্ড ঘটিয়ে এসেছে তোমার ছেলে, সেটা তো জানো। চিনুর মেয়ের সঙ্গে অমন চিঠি লেখালিখি– কিন্তু শেষে কী হলো ? দেখো ভালো করে খোঁজ নিয়ে।

কথাটা বলেই সে বেরিয়ে পড়ছিলো– ওই সময় ফের বাধা– রঞ্জু এসে দাঁড়ায় সামনে। বলে, আব্বা, আমি শাহনিকে কাল সকালেই যশোরের বাসে তুলে দিচ্ছি–

পারবে ও একা যেতে ? রায়হান ছেলের মুখের দিকে তাকায়। দেখে খুবই শান্ত আর স্বাভাবিক ভাব তার সারা মুখে– লজ্জা, সঙ্কোচ, আবেগ কিছুই নেই সেখানে। একটা সমস্যার সমাধান কীভাবে হতে পারে সেটাই যেন জানাচ্ছে। তবু রায়হান নিশ্চিত হতে পারে না। তার তখনও মনে হচ্ছে, ছেলে বোধহয় মেয়েটির সঙ্গে যশোর পর্যন্ত যেতে চায়। তাই ফের সে জিজ্ঞেস করে, তুমি শিওর ও একলাই যেতে পারবে ?

তা পারবে, রঞ্জু জানায়।

তুমি গিয়ে পৌঁছে দিতে পারতে না ?

রঞ্জু ফের স্বচ্ছ হাসে। বলে, নাহ্ কী দরকার, খামোকা বেশি খরচ– তাছাড়া ও তো সেই ফার্স্ট ইয়ার থেকেই একাই যাওয়া আসা করে। অসুবিধা তো কিছু নেই– দিনে দিনেই পৌঁছে যাবে।

অমন কথার পর আর কী বলার থাকতে পারে। সে আর কথা বাড়ায় না। বীথিকে ডেকে বলে, আমি মাহফুজ-এর কাছে যাচ্ছি, তাড়াতাড়িই ফিরবো।

বীথির হাবভাব দেখে কিছুটা হতাশ মনে হয়। রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে বীথির কথাই ভাবে সে। মেয়ে মানুষ আসলে একটু বেশি বেশি কল্পনা করতে ভালোবাসে। কী একটুখানি দেখেছে কি না দেখেছে, তাতেই খামোকা ভেবে বসে আছে যে তার ছেলে সহপাঠিনী মেয়েটির প্রেমে একেবারে গলা পর্যন্ত ডুবে আছে। যখন সত্যি সত্যি দেখবে যে ছেলে প্রেম করছে, তখন খুশিতে পাগল না হয়ে যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

অবশ্যি ওর পক্ষেই অমন আবেগপ্রবণ হওয়া সম্ভব– সে নিজে কি পারবে অমন হতে ? তার মনের ভিতরে প্রশ্ন ওঠে। পারবে তুমি রায়হান ? সে জবাব পায় না। বরং মনের ভেতরে মেরির মুখ ভেসে উঠতে দেখে।

মাহফুজ দলিলের মুসাবিদাটা মনোযোগ দিয়ে দেখে। দেখতে দেখতেই বলে, হিন্দু ভীড রাইটার, তাই না ?

রায়হান হসে। বলে, কেমন করে বুঝলে ?

মুসলমানি কেতা বেশি দেখে– হিন্দু নামের আগে শ্রী না লিখে জনাব লিখেছে।

দলিল লেখার হয়তো আজকাল এমনই রীতি হয়েছে, রায়হান অনুমান করে বলে।

আরে নাহ্, মাহফুজ জানায়। এটা এক ধরনের মাইনরিটি কমপ্লেক্স আর কি ? দেখো না আজকাল হিন্দুরা কেমন সুন্দর করে সালাম আলায়কুম জানায় ? মাহফুজ কাগজের ওপর আঙুল দিয়ে দেখায়। দেখো, কী লিখেছে– স্বর্গীয় চিহ্ন দিয়েছে প্রথমে, তারপর জনাব শ্রী দুই-ই বসিয়েছে– দেখো তুমি ভালো করে।

রায়হান দেখে একনজর। কিন্তু প্রশ্নটাকে সে অন্যভাবে দেখতে পায়– ব্যাপারটা মাইনরিটি কমপ্লেক্স বলে তার মনে হয় না বরং মনে হয়, ব্যাপারটা রুচি, অভ্যাস আর কালচারের ওপর আগ্রাসন– ইণ্ডিয়াতে মুসলমানদের নামের আগে যে কারণে শ্রী বসানো হয়, এখানেও ওই একই কারণে হিন্দুদের নামের আগে জনাব বসানো হচ্ছে। সে বলে, তুমি ইণ্ডিয়ান রেডিও শোনো ? টিভি দেখো ?

হ্যাঁ, মাহফুজ মুখ না তুলে বলে।

ওরা যে মুসলমানদের নামের আগে শ্রী জুড়ে দেয়। সেটা লক্ষ্য করো নি ?

মাহফুজ এবার মুসাবিদা থেকে চোখ তোলে এবং হাসে। বলে, তুমি কম্যুনালিজম-এর কথা বলছো মনে হয় ? ও তর্কটা পরে একদিন করা যাবে– এখন দলিলের ড্রাফট নিয়ে কথা হোক। একটু থেমে সে ফের বলে, তুমি আমাকে একখানা বায়নাপত্র দেখিয়েছিলে, মনে আছে ?

হ্যাঁ, দেখিয়েছিলাম– তাতে কি ?

ওই বায়নানামায় উল্লেখ ছিলো সাদেক সাহেব দশ কাঠা, ওই একই দাগ নম্বর কিন্তু। ওই দশ কাঠা জমির বায়না করেছিলেন, টাকাও দিয়েছিলেন, বোধহয় পঞ্চাশ হাজার– ঠিক না ?

হ্যাঁ, দিয়েছিলেন, রায়হান স্বীকার করে।

ধরো জমি রেজিস্ট্রি হয়ে গেলো– দলিলও হলো দু'খানা, তারপর যদি সাদেক সাহেব একদিন দাবি করেন যে তোমার ওই ৪ কাঠা জমিও কেনার কথা তাঁর, অন্য কারুর নয়– তখন ?

রায়হানের কাছে যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত মনে হয় না ব্যাপারটা। তবু সে বলে, তাহলে কী করতে বলো ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ওই বায়নানামার রেফারেন্সটা তোমার দলিলে থাকতে হবে, পারলে তোমার দলিলে সাক্ষী হিসাবে সাদেক সাহেবের নাম সই করিয়ে নিও।

কিন্তু উনি তো, সাক্ষী হতে পারবেন না– উনি রেজিস্ট্রি অফিসে যাচ্ছেন না– অসুস্থ। বেডরিডেন–

তাহলে কে যাচ্ছেন ?

ওঁর স্ত্রী– দলিল সম্ভবত ওঁর স্ত্রীর নামেই হবে।

তুমি ঠিক জানো ? মাহফুজ দু'মুহূর্ত যেন চিন্তা করে। তারপর বলে, ওকে, ঠিক আছে, যার নামে ওই দলিল হবে– তার সই যেন তোমার দলিলে থাকে।

তাহলে ওই ভাবেই তুমি কথাটা ঢুকিয়ে দাও, রায়হান প্রস্তাব করে।

কীভাবে ? মাহফুজ হাসে। বলে, ওই বায়নানামার কপি লাগবে না ? কতো তারিখে বায়নানামা হয়েছিলো তোমার মনে আছে, কে কে ছিলো সাক্ষী, তুমি জানো ?

মাহফুজের কথা শুনে রায়হান বেশ অস্বস্তিতে পড়ে যায়। বলে, তাহলে কি কাল দলিল রেজিস্ট্রি বন্ধ থাকবে ?

আরে নাহ্, মাহফুজ ফের হেসে ওঠে। বলে, ঘাবড়াবার কিছু নেই– তোমার ওই ডীড রাইটারই পারবে– তুমি শুধু দেখে নিও বায়নানামার রেফারেন্সটা ঠিকমতো আছে কি না।

রায়হান খানিকটা আশ্বস্ত হয়। তারপর জানতে চায়, আর কিছু ?

নাহ্, এই-ই তো থাকে–

একটু থেমে ফের বলে মাহফুজ– কাজের কথা তো হলো, বলো তোমার আর কী খবর।

আমার আবার কী খবর থাকবে– চলে যাচ্ছে দিন কোনোরকমে।

আচ্ছা, মাহফুজের গলার স্বর খুব অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠে। বলে, তোমাদের কী মনে হয় ?

রায়হান সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিতে পারে না। মাহফুজ যে হঠাৎ রাজনীতির ভেতরে ঢুকে যাবে, সে আন্দাজ করতে পারে নি ? বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে কয়েক মুহূর্ত তারপর বলে, দেখো, অন্য সাংবাদিকরা কী ভাবছে জানি না, তবে আমার মনে হয় এরশাদ আরও কিছুদিন ক্ষমতায় থাকবে। অপোজিশন কি সত্যি সত্যি চায় যে ও ক্ষমতা থেকে সরে যাক ? যদি চাইতো, তাহলে কি গত বছরের ইলেকশন-এ যেতো ? বলো ?

মাহফুজ অনিশ্চিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ায়। বলে, ওই একটা ঘটনাই কি যথেষ্ট মনে হয় তোমার কাছে ? যাতে বলা যায় যে মেইন অপোজিশন এরশাদকে হটাতে চায় না ?

আমার তো তাই মনে হয়, যেখানে বারবার বলা হয়েছে যে ক্যান্টনমেন্ট থেকে এসে যারা ক্ষমতা নিয়েছে তাদের সঙ্গে কোনোরকম আপোস নেই। সেখানে ওই একই ক্ষমতাধরদের অধীনে নির্বাচনে কেমন করে যায় ? বিশেষ করে যখন কেয়ারটেকার গভর্ণমেন্টের অধীনে নির্বাচনের জন্য আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

না রায়হান, মাহফুজ একইভাবে ফের মাথা ডাইনে বাঁয়ে নাড়ায়। বলে, তোমার কথাগুলো বিএনপি সাপোর্টারদের মতো শোনাচ্ছে– ব্যাপারটা অমন সরল বলে আমার মনে হয় না। তোমরা লেফ্‌টরা কীভাবে বিএনপিকে সমর্থন করো, আমার মাথায় ঢোকে না।

রায়হান আন্দাজ করে, বেশ জমিয়ে তর্ক করার জন্য মাহফুজ তৈরি হয়ে আছে। কিন্তু তার তো সময় নেই– কারণ ওদিকে অভিমন্যু দাস ৮টার দিকে দলিলের ড্রাফটটা নিতে আসবে। সে ঘড়ির দিকে তাকায়– দেখে ৮টা বাজতে দেরি নেই। মাহফুজের প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়েও সে কেমন যেন থমকে যায়। সম্ভবত মাহফুজ সেটা লক্ষ্য করে। বলে, কী হলো ? এনিথিং রং ?

না, তেমন কিছু না, রায়হান হাসে। বলে, আমাকে কেন লেফ্‌ট ভাবছো, বুঝছি না– আর আমি বিএনপিকে সমর্থন করি, সে খবরটাই বা তুমি কোথায় পেলে ?

আমি তোমাকে মীন করি নি, মাহফুজ বিষয়টা ব্যাখ্যা করতে চাইলে রায়হান বাধা দেয়। বলে, আজ থাক মাহফুজ, আমার এক্ষুণি যাওয়া দরকার, ডীড রাইটার ওদিকে হয়তো এতোক্ষণে বাসায় এসে বসে আছে।

মাহফুজেরও খেয়াল হয় ব্যাপারটা। সে আর কথা না বাড়িয়ে উঠে দাঁড়ায়। বলে, ঠিক আছে, তর্কটা ভবিষ্যতের জন্যে তোলা রইলো, তুমি কেটে পড়ো এবার– কাল ঠিকমতো রেজিস্ট্রি হলো কি না খবরটা আমাকে জানিও।

দরজার মুখ পর্যন্ত এগিয়ে দিতে দিতে ফের দাঁড়ায় মাহফুজ। বলে, একটা কথা, আচ্ছা সুশীল সমাজ মানে কী, জানো ? কথাটা আজকাল খুব শুনছি– পারলে ও ব্যাপারে খোঁজ নিয়ে ব্যাপারটা আমাকে জানিও তো।

রাস্তায় ফেরার পথে অনেক পুরনো কথা মনে পড়ে। মাহফুজরা পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তির সমর্থনে একবার মিছিল বের করার উদ্যোগ নিয়েছিলো, বামপন্থীদের ভারতের দালাল আর বিশ্বাসঘাতক বলতো উঠতে বসতে– মধুর ক্যান্টিনে সে কী তর্ক দিনের পর দিন। নির্মল সেনরা খুব চেষ্টা করেছিলেন যাতে দুই ছাত্র সংগঠন মিলে কাজ করা যায়, কিন্তু ওই একটা ইস্যুর জন্যেই বেচারিদের পরিশ্রম মাঠে মারা যায়। তার মনে হয়, কথাটা মাহফুজকে জিজ্ঞেস করা উচিত। কেননা ঐ উদ্যোগের বিরুদ্ধে মাহফুজই ছিলো খুব বেশি তৎপর। তাহলে বামদের ব্যাপারে তার এ্যালার্জি কি এখনও যায় নি ? সিপিবি মোজাফ্‌ফর ন্যাপদের সঙ্গে গলাগলি হয়ে চলবার পরও কেন সেই পুরনো খোঁচাটা দেয় ?

পল্টনের মোড়ে এসে রিকশা নেয়। ব্যাংকের সামনে দিয়ে আসতে আসতে গেটের দিকে তাকায়। কাল সকালে প্রথম কাজ ব্যাংক ড্রাফট্‌টা করা। সেটা ঠিক ঠিক মতো হয়ে গেলে সে মেরিকে ফোন করে জানিয়ে দেবে কখন সে রওনা হচ্ছে। কারণ বাহারউল্লাহ মুনশির কাল সকালে মেরিদের ওখানে অপেক্ষা করার কথা। ব্যস, এই তো সকাল বেলার কাজ। সাভারে ওদিকে যা করার সবই করবে কুতুবউদ্দিন আর বাহারউল্লাহ। অভিমন্যু দাস যদি দলিলগুলো ১০টা/১১টার মধ্যে জমা দিতে পারে, তাহলে ২টা নাগাদ রেজিস্ট্রি অফিসের কাজ শেষ হয়ে যাবে। তারপরও হাতে অনেক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

সময় পাওয়া যাবে। সাভার থেকেই একজন আমিন যোগাড় করে যদি ফুলবাড়িয়া নিয়ে যাওয়া যায়, তাহলে জমি মাপজোক করে খুঁটি পোঁতার কাজটাই বা শেষ করতে কতোক্ষণ লাগবে ? খুব জোর ঘন্টা তিনেক ? তার মানে আগামী কালই জমি কেনার ব্যাপারটা চূড়ান্ত হয়ে যাচ্ছে। রায়হান কাজগুলো পরপর হয়ে যাওয়ার দৃশ্য কল্পনা ক'রে মনের দিক থেকে বেশ হালকা বোধ করে এবং বার দুই বুক ভরে নিঃশ্বাসও নেয়।

রিকশা ততোক্ষণে গুলিস্তানের ভিড়ে আটকে পড়েছে। রায়হানের মনে ফের খটকা লাগে। যা ভাবছে, যদি সেই মতো কাজগুলো না হয়! হয়তো আমিন আর লেবার যোগাড় হলো না– কিংবা মেরি কোনো রকম ঝামেলা পাকিয়ে বসলো। কারণ ওর প্রস্তাব ছিলো, রায়হান যেন তাকে সঙ্গে করে সাভার নিয়ে যায়। যদি ওই ছুতো ধরে মেরি কোনো ঝামেলা পাকায়, তাহলে সব প্রোগ্রামই যাবে উল্টেপাল্টে। মহিলার মগজে উল্টোপাল্টা চিন্তা কেন যে ঘোঁট পাকায় সে বুঝে উঠতে পারে না। বীথির সঙ্গে অমন আদিখ্যেতা করে বাড়ি বয়ে এসে খাতির জমাবার মানেটা কী ? ফোনে প্রশ্নটা সে জিজ্ঞেস করেছিলো– কিন্তু মেরি জবাব দেবে কী ? খুশিতে আর আহ্লাদে একেবারে আটখানা– হাসতে হাসতে যেন মরে যাচ্ছিলো। শেষে জানালো, তোমার বউয়ের সঙ্গে একটা ভালো সম্পর্ক তো আমাকে রাখতেই হবে– কেন রাখতে হবে, বোঝো না ? তা না রাখলে আমি তোমার সঙ্গে মেলামেশা করবো কীভাবে। কথাটা বলে বটে, কিন্তু শুনে রায়হানের মনে হয় নি সে সত্যি সত্যি একটা পাকা সম্পর্কও রাখা দরকার। ঘনিষ্ঠ হওয়ার ঘটনাটা ঘটে যাবার পরও তার অমনই মনে হয়েছিলো। বিশেষ করে যখন মেরি নিজেই জানায় যে, তাকে তার স্বামী বহুবার ব্যবহার করেছে, তখন থেকে তার ধারণা ঘটনাটা একেবারেই সাময়িক উত্তেজনার। সুতরাং বীথির সঙ্গে আলাপ জমাতে যাওয়ার যে কারণই দেখাক, রায়হানের মনে হয় না– ওটা তার সম্পর্ক পাকা করার কৌশল। যদি হতো, তাহলে সে বীথিকে সাভারে নিয়ে যাবার জন্য নিশ্চয়ই পীড়াপীড়ি করতো।

রায়হান চিন্তাটাকে দূরে ঠেলে রাখতে চায়। এদিকে রিকশা জ্যামে এমনই আটকে গেছে যে, খুব শিগগির ছাড়া পাওয়ার সম্ভাবনা সে দেখতে পায় না। আগের দিনের মতো আজও সে নেমে পড়ে এবং ফুটপাত ধরে হাঁটতে শুরু করে।

কিন্তু স্বচ্ছন্দে হাঁটাও কি যায় ? ফুটপাত ভর্তি ফলের দোকান– ভিড় ঠেলে হাঁটাও মুশকিল। রাস্তায় অমন ঠাসাঠাসি ভিড় আর বাস ট্যাক্সি রিকশার জ্যাম দেখে তার ফের পুরনো দিনের কথা মনে পড়ে। ১৯৫৬/৫৭ সালে কি কল্পনা করা যেতো যে, এমনভাবে মানুষ আর যানবাহনে জমাট বাঁধা ভিড় সর্বক্ষণ গুলিস্তান এলাকায় থাকবেই? বরং অনেক লোককে বলতে শুনেছে, কেন বেশি টাকা পয়সা খরচ করে এতো চওড়া রাস্তা বানানো হচ্ছে– পয়সা পাওয়া গেলেই কি উন্নয়নের নামে অপচয় করতে হবে ?

ফুটপাতের শেষ মাথায় গিয়ে সে দু'মিনিট দাঁড়ায়, সামনেই ছিলো রেলগেট। ট্রেন যাবার সময় রেলগেট বন্ধ করে দেয়া হতো, তাতে দু'দিকে ভিড় জমতো বটে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

তবে বাধা তুলে নেয়ার দশ মিনিটের মধ্যেই ফের রাস্তা ফাঁকা হয়ে যেতো। সে বাঁয়ে মুখ ফিরিয়ে তাকায়, একটা দুর্গন্ধ তার নাকে আসে। লক্ষ্য করলেই দেখতে পায়, পাবলিক টয়েলেট বানানো হয়েছে বাঁয়ে। তার স্মরণ হয়, এখানেই ছিলো গভর্ণর হাউসের গেট– একসার সেপাই, তা জনা দশেক তো হবেই, রাইফেল ঘাড়ে দিনরাত চব্বিশ ঘন্টা পাহারা দিতো– বিদেশী অতিথি এলে ঘোড়সওয়ার সেপাহীদের দেখা যেতো। এখন সেই গেট সরে গেছে আরও পেছনে– মাঝখানের জায়গাটা হয়েছে পার্ক– মূল গেটের সামনে দিয়ে এখন গাড়ি চলাচল নিষেধ। মানুষকেও চলাচল করতে দেয়া হয় না। রায়হানের মনে পড়ে ১৯৬৯ সালে গণঅভ্যুত্থানের আগে ডঃ হুদাকে গভর্ণর করা হলে তিনি গভর্ণর হাউসের গেটের সামনের রাস্তা সাধারণ মানুষের ব্যবহারের জন্য খুলে দেন। মাস খানেকও গভর্ণর থাকতে পারেন নি ডঃ হুদা– পরে রাস্তা আবার বন্ধ হয়ে যায়। পাকিস্তানের শেষ রক্ষার জন্য ডঃ হুদাকে গভর্ণর বানানো হয়েছিলো– ডঃ হুদা গভর্ণর থাকেন নি এবং পাকিস্তানেরও শেষ রক্ষা হয় নি।

রায়হানের হাসি পায় এই ভেবে যে, পাকিস্তান আমলের শেষ দিকে অল্প ক'দিনের জন্য হলেও গভর্ণর হাউসের সামনের রাস্তা খুলে দেয়া হয়েছিলো। কিন্তু এখন স্বাধীন বাংলাদেশে ঐ একই দালানের নাম রাষ্ট্রপতি ভবন হলেও সেই রাস্তা সাধারণ মানুষের ব্যবহারের জন্য খুলে দেয়ার কথা কেউ ভাবতেও পারে না।

মোড় পার হতে হতে রায়হানের মাথায় একটা চিন্তা ঢুকে যায় 'রাষ্ট্রপতি ভবনের গেট' নাম দিয়ে কি একটা স্টোরি করা যায় না ? ১৯০৫ সালের পর থেকে গভর্ণর হাউসের বিবরণ তো একেবারে সংক্ষিপ্ত কিছু নয়। কথাটা তার মনে হয় বটে। কিন্তু স্টোরিটা করবে কে, সেটাই সে ভেবে পায় না। মনে মনে খোঁজে তরুণ সহকর্মীদের মধ্যে কাউকে, কিন্তু কাউকে সে খুঁজে পায় না।

বারো

সব কিছু ঠিক ঠিক মতোই হয়। দলিল লেখানো হয়েছিলো মাহফুজের পরামর্শ মতোই। সাব রেজিস্ট্রারটি বয়সে তরুণ, রায়হানের সাংবাদিক পরিচয় জেনেই সম্ভবত একটু যেন খাতির করলো। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ার পর দলিলখানা পেশকারের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বললো, খতিয়ান নং, দাগ নং, চৌহদ্দী ঠিক মতো লেখা হয়েছে কিনা দেখে নিন– আগের দলিলের রেফারেন্স স্পষ্টভাবে দেয়া হয়েছে কিনা তাও দেখবেন।

বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। একখানা হেলান দেয়ার বেঞ্চি পাতা ছিলো দেয়াল ঘেঁষে। সেখানে কয়েকজন মহিলা বসে ছিলেন। কাজ শেষ হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও মেরি ওখানেই বসে সম্ভবত অপেক্ষা করছিলো। রায়হানকে একইভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সাব রেজিস্ট্রার ফের বলে, আপনি কতোক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবেন, আপনি একটু বাইরে গিয়ে বসুন। এখানে তো দেখছেন, বসার মতো জায়গা নেই– দরকার হলে আমি আপনাকে ডাকবো। রায়হানের বিরক্তি লাগছিলো, কিন্তু তবু সে নিজের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

শান্ত ভাবটা বজায় রাখে। হাসি মুখে বলে, আমার কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। আমি ঠিক আছি, আমাকে আর কী করতে হবে বরং সেটা বলুন।

সাব রেজিস্ট্রার পেশকারের এগিয়ে দেয়া ফাইলটা চোখের সামনে মেলে ধরে হাসে। বলে, না, আপনাকে কিছু করতে হবে না, আপনি শুধু সামনে উপস্থিত থাকবেন– এই পর্যন্ত বলে ভদ্রলোক মুখ তুলে চারদিকে একনজর তাকিয়ে, গলা চড়িয়ে জিজ্ঞেস করে, জমি বিক্রি করছে কে ?

জ্বে, আমি। কুতুবউদ্দিন দু'পা এগিয়ে সামনে গিয়ে দাঁড়ায়।

কার কাছে ?

জ্বে, ইনির কাছে– রায়হান আলী সাহেবের কাছে।

সাক্ষী ?

কুতুবউদ্দিনের দুই সঙ্গী দু'পাশে গিয়ে দাঁড়ায়।

আপনার নাম ?

জ্বে, ফাতু মুনশি। দাড়িঅলা লোকটি জানায় ?

বাড়ি কোথায় ?

জ্বে, ফুলবাইড়া।

মনিরুদ্দিন কে ?

জ্বে, আমি। বাঁ দিকের লোকটি জানায়।

কোথায় থাকেন ?

সাভার টাউনে থাকি স্যার আমি।

কুতুবউদ্দিন ব্যাপারী জমি বিক্রি করছেন। আপনারা জানেন ?

জ্বে।

জমি কতোখানি ?

চার কাঠা।

দাম ?

এক লাখ।

সাব রেজিস্ট্রার দলিলখানা তুলে ধরেন। বলেন, এই সই দু'টা আপনাদের ?

জ্বে।

সাব রেজিস্ট্রার এবার কুতুবউদ্দিনের দিকে আঙুল তুলে জিজ্ঞেস করে, আপনি টাকা পেয়েছেন ?

জ্বে।

দেখি ?

কুতুবউদ্দিন ব্যাংকের ড্রাফখানা এগিয়ে ধরে।

ব্যস, আপনাদের কাজ শেষ। সাব রেজিস্ট্রার চেয়ারের পিঠে হেলান দিয়ে বলে, এবার আপনারা যেতে পারেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

রায়হান ধন্যবাদ জানিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেলে মেরি ছুটে গিয়ে রায়হানের পাশে দাঁড়ায় এবং তার হাত ধরে।

দু'জনে পাশাপাশি হেঁটে অফিসের সামনে খোলা জায়গায় দাঁড়ায়। রায়হানের বুক ভরে নিঃশ্বাস নিতে ইচ্ছা করে। ওই সময় বাহারউল্লাহ মুনশি এগিয়ে আসে। হাসিমুখে বলে, স্যার শুকুর আলহামদুলিল্লাহ কইছেন ? না কইলে এইবার কন।

আসলেই রায়হানের বিশ্বাস হতে চায় না। সে জমি কেনার কাজটা সত্যি সত্যি তাহলে শেষ পর্যন্ত করতে পারলো! কতোদিন ধরে মনের ভেতরে ইচ্ছেটা তৈরি হয়েছিলো, তার নিজেরই জানা ছিলো না– জমি কেনার কথা কেউ বললে সে গা করতো না। এমনভাব দেখাতো যে মনে হতো, বাড়িঘর জমিজমা কেনাকিনিটা তার কাছে খুবই তুচ্ছ একটা ব্যাপার। অথচ যখনই দেখতো, বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে কেউ জমি কিনছে, কি বাড়ি করছে তখনই তার মেজাজ খারাপ হয়ে যেতো। বাড়িঘর করাটা যে খুবই হীন কাজ সেটা প্রমাণ করার জন্য একশ' একটা যুক্তি খুঁজে বের করতো।

আর আজ! জমি কেনার পর নিজেকে ভারমুক্ত মনে হচ্ছে। বাড়িঘর না-থাকাটাই কি তাহলে বোঝা আর পীড়ন ? বাড়িঘর হয়ে গেলেই কি মুক্তি ? বাড়িঘরকে তাহলে প্রোপার্টি বলা হয় কেন ? প্রোপার্টি যদি এক্সপ্লয়টেশনের সুযোগ করে দেয়, তাহলে আমিও কি এক্সপ্লয়টেশনের সুযোগ পাবো ? বাড়িঅলা আমাকে এক্সপ্লয়েট করছে– যদি আমার নিজের বাড়ি না থাকে তাহলে বাড়িঅলার এক্সপ্লয়টেশনের শিকার হতে হবে আমাকে সারা জীবন। তাহলে ?

রায়হান দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নানান চিন্তার মধ্যে ঘুরপাক খায়। মেরি ততোক্ষণে ঘনিষ্ঠ জনের মতো একেবারে গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে হাত ধরে ঝাঁকুনি দেয়– এই শুনছো, এখন কোন দিকে যাবে ?

মুনশি মুখোমুখি দাঁড়ানো তবু যদি সঙ্কোচ বলে কিছু থাকে মেরির। রায়হান প্রথম দিকে খেয়াল করে নি, কিন্তু মুনশির দিকে নজর পড়লে তার খেয়াল হয়। দেখে লোকটা তার দিকে অদ্ভুত নজর মেলে তাকিয়ে আছে। তার মনে হয়, ব্যাপারটা নিশ্চয়ই ভালো দেখাচ্ছে না। সে মেরির কাছ থেকে সরে দাঁড়ায়।

মেরি সম্ভবত লক্ষ্য করে। সে ফের কাছে এসে দাঁড়ায়। রায়হানের বাহু ধরে হাঁটতে হাঁটতে নিচু গলায় বলতে থাকে, এখন চেষ্টা করলেও কি আর দূরে সরিয়ে দিতে পারবে ? তোমার বউ বললো, শিগগির বাড়ির কাজ আরম্ভ হবে তোমাদের, আমিও কিন্তু দেরি করবো না। বুঝেছো ? তখন কী করবে ? রোজ একবার করে দেখা হবেই।

রায়হান কান দিতে চায় না। কিন্তু তবু তার কানে আসতে থাকে খানিক পুরুষালি খসখসে রমণী কণ্ঠের স্বর। সে ডাইনে বাঁয়ে তাকায় কেউ মেরির কথা শুনছে কিনা। মুনশির সঙ্গে চোখাচোখি হলে সে ত্রস্তে নজর সরিয়ে নেয়। তাতে রায়হানের অস্বস্তি আরও বেড়ে যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

মেরি একটু পরই আরও এক নাটকীয় কাজ করে। রায়হান কয়েক পা এগিয়ে গিয়েছিলো ট্যাক্সি ভাড়া করার জন্যে। ওই মুহূর্তে পেছন থেকে ডাকে। দুলাভাই, ও দুলাভাই। মেরির গলায় অমন অদ্ভুত সম্বোধন শুনে রায়হান ঘুরে দাঁড়ায়।

মিষ্টি কিনতে হবে না ? মেরি বলে, সুখবরটা নিয়ে বাড়ি যাবো আর সাভারের মিষ্টি নিয়ে যাবো না ? এ কি হয় ? পেছনে তাকিয়ে মুনশিকেও বলে, আপনারাও চলুন, এতো বড় একটা শুভ কাজ হলো, মিষ্টি না নিলে চলে ? বলতে বলতে সে দ্রুত পায়ে এগিয়ে রায়হানের হাত ধরে এবং সামনে দাঁড়ানো এক রিকশায় তাকে ঠেলে তুলে নিজেও উঠে তার পাশে বসে। বলে, এবার খুশি তো ?

তার মানে ? রায়হান বুঝতে পারে না।

মানে আবার কী! মেরির দু'চোখে খুশি আর কৌতুক জ্বল জ্বল করে। বলে, তোমার গা ঘেঁষে হাঁটছি, তোমার হাত ধরছি, ঘাড়ে মাথা এলিয়ে দিচ্ছি এসব লোকে দেখছিলো বলে তোমার সঙ্কোচ হচ্ছিলো তো ? এখন আর হবে না– শালী-দুলাভাইয়ের সম্পর্ক থাকলে তো ঘনিষ্ঠ হয়ে চলা ফেরা করতেই পারে– পারে না ? বলো, পারে কিনা ?

রিকশা দু'খানার বাজারে পৌঁছতে বেশি সময় লাগে না।

মিষ্টিও কেনা হয়ে যায় অল্পক্ষণের মধ্যে। ছোট প্যাকেট দুটো মুনশি আর কুতুবউদ্দিনের হাতে তুলে দেয় মেরি। বড় প্যাকেট দুটো দোকানদারের কাছে রেখে দিয়ে বলে, আমরা একটু নদীর ঘাটের দিকে যাবো– অনেক দিন পরে এলাম একটু ঘুরে আসি।

হ যান, ক্যান যাইবেন না– কুতুবউদ্দিন সানন্দে উৎসাহ জোগায়। বলে, নৌকায় কইরা এট্টু ঘোরাঘুরিও করতে পারেন।

মুনশি জিজ্ঞেস করে, ও স্যার আমরা কী করমু– আমারে কি থাকতে কন ?

নাহ্ আপনার থাকার কী দরকার– মেরি হাত নাড়িয়ে জানায়।

শেষ দুপুরে বাজারের ভাঙা অবস্থা– বেলা ২টায় কি আর ভিড় থাকে ? সুতরাং দু'সারি দোকানের মাঝখান দিয়ে রাস্তা পার হওয়া গেলো সহজেই। মেরি তখনও শক্ত করে রায়হানের হাত ধরে আছে। এক সময় বললো, এই তুমি এভাবে গোমড়ামুখো হয়ে আছো কেন ? একটু ফ্রী হলে কী হয় ? একটাই তো মাত্র দিন বাপু– রোজ তো আর এভাবে দেখা পাওয়ার সুযোগ হয় না।

রায়হান হাসে জবাবে। সে বোঝে তার হাসিখুশি থাকা উচিত, কারণ অন্যায় কিছু তো কেউ করছে না– কিন্তু তার ওই বোঝা পর্যন্তই। সে পারে না। মনের ভেতরকার জড়তাটা যেন তার আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। তার মন কিছুতেই হালকা হয় না।

নদীর ঘাটে পারাপারের খেয়া নৌকো ছাড়াও কয়েকখানা নৌকো ভাসতে দেখা গেলো। বেশ সুন্দর মতো ছইঅলা নৌকো পছন্দ করে দরদাম মেরিই ঠিক করলো। কথা হলো, এক ঘণ্টা তারা নৌকায় করে ঘুরবে। নৌকোয় ওঠার পর দেখতে না দেখতে নৌকো স্রোতের উজানে চলতে শুরু করলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

মাঝি দাঁড় বায় না, লগি দিয়ে ঠেলে। পানির মৃদু শব্দ শোনা যায়। নৌকোর নিচে স্রোত ধাক্কা দিচ্ছে, তাই অমন আওয়াজ।

সূর্য বেশ হেলে পড়েছে– যদিও রোদের তেজ বেশি এবং গরমও খুব। দূর থেকে ঢাকের আওয়াজ কানে এলে রায়হান বেশ অবাক হয়। দুর্গাপূজার সময় না ঢাকের বাদ্যি বাজে, এখন বাজছে কেন ? সে মাঝিকে জিজ্ঞেস করে, ও মাঝি, বাজনাটা কিসের ?

পূজার স্যার, দেবীপূজার।

পূজা কি এসে গেলো ? সে ফের জিজ্ঞেস করে।

স্যার আইজ তো আশ্বিনের তিন– জাইল্যা পাড়ার পোলাপান প্র্যাকটিস করতেছে– অরাই তো সবগিনি পূজায় ঢাক বাজাইবো।

নদীর পানিতে স্রোত ভালোই– বাতাসে তোলা খুদে খুদে ঢেউ নৌকার পাটাতনে যে আঘাত করছে তাতে তবলার বোলের মতো আওয়াজ উঠছে। নদীর ওপারে জমির আলে কাশফুলের শাদা শাদা শীষ বাতাসে হেলে হেলে একেকবার মাটি ছুঁয়ে যাচ্ছে। ছইয়ের নিচে বসার ব্যবস্থাটা ভালোই। মেরি একেবারে রায়হানের কোলে মাথা রেখে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লো।

রায়হান সহজ হতে চাইলে কী হবে– পারে না। মেরি কেন এতো বাড়াবাড়ি করছে তার কারণ সে কিছুতেই আন্দাজ করতে পারে না। থেকে থেকেই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে।

একবার বলতে শুরু করলো, জানো, আমি আজ খুব খুশি– এতো খুশি আমি জীবনে কখনো হই নি। এক তো ভয় ছিলো, সাদেক আসার জন্যে জেদ না ধরে– আমি যা করি, তাতেই ওর সন্দেহ। গতকাল সারাদিন চেঁচিয়ে পাড়া মাত করে রেখেছিলো– মুখ দিয়ে গোঁ গোঁ আওয়াজ বের হয় শুধু– বলতে চায়, আমি নাকি ওর জমি নিজের নামে করে নিচ্ছি। সকালে যখন দলিলটা পড়ে শোনানো হলো– তখন থেকে শান্ত। কিন্তু আমার তখন নতুন দুশ্চিন্তা– তোমার বউ না এসে পড়ে। যদিও বলেছিলো আসবে না, কিন্তু ওই টাইপের মেয়েদের আমি একদম বিশ্বাস করি না। মুখে বলবে একরকম আর করার বেলায় করবে অন্যকিছু। বলতে বলতে সে খুব ত্বরিৎ গতিতে রায়হানকে চুমু খেয়ে বসে বার দুই।

রায়হান শুধু অপ্রস্তুত নয়, কিছুটা দুশ্চিন্তাও হয় তার। এ পর্দাঅলা ছই-এর নৌকোটা পছন্দ করেছে কোন উদ্দেশ্যে কে জানে। সে মনে মনে কিছুটা অসহায়ও বোধ করে। এবং কথাটা সে না বলে পারে না। বলে, দেখো, আমাদের কিন্তু সাবধান হওয়া উচিত। বেশি ইমোশনাল হয়ে পড়লে কখন কে কী দেখে ফেলবে কিছু বলা যায় না।

আরে নাহ্! রায়হানের দুশ্চিন্তার কারণটা সে হেসে উড়িয়ে দিতে চায়। বলে, এখানে আমাদের কে চেনে ? আমরা যে স্বামী-স্ত্রী নই, এটা কি ওরা কেউ জানে ? আসলে তুমি খামোকা ভয় পাচ্ছো– এতো ভীতু কেন তুমি ? পুরুষ মানুষের একটু সাহস না থাকলে চলে ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

রায়হান শুনে যায়। মেরি যাই বলুক, ওর কথামতো সাহস দেখাতে সে কখনোই যাবে না। সে নজর মেলে ধরে বাইরে। নদীর পাড়ে চরে বেড়ানো গরু-ছাগল দেখে। দু'টি বাচ্চা মেয়েকে দৌড়াতে দেখে। নীল আকাশে শাদা মেঘ ভাসতে দেখে। পাশ দিয়ে একখানা নৌকো যায় তা-ও দেখে। ওই নৌকোর যাত্রীদের একজন তাদের মাঝিকে ডেকে বলে, ও-ই মিয়া, জলদি ঘাটে যাও, দ্যাহো কারা য্যান তোমার সওয়ারি গো বিসরায়। রায়হানের খটকা লাগে– কে খুঁজবে তাদের ? মুনশি ? নাকি কুতুবউদ্দিন ? কিন্তু কেন ? সে কারণ খুঁজে পায় না। নাকি মেরির খোঁজ করছে কেউ? কিন্তু মুনশি আর কুতুবউদ্দিন ছাড়া আর অন্য কেউ তো জানে না যে তারা নৌকোয় চেপে বেড়াতে বেরিয়েছে। নৌকোর মাঝি ডেকে বলে, স্যার হোনলেন তো, কারা য্যান আপনেগো বিসরাইতে আইছে ঘাটে।

মেরি কথাটা শোনে কি না বোঝা যায় না। সে ফের দু'হাতে রায়হানের দু'হাত ধরে কাছে টানে। বলে, তোমার হয়তো বিশ্বাস হবে না– কিন্তু আমার কী মনে হয় জানো ? রায়হান মুখের দিকে তাকালে বলে, তোমার জন্যেই আমি অপেক্ষা করে ছিলাম সারা জীবন। জানি, আমার কথা তোমার বিশ্বাস হবে না। কিন্তু সত্যিই আমার অমন মনে হয়– এখনও হচ্ছে। তোমাকে আমি পুরোপুরি পাবো না– বিশ্বাস করো। অমন দাবিও আমি কখনও করবো না, তবে যতোটুকু পাবো, যতো অল্প সময়ের জন্যেই হোক, তাতেই আমার চলবে। আমি আজকাল ভাবি। আমার জীবন এমন কেন ? আমার যা সাধ, তা কেন কখনোই পূরণ হয় না ? কেন আমার কপালে এসে জোটে ভুল মানুষ ? কেন আমার জীবনে ঘটে ভুল ঘটনা ? কেন আমাকে করতে হয় ভুল কাজ ?

মেরির অমন কথার পিঠে কিছুই বলতে পারে না রায়হান। কী বলবে ? একজন মাঝবয়সী মহিলা যদি আবেগের ঘোরে পড়ে যায়, আর আবেগগ্রস্ত হয়ে আক্ষেপের কথা বলতে থাকে, তখন সঙ্গী পুরুষ মানুষের বলার কি কিছু থাকে ? সে শুনে যায়।

বলতে বলতে একসময় রায়হানের কব্জি ঘুরিয়ে সময় দেখে মেরি। তারপর বলে, আচ্ছা, এখন তো মোটে সাড়ে তিনটে বাজে– আমরা ৭টা/৮টা পর্যন্ত একসঙ্গে কাটাতে পারি না ? এমন সুযোগ আবার কবে পাবো তার কিছু ঠিক আছে, বলো পারি না ?

এই রকম ? নৌকোয় ভাসতে ভাসতে ? রায়হানের হাসি পায়। বলে, লোকে জানতে পারলে দু'জনকেই পাগলা গারদে রেখে আসবে।

না, নৌকোয় না, মেরি প্রায় ফিসফিস করে বলে, ধরো ঢাকায় ফিরে গেলাম– কিন্তু বাসায় না গিয়ে উঠলাম এয়ারপোর্টের কাছাকাছি কোনো হোটেলে। বললাম, সন্ধ্যার ফ্লাইটে চিটাগাং যাবো, তার আগে ঘন্টা দু'তিন বিশ্রাম দরকার– কি বলো, এমন কিছু বলে থাকা যায় না হোটেলে ?

অস্ফুট উচ্চারণে অমন এক মতলব শুনতে শুনতে রায়হানের রক্তেও যেন সাড়া জাগে। একটু একটু উত্তেজনা বোধ করে সে। মেরির ওপরে তুলে ধরা চকচকে মুখ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

তার কাঁধ দু'খানি, স্ফীত বুক– সব একসঙ্গে যেন তার মুখের ওপর এসে ঝাপটার মতো লাগে। তার বুকের ভেতরে কেউ যেন ফিসফিস করে বলে, হ্যাঁ, পারা যায় তো অমন একটা ব্যবস্থা করতে– কে জানছে ? সে মেরির চোখে চোখে তাকিয়ে বলে, তুমি সত্যি সত্যি ওভাবে সন্ধ্যার পরও বাইরে কাটাতে পারবে ? বাড়িতে তোমার মেয়েদের কাছে কী বলবে ? ওদের বাবা চ্যাঁচামেচি করবে না ?

মেরি রায়হানের হাত দু'খানি গালে ঠোঁটে কপালে থেমে থেমে ছোঁয়ায়। বলে, ওসব তো রোজই হয়, আমি বাইরে বেরুলে নানান প্রশ্ন করে– ওদের বাবার মুরোদ নেই তবু চ্যাঁচায়, আধঘন্টার জন্যেও যদি ১ তলায় কি ৩ তলায় যাই তাহলে ভাবে আমি কারুর সঙ্গে শুতে গিয়েছিলাম।

এক মুহূর্ত থেমে ফের বলে মেরি, ওসব নিয়ে আমি আজকাল আর চিন্তা করি না। ধরে নিয়েছি, ওসবই আমার কপাল– পরশুদিন যে দুপুর বেলা তোমাদের বাসায় গিয়েছিলাম, তাই নিয়ে চন্দনার কতো প্রশ্ন। আজ বরং প্রশ্ন-ট্রশ্ন কম করবে, কারণ জানে, বড় রকমের একটা ঝামেলার কাজ সারতে এসেছি– কী বলো, যাবে ?

রায়হানের চোখের ওপর চোখ রাখে মেরি। তার চোখে কী দেখে, ভাল করে বুঝতে পারে না রায়হান। তার মুখ দিয়ে কথা বের হয় না– উচিত হবে কি যাওয়া ? বারবার সে একই ধরনের ঘটনার সঙ্গে নিজেকে জড়াবে ? তারপর ? তারপর কী হবে? এই বয়সে পৌঁছে সত্যি সত্যি সে একটা সীজন্‌ড লম্পট হয়ে উঠবে ?

কী ভাবছো তুমি ? মেরি ফের রায়হানের হাত টেনে নিজের গালে মুখে ছোঁয়ায়। চুমু খায়। তারপর বলে, বেশিক্ষণ তো না– ঘন্টাখানেক সময় কি দেড় ঘন্টা, দু'জনে একসঙ্গে কাটাবো– বলো যাবে ?

রায়হান লম্বা নিঃশ্বাস নিয়ে বলে, ঠিক আছে, চলো এবার তাহলে ফেরা যাক। সে মাঝিকে নৌকো ফেরাতে বলে।

এবার নৌকো ভাটিতে স্রোতের টানে ভাসে– মাঝিকে লগি ঠেলতে হয় না। সে গলুইয়ে বসে গুনগুন করে গান ধরে। বর্ষা চলে গেলে কী হবে। নদীর পানি এখনও ঘোলা ঘোলা। এখানে ওখানে পানা, ঘাস পাতা, খড়কুটো ভেসে যেতে দেখা যায়। কলাপাতার কয়েকটা টুকরো আর কয়েকটা হলদে রঙের কলকে ফুল ভাসতে দেখা গেলো এক সময়। তার মানে কাছাকাছি বোধহয় কোথাও বোষ্টমদের আখড়া আছে। রায়হানের ঐ মুহূর্তে নিজেকেও অমন স্রোতে ভাসমান মনে হয়। সেও তো স্রোতের মধ্যে পড়ে গিয়েছে, সেও তো ভাটার দিকে ভেসে চলেছে। পরিণতিতে যে কোথায় ঠেকবে তার কিছুই সে জানে না।

ওদিকে মেরি নিজের যতো পুরনো কথা সব বলে চলেছে। জানো, আমি জানতামই না প্রেম হওয়া কাকে বলে, এখানে ওখানে শুধু গল্প শুনতাম যে ওই মেয়েটা প্রেমে পড়েছে, কি অমুক ছেলে অমুক মেয়ের জন্যে পাগল হয়ে উঠেছে– গল্পের বইটাই ততোদিনে পড়েছি, কিন্তু প্রেমে পড়লে কী হয় তার কিছুই জানতাম না। চিন্তা করো, কেমন হাবা ছিলাম। ষোল পার হয়ে সতেরোতে পড়েছি। সবে কলেজে ফার্স্ট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ইয়ার, ঐ সময় হুট করে বিয়ে হয়ে গেলো। সাদেকের তখন তিরিশ। কিন্তু হলে কী হবে, দু'জনে পাশাপাশি দাঁড়ালে কেউ বুঝতো না যে দু'জনের বয়সে এতো ফারাক, আমার গড়নটা প্রথম থেকেই বেশ বাড়ন্ত। প্রথম রাতে এমন জন্তুর মতো ব্যবহার করলো যে আমার রীতিমতো ভয় ধরে গেলো। ভাবীকে বলে ফেললাম, অমন মানুষের সঙ্গে কেমন করে সারাটা জীবন কাটাবো ? শুনেছিলাম, নতুন বিয়ে হওয়ার পর মেয়েরা নাকি স্বামীর পথ চেয়ে বসে থাকে। কিন্তু আমার বেলায় হলো উল্টো। আমি ছুতো খুঁজতাম, যাতে দূরে থাকা যায়। যতোদিন বাপের বাড়ি ছিলাম, ততোদিন এটা ওটা ছুতো দেখিয়ে দূরে সরে থাকতাম। কিন্তু যখন ঢাকায় নিয়ে এলো, তখন কোনো ছুতোই আর টিকলো না– প্রত্যেক রাতে মনে হতো, আমাকে রেপ করা হচ্ছে, বুঝলে? এই হলো আমার পুরুষ মানুষের অভিজ্ঞতা।

রায়হান মেরির পরের অভিজ্ঞতা শোনার জন্যে মনে মনে তৈরি হয়– সাদেক যে তার চাকরিতে উন্নতির জন্যে বউকে ব্যবহার করেছে, সেই অভিজ্ঞতার কথাও দু'একটা বলুক মেরি। সে জিজ্ঞেস করে, তারপর ?

তারপর আবার কী ? পুরুষ মানুষের সঙ্গে মেলামেশার অভিজ্ঞতা আমার ওই রকমই। কোনো না কোনো মতলব পেছনে থাকতোই। শুধু তুমিই দেখলাম অন্যরকম। তোমাকে যেদিন দেখলাম– ইশ্, দেখো– মেরি কনুই উঁচিয়ে বাহু তুলে ধরে রায়হানের চোখের সামনে– তারপর বলে সেদিনের কথা মনে হলে এখনও আমার গায়ে কেমন কাঁটা দিয়ে ওঠে।

রায়হান চশমাসুদ্ধ চোখ নামায় তার বাহুর চামড়ার কাছাকাছি কিন্তু সেখানে কাঁটা দেওয়ার ঘটনা তার চোখে পড়ে না।

প্রথম দিন দেখেই আমার মনে হয়েছিলো, তোমাকে আমার পেতে হবে– জানতাম, তোমাকে পুরোপুরি পাওয়া যাবে না, তুমি অন্যের, তোমার সংসার আছে, বউ ছেলেমেয়ে আছে, কিন্তু তবু মন মানলো না– তাছাড়া এটা দেখবার ব্যাপারও ছিলো।

একটু থেমে ফের বলে মেরি, দেখতে ইচ্ছে হয়েছিলো, যাকে আমার ভালো লাগছে, সেই পুরুষ মানুষকে আমি এই বয়সেও জয় করে নিতে পারি কি না।

রায়হানের ভালো লাগে না শুনতে– বেশ বিরক্তি লাগে। সে ভেবে পায় না, কী ভাবে মেরি তাকে জয় করে নিয়েছে। কথাটা জিজ্ঞেস করবে ভাবে– কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রবৃত্তি হয় না। সে ফের বাইরের দিকে নজর রাখে– দূরে নদীর ওপারে পাড় বেয়ে একসার মানুষকে হেঁটে যেতে দেখে– ঘাড়ে বোঝা কারুর, কেউ সাইকেলের পেছনে কী যেন বেঁধে নিয়ে চলেছে। একজনকে দেখা গেলো দড়ি বাঁধা অবস্থায় একটা ছাগল টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছে। সে আন্দাজ করে, নিশ্চয়ই কাছাকাছি কোনো হাট আছে।

এই, কী দেখো ওদিকে, এ্যাঁ ? মেরি ঘাড়ে হাত রেখে ঝাঁকুনি দিলে রায়হান মুখ না ফিরিয়ে বলে, না, তেমন কিছু না।

তাহলে মুখ ফিরিয়ে রেখেছো কেন ? আমার দিকে তাকাও– তাকাও আমার দিকে ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

রায়হান অমন পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও মুখ না ফেরালে মেরির গলায় আহত হওয়ার স্বর শোনা যায়। বলে, আমি কি দেখতে খারাপ ? বলো, আমার বয়স কি খুব বেশি হয়ে গেছে ?

একটু থেমে ফের বলে মেরি, দেখো, তুমি যদি আমাকে এখন অবহেলা করো, তাহলে কিন্তু আমি যাচ্ছেতাই কাণ্ড করে বসবো– হুঁ, তখন বুঝবে মজা। মেরির চোখেমুখে রীতিমতো উত্তেজনা দেখা যায়। তার ঘাড় কাত করে রাগী চোখে তাকিয়ে থাকা, নাকের পাটা যেন ফুলে ফুলে উঠছে– নিঃশ্বাসও যেন নিচ্ছে ঘনঘন– এসব দেখে রায়হান সহজ ভাবে হাসতে চেষ্টা করে। মেরির ঘাড়ে হাত রেখে বলে, তুমি অমন করছো কেন ? এখন আর ওসব উল্টো পাল্টা কথা বলার কোনো মানে হয় ? বলো ? যা হবার তাতো হয়েই গেছে।

তার কথায় মেরি কিছুটা যেন শান্ত হয়। ঐ সময় মাঝি কাকে যেন চিৎকার করে ডেকে বলে– যা তুই ঘাটে যা, আমি আইতাছি–

রায়হান ছইয়ের বাইরে এসে দাঁড়ায় এবং অদূরেই ঘাট দেখতে পায়– আর সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষ ক'জনার দিকে নজর পড়লে তার মাথা ঝিম ঝিম করে ওঠে। আর একই সঙ্গে পেছনে মেরির গলা দিয়ে অস্ফুট আতঙ্কিত চিৎকার বের হয়। বলে, ওমা এখন কী হবে– হায় আল্লাহ, তোমার বউ কীভাবে এলো ? এ্যাঁ ? তুমি না বলেছিলে আসবে না ?

কিছুই বলতে পারে না রায়হান– তার চোখের সামনে শাড়ির হালকা সবুজ রং শুধু মানুষটাকে ঘিরে থাকে না, চারদিকের জমিজায়গা, ক্ষেতফসল, বাড়িঘর, গাছপালা, এমনকি দিগন্ত এবং আকাশ পর্যন্ত ছড়িয়ে যায়।

ইশ্ কি ভাববে। মেরি টানা বলে যেতে থাকে– কী লজ্জার কথা– এই বলো না, কী করবে এখন– আমার মাথায় তো কিছুই আসছে না।

রায়হান কি জানে, ওই মুহূর্তে সে কী করবে ? মুখোমুখি হওয়া ছাড়া আর অন্য কিছু কি করার সুযোগ আছে তার ? সে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে এবং নৌকোটা খুব স্বাভাবিক গতিতে ঘাটে গিয়ে ভিড়লে সে সবিস্ময়ে বলে ওঠে, আরে তোমরা কোনদিক থেকে ?

রায়হান ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে বলতে নৌকো থেকে নামে। আর তার পিছনে মেরি– আরে আপনি। সত্যি সত্যি এসেছেন– ইশ্ যদি সঙ্গে থাকতেন তাহলে কী মজাটাই না হতো– আর এ কে ? নিশ্চয়ই রঞ্জু– বাহ্ এতো সুন্দর দেখতে! চলুন না আপা নৌকোয় চেপে আরেকবার ঘুরে আসি– ও ভাই, ও দুলাভাই, সারাটাক্ষণ তো বলছিলেন, রঞ্জুর মা এলে খুব ভালো হতো– এই তো এসেছেন– এবার মাঝিটাকে বলুন না– সবাই মিলে এবার ওই দিকটা দেখে আসি।

বলতে বলতে দারুণ উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে মেরি। বীথির হাত ধরে টানতে আরম্ভ করে নৌকোয় ওঠার জন্য। টানতে টানতেই বলে মিষ্টি কেনার সময় শুনলাম নদীটা নাকি একেবারেই কাছে চলে এসেছে– এতো দেখতে ইচ্ছে করলো যে কী বলবো– ছেলেবেলাতে আমি নদীর ঘাটে পড়ে থাকতাম–

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বীথি খুব একটা অবাক হয় না। মহিলাকে প্রথম দেখে যে ধারণা হয়েছিলো সেটাই বরং আরও পোক্ত হলো। কিছুটা জেদী, কিছুটা আহলাদী, কিছুটা বেপরোয়া ধরনের মহিলা। মিসেস সাদেকের মতো এমন মহিলা সে আগেও দেখেছে– এদিকে আবার নিজের কর্তাটিকেও সে চেনে– চেপে ধরলে ছুঁচোও গেলানো যায়। সুতরাং মেরির টানাটানি আর অমন অনর্গল কথার তোড়ে তার আর উপায় থাকে না, সহজেই নৌকোয় উঠে যায়।

রঞ্জু গোটা ব্যাপারটা দেখছিলো, মহিলাকে সে আগে কখনও দেখে নি– অথচ ইনি আব্বা আর মায়ের সঙ্গে কবে থেকে কীভাবে ঘনিষ্ঠ হয়ে গেলেন সে ভেবে পায় না। গোটা ব্যাপারটাই খুব হঠাৎ করে ঘটছে বলে তার মনে হয়। জমি কেনার কথা হচ্ছে, সেটা সে জানতো, খুব শিগগির রেজিস্ট্রি হবে, তাও তার কানে এসেছিলো, কিন্তু সেটা যে আজই তা তার জানা ছিলো না। শাহনিকে নিয়ে তার গতকাল সারাটা দিন বিশ্রী ঝামেলা গেছে, বাড়িতে নিয়ে তোলার পর সে আরও বেকায়দায় পড়ে যায়। সে নিজে না হয় বান্ধবীর জন্য ঝামেলা পোহাল, কিন্তু তাই বলে সে বাড়ির লোকদের কেন ঝামেলায় ফেলবে?

আজ সকাল বেলা ওকে গাবতলী বাসস্ট্যাণ্ডে পৌছে ঝিকরগাছার বাসে তুলে দিয়ে তারপর সে নিষ্কৃতি পায়। তাও কি সহজে হয়েছে ব্যাপারটা। বাসের জন্যে তো এমনিতেই কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো– তারপর ঝিকরগাছার বাস যদিবা পাওয়া গেলো, তো চেনা মানুষ আর পাওয়া যায় না। পরে দেখা গেলো ড্রাইভার ভদ্রলোকই শাহনির ভালোমতো চেনা। বিদায় নেয়ার সময় সে রঞ্জুর হাত ধরে আর এক প্রস্থ কাঁদলো। বললো, তোমাদের বাড়ির সবাই এতো ভালো, ওরা আমাকে এতো আদর করলেন, আমি জীবনে ভুলবো না।

বাস ছাড়লে তারপর সে বাড়িমুখো রওনা হলো। বাড়িতে এসে দেখে মা বারান্দায় দাঁড়িয়ে। সে জিজ্ঞেস করে, ও মা, তুমি এভাবে দাঁড়িয়ে কেন, কেউ কি আসবে?

না, কেউ আসবে না– তোর আব্বা জমি রেজিস্ট্রি করার জন্যে সাভার গেলেন তো– আমাকে খুব করে যেতে বলেছিলেন ঐ মহিলা, মানে মিসেস সাদেক, যাঁর সঙ্গে মিলে আমাদের জায়গা কেনা হচ্ছে– তোর আব্বাও বলেছিলেন, গেলেই পারতাম, তাই না? একটু ঘুরে ফিরে আসা যেতো– মঞ্জু তো দেখলাম, ইউনিভার্সিটি গেলো না।

মায়ের কথায় আফসোসের মতো কিছু যেন ছিলো। রঞ্জুর তাতে খারাপ লাগে। সে তক্ষুণি বলে ওঠে, খুব তো বেলা হয় নি। এখনও তো যাওয়া যায়– চলো যাই, জায়গাটা আমারও তো দেখা হয় নি।

ছেলের অমন আগ্রহ দেখে বীথির তৈরি হয়ে নিতে আর কতোক্ষণ লাগে? দেখতে না দেখতে দু'জনে বাসা থেকে বেরিয়ে বেবিটেক্সিতে চেপে বসে তারপর বোধহয় ঘন্টাখানেক, সময় লাগে। রেজিস্ট্রি অফিসে খবর পাওয়া গেলো বাহারউল্লাহ মুনশির সঙ্গে এক সায়েব আর এক বিবি সায়েবকে বাজারের দিকে যেতে দেখা গেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বাজারের কাছাকাছি গেলে রাস্তাতেই দেখা হয়ে গেলো মুনশির সঙ্গে– তাকে ধরে নিয়ে ঘাটে আসা এবং তারপর এই কাণ্ড।

বীথির নজর বারবার স্বামীর মুখের ওপর গিয়ে পড়ে। তার অস্বস্তি বোধহয়, মানুষটাকে অমন দেখাচ্ছে কেন ? মনে হচ্ছে খুব যেন দুশ্চিন্তায় পড়েছে। কাছে গিয়ে যে জিজ্ঞেস করবে তার উপায় নেই, এদিকে মেরি একহাত দিয়ে আহলাদি ভঙ্গিতে তার গলা পেঁচিয়ে ধরে আছে। নৌকো ধীর স্রোতে ভাটির দিকে ভেসে চলেছে। রঞ্জু ওদিকে মাঝির সঙ্গে গল্পে মত্ত। রায়হান দূরে নজর মেলে রেখেছে, কী দেখছে, ও-ই জানে। বীথি নদীর পাড়ের দিকে তাকিয়ে দেখবার মতো কোনো জিনিসই খুঁজে পায় না। এদিকে মেরি ফের গল্প জুড়ে দেয়। বলে, এই নদীতে আপা শীতকালেও স্রোত থাকে। আমরা একবার নয়ারহাটের দিকে পিকনিক করতে এসেছিলাম– এই নদী থেকে ধরা প্রকাণ্ড একটা পাঙ্গাশ মাছ কিনেছিলো চন্দনার আব্বা– আজকাল বোধহয় তেমন মাছটাছ আর পাওয়া যায় না। আর একবার কী হয়েছিলো– যদি শুনতেন, আমার ছোটবোন বিনু সঙ্গে এসেছিলো সেবার, ওর তখনও বিয়ে হয় নি, ফরিদপুর শহরে রাজেন্দ্র কলেজে পড়ে, দুলাভাইয়ের সঙ্গে তো খুব ঠাট্টা করছে, ওই ঠাট্টা করতে করতেই দিয়েছে এক ধাক্কা, ব্যস, সায়েব পাড় বেয়ে গড়াতে গড়াতে একেবারে পানিতে। ও আবার সাঁতার জানতো না– আমার চ্যাঁচামেচিতে লোকজন ছুটে এসে মানুষটাকে পানি থেকে তোলে।

বীথির ভালো লাগে না– অমন গল্প শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিলো, গল্পটা তখন তখনই মহিলা বানাচ্ছেন। সে রঞ্জুকে ডেকে নৌকো ফেরাতে বলে, সেই সঙ্গে জমি দেখতে যাওয়ার কথাও স্মরণ করিয়ে দেয়।

রঞ্জুর কথা শুনে মাঝি রায়হানের দিকে তাকায়। তাকে সেও একই হুকুম করে। মনে মনে সে তখন বেজায় অস্থির, কতোক্ষণে অস্বস্তির পীড়ন থেকে ছাড়া পাবে। তার এমনিতেই চিন্তা হচ্ছে তখন। মাঝি লোকটা যে রঞ্জুর সঙ্গে এতোক্ষণ গল্প করলো, সে যদি বলে দিয়ে থাকে যে, প্রথম বিবি সায়েবের সঙ্গে সায়েবের ঘনিষ্ঠ হবার কেমন দৃশ্য সে দেখেছে ? বলতে কি পারে না ? খোলাখুলি কি আর বলবে যে বিবিসায়েব সায়েবকে চুমু খেয়েছে। ঠাট্টাচ্ছলে শুধু এইটুকু যদি বলে যে, সে ভাবতেও পারে নি যে, যে বিবি সায়েব সায়েবের সঙ্গে ছিলেন– তিনি সায়েবের স্ত্রী নন, তাহলেই তো রঞ্জুর মনে সন্দেহ জাগবে। ভাববে, নিশ্চয়ই এমন কিছু দেখেছে মাঝি, যাতে তার ধারণা হয়েছিলো যে, তার নৌকার সওয়ারী দু'জন স্বামী-স্ত্রী। যদি ছেলের মনে খটকা লাগে, তাহলে সে কীভাবে সেটা দূর করবে ? সে বারবার নজর ঘুরিয়ে ছেলের মুখের দিকে তাকায়।

তেরো

ক্লাস বেশ জমে উঠেছিলো। নজরুল স্যার আজ ফের সিলেবাসের বাইরে চলে গিয়েছিলেন। হিউম্যান হ্যাবিটেশনের বিষয়ে বলতে প্রস্তর যুগের কথায় চলে আসেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

তারপর সেই সূত্রেই মেগালিথ, মেসোলিথ আর মাইক্রোলিথ-এর কথা বলতে বলতে শুরু করেন। বিলেতের স্টোন হিনজ-এর ছবিটা দেখাতে দেখাতে হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসেন, সিলেটের জয়ন্তিয়া হিলস-এর কাছে একটা মেগালিথ টুম্ব আছে। তোমরা দেখেছো ? স্ট্রাকচারটা অনেকটা আমাদের শহীদ মিনারের মতো– তোমাদের মধ্যে সিলেটের কেউ নেই ?

প্রশ্নটা তাঁর মুখ থেকে শুধু বেরিয়েছে, আর ঠিক ওই মুহূর্তে একটি ছেলে ছুটে এসে ক্লাসে ঢোকে। এবং হাঁফাতে হাঁফাতে বলে, স্যার বাইরে খুব গোলমাল, গোলাগুলি হচ্ছে।

ছেলেটির কথা শুনে নজরুল স্যার হঠাৎ পাথরের মতো স্থির হয়ে যান। মুখের কথা তাঁর মুখেই থেকে যায়। সামনের দিকে কয়েকটি মেয়ে বসে। ওদের মধ্যে একজন, বোধ হয় রাখি, বলে ওঠে, স্যার দরজাগুলো বন্ধ করে দিলে ভালো হয়।

নজরুল স্যার ওই কথার পরও কিছু বলেন না, একই ভাবে দাঁড়িয়ে থাকেন। ওরই মধ্যে একটি ছেলে বলে ওঠে, গোলাগুলি তো স্যার এদিকে নয়– ওই শহীদুল্লাহ হল-এর দিকে, অন্য ডিপার্টমেন্টে ক্লাস চলছে।

ছেলেটির উঠে দাঁড়ানো, তারপর কথা বলা এসব স্যার দেখছেন কিনা, শুনছেন কিনা, কিছুই বোঝা যায় না– উনি একই ভাবে দরজার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকেন।

স্যার আমরা কি চলে যাবো ? একটি ছেলে পেছন থেকে জানতে চায়।

এবার যেন স্যার শুনতে পান। পাল্টা প্রশ্ন করেন, কোথায় যাবে ?

তাঁর কপালে ভাঁজ পড়ে, সারাটা মুখ চিন্তাক্লিষ্ট দেখায়। একটু থেমে ফের বলেন, এখন বাইরে বেরুনো ঠিক হবে না– একটু অপেক্ষা করে দেখো, কী হয়– কোন ঘটনা যে কী ঘটাবে, তার কি ঠিক আছে কিছু ?

মঞ্জু কান পেতে রাখে কিছুক্ষণ, কিন্তু গুলিটুলির আওয়াজ তার কানে আসে না। দু'বেঞ্চের ওপার থেকে রাখি মুখ ফিরিয়ে ডাকে। তারপর নিচু গলায় বলে, আমি তোমার সঙ্গে যাবো। আমাকে ফেলে যেও না।

তার মানে রাখি ভয় পেয়েছে, মঞ্জুর হাসি পায়। সাহসী মেয়েরা এখন সঙ্গী খুঁজছে। ওকে সঙ্গে নিতে মঞ্জুর আপত্তি নেই। কেন থাকবে ? ওয়ারী যাওয়ার পথেই পড়ে পুরানা পল্টন, ওকে ওদের বাড়ির কাছে নামিয়ে দিতে কী আর অসুবিধা! ওকে নামিয়ে দিয়ে ওই রিকশা নিয়েই সে বাড়ি যেতে পারে।

পাশের বেঞ্চের ফোরকান ফিসফিস করে বলে, এবার মনে হয়, এরশাদ পার্টির খবর আছে– অগো খেদাইবো।

মঞ্জুর মনে পড়ে, ফেরদৌস শহীদুল্লাহ হলের ছাত্র। তার একটু চিন্তা হয়, ওর ওপরেও কি হামলা হবে ? কে করবে হামলা ? সে মনে মনে হিসাব করে। ছাত্রলীগের দুই গ্রুপ, তারপর ছাত্রদল এদের কারুর সঙ্গেই তো ওর শত্রুতা নেই, বরং বলা যায় বন্ধুত্বই আছে– তাহলে ? কারা ওর ওপর হামলা করবে ? বরং তার মনে হয়, ওর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

দলেরই কয়েকজন ওকে পছন্দ করে না– কথাটা এই তো সেদিন বললো ফেরদৌস। বললো, আমাকে অন্য কেউ মারবে না, মারলে মারবে আমাদের দলের ছেলেদের মধ্যেই কেউ।

জগন্নাথ কলেজের পুরো গ্রুপটাই নাকি শহীদুল্লাহ হলের লিডারশিপ পছন্দ করে না। পুরনো ঢাকার নবাবপুর আর নয়াবাজার এলাকায় চাঁদা তোলা নিয়ে বিবাদ। ওদিকে আবার সোহরাওয়ার্দী কলেজের ছাত্ররাও একটা সমস্যা। সেখানেও মূল কারণ চাঁদা তোলা।

নজরুল স্যার কিছুক্ষণের জন্যে বসেছিলেন, কী মনে হলো, ফের উঠে দাঁড়ালেন। বাইরে ওই মুহূর্তে কোনো সাড়াশব্দ নেই। স্যার গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন, আমরা কি আলোচনাটা শেষ করবো?

তাঁর প্রশ্নের জবাবে কেউ কিছু বলে না– হ্যাঁ না, না-ও না, সবাই বেকুবের মতো স্যারের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

তাহলে আজ থাক, পরে কোনোদিন বিষয়টা নিয়ে কথা বলা যাবে– শুধু একটা কথা মনে রাখবে, নিউম্যান হ্যাবিটেশন সম্পর্কে ঢালাওভাবে কিছুই বলা যাবে না। মধুপুর বা সীতাকুণ্ড-এর নিওলিথিক কুড়াল যেমন হিসাবের মধ্যে রাখতে হবে, তেমনি হিসাবের মধ্যে রাখতে হবে ময়নামতি'র ফসিলাইজড কাঠের টুকরোগুলোকেও।

মঞ্জুর মনে হচ্ছিলো, স্যার বোধহয় ফের ক্লাসটা পুরোপুরি নিতে শুরু করেছেন। আরও কতোক্ষণ বলতেন, কে জানে, ওই সময়ই খুব জোরে একটা পটকার আওয়াজ শোনা যায়। ফলে তিনি ফের চুপ হয়ে যান। তাঁর চোখে মুখে বিরক্তির চিহ্ন ফুটে ওঠে। কিছুক্ষণ চুপ হয়ে থাকার পর বলেন, আমার মনে হয় না, এমন অবস্থায় ক্লাস নেয়া সম্ভব– তোমরা কি সেফলি বেরিয়ে যেতে পারবে?

পিছন থেকে ফোরকান বলে ওঠে, জ্বী স্যার পারবো, শহীদুল্লাহ হলে গোলমাল, এদিকে সব ঠিক আছে।

স্যার বোধহয় নিশ্চিত হতে পারেন না। বলেন, তোমরা একটু বসো। আমি বাইরটা দেখে আসি।

মিনিট পাঁচেক পরই ফিরলেন। বললেন, তোমরা বরং আজ চলেই যাও। এদিকে এখনও কিছু না হলে কী, পরে যে কিছু হবে না– তার গ্যারান্টি কী? চেয়ারম্যান বললেন ক্লাস বন্ধ করে দিতে।

ক্লাসরুম থেকে বেরিয়ে সবাই ব্যালকনিতে দাঁড়ায় প্রথমে। ফজলুল হক হল আর শহীদুল্লাহ হল-এর মাঝখানে পুকুরের পানিতে বাতাস লাগা ঝিলিমিলি ঢেউ দেখতে পাওয়া যায়। দক্ষিণ পড়ের রাস্তাটাও স্পষ্ট দেখা যায়, গাছের ডালপালাও দিব্যি হেলছে দুলছে– কিন্তু একটা লোক দেখা যায় না কোথাও– বাতাসে বারুদের গন্ধ ভাসছে এখনও। চারদিকটা যেন হঠাৎ চুপ হয়ে গিয়েছে। রাখি মঞ্জুর কনুই ছুঁয়ে বলে, এই তুমি কি এখন যাবে?

হ্যাঁ, চলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

দু'জনে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামে। তারপর বাঁয়ে মোড় নিয়ে কার্জন হলের পেছনকার ঘন গাছপালার ছায়ার নিচে চলে আসে। শেষে, ডাইনে বাঁয়ে তাকাতে তাকাতে পূর্ব গেটের দিকে ছোটে দু'জনে। গেটের মুখে পৌঁছে দাঁড়ায় এবং দেখে অদ্ভুত কাণ্ড। গেটের বাইরে সমস্ত কিছু স্বাভাবিক– ট্রাফিক পুলিশ, রিকশা, বেবি, চলন্ত বাস, মোটর গাড়ি, চিনেবাদাম, ফ্লাস্ক যাতে চায়ের ফেরিঅলা, এমন কি ভিকিরি পর্যন্ত।

রাখি রিকশা চেপে ডাকে, কই, এসো! যাবে না?

মঞ্জু ইতস্ততঃ করে। হোক ক্লাসমেট, তাই বলে এক রিকশায় দু'জনে পাশাপাশি বসবে? কোনোদিন কোনো মেয়ের সঙ্গে এমন পাশাপাশি বসেনি সে। দৃশ্যটা কল্পনা করে তার বেশ লজ্জাই লাগে।

আরে কি হলো? রাখি ফের তাগিদ দিলে সে রিকশায় গিয়ে ওঠে।

কার্জন হল থেকে পুরানা পল্টন কতোটুকুই বা দূর। দশ মিনিটও লাগল না পল্টনের মোড়ে পৌঁছতে। কিন্তু ওইখানেই আবার জ্যাম। তার আগেই রাখি আলাপ জমিয়ে ফেলে। প্রেসক্লাবের গেটে পৌঁছেই বলে, আমরা বোধহয় সেশনজটের মধ্যে ভালোভাবেই পড়বো। আমাদের সায়েন্স ফ্যাকাল্টিতে তো তবু ক্লাস হয়–ওদিকে আর্টস ফ্যাকাল্টিতে শুনি ক্লাসই হয় না– গতকালও তিমলিদের ক্লাস হয় নি।

তিমলি নামটা উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে মঞ্জু তার মুখের দিকে তাকালে রাখির হাসি পায়– বলে, কী হলো?

আচ্ছা, একটু থেমে সে ফের বলে, তুমি ওর নাম শুনলে রিঅ্যাক্ট করো কেন?

মঞ্জু খানিক অপ্রস্তুত হয়। তবু বলে, নাহ্ রিঅ্যাক্ট কেন করবো? আমাকে গণ্ডার বলেছে কিনা, তাই জিজ্ঞেস করতে চাইছিলাম।

রাখি হাসে। বলে, তোমার আন্দাজ ঠিক, যখনই দেখা হয়, তখনই জিজ্ঞেস করে, তোমাদের গণ্ডারটা কেমন আছে। পল্টনের মোড়ে জ্যাম-এ রিকশা আটকালে মঞ্জুর মুখের দিকে তাকিয়ে ফের বলে রাখি, মনে হয়, তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চায়।

কথাটা বলে মুখ টিপে হাসে রাখি।

মঞ্জু কিছু বলে না। তবে অনুমান করে, রাখি তাকে আর তিমলিকে জড়িয়ে মজার কোনো রকম মশকরা করবে। সে এ ব্যাপারে আর কথা বাড়ায় না।

জ্যাম খোলাসা হলে রিকশা ধীরে ধীরে মোড়টা পার হয়। পার হওয়ার সময় মঞ্জু জিজ্ঞেসা করে, এবার তো বাঁয়ে, তাই না?

না, সোজা।

মঞ্জু অবাক হয়। পুরানা পল্টনে তো বাঁ দিকের রাস্তা দিয়েই যেতে হয়। রাখির মুখের দিকে তাকালে দেখে, সে মুখ টিপে হাসছে।

কি ব্যাপার, তুমি বাসায় যাবে না? সে জিজ্ঞেস না করে পারে না।

রাখিই ঐ কথায় খোলামেলা হেসে ওঠে। সামনের দিকে নজর মেলে দিয়ে বলে, এখন না হয় না গেলাম আমাদের বাসায়– তোমাদের বাসায় গেলে কেমন হয়? তুমি নিয়ে যাবে না? নিয়ে গেলে অসুবিধা আছে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

মঞ্জু মনের ভেতরে রীতিমতো চমকায়। এ কেমন কথা বলছে মেয়ে ? সে মুখ ফিরিয়ে রাখির চোখের দিকে তাকায়। কিন্তু দেখে, নাহ্ খুবই স্বাভাবিক ভঙ্গি তার মুখে। কোনো রকম ভাবান্তর নেই। চোখেমুখে দুষ্টুমি ভরা হাসি একই রকম মিটমিট করছে। দুই চোখে আর গলার স্বরে কৌতুক নিয়ে মেয়েটা ফের বলে, কি হলো, কথা বলছো না কেন ? আমাকে নিয়ে যাবে না বাসায় ?

মঞ্জু হাসে। বলে, কেন নিয়ে যাবো না ? একশ' বার নিয়ে যাবো– কিন্তু তুমি কি সত্যি সত্যি যাবে ? যদি তোমার জাত চলে যায় ?

না, আমাদের জাত অতো সহজে যায় না, বুঝেছো ? দৈনিক বাংলার মোড়ে পৌঁছলে রাখি রিকশাঅলাকে বাঁয়ে যেতে বলে। মঞ্জুকে তখন বলতে হয়, আমি তাহলে এখানেই নেমে যাই।

কেন, এখানে কেন নামবে ? আমাদের বাসাটা অন্তত চিনে যাও।

রাখির কথা শুনে মঞ্জু মুখোমুখি তাকায়। রাখি ভারী স্বচ্ছ হাসি হাসে। চোখে চোখে তাকিয়ে বলে, বাসা চেনা থাকলে সুবিধা না, বলো ? কখন কী দরকার হয়, বলা যায় কিছু ? তোমাদের বাসাও তো বোধহয় কাছেই, তাই না ?

কথাটা অযৌক্তিক মনে হয় না মঞ্জুর, আসলেই তো ওয়ারি থেকে পুরানা পল্টন আর এমন কী দূর। পানির ট্যাংকের বাঁ দিকের গলিতে ঢুকবে। ঠিক ওই সময় সামনে, একেবারে মুখোমুখি একখানা মোটর বাইক দাঁড়িয়ে যায়। মুখের ওপর থেকে হেলমেট সরালে দেখতে পায়, ফেরদৌস তার দিকে তাকিয়ে। একটু যেন বেশি গম্ভীর। বলে, এদিকে কোথায় যাচ্ছিস ? মঞ্জু বেশ বিব্রত বোধ করে। কী বলবে বন্ধুকে। সে দু'জনকে পরিচয় করায়, এ হচ্ছে রাখি মিত্র– আর রাখি, এ আমার বন্ধু ফেরদৌস। বলে, রাখির বাবাও সাংবাদিক, আমার আব্বার বন্ধু– একটা বই আনতে যাচ্ছি ওদের বাড়ি।

কখন ফিরবি ? ফেরদৌস খুব শীতল গলায় জিজ্ঞাসা করে।

তা ঘন্টাখানেক দেরি হবে।

মঞ্জুর জবাব শুনে ফেরদৌস কিছু যেন ভাবে দুই মুহূর্ত। তারপর বলে, ঠিক আছে, বাসায় থাকিস, আমি আসছি।

কী যে হয় মঞ্জুর, সে হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসে, তুই হলে ছিলি ? গোলাগুলির সময় ?

ফেরদৌস কোনো জবাব দেয় না। ওদিকে পেছনে অনেক রিকশা দাঁড়িয়ে পড়েছিলো রাস্তা বন্ধ হয়ে যাওয়ায়। ফেরদৌসের বাইক পথ ছেড়ে এগিয়ে গেলে রাখির রিকশা ফের এগোয়।

তোমার বন্ধু ও ? রাখি জিজ্ঞেস করে।

হ্যাঁ, ছেলেবেলা থেকে– সেই কেজিতে যখন পড়তাম তখন থেকে।

ঐ জবাব শুনে রাখি আর কিছু বলে না। তবু মঞ্জু বলে, খুব ভালো ছেলে ছিলো, ৪টা লেটার ছিল এসএসসিতে– ওদের বাড়িতে গোলমাল– ওর বাবা মডেলদের ফটো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

তুলে বেড়ায়। ওদের সঙ্গে নানান জায়গায় ঘোরে ফেরে আর তাই নিয়ে ওর মায়ের সঙ্গে ঝগড়া– সেই জন্যে ও বাড়িতে থাকতো না– তারপরে–

কথা শেষ করে না মঞ্জু– তার দরকারও হয় না। রাখি বলে, ওকে অনেকেই ভয় পায়। আমার কিন্তু একটুও ভয় লাগে না– বরং কেমন যেন মায়া লাগে। মনে হয়, খুব যেন কষ্ট পাচ্ছে সর্বক্ষণ।

একটা বাঁক ফিরলেই রিকশা দাঁড় করায় রাখি। তারপর রিকশাঅলাকে টাকা দিতে দিতে বললো, কিন্তু ওকথা কেন বললে ওকে ?

কোন কথা ?

ঐ যে বললে, আমার বাবা আর তোমার বাবা দু'জনে বন্ধু।

বাহ্ বন্ধু হতে পারেন না ? মঞ্জু হাসে। বলে, দু'জনেই যখন সাংবাদিক–

হোক সাংবাদিক– এক প্রফেশনে থাকলেই কি সবাই সবার বন্ধু হয় ? এক ক্লাসে আমরা পড়ি– সবাই কি সবার বন্ধু ?

মঞ্জু জবাব দিতে পারে না।

তাছাড়া ওটাও তো বানানো কথা, তুমি তো সত্যি সত্যি বই নিতে আসো নি– মিছে কথাটা কেন বললে ?

রাখি প্রশ্নটা করে চোখে চোখে তাকায়।

মঞ্জু এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারে না। সে তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, এবার আমি যাই– বাড়ি তো চেনা হলো, পরে একদিন ফের আসবো।

বাহ্ এভাবে গেট থেকে চলে যাবে কেন ? রাখি মঞ্জুর হাত চেপে ধরে। বলে, বাবা বোধহয় বাসায়– আজ ওঁর অফ ডে– চলো।

রাখি হাত ধরে টানতে টানতে মঞ্জুকে নিয়ে গেট খুলে ভেতরে ঢোকে।

দরজা খোলাই ছিলো। প্যাসেজ দিয়ে যাবার সময় রাখি পর্দা তুলে ভেতরে উঁকি দেয়। দেখে বাবার সঙ্গে তাঁর দুই বন্ধু জমিয়ে আড্ডা দিচ্ছেন। রাখি ভিতরে চলে যাচ্ছিলো। ঐ মুহূর্তে ডাক– রাখি, রাখি। পর্দা সরিয়ে ভেতরে ঢুকতে হয় অগত্যা। প্যাসেজে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মঞ্জু শোনে, তার সম্পর্কেই কথা হচ্ছে। রাখিকে কৈফিয়ত দিতে হচ্ছে। রাখি বলছে, ও আমার ক্লাসমেট– ক্লাস হলো না, ভীষণ গোলাগুলি হচ্ছিলো তাই দু'জনে একসঙ্গে পালিয়ে এসেছি।

তা বাইরে দাঁড়িয়ে কেন, ভেতরে ডাক– ও বাবা, কী নাম তোমার ? ভেতরে এসো।

মঞ্জু ঘরের ভেতরে এসে দাঁড়ালে মাঝ বয়সী ভদ্রলোক, উনিই বোধহয় রাখির বাবা, মাথায় কিছু কাঁচপাকা চুল এবং টাক, মুখে পাইপ। বলেন, দাঁড়িয়ে কেন ? বসো।

মঞ্জু সোফায় বসলে পাশের ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করেন, তোমরা মনে হচ্ছে কাছেই থাকো।

জ্বী, ওয়ারী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

আচ্ছা, তৃতীয় ভদ্রলোক একটু যেন আগ্রহী হন। বলেন, ছেলেটিকে চেনা চেনা লাগছে কেন? কার চেহারার সঙ্গে যেন মিল আছে। তোমার বাবা কি সাংবাদিক?

স্ত্রী, মঞ্জু ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকিয়ে তাঁকে চিনতে চেষ্টা করে বলে, আমার আব্বার নাম রায়হান আলী।

দেখেছেন সমীরণ দা, কেমন অনুমান আমার? ভদ্রলোক নিজের ওপর নিজেই খুশি হয়ে যান। তখন সমীরণ মিত্র গলা উঁচিয়ে মেয়েকে ডাকেন, রাখি। রাখি।

রাখি ঘরে এলে বলেন, আচ্ছা তুই বলবি তো যে ও রায়হানের ছেলে!

খুব একপ্রস্থ হাসাহাসি হয়। একজন বলেন, বাপের মতোই হয়েছে ছেলে, শান্ত, ধীর আর চুপচাপ।

দ্বিতীয় ভদ্রলোক বলেন, আমরা বাবা সবাই তোমার আব্বার সঙ্গে পরিচিত– এই যে সমীরণ দা'কে দেখছো, উনি তো এক সময় কলিগও ছিলেন। ১৯৬৮তে না সমীরণ দা? আপনারা এক সঙ্গে 'দেশের বাণী'তে কাজ করতেন? তুমি তো বোধহয় ভাইবোনদের মধ্যে ছোট।

স্ত্রী না, মঞ্জু জানায়। বলে, আমি মেজ। আমার ছোট ভাই আছে, স্কুলে পড়ে।

তোমার বড় ভাই শুনেছিলাম মেডিক্যাল-এ পড়তো। ও কি ডাক্তার হয়ে গেছে?

স্ত্রী না, এবার ফোর্থ ইয়ারের ফাইনাল দিলো।

মঞ্জু উঠে দাঁড়ায়। ফেরদৌস কেন বাসায় আসতে চাইলো সেই চিন্তাটা তখনও তার মগজে পাক খাচ্ছে। সে বললো, আমি এখন যাই।

আরে এখনই যাবে কি, একটু বসো, আলাপ করি তোমার সঙ্গে, সমীরণ মিত্র হাসতে হাসতে বলেন।

ঐ সময় রাখির মা ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়ান। একটু বেশি উচ্ছ্বসিত দেখা যায় তাঁকে। বলেন, দেখি দেখি, ছেলের চেহারাটা দেখি। এই ছেলে, এক্ষুণি যাবি কেন? তোর মাকে বলবি আমার কথা– বলবি গীতা মাসীর সঙ্গে দেখা হয়েছে। ওকে একদিন নিয়ে আসবি। তোর আর রাখির জন্ম একই সময় হয় ঢাকা মেডিক্যালে, বুঝেছিস? একই কেবিনে আমরা ছিলাম।

মঞ্জু ভেতরে ভেতরে অভিভূত বোধ করে। ওদিকে ততোক্ষণে রাখি ট্রে ভর্তি চা বিস্কুট নিয়ে এসেছে। পুরনো দিনের কথাবার্তা বলতে বলতে সে সব খাওয়া হয় সবাই মিলে। তারপর মঞ্জু ওঠে। বিদায় নিয়ে দরজা দিয়ে বেরিয়েছে সবে, ওই মুহূর্তে পেছন থেকে ডাক, এই শোনো–

মঞ্জু ঘুরে দাঁড়ালে রাখি সামনে এসে মুখোমুখি দাঁড়ায়। বলে, তোমার মাকে আমি একদিন নিয়ে আসবো, দেখো তখন খুব জমবে। কবে নিয়ে যাবে তোমাদের বাসায়– কাল? আগামীকাল ক্লাসের পর তোমাদের বাসায় চলে যাবো হ্যাঁ?

বলতে বলতে রাখি আকাশের দিকে মুখ তোলে। এক টুকরো সাদা মেঘ দেখতে দেখতে বলে, আমাদের দু'জনের জন্ম একই জায়গায়, একই দিনে। একই ঘরে আমরা জন্মের পরে প্রথম কান্না কেঁদেছি। কী অদ্ভুত লাগে ভাবলে, তাই না?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

রাখিকে রীতিমতো ভাবের ঘোরে পড়তে দেখে মঞ্জু। সে কথা বাড়ায় না। বলে, রাখি, আমি এবার যাই। কথাটা বলেই সে গেটের ফোঁকর গলে বাইরে রাস্তায় গিয়ে পড়ে।

হাঁটতে হাঁটতে সে স্মৃতি হাতড়ায়। রাখির বাবা কিংবা তাঁর দুই বন্ধুর কাউকে কখনও দেখেছে কি না, স্মরণ করার চেষ্টা করে। ওঁদের কথাবার্তা শুনে তো মনে হলো আব্বার সঙ্গে ওঁদের খুবই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। তবে আবার এও ঠিক, মঞ্জুর খেয়াল হয়, আব্বা তাঁর বন্ধু-বান্ধবদের বাসায় নিয়ে আসেন খুব কম। আবার মায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছিলেন রাখির মা– এ খবরও তো সে কখনও শোনে নি। তবে যা বললেন, তাতে তো মনে হলো দু'জনে সম্ভবত বান্ধবীও ছিলেন। তার অবাক লাগে, একই সময় একই কেবিনে জন্ম হয়েছে দু'জনার ছেলেমেয়ের– গল্পচ্ছলেও তো কথাটা উঠতে পারতো। কিন্তু তার তো মনে পড়ে না, এমন গল্প সে মায়ের মুখে কখনও শুনেছে। গলি থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তার ওপারে ফুটপাথে উঠেছে। ঠিক ওই সময় ডাক আসে– ওই ভালো ছেলে গুডবয়।

মঞ্জু মুখ ঘুরিয়ে দেখে ঠিক তার পাশাপাশি মোটর বাইকে টাটা আর বাবুল। দু'জনের মুখেই হাসি। পিছনের ক্যারিয়ারে বসা বাবুল সানগ্লাস খুলে ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করে, কই যাও?

মঞ্জু হাত তুলে সামনের দিকটা দেখায়, মুখে কিছু বলে না।

খানিকটা এগিয়ে একপা মাটিতে ঠেকিয়ে টাটা মোটর বাইকটা থামায়। তারপর অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে ডাকে– এদিক আহো দোস্ত।

কাছে গিয়ে দাঁড়ালে হাসতে হাসতে বলে, ফিল্ডিং তো ভালোই মারবার লাগছো। তোমারে যে ডাইকা উঠাইলো রিকশায়, মালখান ক্যাঠা?

মঞ্জুর মুখ চোখের ভাব দেখে ফের হাসে টাটা। বলে, চেইতো না মিয়া, আমরা কিছু মনে করি নাই। ইনভার্সিটিতে পড়বা আর ফিল্ডিং মারবা না, এমুন কি হইতে পারে? নাকি হওনটা ঠিক? আমাগো কুনো আপত্তি নাই। অহন একটা কথা জিগাই, কইবা?

কী?

আমাগো ফিরদৌসের লগে দ্যাখা হইছে তোমার?

মঞ্জুর কী মনে হয়। সে মাথা নাড়ায়। বলে, না।

আইজ তোমাগো কেলাস হইছে?

না, মঞ্জু ফের মাথা নাড়ায়। বলে, গোলাগুলি হচ্ছিলো শহীদুল্লাহ হলের দিকে। তাতে স্যার ক্লাস বন্ধ করে দেন।

ফিরদৌসের লগে দ্যাখা হয় নাই, ঠিক কইতাছো তো?

মঞ্জু মুখ দিয়ে কোনো কথা উচ্চারণ করে না। শুধু মাথাটা ডাইনে বাঁয়ে নাড়ায়। আর নজর ওপরের দিকে তুলে রাখে। সে সামনে দাঁড়ানো বাবুলের ভাবলেশহীন পাথরের মতো মুখের দিকে তাকাতে পারে না। বুকের ভিতরে কোথায় যেন অজানা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

একটা ভয় শিরশির করে ওঠে। সামনের দিকে দুই কদম এগিয়েছে। ফের পিছন থেকে ডাক, আবে ওই পিতলা ঘুঘু, অতো জলদি কিয়ের ? কই যাইবার লাগছো– আহো আমাগো লগে, তোমারে লইয়া যাই। বাসায় যাইবা তো ?

বাবুলের মুখে হাসি দেখা যায় এবার। মঞ্জুও পাল্টা হাসে। বলে, থ্যাংক য়ু, আমি কিন্তু ভাই এখন বাসায় যাচ্ছি না।

তয় কই যাইবা ?

আব্বার অফিসে, মতিঝিল।

ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বিচিত্র এটা ভঙ্গি করে টাটা, তারপর মাথা দুলিয়ে বলে, ঠিক আছে, যাও। ফের দ্যাহা অইবো।

টাটার মুখ থেকে অনুমতি বের হওয়ার পরও মঞ্জু ওদের দিকে তাকিয়ে থাকে। ডান পায়ে কিক দিয়ে টাটা মোটর বাইক চালু করে। তারপর মাথায় হেলমেট এঁটে খুব জোর স্পীডে সামনের দিকে ছুটে যায়।

মঞ্জু তারপরও ফুটপাথে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থকে। সে বুঝে উঠতে পারে না কেন এতোক্ষণ ধরে ওরা তার সঙ্গে কথা বলে সময় নষ্ট করলো। ফেরদৌসকে ওরা প্রথম প্রথম খুব ভয় করতো। ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব আছে জানার পর তার সঙ্গেও রীতিমতো সমীহ করে কথা বলতো। তারপর যখন থেকে ইউনিভার্সিটির বাইরের ছেলেদেরও দলে নেয়া শুরু হলো, মানে সেই দিন থেকে যেদিন মিটিংয়ের সময় প্রকাশ্যে সবার সামনে এক নেশাখোর পাশের ছেলেটির হাঁটুতে গুলি চালিয়ে দিলো, সেই দিন থেকেই এরা যেন মাথায় চড়ে বসলো। এখন ওরা ঘাড় ধরে কথা বলে। ঠাট্টা ইয়ার্কি মারে। একদিন তো দেখলো, ফেরদৌসের পিঠে চাপড় মেরে, ও আমার সোনার চান বলে ডাকলো।.

বাসার গেটের কাছে পৌছতেই সে পিছন থেকে ফেরদৌসের ডাক শুনতে পায়। পিছনে ঘুরে তাকালে দেখে গলির মুখে ছাপড়া চায়ের দোকান থেকে বেরিয়ে আসছে। কাছে এসে বলে, তোর সঙ্গে আমার কথা আছে, ভিতরে চল।

মা দরজা খুলে ফেরদৌসকে দেখে একটু অবাক হন। বলেন, আরে! ফেরদৌস যে, অনেকদিন তোমাকে দেখি না, কেমন আছো ? ভালো ? তোমার মা ?

ফেরদৌসের কী যেন হয়। হঠাৎ সে মায়ের পা ছুঁয়ে সালাম করে। মুখে কিছুই বলে না ; মঞ্জু লক্ষ্য করে, মা এখনও ফেরদৌসকে সহজভাবে নিতে পারেন না। ফেরদৌসকে সালাম করতে দেখে বোধহয় অস্বস্তির মধ্যে পড়ে গেলেন। তাই কোনো কথা না বলে বাড়ির ভিতরে চলে গেলেন।

মঞ্জুর কামরায় গিয়ে ফেরদৌস বিছানায় শুয়ে পড়ে। তারপর শুয়ে শুয়েই বলে, মঞ্জু শোন, তোকে ভাই একটা কাজ করতে হবে, আমি দুটো খাম দিচ্ছি তোর হাতে, খাম দুটো আমার মায়ের হাতে দিয়ে আসতে হবে।

সে পেটমোটা দুটো খাম পকেট থেকে বের করে টেবিলের ওপর রাখে।

কী আছে খামের ভিতরে ? মঞ্জু জিজ্ঞেস না করে পারে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

টাকা, ফেরদৌস জানায়।

অতো ? মঞ্জুর অবিশ্বাস্য মনে হয়।

ফেরদৌস তার কথায় কান না দিয়ে বলে, কিছু বলতে হবে না কাউকে, শুধু প্যাকেট দুটো মায়ের হাতে তুলে দিলেই তোর কাজ শেষ।

কেন, তুই গেলে কী হয় ? মঞ্জুর গলায় ক্ষোভ প্রকাশ পায়। বলে, তুই যেতে পারিস না ?

না পারি না, ফেরদৌসের মুখে যন্ত্রণার ছাপ পড়ে। বলে, আমি যদি যেতে পারতাম, তাহলে তোর কাছে কেন আসবো ? তুই তো জানিস, আমার আব্বা কেমন মানুষ। আব্বা আমাকে বলে দিয়েছে, ও বাড়িতে আমার জায়গা নেই। কখনও যেন বাড়িতে আমি পা না রাখি।

রাগের মাথায় মা-বাবা অমন কথা বলে, সব কথা ধরলে চলে ?

মঞ্জুর কথায় ফেরদৌস অস্পষ্ট হাসে। বলে, সব কথা খুলে বলার মতো সময় নেই, বুঝলি ? মা যদি আমার খবর জানার জন্য খুব জেদ ধরে, তো বলবি, আমি ঢাকার বাইরে চলে গেছি আর ভালো আছি।

ফেরদৌসের মুখের দিকে তাকায় মঞ্জু। বলে, সত্যি সত্যি তুই চলে যাবি ?

হ্যাঁ, আর ভালো লাগে না। ফেরদৌসের গলার স্বরে ক্লান্তি গাঢ় হয়ে ওঠে। বলে, নেতাদের হুকুম মানতে গিয়ে মারামারি, খুন, জখম, হামলা এসব করতে হয়। একই দলের এক নেতার পক্ষে থাকলে অন্য নেতার পক্ষের লোক তোর শত্রু হয়ে যাবে। এখানে থাকলে হয় আমাকে প্রফেশনাল খুনী হতে হবে, নইলে মারা পড়তে হবে। আমি বাঁচতে চাই। বুঝলি, নর্মাল লাইফ নিয়ে বাঁচতে চাই। আর বাঁচার জন্যই আমি দূরে কোথাও চলে যাবো। ঐ কথায় হঠাৎ মঞ্জুর খেয়াল হয়, কিছুক্ষণ আগে তার সঙ্গে টাটা আর বাবুলের দেখা হয়েছিলো। কথাটা সে ফেরদৌসকে জানায়। বলে, মনে হলো, তোকে ওরা খুঁজছে।

মঞ্জুর কথা শুনে ফেরদৌস হঠাৎ যেন স্থির হয়ে যায় কিছুক্ষণের জন্য। কী যেন ভাবে। তারপর জিজ্ঞেস করে, তখন ক'টা বাজে খেয়াল করেছিলি ?

ক'টা ? মঞ্জু আন্দাজ করে। বলে, ধর বেলা দুটোর মতো হবে। তোর সঙ্গে রাস্তায় দেখা হলো তার ঘণ্টা খানেক পরে।

আর কিছু বললো ?

না, দু'বার জিজ্ঞেস করলো তোর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে কি না। আমি সোজাসুজি বলে দিলাম, না দেখা হয় নি।

ফেরদৌস টেবিলের ওপরে রাখা খাম দুটোর দিকে আঙুল তুলে বলে, পারলে খাম দুটো তুই এখনই আমার মায়ের হাতে দিয়ে আয়।

মঞ্জু জিজ্ঞেস করে, কতো টাকা ? অনেক ?

হ্যাঁ, ৫০০ টাকার প্যাকেট, দুই প্যাকেটে যা হয়।

তার মানে ১ লাখ। মঞ্জু মনে মনে হিসাব করে আর তাতে ভীষণ অস্বস্তি বোধ করে। মুখ দিয়ে কথা বের হয় না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

আর ঠিক ওই সময় বীথি ঘরে ঢোকে, দু'কাপ চা আর বিস্কুট নিয়ে। বলে, নাও বাবা একটু চা নাও। ট্রেটা টেবিলে রাখার সময় মোটা খাম দুটো বীথির চোখে পড়ে। মঞ্জুর দিকে তাকিয়ে বলে, এ দুটো কীসের খাম ? কী আছে ভিতরে ?

মঞ্জুর বুকের ভিতরে তখন ধড়াস ধড়াস আওয়াজ হচ্ছে, তালু গেছে শুকিয়ে। তার মুখ দিয়ে কথা বের হয় না, মুখ ফ্যাকাশে।

ফেরদৌস উঠে গিয়ে খাম দুটো হাতে তুলে নিতে নিতে বলে, এগুলো আমি রেখেছিলাম খালাম্মা।

কিন্তু কী আছে খামের ভিতরে ? বীথির কপাল কুঁচকে ওঠে।

ফেরদৌস মঞ্জুর মুখের দিকে একবার তাকিয়ে দেখে। তারপর লম্বা নিঃশ্বাস নিয়ে বলে, খাম দুটোর ভিতরে টাকা আছে খালাম্মা, আমার মাকে দেবো।

বীথির চোখমুখ থমথমে হয়ে ওঠে। তার মনে পড়ে, গতবার এই ছেলেই মঞ্জুর কাছে টাকা রেখে যাওয়াতে বাড়িতে বেশ বড় রকমের ঝামেলা হয়েছিলো। সে ফেরদৌসের মুখের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে বলে, শোনো বাবা ফেরদৌস, মঞ্জুর কাছে টাকা ফাকা রেখে যেও না। ওই নিয়ে সেবার বাড়িতে খুব ঝামেলা হয়েছিলো।

কথাটা বলেই বীথি ছেলের ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

মঞ্জু দেখে তার বন্ধু মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঠোঁট কামড়াচ্ছে।

সে বলে, এখন কী করবো বল, আমার কি টাকাটা রাখা ঠিক হবে ?

ফেরদৌসের কপালের কুঁচকানি আরও ধারলো হয়। বলে, আমি তোকে কী বলবো, যা করার তোকে করতে হবে। এখন তুই-ই বল, আমার মায়ের হাতে টাকাগুলো দিয়ে আসতে পারবি কি না।

মঞ্জু স্থির দাঁড়িয়ে থাকে। বন্ধুর প্রশ্নের জবাব দিতে পারে না।

আচ্ছা ঠিক আছে, তুই বরং একটা কাজ কর, ফেরদৌস পরামর্শ দেয়ার মতো করে বলে, তুই আমার মাকে কাল সকালে তোদের বাসায় আসতে বলবি। আমিই বরং কাল দুপুরের দিকে একবার এসে তাঁর হাতে টাকাটা দিয়ে যাবো। আমার মনে হয়, এটাই ভালো ব্যবস্থা। মায়ের সঙ্গে আমার দেখাও হলো, টাকাটাও দেয়া হলো।

নিজের প্রস্তাব নিজের কাছেই তার পছন্দ হয়। সম্ভবত সে কারণেই সে একটু খুশি হয়। বলে, তাহলে এবার চলি, কাল ফের দেখা হচ্ছে।

মঞ্জু সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেট পর্যন্ত এগিয়ে দেয় বন্ধুকে।

ফেরদৌস সামনের দিকে এগোতে থাকলে তাকে অনেকক্ষণ ধরে দেখে মঞ্জু। বড় রাস্তার মুখে ছাপরা রেস্তোরাঁর পাশে দাঁড় করানো মোটর বাইক স্টার্ট করে তাতে চেপে যতোক্ষণ পর্যন্ত না চোখের আড়াল হয়, ততোক্ষণ পর্যন্ত দেখে সে। আর মনে মনে চিন্তা করে, কোথায় যাবে ও ? কতোদূরে ? মা-বাবাকে ছেড়ে ওকে কেন চলে যেতে হবে ?

দরজাটা বন্ধ করে মঞ্জু ফের ওপরে ওঠার জন্য সবে সিঁড়িতে পা রেখেছে, ঠিক ওই সময় একটা আওয়াজ কানে আসে তার। একবার মনে হয় গুলির আওয়াজ। ফের মনে হয় পটকার আওয়াজ। বুকের ভিতরে কোথায় যেন খচখচ করতে থাকে। সে ফের দরজা খুলে রাস্তাটা দেখে নেয়। উহু, কিছুই তার চোখে পড়ে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ওপরে গিয়ে মায়ের মুখোমুখি হয়। দেখে মা নিজেই সিঁড়ির দিকে আসছিলেন।

কী রে, গেলো তোর বন্ধু ?

হ্যাঁ।

ওর কাছে তো মনে হলো, অনেক টাকা। জিজ্ঞেস করেছিলি, কতো ?

না, মায়ের কাছে গোপন করে সে টাকার অঙ্কটা। বলে, কতো আর হবে, দু'চারশো খুব জোর।

ঐ কথার পর মঞ্জু অন্য প্রসঙ্গে চলে যায়। বলে, আচ্ছা মা, সমীরণ মিত্র নামে আব্বার কোনো বন্ধু আছেন ?

বীথি একটু যেন চমকায়। অনেক কিছু যেন এক সঙ্গে তার মনে পড়ে। বলে, কেন, তুই জানিস না ? সমীরণ বাবু তোর আব্বার সঙ্গে 'দেশের বাণী'তে এক সঙ্গে কাজ করতেন। পরে ভদ্রলোক বোধহয় চিটাগাং চলে যান, ওঁর স্ত্রী গীতা আমার খুব বন্ধু ছিলো।

মঞ্জু হয়তো আজকের গোটা অভিজ্ঞতাটা বর্ণনা করতো। তার আগেই নিচের দরজায় ঘন ঘন ধাক্কা।

নিচে গিয়ে দরজা খুলতেই মোড়ের ছাপড়া রেস্তোরাঁর চেনা ছেলেটিকে দেখে। সে বলে, আপনের বাড়ি আইছিলো যে মেহমান, তারে মাইরা ফালাইছে।

কী-ই ?

হ, বড় রাস্তার উপ্রে পইড়া ছিলো, পুলিশে হাসপাতালে লইয়া গেলো।

কখন ?

এই তো, ক্যান গুলির আওয়াজ হোনেন নাই ?

মঞ্জুর যে কী হয়, সে নিজেই বুঝতে পারে না। সোজা লাফ দিয়ে রাস্তায় নামে। তারপর ছোটে। পেছনে বীথি ডাকে, মঞ্জু, যাস না– মঞ্জু, ওভাবে যাস না। কী হয়েছে আগে ভালো করে শোন, মঞ্জু-উ-উ।

মায়ের গলার স্বর তার কানে পৌছায় না। বুকের ভিতর কেউ যেন বারবার করে বলে যাচ্ছে– চলে যেতে চেয়েছিলো, ফেরদৌস চলে যেতে চেয়েছিলো। বাঁচবার জন্য চলে যেতে চেয়েছিলো ঢাকা শহর ছেড়ে। দলাদলি, রাজনীতি, চাঁদাবাজি, হাঙ্গামা, খুন, জখম সব কিছু ছেড়ে দিয়ে ও চলে যেতে চেয়েছিলো!

চৌদ্দ

১৯৮৭'র হেমন্তে শীতের পাখিরা বাংলাদেশে খুব বেশি সংখ্যায় আসতে আরম্ভ করে। রোজ ভোর বেলা আর সন্ধ্যায় আকাশময় বেলোয়াড়ি চুড়ির আওয়াজ শুনতে পায় ঢাকা শহরের লোকেরা।

রঞ্জু লাইব্রেরি থেকে বেরিয়ে হোস্টেলের দিকে যাচ্ছিলো। ওই সময় আওয়াজটা তার কানে আসে। আকাশে তখনও আলো, পশ্চিমে মেঘ থাকলেও সে দাঁড়িয়ে পড়ে এবং মুখ তোলে আকাশে। খোঁজে, আওয়াজটা আসছে কোনদিক থেকে। প্রথম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ঝাঁকটা সে আবিষ্কার করে যখন ওটা প্রায় মিলিয়ে যাচ্ছিলো। ওই সময়ই তার চোখে পড়ে দ্বিতীয় ঝাঁকটা অনেক নিচু দিয়ে যাচ্ছে, উত্তর থেকে দক্ষিণে।

সহপাঠী রাজিব রায়হানকে ওইভাবে আকাশের দিকে মুখ তুলে থাকতে দেখে দুই সহপাঠিনীই রীতিমতো অবাক হয়, ছেলেটা অমন করে কী দেখছে আকাশে ? দু'জনে কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়ায়। তারপর দেখাদেখি ওরাও আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখে– কী দেখছে রাজিব রায়হান ?

একজন নববর্ষের পদবি দিয়ে ডেকে জিজ্ঞেস করে, কী দেখছেন, আজিব রায়হান?

অন্যজন তখনও আকাশ দেখে কিন্তু কিছুই আবিষ্কার করতে পারে না। কিন্তু তবু তার আকাশ দেখতে ঐ মুহূর্তে ভালো লাগে। দেখে, আকাশ মেদুর। পশ্চিমের দিগন্তে প্রকাণ্ড দু'খানা মোষরঙা মেঘের মাথায় সিঁদুর মাখানো আর তার নিচে ঘনানো অন্ধকার।

পরের বার দু'জনেই একসঙ্গে জিজ্ঞেস করে, কী দেখো তুমি ? বলছো না কেন ?

রঞ্জু হাসে। বলে, শুধু চোখ মেলে দেখলে হবে না। কানও পাততে হবে। কান পেতে রাখলে তখন শুনতে পাবে– কান পেতে দেখো। কিছু শুনতে পাও কি না– শুনছো এবার ? একটু থেমে ফের বলে রঞ্জু। শুনতে পাচ্ছো না, বেলোয়াড়ি চুড়ি পরে কোনো মেয়ে যেন আকাশময় হাত নাড়াচ্ছে ?

একজন শুনতে পায় এবং অবাক হয়ে বলে, অদ্ভুত তো ! সত্যি সত্যি চুড়ির আওয়াজ। বান্ধবীর দিকে তাকিয়ে ফের বলে, তুই শুনতে পাস না ? বয়রা নাকি ? এতো জোরে আওয়াজ হচ্ছে আর তুই শুনতে পাচ্ছিস না ?

এবার সঙ্গিনী মেয়েটির মুখ যেন ক্ষণিকের জন্য উজ্জ্বল হয়– বোঝা যায় সেও শুনতে পাচ্ছে। কিন্তু সেটা সে প্রকাশ করে না। রঞ্জুর দিকে তাকিয়ে ঠোঁট উল্টে বলে, ও এই আওয়াজ। ভাবলাম কী না কী।

তার মানে ?

মানে আবার কী ? তোমরা সিটি ডুয়েলার– তোমরা ওসব জিনিস নিয়ে আদিখ্যেতা করো গিয়ে– শীতকালে বিদেশী পাখিরা আসে, এটা কি কোনো নতুন ঘটনা ? বেলোয়াড়ি চুড়ি– হুঁ!

রঞ্জুর এতোক্ষণ মেয়েটির নাম মনে আসছিলো না, তাই কথাও বলতে পারছিলো না– হঠাৎ তার নামটা মনে পড়ে গেলো– মেয়েটির নাম সোনিয়া। সে দু'পা এগিয়ে বেশ নাটকীয়ভাবে বললো, এই যে গাঁয়ের মেয়ে সোনিয়া, একটু কষ্ট করে কি বলবেন, ওগুলো কোন জাতের হাঁস ? সব বুনোহাঁসই কি অমন চুড়ি বাজাতে বাজাতে আকাশে উড়ে যায় ? ওগুলো সরালী না বেলে, নাকি ল্যাঞ্জা ? নাকি দীঘলি ? বলুন, কী নাম ওই হাঁসের ?

সোনিয়া ঠোঁট উল্টে বলে, হুঁ! বয়ে গেছে আমার নাম বলতে।

রঞ্জু সোনিয়ার কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়িয়েছে সবে। ইচ্ছে, ওর সঙ্গে একটু ছেলেমানুষি ঝগড়া করবে। ঠিক ওই সময় পেছন থেকে ডাকাডাকি। সে ঘুরে দাঁড়ায় এবং দেখে মনির আসছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

কাছে এসে মনির বলে, তুমি এখানে, আর আমি খুঁজে খুঁজে হয়রান- তোমাদের কেউ কি অসুস্থ ?

না তো। রঞ্জু অবাক হয়। বলে, কেন ?

মঞ্জুকে দেখলাম এমারজেন্সির প্যাসেজে দাঁড়িয়ে আছে। মনে হলো ভেতরে কারুর বোধহয় অপারেশন হচ্ছে, চোখে মুখে ভয়ানক অসহায় ভাব দেখলাম।

অমন কথার পর কে স্থির থাকতে পারে ? তক্ষুণি ছোটে এবং এমারজেন্সির প্যাসেজে গিয়ে ধরে, কী খবর মঞ্জু, কী হয়েছে ?

মঞ্জুর দু'চোখে উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি, সারা মুখ থমথমে। ভাঙা গলায় বলে, ফেরদৌসকে মেরে ফেলেছে।

কী ?

নিজের গলার স্বর শুনে রঞ্জু নিজেই চমকে ওঠে এবং তারপর সে নিচু গলায় জানতে চায়, কখন ? কোথায় ?

বিকেলে। আমাদের বাসা থেকে বেরুবার পরপরই।

ওই সময় দু'জন পুলিশের লোক ঢোকে এমারজেন্সিতে। তারা গেটে রঞ্জুকে থামিয়ে দেয়।

পুলিশের লোক দু'জন ওদিকে তখন কাকে যেন খোঁজে আর গলা উঁচিয়ে ডাকে, মঞ্জু কার নাম ? মঞ্জু নামে কি কেউ এখানে আছে ?

রঞ্জুর যে কী হয় ওই মুহূর্তে, সে নিজেও জানে না। গোটা ব্যাপারটা বুঝে নেওয়ার আগেই ভাইয়ের হাত ধরে টেনে বাইরে নিয়ে যায়। তারপর ছুটতে ছুটতে বাইরে এসে রিকশায় চাপে। রিকশায় চেপে যাওয়ার পথে মঞ্জু থেমে থেমে বলে, আমাদের বাসায় গিয়েছিলো- আমাকে বলেছিলো আমি যেন ওর মায়ের হাতে কিছু টাকা পৌঁছে দিই- আমাকে টাকা ভর্তি দুটো খামও দেয়, ওর আব্বার সঙ্গে ঝগড়া, তাই ও বাসায় যায় না।

তুই টাকাটা হাতে নিয়েছিলি ? কতো টাকা ? রঞ্জু জানতে চায়।

না, টেবিলের ওপর রেখেছিলো, অনেক টাকা- সব ৫০০ টাকার নোট, আম্মা ঘরে এসে দেখতে পায় খাম দুটো। টাকা আছে জানতে পেরে আম্মা একটু বকে। তখন বেরিয়ে যায় আমাদের বাসা থেকে। তারপর মোড়ে চায়ের দোকানের সামনে-

এই পর্যন্ত বলে আর বলতে পারে না মঞ্জু, কেমন যেন ভেঙে পড়ে।

রঞ্জুর রাগ হয় খুব। কিন্তু তার চাইতে বেশি হয় মায়া। ছোট ভাই মঞ্জুর জন্য যেমন, তেমনি ওর বন্ধু ফেরদৌসের জন্যও।

তারপর কী হলো শোনো, গলির মোড় পর্যন্ত গিয়েছে ওই সময় টাটা আর বাবলু ওর মোটর বাইকের সামনে দাঁড়ায়- তারপর বাইক থামিয়ে ওকে রাস্তায় নামায়, তারপর-

তুই ছিলি কাছে ? নিজের চোখে দেখেছিলি ?

ভাইয়ের প্রশ্ন শুনে মঞ্জু একটু যেন থমকায়। তারপর বলে, না আমি দেখি নি, চায়ের দোকানের ছেলে, দুলাল নাম, ও হাসপাতাল পর্যন্ত এসেছিলো, ওই বললো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ঠিক আছে, রঞ্জু বলে, যা হবার হয়েছে, এখন চুপ করে থাকবি, যা দেখিস নি তা বলবি না।

আব্বাকে অফিসে পায় না রঞ্জু। দু'ভাইয়ের চেহারায় সম্ভবত কিছু লক্ষ্য করে আব্দুল্লাহ।

বলে, কেন, কোনো খবর আছে?

রঞ্জু স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করে। বলে, না, তেমন কিছু না।

এই তো ছিলেন, কিছুক্ষণ আগেও। আব্দুল্লাহ বলে, গল্প হচ্ছিলো তোমাদের জমি কেনা নিয়ে। ওই সময় একটা টেলিফোন এলো, আর সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে গেলেন–

দু'ভাই অফিস থেকে বেরিয়ে আসে। তবে বাসায় ফেরে না রঞ্জু। কলেজের হোস্টেলে ফিরে এসে মাকে টেলিফোন করে জানায় যে মঞ্জুকে সে আপাতত হোস্টেলে রাখলো।

আব্বাকে সে ফোনে পায় আরও ঘণ্টা দুই পরে। তখনও বাসায় ফেরেন নি। আব্বার কথায় জানতে পারে ফেরদৌসকে হাসপাতালে নেওয়ার সময় ও মঞ্জুর নাম বলে– অন্য আর কিছু বলতে পারে নি– শুধু নামটা– কিন্তু চায়ের দোকানের কয়েকটি ছেলে অন্যসব খবর দিয়েছে, এমনকি বাসা পর্যন্ত দেখিয়ে দিয়েছে। বলেছে, ফেরদৌসের মায়ের কাছে নাকি মঞ্জুর খবর দেওয়ার কথা।

রাত দশটার দিকে রায়হান হোস্টেলে আসে। রঞ্জু তাকে নিজের বিছানায় বসায়। আব্বার কথার ভঙ্গিতে আর গলার স্বর শুনে তাঁকে খুব দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মনে হয়। তবু সে জিজ্ঞেস না করে পারে না। বলে, মঞ্জুর কি অসুবিধা হবে?

হ্যাঁ, খুব অসুবিধা হবে, রায়হান জানায়। বলে, পুলিশ নিজের কাস্টডিতে নিয়ে যেতে পারে– ফেরদৌস মারা যাওয়ার আগে দু'জনের নাম বলেছে– ওদেরই দলের নন স্টুডেন্ট ক্যাডার– ওই দু'জনের সঙ্গে নাকি আজ মঞ্জুর দেখাও হয়েছিলো ঘটনার কিছুক্ষণ আগে। পুলিশের কাছে কী বলতে কী বলবে– কে জানে, আব্বার গলার স্বর ভেঙে পড়ার মতো অবস্থা হয়।

আমি পুলিশকে বলবো, মঞ্জু জানায়। বলে, টাটা আর বাবুল ওকে খুঁজছিলো– ওর কাছ থেকে টাকাটা নেওয়ার জন্য–

এ্যাই চুপ। রঞ্জু ধমকে ওঠে। বলে, খবরদার ওসব কথা তুই বলবি না– আগ বাড়িয়ে কোনো কথাই বলবি না। আর ওসব কথা ভুলেও কখনো উচ্চারণ করবি না।

সে বাপকে বলে, আব্বা, ভয় তো পুলিশকে না– আমার ভয় হচ্ছে, ওদের পার্টির ক্যাডাদের দিক থেকে বিপদ আসে কি না। মঞ্জুর মুখ দিয়ে যদি ওই নামগুলো একবার বের হয় আর তার ফলে ওকে যদি সাক্ষী দিতে নিয়ে যায় পুলিশ– তখন কী হবে চিন্তা করেছো?

রায়হানের সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হয় না। সে মঞ্জুকে রঞ্জুর কাছেই হোস্টেলে রেখে দেয় এবং পরদিন ভোর বেলা দু'জনকেই রংপুরের বাসে তুলে দেয়। আপাতত মঞ্জু থাক কিছুদিন ওর চাচার বাড়িতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

পরামর্শটা মাহফুজের। বলেছিলো, দেখা যাক কিছুদিন– পুলিশ কীভাবে কেসটা নিয়ে এগোচ্ছে– আর সরকারী দলের নেতাদের কী মনোভাব সেটাও জানা দরকার।

বীথি ভেতরে ভেতরে দারুণ অস্থির ছিলো কয়েকটা দিন। কিন্তু বাইরে সেটা প্রকাশ করে নি। কেমন করে করবে ? কার কাছে করবে ? আত্মীয়স্বজন বলতে তো দু'জন ভাই আর একজন দেওর– ওদের কাছে বললে লাভ তো কিছু হবেই না, বরং উল্টো বিপদ হয়ে যেতে পারে। কার কাছে কী বলবে, তার ঠিক আছে কিছু ? এমনকি রায়হানের সঙ্গেও আলাপ করতে তার সাহস হয় না। জেদী মানুষ, কোন কাজ করতে কোন কাজ করে বসবে তার ঠিক কী ? ছেলের বন্ধু ফেরদৌস যে খুব খারাপ কাজকর্মের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিল সেটা তার প্রথম থেকেই সন্দেহ হতো। ওর মোটর বাইকে চেপে চলাফেরা, বাড়িতে না থাকা, মঞ্জুর কাছে টাকা রেখে যাওয়া, এসব কাণ্ড দেখে গতবছরই তার সন্দেহ হয়েছিলো। একদম পছন্দ হতো না ছেলেটাকে। তবে যেদিন ও মঞ্জুকে থানা থেকে ছাড়িয়ে আনে, সেদিন থেকে তার মন কিছুটা নরম হয়। আরও যখন জানতে পারে যে ওর বাবা ওর মাকে কষ্ট দেয় আর তাতেই ছেলেটার অমন অবস্থা, তখন থেকে ওর ওপর কিছুটা মায়াও জন্মাতে আরম্ভ করে। তবে সেদিন মঞ্জুর টেবিলে টাকা ভর্তি খাম দুটো দেখে তার খুব রাগ হয়েছিলো এবং সেটা সে সামলাতে পারে নি। বেশ কড়া ভাষাতেই কথা বলেছিলো– আর তাতে ও বেরিয়ে যায়– আর তার পরপরই ঘটে ঘটনাটা। বেরিয়ে যাবার সময় ওর মুখখানা কেমন আহত দেখাচ্ছিলো। সেই দৃশ্য সে কখনো ভুলতে পারে না। তাই এখন সে ও-ব্যাপারে কোনো কথা বলতে পারে না– বলতে গেলেই কষ্ট হয়। সে কীভাবে বলবে যে ছেলেটা ভালো। আবার ছেলেটা নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো সেটাও কি সে বলতে পারে? বললে সেটা মিথ্যে কথা হবে না ? আবার এও মনে হয়, যখন জানলো যে ছেলেটা খারাপ পথ ধরেছে, তখন কি তার উচিত ছিলো না ওর মা-বাবার কাছে গিয়ে সেটা বলা ? একেবারে অচেনা লোক তো তাঁরা ছিলেন না।

একেকদিন তার ইচ্ছে হয়, ফেরদৌসের মায়ের সঙ্গে দেখা করে। কিন্তু পারে না। তার সাহসে কুলোয় না। এখন তো বলা যায়, সর্বক্ষণই ভয়ে ভয়ে থাকে। যদি এসে মহিলা মঞ্জুকে খোঁজেন, কি বাসায় এসে কান্নাকাটি জুড়ে দেন ? অমন কিছু করলে সে কী করবে ? আরও এক মুশকিল হয়েছে এই যে, রায়হান তার কাছে কিছুই বলে না। দেখতে পাচ্ছে মানুষটা অস্থির হয়ে ছটফট করছে অথচ সে কিছুই করতে পারে না। কোথায় কোথায় যে যায়, কার কাছে কী বলে, তার কিছুই সে জানতে পারে না। জিজ্ঞেস করলেও কোনো জবাব দেয় না– মুখ ঘুরিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে।

তাই এখন তার কিছুই করার নেই, চুপচাপ বাড়ির ভেতরে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকা ছাড়া। বাইরে সে কার কাছে যাবে ? যদি পুলিশের লোকদের সঙ্গে জানাশোনা থাকতো, তাহলে একটা সুরাহা হয়তো দেখা যেতো– কিন্তু রায়হান তো গোড়া থেকেই পুলিশের লোকদের এড়িয়ে চলে– শুধু এড়িয়ে চলে না, বলা যায় ঘেন্নাই করে। সুতরাং ওদিকের রাস্তা তার জন্যে বন্ধ। আত্মীয়দের মধ্যে যদি কেউ উকিল কি জজ সাহেব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

থাকতো, তাহলেও হয়তো আন্দাজ করতে পারতো– মামলা টামলা হলে মঞ্জু তাতে কতোখানি জড়াবে এবং তাতে তাদের বাবা-মা হিসেবে কী করা উচিত।

সে এ-ঘর থেকে ও-ঘরে যায়। কিছুক্ষণ জানালার কাছে দাঁড়িয়ে বাইরের আকাশে শাদা মেঘ দেখে কখনও, কখনও নীল রং। তার মাঝেই নানান দৃশ্য তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। কখনো দেখে, মঞ্জু জেলখানার গেটে গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে আছে, কখনো দেখে লম্বা স্ট্রাইপ দেওয়া কুর্তা আর পায়জামা পরা একটি অল্পবয়সী ছেলে ফাঁসির মঞ্চের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে– কখনো আবার দেখে চওড়া রাস্তা, খাঁ খাঁ করছে– একটা মানুষ নেই কোথাও, শুধু রাস্তার মাঝখানে একটি অল্পবয়সী তরুণের গুলি খাওয়া রক্তাক্ত লাশ পড়ে আছে। ওই সব দৃশ্য মনে মনে দেখে তার বুকের ভেতরটা হিম হয়ে যায়।

দেখতে দেখতে পুরো একটা সপ্তাহ পার হয়ে যায়– কিন্তু কোনো খবর আনতে পারে না রায়হান। ওদিকে রঞ্জুর ক্লাস কামাই হচ্ছে– এবার ওর ফাইনাল ইয়ার– ছেলেটার পড়াশোনার এভাবে ক্ষতি হলে রেজাল্ট কেমন করে ভালো হবে? চিন্তা করে বীথি কোনো কূল কিনারা করতে পারে না।

অমন সময়েই একদিন রঞ্জুর রুমমেট মনির বাসায় এলো। রায়হান সেদিন বাসায় ছিলো। প্রথমদিকে কী কথা হয়েছিলো তা সে শোনে নি। পরে যখন ডাকা হলো ওকে তখন শুনলো। মনির খবর নিয়ে এসেছে যে ফেরদৌসের খুনের ব্যাপারে ওদের পার্টির তরফ থেকে কোনোরকম চাপ আসবে না– বরং পুলিশ যাতে বেশি ঘাঁটাঘাঁটি না করে সেদিকেই নজর রাখা হবে। অবশ্যি পুলিশ এমনিতে রুটিন মাফিক একটা কেস সাজাবে তবে ও নিয়ে বেশি এগোবে না– কাউকে ধরাও হবে না। কারণ টা., বাবুল, নীলা এই তিন নন স্টুডেন্ট ক্যাডারকেই এখন সরকারী দলের খুব দরকার।

কিন্তু ফেরদৌসের বাবা? উনি কিছু করবেন না?

বীথির প্রশ্ন শুনে মনির চুপ করে যায় এবং রায়হানের দিকে তাকায়।

হ্যাঁ করতে পারে, রায়হান জবাব দেয়। বলে, কিন্তু বিচারটা তো হবে কোর্টে, আর সেজন্যে মামলাটাকে অবশ্যই কোর্টে যেতে হবে– আর সেটা পাঠাবে পুলিশ– পুলিশ যদি দেরি করে, তাহলে কার কী করার আছে– দেরি করাবে হোম মিনিস্ট্রি। বলা হবে ইনভেস্টিগেশন ভালোমতো করো– তাই পুলিশ অনেক বেশি সময় নেবে।

ওই ধরনের আরও কিছু কথা হয়, তারপর চা খেয়ে মনির বিদায় নেয়।

মনির চলে গেলে রায়হান উঠে দাঁড়ায়। তারপর বারান্দার দিকে যেতে যেতে বলে, এ যাত্রা মনে হয় বাঁচা গেলো, নইলে ছেলে তো প্রায় ফেঁসেই গিয়েছিলো– ও ফিরে আসুক, ট্যাং ভেঙে বাসায় বসিয়ে রাখবো, ওর ইউনিভার্সিটি যাওয়ার দরকার নেই। যে নিজেকে সামলে চলতে পারে না, তার বাইরে যাওয়ার কী দরকার?

রংপুর শহরটা বেশ লাগে রঞ্জুর কাছে। বেশ ছিমছাম, ঢাকার তুলনায় ভিড়ভাট্টা একেবারেই কম– বিশেষ করে কারমাইকেল কলেজের দিকটা– ওই পথে হাঁটতে বেশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

লাগে। রাস্তার দু'ধারে গাছ, বোধহয় কৃষ্ণচূড়া, মাঝে মাঝে মেহগিনিও আছে। চাচা মেহগিনি গাছ চেনান। বলেন, খেয়াল করবে, লম্বাটে পাতা– কিন্তু পুরোপুরি লম্বা নয়, দেবদারু পাতার মতো। রংটা হবে কালচে-সবুজ। দেবদারুর পাতা হালকা সবুজ। তবে কাঠের রংটা হয় কালোমতো– ঠিক কালো নয়, ডীপ খয়েরি বলতে পারো।

বলতে বলতে পুরনো স্মৃতির খেই ধরেন বড় চাচা। বলেন, আমাদের মোহনগঞ্জের বাড়িতে একটা পুরনো সিন্দুক ছিলো–

রঞ্জুর মনে পড়ে। বলে ওটা নাকি লোহা কাঠের ? একখানা ছাপর খাট আর একটা কাঠের সিন্দুক–

আরমান বলেন, ওটার কথা বলছি না, এটা আর একটা। ও দুটো তো ছিলো দাদীর ঘরে– আমাদের মায়ের ঘরে ছিলো আর একটা। টাকা পয়সা গয়না গাঁটি তো ছিলো না, তাই মা ওই মেহগিনি কাঠের সিন্দুকে বই রাখতেন।

মঞ্জু হাঁটতে হাঁটতেই বলে ওঠে, মেহগিনির মঞ্চ জুড়ে পঞ্চহাজার গ্রন্থ– সত্যি সত্যি ঠাকুর বাড়িতে পাঁচ হাজার বই ছিলো চাচা ?

কারমাইকেল কলেজের ইংরেজির প্রফেসর ভাইপোর প্রশ্নের জবাব দিতে পারেন না। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে পাঁচ কেন, দশ হাজার বই থাকাও বিচিত্র কোনো ঘটনা ছিলো না– কিন্তু আসলেই কি পাঁচ হাজার বই ছিলো ? রবীন্দ্রনাথ কি ক্যাটালগ দেখে নিয়েছিলেন কবিতাটা লেখার সময় ?

এইসব এলোমেলো চিন্তা ওড়ে মঞ্জুর মগজের ভেতরে। নিজের ভাইয়ের সঙ্গে আর কতোক্ষণ কথা বলা যায় ? চাচার বড় ছেলেটি খুলনায়– ব্যাঙ্কের চাকরি। বাড়িতে খুব কম আসে। ছোটটি তো একেবারেই ছোট, ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে। মাঝখানে একটি বোন এবং সে এখন স্বামীর ঘরে। ফল হয়েছে এই যে, ভাইপো দু'টিকে সঙ্গ দেওয়ার মতো লোক নেই। পাড়ার একটি ছেলের সঙ্গে রঞ্জুর আলাপ হয়েছে, ছেলেটি গতবছর সেকেণ্ড এমবিবিএস পরীক্ষা দিয়েছে– বেচারার খুব আগ্রহ রঞ্জুর সঙ্গে কথা বলতে। কিন্তু হলে হবে কী, সময় পেলে তো ? ফাঁক পেলেই চলে আসে। কিন্তু সেওবা আর কতোক্ষণ? বড় চাচা ব্যস্ত মানুষ। সিনিয়র এবং স্থানীয় হওয়াতে এমনিতেই কিছু বাড়তি দায়িত্ব তাঁকে পালন করতে হয়। তার ওপর আবার প্রাইভেট ট্যুইশনিও করেন। সন্ধ্যা বেলা ৩টি ছেলেমেয়ে পড়তে আসে। ওদিকে চাচীরও ব্যস্ততা কম নয়। সমিতির কাজ থাকে প্রায়ই, তাছাড়া সপ্তাহে ৩ দিন বস্তির মেয়েরা তাঁর কাছে সেলাই ফোঁড়াই আর দর্জির কাজ শিখতে আসে। ছোট ভাই রবি তো আরও বেশি ব্যস্ত তার ক্রিকেট খেলা নিয়ে। কলেজ থেকে বাড়ি ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা করে ফেলে। অর্থাৎ বড় চাচার বাড়িতে বলতে গেলে সবাই নিজেদের কাজ নিয়ে সর্বক্ষণ ব্যস্ত। সুতরাং ঘুরেফিরে ভাইয়ের সঙ্গী বলতে ভাই-ই, একজনের সঙ্গী আর একজন।

দিন কয়েকের মধ্যেই মঞ্জু ভাইয়ের কথাবার্তায় বিরক্তির ভাব লক্ষ্য করে। সেজন্য একদিন বলেই ফেলল, ভাইয়া আমার জন্যে তুই এখানে কেন পড়ে আছিস ? তোর পড়াশোনার ক্ষতি হচ্ছে– তুই বরং চলে যা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

আর তুই ? রঞ্জু ভাইয়ের চোখে চোখ রেখে পাল্টা জিজ্ঞেস করে।

আমি আবার কী ? রইলাম এখানে, যতদিন আব্বা ফিরে যেতে না বলেন।

যদি আবার কোনো ঝামেলা পাকিয়ে বসিস ?

মঞ্জু ওই কথায় খানিকটা চটে। ক্ষুব্ধ স্বরে বলে, তোরা ভাবিস আমি খালি ঝামেলা পাকাই, তাই না ?

হ্যাঁ পাকাসই তো, রঞ্জু মুখের ওপর জবাব দেয়। বলে, পাকাস না, বল ? তোকে থানার হাজতে ঢুকিয়েছিলো ক'দিন আগে, হিসেব করে দেখ ? তার আগে পাড়ার মস্তানদের সঙ্গে ঝামেলাটা কে বাধিয়ে ছিলো ? তুই নিজেই বল ?

মঞ্জু মুখ ফিরিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে। রঞ্জুর কথার পিঠে দেয়ার মতো জবাব খুঁজে পায় না। কারণ কথাগুলো তো মিথ্যা নয়। সে নিঃশ্বাস ফেলে বলে, কী করবো বল, আমার কপালটাই খারাপ- যেখানেই যাই, যা-ই করি, একটা না একটা ঝামেলা আমার কপালেই এসে জোটে।

একটু থেমে ফের বলে, আমাকে তুই এখানে রেখে যা, আমি ঠিক থাকবো, চাচা-চাচীর কথামতো চলবো, দেখিস আর কোনো অসুবিধা হবে না।

কারমাইকেল কলেজ এলাকায় চারদিকে প্রচুর খোলা জায়গা। ব্রিটিশ আমলের প্রাচীন দালানের পাশে আজকাল আরও দুটো দালান উঠেছে- তবু জায়গাটা খোলামেলা। শোনা যায়, আগে নাকি আরও বেশি ফাঁকা ছিলো চারদিকে। সরকার নিয়ে নেয়ার আগে যখন প্রাইভেট কলেজ ছিলো, তখন নাকি শিক্ষকরা জমি চাষের জন্য বর্গা দিতো।

বেশ জমজমাট থাকে কলেজ এলাকা। গেটের পাশে দেয়ালে নানান ধরনের পোস্টার। তাতে কোথাও লেখা, উত্তরবঙ্গের বীরসন্তান এরশাদের হাত শক্ত করুন, কোথাও লেখা, বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন সোনার বাংলা কায়েম করুন, আবার কোথাও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রই মুক্তির পথ, আল্লাহর আইন কায়েম করুন, রাজাকারদের বিচার চাই- এ ধরনের স্লোগানের পোস্টার একটার ওপর একটা চাপানো। তবে একটা স্লোগানের পোস্টার বহু জায়গায় লাগানো দেখলো- তাতে কারমাইকেল কলেজকে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় করার দাবি তোলা হয়েছে। রঞ্জুর কৌতূহল হয়। জানতে চায়, এখানে কি ফুল ফ্লেজেড ইউনিভার্সিটি চলবে ?

বাহ্ কেন চলবে না ? মুয়িদ ত্বরিত পাল্টা প্রশ্ন করে। বলে, মেডিক্যাল কলেজ যে খোলা হয়েছে, সেটা কি চলছে না ? কতোদিনের পুরনো একটা বিখ্যাত কলেজ- নিশ্চয়ই ইউনিভার্সিটি হতে পারে। জায়গা কতো চারদিকে। কি বিশাল লাইব্রেরি।

রাজশাহী ইউনিভার্সিটি কিন্তু বেশি দূরে নয়- রঞ্জু স্মরণ করিয়ে দেয়।

মুয়িদ পাল্টা হাসে। বলে, ঢাকা থেকে জাহাঙ্গীরনগরের দূরত্বের চাইতে নিশ্চয়ই বেশি। কিন্তু কথা তো সেটা নয়- আমাদের কথা উত্তরবঙ্গ জুড়ে মাত্র একটা ইউনিভার্সিটি কেন থাকবে, বলুন ? ঢাকা, জাহাঙ্গীরনগর ময়মনসিংহ, চিটাগাং এসব তো রয়েইছে- শোনা যাচ্ছে সিলেটেও নাকি আর একটা ইউনিভার্সিটি খোলা হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

রঞ্জু তর্ক করতে চায় না। উত্তরবঙ্গকে অবহেলার কথা নিয়ে খবরের কাগজে এতো করে লেখালেখি হয়েছে যে, ও নিয়ে কথা বলাটাই রঞ্জুর বাহুল্য মনে হয়। মুয়িদ কিন্তু প্রসঙ্গটা ধরে রাখে। বলে, নর্থ বেঙ্গলে ইন্ডাস্ট্রি বলতে কিছু নেই। বগুড়াতে দু'টি একটি গড়ে উঠেছিলো বটে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত টিকতে পারলো না। আমরা শুধু কৃষিকাজ করি আর জোতদার হয়ে ঢাকা শহরে বাবুগিরি দেখাই আমাদের শিক্ষিত তরুণরা নির্লজ্জ কাপুরুষের মতো শ্বশুরের কাছ থেকে যৌতুকের টাকা নিয়ে বিয়ে করে– চিন্তা করুন ১৯৭৪-এ কতোবড় একটা দুর্ভিক্ষ গেলো– কিন্তু তারপরও কোনো উদ্যোগ-আয়োজন নেই যাতে দুর্ভিক্ষ ভবিষ্যতে না হয়।

মুয়িদের গলায় বেশ আবেগ প্রকাশ পায়। বলে, পাকিস্তান আমলে যেমন হয়েছিলো, যা কিছু হওয়ার সবই হতো পশ্চিমে। পূর্বে কিছুই না। তেমনি এখন বাংলাদেশ আমলেও দেখা যাচ্ছে যা কিছু হওয়ার, সবই হচ্ছে নদীর পূর্বে বা পশ্চিমে, উত্তরে কিছুই না।

রঞ্জু কিছু বলে না। খালি শোনে। কী বলবে ? কথা তো অযৌক্তিক নয়– উত্তরের জনসংখ্যা প্রায় অর্ধেক কিন্তু সরকারের নজর এদিকে পড়তেই চায় না।

হাঁটতে হাঁটতে কোনদিক থেকে যে কোনদিকে আসে, রঞ্জু খেয়াল করতে পারে না। রাস্তার ধারে একটা গেটওয়ালা বাড়ি দেখিয়ে মুয়িদ বলে, ওই যে দেখুন। প্রেসিডেন্ট-এর প্যালেস।

রঞ্জু প্রথমে বুঝতে পারে না। মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলে মুয়িদ হাসে। বলে, বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট কে ?

আর বেশি কিছু বলার দরকার হয় না। রঞ্জুর মুখেও হাসি দেখা যায়। বলে, শুধু প্রেসিডেন্ট কেন ? বলুন প্রেসিডেন্টের বাপের বাড়ি। সে নজর করে দেখে খানিকটা হতাশই হয়। এই নাকি প্রেসিডেন্টের বাপের বাড়ি ? সে জিজ্ঞেস করে, বাড়িটা কি একইভাবে বরাবর আছে ?

নাহ্ তা কেন থাকবে ? কোনো বাড়িই কি তা থাকে ? তবে যেমন বদলাবার কথা তেমন বদলায় নি।

কিন্তু কেন ? এরশাদ কি ফ্যামিলির খোঁজ খবর করেন না ?

না, তা কেন করবেন না। মুয়িদ বলে, আমাদের অনুমান– ভদ্রলোক তাঁর পাবলিক ইমেজ ঠিক রাখার জন্য পৈতৃক ভিটায় প্যালেস বানান নি। শুনতে পাচ্ছি তাঁকে পল্লীবন্ধু খেতাব দেয়া হয়ে গেছে– রংপুরে এরশাদের বিরুদ্ধে কিছু বলা যায় না।

রঞ্জু হাসে। বলে, যারা ক্ষমতায় থাকে, তাদের বিরুদ্ধে কখনোই কি কিছু বলা যায় ? যখন নির্যাতন আরম্ভ করে, তখনই বোঝা যায়, যে, তার দিন ফুরোতে আর দেরি নেই।

আপনাদের এখানে গতমাসে ডাক্তারদের স্ট্রাইক হয় নি ? রঞ্জু হঠাৎ অন্য প্রসঙ্গ তোলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

মুয়িদ হাসে। বলে, ডাক্তাররা অনেকেই স্ট্রাইক করেছিলো– কিন্তু পাবলিকের তাতে সমর্থন ছিলো না। কেউ কেউ তো ডাক্তারদের রীতিমতো গালাগাল করতো।

মুয়িদের সঙ্গে সে মেডিক্যাল কলেজে যায়। সেখানে হাসপাতালের ওয়ার্ডে, হোস্টেলে ঘোরে ফেরে, মুয়িদের সহপাঠীদের সঙ্গে একটু আধটু আড্ডাও দেয়। তার কোনো অসুবিধা হয় না। একই রকম লাগে। ঢাকার মতোই– এমনকি বয় বেয়ারাদের কথাবার্তা পর্যন্ত এক রকম। মুয়িদকে বললে, সে হাসে। বলে, হ্যাঁ, একই রকম তো হবে– অন্যরকম কেন হবে ? এ্যাডমিনিস্ট্রেশন-এ যাঁরা আছেন, তাঁরা তো বাইরের লোক– নিজেদের চেনাজানা আত্মীয় স্বজনকে ঢুকিয়েছেন– ফলে যা হবার, তাই হয়েছে।

মুয়িদ বেশিক্ষণ সময় দিতে পারে না। অগত্যা, রঞ্জুকে তাড়াতাড়িই ফিরতে হয়।

এদিকে মঞ্জুর সঙ্গে রবির ভাব গাঢ় হচ্ছে একটু একটু করে। রবি কলেজের মাঠে ক্রিকেট খেলে। মঞ্জুকে ওর খেলা দেখতে হয়। একেকদিন রবি খেলে না, খেলা দেখে। সেদিন ও চাচাতো ভাইটাকে ক্রিকেটের ভাষা শেখায়। মঞ্জুর কাছে অচেনা নয় শব্দগুলো, কিন্তু তবু রবির উৎসাহ দেখে সে মনোযোগ দিয়ে শুনতে চেষ্টা করে। অফ ব্রেক, লেগ ব্রেক, ফাস্ট, মিডিয়াম পেস, গুগলি– এসব বোঝাবার জন্য বেচারা নিজের গায়ের ঘাম ছুটিয়ে দেয়। কিন্তু হলে হবে কী। মঞ্জু সব বুঝতে পারলে তো। সে ছেলেদের ছোটাছুটি দেখে, ব্যাটের আঘাতে বলের ছিটকে যাওয়া দেখে। ঘাস ভর্তি মাঠ দেখে। তারপর আসন্ন হেমন্তের ছোঁয়ালাগা গাছগাছালি, মেঘ ভেসে যাওয়া আর হালকা কুয়াশা লাগা ঝাপসা নীল আকাশ, ধানক্ষেতের দিকে উড়ে যাওয়া শালিকের ঝাঁক– এইসব একের পর এক দেখতে থাকে।

এইসব দেখতে দেখতে কখন যে ফেরদৌসের স্মৃতি তাকে পেয়ে বসে সে নিজেই খেয়াল রাখতে পারে না। মনে পড়ে, একবার স্কুলে পড়ার সময় তারা দু'জনে হাঁটতে হাঁটতে বাসাবো পার হয়ে গোরান ছাড়িয়ে মেরাদিয়ার দিকে চলে গিয়েছিলো। চারদিকে ছিলো ধানক্ষেত, সোনালি ধান আর ধান। যতদূর চোখ যায়– হলুদ রঙের বন্যায় যেন দুনিয়া ভেসে যাচ্ছে। ফেরদৌস আর সে হাত ধরাধরি করে চুপচাপ ছবির মতো আলের ওপর দাঁড়িয়েছিলো– সেদিন, একেবারে বিকেল গড়িয়ে যাওয়া পর্যন্ত।

ওর মা পথ চেয়ে বসে ছিলেন। ফেরদৌসের ভয় ছিলো, মা বোধহয় মারবেন। তো দেখলো, মার তো দূরের কথা, উল্টো আদর– কপালে, গালে, মাথায় চুমো আর চুমো– মুখে শুধু একটাই কথা, বলে যাস নি কেন ? এই শয়তান, এই পাজি, কেন বলে যাস নি, আজ তোকে মেরে পিঠের ছাল তুলে নেবো।

মুখে ওইরকম কথা আর বুকে জড়িয়ে ধরে আদর। মঞ্জুর মনের ভিতরে কেউ যেন বলে, ওর মা বাঁচবেন না, এবার ঠিক মরে যাবেন। স্রেফ কাঁদতে কাঁদতেই মারা পড়বেন খালাম্মা। তার আফসোস হয়, যদি সেদিন টাকাটা দেয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে খালাম্মাকে দিয়ে আসতো, তাহলে হয়তো ও টাটা আর বাবুলকে সেদিন এড়িয়ে যেতে পারতো। ওই যে বললো, খুনোখুনি, হাঙ্গামা, রাজনীতি-চাঁদাবাজি, সব কিছু পিছনে ফেলে সে অন্য কোথাও চলে যাবে। সেদিনই বোধহয় ও চলে যেতে পারতো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

কিন্তু পরক্ষণেই মনে হয়, সত্যি সত্যি চলে যেতে পারতো কি ? সেদিন হয়তো ওদের নজর এড়াতো। কিন্তু তারপর ?

যতোবার চিন্তা করে, ততোবারই শেষ পর্যন্ত একটা দৃশ্যই সে মনের ভেতরে দেখতে পায়। রাস্তার ওপর লুটিয়ে পড়ে থাকা লাশটাই সে দেখতে পায়– আর তার বুকের ভেতরটা কেঁপে কেঁপে ওঠে। তার মানে, ফেরদৌসের অমন অপমৃত্যু হতোই। আর সেই কারণেই, অর্থাৎ ফেরদৌসের মৃত্যুর কারণেই তাকেও মরতে হবে।

মঞ্জু একাকী থাকলেই এই ধরনের চিন্তা তার মনের ভেতরে ঘোঁট পাকায় আর তখন তার কিছুই ভালো লাগে না। একদিন বিকেল বেলা খেলার মাঠে তাকে অন্যমনস্ক দেখে রবি বলে ফেললো, আচ্ছা আপনি অতো কী চিন্তা করেন ? রঞ্জু ভাই তো আপনাকে আমাদের সঙ্গে খেলাধুলা করতে বলেছে, কই, একদিনও তো মাঠে নামলেন না– আজ আপনাকে খেলতেই হবে, আসুন।

হাত ধরে টানে রবি। তাতে মঞ্জুর বিরক্তি লাগে। বলে, না ভাই, আজ থাক– আজ ইচ্ছে করছে না। তোমরা খেলো, আমি দেখি।

কিন্তু ওই বলা পর্যন্তই। মনের ভেতরে সে ফেরদৌসের মুখ দেখে। আর দেখে ওই মুখের পেছনে আরও কয়েকজনের মুখ– তবে এ মুখগুলো অস্পষ্ট– টাটা-বাবুল আর নীলার মুখ– তিনখানাই সে চিনতে পারে। আর চিনতে পারে সেই ছেলেটার মুখ, যে মিটিংয়ের মধ্যে হাসতে হাসতে তার পাশে বসা এক ছেলের পায়ে গুলি করেছিলো।

দু'জনের নাম তো সেদিনই সে বলে দিয়েছে। সেই জন্যেই পুলিশের লোকেরা তাকে খুঁজছিলো। কে জানে, টাটা-বাবুলরা নিশ্চয়ই তার খোঁজ করবে– কারণ সে-ই ওই নাম দুটো বলে দিয়েছিলো হাসপাতালে যাওয়ার সময় আর সে জন্যই পুলিশ তাকে খুঁজছিলো। সে জানে, ওরা ঠিকই তাকে খুঁজবে। আর সেজন্য আব্বা কিংবা মায়ের কাছে যাবে। যদি আব্বা কিংবা মায়ের কাছে নাও যায়– ভাইয়ার হোস্টেলে তো অবশ্যই যাবে। তারপর ? তার হদিস কি আর গোপন থাকবে ওদের কাছে ? একদিন এখানেই– এই রংপুরেই বাসা থেকে বেরুবার সময় কিংবা খেলার মাঠে অথবা চৌরাস্তার মোড়ে, ঠিক এক ঝাঁক গুলি এসে তার বুক ঝাঁঝরা করে দেবে।

ওদিকে তখন রবি একটা ছক্কা মেরেছে– তাতে খুব খুশি সে– হাততালি দিচ্ছে সবাই। রবির হাসি উপচানো মুখ বিকেলের রোদে ঝলমল করছে। মঞ্জু ভালো করে তাকিয়ে দেখে চাচাতো ভাইটির দিকে। তার হিংসা হয়– রবি কেমন সহজ স্বচ্ছন্দ আর হাসিখুশি– তার মতো ওকে পালিয়ে বেড়াতে হচ্ছে না।

নিজেকেই সে জিজ্ঞেস করে। আমি পালাতে পালাতে রংপুর এসেছি, এখান থেকে কোথায় যাবো ? দাদুর বাড়ি দিনাজপুর। কিন্তু তারপর ? দিনাজপুর থেকে আর কোথায় ? ছোট ফুফুর বাড়ি ঠাকুরগাঁও– নাকি বড় চাচার মেয়ে নাজু বুবুর শ্বশুরবাড়ি বগুড়া, নাকি মামুন ভাইয়ার কাছে, খুলনায়। ওসব জায়গাতে গেলেই কি তার নিস্তার আছে ? বাবুল-নীলারা কি খুঁজে পাবে না তাকে ? ওদের দলের ক্যাডার কি ওসব জায়গায় নেই ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

মঞ্জুর মগজে সর্বক্ষণ এই এক চিন্তা বোঝার মতো ভারী হয়ে থাকে।

রংপুর আসার গোড়া থেকেই আব্বার সঙ্গে বড় চাচার টেলিফোনে কয়েকবার কথা হয়েছে সেটা রঞ্জু জানে। কিন্তু কী কথা হয়েছে, সেটা চাচা তাকে বলেননি। সাত দিন পর চাচা রাতের বেলা তাঁর রুমে ডাকলেন। ভেতরে গেলে রঞ্জুর দিকে ফোনের রিসিভারটা এগিয়ে ধরলেন। বললেন, তোমার আব্বার সঙ্গে কথা বলো।

ফোনে আব্বার গলা স্পষ্ট শুনতে পায় রঞ্জু। আব্বা জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কেমন আছো?

ভালো, রঞ্জু সংক্ষিপ্ত জবাব দেয়।

মঞ্জু ধাক্কাটা সামলেছে বলে মনে হয়?

রঞ্জু ভাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে জবাব দেয়। বলে, ঠিক বুঝতে পারি না– তবে বেশ স্বাভাবিক এখন– আমরা কবে ফিরবো?

শিগগিরই, আব্বা জবাব দেন। বলেন, মঞ্জুকে ফোনটা দাও।

মঞ্জুর চোখমুখ খুব উজ্জ্বল দেখায় ফোনে কথা বলার সময়। আব্বা কী বলেন মেজো ছেলেকে, তা রঞ্জু আন্দাজ করতে পারে না। কিন্তু মঞ্জুকে যখন বলতে শোনে, হ্যাঁ পারবো, নিশ্চয়ই পারবো– কেন পারবো না? তখন সে অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করে।

মায়ের সঙ্গেও দু'ভাইয়ের কথা হয়। মা রঞ্জুকে বলেন, তোর ক্লাস কামাই হচ্ছে, মঞ্জু ওখানে থাক, তুই চলে আয়।

চাচীর সঙ্গেও মায়ের কথা হয়।

বাইরে এসে রঞ্জু জিজ্ঞেস করে, আব্বা তোকে কী বললেন?

মঞ্জু হাসে। বলে, আমি তোকে যা বলেছি।

রঞ্জু কথাটা ধরতে পারে না। বলে, তুই আবার কী বলেছিস?

বাহ্, বলি নি। তুই চলে যা, আমি থাকি– কালই তো বললাম, মা-ও তাই বললেন।

রঞ্জু লক্ষ্য করে কথা বলার সময় মঞ্জু হাসছে বটে, কিন্তু হাসিটা ওর অন্যরকম– মনে হচ্ছে, যেন জোর করে হাসছে।

আমি চলে গেলে তুই একলা থাকতে পারবি? রঞ্জু জিজ্ঞেস করে।

বাহ্ কেন পারবো না? মঞ্জু পাল্টা জিজ্ঞেস করে।

কেমন করে পারবি? রবির সঙ্গে তোর দেখা হয় তো সেই বিকেল বেলা– সারা দিন একা থাকবি, কার সঙ্গে কথা বলবি? অন্য কারুর সঙ্গে তো চেনাজানাও হয় নি তোর।

ও কিছু একটা করে নেবো, মঞ্জু সহজ ভঙ্গিতে জানায়। বলে ও নিয়ে তোকে চিন্তা করতে হবে না। ওটা কঠিন কাজ নয়, কারুর সঙ্গে একটা সম্পর্ক করে ফেলবো।

তা হয়তো করবি, রঞ্জু বলে, বন্ধুত্বও হয়তো হবে, কিন্তু তোর সেই নতুন বন্ধুকে যদি বলে দিস, কিসের জন্যে তুই রংপুরে এসেছিস, তখন? জানিস, তাতে কী হতে পারে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

হ্যাঁ, জানি। গম্ভীর মুখে জানায় মঞ্জু। বলে, টাটা আর বাবুল খোঁজ পেয়ে এখানে এসে আমাকে খুন করে যেতে পারে।

রঞ্জু হেসে ওঠে ছোট ভাইয়ের কথা শুনে। বলে এই তো বুদ্ধি! কথা নেই, বার্তা নেই, খুন করে যেতে পারে। যতো উদ্ভট চিন্তা। জানিস, তোর দাম কানাকড়িও নয়– একটা খুন করলে ওরা কতো টাকা পায় জানিস তুই?

একটু থেমে ফের বলে রঞ্জু, তুই মগজের ভেতরে ওই খুনোখুনির চিন্তাটা পুষে রেখেছিস কেন বলতে পারিস? তুই তো কোনো অন্যায় করিস নি? কারুর সঙ্গে তোর ঝগড়া নেই– ফেরদৌসকে ওরা খুন করেছে চাঁদার বখরা দেয় নি বলে, তোকে কেন মারবে?

বড় ভাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে মঞ্জু কী দেখে, নিজেই বলতে পারবে না। একবার মনে হয়, ওর কথাগুলো বানানো, ছোট ভাইকে সাহস দেয়ার জন্য বলছে। ফের মনে হয়, আসলে ঠিক কথাই তো বলছে, আসলেই তো আমি কোনো অন্যায় করি নি। কোনো দলাদলির মধ্যে ছিলাম না। কারুর সঙ্গে আমার ঝগড়া-বিবাদ হয় নি– তাহলে আমাকে কেন মারবে ওরা।

দেখ চিন্তা করে, রঞ্জু ফের বলে, তুই ওদের নাম বলে দিবি, কি সাক্ষি দিবি, এই আশঙ্কা করেই তো ওরা তোকে মারতে চাইবে? আসল উদ্দেশ্য তো মুখ বন্ধ করা? তো এসে বললো তোকে, কোনো কথা বলতে পারবে না– কিংবা এসে তোর হাতে টাকা দিলো ১০ হাজার। দিয়ে বললো, তুমি কিছু দেখো নি, তুমি কিছু জানো না– শুধু এই কথা বলবে, অন্য কিছু বলবে না। পারে তো এমন এ্যাপ্রোচ করতে, পারে না? তারপর গোটা ব্যাপারটা আসছে পুলিশ ওদের ধরার পর। তাহলে? পুলিশ কি ওদের কাউকে ধরেছে?

মঞ্জু ভাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে সমস্ত কথা শোনে। তার খুব জানতে ইচ্ছে করে, তার যদি বিপদের আশঙ্কাই না থাকবে, তাহলে কেন তাকে রংপুরে পাঠানো হয়েছে? তাছাড়া তাকে ঢাকা থেকে সরিয়ে দেয়ার প্রস্তাবটা করেছিলো কে? ভাইয়াই তো– না কী? ও-ই তো বলেছিলো ভয় পুলিশকে নয়– ভয় ওদের আর্মড ক্যাডারদের। কথাগুলো তার মনে হয়, কিন্তু সে উচ্চারণ করে বলে না। কী দরকার। ভাইয়া তার জন্যে কতোদিন এখানে পড়ে থাকবে।

রঞ্জু ভাইকে রেখে হয়তো ফিরে চলে যেতো ঢাকায়। কিন্তু পারা গেলো না। মঞ্জুকে কার কাছে রেখে আসবে, সেটাই সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো শেষ পর্যন্ত।

ব্যাপারটা হয়তো শুরু থেকেই ছিলো, কিন্তু সে টের পায় নি। যখন সে জানালো বড় চাচাকে যে, মঞ্জুকে রেখে সে ঢাকায় ফিরে যাচ্ছে, তখন বড় চাচা গম্ভীর মুখে বললেন, তুমি যাচ্ছো ভালো কথা, কিন্তু মঞ্জু কতোদিন থাকবে? তোমার আব্বা তো কিছু বললো না।

রঞ্জু বড় চাচার মুখে অমন কথা শুনে হকচকিয়ে যায়।

সে কিছু বলার আগেই বড় চাচা ফের বলেন, মঞ্জুর সঙ্গে রবিকে ক্রোজলি মেলামেশা করতে দেয়া কি ঠিক হচ্ছে বলে তুমি মনে করো?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

রঞ্জুর মুখ বোবা হয়ে যায় ঐ প্রশ্নের পর।

বড় চাচা ব্যাখ্যা করে বলেন, লেট আস বি প্র্যাক্টিক্যাল। রবি বয়সে ছোট, রাজনীতি-ফাজনীতির ও কিছুই জানে না। ওদিকে মঞ্জু পলিটিক্যাল ক্রাইমের সঙ্গে ইনভলভড বলে মনে হচ্ছে, এ্যাট লিস্ট তোমার আব্বা যা বললেন, তাতে তা-ই দাঁড়ায়। সুতরাং তোমার এভাবে একলা ঢাকায় ফিরে যাওয়া কি ঠিক হচ্ছে ? চিন্তা করে দেখো।

রঞ্জু একটু যেন থমকায় বড় চাচার গলার স্বর শুনে। এমন স্বরে কখনো কথা বলেছেন বলে রঞ্জুর মনে পড়ে না। সে তবু জবাব দেয়। বলে, ও কতোদিন থাকবে, তা নিশ্চয়ই আব্বা আপনাকে জানাবেন।

তোমার আব্বার কথা বাদ দাও, ওর কমনসেন্স কম। আমার প্রশ্ন, তুমি যাবে ভালো কথা, কিন্তু মঞ্জু একলা এখানে কীভাবে থাকবে ? ওর সঙ্গে কথাবার্তাই বা কে বলবে ?

কেন, রবির সঙ্গে তো ও বেশ গল্পগুজব করে, রঞ্জু জানায়।

হ্যাঁ, দ্যাটস দ্য পয়েন্ট– ওই কথাটাই আমি বলছিলাম। আমার পছন্দ নয় রবির সঙ্গে ও ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করুক। কারণ তোমার আব্বা যতটুকু বলেছে, তাতে আমার ধারণা, মঞ্জু পলিটিক্যাল ক্রাইমের সঙ্গে ইনভলভড– এমন ইনভলভমেন্ট তোমার আব্বারও ছিলো, বুঝেছো ? তুমিও কি কমিউনিস্ট ?

রঞ্জু চাচার প্রশ্ন শুনে সোজাসুজি কিছু বলতে পারে না। শুধু মাথাটা ডাইনে বাঁয়ে নাড়ায়। দ্যাটস গুড! বড় চাচা বইয়ের পাতা ওল্টান– যেন কিছুটা স্বস্তিবোধ করছেন, এমন মনে হয়। তারপর বলেন, মঞ্জু কতোদিন থাকবে, কে ওকে কম্পানি দেবে সেটা ঠিক করো প্রথমে, তারপর যেখানে যেতে চাও, যেও।

রঞ্জু চাচার হেঁটমুখী হয়ে বইয়ের পৃষ্ঠা ওল্টানো দেখে। তার মাথায় ঢোকে না, উনি কীভাবে সন্দেহ করলেন যে, মঞ্জু পলিটিক্যাল ক্রাইমের সঙ্গে ইনভলভড। আব্বা কি তাঁর বড় ভাইকে সমস্ত কিছু খুলে বলেন নি ? সে বড় চাচার কথার প্রতিবাদ করে না। মনে মনে ঠিক করে, মঞ্জুকে রংপুরে রেখে সে ঢাকায় ফিরবে না।

তখনকার মতো সে বড় চাচার সামনে থেকে সরে আসে বটে কিন্তু তাঁর কথাগুলো তাঁকে রীতিমতো খোঁচাতে থাকে। মঞ্জু সম্পর্কে অমন ধারণা তাঁর কেন হয়েছে, সে কিছুতেই তার হদিস খুঁজে বের করতে পারে না। তার মনের ভেতরে একটা সন্দেহ পাক খেতে শুরু করে, তাহলে কি বড় চাচা-চাচী দু'জনেই চান না যে তারা দু'ভাই তাঁর বাসায় থাকুক ? দু'জনকে কি সংসারে বাড়তি বোঝা বলে মনে করছেন ?

সন্দেহটা হয় বটে, কিন্তু টেকে না। কারণ দুপুর বেলা খাওয়ার সময় যখন বলে, চাচী আমাদের এবারে বোধহয় যেতে হবে।

ও মা, কোথায় ! চাচী রীতিমতো অবাক হন।

কেন, ঢাকায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

কিন্তু কই, বীথি তো কিছু বললো না, বরং উল্টো বললো, তোরা কিছুদিন থাকবি, আমি যেন শীতের পিঠাটিঠা করে তোদের খাওয়াই।

কিন্তু আমার তো কলেজ, সামনে পরীক্ষা।

চাচী কয়েক মুহূর্ত কিছু যেন চিন্তা করেন, তারপর জানতে চান, কবে যাবি ? সামনের সপ্তাহে ?

না, ভাবছি কাল পরশু–

মাথা খারাপ, চাচী হেসে ওঠেন। বলেন, ও হবে না, আমি তোদের পিঠা করে খাওয়াবো তারপর যাবি। এভাবে আমি তোদের যেতে দেবো ? এতো সোজা ?

একটু থেমে ফের বলেন, তা তুই যাবি ভালো কথা। কিন্তু মঞ্জুকে কেন টানছিস, ও থাক আরও কিছুদিন। ওর তো ক্লাস করার বালাই নেই, ইউনিভার্সিটিতে গণ্ডগোল, কীরে, থাকবি না ? চাচী মঞ্জুর মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেন।

মঞ্জু চোখ তুলে তাকায় চাচীর দিকে আর মনে মনে স্থির হয়ে যায়। কী অদ্ভুত কাণ্ড, অবিকল যেন মা– একেবারে মায়ের মুখ দেখছে। সে হাসিমুখে মাথা হেলায়। বলে, হ্যাঁ, থাকবো।

পাশ থেকে রবি বলে ওঠে, না মা, রঞ্জু ভাইয়াও যাবে না– তোমাকে ভয় দেখাচ্ছে, তুমি বেশি আদর করো না তো, সেই জন্যে।

হাসাহাসির মধ্যে প্রসঙ্গটা তখনকার মতো শেষ হয়। রঞ্জুর বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, বড় চাচা যা বলেছেন তা তাঁর নিজের কথা– কারুর সঙ্গে পরামর্শ করেন নি– চাচীর সঙ্গে তো নয়ই।

ব্যাপারটা আরও পরিষ্কার হলো, যখন তিনি রঞ্জুর হাতে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর একখানা জীবনী তুলে দিলেন। বললেন, এ বইটা পড়েছো ?

রঞ্জু মাথা নাড়ায়। বলে, জ্বী না, পড়ি নি, তবে নাম শুনেছি।

কেন, এসব বই পড়ো না কেন ?

কী জবাব দেবে, রঞ্জু বুঝতে পারে না।

এ সব বই না পড়া অন্যায়, বুঝেছো ? নিজেদের ন্যাশনাল স্ট্রাগলের হিস্ট্রিই যদি না জানলে, তাহলে জানলেটা কী ? য়ু মাস্ট নো এ্যাবাউট দ্য টাইম হোয়েন আওয়ার ন্যাশনাল লিডারস গেভ দ্য ক্লারিয়ান কল ফর থ্রোয়িং এ্যাওয়ে দ্য শ্যাকলস অফ বণ্ডেজ অফ ফরেন ডমিনেশন, বঝেছো ?

রঞ্জু বলে, জ্বী। তারপর ফের বলে, কিন্তু চাচা ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে স্বাধীন হওয়ার পরও ফের কেন স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করতে হলো ?

আরমান সাহেব ধারালো চোখে ভাইপোটির দিকে তাকান। তারপর বলেন, এ আবার কিসের স্বাধীনতা, এ্যাঁ ? এ তো বখড়ার লড়াই– এক ভাই বেশি নিলে আর এক ভাই যেমন ঝগড়া-বিবাদ করে আলাদা হয়ে যায়। সেই রকম।

একটু থেমে কী যেন চিন্তা করেন, তারপর ফের বলেন, হোয়াট ওয়াজ শেখ মুজিব হিমসেলফ এ্যাণ্ড ফর দ্যাট ম্যাটার হিজ মেন্টর সোহরাওয়ার্দী ? দে ওয়ার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ডিভোটেড লিডারস অব পাকিস্তান মুভমেন্ট– এখনও যে তোমরা সোহরাওয়ার্দীকে নিয়ে নাচানাচি করো। তিনি কি পাকিস্তান ভাঙতে চেয়েছিলেন কখনও ?

চুপচাপ শুনে যায় রঞ্জু– কারণ বড় চাচার গলার স্বরে বেশ আবেগ জেগে উঠেছে তখন। আরও হয়তো কিছু বলতেন। রঞ্জু তার সুযোগ দেয় না। বলে, চাচা, আমি পড়বো বইখানা, দেখবেন, পরশু দিনের মধ্যে ঠিক পড়ে ফেলবো।

পরশু দিনের মধ্যে কেন ? হোয়াই সো হারি ? বড় চাচা রীতিমতো অবাক হন।

আমরা আর কতোদিন থাকবো এখানে ?

আরমান সাহেব ভুরু কুঁচকে কিছু যেন ভাবেন। সম্ভবত কোনো কথা স্মরণ করেন।

তারপর বলেন, তোমার থাকতে তো অসুবিধা নেই। আমি মঞ্জুর কথা বলেছিলাম– আর ওর ব্যাপারেই বা যাওয়ার কথা কে বলেছে ? আমি তো শুধু রবির সঙ্গে যাতে না মেশে সে কথা বলেছিলাম–

বলতে বলতে কী যেন মনে পড়ে তাঁর। বলেন, আচ্ছা মঞ্জু নিশ্চয়ই কমিউনিস্টদের সঙ্গে মিশতো, তাই না ? য়ু নো, দে আর দ্য রুটস অব অল ইভিলস– তোমার আব্বাও একসময় ওদের পাল্লায় পড়েছিলো, জেল পর্যন্ত খেটেছে, কেরিয়ারটা তো ওই জন্যই নষ্ট হয়ে গেলো– না হলে ওর কি একজন জার্নালিস্ট হবার কথা ? ও সিএসপি তো হতোই।

বড় চাচা চিন্তা-ভাবনায় কী রকম, সে সম্পর্কে আব্বা কেন খুলে বলেন নি ভেবে তার অবাক লাগে। শুধু বলেছিলেন, উনি একটু একসেন্ট্রিক ধরনের মানুষ– যার সঙ্গে তাঁর মতে মেলে না তাকে সহ্য করতে পারেন না– ওইটুকু কথায় আর কতোটুকু আন্দাজ করা যায় ?

এদিকে মায়ের মুখেও কখনও কিছু শোনা যায় নি তাঁর ভাসুর সম্পর্কে, ভালোও না, মন্দও না।

রঞ্জু বুঝে উঠতে পারে না কী করবে। আব্বা জানিয়েছিলেন, খুব শিগগিরই ঢাকায় ফেরার মতো অবস্থা হবে কিন্তু সেই শিগগির যে কবে হবে কে জানে।

মুয়িদ এর সঙ্গে দেখা করার জন্য সে মেডিক্যাল কলেজের দিকে যাচ্ছিলো, রাস্তায় এক সাইকেল আরোহী তার রিকশাটা দাঁড় করায়। বলে, আপনি তো প্রফেসর আরমান-এর বাসায় থাকেন, তাই না ?

জ্বী, রঞ্জু স্বীকার করে।

ঢাকা মেডিক্যাল-এর ছাত্র, রংপুরে নতুন এসেছেন ?

জ্বী, রঞ্জু জবাব দেয়। তারপর পাল্টা জিজ্ঞেস করে, কিন্তু আপনি কে ?

আমি সিআইডি'র লোক, আপনাকে একটু আমার সঙ্গে যেতে হবে।

তার মানে ? রঞ্জু ভুরু কুঁচকে লোকটার মুখোমুখি তাকায়। তবে ওভাবে মেজাজ দেখালে কী হবে, সে মনে মনে বেশ ঘাবড়ে গেছে ততোক্ষণে। বলে, আপনি আমাকে এ্যারেস্ট করছেন ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

আরে নাহ্। ওসব কিছু না, লোকটা হাসে। তারপর বলে। আমাদের ডিএসপি সাহেব আপনার সঙ্গে একটু আলাপ করবেন। কিছু খবরটবর নেবেন আর কি।

রঞ্জু মনে মনে একটু দিশেহারা বোধ করে। ওই মুহূর্তে তার কী করা উচিত ভেবে পায় না। একবার মনে হয়, যায় লোকটার সঙ্গে– ফের মনে হয়, এভাবে হুট করে কাউকে না জানিয়ে পুলিশের লোকের সঙ্গে যাওয়াটা মোটেও তার উচিত হবে না। যদি কোনো কারণে তাকে আটকে রাখে, তাহলে তো সে ফেসে গেলো নতুন ঝামেলায়। সে বলে, দেখুন এখন আমি জরুরী দরকারে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে যাচ্ছি এই মুহূর্তে আপনার সঙ্গে যেতে পারবো না– তবে ওখান থেকে ফিরে অবশ্যই যাবো– আমি ডিএসপি সাহেবের অফিস চিনি।

লোকটা কী যেন দেখে রঞ্জুর মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে। তারপর বলে, ঠিক আছে, তাড়াহুড়োর কিছু নেই, দুপুরের মধ্যে আসলেই চলবে।

কথাটা বলতে বলতে লোকটা হাসে। তারপর যেদিক থেকে সাইকেল চালিয়ে এসেছিলো, সেই দিকেই চলে যায়।

বেশ চিন্তায় পড়ে যায় রঞ্জু। এ আবার কোন ফ্যাসাদ এসে জুটলো। সিআইডি'র লোক তাকে কেন খুঁজবে। আর ডিএসপি সাহেবেরই বা কী জরুরি দরকার পড়লো তাকে, যে ডাকবার জন্যে লোক পাঠাতে হবে? তবে ফের এও মনে হয় যে, ব্যাপারটা গুরুতর কিছু নয়। হলে, লোকটা এমনভাবে কথা বলতো না।

তবে মেডিক্যাল কলেজের দিকে তার যাওয়া হয় না। মনের ভেতরে কেবলই খচখচ করে প্রশ্নটা, আমাকে কেন খুঁজবে পুলিশের লোক? রিকশাঅলাকে সে বাসার দিকে ফিরে যেতে বলে।

বড় চাচাকে খবরটা জানায় সে। প্রফেসর আরমান শুনে কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে থাকেন। তারপর বলেন, তুমি এখানে এসে কি লোকাল ক্রিমিনালদের সঙ্গে মেলামেশা করছো?

ঐ কথা শুনে রঞ্জু এমন একটা ধাক্কা খায় যে, কিছুক্ষণ তার মুখ দিয়ে কথা বের হয় না। সে ভেবে পায় না এমন প্রশ্ন কীভাবে করতে পারলেন বড় চাচা। তাঁর মগজে সন্দেহটা জাগবার কোনো কারণই সে খুঁজে বের করতে পারে না। সে বেশ কিছুক্ষণ বড় চাচার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, তারপরে বলে, আমি এখানে সত্যিকার অর্থে কোনো লোকের সঙ্গে মেলামেশা করি না।

তাহলে সিআইডি'র লোক তোমাকে কেন খুঁজবে? সিআইডি শব্দটার মানে জানো তো? ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট– খামোকা কেন ওরা তোমার পেছনে লাগবে?

আমার পেছনে লাগার কথা তো বলি নি চাচা, বললাম, ওদের ডিএসপি সাহেব আমাকে দেখা করতে বলেছেন।

কিন্তু কেন?

তা তো বললো না, রঞ্জু মুখোমুখি তাকিয়েই জবাবটা দেয়।

তাহলে সেটা আগে জানো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

কাঁহাতক আর সহ্য হয়। রঞ্জুর মেজাজ খারাপ হয়ে যায় বড় চাচার কথা শুনে। সে ভেবেছিলো, খবরটা বড় চাচার অজানা থাকা ঠিক নয়। সেজন্যই সে জানাতে গিয়েছিলো। কিন্তু ঘটনা ঘটে গেলো উল্টো। বড় চাচাই তার সম্পর্কে বাজে একটা সন্দেহ করে বসলেন। সে দেরি না করে তক্ষুণি বেরিয়ে পড়লো। দেখা যাক, কী বলেন ডিএসপি সাহেব।

অফিসেই ছিলেন ভদ্রলোক। একজন সেপাই ছিলো দরজায়। তাকে বলার সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে নিয়ে গেল। সামনে দাঁড়িয়ে পরিচয় দিতেই ভদ্রলোক একমুখ হাসলেন। বললেন, বসো।

রঞ্জু বসলে বললেন, কেমন আছো, ভালো?

জ্বী, রঞ্জুও পাল্টা হাসে।

রংপুরে কতোদিন হলো তোমাদের।

তা দিন দশেক। রঞ্জু সংক্ষিপ্ত জবাব দেয়।

এই সময়টাই কিন্তু রংপুর খুব ভালো, শীতের আগে আগে– শীত পড়ে গেলে আর ভালো লাগবে না, তখন বেজায় শীত লাগবে।

এক মুহূর্ত থেমে বলেন, তো যাক সে কথা। যে জন্যে তোমাকে ডাকা। আসলে তোমাকে নয় তোমার ভাই মঞ্জুর সঙ্গে আমার কথা বলা দরকার। সরাসরি ওকে ডাকলে ঘাবড়ে যেতে পারে সে কথা চিন্তা করেই তোমাকে ডাকা– তুমি ওকে বুঝিয়ে বললে ও আশা করি ঘাবড়াবে না, আর কথাও বলবে মন খুলে। আমার কথা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো তুমি।

একটু একটু, রঞ্জু হাসতে হাসতে বলে। আপনি আসল কথাটা এখনও বলেন নি।

বলছি। ডিএসপি চেয়ারের পিঠে হেলান দেন, তারপর একটা পেনসিল দু'হাতের আঙ্গুল দিয়ে নাড়তে নাড়তে বলেন। ফেরদৌস খুন হওয়ার ঘটনা নিয়েই আমার কিছু ইনফরমেশন দরকার– ঢাকায় ইনভেস্টিগেশন হচ্ছে– কিন্তু ওতে কাজ কতোদূর হবে বলা মুশকিল। ছেলেটি আমার আত্মীয়। ফুফুতো বোনের ছেলে, ওর বাবা হাশেম সাহেবই আমাকে ব্যাপারটা জানান যে, ফেরদৌসের বন্ধু মঞ্জু এখন রংপুরে। ওর কাছ থেকেই পুরো ব্যাপারটা জানা যাবে। ওর মা-ও হয়তো কিছু বলতে পারতো। কিন্তু ওর এখন মাথার ঠিক নেই– খালি কাঁদে আর আবোল তাবোল বকে– সুতরাং বুঝতেই পারছো– ঢাকার পুলিশকে আমি কিছু ক্লু দিতে চাই, মঞ্জুর নাম অবশ্যই উল্লেখ করা হবে না– অন্য কেউ জানবে না– সাক্ষী দেওয়ার জন্য ওকে কোর্টেও যেতে হবে না– ব্যাপারটা আসলে কী হয়েছিলো, সেটাই আমার জানা দরকার।

রঞ্জু ভদ্রলোকের কথা শুনতে শুনতে তাঁর খাকি পোশাক দেখে, আধপাকা পুরু গোঁফ দেখে, চশমার পুরু ফ্রেম দেখে। সে বুঝতে পারে না। পুলিশের একজন কর্তাব্যক্তি অমন অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে কেন কথা বলছেন। ডিএসপি আহসান উল্লাহর কথা শেষ হলে সে জানতে চায়, আমাকে কী করতে হবে, সেটা বলুন।

তেমন কিছু না। ডিএসপি নরম গলায় বলেন, শুধু একটু বুঝিয়ে বলতে হবে ও যেন আমার এখানে এসে কিছুক্ষণ কথা বলে– তুমিও সঙ্গে থাকবে– গল্প করতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

করতেই যা জানার আমি জেনে নেবো। শুধু বুঝিয়ে বলো যে ঘাবড়ানোর কোনো কারণ নেই– ওর কোনো ক্ষতি হবে না।

আমরা রংপুরে কেন এসেছি, তা কি জানেন ? রঞ্জু এবার খোলাখুলি প্রশ্ন করে।

জানি না, তবে অনুমান করতে পারি। ডিএসপি সায়েব হাসতে হাসতে বলেন, তোমার বাবা-মা ইনসিকিওরড ফীল করছিলেন তাই ওকে ভাইয়ের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন, তাই তো, না কী ?

জ্বী, রঞ্জু জবাব দেয়। বলে, যারা ফেরদৌসকে খুন করেছে তাদের যেহেতু মঞ্জু চেনে সেহেতু ওর ওপরেও হামলা হতে পারে এমন আশঙ্কা হয়েছিলো আমাদের।

হ্যাঁ, সেটাই তো বললাম আমি, ডিএসপি বলেন, কেসটা নিয়ে নানান রকম কথা হচ্ছে– ওর আব্বা মানে হাশেম সাহেব, তিনিও ঠিকমতো বলতে পারেন না ফেরদৌস কোথায় থাকতো, কাদের সঙ্গে ঘোরাফেরা করতো, এমনকি কোন ডিপার্টমেন্টের ছাত্র ছিলো, তাও নাকি ঠিকমতো বলতে পারেন নি।

এই পর্যন্ত কথা হয়। তারপর বেলা দুপুর হওয়া সত্ত্বেও চা খাওয়ান ভদ্রলোক। শেষে বিদায়।

ডিএসপি সায়েবের ব্যবহার দেখে রঞ্জু রীতিমতো ধাঁধায় পড়ে যায়। যা বোঝালেন ভদ্রলোক, আসলে কি ব্যাপারটা তা-ই ? নাকি ভুলিয়ে-ভালিয়ে মঞ্জুকে ফাঁসিয়ে দেবেন। বড় চাচার সঙ্গে পরামর্শ করার কথা মনে হয় একবার– কিন্তু সকাল বেলার ঘটনার কথা স্মরণ করে সাহস পায় না।

কিন্তু বাসায় ফিরে দেখে মঞ্জু মুখ গোমড়া করে বসে আছে। গিয়ে সামনে দাঁড়াতেই বলে উঠলো, যা আগে বড় চাচার সঙ্গে দেখা করে আয়, বলে আয় একটা খুন আর ডাকাতি করে এসেছিস। যদি স্মাগলিং করে কিছু এনে থাকিস, তাহলে তা-ও দেখিয়ে আয়। খানিক পর জানলো, চাচীর সঙ্গেও চাচার একচোট হয়ে গেছে– ওই একই ব্যাপার, চাচী ছেলের দিকে নজর রাখে না কেন, কেন ক্রিমিনালদের সঙ্গে মেলামেশা করতে দেয়।

কে, ক্রিমিনাল ? রঞ্জু হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করে ?

তাতে মঞ্জুও হেসে ওঠে। বলে, ওই প্রশ্নের জবাব দিতে পারেন না– খালি চেল্লাচিল্লি করেন। আমার জন্যই তো এতো অশান্তি– দূর ভাইয়া, আমার একদম ভালো লাগছে না।

তাকে ডিএসপি সাহেবের কাছে যাওয়ার কথা বললে সে কিছু যেন চিন্তা করে। তারপর লম্বা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলে, ঠিক আছে, তাই চল। যা হবার হয়ে যাক কিছু একটা।

পরের দিনই বিকেল বেলা তারা যায়। ডিএসপি সাহেব বেশ খুশি হন দু'ভাইকে দেখে। প্রথমে চা-বিস্কুট খাওয়া হয়। তারপর এলোমেলো একথা-সেকথা আরম্ভ হয়ে যায়। যেমন, ফেরদৌসের সঙ্গে কোন স্কুলে পড়তো। খেলাধুলা কী কী করতো, ক্লাস টিচার কান ধরে বেঞ্চের ওপর দাঁড় করিয়ে রেখেছিলো কি না, কার কার সঙ্গে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

মারামারি হয়েছে, টিফিনের পর ক্লাস পালিয়ে সিনেমা দেখেছে কি না– এই সব আজে-বাজে প্রশ্ন করতে করতে একসময় ভদ্রলোক মূল প্রশ্নে এসে গেলেন এবং মঞ্জুও বলতে শুরু করল, ফেরদৌস কবে থেকে কেন বাড়িতে থাকতো না। কেন সরকারী দলের ছাত্র সংগঠনে ভিড়ে গেলো। কবে একবার তার কাছে টাকা রাখতে দিয়েছিলো, মোটর বাইকখানা কীভাবে পেয়েছিলো, টাটা আর বাবুল তার কাছে কবে ফেরদৌস সম্বন্ধে জানতে এসেছিলো। এসব তো বললোই, তার সঙ্গে আরও বললো, নবাবপুর এলাকায় তোলা চাঁদার বখরা নিয়ে গোলমাল, তার মাকে দেয়ার জন্য একলাখ টাকা মঞ্জুর হাতে দেয়া, ইউনিভার্সিটি এলাকায় আলাপ-আলোচনার আসরে একজনকে আর একজনের হাঁটুতে গুলি মারা– এইসব ঘটনার কথাও।

শুনতে শুনতে রঞ্জুর অবাক লাগে, সুন্দর গুছিয়ে কথা বলতে পারে তার ছোট ভাই। ভদ্রলোক সব শুনে বললেন, ঠিক আছে, তোমার ঘাবড়াবার কোনো কারণ নেই– সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে।

বিদায় নেয়ার সময় আহসান উল্লাহ বললেন, তবে আমার মনে হয়, তোমাদের আরও কয়েকটা দিন সাবধানে থাকা দরকার। কারণ ড্রাগ এ্যাডিক্ট ক্রিমিনালদের সম্বন্ধে কিছুই বলা যায় না।

মঞ্জু ভদ্রলোকের মুখোমুখি তাকিয়ে বলে, আরও কতোদিন এভাবে থাকতে হবে?

তা তো বলা যাচ্ছে না, আহসান উল্লাহ হাসেন। বলেন, দু'সপ্তাহ হতে পারে। আবার দু'মাসও হতে পারে। যে তিনজনের নাম বললে– ওরা তো কেউ এখনো ধরা পড়ে নি– ওরা ধরা পড়লেই তখন আর কোনো রিস্ক থাকবে না।

কেন, ওদের পেছনে আর লোক নেই? মঞ্জুর গলার স্বর হঠাৎ ধারালো হয়ে ওঠে।

আহসান উল্লাহ সেটা টের পান। তাতে তাঁর ভ্রূ কুঁচকে ওঠে যেন একটু। সামান্য হাসিরও আভাস দেখা যায় চিবুকের ভাঁজে। বলেন, তা আছে, অনেক লোক আছে পেছনে। কিন্তু ওরকম দু'চারজন ক্রিমিনালকে নিয়ে ওরা মাথা ঘামায় না।

ঘন্টা দেড়েক পরে দু'ভাই ফেরে। রঞ্জু বুঝতে পারে না, কেন মঞ্জু শেষের দিকে ওভাবে হঠাৎ রেগে উঠেছিলো। জিজ্ঞেস করলে সে জবাব দেয় না– অন্য কথায় চলে যায়। বলে, ভাইয়া, আমাদের বোধহয় ডিএসপি'র কাছে যাওয়া ঠিক হয় নি।

কেন, কী বুঝলি তুই? রঞ্জু প্রশ্নটা না করে পারে না।

মঞ্জু দূরে নজর রেখে বলে, আমি যে রংপুরে আছি এ খবরটা টাটা বাবলুরা পেয়ে যাবে– পুলিশই হয়তো বলে দেবে।

পুলিশ কি আমাদের এখানে আসার খবর জানতো না? এ তুই কী বলছিস? রঞ্জু আরও বলে, না জানলে আমাকে খুঁজে বের করলো কীভাবে?

তা হয়তো জানতো, মঞ্জু স্বীকার করে। তবু বলে, কিন্তু শিওর ছিলো না– তাছাড়া এখন যা জানলো, সবই তো আমার জবানবন্দী হিসেবে কাজে লাগাবে, আমার কথা টেপ করলো কি না তাই বা কে জানে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

হ্যাঁ, তা করতে পারে। রঞ্জু সহজভাবে বলে, তা একদিন না একদিন তো এসব কথা তোকে বলতেই হতো। এখন বলে দিলি, ব্যস চুকে গেলো।

মঞ্জু ভাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, তাহলে আমাকে রংপুরে নিয়ে এলি কেন?

আমাকে নিয়ে সবার এতো দুশ্চিন্তাই বা কেন? ঢাকায় থেকেই তো আমি এসব কথা পুলিশকে বলতে পারতাম।

একটু থেমে ফের বলে, আমি আর এখানে থাকবো না, ঢাকায় ফিরে যাবো।

তার গলার স্বরে রীতিমতো রাগের ঝাঁজ ফোটে, রঞ্জুর তাতে বিরক্ত লাগে। কিন্তু তখনকার মতো ভাইয়ের ঐ কথার পিঠে কোনো কথা বলে না।

বাসায় ফিরে ঢাকায় ফেরার কথা মঞ্জু ফের বললে, রঞ্জু তাকে বোঝাতে চেষ্টা করে। বলে, ঠিক আছে, ঢাকায় আমরা শিগগিরই ফিরে যাবো– তবে তার আগে আব্বাকে জানাই? আব্বা যদি বলেন, তাহলে কালই চলে যাবো।

না, আব্বাকে কিছু জানানোর দরকার নেই। মঞ্জু রাগে গণগণ করে– আমাকে নিয়ে এতো ঝামেলা কেন? আমি এখানে আর কিছুতেই থাকবো না।

পরের দিন ভোর বেলা রঞ্জু দেখে, মঞ্জু বিছানায় নেই। দরজা খোলা এবং টেবিলের ওপর এক টুকরো কাগজ। তাতে লেখা, রবি, আমি ঢাকায় ফিরে গেলাম– মঞ্জু।

পনেরো

নভেম্বরের বিকেল মানে বেশ বিকেল। দিন যে ছোট হয়ে আসছে দিব্যি টের পাওয়া যায়। আর ক'দিন পর দেখতে না দেখতে ঝপ করে সন্ধ্যা নেমে যাবে। এক একদিন উত্তরের হাওয়া হালকা ঝাপটা মারে, তাতে রাস্তার ধারের গাছটা দুটো তিনটে হলুদ রঙের পাতা ঝরিয়ে দেয়।

বীথি আজকাল সারাটা বাড়িতে একা। একাকী আগে যে থাকতো না, তা নয়। তবে নিঃসঙ্গতার বোধটা এমন গভীর ছিলো না। আগে মনে হতো– সবাই আছে তাকে ঘিরে– খানিক সময়ের জন্যে বাইরে গেছে, এক্ষুণি এসে যাবে। আজকাল তা মনে হয় না। ওদের এক্ষুণি ফিরে আসবার ভাবটা মনের ভেতরে টের পায় না। বরং উল্টো প্রকাণ্ড একটা শূন্যতা অনুভব করে সেখানে।

সকাল ৯টার দিকে টুকু বেরিয়ে যায়। কারণ ওর কোচিং ক্লাসের তাড়া থাকে। সামনে পরীক্ষা। আর কর্তা বের হয় ১১টা/১২টার দিকে। ব্যস তারপর গোটা বাড়ি খাঁ খাঁ।

মোমেনা পড়ে পড়ে ঘুমোয়। বীথি এ-ঘর থেকে ও-ঘরে যায়। আবার ও-ঘর থেকে সে-ঘর। মঞ্জুর গোছানো পড়ার টেবিল আবার গোছায়। রঞ্জুর বইয়ের র‍্যাক ঝাড়ামোছা করে, রায়হানের পছন্দের বইগুলো নিচে নামিয়ে [illegible] ফের র‍্যাকে সাজিয়ে রাখে। টলস্টয়, ডস্টয়ভস্কি, লুসুন, গোর্কি, এঙ্গেলস, লে[illegible] ম ধ ধরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

সে বই হাতে নেয় তারপর র‍্যাকে সাজায়। ডাস ক্যাপিটাল বইখানা কোথায় গেলো, সে ভেবে পায় না। তবে অস্থির হয় না। কারণ জানে, এখন ওসব বই পড়বার লোক বাড়িতে শুধু রায়হানই নয়। রঞ্জু তো খুব পড়তো কিছুদিন, এখন মঞ্জুকে দেখে ওসব বই নাড়াচাড়া করতে। একেকদিন রায়হানের ডায়েরির পাতা খুলে তাতে চোখ বুলায়। রায়হানের কবিতা পড়তে পড়তে আপনমনে হাসে। এক সময় কবিতা লিখতো, ছাপাতেও দিতো। আজকাল দেয় না। অথচ এখনো লেখে।

এ-ঘর ও-ঘর বারান্দা করতে করতে তার সময় কাটে। কিন্তু কিছুই ভালো লাগে না। ছেলেদের ছাড়া সে কখনও থাকে নি। রঞ্জু হওয়ার পর যেদিন নাইট ডিউটি থাকতো রায়হানের, সে রাতে সারাটাক্ষণ ছেলেকে বুকে ধরে রাখতো। ছেলের হৃৎস্পন্দন নিজের বুকের ভেতরে অনুভব করতো। ছেলের পেট ভরা থাকলেও স্তনের বোঁটা গুঁজে দিতো ছেলের মুখে। স্তনের বোঁটা চোষার টান আর ছেলের হৃৎস্পন্দনে তার শরীর-মন বিভোর হয়ে থাকতো। স্কুলে পড়ার সময়ও রঞ্জু-মঞ্জু দু'ভাই ছুটির পর ছুটতে ছুটতে আর মা মা ডাকতে ডাকতে বাসায় ঢুকতো। রঞ্জু বড় হয়েছে, ক'দিন পর ডাক্তার হয়ে বেরুবে। এখন হোস্টেলে থাকে। তবু এখনও অমন করে। একদিন দু'দিন পরপরই বাসায় এসে দেখা করে যায়।

বেশ ছিলো সে স্বামী-ছেলে-সংসার নিয়ে। কী যে কপাল তার। কোনো ভালো কাজে হাত দিলে একটা না একটা বাগড়া লাগবেই। জমি কেনা হলো, কোথায় বাড়ি করার জন্য উদ্যোগ আয়োজন আরম্ভ হবে, মাঝখানে এই বিপত্তি। দু'ছেলেকেই সরিয়ে দিতে হলো। এখন তার এ ঘর ফাঁকা, ও-ঘর ফাঁকা, সে-ঘর ফাঁকা। তার নিজের ঘরখানাও তার ফাঁকাই লাগে। ঢুকলে মনে হয় না যে সে ও-ঘরে বসবাস করে। তার ওপর সর্বক্ষণের এই দুশ্চিন্তা, মঞ্জুর বিপদ কতোদিনে কাটবে। স্বামীকে সে কিছু বলতে পারে না। কী বলবে? নিজের চোখেই তো দেখছে মানুষটা দিনরাত কী রকম ছোটাছুটির মধ্যে থাকে। এক তো বাইরের রাস্তায় নিত্যি স্লোগান শোনা যায়– গুলিস্তানের দিক থেকে এক একদিন মেঘ গর্জনের মতো স্লোগানের আওয়াজ ভেসে আসে। সেদিন বিকেলে তো চিয়ারগ্যাস ঢুকে পড়েছিলো বাসার ভেতরে। আজকাল উত্তর আর পশ্চিমের সব দরজা জানালা সে বন্ধ রাখে। রাজনৈতিক উত্তেজনা বাড়ছে বলেই বোধহয় কাগজের অফিসে কাজের চাপ বেশি। রায়হান ১১টা/১২টার দিকে বেরিয়ে যায় আর ফেরে কোনোদিন ৮টায়, কোনোদিন ৯টায়। যেদিন ফেরদৌসের খুনের মামলার খোঁজ-খবর করতে যায়, সেদিন আরও দেরি হয়। কোথায় পুলিশ দারোগা, কোথায় এসপি, কোথায় উকিল, কোথায় এমপি আর মন্ত্রী– এসব করে বেড়াতে হয়। ঘড়ির দিকে নজর গেলে দেখে, ৫টা বাজতে দেরি নেই। সে ওঠে, টুকুর আসবার সময় হলো, এক্ষুণি এসে বলবে, খেতে দাও।

সে রান্নাঘরে ঢুকতে যাবে, ওই সময় দরজায় ধাক্কা এবং ডাক, মা, ওমা, দরজা খোলো। ওই ডাক শুনে তার বুকের ভেতরটা কেঁপে ওঠে, মঞ্জুর গলা না? ও কি ফিরে এলো? সে ছুটে গিয়ে দরজা খোলে আর সঙ্গে সঙ্গে মঞ্জু তার বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। বেশ কিছুক্ষণ একইভাবে একই জায়গায় মাকে বুকে জড়িয়ে ধরে রাখে মঞ্জু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

আর মায়ের ঘাড়ে মুখ ঘষতে ঘষতে নিচু গলায় বলে, মা আমি চলে এলাম। আমার ওখানে অসহ্য লাগছিলো– একদম ভালো লাগছিলো না।

বীথি ছেলের ঘাড়ে হাত বোলায়, মাথায় হাত বোলায়, আর বলে, এসেছিস ভালো করেছিস।

মুহূর্তেক পরে খেয়াল হলে বলে, হ্যাঁ রে তোর আব্বা তোকে আসতে বলেছিলো তো–

মঞ্জুর জবাব না পেয়ে তার আরও খেয়াল হয় যে, রঞ্জুর কোনোরকম সাড়া-শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। সঙ্গে সঙ্গে তার বুকের ভেতরটা ধড়াস করে ওঠে। বলে, হ্যাঁ রে, রঞ্জু কই ? কোথায় রেখে এলি ওকে ?

মঞ্জু মায়ের দিকে মুখ না ফিরিয়েই বলে। আমি একলাই চলে এসেছি– ভাইয়া আমাকে একলা রেখে আসতে চাইছিলো না, তাই আমি চলে এলাম– আমার জন্য ওর পড়ার ক্ষতি হবে, এটা কি ঠিক ? তুমিই বলো ?

বীথি রীতিমতো দিশেহারা বোধ করে। তক্ষুণি ফোন করে রায়হানকে। রায়হান খবর শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর বলে, এসে যখন গেছে তখন আর কী করবে। বরং ভালো করে বুঝিয়ে বলো, যেন কখনও বাসার বাইরে না যায়। আমি রংপুরে ফোন করে খবর নিচ্ছি আসলে ঘটনাটা কী ?

স্বামীর গলার স্বরে উদ্বেগ উৎকণ্ঠার লেশমাত্র নেই। অথচ এই লোকই ছেলের চিন্তায় রাতে ঘুমোয় না। বীথির রীতিমতো ধাঁধা লাগে। অনুমান করে, নিশ্চয়ই মাঝখানে কোনো ঘটনা ঘটেছে কোথাও।

রায়হানের সঙ্গে কথা হওয়ার পর তারও মনে কেমন একটু স্বস্তি বোধ হয়। দুশ্চিন্তা বাদ দিয়ে সে ছেলের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করতে যায়।

খাবার টেবিলে ডাকে ছেলেকে। খাবার গরম করতে করতে জিজ্ঞেস করে, রংপুরে চাচার বাড়ি কেমন লাগলো। চাচী নিজের হাতে খেতে দিতেন, না কাজের লোক খেতে দিতো, শোবার ব্যবস্থা কোথায় হয়েছিলো। চাচার মেয়ে নাজমার সঙ্গে দেখা হয়েছে না হয় নি, বড় ভাই রনি কি একদিনের জন্যও রংপুরে যায় নি ?

এই রকম সব প্রশ্ন করে বীথি। জবাব দিতে দিতে ওদিকে মাঝখানে টুকু এসে যায়। সব জবাব দেয়া হয় না। ভাইকে দেখে টুকু অদ্ভুত চোখে তাকায়। বলে, বড় ভাইয়া কোথায় ?

কথাটা বলেই সে ভেতরের কামরায় চলে যায় এবং পর মুহূর্তেই ফেরে। আবার জিজ্ঞেস করে, কোথায় গেলো বড় ভাইয়া, ওমা বলো না ?

রঞ্জু তো আসে নি, বীথি জানায়। বলে, মঞ্জু একা এসেছে– রঞ্জু বোধহয় কাল আসবে। টুকু মায়ের জবাব শুনে একটু যেন দমে যায়। তবে কিছু বলে না, চুপচাপ ফের বারান্দার দিকে চলে যায়। ওখানে কী দেখে কে জানে। খেতে ডাকা হলে চুপচাপ এসে খেতে বসে।

রায়হান মঞ্জুর ব্যাপারে অনেকদিন পর কিছুটা স্বস্তিবোধ করছে। আজই ম্যানেজিং এডিটর আমানউল্লাহ সাহেবের সঙ্গে বিকেলে আলাপ হওয়ার পর দুশ্চিন্তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ভাবটা এখন আর তেমন নেই। ভদ্রলোক সরকারী দলের লোক, সর্বক্ষণ দলের নেতাদের সঙ্গে ওঠা বসা। ভেতরকার নানান খবর তাঁর জানা। উনিই বললেন যে, অতীতে যা হয়েছে– হয়েছে। এখন থেকে নেতারা দলের মধ্যে কোনোরকম ভাঙন বা বিভেদ তৈরি হতে দেবে না। দলের ক্যাডারদের পুলিশ তো ধরবেই না, এমন কি যাদের ধরা হয়েছে, তাদেরকে যেভাবে হোক জামিনে ছাড়িয়ে আনার ব্যবস্থা নেয়া হবে।

ব্যাপারটা প্রথম থেকেই চাপা ছিলো এবং তাই থেকে যাচ্ছিলো, সরকারী দলের মাস্তানদের নিজেদের মধ্যেকার ব্যাপার হওয়ায় পুলিশ প্রথমদিকে ঘাঁটাঘাঁটি করতে চায় নি। কিন্তু ফেরদৌসের বাবা ব্যাপারটা নিয়ে নানা জায়গায় কথাবার্তা বলতে শুরু করেন। ভদ্রলোক একেবারে হেলাফেলার মানুষ তো নন। বাংলাদেশের পুলিশের দুনিয়ায় ঘোরাফেরা করেন। মিডিয়া আর এ্যাড ফার্মের সঙ্গে ভালো যোগাযোগ। ফলে বাধ্য হয়ে পুলিশকে নড়াচড়া করতে হয়। আর সেটাই হয়ে দাঁড়ায় ভয়ের ব্যাপার। কারণ পুলিশের কাছে মন্থু মুখ খুললেই সেটা মাস্তানদের বিরুদ্ধে চলে যেতো। আর তাতেই বিপদ হতে পারতো। একবার পুলিশের লোক বাসায় এসেও ছিলো মন্থুকে খুঁজতে। তখন বীথি বুদ্ধি করে জানায় যে মন্থু খুলনায় গেছে ওর বড় খালার বাড়িতে। ওই পর্যন্তই এগিয়েছিলো পুলিশ– ভেতরের খবর সে জানে না। তবে এখন তো মনে হচ্ছে, আপাতত পুলিশ বোধহয় আর এগুবে না। আমানউল্লাহ সাহেবের দেয়া খবর যদি ঠিক হয়, তাহলে পুলিশের ও ব্যাপারে আর এগুবার কথা নয়। বন্ধু কামালউদ্দিন তার ডিআইজি বন্ধুর কাছ থেকে ওই একই রকম খবর বের করে আনে। সুতরাং রায়হানের বুকের ভেতর থেকে স্বস্তির নিঃশ্বাস না বের হয়ে পারে ?

তবু ব্যাপারটা খুলে বলতে পারে নি বীথিকে। কারণ তখন এডিটর সাহেব এক মন্ত্রীর প্রেস কনফারেন্সে যাচ্ছিলেন এবং রায়হানকে সঙ্গে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করছিলেন। কারণ নিউজের আব্দুল্লাহ তখনও অফিসে এসে পৌছায় নি। অমন চাপের মধ্যে থাকলে কি মানুষ সব কথা খুলে বলতে পারে ?

অবশ্যি খানিক পরই চীফ রিপোর্টার এসে যায় এবং যথারীতি তাকে সঙ্গে নিয়ে সম্পাদক বেরিয়েও যান। তখন অবসর হয় রায়হানের এবং ওই ফাঁকে সে রংপুরে টেলিফোন করে জানায় যে মন্থু বাসায় পৌছে গেছে। বড় ভাই টেলিফোন ধরেছিলেন। বললেন, রঞ্জুও আজ নাইট কোচে রওনা হয়ে গেলো। একটু থেমে মন্তব্য করলেন, তোমার দুই ছেলেই দেখছি তোমার স্বভাব পেয়েছে– আউট এ্যাণ্ড আউট এ কম্যুনিস্ট।

রায়হান হাসে। বলে, ভাইজান, তোমার ওই পুরনো ফোবিয়াটা এতোদিনেও কেন গেলো না আমি ভেবে পাই না। তুমি নিশ্চয়ই জানো যে কম্যুনিস্ট হওয়া অতো সোজা নয়।

ওই কথার উত্তরে গম্ভীর গলায় জবাব আসে রায়হানের কানে। আরমান বলেন, ইংরেজিটা তুমি এতোদিনেও শিখলে না। তুমি বোধহয় ম্যানিয়া বলতে চাইছো, তবে শুনে রাখো, ওটা আমার ম্যানিয়া বা ফোবিয়া– কোনোটিই নয়– ওটা আমার রিয়েলাইজেশন– বুঝেছো ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

রায়হান বড় ভাইয়ের সঙ্গে একটু ঠাট্টা করার লোভ সামলাতে পারে না। বলে, অমন রিয়েলাইজেশন হওয়াটা কি নরম্যাল ভাইজান? অমন রিয়েলাইজেশন তো হয় ম্যানিয়াকদের আর ফোবিয়া থেকেই যে মানুষ ম্যানিয়াক হয়, সেটা কে না জানে, রংপুরে তো মেডিক্যাল কলেজ হয়েছে– সাইকিয়াট্রির প্রফেসরকে জিজ্ঞেস করে নিও আমার কথাটা ঠিক কিনা।

তোমার কি আর কোনো কথা আছে? বড় ভাই প্রশ্নটা করে আধ মিনিট অপেক্ষা করেন, তারপর লাইনটা কেটে দেন।

অনেকদিন পর মনের দিক থেকে নিজেকে হালকা বোধ করে রায়হান। অফিস থেকে বেরুবার আগে প্রথমে টেলিফোন করে বীথিকে গোটা ব্যাপারটা জানায়। তারপর বেরিয়ে প্রেসক্লাবের পথ ধরে। না রিকশা নেয় না, শ্রীচরণ ভরসা করেই এগোয়। দৈনিক বাংলার মোড়ে পৌঁছে রাস্তা পার হবার সময় লক্ষ্য করে দিনের শেষ রোদ দৈনিক বাংলার মাথায় নরম হলদেটে আলো মাখিয়ে দিয়েছে। তিন তলার বারান্দা দিয়ে বিচিত্রার শাহাদাত চৌধুরীকে হেঁটে যেতে দেখে তার মনে পড়ে। কতোকাল ধরে শাহাদাতের সঙ্গে তার দেখা হয় না। অনেক পুরনো কথা মনে পড়ে। একই সঙ্গে হাসান ভাই, রাহমান ভাই, হুমায়ুন– সব চেনা লোকেরা ছিলো ওই বিল্ডিংয়ে। হাসান ভাই গত হয়েছেন, কিন্তু বাকিরা সবাই? ওঁরা তো আছেন– অথচ একই পেশায় আছে সে, একই শহরে আছে– তবু দেখা হয় না, কী অদ্ভুত কাণ্ড!

মনে পড়ে শাহাদাত যুদ্ধ শেষে ফিরে এলো– না রেডিওতে বক্তৃতা দেয়ার যুদ্ধ না, কিংবা লেখালেখির যুদ্ধও না। রীতিমতো রাইফেল তাক করে গুলি ছুঁড়ে শত্রুর সঙ্গে মোকাবিলার যুদ্ধ– সেই যুদ্ধ শেষে ফিরে এসে ফের পুরনো অফিসের টেবিলেই গিয়ে বসলো। অদ্ভুত লাগে, আর্ট কলেজের পাস করা ছাত্র সাংবাদিকতায় ঢুকে রাইফেল হাতে যুদ্ধ করতে চলে গেলো– ফিরে এসে ফের সাংবাদিকতায় ঢুকে এখন সম্পাদক। শাহাবুদ্দিনও তো অমনই আর্ট কলেজের ছাত্র ছিলো। ওই অবস্থায় মুক্তিযুদ্ধে শামিল হয়ে যুদ্ধ করলো তারপর ফের তুলি হাতে নিয়ে এখন ফের শিল্পী, দুনিয়াজোড়া নাম। রাইসুল আসাদ না মেডিক্যালের ছাত্র ছিলো! সে যুদ্ধ শেষে ফিরে এসে হয়ে গেলো অভিনেতা– এই রকম কতোজন যে আছে, হিসেব করে কি কুল পাওয়া যাবে? সে নিজের মনের ভেতর থেকে জবাব পায়। সে জানে, অমন হিসেব করে লাভ হবে না। বরং হিসেব করতে গেলেই রাগ জন্মায় তার মনের ভেতরে। ওরা যুদ্ধ শেষে ফিরে এলো কেন? কেন যুদ্ধের পরও যে যুদ্ধ থাকে, সেটা শেষ করলো না।

পল্টনের মোড়ে পৌঁছে দেখে ট্রাফিক বন্ধ। মোড় দিয়ে জিপিও'র দিকে একটা ছোট মিছিল যাচ্ছে। জনা পঞ্চাশেক লোক হবে– বয়সে তরুণ কয়েকটা পিচ্চি বাচ্চাও আছে। সবার পিঠে প্ল্যাকার্ড ঝোলানো। তাতে লেখা, স্বৈরাচার নিপাত যাক– গণতন্ত্র মুক্তি পাক। মিছিলের পেছনে পেছনে রায়হান প্রেসক্লাবে গিয়ে পৌঁছায়। দেখে গাড়ি বারান্দার বাইরে, লনে আব্দুল্লাহ দু'টি তরুণের সঙ্গে কথা বলছে। সে দূর থেকেই ডাকলো, রায়হান ভাই, একটু এদিকে আসবেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

রায়হান মুখোমুখি হলে জিজ্ঞেস করে, আমানউল্লাহ সাহেবের সঙ্গে আলাপ করে কিছু আন্দাজ করতে পারলেন ?

কী আন্দাজ করবো ? রায়হান খানিক যেন অবাক হয়। বলে, খবর তো তোমাদের কাছে থাকার কথা– কেন নেগোসিয়েশন কি ফেইল করেছে ?

হ্যাঁ, তাই তো মনে হচ্ছে, মিজান চৌধুরী কেয়ার টেকার সরকারের প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছেন। জানিয়ে দিয়েছেন কনস্টিট্যুশনে যা নেই, তা নিয়ে কোনোরকম আলোচনা করতে তিনি রাজি নন। কামাল হোসেন সাহেবের লোক এই খবর নিয়ে এসেছে।

আজ বিকেল বেলায় আমানউল্লাহ সাহেবের কাছ থেকে যা শুনেছে, সেই সব কথা মনে পড়ে রায়হানের। সে আব্দুল্লাহর মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, মনে হয় সরকারী দল কনফ্রন্টেশনের লাইন নিতে যাচ্ছে।

কী রকম ? আব্দুল্লাহর সঙ্গী তরুণটি দু'পা এগিয়ে আসে। রায়হান চিনতে পারে না ছেলেটিকে। তার দিকে ঘুরে তাকালে আব্দুল্লাহ বলে, এ হচ্ছে আদিব, ইউনিভার্সিটি থেকে সদ্য বেরিয়েছে, এখন সংবাদের নিউজ সেকশনে এ্যাপ্রেনটিস।

তিনজনকে অমন আগ্রহী দেখেও রায়হান কথাটা ভেঙে বললো না যে সরকারী দল তাদের আর্মড ক্যাডারদের রাস্তায় নামাবার জন্য তৈরি হচ্ছে। এইটুকু শুধু জানালো যে, আমার যা মনে হচ্ছে তাই বললাম, তোমরা ইউনিভার্সিটি এলাকায় খোঁজ নিয়ে দেখো, আমার অনুমান ঠিক কি না।

আরও কয়েকজনের সঙ্গে দেখা হলো। সবার মুখে এক কথা, অপজিশনেরও হার্ডলাইন নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। দুই পার্টিকেই এখন কমন প্রোগ্রাম নিতে হবে ?

এক্সপ্রেস নিউজ-এর জামান ভাই চেয়ারের পিঠে হেলান দিয়ে পাইপ টানছিলেন। বললেন, দেখো, কমন প্রোগ্রাম আসছে– ঢাকা অবরোধ করে রাখা হবে। রায়হানের অবাক লাগে। বলে, একি যুদ্ধ নাকি জামান ভাই ? সীজ করে রাখা, যতোক্ষণ না পতন হয়– এ তো যুদ্ধের ট্যাকটিস।

তা বলতে পারো। জামান ভাই ধোঁয়া ছেড়ে বলেন, পিপলস আপসার্জ তো যুদ্ধের চাইতেও বড় ঘটনা। রায়হানের একটু চিন্তা হয়– সত্যি সত্যি কি অমন ঘটনা ঘটবে ? বলে, জামান ভাই আপনার কি মনে হয় ঘটনা অতোদূর পর্যন্ত গড়াবে ?

কেন গড়াবে না ? জামান ভাই পাল্টা প্রশ্ন করেন। বলেন, '৬৯-এ তো অমন ঘটনা ঘটেছিলো– বলো, ঘটে নি ?

তখন তো ছিলো পাকিস্তানের আর্মি শাসন। রায়হান বলতে চেষ্টা করে, কিন্তু পুরোটা বলার আগেই জামান ভাই বলে ওঠেন, হ্যাঁ তখন আর্মি শাসন ছিলো উইদাউট মার্শাল ল– এখনও তো সেই একই অবস্থা। এখানেও আর্মি শাসন এবং পাকিস্তান আর্মিরই শাসন।

নাহ্, রায়হান হেসে ওঠে। বলে, এ কিন্তু বেশি হয়ে যাচ্ছে জামান ভাই।

না, কিছু বেশি নয়। তুমি চিন্তা করে দেখো। জামান সাহেব সামনের দিকে ঝুঁকে বসেন। বলেন, রিপ্যাট্রিয়েটেড আর্মি আর ফ্রীডম ফাইটার আর্মির মধ্যে বেসিক ডিফারেন্স থাকবে না ? বলো তুমি, থাকবে কি না ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

তর্কটা হয়তো আরও এগুতো, কিন্তু তার আগেই এসে গেলো জামান ভাইয়ের তাসের সঙ্গী তিন ভদ্রলোক। রায়হানকে উঠতে হলো। উঠে ভেতরের দিকে গেলে চেনামুখ দেখলেও ঘনিষ্ঠ কাউকে আর দেখতে পায় না। সে লক্ষ্য করে প্রত্যেক টেবিলেই তরুণদের ভীড়। ভয়ানক লোক মাত্র একজন। ওই কামালউদ্দিন ডাকলে তার সঙ্গে বসে কফি খেলো এক কাপ। মনে হচ্ছিলো, কামাল বোধহয় কিছুক্ষণ বসবে। কিন্তু কফি শেষ করে কামাল উঠে দাঁড়ালো। বললো, আমি এবার কাটবো– আজকের ডেসপ্যাচটা এখনো পাঠানো হয় নি।

কী পাঠাচ্ছো ডেজপ্যাচ-এ ? রায়হান জিজ্ঞেস না করে পারে না।

ওই তো, যা শুনছো, অপজিশন ইউনিটির দিকে এগোচ্ছে– গভর্ণমেন্ট গত বছর যা করতে পেরেছিলো আওয়ামী লীগকে ইলেকশনে নামিয়ে, তাতে লাভ হয় নি। আবার আওয়ামী লীগ রাস্তায় নেমে পড়েছে।

ওই কথার পর দু'জনে এক সঙ্গে ওঠে। কামাল তার গাড়ির দিকে গেলে রায়হান গেট দিয়ে বেরিয়ে রিকশায় চেপে বসে। সন্ধ্যার পর ঢাকা শহর, ঝলমল করছে। রোজকার মতোই ফুটপাথ ভর্তি দোকান, মানুষ হাঁটতে পারে না– বায়তুল মোকাররমের মোড়ের জ্যামটাও রোজকার মতোই– একই রকম লাগে। অথচ যেসব খবর এইমাত্র শুনে এলো, তাতে তো কিছুই এমন একরকম থাকার কথা নয়। তাহলে কি ওসব খবর সবার কাছে পৌছায় নি ?

তার মনে পড়ে '৬৯-এর জানুয়ারিতে আসাদকে যেদিন গুলি করে মারা হয়, সেদিন দুপুরেও ঢাকা শহর স্বাভাবিক ছিলো। সেদিন সে দোতলা বাসে চেপে ফার্মগেট-এর দিকে যাচ্ছিলো, শাহবাগের মোড়ে বাসটা যখন বাঁক নিচ্ছিলো ঐ সময় কে একজন বাসের ভেতরেই খবরটা জানায়– খুব শান্ত গলায়, লম্বা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলে, কিছুক্ষণ আগে পুলিশ আসাদ নামে একটি ছেলেকে গুলি করে মেরেছে। খবরটা শোনে সবাই, কিন্তু কারুর চোখেমুখে কোনোরকম প্রতিক্রিয়া দেখে নি। রায়হান বাইরে তাকিয়ে ছিলো। না, রাস্তায় রোজকার মতো মানুষ হেঁটে যাচ্ছিলো। বাস, রিকশাও চলছিলো রোজকার মতোই– বরং মনে হচ্ছিলো অন্যদিনের চাইতে যেন বেশি শান্ত সেদিন ঢাকা শহর। চারদিকে বারবার করে সেদিন সে তাকিয়ে দেখেছিলো। না একটুও মনে হয় নি যে পরের দিন থেকে পুরো ঢাকা শহরের চেহারা বদলে যাবে। শুধু ইউনিভার্সিটি এলাকা নয়– ঢাকা শহরের পুরোটা হয়ে উঠবে স্লোগানে স্লোগানে উত্তাল আর মিছিলের লক্ষ লক্ষ পায়ের ভারে রাস্তাগুলো কেঁপে কেঁপে উঠবে! তাহলে কি আজকের শোনা খবর পৌছেছে মানুষের মনে– সেই খবর ঘুরপাক খাচ্ছে আর অপেক্ষায় আছে একজন আসাদের ?

রায়হান পুরনো ঘটনার স্মৃতিতে হয়তো আরও কিছুক্ষণ থাকতো কিন্তু ওই সময় হঠাৎ মতিঝিল এলাকার বাতি চলে যায়। রিকশাঅলা নিচু গলায় বিড়বিড় করে গালাগাল দিতে শুরু করে। ওই একই সময় আবার এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস এসে লাগে রায়হানের চোখেমুখে। শীতটা তাহলে শেষ পর্যন্ত এলো ? রায়হান আকাশের দিকে মুখ তোলে। তারায় ছাওয়া আকাশের অনেকখানি দেখা যায়। ধোঁয়াটে ছায়াপথও নজরে আসে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ঢাকা শহরে এই এক অসুবিধা। চারদিকে এতো আলো থাকে যে রাতের আকাশ দেখা যায় না। কতোকাল সে তারা দেখে না! অথচ এক সময় রাতের বেলা ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যেতো আকাশের তারা দেখতে দেখতে। সে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকায়, ক্যাসিওপিয়া দেখা যায় কি না, ছায়াপথের উত্তরে থাকবার কথা নভেম্বর মাসে। হ্যাঁ, মাথার ওপরেই থাকে এই সময়। চেনা তারা, কিন্তু উল্টো এম-এর নকশা বানানো তারা কয়টা সে খুঁজে পায় না। সঙ্গী দুই তারাকে নিয়ে এক লাইনের অরনিকেও সে আবিষ্কার করতে পারে না। অথচ এখন, এই সময়, ছায়াপথের মধ্যে মাথার ওপর থাকার কথা। দক্ষিণাকাশের ডেনেবকেও দেখা যায় না। এখন ও তারার তো দিগন্তের খানিক ওপরে থাকবার কথা। সে দক্ষিণমুখী রাস্তা ধরেই যাচ্ছে। হাটখোলার দালানগুলোর ওপরে ওটা কোন তারা? ডেনেব কি? সে নিশ্চিত হতে পারে না। কারণ ওদিকে ভালো দেখা যায় না। বাতি চলে যায় নি, তাই আকাশ আলোর আভায় ঝাপসা। আকাশ দেখতে দেখতেই সে শুনতে পায়, কানের কাছে কেউ যেন বলছে, রায়হান আর কতোদিন? অনেক তো হলো, আপোস তো কম করিস নি। ভয় তো কম পাস নি। লম্পট হতেও তোর বাধে নি– তাহলে? অতো ভড়ং কেন তোর? ছেলে আর বউয়ের জন্য কিছু করে রাখলে এমন কী হতো দোষের? এ্যাঁ?

অনেকক্ষণ ধরে কেউ যেন প্রশ্ন করে যায়। আর সে মনের ভেতরে মিলিয়ে মিলিয়ে দেখে। যখন রাজনীতি থেকে সরে আসে, তখন তার মনের ভেতরে পরাজয়ের গ্লানি। বাবা আর বড় ভাইয়ের চাপে বশু সই করে জেল থেকে বেরিয়ে আসার জন্য কখনও বন্ধুদের পাশে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে নি আর সেই কারণেই সে রাজনীতি থেকে সরে আসে। সাংবাদিকতা শুরু করে সে ছোট কাগজে। কারণ তার কেমন করে যেন ধারণা হয়েছিলো যে, বড় কাগজ এস্টি এস্টাব্লিশমেন্ট হয় না– তাই সরকার বিরোধী বক্তব্য কখনো তোলে না। কিন্তু দেখলো ছোট কাগজও সরকার, প্রশাসন, রিএ্যাকশনারি রাজনীতি সমস্ত কিছুর সঙ্গেই আপোস করে চলে। কারণ, কাগজের মালিকের যে ব্যবসার টাকা চাই, এক্সপোর্ট-ইম্পোর্ট-এর লাইসেন্স চাই, সাপ্লাইয়ের কন্ট্রাক্ট চাই। সমস্ত কিছুর সঙ্গেই সে ভেতরে ভেতরে আপোস করে চলে। ওপরে ওপরে দু'একটা গরম খবর ছেপে বাজার গরম রাখে মাত্র। কিন্তু তবু সে লেগে ছিলো। কারণ তার বিশ্বাস ছিলো যে, দিন বদলাবে। কিন্তু কোথায় কী? '৬৮/'৬৯-এর পরে বদলালো না, '৭১-এর পর বদলালো না। তারপর পুরো দুটো দশক পার হতে চললো, কিন্তু দিন আর বদলালো না। এখন সে কী বলবে কাকে? বীথি আগে কোনো কোনো সময় বলতো– এখন বলে না। মনে হয়, ছেলেদের মনের ভেতরেও বোধহয় অভিযোগ আছে– শুধু বাইরে প্রকাশ করে না, এই যা। রঞ্জুকে না হয় মেডিক্যালে ভর্তি করাতে পেরেছে। কিন্তু মঞ্জুকে? ওর বেলাতে তো জোটাতে পারলো ওই ইউনিভার্সিটির জিওগ্রাফি ডিপার্টমেন্ট। ছেলেটার পেছনে ভালো খরচ করতে পারলে সে কি ভালো রেজাল্ট করতো না? এরপর আসছে টুকু। টুকুর বেলাতেও কি একই রকম ঘটনা ঘটাবে সে? শেষ পর্যন্ত খরচ যোগাতে পারবে না– আর তাতে ছেলেটার ভবিষ্যত হয়ে যাবে অনিশ্চিত। জায়গা কেনা হয়েছে তার, কিন্তু বাড়ি হবে কীভাবে? বউয়ের গয়না বিক্রি করে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

কী হে বীরপুরুষ ? সেই অদৃশ্যজনের গলার স্বর কানের কাছে বিদ্রূপ করে ওঠে। বলে, বউয়ের কাছে নাকি হাত পাতবে না ? যদি না পাতো, তাহলে কি হবে তোমার বাড়ি ?

রায়হান ভবিষ্যতটা পুরো দেখতে পায় না। শুধু এটুকু বোঝে যে, সরকার যদি পড়ে যায় আন্দোলনের ধাক্কায়, তাহলে তার কাগজেরও বারোটা বেজে যাবে। সম্পাদক তো শুধু নামেই, আসলে সমস্ত কিছু দেখছেন আমানউল্লাহ। যদি তাঁকে সরে যেতে হয়, তাহলে কে আছে এমন যে কাগজটাকে ফের ঠ্যাকা দিয়ে ওপরে তুলে রাখবে ? তাহলে কি এই বয়সে তাকে আবার দুয়ারে দুয়ারে চাকরির জন্য ধরনা দিয়ে বেড়াতে হবে ?

রঞ্জু ঢাকায় ফেরার পরদিনই হোস্টেলে যায় না। ঠিক করে, কয়েকদিন বাসায় থেকেই ক্লাস করবে। কাগজে যেসব খবর বেরুচ্ছিলো তাতে অনুমান হয়েছিলো ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের অবস্থা এখনও স্বাভাবিক হয় নি। এসে দেখলো তার অনুমান মিথ্যে নয়, ডাক্তাররা স্ট্রাইকের কথা অবশ্যি ভাবছে না, কিন্তু তরুণরা বিএমএ'র ভেতরে থেকে যথেষ্ট সক্রিয়। আর ছাত্রদের মধ্যে যে ভেতরে ভেতরে কাজকর্ম চলেছে তা তো কারুরই অজানা নয়– কাগজে খবর না বেরুলে কী হবে। জাসদ আর মুজিববাদী দুই ছাত্রলীগই এখন অনেক বেশি কাছাকাছি। ছাত্রদল আলাদা চলছে বটে কিন্তু দুই ছাত্রলীগের সঙ্গে আগের মতো ঝগড়া বিবাদে যেতে চায় না তারা। অপরদিক থেকে উস্কানি দিলেও না। এদিকে সব পার্টিই ঢাকা অবরোধের জন্য তৈরি হচ্ছে। সে প্রথম প্রথম বুঝতে পারে নি অবরোধের কাজটা কীভাবে সম্ভব হবে। অফিস-আদালত হলে কথা ছিলো না। কিছু লোক গেটে ভিড় জমিয়ে রাখলেই হলো, যাওয়া-আসা দুই-ই বন্ধ– অগ্র-পশ্চাৎ গমনাগমন নাস্তি।

ছোটবেলার বন্ধু দীপুর কাছ থেকে শেখা শব্দটা– নাস্তি মানে নেই। সংস্কৃত শব্দ। কিছু লোকজন একসঙ্গে অফিসে ঢোকার গেটে ভিড় করে দাঁড়ালো– ব্যস হয়ে গেলো অবরোধ। অমনভাবে একটা বাজার কিংবা পাড়াও অবরোধ করা যায়। কিন্তু পুরো একটা রাজধানী শহর! একি সোজা ব্যাপার! প্রথমে শুনে মনে হয়েছিলো এ প্রোগ্রাম বিরোধী দলের জন্য বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু মনির যখন বুঝিয়ে বললো যে আসল অবরোধ হবে সেক্রেটারিয়েট ঘিরে, তখন সে ব্যাপারটা বুঝলো। পরে শুনলো, ঢাকা শহরে ঢোকার বড় রাস্তাগুলোতেও কিছু পিকেটিং হবে, যাতে বাস-ট্রাক শহরের ভেতরে ঢুকতে না পারে বা শহর থেকে বেরুতে না পারে। আর ট্রেন চলাচল বন্ধ করা তো সোজা। টঙ্গী রেলস্টেশনের কাছে কয়েকখানা প্লাকার্ড নিয়ে দাঁড়ানো। সঙ্গে যেন দু'চারটি ছেলে গাঁইতি-শাবল হাতে নিয়ে থাকে। ব্যস তাতেই কেল্লা ফতে।

হোস্টেলে মনিরের সঙ্গে বেশিক্ষণ থাকা গেলো না। ওর তখন সলিমুল্লা হলে যাওয়ার তাড়া। হোস্টেল থেকে বেরিয়ে সে শর্টকাট পথ ধরলো নার্সদের হোস্টেলের গেট দিয়ে। কলেজে ঢোকার রাস্তার মোড়ে শাহনির সঙ্গে দেখা, ও বোধহয় হোস্টেল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

থেকে বেরুচ্ছিলো। রঞ্জুকে দেখে হাসতে হাসতে এগিয়ে এলো। মুখোমুখি হয়ে চোখে চোখ রেখে বললো, ভালো ছিলে?

হ্যাঁ। রঞ্জু শাহনির চুল, কপাল ভুরু, ঠোঁট, চিবুক দেখতে দেখতে পাল্টা জিজ্ঞেস করে, তুমি কেমন ছিলে, ভালো?

হ্যাঁ, এমনিতে তো ভালোই ছিলাম, কান্নাকাটির মধ্যে থাকা– বোঝোই কেমন থাকা যায়। কাল এসেছি, আজ কলেজে তোমাকে না দেখতে পেয়ে ভাবছিলাম, ফোন করি– তো শুনলাম, তুমি ঢাকার বাইরে কোথায় নাকি গিয়েছো।

শাহনি কথা বলতে বলতে ওপরের দিকে তাকায়। আকাশে এখনও রোদ, ছেঁড়াফাড়া শাদা মেঘের গায়ে লেগে আছে। ওই রোদ লাগা মেঘ দেখতে দেখতে কিছু যেন ভাবে শাহনি। তারপর নিজের মনেই বলতে থাকে, আমার আর কিছু ভালো লাগে না, মানুষকে যদি বিশ্বাস না করতে পারা যায়, তার চাইতে বড় কোনো কষ্ট আছে, বলো? মানুষ এমন কেন? মেজভাইকে কারা খুন করেছে জানো? ওরই দুই বন্ধু, ডেভিয়েটর রেনিগেড এইসব অভিযোগ তুলে। চিন্তা করতে পারো? দশ বছর ধরে একসঙ্গে লেখাপড়া, সুখে দুঃখে– একসঙ্গে থাকা টানা দশটা বছর, চিন্তা করে দেখো, সেই কমরেডরা এক রাতে বাসা থেকে ডেকে নিয়ে গেলো, তারপর মেরে ফেললো– দোষ কী? না বলেছিলো, খুনোখুনির রাজনীতি আর ভালো লাগে না। চল, আমরা আন্ডারগ্রাউন্ড থেকে বেরিয়ে ওপেন রাজনীতি করি।

বলতে বলতে শাহনির গলার স্বর কেমন বুঁজে আসে। কিছুক্ষণ কিছুই বলে না। রঞ্জু বুঝতে পারে না কী করবে। খানিক পরই ফের শাহনি স্বাভাবিক হয়ে যায়। তখন সে অন্য প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলে। জানতে চায়, খালাম্মা ভালো? খালুজান?

শাহনির আবেগ আবার বইতে শুরু করে। বলে, আমি তোমাদের বাড়ির কথা যতোবার ভেবেছি, ততোবারই অবাক হয়েছি। এমন ফ্যামিলি এখনও এদেশে আছে? আমার মামাদের ফ্যামিলি ঢাকায় থাকে। শুনেছি আব্বার দু'জন চাচাতো ভাইও এখানে থাকেন– কিন্তু ওঁদের কাউকেই আমি কখনও দেখি নি। বাড়িতে সব সময় তোমার কথা মনে পড়তো।

হাঁটতে হাঁটতে রঞ্জুর সঙ্গে শাহনি হাসপাতালের গেট পর্যন্ত আসে। শাহনি জিজ্ঞেস করে, তোমার কি এখানে এখন কোনো কাজ আছে?

রঞ্জু মাথা নাড়ায় হ্যাঁ বোঝাবার জন্য। মুখে কিছু বলে না।

তুমি কিন্তু নিজের কথা কিছুই বললে না। যা বলার সব আমিই বললাম।

রঞ্জু হাসে। বলে, আমার বলবার মতো কথা থাকলে নিশ্চয়ই বলতাম।

আচ্ছা, শাহনি এবার এগিয়ে এসে একেবারে মুখোমুখি ঘনিষ্ঠ হয়। বলে, আমি যদি তোমাদের বাড়ি যাই, খালাম্মার সঙ্গে দেখা করতে, তাতে তুমি আপত্তি করবে?

রঞ্জু ওই অদ্ভুত কথা শুনে যেমন হাসে, তেমনি আবার অবাকও হয়। বলে, কী পাগলের মতো কথা বলছো, আমি কেন আপত্তি করতে যাবো? আমাকে কি অতো গাধা মনে করো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

কী জানি, শাহনি ফের নজর দূরে মেলে দেয়। বলে, জানো, আমার খুব সঙ্কোচ হয়– একেক সময় মনে হয়, তুমি হয়তো ভাববে, আমি গায়ে পড়ে তোমাদের সঙ্গে খাতির জমাতে চাইছি।

রঞ্জু ওই কথার পর আর দাঁড়ায় না। তার সন্দেহ হয়। শাহনি বোধহয় এখনও শোকের ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠতে পারে নি। সে শাহনির দিকে ঝুঁকে পড়ে বলে, শাহনি, আমার একটা জরুরী কাজ আছে। বলেই সে তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে বারান্দায় উঠে যায়।

ষোল

সাধারণত ভোর বেলায় ওঠা হয় না। সেদিন রায়হানের হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায়। চোখ মেললেই বীথির মুখ দেখতে পায়। দেখে বীথি জেগে, কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। শুকনো এলোমেলো চুল। জানালা দিয়ে ভোরের আলো ওর মুখের ওপর পড়েছে– শান্ত চোখ দু'টি দেখতে পায়, চিবুকখানির কোমল ডৌলটি দেখতে পায়, নাকের হীরেটার ঝিকিমিকি দেখতে পায়। গলার চেনের লকেটটি বুকের বাঁ দিকে ঝুলে আছে, তাও দেখতে পায়। লকেট যে জায়গাটি ছুঁয়ে আছে সেই স্ফীত কোমল জায়গাটিও তার নজরের বাইরে থাকে না। ঘুমের আচ্ছন্নতার মধ্যে ওসব দেখতে দেখতেই হয়তো সে পুরোপুরি জেগে উঠতো। কিন্তু ঐ সময় বীথির যে কী হয়। সে মাথা নিচু করে স্বামীর দুই ঠোঁটে নিজের দুই ঠোঁট মিলিয়ে পরিপূর্ণ চুমু খায়। আর তাতেই যেন শরীরে ঝাঁকুনি লেগে যায় রায়হানের। সে দু'হাতে চল্লিশোর্ধা বউকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে শক্তভাবে জড়িয়ে ধরে এবং পাল্টা চুমু খায়। তারপর পেষণ, দলন, শোষণ ইত্যাদি যা যা বরাবর করে সেই সব করতে আরম্ভ করলে বীথি না-না করে। বলে, ছি! লজ্জা করে না, সকাল হয়ে গেছে, ছেলেদের কেউ এসে যদি দরজায় ধাক্কা দেয় ? এই ছাড়ো। সারা রাত নাক ডাকিয়ে ঘুমোলে, এখন সকাল বেলায় যতো শয়তানি।

এই, তোমার বুকে ব্যথা উঠবে তো!

বাধা দেবার জন্য ঐসব কথা বলে বটে। কিন্তু সে আর কতোক্ষণ। এসময় রায়হান টের পায় বীথিও সাড়া দিতে শুরু করেছে। ফলে অনেকদিন পর, অনেকক্ষণ ধরে তারা দেহের মিলন খেলা খেলে– হেমন্তের সেই আশ্চর্য এক ভোর বেলায়।

খেলা সাঙ্গ হয় একসময়। বীথি চিৎ হয়ে চোখ বুঁজে শুয়ে থাকে। মনে হয় ঘুমিয়ে পড়েছে। রায়হান একটু একটু হাঁফাচ্ছিলো, ওরই মধ্যে একেকবার চিন্তাও হচ্ছিলো। বুকের বাঁ দিকে ব্যথাট্যথা উঠে যায় কিনা।

হাঁপ থামলে সে ফের তাকায় বীথির দিকে। তখনও দেখে একই ভঙ্গিতে বীথি শুয়ে, ভারি শান্ত, আর কোমল দেখায় ওর মুখ। মনে হয়, গভীর তৃপ্তির ঘুম ঘুমোচ্ছে। সে নিচু গলায় ডাকে, এই ঘুমোলে ?

হুঁ, চোখ না খুলে বীথি সাড়া দেয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

উঠবে না ?

বিয়ের পর নতুন-নতুন যে ভঙ্গিতে স্বামীর বুকে মুখ গুঁজতো, বহুদিন পর একই ভঙ্গিতে সে রায়হানের বুকে মুখ গুঁজে রইলো, নিস্পন্দ শিথিল ফুলের মালার মতো শরীর নিয়ে। রায়হানও বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছিলো। একসময় দরজায় ধাক্কার শব্দ শুনে উঠে বসতে হলো। শুনলো, বাইরে মঞ্জু ডাকছে। উঠে দরজা খুললে বিছানায় মাকে ঘুমন্ত দেখে বললো, কী ব্যাপার ? আম্মার কি শরীর খারাপ ?

না, তেমন কিছু না। রায়হান ছেলেকে আশ্বস্ত করার জন্য বলে, একটু ঠাণ্ডা লেগেছে বোধহয়।

দেখো, কে এসেছে বাইরে।

রায়হান ব্যস্ত হয়, এতো ভোর সকালে আবার কে এলো ? সে ঘর থেকে বেরুতে যাচ্ছিলো মঞ্জু বাধা দিয়ে বললো, তুমি ব্যস্ত হচ্ছো কেন, তাড়াহুড়োর কিছু নেই, মুনশি এসেছে, আমি ওকে বসতে বলেছি। তুমি মুখেচোখে পানি দাও আগে, তারপর কথা বলো, ও লোক সহজে যাবে বলে মনে হয় না।

মুখোমুখি হলে মুনশি কোনোরকম ভণিতা না করে সোজাসুজি বলে, স্যার, আপনে কি জমির সীমানায় পিলার বহাইতে কইছেন ?

না, কেন ?

কাইল অরা তো পিলার বহাইয়া দিছে, আমি ভাবলাম, আপনেরে খবর দেওয়া দরকার– তাই আন্ধার থাকতে রওনা হইছি। আপনে কি জানতেন যে পিলার দিবো ঐ বিবি সাবে ?

না, রায়হান মাথা নাড়ায়।

দ্যাখতে যাইবেন না ?

রায়হান হাসে। বলে, কী দরকার, সীমানা নিয়ে ঝগড়া করে লাভ আছে ? পাশাপাশি একসঙ্গে ছেলেপুলে নিয়ে বসবাস করবো– আগে থেকে ঝগড়াঝাঁটি বাধিয়ে বসা কি ভালো ?

আহা ঝগড়া করতে কে কইতাছে আপনেরে– দেইখা লইবেন না ? ঠিক মতোন সীমানা গাড়া হইল কি-না, পরে যদি ভ্যাজাল লাগে ?

রায়হান তবু গা করে না, উদাস আলস্যে সোফায় হেলান দিয়ে মুনশির দিকে তাকিয়ে থাকে। তার মনে সামান্যতম সন্দেহ জাগে না যে জমির সীমানা নিয়ে কোনোরকম ঝামেলা হতে পারে। কেমন করে হবে, সে নিজের মনকে বোঝায়, যেখানে মেরি আছে, সেখানে অমন সন্দেহ সে কীভাবে করবে ? সে হেসে উড়িয়ে দেয় মুনশির আশঙ্কা। বলে, না মুনশি, খামোকা ওসব দুশ্চিন্তা করবেন না। সাদেক সাহেবদের দিয়ে ওসব কিছু হবে না, আপনি খামোকা কষ্ট করে না এলেও পারতেন।

কিন্তু স্যার, আপনেরে ক্যামনে বুঝাই কন। সয়সম্পত্তি বিষয়ে বাপ-ভাইরেও মাইনষে বিশ্বাস করে না, আর আপনে বিশ্বাস কইরা বইয়া আছেন দুই দিনের চিনা লোকরে–

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

কাইল আমি নিজের চোখে দেখলাম আপনের লাগাইন্যা বাঁশের খুঁটি ফালাইয়া পিলার বহাইয়া দিছে সীমানার এ্যাক দেড় হাত ভিতরে– আমি কই, আপনে বিশ্বাস করেন না।

ওখানে যে গিয়েছিলো, তাকে আপনি চেনেন ? রায়হান এবার সোজা হয়ে বসে।

না, তারে ক্যামনে চিনমু, সে তো মিস্ত্রি না, কন্টাকদার কিসিমের মানুষ–

তাহলে সে উল্টাপাল্টা কাজ করেছে– একসময় গিয়ে ঠিকমতো পিলার বসিয়ে দিলেই হবে, এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে মানুষকে সন্দেহ করা ঠিক নয়।

মুনশি এবার হাল ছেড়ে দেওয়ার ভঙ্গিতে বলে, কি মুশকিল, আমি কই কী, আর আপনে বোঝেন কী– আমার কথা শুনেন, কে একজন পিলার বহাইতাছে খবর পাইয়া ছুটতে ছুটতে গেলাম, গিয়া দেহি, পিলার লাগান শ্যাষ, জিগাইলাম ও ভাই এইডা কি হইল ? তো কইলো বিবিসাবে আগের খুঁটি ছাড়াইয়া দুই হাত বাইরে পিলার বহাইতে কইছে– আমার কতাডা বুঝলেন এইবারে ?

রায়হানের অবিশ্বাস্য মনে হওয়ায় সে মুনশিকে বসিয়ে রেখেই মেরিকে টেলিফোন করে। মেরি ধরেই রায়হানের গলার স্বর চিনতে পেরে বলে, কি ব্যাপার আজ সূর্য কোনদিকে উঠলো ? এতো সকালে ফোন ?

জমির সীমানায় পিলার বসানো হয়েছে ? রায়হান সোজাসুজি জিজ্ঞেস করে।

হ্যাঁ। কেন ?

রায়হান খিলখিল হাসি শুনতে পায়। মেরি বলে, এই জন্যেই পিলার বসানো হয়েছে।

কীসের জন্যে ? রায়হানের ধাঁধা লাগে।

এই যে, তুমি টেলিফোন করছো ভোর বেলায়– এই জন্যে।

একটু থেমে ফের বলে মেরি, ভেবেছিলে মেরি খুব শস্তা, তাই না ? ইচ্ছামতো কাছে টানা যায়, আবার দূরেও ঠেলে দেওয়া যায়– এখন পারবে আমার কাছে না এসে ?

রায়হানের শুনতে মজা লাগে। তবে রাগও যে হয় না একটু, তা নয়। বলে, ঠিক আছে আমি আজই আসছি।

কোথায় ? মেরি জানতে চায়।

কেন বাসায়, রায়হান জানায়। বলে, পিলার সীমানা খুঁটি এইসব নিয়ে আলাপ করা দরকার।

এই না, আজ না, মেরির গলায় বিব্রত হওয়ার স্বর শোনা যায়। বলে, বাড়ি ভর্তি লোক, আমার দুই ছেলে মিন্টু-লিন্টু এসেছে ওদের দুই বন্ধুকে নিয়ে, বুঝেছো ? প্লিজ আজ না–

আসলে আমার খুব রাগ হয়েছিলো। কতোদিন হয়ে গেলো, একটা খোঁজখবর পর্যন্ত নাও না, তাই ঠিক করলাম দেখি কীভাবে যোগাযোগ না করে থাকতে পারো।

রায়হানের হাসি পায় মেরির কথা শুনে। বলে, তাই দেখো তাহলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

না, প্লিজ, তুমি কিছু মনে করো না। তুমি তো জানোই আমি একটা খ্যাপাটে ধরনের মেয়ে। প্লিজ বুঝতে চেষ্টা করো– জমির পিলার টিলার সব আমি সরিয়ে ফেলবো, রাগ করো না প্লিজ, আমাকে বুঝতে চেষ্টা করো–

মেরি কাকুতি মিনতি আরম্ভ করলে রায়হানকে শেষে বলতে হয়, হ্যাঁ, আমি তে চেষ্টা করছি– আশা করি বুঝতে পারবো।

রায়হান কথা শেষ করে টেলিফোন নামিয়ে রাখে। মুনশি উৎসুক মুখে রায়হানের দিকে সারাটাক্ষণ তাকিয়ে ছিলো। রায়হান ফোন নামিয়ে রাখার সঙ্গে সঙ্গে সে জানতে চাইলো, কি কইলো ? আমি যা কইছি, ঠিক না ?

রায়হান হাসে, তারপর একটু বানিয়ে বলে, আপনি যা বলেছেন তা হয়তো ঠিক, কিন্তু ঐ কন্ট্রাক্টর যা বলেছে আপনাকে, তা ঠিক নয়।

তার মানে ?

উনি বলেছিলেন পিলারটা তাঁর সীমানার দু'হাত ভিতরের দিকে বসাতে।

হায় হায় রে, কী কইতে কী, পান্তা ভাতে ঘি, মুনশি জোরে হেসে ওঠে। বলে, তবু কই স্যার, জমিন যহন কিনছেন, উদলা ফালাইয়া রাখন ঠিক না– উঁচা জমিন, বগলেই রাস্তা, বাঁশ দিয়া টিনের চালা বাইন্দা দিলেই ভাড়া পাইবেন।

ততোক্ষণে বীথি এসে দরজার কাছে দাঁড়িয়েছে। রঞ্জু ও মঞ্জু মায়ের পিছনে। মুনশির কথার জবাবে মাথা ঝুঁকিয়ে বলে, দেখি, কী করা যায়।

মুনশি এক কাপ চা-বিস্কুট খেয়ে চলে যায়। দরজায় পা দিয়ে ফের ফিরে তাকিয়ে বলে, স্যার, আমি কিন্তু ভালোর জন্যই কথাটা কইছি, চিন্তা কইরা দেইখ্যেন।

লোকটা বিদায় হলে রঞ্জু বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, মুনশি তো ঠিক কথাই বললো আব্বা।

হ. রায়হান মুখ না তুলেই বলে, কথাটা ঠিক, কিন্তু এখন এই মুহূর্তে কি ওসব কাজে হাত দেয়া আমার উচিত হবে ? তোমার ফাইনাল পরীক্ষাটা হয়ে যাক, তারপর–

রঞ্জুর হাসি পায় ঐ কথা শুনে। তার ওপর কেন এতো ভরসা করছেন আব্বা, সে আন্দাজ করতে পারে না। বলে, আব্বা, এ তুমি কী বলছো, আমার পরীক্ষা হবে ডিসেম্বরে, রেজাল্ট হতে হতে আরও ২/৩ মাস– তারপর ইন্টার্নিশিপ, যদি ২/১ পেপারে পাস করতে না পারি, তাহলে পিছিয়ে গেলাম আরও ৬/৭ মাস। তাহলে কি ততোদিন সব কাজ বন্ধ থাকবে ?

রায়হান ছেলের দিকে তাকিয়ে থাকে। রঞ্জু কেমন দায়িত্ববান হয়ে উঠেছে, সাংসারিক বিষয় নিয়ে চিন্তা করছে, দেখে তার অদ্ভুত লাগে। রঞ্জু কি তাহলে সাংসারিক দায়িত্ব পালন কাকে বলে তা বুঝতে শিখেছে ? একজনের দিকে তাকিয়ে সবার জন্য দরকারি কাজটা ফেলে রাখা যে ঠিক নয়, এই বোধটা কি তার মধ্যে এসে গেছে ?

বীথি কিছু বলে না। অকারণে খালি হাসে। ঘরে ফিরে এলে, যখন রায়হান বলে, দেখেছো, তোমার ছেলে সংসারের ভালোমন্দ নিয়ে কেমন ভাবতে শিখেছে ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বীথি ঐ কথায় ফের এক প্রস্থ হাসে। বলে, তুমি কি ভেবেছো, ওরা সবাই তোমার মতো হবে ? চালচুলোর চিন্তা কখনোই করবে না ?

রায়হানও হাসে। বলে, যাক এবার যদি তোমার সাধ পূরণ হয়, আমি তো পারলাম না–

তাই বলে তুমি হাত গুটিয়ে বসে থাকবে ? বীথি দু'পা এগিয়ে এসে বলে, এবার কিন্তু সেটি হচ্ছে না– আমি তোমার ঘাড়ে চেপে দেখি, তুমি কিছু করো কিনা।

প্রথমদিকে আমল দেয় নি রায়হান। কিন্তু পরে খেয়াল করে মুনশির উস্কে দেয়া চিন্তাটা মনের মধ্যে বেশ নড়াচড়া শুরু করে দিয়েছে। করতো না। কিন্তু টুকুকে পর্যন্ত যখন বলতে শুনলো যে, এমন পচা বাসায় আর তারা থাকবে না। শিগগিরই নিজেদের নতুন বাড়িতে চলে যাবে, তখন আর উপায় রইলো না। চিন্তাটা মগজের মধ্যে বেশ জাঁকিয়ে বসলো। চিন্তা অন্য কিছুর নয়, টাকার। বাড়ি বানাতে গেলে খরচ কি কম ? অতো খরচ, সে কীভাবে টাকা জোটাবে ? বীথির গয়নাগুলো বেচে আর কতো টাকা পাওয়া যাবে। বিশ ভরি সোনার দাম খুব বেশি হলে লাখ খানেক টাকা। অফিস থেকে এ্যাডভান্স নেওয়া হয়ে গেছে, প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকাও গেছে। তা হলে আর বাকি রইলো কী ? ধরা যাক সে ব্যাংক থেকে কিংবা হাউস বিল্ডিং থেকেই টাকা ধার নিয়ে একটা পাঁচ রুমের একতলা বাড়ি করলো। তাতে কম করে হলেও লাখ পাঁচেক তো লাগবে। ঐ টাকা মাসিক কিস্তিতে শোধ করতে গেলে সংসারের খরচ চালাবে কীভাবে? ছেলে বউকে নিয়ে খাবেই বা কি ? এখন যতো টাকা বাড়ি ভাড়া দিচ্ছে তার চাইতে যদি কিস্তির টাকা বেশি লাগে ?

হিসাবটা যতোবার করে, ততোবারই মস্তবড় একটা প্রশ্ন তার মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়ে যায়।

বীথি একদিন বলে, এই শুনছো, মিসেস সাদেক বাড়ির কাজে হাত দিচ্ছে শিগগির। বাড়ির প্ল্যান নাকি ডিআইটিতে সাবমিট করা হয়ে গেছে।

রায়হান শুধু শোনে, হুঁ হাঁও করে না। সে অবাক হয় না। কারণ জানে মেরির পক্ষে সবকিছুই সম্ভব– অমন চালু মেয়ে মানুষ না পারে কী ? তার পক্ষে একটা প্ল্যান তৈরি করানো, কিংবা সেই প্ল্যান পাস করানো কি কোনো ব্যাপার ? এমন কি লোনের ব্যবস্থাও যদি করে থাকে, তাহলেও সে অবাক হবে না। সে বীথিকে বলে, ওদের টাকা আছে, তাই বাড়ির কাজে হাত দিচ্ছে, আমাদের টাকার ব্যবস্থা হলে আমরাও বাড়ি তৈরির কাজে নামবো।

কিন্তু প্ল্যানটা তো আমরা করাতে পারি। পারি না ?

বীথির কথার জবাব দেয় না রায়হান, শুধু তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। স্ত্রীর কথা খুব স্পষ্ট শুনতে পায় সে। একটু হাসিও পায় স্ত্রীর মুখে অমন কথা শুনে। বলে, ধার শোধের ব্যবস্থা করতে পারলে তবে না ধার নেওয়া যায়, তার আগে ধার নিলে সামাল দেওয়া যাবে ? বলো ?

চোখে চোখে তাকিয়ে কথা হচ্ছিলো। বীথি চোখ নামিয়ে নেয়। বলে, অমন কথা তো জীবনভর শুনছি, আরম্ভ করার প্রথম দিক থেকেই তো অমন হিসেবের কথা বলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

আসছো– ঝুঁকি নিতে চাইলে না, কিন্তু ঝুঁকি না নিয়ে কি পেরেছো ? কতোবার তোমাকে চাকরি ছাড়তে হয়েছে হিসেব করো ? রায়হান চুপচাপ শুনে যায়। সে কেমন করে বোঝাবে যে, মতে মেলে না বলে চাকরি ছাড়ার ঝুঁকি আর বাড়ি বানানোর টাকা ধার নেওয়ার ঝুঁকির মধ্যে ফারাক অনেকখানি। তাছাড়া বয়সের ফারাকও কি কম ?

যখন অমন এক কাগজের চাকরি ছেড়ে অন্য কাগজে চাকরি নিতো তখন সে চল্লিশেও পৌছে নি। আর এখন তার বয়স পঞ্চাশের কোঠা পেরুবার মুখে। এখন সে কীভাবে ঝুঁকি নেবে ? যদি বিপদে পড়ে যায়, তাহলে ঋণের দায়ে যেটুকু জুটিয়েছে সেটুকুই যাবে বেরিয়ে, তখন ? সে নিজেকে হুঁশিয়ারি দেয়। কিন্তু তবু চিন্তাটাকে দাবিয়ে রাখতে পারে না।

পরের দিন সকাল বেলা ফের মুনশি এসে হাজির। কী ব্যাপার ? রায়হান জিজ্ঞেস করলে মুনশি বলে, আপনে কইলেন কী, আর ওই দিক হইতেছে কী ?

কেন, আবার কী হলো ? রায়হান জানতে চায়।

মুনশি ব্যাখ্যা করে যা বলে, তাতে শুধু এটুকু বোঝা যায় যে, সীমানার পিলার সরিয়ে দেওয়া টেওয়া কিছু না সাদেক সাহেবের কন্ট্রাক্টর সেদিন যেখানে পিলার বসিয়ে ছিলো, সেখানেই, অর্থাৎ রায়হানের জমির সীমানার দেড় হাত ভেতরেই পাঁচিল তোলার জন্য মাটি কাটা হচ্ছে।

রায়হান অগত্য ফোন করে মেরিকে। কিন্তু কোনো সাড়া পায় না। রিঙের পর রিঙ হয়, কিন্তু কেউ ধরে না। তখন সে আর কী করে ? তক্ষুণি রওনা হয়ে যায় মুনশির সঙ্গে। গোটা ব্যাপারটা তার কাছে অবিশ্বাস্য লাগে। মরিয়ম যা বললো পরশুদিন, তার পুরোটাই মিথ্যা, আর বানানো ? তাকে ভুলিয়ে রাখার জন্য বলা ? সন্দেহটা জেগে উঠতে চেয়েও জেগে ওঠে না। স্কুটারে চেপে যেতে যেতে রায়হান ঘুরে ফিরে একই প্রশ্ন করে মুনশিকে, আপনি ঠিক দেখেছেন ? পাঁচিল দিচ্ছে ? মাটি খোঁড়া হচ্ছে দেখেছেন ? ইট দেখেছেন কাছে ? বালি ?

কী যে কন স্যার, মুনশি যেন একটু বিরক্ত হয়। বলে, আমারে আপনে কী বুজছেন, বুঝি না– আরে এইসব দ্যাখতে দ্যাখতে চক্ষু দুইডা পইচা গেলো– জমি-জমা স্যার খুব খারাপ জিনিস, আমি ইটা ফালাইতে দ্যাখছি, বালি ফালাইতে দ্যাখছি, এইসব তো হইছে পরশুদিন কা-ই, কাইল বৈকালে না ধরছে মাটি কাটার কাম, সাদেক সাবের দুই পোলা আইছিলো– টাঙ্গাইল না মৈমনসিং-এর মেলেটারি কলেজ না ক্যাডেট কলেজ আছে– সেই কলেজে পড়ে– অরা আইছিলো অরাই মাটি খুদাইলো–

মুনশি খবরটা অকারণে লম্বা করে বলতে থাকে। রায়হান মনোযোগ দিতে পারে না পুরোপুরি। সন্দেহটা তার থেকেই যায়। পাঁচিল তোলার ব্যাপারটা হয়তো ঠিকই। কিন্তু সীমানা বাড়িয়ে নেওয়ার ব্যাপারটা বোধহয় ঠিক নয়। হলেও সেটা মেরির ইচ্ছায় বা হুকুমে হচ্ছে না।

সকাল বেলার রাস্তা ফাঁকা– বাতাসে ঠাণ্ডা ভাব। ধানমণ্ডির পাশ দিয়ে যাবার সময় শিশিরে ভেজা ইউক্যালিপটাস গাছের পাতা দেখলো। স্বাস্থ্যান্বেষী মানুষদের জগিং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

করতে দেখলো, যদিও রোদ অনেকক্ষণ হলো উঠেছে, তবু বুড়ো লোকদের প্রচুর উৎসাহ। দৌড়াতে দৌড়াতে বাড়ি ফিরছেন। ঘামে ভেজা মুখ দেখে মনে হয়, খুব সহজে এঁরা মরতে চান না। কল্যাণপুরের কাছাকাছি পৌঁছতেই দেখা গেলো, সার বেঁধে বাসট্রাক আসছে। তার মানে, আরিচা ঘাটের জ্যাম বোধহয় খুললো। তার মনে পড়ে, নিউজ টেবিলে আরিচা ঘাটের যানজট নিয়ে কথা হচ্ছিলো গতকাল। সে মুনশিকে বলে, গাড়ির লাইন দেখেছেন ?

ই আর কইয়েন না– মুনশি বলে, আমার ভাইগ্গারে সিরাজগঞ্জ যাইতে দ্যাখলাম কাইল দুইফরে। আইজ ভোর বেলা দেখি রাস্তায় খাড়াইয়া রইছে। কইলাম, কিরে কখন আইলি ? তো কইলো, আমিতো আহি নাই– যাইতে পারলে না আইমু! যেমুন একখান জাম লাগছে ঘাটে–

রায়হান মুনশির ঘাটে জ্যাম লাগা বয়ানের দিকেও মনোযোগ দিতে পারে না। তার মনে হয় মুনশির স্বভাব খানিক যেন বদলে গেছে– আগেও লোকটা কথা বলতো, কিন্তু এতো বেশি বলতো না।

বেবিট্যাক্সিকে একেবারে জায়গা পর্যন্ত নিয়ে গেলো মুনশি। জায়গায় পৌঁছে রায়হান অবাক হয়। দেখে মেরি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দু'জন লোকের সঙ্গে কথা বলছে। রায়হান কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই বললো, নাহ্ এখানে কাজ করাতে হলে নিজে এসে থাকতে হবে– এভাবে অসম্ভব।

তার চোখে মুখে যথেষ্ট বিরক্তি আর ক্ষোভ। একজন রাজমিস্ত্রী আর দু'জন যোগালি– সে রীতিমতো বকাবকি করে চলেছে সবাইকে। রায়হান খানিকটা দূরে দাঁড়ায় এবং শোনে পরশুদিন যেমন যেমন বলা হয়েছিলো সেইমতো কাজ করা হয় নি কেন ? বলা হয়েছিলো, পিলার থেকে দু'হাত পশ্চিমে পাঁচিল বসবে। সেটাই বা হচ্ছে না কেন ?

কন্ট্রাক্টর কলিমুদ্দিন কোথায় ? কাল সে দেখা করলো না কেন ?

রায়হান লক্ষ্য করে মেরির কথাবার্তা প্রচণ্ড দাপট। তিনটি লোকই বয়স্ক, কিন্তু ভয়ে একেবারে জড়োসড়ো হয়ে পড়েছে। দেখতে না দেখতে দু'দিকের দুই পিলার থেকে দু'হাত পশ্চিমে খুঁটি পোঁতা হলো একটা করে। তারপর একখানা দড়ি বেঁধে টানটান করে সীমানা চিহ্ন দেওয়া হলো। শেষে ঝপাঝপ কোদাল পড়তে লাগলো। রায়হান দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলো। কিছুই বলার নেই তার।

মেরি এগিয়ে এসে রায়হানের পাশে দাঁড়ায়। বলে, আমার কথাটা বিশ্বাস হয়নি তোমার, তাই না ?

কোন কথা ? রায়হান না বোঝার ভান করে।

থাক আর ন্যাকামি করতে হবে না। ঐ দালালটা নিশ্চয়ই তোমার কাছে গিয়ে নালিশ করেছিলো, ঠিক না ?

রায়হান অন্য প্রসঙ্গে চলে যায়। বলে, তুমি এতো সকালে এখানে কেন ?

মেরি লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে বলে, আর বলো না, মিস্টু-লিস্টুদের দাওয়াত ওদের চাচার বাড়িতে কল্যাণপুরে, ভোর বেলাতেই শুনলাম দু'ভাই মিলে গল্প করছে, এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

পাঁচিল দেওয়া নিয়ে, ওদের চাচাকে বললো, ওরা দু'হাত সরিয়ে দিয়েছে পাঁচিলের সীমানা– চিন্তা করো তো, কেমন লাগে– তোরা ছেলে মানুষ, তোরা বাপু কী বুঝিস জমি জায়গার ব্যাপারে–

মেরি পুরোটা বলে না, তার আগেই প্রসঙ্গ বদলে ফেলে। বলে, তুমিও পাঁচিল তুলে ফেলো, দেরি করে লাভ আছে ? তোমার তো একদিকের পাঁচিল তোলা হয়ে যাচ্ছে আমিই তুলে দিচ্ছি, কী ঠিক না ? বলতে বলতে আড় চোখে মেরি তাকায়। রায়হানের বেশ মজা লাগে। একটু আগে রাগ বিরক্তি ক্ষোভ যার কথায়, চাউনিতে, দাঁড়াবার ভঙ্গিতে ফুটে বেরুচ্ছিলো, তারই মুখের কথায়, তাকানোর ভঙ্গিতে, চলনের ছাঁদে, এখন কেমন সহজ কৌতুক।

সে হাসতে হাসতে বলে, তুমি কনস্ট্রাকশন-এর কাজ খুব ভালো বোঝো বলে মনে হচ্ছে।

মেরি হাসে। বলে, বুঝেছো তাহলে! যাক একটা দুশ্চিন্তা গেলো আমার।

কী রকম ? রায়হান বুঝতে পারে না।

এই তো, মেরি হেসে ওঠে। বলে, তুমি কিছুই বোঝো না, বুঝলে তুমি এমন প্রশ্ন করতে না– রাস্তার দিকে যেতে যেতে মেরি ফের বলে, চলো ঐ গাছতলায় দাঁড়াই– এরা এদিকে কাজ করুক ততোক্ষণ। গাছটা কাঁঠালের, উঁচু মতো জায়গায়, পেছনে আখের ক্ষেত, সামনে ফাঁকা– ফসল-কাটা ধানক্ষেত, তারপরে বিল, তারপরে গাড়ি চলাচলে ব্যস্ত বিশ্বরোড। রায়হান বলে, এখানে কি কিছুক্ষণ বসবে ?

তোমার কি তাড়া আছে ? মেরি পাল্টা জানতে চায়।

না, মাথা নাড়ায়, রায়হান। তারপর ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলে, এখান থেকে অফিসে যাবো, বারোটা পর্যন্ত আমি ফ্রি। মেরি কী যেন ভাবে, তারপর ঘুরে তাকায়, চোখে চোখে। রায়হান লক্ষ্য করে মেরির বয়স্ক চোখেমুখে তরুণীর কৌতুক ঝিকিয়ে উঠলো যেন। গাঢ় স্বরে বলে মেরি, এই যাবে ?

রায়হান মেরির মুখের দিকে নজর রাখলে তার মনের ভেতরে একটা নিষিদ্ধ উত্তেজনা সাপের মতো হিল হিল করে ওঠে। সে জিজ্ঞেস করতে পারে না, কোথায় যাওয়ার কথা বলছে মেরি।

কী হলো ? মেরি নিচু গলায় বলে, যাবে ? একটু থেমে ফের বলে, না হোটেল কোটেল নয়, বাসায়।

বাসায় ? রায়হান অবাক হয়।

হ্যাঁ, বললাম না, মেরি ব্যাখ্যা করে বলে, আজ সবাই তো কল্যাণপুরে– মিল্টু-লিল্টু, ওদের বন্ধু দু'জন, মেয়েরা, ওদের বাবা সবার দাওয়াত।

রায়হানকে অবাক হতে দেখে, মেরি আরও খুলে বলে, সাদেক তো আজকাল একটু একটু হাঁটতে পারে, কথাও বলার চেষ্টা করে, কিন্তু সব বোঝা যায় না।

একটু পর মেরি ফের বলে, কী হলো, যাবে না ? সঙ্কোচ হচ্ছে ? বিবেক দংশন ?

মেরির চোখমুখ ক্রমেই অন্যরকম হয়ে উঠছে, রায়হান লক্ষ্য করে। সে উঠে দাঁড়ায়। বলে, আমি এবার যাবো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

মেরিও সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে য়ায় এবং তার হাত ধরে। বলে, আমিও যাবো।

রায়হান ফাঁপড়ে পড়ে যায়। সে কেমন করে বোঝায় যে এ ধরনের সম্পর্ক ভালো নয়– এমন সম্পর্ক থাকা অন্যায়– সে ভাষা খুঁজে পায় না।

মেরি এবার সোজাসুজি চোখের দিকে তাকায়। বলে, তুমি কি আমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চাও না ?

এমন সম্পর্ক থাকা কি ভালো ? রায়হান দূরে নজর রেখে বলে।

মেরি দু'হাতে জোর করে রায়হানকে মুখোমুখি দাঁড় করায়। তারপর বলে, বলো, কী খারাপ দেখলে তুমি আমাদের সম্পর্কের মধ্যে ?

তোমার ছেলেমেয়েরা দেখলে কী বলবে ?

কিছু বলবে না, মেরি বিদ্রুপের হাসি হাসে। বলে, এসব ঘটনা ওদের চোখ সওয়া হয়ে গেছে। বাচ্চা বয়স থেকে দেখে আসছে ওদের মা আঙ্কেলদের সঙ্গে পার্টিতে যায়, বসার ঘরে দরজা বন্ধ করে কোনো আঙ্কেলের সঙ্গে যদি কথা বলে তো ঐ ঘরের কাছাকাছি ঘেঁসাও বারণ।

রায়হান অবাক হয়। এ ধরনের গল্প তার অনেক জানা থাকলে কী হবে, সত্যি সত্যি যে এমন ঘটনা ঘটে, সেটা সে কখনো দেখে নি। কিংবা এমন ধরনের লোকের সঙ্গে তার কখনো দেখা হয় নি। সে চুপচাপ পাশাপাশি হাঁটে। মুৎসুদ্দি বুর্জোয়ার উত্থান কীভাবে হয়, তার নমুনা পাকিস্তানী আমলে সে দেখেছে। পরে লুম্পেন বুর্জোয়াদেরও উঠতে দেখলো সে স্বাধীনতার পরে। সে ভেবে পায় না, সাদেককে সে কোন শ্রেণীতে ফেলবে– আর সে নিজে ? সে কোন শ্রেণীতে পড়বে ?

হাঁটতে হাঁটতে নিজের জায়গায় পৌঁছে দূর থেকেই মিস্ত্রীকে কাজ শেষ করে বাসায় দেখা করার হুকুম দিয়ে মেরি রায়হানের হাত ধরে বাসস্ট্যান্ডের দিকে রওনা হয়ে যায়।

বেবিট্যাক্সি পাওয়া যায় না। অগত্যা বাসে উঠতে হয় এবং বসার জায়গাও তারা পায়।

কথা হয় না অনেকক্ষণ। অবশ্যি বেশিক্ষণ বাসে থাকার দরকারও হয় না। কল্যাণপুরের কাছাকাছি হলে রায়হান মেরির মুখের দিকে তাকায়। সে ডাইনে বাঁয়ে মাথা নাড়ায়। তার মানে কল্যাণপুরে সে যাচ্ছে না।

তাহলে ? রায়হান নিজের মনের দিকে তাকায়। ঘটনাটা কি তাহলে অনিবার্যভাবেই ঘটতে যাচ্ছে। সে কি পাশ কাটাতে পারে না।

কী দরকার ? কেউ যেন তার মনের কোনো এক গোপন গুহার ভেতর থেকে তাচ্ছিল্যের স্বরে বলে ওঠে। বলে, যা হতে যাচ্ছে তা হতে দিলে কী ক্ষতি ? কারুর তো কোনো ক্ষতি হচ্ছে না। আগে যে ঘটনাটা ঘটেছে, তাতে কি কারুর ক্ষতি হয়েছে ?

রায়হান নিজের মনের কথা নিজের মনের ভেতরেই শোনে এবং তার হাসি পায়।

নিজে কি সে জানোয়ার হয়ে গেলো ! তার চেহারাটা কি হয়েছে হনুমানের মতো ? নাকি বেবুনের মতো ? কোন জানোয়ারের মধ্যিখানের পা যেন খুব লম্বা ? তারও কি এমন কিছু হতে যাচ্ছে ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ওদিকে বাসে যাত্রীর ভিড় বাড়ছে একজন দু'জন করে। দেখতে দেখতে প্রেস ক্লাবের মোড় এসে গেলো। মেরি হাত ধরে বললো, চলো নামি।

রায়হান রাজি হয় না। বলে, এখানে না।

বাহ্ কেন ? মেরি অবাক হয়।

না, এখানে অনেক চেনা লোক আছে। মেরি রায়হানের চোখে চোখে তাকিয়ে বিচিত্র ভঙ্গিতে হাসে।

বাসটা ফের চলতে শুরু করলে রায়হানের হুঁশ হয়। এ সে কী করলো ? মানুষের চোখের আড়ালে কুকর্ম করার আয়োজন করতে শুরু করে দিলো ? সেও কি পাগল হয়ে উঠেছে একটা মেয়ে মানুষের সান্নিধ্য পাবার জন্য ? পল্টনের মোড়ে বাস থামতেই মেরি তার হাত ধরে টেনে নামালো। এবং বাস থেকে নেমেই দু'জনে বেবিট্যাক্সিতে উঠে পড়লো।

সতেরো

গুলিস্তানের মোড়ে ভিড় কম দেখে একটু অবাকই লাগে রঞ্জুর। পরে খেয়াল হয়। আজই তো সেই দশ তারিখ। সেই জন্যেই বোধহয় গুলিস্তানের মোড়ে অন্যান্য দিনের মতো সারি সারি বাস দাঁড়িয়ে নেই। সে কব্জি উল্টে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে। বেলা ন'টা বাজতে পাঁচ মিনিট। আসলেই কি তাহলে অবরোধ হচ্ছে ? তার কৌতূহল লাগে। মনে পড়ে, আজ মনিরের দলবল নিয়ে শিক্ষা ভবনের সামনে রাস্তা অবরোধ করার কথা। রিকশা সোজাসুজি পথ ধরেছিলো। সে রিকশাঅলাকে ডান দিকে জিপিও স্টেডিয়াম গেটের দিকে যেতে বললো। রিকশাটা ডাইনে বাঁক নিলে সম্মিলিত স্বরে স্লোগানের আওয়াজ শুনতে পায় সে। পিছনে ঘুরে তাকালে দেখে নবাবপুরের দিক থেকে একটা মিছিল আসছে। সামনের সারির সবার হাতে ফেস্টুন আর তাতে লেখা– স্বৈরাচার নিপাত যাক, গণতন্ত্র মুক্তি পাক। কেউ কেউ আবার গলায় ঝুলিয়ে নিয়েছে ওই ফেস্টুন। রিকশা চেন খুলে যাওয়াতে রিকশাঅলা ডান দিকে ফুটপাত ঘেঁসে রিকশা দাঁড় করিয়ে, চেন ঠিক করতে করতে আপন মনে বলে, আইজ এ্যারশাদ সাবের খবর আছে।

কেমন খবর ? রঞ্জু জিজ্ঞেস করে।

খবর আর কেমুন ? দ্যাহেন না। জিপিও'র মোড়ে গেলেই দ্যাখবেন, কেমুন বড় বড় পুলিশের টেরাক আর কতো পুলিশ খাড়াইয়া রইছে। সেকরেটারির গেটে গেলে দ্যাখবেন, য্যান যুদ্ধ হইবো এমুন একখান ভাব।

আজ কি অবরোধ সত্যি সত্যি হচ্ছে ? রঞ্জু ফের জিজ্ঞেস করে।

মনে তো হয়, রিকশাঅলা রিকশার সিটে বসতে বসতে বলে, দ্যাহেন না, বেলা হইয়া গেল, কিন্তু টেরাক-বাস রাস্তায় দ্যাহা যায় না ক্যান। কন ? বাস তাও দেখছি, কিন্তু টেরাক একখানও দেহি নাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

রিকশাঅলা এক পাশে সরে মিছিলটাকে যাবার রাস্তা করে দেয়। বেশ বড় মিছিল, মাথা যখন স্টেডিয়ামের বড় গেট পার হয়ে বাঁয়ে বাঁক নিয়েছে, পেছনের দিকটা তখনও, স্টেডিয়ামের নতুন গেট বরাবর এসে পৌছায় নি। খানিক পর মিছিলটা দাঁড়িয়ে পড়ে। রিকশাঅলা বলে, স্যার, এই দিক দিয়া যাইতে পারবেন না, মনে হয় মিছিলের মানুষগিনি সভা করবো।

ডান ফুটপাত ঘেঁসে কিছুটা এগিয়ে স্টেডিয়ামের গেটের কাছাকাছি পৌছে রিকশা থেমে যায়। রিকশাঅলা বলে, স্যার, আর সামনে যাওন ঠিক না।

রঞ্জু বাঁয়ে তাকিয়ে দেখে। রাস্তাটা মাঝ বরাবর ফাঁকা, কিন্তু তা হলে কী হবে, দু'পাশের ফুটপাতে ভিড় করে মানুষ দাঁড়িয়ে। জিপিও'র গেটের কাছাকাছি পর্যন্ত এই অবস্থা। মোড়ের ওদিকে সেক্রেটারিয়েটের পাশের রাস্তায় নাকি পুলিশ বন্দুক উঁচিয়ে কমব্যাট পজিশন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আর নীল উর্দিঅলারা কখনও রাস্তার এদিক যাচ্ছে, কখনও ওদিক। কয়েকজনের হাতে আয়তাকার লোহার ঢাল, মাথায় হেলমেট, সোজাসুজি পুবমুখো তাকিয়ে আছে। রঞ্জু লক্ষ্য করে মিছিলটা এখনো ভেঙে যায় নি। দু'পাশের ফুটপাতে দাঁড়ানো লোকেরা তখনও থেকে থেকে দু'হাত আকাশের দিকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে স্লোগান দিচ্ছে ঃ পুলিশী জুলুম– বন্ধ করো, বন্ধ করো। সামরিক শাসন– মানি না, মানি না। স্বৈরাচার– নিপাত যাক, নিপাত যাক।

রিকশার ওপরে দাঁড়িয়ে মিনিট দুই দৃশ্যটা দেখে রঞ্জু। কার্তিকের সকাল বেলায় কোমল রোদ রাস্তায় রোড ডিভাইডারে লাগানো গাছের হাওয়া লাগা ঝিরিঝিরি পাতায় কাঁপছে। আকাশে মেঘ নেই। তবু গ্রীল রড ঝাপসা দেখায়। রঞ্জুর বুকের ভেতরে ভেতরে অদ্ভুত রকমের সাড়া জাগে। ওদিকে স্লোগানের আওয়াজ মুহূর্মুহু হতে থাকলে তার কেমন মনে হয়, অহেতুক সে রিকশার ওপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখছে, সে কি কিছু করতে পারে না ? কিছু না পারুক, অন্তত ওই মিছিলের মধ্যে শামিল তো হতে পারে। কথাটা মনে হয় একবার, তারপর ক্রমেই সেটা তাকে খোঁচাতে আরম্ভ করে। তাকে যে সকাল দশটায় পিজির কার্ডিওলজি ডিপার্টমেন্টে গিয়ে প্রফেসর হায়দারের সঙ্গে দেখা করে আজ সন্ধ্যা বেলায় তার আব্বাকে দেখার জন্য এ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে, সে কথা সে ওই মুহূর্তে বেমালুম ভুলে গেছে। সে রিকশা থেকে নামতে যাবে, ওই সময়ে রিকশাঅলা বলে, ওই দ্যাহেন, কী করে–

রঞ্জুর ওই মুহূর্তে রিকশা থেকে নামা হয় না। সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা দেখে। একটি অল্পবয়সী তরুণ আদুল গায়ে; পিঠের ওপর বড় বড় হরফে লেখা– স্বৈরাচার একটি অল্পবয়সী তরুণ আদুল গায়ে; পিঠের ওপর বড় বড় হরফে লেখা– স্বৈরাচার নিপাত যাক। ছেলেটি দু'হাত মাথার ওপর তুলে তালি দিতে দিতে পায়ে তাল দিয়ে ঘুরে ঘুরে নাচতে শুরু করেছে। দু'পাক ঘুরতে না ঘুরতে তার বুকের ওপরকার লেখা হরফগুলোও নজরে এলো। সেখানে লেখা– গণতন্ত্র মুক্তি পাক। ছেলেটা বোধহয় সুর করে গানও গাইছে। দূর থেকে শোনা যায় না। কিন্তু রাস্তার দু'পাশের লোকদের দেখে মনে হচ্ছে, সবাই ওই গান শুনতে শুনতেই তাল মিলিয়ে হাতে তালি দিচ্ছে।

রঞ্জু রিকশা থেকে নেমে পড়ে। পকেট থেকে টাকা বের করে রিকশাঅলার হাতে গুঁজে দিয়েই সে লাফিয়ে ডান দিকের ফুটাতে উঠে যায়। ভিড়টা এড়িয়ে ঠেলেঠুলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

কোনো রকমে জিপিও'র গেট পর্যন্ত সে চলে যায়। উল্টো দিকে হকার্স মার্কেটের ঝাঁপ বন্ধ। কিন্তু ফুটপাতে কিছু লোক ঠিকই দাঁড়িয়ে শোনে। চোখে তাদের ত্রস্ত চকিত ভাব, মিছিলের লোকেরা শেষ পর্যন্ত কী করে, সম্ভবত তাই দেখতে চায়। তবে তেমন কিছু দেখলে মার্কেটের ফাঁক-ফোকর গলে যে ভেতরের দিকে চলে যাবে তা দিব্যি বোঝা যায়।

জিপিও'র মোড়ে সে দেখে, লম্বা চওড়া গড়নের মাঝবয়সী এক সাহেব ফুটপাতে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর সঙ্গী দেশী এক ফটোগ্রাফারকে নিচু গলায় নির্দেশ দিচ্ছেন, আর সঙ্গীটি ক্যামেরা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে টপাটপ ফটো তুলে নিচ্ছেন। ভদ্রলোকের মুখ বেশ ভারী– যদিও মুখখানা লম্বাপানা এবং কপালও বেশ বড়। বিদেশী কোনো সাংবাদিক কি ? রঞ্জুর মনে কৌতূহল জাগে। যদি হন, তাহলে তো বুঝতে হবে, সরকারের অবস্থা নড়বড়ে– আর সে খবর বিদেশীদের কাছেও পৌঁছে গেছে। তার কৌতূহল জাগে, কোন দেশের লোক উনি ? কোন কাগজের ? নাকি অন্য মিডিয়ার ? তার জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে জাগে। কিন্তু পারে না। কারণ ভদ্রলোক ঠিক ওই মুহূর্তেই ডাইনে বাঁয়ে তাকাতে তাকাতে রাস্তা পার হয়ে যেখানে পুলিশের দলটা ব্যারিকেড দিয়ে বসেছিলো, সেদিকে গেলেন। পুলিশকে কিছু যেন বললেন, তাতে একজন, সম্ভবত ইন্সপেক্টর জাতীয় কেউ, প্রথমে মাথা বাঁকিয়ে না না করে ওঠে, তারপর মাথা হেলিয়ে সায়েবের কথায় সায় দেয়। তখন ভদ্রলোক সোজা হাঁটলেন সেক্রেটারিয়েটের দক্ষিণ গেট পর্যন্ত। ওখানে দাঁড়িয়ে কী দেখলেন কে জানে, তারপরই হন হন করে হেঁটে ফিরলেন। ঠিক ওই সময় দেখা গেলো, গুলিস্তানের দিক থেকে একটা মিছিল আসছে।

সায়েব ভদ্রলোক ততোক্ষণে ফিরে এসে ফের ফুটপাতে দাঁড়িয়েছেন। সঙ্গী ফটোগ্রাফারকে বললেন, নাউ গো স্ট্রেইট টু মাই হোটেল রুম, আস্ক সামাদ টু কন্ট্যাক্ট মি এ্যাট দ্য প্রেসক্লাব।

সামাদ নামটা কানে আসতেই রঞ্জু ফের ভদ্রলোকের মুখের দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখে। আব্বার বন্ধু সামাদ চাচার নাম বললেন কি ভদ্রলোক ? সামাদ চাচা তো বিবিসি'র রিপোর্টার– ইনিই কি তাহলে বিখ্যাত সাংবাদিক মার্ক টালি ?

সে হয়তো আরও কিছুক্ষণ দাঁড়াতো। কিন্তু পারা গেলো না। ঠিক ওই মুহূর্তে দু'জন পুলিশ এসে ফুটপাতের লোকজন সরিয়ে দিতে আরম্ভ করলো। বললো, এখানে দাঁড়াবেন না, এখান থেকে সবাই চলে যান।

রঞ্জু লক্ষ্য করে, গুলিস্তানের দিক থেকে আসা মিছিলটা আরও এগিয়ে এসেছে, স্টেডিয়াম গেটের মুখে যে মিছিলটা থেমে গিয়েছিলো তার লোকেরা অনেকেই রাস্তায় বসে পড়েছে। তখনও নেচে চলেছে গায়ে স্লোগান লেখা ছেলেটা। কখনো ফুটপাতে দাঁড়ানো লোকদের মাঝখান থেকে, কখনো বসে পড়া লোকদের ভেতর থেকে স্লোগান উঠছে– কখনো জোরে, কখনো আস্তে, কিন্তু স্লোগান থামে না।

দেখতে চাইছিলো রঞ্জু আরও কী ঘটে। একজন অফিসার রাস্তার ওপার থেকে প্রায় তেড়ে এসে ধমকাতে লাগলো। যান এখান থেকে, না হলে এ্যারেস্ট করা হবে– এক্ষুণি যান, কোনো কথা নয়– কুইক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ওই ধমকের সঙ্গে সঙ্গেই তিন চার জন সেপাইকে ছুটে আসতে দেখা যায়– আর তাতেই জমায়েতের লোকেরা পিছু হটতে শুরু করে। কেউ কেউ দৌড় লাগায় পেছনে পল্টনের মোড়ের দিকে– যদিও ওই মোড়েও পুলিশের পাহারা আরও বেশি শক্ত। তবু সবাই ওই দিকেই ছোটে।

পল্টনের মোড় থেকে প্রেসক্লাবের দিকে যাওয়ার রাস্তা বন্ধ হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা। পেছনে হাউস বিল্ডিংয়ের দিকে রাস্তায় কিছু লোক বসে পড়েছে। সামনে পুলিশের গাড়ি ছাড়া অন্য গাড়ি নেই। উত্তরমুখী নতুন রাস্তায় খণ্ড খণ্ড মিছিল এবং শ্লোগান। যারা রাস্তায় বসে পড়েছে, তাদের মধ্যে কেউ খবরের কাগজ মেলে ধরেছে মুখের সামনে, কেউ মাথা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে তর্ক করছে বলে মনে হয়। কয়েকটি ছেলেকে হাসা-হাসি করতে দেখা যায়। একজন মাইকে হারান বিজ্ঞপ্তি প্রচার শুরু করে দেয়। বলে, একজন প্রেমকাতর পুরুষ মানুষ হারিয়ে গেছে। সন্ধান দাতাকে এক লক্ষ টাকা পুরস্কার দেয়া হবে, বঙ্গভবনে যোগাযোগ করুন।

রঞ্জু রগড়টা দেখে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে। ওই সময় একখানা রিকশা আসছিলো নতুন রাস্তা ধরে। পল্টনের ডান দিকে পুলিশ আটকালো। তখন এক মহিলা মিনতি করে বলতে লাগলেন– প্লীজ, আমাদের যেতে দিন। হাসপাতালে যাচ্ছি রোগী নিয়ে– খুবই ইমারজেন্সি– প্লীজ!

হাসপাতালের কথা শোনামাত্রই রঞ্জু মনের ভেতরে চমকে ওঠে। তার না পিজিতে যাবার কথা! সে ঘড়ির দিকে তাকায়। বেলা দশটা। তার মানে, প্রায় এক ঘণ্টা ধরে সে রাস্তায় রগড় দেখছে। সে জোরে পা চালায় সামনের দিকে। হাঁটে আর নিজেকেই ধিক্কার দেয়, ছি রঞ্জু ছি! তোর আব্বা অসুস্থ, ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করে এ্যাপয়েন্টমেন্ট নেওয়ার কথা– আর তুই রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখছিস ? ছি!

সেক্রেটারিয়েটের গেটের কাছাকাছি পৌঁছতেই একজন পুলিশের লোক এগিয়ে এসে তাকে দাঁড় করায়। জানতে চায়, কোথায় যাচ্ছেন এদিকে ?

অমন ধমকের স্বরে প্রশ্ন করায় রঞ্জু থমকায় এক পলক। তারপর মুখোমুখি তাকিয়ে বলে, পিজি হাসপাতালে যাবো।

বাসা কোথায় ?

ওয়ারী। রঞ্জু চোখে চোখ রেখে জবাব দেয়।

তো এ পথে কেন ? এ্যাঁ ?

রঞ্জু মুখোমুখি তাকিয়ে থাকে, তারপরে বলে, এটাই তো সোজা রাস্তা।

দাঁড়ান !

রাগী গলায় ধমকে ওঠে নীলউর্দি পরা লোকটা। তারপর এগিয়ে এসে রঞ্জুর শরীরের দু'পাশ আর কোমর-বুক-পিঠ দুই হাত দিয়ে হাতড়ায়। তারপর ঘাড়ে হাত রেখে ধাক্কা দেয়ার মতোই সামনের দিকে ঠেলে দিয়ে বলে, যান এবার, এখানে দাঁড়াবেন না।

রঞ্জুর দারুণ খারাগ লাগে। নিজেকে অপমানিত বোধ হয়। নিজের ওপরেও রাগ হয়। কেন সে এ পথে আসতে গেলো, রিকশাঅলা তো গুলিস্তানের মোড় থেকে সোজা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

রেলওয়ে হাসপাতালের রাস্তাটাই ধরেছিলো। মনিরদের অবরোধ কেমন হচ্ছে সেটা দেখা কি তার খুব জরুরী! নিজের মনের ভেতরেই সে চাবকানি খায়– বাপের হার্টের অসুখ আর ছেলে রাস্তায় রাস্তায় রগড় দেখে বেড়াচ্ছে! ছি! সে নিজেকে বলে, রাস্তার ওপর কেউ তোকে কান ধরে উঠ-বস করাতো, তাহলে ঠিক শাস্তি হতো তোর।

সে প্রেসক্লাব ছাড়িয়ে সামনের মোড়ে রিকশার জন্য দাঁড়ায়। কিন্তু কোথায় রিকশা ? এ মোড়েও পুলিশ আর পুলিশ। তার হাসি পায় পুলিশের ভিড় দেখে। সেক্রেটারিয়েট কি বেদখল হয়ে যাচ্ছে যে এতো পুলিশের পাহারা।

তার মনে পড়ে, মনিরদের এ পথেই আসার কথা ছিলো। সে ডাইনে বাঁয়ে ফের তাকায়। তাকাতে তাকাতে ট্রাফিক আইল্যাণ্ডের লোহার গ্রেটিং-এর গায়ে আটকানো ছোট্ট স্মৃতিফলকটা দেখে। স্বাধীন বাংলাদেশের পুলিশের গুলি খেয়ে প্রথম ছাত্র মরার সাক্ষী নাকি ওই স্মৃতিফলকটি। ছাত্ররা সেদিন ভিয়েৎনামে মার্কিন আগ্রাসনের প্রতিবাদে মিছিল বের করেছিলো।

রিকশা পাওয়া যাবে বলে তার মনে হয় না– ওই সময়ই আবার একজন পুলিশের লোককে এগিয়ে আসতে দেখে সে উত্তরমুখো হাইকোর্টের পাশ দিয়ে পা চালিয়ে হাঁটতে শুরু করে। দশটার মধ্যে না হোক সাড়ে দশটার মধ্যে পৌছলেও প্রফেসর হায়দারকে পাওয়া যাবে। আব্বা তো তাই বললেন, সে ইনভেস্টিগেশন রিপোর্টের ফাইলটা শক্ত করে ধরে সামনের দিকে এগোতে থাকে।

প্রফেসর হায়দার ফাইল খুলে পুরনো প্রেসক্রিপশন আর রিপোর্ট দেখতে দেখতে হাসেন। তারপর মাথা ডাইনে বাঁয়ে নাড়াতে নাড়াতে বলেন, রায়হান সাহেব একই রকম রয়ে গেলেন–

তারপর রঞ্জুর মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেন, উনি কি এখনও রাত জাগেন ? সিগ্রেট খান ?

রঞ্জু বেশ অবাক হয়। প্রফেসর হায়দার কি তাহলে আব্বার বন্ধু স্থানীয় লোক ? সে ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, না সিগ্রেট ছেড়ে দিয়েছেন, অনেকদিন হলো– রাতও জাগতে দেয়া হয় না।

প্রেসার চেক করা হয় রোজ ?

রঞ্জু চুপ হয়ে যায় ওই প্রশ্নে। কিছু বলতে পারে না। কারণ দায়িত্বটা তো তার।

সে বলে, জমি নিয়ে একটা ঝামেলা হয়েছে। তারপর সারা দিন অফিসে ছিলেন। অফিসে লোকেরা বাসায় টেলিফোন করে জানায় যে, খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। আমরা হাসপাতালে নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম, উনি কিছুতেই রাজি হলেন না– ওষুধ খেয়ে বসে রইলেন– তারপর বুকের ব্যথাটা কমলে আমরা বাসায় নিয়ে যাই।

ঠিক আছে, প্রফেসর হায়দার বলেন, তুমি তো শুনলাম মেডিক্যাল-এ পড়ছো, তাই না ?

রঞ্জু মাথা নিচু করে বলে, জ্বি।

ঠিক আছে। প্রফেসর হায়দার ফের বলেন, আজ আমার ওখানে নিয়ে এসো রাত আটটার পর– আমি ইসিজি করে দেখতে চাই, কী অবস্থা– ঠিক আছে ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

রঞ্জু চলে আসছিলো। উনি ডাকলেন। বললেন, শোনো, তুমি রোজ বাসায় গিয়ে একবার করে প্রেসারটা চেকআপ করবে, ঠিক আছে?

জ্বি, রঞ্জু ফের মাথা নিচু করে জানায়। তারপর দরজা খুলে চেম্বার থেকে বেরিয়ে আসে। বারান্দায় দাঁড়ায় কিছুক্ষণ সে। ঘড়ির দিকে তাকায়, বেলা এগারোটা। খুব মৃদু হাওয়া বইছে– হাওয়ায় একটু ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব। অদূরের বটগাছটার দিকে নজর ফেরায় সে।

আব্বাকে যদি হাসপাতালে আনতে হতো তাহলে কি সে পিজিতে আনতো?

মেডিক্যাল কলেজের হাসপাতালে তো সেই কবে থেকেই শুনে আসছে শিগগির করোনারি কেয়ার ইউনিট খোলা হবে– কিন্তু কই, কোনো খবর নেই।

আচ্ছা, হয়েছিলোটা কি? সে গতকালের অভিজ্ঞতা স্মরণ করে। মঞ্জু এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বললো, শিগগির চল। কোথায়? না আব্বার অফিসে। তখন রাত আটটার মতো। আব্বাকে একটা সোফায় শুইয়ে রাখা হয়েছে, মাঝে মাঝে কপাল কুঁচকে উঠছে, আর বুকের বাঁ দিকে হাত বুলাচ্ছেন।

একজন ডাক্তার বলছেন, হাসপাতালে চলুন– বুঝলেন? হাসপাতালে গেলে আরাম পাবেন। আব্বা মাথা নাড়ান চোখ বোঁজা অবস্থায়, আর বলেন, আমি ঠিক আছি, তোমরা ব্যস্ত হচ্ছো কেন? রঞ্জুকে এক পাশে ডাকেন আম্মা। বলেন, আমার মনে হয়, বাসায় নিয়ে গেলেই ভালো– বাসায় বিছানায় শুয়ে একবার ঘুমিয়ে পড়লে ঠিক হয়ে যাবে।

কাছে গিয়ে মাথার কাছে ঝুঁকে পড়ে আম্মা ফের জিজ্ঞেস করেন, শুনছো?

হুঁ, সাড়া দেন আব্বা।

ব্যথাটা কি এখনও আছে?

আব্বা বাঁ হাতটা বুকের ওপর রাখেন একবার। তারপর বলেন, না।

এখন কি বাসায় যাবে? আম্মা ফের জিজ্ঞেস করেন।

একটু পর।

শুধু ওইটুকু কথা। তারপরই বাসায় ফেরে সবাই।

কিন্তু আব্দুল্লাহ সাহেব থেকে থেকেই আম্মাকে বলছিলেন, ভাবী, হাসপাতালে নেওয়াই ভালো ছিলো– যখন বিকেল বেলা এলেন, খুব খারাপ লাগছিলো দেখতে; মনে হচ্ছিলো সিরিয়াস কিছু হয়েছে।

রঞ্জুর ওই খটকাটা তখন থেকেই মনের ভেতরে খচখচ করছে, আব্বা কাল দুপুর বেলাটা কোথায় কাটিয়েছেন?

প্রেসক্লাবে? নাকি ফুলবাড়িয়ায়?

সন্ধ্যার পর ডাক্তারের কাছে যাওয়ার কথা। কিন্তু বাসা থেকে বেরুবার পর বাহন আর পাওয়া যায় না। বেবিট্যাক্সি তো নেই-ই। এমনকি রিকশাও দেখা যায় না। রঞ্জু দুপুর বেলা রাস্তায় গোলমাল হতে দেখেছিলো। কিন্তু তার জের সন্ধ্যা পর্যন্ত চলবে? রঞ্জু ঘন ঘন একবার ডাইনে তাকায় একবার বাঁয়ে। র‍্যাঙ্কিন স্ট্রীটের মোড় পর্যন্ত কোনো বাহনের নিশানা দেখতে পায় না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই স্লোগান শোনা যায় এবং তারপরই একটা মিছিল আসতে দেখা যায়। বাতির নিচ দিয়ে যাবার সময় দেখা যায় কয়েকজনের কপালে লাল পট্টি বাধা, দু'একজনের হাতে হকিস্টিকও দেখা গেলো। রঞ্জু অনুমান করে মিছিলটা নিরীহ ছিলো না। মুঠো বাঁধা হাত শূন্যে ছুঁড়ে ছুঁড়ে স্লোগান দিচ্ছে– নূর হোসেন হত্যার– বিচার চাই, বিচার চাই। স্বৈরাচারের চামড়া– খুলে নেবো আমরা। পুলিশী জুলুম– চলবে না, চলবে না।

দূর থেকে মনে হয়েছিলো ছোট, কিন্তু দেখা গেলো মিছিলটা বেশ বড়ই। রায়হান দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে। বলে গাড়িটাড়ি নিশ্চয়ই ভেঙেছে এরা। অন্য কাউকে না, বলে নিজেকেই। অফিস থেকে দুপুরের দিকে টেলিফোন পায় আব্দুল্লাহর। ওর কাছ থেকেই জানে যে আজ সকাল দশটার দিকে সেক্রেটারিয়েটের দক্ষিণ গেটের সামনের রাস্তায় হাঙ্গামা হয়েছে এবং জিপিও মোড়ের কাছে পুলিশের গুলিতে নূর হোসেন নামে একটি তরুণ ছেলে মারা গেছে। আব্দুল্লাহ মন্তব্য করে, ব্যাপারটা সিরিয়াস হয়ে যাচ্ছে রায়হান ভাই, হাঙ্গামার সময় ব্রিটিশ জার্নালিস্ট মার্ক টালি উপস্থিত ছিলো। মনে হয় বিবিসিতে এতোক্ষণে খবরটা চলে গেছে– শহরে দারুণ উত্তেজনা, বহু গাড়ি ভাংচুর করা হয়েছে। আব্দুল্লাহর কথা যে মিথ্যা নয় তা মিছিলের লোকজনকে দেখেই সে বুঝলো।

রায়হান কিছুক্ষণ আরও দাঁড়ায়। গুলিস্তান এলাকাও কি ফাঁকা ? তার সন্দেহ হয়। নইলে সন্ধ্যা বেলা তো বাসের পর বাস এই পথ দিয়ে যাবার কথা। সে কিছুক্ষণ পর ছেলেকে বলে, না বাবা বাদ দাও, আজ রাস্তায় হাঙ্গামার মধ্যে পড়তে পারি। তাছাড়া রিকশা তো দেখছি না।

রঞ্জু কিছু বলে না। আসলেই তো আব্বার অনুমান ঠিক। কারণ দুপুর বেলা মেডিক্যাল কলেজ থেকে ফেরার সময় বায়তুল মোকাররমের মোড়ে সে বহু লোক জড়ো হতে দেখেছে। সবারই চোখে মুখে মারমুখী ভাব। কারও কারও হাতে লাঠি দেখেছিলো সে। সবচেয়ে বড় কথা– ওই সময় গুলিস্তান এলাকায় সে ট্রাফিক পুলিশ দেখে নি। বলতে গেলে পুলিশই ছিলো না গোটা এলাকায়। তারও অনুমান, পথঘাটের অবস্থা এখনও স্বাভাবিক হয় নি। কোনোরকম যানবাহন পাবে বলে তার মনে হয় না। কিন্তু যখন দেখলো ডাক্তারের কাছে যেতে হচ্ছে না বলে আব্বা খুশি হয়েছেন, তখন তার একটু রাগ হয়। বলে, তুমি এখানে দাঁড়াও। আমি কাপ্তানবাজারের মোড় থেকে রিকশা নিয়ে আসি।

কী লাভ! রায়হান ছেলের দিকে তাকিয়ে বলে, মাঝপথে কোথাও যদি রিকশার চাকা ফাঁসিয়ে দেয়, তখন কী হবে ? হাঁটাহাঁটির ধকল কি সহ্য করতে পারবো ? তাছাড়া ডাক্তারও চেম্বারে আসবেন কি না, তাই বা কে জানে ? বলো, রাস্তায় এতো গাড়ি ভাঙাভাঙি– সুতরাং কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর বাবা-ছেলে ঘরে ফিরে যায়।

বীথি দু'জনকে ফিরতে দেখে বলে, কী হলো, ডাক্তারের কাছে যাও নি ?

রায়হান হাসে, বলে, অতোদূর হেঁটে যাওয়া আমার জন্য ঠিক হবে ? বলো ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

স্বামীকে অমনভাবে হাসতে দেখে পিত্তি জ্বলে যায় বীথির। তবে মুখে কিছু বলে না। কী বলবে? সংসার জীবনের শেষ দিকে এসে এখন দেখছে স্বামীকে সে চিনতে পারে না। সেদিন সারাটা দিন মানুষটার পাত্তা ছিলো না। সকালে মুনশির সঙ্গে ফুলবাড়িয়া যাবে বলে বেরিয়েছিলো। বিকালেও মানুষটা ফিরলো না দেখে সে অফিসে টেলিফোন করে। তাতে শুনলো, তখনও অফিসে যায় নি। একেবারে সন্ধ্যার দিকে টেলিফোন। আব্দুল্লাহ জানালো, রায়হান ভাই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, আপনারা আসুন। পড়িমরি করে টুকুকে সঙ্গে নিয়ে ছুটে বের হয় বীথি। বেরুবার মুখে মঞ্জুকে রঞ্জুর কাছে গিয়ে খবরটা জানাতে বলে। গিয়ে দেখে, একটা সোফার ওপর মানুষটা লম্বা হয়ে শুয়ে– ঘুমিয়ে না জেগে চট করে বোঝা যায় না। খানিকপর মানুষটা নড়ে ওঠে এবং মুখ দিয়ে কাতর একটুখানি শব্দ বের হয় লম্বা নিঃশ্বাস ফেলার সঙ্গে। একটা হাত বুকের বাঁ দিকে রাখে। ওই অবস্থায় চোখ মেললে প্রথমে টুকুকে দেখতে পায়। তারপর টুকু এগিয়ে গেলে তাকে কাছে টেনে নিয়ে বলে, আমার কিছু হয় নি, আমি ভালো আছি।

বীথি কী যে করবে বুঝতে পারছিলো না প্রথমদিকে। হাত-পা কেঁপে কেঁপে উঠছিলো। বুকের ভেতরটা হিম হয়ে যাচ্ছিলো থেকে থেকে। এ্যাম্বুলেন্স আনা হবে কি না তাই নিয়ে অফিসের লোকেরা কিছুক্ষণ কথা বললো। কিন্তু রায়হান এদের আলাপ শুনে খালি মাথা নাড়ায়। বলে, না হাসপাতালে যাবো না। আমি তো সুস্থ এখন। কিসের জন্য আপনারা আমাকে হাসপাতালে পাঠাবেন, বলুন? আমি এখন বাড়ি যাবো। কিছুক্ষণের মধ্যেই একজন অল্পবয়সী ডাক্তার প্রেসার আর পালস দেখতে আরম্ভ করে আর সে তাই দেখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। যখন হাসপাতালে যাওয়ার কথাটা ফের উঠলো, তখন সে সায় দিয়ে দিলো।

অবশ্য ডাক্তারটি তখন পর্যন্ত কিছু বলে নি। প্রেসার দেখার পর পালস দেখা শেষ হয়ে যাবার পরও রোগীর হাতটা ধরে রাখলো। তারপর ওই অবস্থাতেই মুখের কাছে ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করলো, ব্যথাটা এখনও আছে?

না, রায়হান মাথা নাড়ায়। আমি বাসায় গিয়ে ঘুমোতে পারলে ঠিক হয়ে যাবো। কাণ্ডটা কী ঘটেছিলো, বীথি সেটা আব্দুল্লাহর কাছ থেকে শোনে। সে বলে, রায়হান ভাই অফিসে এসে ঢোকেন চারটার দিকে। দুপুরে যখন এডিটর সাহেব মিটিংয়ে বসেন, তখন ছিলেন না। অন্যান্য দিনে কোনো কারণে মিটিংয়ে না থাকতে পারলে আগেই জানিয়ে রাখতেন। আজ কিছুই বলে যান নি। অফিসে যখন ঢুকলেন, তখন ভয়ানক কাহিল অবস্থা ওঁর। মুখচোখ ফ্যাকাশে। হাঁটবার সময় টলছেন। আর ঘামছেন ভীষণ। আমরা ধরে বসিয়ে দিলে পকেট থেকে একটা শিশি বের করে তার ভেতর থেকে ট্যাবলেট নিয়ে জিভের নিচে দিলেন। একবার নয়। কয়েকবারই ওই ভাবে ট্যাবলেট মুখে দিতে দেখলাম আমরা। একবার বললেন, বুকের বাঁ দিকে ব্যথা হচ্ছে। তখন অবস্থা দেখে আমরা আর দেরি করি নি। আপনাদের বাসায় টেলিফোন করে দিয়েছি আর এদিকে ডাক্তার আনার জন্য লোক পাঠালেন আমাদের ম্যানেজিং এডিটর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

একটু পর ফের বলে আব্দুল্লাহ– এখন তো অনেক ভালো। যখন অফিসে ঢুকলেন তখন চেনা যায় না– চোখমুখের চেহারাই অন্যরকম; আমরা রীতিমতো ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। সময়টাও বেকায়দার। এডিটর সাহেব নেই। আমাদের সৌভাগ্য যে আমানউল্লাহ ভাই ছিলেন। বীথি শুনে যাচ্ছিলো শুধু, তার কিছুই করার ছিলো না। সে ঘুরে ফিরে মেঝের ওপর হাঁটু গেড়ে সোফায় শোওয়া মানুষটার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে বলছিলো থেকে থেকে, এখনও কষ্ট হচ্ছে? ব্যথাটা এখন আছে?

তার অদ্ভুত লাগছিলো। এমন অবস্থা আগেও হয়েছিলো একবার। তখন তো বীথির হাত ধরে নিজের বুকের ওপর চেপে রেখেছিলো; বারবার করে বলছিলো, এখন আমাকে ছেড়ে যেও না, আমার কাছে বসো। আজ সেই লোক চোখ মেলে তাকাচ্ছে না পর্যন্ত। অফিসের লোকজন চারদিকে ঘিরে আছে, সেই জন্যে কি? নাকি লোকটার এখন তাকে কাছে পাবার দরকার নেই।

ডাক্তার যাবার সময় বলে যায়, ব্যথাট্যাথা নেই। বাসায় যখন যেতে চাইছেন, বাসাতেই নিয়ে যান। তবে দু'একদিনের মধ্যে কার্ডিওলজিস্ট দেখাবেন, আর যদি ব্যথাটা আবার শুরু হয় তাহলে সঙ্গে সঙ্গে সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে নিয়ে যাবেন।

ওই কথার পর আর বলার কী থাকে। সুতরাং চলো বাসায়। আব্দুল্লাহ অফিসের মাইক্রোবাসটা নিয়ে আসে এডিটরের বাসা থেকে। তারপর সেই গাড়িতে চেপে রায়হান সপরিবারে বাসায় ফেরে। রায়হানের আসলে ব্যথাটা কমে যায় এ্যানজাইসড ট্যাবলেট জিভের নিচে দেওয়ার দশ পনেরো মিনিটের মধ্যেই। তার আগে ঘাম হচ্ছিলো খুব। যখন মেরি তাকে বিছানায় নিয়ে যায় তখন ফ্যান চলা সত্ত্বেও দরদর করে ঘামছিলো সে। শরীরকে উপভোগ্য করার নাকি নানান কৌশল আছে; সেই কৌশলের কথা বোঝাচ্ছিলো মেরি। রায়হানের অমন অভিজ্ঞতা নতুন হলো। সত্যি সত্যি সমস্ত শরীরের স্নায়ুমূল ঝনঝন করে বাজলো সেতারের ঝালার মতো এবং কোনো চিন্তা ছিলো না কিছুক্ষণ। স্ত্রী, সন্তান, সংসার, চাকরি, বাইরের আন্দোলন, তার বাড়ি তৈরির আয়োজন– এমন সব ঘটনা, চিন্তা, উদ্বেগ, কল্পনা, কিছুই ছিলো না তখন তার মগজে। ওই মুহূর্তে শুধু উপভোগের মুহূর্তগুলোই বাস্তব। আর অন্য কিছু বাস্তব ছিলো না তার কাছে। দ্বিতীয়বার আয়োজনের সময় তার ব্যথাটা শুরু হয়। সে উপুড় হয়ে ঝুঁকে থাকতে পারে না। তাকে চিৎ হতে হয় এবং সে বুঝতে পারে, এবার হয়তো তার সকল খেলা সাঙ্গ হওয়ার সময় হয়েছে। সে ঘন ঘন নিঃশ্বাস নিতে নিতে বলে, আমার বুকে ব্যথা হচ্ছে।

সে কি! মেরি চমকে উঠে কিছুক্ষণ রায়হানের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর জিজ্ঞেস করে– কিসের ব্যথা? তোমার কি হার্টের দোষ আছে?

রায়হান স্বীকার করে এবং মুখে ট্যাবলেট দিয়ে কাপড় চোপড় পরতে থাকে। মেরিও দেরি করে না। সেও তৈরি হতে থাকে। বলে, কী মানুষ তুমি, এ্যাঁ? বলবে তো? এতোদিন ধরে কথাবার্তা হচ্ছে, একদিনও তো বলো নি যে তোমার হার্টের অসুখ হয়েছিলো কখনও। বলতে বলতে সে কাপড় পরার কাজটা সেরে ফেলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

তারপর রায়হানকে ক্যানের নিচে বসিয়ে রাখে কিছুক্ষণ। ওই সময়ে ব্যথাটা খানিক বাড়ে। আগে রিনরিন করা একটা মৃদু ব্যথার মতো অনুভূতি ছিলো। ক্রমে সেটা রীতিমতো কার্ডিয়াক পেইন হয়ে ওঠে। সে ফের জিভের নিচে ট্যাবলেট দেয়, তবু। মেরি তখনই ছুটে বাইরে বেরিয়ে বেবিট্যাক্সি নিয়ে আসে। তারপর তাতে রায়হানকে চাপিয়ে নিয়ে যায় মতিঝিল, 'গণ একতা' অফিসের কাছাকাছি জায়গায় সে নেমে পড়ে। নামবার সময় শুধু বলে, আমি ফোন করে খবর নেবো, নেগলেক্ট করো না, পারলে অফিসের কাউকে নিয়ে হাসপাতালে চলে যেও।

বেবিট্যাক্সিতে ওঠা অবধি সে একটি কথাও বলে নি। নামবার সময় ওই তার শেষ কথা। রায়হান তুই কী ? সে নিজেকে জিজ্ঞেস করে। কিন্তু জবাব খুঁজে পায় না। সে কি দায়িত্ববান স্বামী, স্নেহবৎসল পিতা, সচেতন সাংবাদিক ? নাকি শুধুই লম্পট, আপাদমস্তক লম্পট ? তার সততা, তার অন্যায়ের সঙ্গে আপোস না করা। এস্টাব্লিশমেন্টের কাছ থেকে কৃপা ভিক্ষাথী না হওয়া– সবই ভড়ং আর ভণ্ডামি ? সে নিজের মনের দিকে তাকালে তার মন বলে, তুই শুধু লম্পট না। তুই মিথ্যেবাদী, দুর্বল এবং নিকৃষ্ট রকমের কাপুরুষ। সে নিজের মনের কথা শুনতে শুনতে গাড়িতে চেপে বাসার দিকে যায়। আর যাওয়ার সারাটা পথ বীথি তার ঘাড়ে হাত রেখে থেকে থেকেই বলে ওঠে– এই, কষ্ট হচ্ছে খুব ? ব্যথাটা কি বাড়ছে ?

রায়হান মাথা নাড়ায়, মুখে কিছু বলে না। কোনো কথা মুখ দিয়ে উচ্চারণ না করে সারাটা পথ একইভাবে আসে। বাসায় পৌঁছলে, সিঁড়ি দিয়ে উঠবার সময় দুই ছেলে বাপের দুই বাহু ঘাড়ে নিয়ে প্রায় চ্যাংদোলা করে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠে। বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হলে সে একইভাবে শুয়ে থাকে। ওদিকে বীথি কাপড় চোপড় বদলাবার জন্যে বলতে থাকে। এই– কাপড়টা ছাড়ো, লুঙ্গি পরো, আরাম লাগবে। এই শুনছো ?

কোমরে হাত দিয়ে বোতাম খোলার চেষ্টা করলে রায়হান বীথির হাত সরিয়ে দেয় এবং প্রথম কথা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করে, এখন না, পরে।

মুখ দিয়ে কথা বের হয়, কিন্তু চোখের পাতা খোলে না। তবে বীথি জোর করে না। আস্তে করে জিজ্ঞেস করে– এই তোমার কি ঘুম পাচ্ছে ?

হ্যাঁ, রায়হান চোখ বোঁজা অবস্থাতেই জবাব দেয়। তাতে বীথি কাপড় বদলাবার চেষ্টা আর করে না। বরং স্বামীর পায়ের কাছে খাটের বাজুতে হেলান দিয়ে বসে।

রায়হান ক্রমে চোখ মেলে এবং চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। বীথিকে ওই ভাবে পায়ের কাছে বসে থাকতে দেখে তার বিরক্তি লাগে। মনে হয়, বেশি বেশি আদিখ্যেতা বউয়ের– ওখানে ওভাবে বসে থাকার কী দরকার তার ? স্বামী ঘুমিয়ে থাকলেও কি ও স্বামীর পদসেবা করতে চায় ?

বাসায় আসার ঘন্টা খানেকের মধ্যেই সে ঘুমিয়ে পড়ে। ভোর বেলা ঘুম ভাঙলে একটা ঘোরও যেন কাটে তার। ফুলবাড়িয়া যাওয়ার পর থেকে আগের দিনের পুরো ঘটনাটা সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মনে মনে বিচার করে দেখার চেষ্টা করে। জমির সীমানা নিয়ে কথাবার্তা, একসঙ্গে পাশাপাশি গাছতলায় বসা, একসঙ্গে বাসে চেপে ফেরা, সব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে হিসেব করে দেখে। সে কিছুতেই মেরিকে পুরোপুরি দায়ী করতে পারে না। সে বুঝতে পারে, তার দিক থেকেও আগ্রহ কম ছিলো না এবং মেরি সেটা টেরও পেয়েছিলো। আর সেজন্যেই অমন বেপরোয়া হয়ে উঠেছিলো– জমি রেজিস্ট্রির দিনে নৌকোয় চাপবার ঘটনাটা তার মনে পড়ে, সেদিনও তো একটা ঘটনা ঘটে যেতে পারতো।

তাহলে কি এমন ঘটনা ঘটতেই থাকবে? তারপর কী হবে, শেষের ঘটনা কী? রায়হান ওই প্রশ্নের জবাব খুঁজে পায় না। ঘুমন্ত বীথির দিকে চোখ পড়ে তার– আবার তো সে একই ধরনের ঘটনা ঘটাবে, তখন? মেরি যদি ফের এসে দাঁড়ায় তার সামনে, তখন কি সে তাকে ফিরিয়ে দিতে পারবে? নিজের মনের দিকে তাকিয়ে সে জবাব খুঁজে পায় না।

আঠারো

ঢাকা শহর ক'দিনের মধ্যে একেবারে টালমাটাল হয়ে উঠলো। নূর হোসেন হত্যার প্রতিবাদে মিছিলের পর মিছিল আর সমাবেশের পর সমাবেশ হতে লাগলো। বুকে পিঠে লেখা স্লোগানসুদ্ধ তার ছবি সব কাগজে ছাপা হলো ক'দিন। একদিন ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ছেলেরা মিছিল সমাবেশ করে তো পরের দিনই করে সংগ্রামী ছাত্রজোটের ছেলেরা। সারাদেশের ৮ দল ৭ দল আর ৫ দলের নেতা কর্মীরা যেন গা ঝাড়া দিয়ে উঠলো।

অবশ্যি আয়োজন ছিলো আগে থেকেই '৮৬-র নির্বাচনে আওয়ামী লীগ অংশ নেওয়াতে অনেকেরই মনে হয়েছিলো, গায়ের জোরে ক্ষমতা দখল করা এরশাদ সরকার বোধহয় শেষ পর্যন্ত টিকে গেল। কারণ আন্দোলন আর বিক্ষোভ তো '৮৮ সাল জুড়ে কম হয় নি। কিন্তু দেখা গেলো ব্যাপারটা সোজা নয়। বিএনপি তো আন্দোলন জিইয়ে রেখেই ছিলো, আওয়ামী লীগও ফের রাস্তায় নেমে এলো। বলা যায় পার্লামেন্টে যেমন তারা সরকারের প্রতিপক্ষ, রাস্তাতেও তাই। শেষে একসময় সংসদে যাওয়া তারা একরকম বাদই দিয়ে রাখলো। মিছিল সমাবেশ ছাড়াও ছাত্রদের নানান কাজকর্মে সরকার সমর্থক ছাত্রসংগঠন জাতীয় ছাত্র সমাজের নেতা কর্মীরা কোণঠাসা হয়ে পড়েছিলো। অস্ত্রশস্ত্র আর ভাড়াটে মাস্তান ছাড়া ইউনিভার্সিটি হল বা হোস্টেলে থাকা তাদের পক্ষে তখন অসম্ভব। ছাত্র সমাজের ছাত্রদের নানান ধরনের মাস্তানির বিরুদ্ধে মানুষের বিরক্তি আর ক্ষোভ হয়ে উঠেছিলো জোরালো। সারাদেশ জুড়েই তাদের গুণ্ডামি আর চাঁদাবাজি মাস্তানির বিরুদ্ধে মানুষ রুখে দাঁড়িয়েছে। অস্ত্রশস্ত্র আর সরকার– পুলিশের ছত্রছায়ায় ঘাঁটি গাড়লে কী হবে, সর্বক্ষণ তাদের তটস্থ হয়ে থাকতে হচ্ছিলো।

যে ব্যবসায়ীরা সাধারণত সরকারকে সমর্থন করে চলে, তারাও বেঁকে বসতে আরম্ভ করলো। ওদিকে ডাক্তারদের ধর্মঘট বন্ধ হলেও তাদের বিক্ষোভের জের তখনও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

চলছে। হাইকোর্টেও আঞ্চলিক বেঞ্চ খোলার প্রতিবাদে হাইকোর্টের উকিল ব্যারিস্টাররা আদালত বর্জন অব্যাহত রেখেছে। এদিকে আবার প্রত্যেক থানায় ফৌজদারি কোর্ট বসায়, সে সব কোর্ট ও উকিলরা বর্জন করে চলেছে। সাংবাদিকদের প্রতিবাদ বিক্ষোভ ভিতরে ভিতরে তখনও রয়েছে। তাদের দাবি দাওয়া পূরণের ব্যাপারে কিছুই এগোয় নি। এদিকে সেন্সরও হয়ে উঠছিলো কড়া। রাজনৈতিক খবর, সরকারি দলের কুকর্ম, সরকার বিরোধী কাজ এসব খবর তো সেন্সর হচ্ছিলোই এমনকি দেশের সম্পদ সংক্রান্ত খবরাদিও ছাপতে দেয়া হচ্ছিলো না। দেশের ভূখণ্ডে তেল, গ্যাস, অনুসন্ধান শেষ করে রুশ বিশেষজ্ঞরা যে রিপোর্ট দেন সেটা তো প্রকাশ করা হয়ই নি এমনকি প্রেস কনফারেন্স করে যা বলা হয়, তার সেই বক্তব্যও কোনো কাগজে ছাপতে দেয়া হয় নি। এরই মধ্যে বিবিসি'র সাংবাদিক আতাউস সামাদকে গ্রেফতার করা হলো নূর হোসেনকে পুলিশ গুলি করে মারার ১২দিন পর– নভেম্বরের ২২ তারিখে। সাংবাদিককে জেলখানায় পাঠানো এদেশে নতুন কোনো ঘটনা নয়। পাকিস্তান আমলে ফয়েজ আহমদকে প্রায়ই ধরে ধরে জেলখানায় পাঠানো হতো। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর অনেক কাগজ বন্ধ করে দেয়া হয়, সাংবাদিকও ধরা পড়ে– এনায়েতুল্লাহ খানকে জেলে পুরে রাখা হয়েছিলো। পরে নির্মল সেনকেও জেলে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু তাতে তেমন প্রতিক্রিয়া হয় নি। মানুষ ধরে নিতো নিশ্চয়ই তাঁদের কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যোগাযোগ আছে এবং রাজনৈতিক কারণেই তাঁদের ধরা হয়েছে। কিন্তু আতাউস সামাদের গ্রেফতার হওয়ার ব্যাপারটা সেভাবে মানুষ নিতে পারলো না। সোজাসুজি বুঝে নিলো। মানুষের কাছে সত্যি খবর যাতে না পৌঁছায়, সে জন্য এই গ্রেফতারের ঘটনা। কারণ সেন্সর থাকায় সব খবর খবরের কাগজ বা রেডিও টিভিতে প্রচারিত হতো না– হলেও হতো, দু'একদিন পর। মানুষ তাই আসলে দেশের ভিতরে কী ঘটছে, তা জানার জন্য নির্ভর করতো বিদেশী মিডিয়ার ওপর। আসলে তারা দেখতোও যে, বিবিসি'র খবরে তাদের জানবার খবর সবই পাওয়া যাচ্ছে সেই সঙ্গে পাওয়া যাচ্ছে সরকারের আরও নানান কেচ্ছার খবর। সুতরাং আতাউস সামাদের এ্যারেস্ট সাধারণ মানুষের মধ্যে যেমন, তেমনি সাংবাদিকদের মধ্যেও তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করলো।

এইভাবে তুমুল উত্তেজনা, বিক্ষোভ, প্রতিবাদ সরকার সমর্থক গুণ্ডা মাস্তানদের হামলা আর পুলিশী নির্যাতনের মধ্যে ১৯৮৭ সালের শেষ দিনগুলো পার হয়।

'গণ একতা'র মালিক পক্ষ এখনও সরকার ঘেঁষা নীতি রেখে চলেছে। তবে সরকারের সব নীতি সমর্থন করতে রাজি নয়। ম্যানেজিং এডিটর আমানউল্লাহ সরকারী দলের সঙ্গে মাখামাখি করলেও, এমনকি ঐ দলের পক্ষে কাজ আরম্ভ করলেও 'গণ একতা' সরকারী নীতি থেকে দূরেই রয়ে গিয়েছিলো। মনে হয় মালিক পক্ষ ঐ পর্যন্তই অলিখিত সীমানা বেঁধে দিয়েছিলো। সরকারী দলের সঙ্গে মেলামেশা করো, পারলে ওদের পক্ষে কাজও করতে পারো, কিন্তু কাগজে সব ব্যাপারে সরকারকে সমর্থন করা যাবে না। সম্পাদক সাহেব ব্যাপারটা আঁচ করেছিলেন সম্ভবত। তিনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

এডিটরিয়ালের পাতায় সরকারী নীতির অল্প-স্বল্প সমালোচনাও শুরু করেছিলেন। ওদিকে নিউজ আর রিপোর্টিংয়ের সাংবাদিকরাইবা কেন পিছিয়ে থাকবে ? দেখা গেলো, 'গণ একতা'র সব সাংবাদিকই সরকার বিরোধী অবস্থান নিয়ে বসে আছে। অবশ্য সরকারের বিরুদ্ধে সরাসরি কিছু লিখতো না। তবে ফাঁক মতো সরকার পক্ষের লোকদের বক্তব্য একটা-দুটো শব্দ ঘুরিয়ে লিখলে আর ধরছেটা কে ? প্রধানমন্ত্রী মীজান চৌধুরী হয়তো বলছেন, অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের বিধান সংবিধানে নেই কিন্তু ঐ কথাটাই আব্দুল্লাহ হেড লাইনে তুলে দিলো এইভাবে যে, অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের কোনো সুযোগ সরকার দেবে না। আবার ৫ দলের সঙ্গে বিএনপি আর সিপিবি'র বৈঠক হওয়ার খবরটা দেয়ার সময় লিখে বসলো, ৫ দলের সঙ্গে সিপিবি আর বিএনপি'র সমঝোতার সম্ভাবনা।

একদিন তো আমানউল্লাহ সাহেব নিউজ সেকশনে গিয়ে রিপোর্টার সালেহউদ্দিনকে বলে বসলেন, এটা তো ঠিক হচ্ছে না।

কোনটা স্যার ? সালেহউদ্দিন যেন অবাক হয়। আজকের 'দেশ জনতা' দেখো, ওখানে ছাপা হয়েছে। মীজান চৌধুরী বলেছেন, কেয়ারটেকার গবর্মেন্টের কোনো প্রভিশন আমাদের কনস্টিটিউশনে নেই। আর তোমার রিপোর্টে তুমি লিখলে, মীজান চৌধুরী বলেছেন অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের কোনো সুযোগ কাউকে দেয়া হবে না, এটা কি ঠিক হয়েছে ? বলো ?

সালেহউদ্দিন মুখোমুখি তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ, তারপর বলে, স্যার, কথাটা কিন্তু তিনি বলেছেন, আমার তৈরি করা নিউজের মধ্যে এগজ্যাক্ট শব্দগুলো আমি দিয়েছি। তিনি বলেছেন, যেহেতু সংবিধানে নেই, সেহেতু অন্তর্বর্তী সরকার গঠনে সুযোগ কাউকে দেয়া হবে না। 'দেশ জনতা'য় কিন্তু সংবিধানে প্রভিশন না থাকার কথাটাই শুধু উল্লেখ করা হয়েছে। দেখুন আপনি পুরো নিউজটা পড়ে।

রায়হান দূর থেকে লক্ষ্য করে। আমানউল্লাহ মুখখানা গম্ভীর করে বসেছিলেন। ঐ মুখ আরও বেশি গম্ভীর করে তিনি সরে গেলেন।

অন্য সময় হলেও যে খুব বেশি হৈ চৈ করতেন, তা নয়। ভদ্রলোক আসলেই ভদ্রতা বজায় রেখে চলেন, নিয়ম-কানুন নিজে মানেন, অন্যকেও মানতে বলেন। কিন্তু হলে হবে কী, সাংবাদিক ইউনিয়নের এখন এমন অবস্থা যে, তাঁর মতো ভদ্রলোক টাইপের সরকার সমর্থকদের কেউ পাত্তা দিতে চায় না। সরকার বিরোধীরা তো নয়ই, এমনকি সরকার সমর্থকরাও না। রায়হানকে একবার তো বলেই ছিলেন যে, সরকারকে কাজ করার সুযোগ দেয়ার জন্য একটা উদ্যোগ নেয়া দরকার। তারপর একদিন আবার বললেন, আমাদের, মানে ওয়ার্কিং জার্নালিস্টদের, পলিটিক্যালি ইনভল্ভ হওয়া ঠিক হচ্ছে না। আমরা তো প্রফেশনাল সিটিজেন, পলিটিক্যাল স্লোগান কি আমাদের দেয়া উচিত ? বলুন ?

রায়হান উদাস ভঙ্গিতে তাকিয়ে ছিলো সেদিন ভদ্রলোকের মুখের দিকে। ভয়ানক করুণ দেখাচ্ছিলো তাঁকে। সেদিন সে বলেছিলো, আমি কী বলবো আমান ভাই,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বলুন ? ভেবে দেখুন সামাদকে কেন এ্যারেস্ট করলো, বলুন ? আপনি তো ওকে চেনেন, ওর কি কোনো পলিটিক্যাল পার্টির সঙ্গে সম্পর্ক আছে ? আর ওর বিরুদ্ধে কোনো চার্জও তো আনতে পারে নি, তাহলে আপনি বলুন। সাংবাদিকরা প্রোটেস্ট না করে কোথায় যাবে ?

আমানউল্লাহ খান তবু মাথা ডাইনে বাঁয়ে দোলান আর বলেন, সে যাই বলুন আপনি, এসব ঠিক হচ্ছে না ভাই, আসলে মার্শাল-ল তো এখনও চলে যায়নি- আমি সেই দিকটার কথা ভাবছি- পীসফুলি একটা ডেমোক্রেটিক আবহাওয়া তৈরি হচ্ছিলো- কিন্তু সেটা নষ্ট হয়ে গেলো, আমাদের কপালে আরও দুঃখ আছে- দেখবেন আপনি। কথা ক'টা বলে আমানউল্লাহ একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলেন। রায়হান ভদ্রলোকের হতাশ হওয়ার কারণ কিছুটা জানে। ইয়োরোপের কোন দেশে বাংলাদেশ এ্যাম্বাসিতে তাঁর কাউন্সিলর হয়ে যাবার কথা পাকা হয়ে গিয়েছিলো, ফাইলে প্রেসিডেন্টের সই হবার অপেক্ষা শুধু। মাঝখানে এই বাগড়া। প্রেসিডেন্ট নাকি আজকাল এসব ফাইল তাঁর সামনে এগিয়ে ধরলে বিরক্ত হয়ে ঠেলে সরিয়ে দেন।

রায়হানের ওপর দিয়ে কয়েকদিন বেশ ধকল গেল। রঞ্জু আর বীথির পীড়াপীড়িতে সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে গিয়ে দিন চারেক থাকতেও হয়েছিলো। ডাক্তার রক্তে কোলেস্টরেল দেখে, দিনে পাঁচবার প্রেসার মেপে, চারদিনের প্রত্যেক দিন ইসিজি যাচাই করে তারপর হাসপাতাল থেকে ছেড়েছেন। অবশ্যি ওসব ছাড়া তাঁদের বেশি কিছু করারও ছিলো না। ডাক্তার জামান দাড়িওলা মুখ নিচু করে প্রেসক্রিপশন লিখতে লিখতে রঞ্জুকে বলেছিলেন, কোলেস্টরেল হাই, তারপর হাইপারটেনশন এ তো দেখাই যাচ্ছে। কিন্তু ইসিজি দেখে কিছু বোঝা যাচ্ছে না- আর ইসিজি রিপোর্টে যে খুব নির্ভর করা যায় না, তা তুমি নিশ্চয়ই শুনেছো-

মুখ তুলে রঞ্জুর দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, ডেফিনিট কিছুই বলা যাচ্ছে না বুঝেছো ? পারলে একটা এনজিওগ্রাম করার ব্যবস্থা করো।

বীথি ডাক্তারের মুখোমুখি তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলো, ওটা কি ঢাকায় করানো যাবে ?

ডাক্তার একটু যেন বীথির চোখে চোখে তাকিয়ে বলেছিলেন, আপনি সব কিছু বুঝবেন না মিসেস আলী, আপনার ছেলে বুঝবে- ওকে আমি বলছি। ও-ই আপনাকে বলতে পারবে, কী করতে হবে। একটু থেমে ফের মুখ নিচু করে প্রেসক্রিপশন লিখতে লিখতে বলেন। তবে ঘাবড়াবার কিছু নেই। টেনশন এ্যাভয়েড করবেন। চর্বিওলা জিনিস মানে গরু, খাসি, ডিম, দুধ, মাখন এসব খাবেন না আর হালকা একসারসাইজ- এই আর কি।

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবার দু'দিন পর সে প্রথম অফিসে আসে। বাইরে রাজনৈতিক উত্তেজনা সে দেখেই গিয়েছিলো। অফিসে আসার দু'তিন দিন পরই এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

কাণ্ড। আতাউস সামাদকে ধরে জেলে পাঠানো হয়েছে। খবরটা শোনার পর থেকেই তার খারাপ লাগে। খুব বেশি বন্ধুত্ব হয়নি ওর সাথে কখনো– কিন্তু কথাবার্তায় বরাবর আন্তরিকতা রয়ে গেছে। ইউনিভার্সিটিতে যখন পড়তো, তখন কারোর চোখে পড়েছিলো বলে মনে হয় না। ওকে দেখলো '৬২ সালে, ছাত্র আন্দোলনের সময়, খুব ব্যস্ত সর্বক্ষণ। পুলিশ কর্ডনের ভেতরে ঢুকে পড়েছিলো সেদিন সেক্রেটারিয়েট গেটের কাছে। কখনো দেখে নি কোনো রাজনৈতিক দলের পক্ষে কাজ করছে– সেই লোককে কথা নেই বার্তা নেই এরশাদ এ্যারেস্ট করে জেলের ভেতরে ঢুকিয়ে দিলো ? তার অবিশ্বাস্য লাগে।

সামাদের ফর্সা মুখ, বড় বড় চোখ আর মুখ ভর্তি হাসির ছবি তার মনে আঁকা হয়ে রয়েছে কবে থেকে সে নিজেই জানতো না। ওর এ্যারেস্ট হবার খবর শোনার পর সে এখন বুঝছে, যতো কম জানা-শোনাই থাক, সামাদকে কারুর পক্ষে সহজে ভোলা সম্ভব নয়। ঐ ঘটনার পর থেকে প্রায় সব খবরের কাগজের অফিসেই টানটান উত্তেজনা। প্রেসক্লাবেও সবারই চোখে মুখে ঔৎসুক্যের ভাব। আসলে খবরটা কী জানো ? যেন সবাইকে সবাই জিজ্ঞেস করতে চায়। রায়হান সেদিন অফিসে গিয়েই শুনলো, দুপুরে সাংবাদিকদের মিছিল বেরুচ্ছে প্রেসক্লাব থেকে। সে রওনা হচ্ছিলো, ঐ সময় আব্দুল্লাহর সঙ্গে দেখা। কে জানে কেন, রায়হানের মুখের দিকে তাকিয়ে সে দাঁড়িয়ে পড়লো। কী দেখলো চোখে মুখে, সে-ই জানে। সে জিজ্ঞেস করলো, কোথাও বেরুচ্ছেন ?

হ্যাঁ, রায়হান জবাব দেয়। বলে, ভাবছি প্রেসক্লাবের দিকে যাই, শুনলাম মিছিল নাকি বেরুবে ?

আব্দুল্লাহ মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে আরও কয়েক মুহূর্ত। তারপর বলে, না রায়হান ভাই, আপনি বরং দূর থেকে দেখুন, কী হয়, অসুস্থ শরীর নিয়ে আপনার মিছিলে যাওয়া ঠিক হবে না। শুনলাম, জার্নালিস্টদের মিছিলেও নাকি পুলিশ হামলা করবে। পুলিশের কোন এক কর্তা নাকি হুমকি দিয়েছে ডাক্তার উকিল প্রফেসর সাংবাদিক, কেউ বাদ যাবে না, রাস্তায় মিছিল করলেই নাকি পুলিশের ডান্ডা খেতে হবে।

রায়হান গেটের কাছে দাঁড়িয়ে পড়লো। দেখলো, আব্দুল্লাহ, সালেহউদ্দিন, আলম, কবির, তারপর নতুন যে জুটি আজকাল ডেস্কে বসছে তারা– সবাই একে একে বেরিয়ে গেলো। পেছনে দাঁড়িয়ে থেকে ওদের বেরিয়ে যাওয়ার দৃশ্য দেখতে দেখতে তার মনে পড়ে '৬৯-এ ঠিক এমনভাবেই 'পূর্বদেশ' অফিস থেকে সে সহকর্মীদের সঙ্গে বেরিয়ে মিছিলে যোগ দিয়েছিলো। ফল হয়েছিলো আইয়ুব খান মোনেম খানের পতন। শুধু আইয়ুব খান মোনেম খানের কথাই বা সে কেন বলবে। আসলে পাকিস্তানেরই পতন হয়েছিলো '৬৯-এর ঘটনায়। তার জানতে ইচ্ছে করে, আব্দুল্লাহদের ঐভাবে বেরিয়ে যাওয়ার ফলে কি কারুর পতন ঘটবে ? আসলে কি শোষকের পতন ঘটবে ? শাসন কি বদলাবে ? না হলে একটা মানুষকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে কী লাভ ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

নিজের মনের দিকে তাকায় রায়হান। সেই '৬৯-এর রায়হান কি এখনও আছে। ই জেদী একরোখা আপোসহীন রায়হানকে কি কেউ এখন দেখতে পায় ? সে মনের তর থেকে জবাব পায় না।

তাকে এখন পথের পাশে সরে দাঁড়াতে হচ্ছে। আর তাকে ছাড়িয়ে সামনের দিকে য় চলে যাচ্ছে, নতুন প্রজন্ম চলে যাচ্ছে, নতুন চিন্তাভাবনা চলে যাচ্ছে। কেননা তার স্তিত্ব এখন ভারগ্রস্ত– এখন তার ওপর রোগের ভার, মিথ্যাচারের ভার, ভণ্ডামির ভার, নশ্চয়তার ভার, আপোসকামিতার ভার, এমন অবস্থায় ঐ মিছিলে সে কেমন করে মিল হবে ?

নিজেকে নিদারুণ রকমের পরিত্যক্ত বলে মনে হয় তার। ঘুরে ফিরে প্রশ্নটা জেকেই সে করে। আসলেই কি আজকের ঐ মিছিলে শামিল হওয়ার যোগ্যতা বলে ার কিছু আছে ? সে তো জীবনভর শুধু পাশই কাটালো– এক সময় ছিলো না। কিন্তু খন তো সে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আপোস করার জন্য উন্মুখ। আর মিথ্যাচার, সে জের প্রিয়জনের কাছে মিথ্যাচারী, নিজের স্ত্রী সন্তান বন্ধু সবার কাছে সে মিথ্যাচারী ার সরল নিষ্পাপ মুখ দেখিয়ে তার মতো লাম্পট্য আর কি কেউ কখনো করেছে ? ।, তার মনে হয় না। এমন একটা অস্তিত্ব নিয়ে কি সে অমন সাহসী মানুষের সারিতে ায়ে পাশাপাশি দাঁড়াতে পারে ?

সে নিজের হৃৎপিণ্ডটাকে ধন্যবাদ জানায়। বলে, ভাই তোমাকে ধন্যবাদ। তুমি মন বেচাল চলেছো বলেই আমি মুখ রক্ষার সুযোগ পাচ্ছি।

এতোসব ভেবে সে নিজেকে ধিক্কার দেয় বটে, কিন্তু ফের এমন চিন্তাও মনে জাগে য, সত্যি সত্যি কি ঐ মিছিল সভা সমাবেশ আর বিবৃতি দিয়ে কোনো ফল হবে ? সে কোনো জবাব খুঁজে পায় না।

রায়হান শুধু নয়, বয়স্ক অন্য সাংবাদিকদের মনেও এমনই সংশয়। বাংলাদেশে ামরিক শাসন কি থেকে যাবে ? '৮৭ তে সারাটা বছর ধরে কতোবার যে হরতাল মিছিল আর সমাবেশ হলো, তার হিসেব নেই। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ৮ দল, বিএনপি'র নেতৃত্বে ৭ দল আর বামদের ৫ দলের জোট কতোবার যে নিজেদের মধ্যে বৈঠক করলো, কতোবার যে মিছিল করলো, কতোবার গুলি খেয়ে কতোজন মারা পড়লো, কলেজ ইউনিভার্সিটিগুলো খুনোখুনির জন্য বন্ধ রইলো কতোদিন। কোর্ট কাছারিতে কাজ হয় না কতোদিন, ডাক্তার উকিল শিক্ষক, সাংবাদিক দিনের পর দিন ধর্মঘট চালিয়ে গেলো– কিন্তু ফল ? সেই একই, গোলাকার একটি শূন্য। সরকারের খুঁটি নড়ে না। জাতীয় সংসদ অকেজো হয়ে গেলে '৮৬-র নির্বাচনে গড়া ঐ সংসদ বছর দুয়েক যাওয়ার আগেই '৮৮তে বছরের শুরুতেই ফের নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হলো। কিন্তু তবু শাসনের মূল খুঁটি নড়েচড়ে না। একদিকে বিএনপি বলে সরকারের পতন না হওয়া পর্যন্ত লাগাতার কর্মসূচী চলবে, অন্যদিকে আওয়ামী লীগ বলে, এখন একটাই দফা, আর তা হলো সরকারকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করার দফা। রোজ সারা দেশের কোথাও না কোথাও বিক্ষোভ প্রতিবাদ হচ্ছে কিন্তু সরকার বহাল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

রয়েছে ঠিক মতোই। পুরনো মন্ত্রী বাদ দিয়ে নতুন মন্ত্রী নেয়া হচ্ছে। দলের পাণ্ডারা টাকা পয়সা বিদেশে পাচার করছে, মেয়ে ছেলে নিয়ে কেলেঙ্কারি করছে– ভাবখানা এমন যে, তারা চিরকালের জন্য ক্ষমতায় এসেছে– আর যা ইচ্ছে তারা তাই করতে পারে। এতো যে সমালোচনা, এতো যে প্রতিবাদ, কোনো কিছু তাদের স্পর্শ করে না।

ঢাকার মানুষের দিশেহারা হবার মতো অবস্থা হয়ে দাঁড়ালো। মানুষ কতোভাবে আর বিক্ষোভ-প্রতিবাদ করতে পারে! '৮৭-র সারাবছর কেটেছে নানান রাজনৈতিক উদ্বেগ আর উত্তেজনায়। '৮৮-র প্রথম দিন থেকেই তাঁর জের চলতে দেখা গেলো। ১লা জানুয়ারিতে দু'খানা সাপ্তাহিক কাগজ সরকারী হুকুমে বন্ধ হয়ে গেলো। ২রা জানুয়ারি ঘোষণা দেওয়া হলো জাতীয় সংসদের নির্বাচন হবে ২৮শে ফেব্রুয়ারি। ঐ ঘোষণার কারণেই সম্ভবতঃ দুই জোটের দুই নেত্রী শেখ হাসিনা আর খালেদা জিয়া এক সঙ্গে বৈঠক করলেন। এদিকে সরকারের মতিগতিরও ঠিকঠিকানা নেই। ১৯শে জানুয়ারি ফের সরকারি ঘোষণা হলো, নির্বাচনের তারিখ পাল্টানো হয়েছে, নির্বাচন হবে ৩রা মার্চ। জানুয়ারির ২১ তারিখ থেকে সারা দেশ জুড়ে শুরু হলো সকাল-সন্ধ্যা কর্মসূচী। রাস্তায় রাস্তায় মিছিল সমাবেশ আর ঘেরাও। ২৫ তারিখে চট্টগ্রামে ৮ দল বিক্ষোভ মিছিল বের করে আর সেই মিছিলে পুলিশ গুলি চালালে প্রায় ১০/১২ জন মারা যায়। শেখ হাসিনা প্রেস কনফারেন্স করেন এবং তিনজোটের নেতারা ২৯শে জানুয়ারি জাতীয় শোক দিবস পালনের ডাক দেন। কিন্তু দেখা গেল, শেখ হাসিনা প্রতিবাদ মিছিলে আসেন নি। তাই নিয়ে শুরু হয়ে গেল নানান জল্পনা কল্পনা।

এখন আর খবরের জন্য বাইরে যেতে হয় না। প্রেসক্লাবেও না। অফিসে বসেই খবর পাওয়া যায়, কী হচ্ছে, বা কী হতে যাচ্ছে। আব্দুল্লাহর কাছে ৮ দলের ভেতরকার খবরাখবর পাওয়া যায়। ২৯ তারিখের বিক্ষোভ মিছিলে শেখ হাসিনা না যাওয়ায় অনেকের মনে সন্দেহ জাগে। কেউ কেউ প্রশ্নও করে বসে। আওয়ামী লীগ বা ৮ দল কি ৩রা মার্চের নির্বাচনে যাওয়ার কথা ভাবছে? এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে থেকে যদি এরশাদ সরকারের নির্বাচনে একবার যেতে পারে, তাহলে দ্বিতীয়বারও যে যাবে না, তার নিশ্চয়তা কোথায়?

আব্দুল্লাহ জোর দিয়ে বলে, না যাবে না– '৮৬-র নির্বাচনে অংশ নিয়ে আওয়ামী লীগ দেখিয়ে দিয়েছে এরশাদ সরকারের নির্বাচন কেমন অর্থহীন– অমন ঢালাও কারচুপির নির্বাচনে যে কোনো দিনই সরকার বদল সম্ভব হবে না, সেটা মানুষকে দেখিয়ে দেয়ার জন্যই আওয়ামী লীগ ঐ নির্বাচনে অংশ নিয়েছিলো। এখন সবাই বোঝে যে, এই সরকার কোনোদিনই কোনোরকম ডেমোক্রেটিক ইনস্টিটিউশন গড়ে তুলতে দেবে না। এরশাদ সরকারের টোটাল একটা এক্সপোজার দরকার ছিলো। সুতরাং '৮৬-র নির্বাচনে অংশ নেয়ার মানে এরশাদ সরকারকে সহযোগিতা করা নয় বরং এরশাদ সরকারের আসল চেহারা খুলে ধরা। এখন আর অমন নির্বাচনে যাওয়ার দরকার নেই– সুতরাং অমন নির্বাচনে আওয়ামী লীগ কেন যাবে?

তাহলে দুই নেত্রী এক সঙ্গে আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে অসুবিধা কী? কেন তাঁরা এক প্লাটফর্মে আসছেন না? তিন জোটের একসঙ্গে শোক দিবসের প্রোগ্রাম দেয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

হলো, অন্য সবাই এলেন। শেখ হাসিনা কেন এলেন না ? আব্দুল্লাহ ঐ প্রশ্নে একটুও বিব্রত বোধ করে না। বলে, আওয়ামী লীগ কেমন পার্টি, সেটা তো দেখতে হবে। একটা ডেমোক্রেটিক পার্টি অন্যপার্টির সঙ্গে ইস্যুভিত্তিক প্রোগ্রাম করতে পারে, কিন্তু অন্য যে কোনো পার্টির সঙ্গে এক প্লাটফর্মে মিলেমিশে যেতে পারে না। আওয়ামী লীগের জন্ম, তার বিকাশ, তার অবলম্বন, সবই পিপলকে নিয়ে আর পিপলের মধ্যে। সুতরাং অমন পার্টির নিজস্ব লাইন অফ এ্যাকশন থাকতেই পারে। আর চিন্তা করে দেখো অন্য সব পার্টির জন্ম কোথায়, কখন, কাদের নিয়ে ?

শামসুল আলম নতুন সাংবাদিক, তার সঙ্গেই কথা হচ্ছিলো আব্দুল্লাহর। সে সিনিয়র সাংবাদিক আব্দুল্লাহর অমন প্রশ্নের মুখোমুখি জবাব দিতে পারে না। তবু বলে, আর্মিকে মীন করছেন আপনি– কিন্তু আর্মি খারাপ কেন হবে ? আমাদের আর্মি তো রিভোল্ট করেছে, পিপলের লিবারেশনের জন্য যুদ্ধ করেছে– পিপলের ভালোমন্দ দেখার দায়িত্ব কি তার ওপর বর্তায় না ? তাদের মধ্য থেকে যদি পলিটিক্যাল নেতৃত্ব আসে তা হলে দোষ কোথায় ?

নাহ্ কোনো দোষ নেই। আব্দুল্লাহর গলায় স্বরে বিদ্রূপ প্রকাশ পায়। বলে, এখন এরশাদ যা করছে, সেগুলোও তো পিপলের ভালোমন্দ দেখার দায়িত্ব পালনের জন্যই করছে– তাহলে আর তার বিরুদ্ধে যাওয়া কেন ?

রায়হান লক্ষ্য করে আলম, জাহিদ, আরমান এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। তার মানে তারা আব্দুল্লাহর কথা শুনতে চাইছে না অথবা মেনে নিতে পারছে না। জাতীয় শোক দিবসের ঐ ঘটনার পর কোনো কোনো কাগজে সমালোচনা হয়। মানুষের মনে সন্দেহ থেকেই যায়। এরশাদ সরকারকে আন্দোলন করে যে খুব শিগগির হটাতে পারবে এমন বিশ্বাস অনেকেরই হয় না।

দিন কয়েক পরে অফিসে ঢোকার সময় গেটের কাছে এক মহিলাকে দেখলো রায়হান। মহিলাটির সঙ্গে ১০/১১ বছরের একটি ছেলে দু'জনেই বারান্দায় দাঁড়িয়ে বেয়ারা আনসারকে জিজ্ঞেস করছে আব্দুল্লাহ সাহেব এসেছেন কিনা।

মহিলাকে রায়হানের কেমন যেন চেনা-চেনা লাগে। আনসারকে সেও জিজ্ঞেস করে আব্দুল্লাহর অফিসে আসার কথা। ঐ সময় মহিলা তার মুখের দিকে তাকিয়ে সবিস্ময়ে বলে ওঠে, ভাই, আপনি ?

রায়হান তখনও চিনতে পারে না, কে এই মহিলা, চেহারা দেখে, গলার স্বর শোনে, মুখ চোখের হাবভাব দেখে, কিন্তু কিছুতেই পুরোপুরি স্মরণ করতে পারে না। মহিলা ফের বলে, আমাকে চিনতে পারছেন না, আমি বিনু। আপনাদের শাজাহানপুরের বাসার পাশের বাসায় থাকতাম, আমার দুলাভাই মতিঝিল স্কুলের টিচার ছিলেন, এমরান সাহেব– আমার আব্বাকেও তো চিনতেন, যশোরে বাড়ি আমাদের।

দেরি হয় সামান্য কিন্তু চিনতে পারে রায়হান। হ্যাঁ, বিনুই নাম ছিল মেয়েটির, খুব যে একটা বদলেছে তা নয়। সেই একই রকম ছিপছিপে একহারা চেহারা। ফর্সা,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

কোমল চিবুক, টিকালো নাক। তবে মুখের সেই লাবণ্য নেই। মাথায় চুল কম, সিঁথিটা চওড়া দেখায়। চোখের নিচেও চামরা কুঁচকানো এবং সেখান কালি। হাসছে, কিন্তু হাসি অসম্ভব করুণ।

বিনু ছেলেটিকে কাছে টেনে বলে, আমার ছেলে অসীম। রায়হানের মুখ দিয়ে কথা সরে না, সে বিনুর মুখের ওপর নজর ফেলে রাখে। কতো বছর হয়ে গেলো, মেয়েটি দিনের পর দিন বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকতো রাস্তার দিকে নজর মেলে। দিনের পর দিন চুলে তেল পড়তো না, চিরুনী পড়তো না, খাওয়া-দাওয়াও ঠিকমতো বোধহয় করতো না। এমরান সাহেব মলিন মুখে কোথায় কোথায় যেন ঘুরতেন। মুখ চোখ শুকনো, উস্কো খুশকো চুল, ভয়ানক ক্লান্ত চেহারা দেখতো ভদ্রলোকের। আসতে যেতে দেখা হলে রায়হান জিজ্ঞেস করতো, কোনো খবর পেলেন? জবাবে ভদ্রলোক ডাইনে বাঁয়ে মাথা নাড়াতেন। মুখে কিছু বলতেন না। খুব আদর করতেন মা-মরা ছোট শালীটিকে। বিনুর চেহারা কয়েকদিনের মধ্যে একেবারে বদলে যেতে দেখছিলো, এখন মনে পড়ে। চঞ্চল হাসিখুশি মেয়ে, বীথির পিছন পিছন ঘুরতো আর কলেজের গল্প করতো। বিনুর বিয়ের ঘটনাও খুব স্পষ্ট স্মরণ হয় রায়হানের। এয়ার ফোর্সের চাকুরে। নন কমিশনড্ চাকরি কিন্তু তা হলে কী, দেখতে সুন্দর ছিলো ছেলেটি লম্বা ফর্সা ঝকঝকে চেহারা– ভারী ভদ্র আর বিনয়ী। দু'টিতে মানিয়েও ছিলো খুব।

বিনু বলে, ভাই আব্দুল্লাহকে আমার খুব দরকার, ওর সঙ্গে এক এনএসআই-এর লোকের খুব ভালো জানাশোনা– তাঁর কাছে আমাকে নিয়ে যাবে বলেছে।

রায়হানের মনের ভিতরে বিদ্যুচ্চমকের মতো আকাশ চিরে যায়। সে ফের বিনুর ছেলের মুখের দিকে তাকায়। না ছেলে বাবার চেহারা পায় নি। গড়নটা বাবার মতোই লম্বা, কিন্তু চেহারাটা মায়ের। কোন সাল যেন? রায়হান মনে মনে হিসেব করে। '৭৭ না? হ্যাঁ বছরটা '৭৭ই। পেটে বাচ্চা বলে বোনের বাড়িতে থাকতে এসেছিলো। খুব ভোর বেলা সেদিন– একদিন আগে এয়ারপোর্টে গোলমাল– একখানা জাপানী প্লেন দিল্লী না বোম্বাই থেকে হাইজ্যাক করে এনে ঢাকা এয়ারপোর্টে নামিয়েছে জাপানের রেড আর্মির লোকেরা। বিনুর বর হাসিম দু'দিন টানা ডিউটি করে বাসায় এসে ঘুমোচ্ছিলো। ঐ সময়, সেই ভোর বেলা, জরুরী দরকার আছে বলে, এয়ারফোর্সের নাকি আর্মির গাড়িতে করেই হবে, তাকে নিয়ে গেলো। সেই যে গেলো তো একেবারেই গেলো। ফ্লাইট সার্জেন্ট হাসিমের কোনো খবর আর পাওয়া যায় নি। আরমান সাহেব বহুদিন ঘোরাঘুরি করেছিলেন, কিন্তু লাভ হয় নি। তারপর তো শাজাহানপুরে বাসা বদল করে ওঁরা আরামবাগ না টিকাটুলি চলে যান। তারপর আর যোগাযোগ হয় নি।

বিনু বলে, একটা নাকি লিস্ট তৈরি করা হয়েছে– যাদের গার্জেনরা কোনো খোঁজ পায় নি। তাদের লিস্ট, আমি ঐ লিস্টটা দেখতে চাই যদি অসীমের আব্বার নামটা ঐ লিস্ট-এ পাওয়া যায়। একটু থেমে নজর দেয়ালের দিকে রেখে ফের বলে বিনু, এতো বছর হয়ে গেলো, কোনো খবর পেলাম না– কতোজনকে যে বলেছি। তার হিসেব নেই। কোর্ট মার্শাল তো ফ্যামিলিকে জানায়– আমাদের কখনো কিছু জানায় নি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

যারা ধরে নিয়ে গিয়েছিলো তারা যে কারা, তারও হদিস কেউ দিতে পারেনি। আব্বা খোঁজ নিতে গিয়েছেন, তাঁর সঙ্গে ছোট বাচ্চা কোলে নিয়ে আমিও গিয়েছি কিন্তু লাভ হয় নি। কেউ কিছু জানায় না। খালি বলে, খোঁজ নিয়ে কী করবেন, যাদের ধরা হয়েছিলো তাদের সবাইকেই তো কোর্ট মার্শাল-এ শাস্তি দেওয়া হয়ে গেছে। বিনুর গলা কাঁপে না, চোখের কোণে পানিও জমতে দেখা যায় না। তার ভাবে ভঙ্গিতে গলার স্বরে রাগ ক্ষোভ প্রতিবাদ কিছুই প্রকাশ পায় না। তার চোখেমুখে এমন একটা ভাব, দেখে মনে হয় যেন সুখ দুঃখের গল্প করছে বহুদিন পর দেখা হওয়া কোনো আপনজনের সঙ্গে। রায়হান নিজের কামরায় এনে বসায় বিনুকে। তার ছেলেকে, কী পড়ে, কোথায় পড়ে এসব আলগা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে। অন্য কিছু বলতে পারে না– জিজ্ঞেসও করে না। কী বলবে ? ও ব্যাপারে কিছু জানা থাকলে তো বলবে! তার ধারণা '৭৭ সালের ঘটনাটা পুরো চেপে যাওয়া হয়েছে। ঘটনা কী হয়েছিলো খবরের কাগজে তার কিছুই আসে নি, কোনোরকম সরকারী বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয় নি, শ্বেতপত্র জাতীয় কিছু প্রকাশ করা হয় নি। কী বিচার হয়েছিলো, কতোজনকে শাস্তি দেওয়া হয়েছিলো, তাদের পুরো হিসেব কেউ জানে না। সবচেয়ে বড় কথা, বিদ্রোহের সূত্রপাতটা হয় কোন বাহিনীতে এবং কোন কারণে, হোতা কারা ছিলো সে সম্পর্কে কোনো কিছু প্রকাশ করা হয় নি।

কোল্ড ড্রিঙ্কস দিয়ে গিয়েছিলো বেয়ারা। মা বেটার খাওয়া শেষ হওয়ার আগেই আব্দুল্লাহ এসে দরজায় উঁকি দেয়। সে বেশ অবাক হয় বিনুকে আপ্যায়ন করা হচ্ছে দেখে। বলে, আপা, আপনি রায়হান ভাইকে চেনেন ?

বিনু মুখ তুলে অল্প হাসে। সরাসরি কোনো জবাব দেয় না।

রায়হানই বরং জবাবে জানায়, জানি না, হয়তো দেখা যাবে তোমার চাইতেও অনেক আগে থেকে বিনুকে আমি চিনি। যখন থেকে ও বেণী দুলিয়ে কলেজের ফার্স্ট ইয়ারে ক্লাস করতে যেতো।

অমন হালকা কথা বলতে বলতেই রায়হান মূল কথায় চলে যায়। বলে, ব্যাপারটা আসলে কী, বলো তো ? '৭৭-এর ঐ ঘটনা নিয়ে কি সত্যিসত্যি নতুন কিছু হচ্ছে।

ঠিক জানি না রায়হান ভাই, আব্দুল্লাহ জানায়। বলে, এনএসআইতে এখন আমার বন্ধুর বড় ভাই বদলি হয়ে এসেছেন। আমার বন্ধুটিকে তো আপনি চেনেন। এই অফিসেও দেখেছেন– ইউনিভার্সিটিতে পড়ায়, নাম আফসার– ওকে কথায় কথায় একদিন বিনু আপার কথা বলেছিলাম। শুনে ওই বলেছিলো, আমার বড় ভাইকে ব্যাপারটা খুলে বলতে পারো। বলা যায় না, উনি হয়তো সাহায্য করতেও পারেন। ওর ঐ কথাতেই আমি আনসার ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করি। আমার কাছে সব শুনে উনি বিনু আপার সঙ্গে কথা বলতে চান– ওঁর ঐ কথা শুনেই আমি যশোরে খবর পাঠিয়েছিলাম– তা আসতে আসতে দু'মাস লাগিয়ে দিলেন, এখন কাজ হবে কিনা, কে জানে, চারদিকে পলিটিক্যাল টেনশন নিয়ে ওঁরা এখন যা ব্যস্ত!

আসলে বিনুর লাভ হলো না শেষ পর্যন্ত। যশোর থেকে অমন দূরের পথে যাওয়া-আসাই সার। প্রাইমারি স্কুলের চাকরি, ছুটি পেয়েছে মাত্র ৫ দিনের। ওর দেরি করার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

উপায় নেই। তবু ওরই মধ্যে একদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বীথির সঙ্গে কাটালো। ওর ছেলে অসীম বেশ জমে গেলো টুকুর সঙ্গে– দু'জনে গল্পে গল্পে মেতে রইলো সারাটাক্ষণ।

বিনুর লাভ না হওয়ার কারণ– যাঁর কাছে তার আসা, তাঁকে সপ্তাহখানেক আগে বদলি করে দেওয়া হয়েছে– ভদ্রলোকের অমন হঠাৎ বদলি নিয়ে কানাঘুষাও নাকি শুরু হয়েছে। বেচারা ঐ পোস্টে পুরো বছরটাও থাকতে পারলেন না। উনি নিজে কিছু করতে পারলেন না, তবে টেলিফোন করে একজনের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছেন– তাঁর সঙ্গে বিনু দেখাও করেছে গতকাল, কিন্তু সেখানেও কোনো কাজ হয় নি। তবে ভদ্রলোক না-ও করেন নি। বলেছেন, ব্যাপারটা নিয়ে এই মুহূর্তে তাঁর পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয়। ছুতো দেখিয়ে বলেছেন যে নতুন জয়েন করার কারণে ফাইল-টাইল না দেখে তাঁর পক্ষে কিছু করা বা বলা সম্ভব নয়, নাম-ঠিকানা উল্লেখ করে দরখাস্তটা রেখে যান, পরে চিঠিতে জানানো হবে, যদি জানাবার মতো কিছু থাকে।

তখন পড়ন্ত বিকেল, জানালার পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলো বিনু। সব পুরনো কথা, বলতে বলতে একেকবার সামনের গাছপালার ওপর দিয়ে আকাশের দিকেও তাকাচ্ছিলো। এক সময় বললো, শাজাহানপুরের এ বাসার বারান্দাটা আমার খুব ভালো লাগতো। ওখানে দাঁড়ালে ভোরের শুকতারা দেখা যেতো– ঐ বারান্দায় দিনের পর দিন দাঁড়িয়ে থাকতাম। যদি আসে মানুষটা। পেটের বাচ্চাটা নড়ে উঠলেই বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াতাম। দিনের পর দিন সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস। পাঁচ মাস পর দুলাভাই বাসা বদলান।

রায়হানকে বলে, অন্য কিছু না ভাই, শুধু জানতে চাই, ওর দোষটা ছিলো কী। আমি জানি, ও কোনোরকম ষড়যন্ত্রের মধ্যে ছিলো না। পেটে বাচ্চা আসার পর ও আমার যত্ন ঠিকমতো হবে বলে আমাকে বুবুর কাছে পাঠিয়ে দেয়। রোজ আসতো একবার করে– সেদিন রাতটা কোয়ার্টারে না থেকে শাজাহানপুরে ছিলো, শুনছি শুধু এইটাই নাকি অপরাধ। বলুন, এই অপরাধের জন্য শাস্তি দেবে? বেশ, ঠিক আছে, দিলো শাস্তি, কিন্তু একটা খবর জানাবে না?

বিনু আর ওর ছেলে আব্দুল্লাহর কাছে মোট দু'দিন এসেছিলো। কিন্তু ওদের এ দু'দিনের আসাতেই অফিসের তরুণ সাংবাদিকদের মধ্যে '৭৭-এর ঘটনা নিয়ে খোঁজখবর আর তর্কবিতর্ক শুরু হয়ে যায়। সালাউদ্দিন, কামাল, জাহিদ, আলম এদেরকে প্রায় রোজই ঐ ঘটনা নিয়ে কথাবার্তা বলতে দেখা যায়। ওদিকে আব্দুল্লাহ নিজে ব্যাপারটা নিয়ে ব্যস্ত তো ছিলোই। দেখা গেলো তর্কবিতর্ক শুরু হলে ওর গলাই থাকে বেশি জোরালো। তার সোজাসুজি মত– সামরিক ছাউনি থেকে কখনোই গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে পারে না– তা সামরিক নেতারা যতই উদার আর মানবতাবাদী হোন না কেন। জিয়াউর রহমানের আমল তার উদাহরণ। তাঁর আমলে যতো মানুষ খুন হয়েছে, অতো মানুষ খুন আর কখনও হয় নি।

কেন, আমাদের সিভিল শাসনের সময় মানুষ খুন হয় নি? জাহিদ সোজাসুজি প্রতিবাদ করে। বলে, রক্ষীবাহিনীর হাতে কতো মানুষ মারা পড়েছে? তারপর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

দুর্ভিক্ষে ? লোকাল পলিটিক্যাল মাস্তানরা কতো লোক মেরেছে সেটা হিসাব করুন ? আর একটা দেশের আর্মি হচ্ছে, সে দেশের ডিফেন্স-এর শেষ ভরসা, সেখান যদি বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, কি রিভোল্ট হয়, তাহলে সেটা দমন করতে হবে না ?

ঠিক আছে, আব্দুল্লাহ হাত তুলে শান্ত থাকতে বলার ভঙ্গি করে। তারপর বলে, তোমার কথাই মানলাম, আর্মি রিভোল্ট দমন করার জন্য মানুষ মারা হলো– কিন্তু তার ট্রান্সপারেন্সি থাকতে হবে না ? সেটা নেই কেন ? খবরের কাজে দুই দশক পরে আর্মির ঐ সময়কার নিখোঁজ লোক সম্পর্কে চিঠি ছাপা হয় কেন ? একটা প্রতিষ্ঠানে যা-ই ঘটুক তার ট্রান্সপারেন্সি তো থাকতে হবে।

ও জিনিসের কথা বলবেন না আব্দুল্লাহ ভাই– সালেহউদ্দিন পাস থেকে হেঁকে ওঠে। বলে থার্ড ওয়ার্ল্ড-এ ও জিনিসের আশা করাটাই তো অন্যায়। আমাদের দেশে সিভিল রুলের সময় কখনও ছিলো ? গ্রামেগঞ্জে কতো পলিটিক্যাল অপোনেন্টকে এলিমিনেট করা হয়েছে, তার হিসেব আছে ? অখ্যাত লোকেদের কথা বাদ দিলাম। তাদের কখন কী ভাবে ধরা হলো, তারপর কীভাবে তারা উধাও হয়ে গেলো সে প্রশ্নও বাদ দিলাম। কিন্তু যেসব লোককে ধরা হয়েছে, জানানো হয়েছে যে তাদের ধরা হলো, তারপর কান্টডিতে থাকার সময় তাদের কোন যুক্তিতে মারা হয় ? সিভিল রুল-এর সময় ট্রান্সপারেন্সি থাকে ? বলুন ছিলো কখনো ? সিরাজ শিকদারকে ভুলতে পারবেন ?

তর্কটা বেশ ক'দিন চলে তারপর যায় থিতিয়ে। কারণ টানটান উত্তেজনা আর ক'দিন থাকে ? বাইরে প্রতিদিনই আন্দোলন চলছে– কিন্তু মনে হচ্ছে, উত্তেজনাটা যেন কম। সকাল-সন্ধ্যা কর্মসূচী দেয়া হচ্ছে। পালিতও হয়ে যাচ্ছে, পুলিশের সঙ্গে দৌড়াদৌড়ি আর মারামারিও বাদ থাকছে না– তবে টানটান উত্তেজনাটা বেশ যেন কম। মনে হয় মানুষ যেন সব কিছুর সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিচ্ছে। ভাবখানা এমন যে, সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করাটা জীবনযাপনেরই একটা অংশ। তবে হাঁ, মফঃস্বল এলাকায়, কি অন্য শহরগুলোতে আন্দোলনের ঢেউ কম।

তবে আসল উত্তেজনা এখন গ্রামাঞ্চলে। প্রায় রোজই খুনজখমের খবর আসছে– কারণ ইউপি নির্বাচন শেষ হবার মুখে। বিরোধী দল নির্বাচন বর্জনের ডাক দিলে কী হবে– গ্রামে নেতৃত্ব থাকে টাউট মাতব্বরদের হাতে– এক পক্ষ চেয়ারম্যান মেম্বারগিরি করলে অন্য পক্ষ কি সেটা চাইবে না। সুতরাং হচ্ছে নির্বাচন– নির্বাচন না হলে কার খুঁটি কত শক্ত তা কীভাবে বোঝা যাবে ? দেশের রাজনীতিতে ওদিকে যাই হোক, গ্রামে কায়েমী স্বার্থের প্রভুত্ব যেন ঠিক থাকে। অতএব সরকার নির্বাচন চালালো, এবং তা হয়েও গেল। তবে ২১ হাজার কেন্দ্রের মধ্যে আড়াই হাজার কেন্দ্রের নির্বাচন স্থগিত। প্রাণ গেছে ৭৫ জনের আর আহতের সংখ্যা ৬ হাজার।

ঢাকায় থেকে থেকেই সকাল-সন্ধ্যা কর্মসূচী দেয়া হচ্ছে। এবংতা মানুষ পালনও করছে। ঘন ঘন অমন কর্মসূচী দেয়া হলেও তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয় না। মানুষ কেমন অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। ধরেই নিয়েছে যে সপ্তাহে ২/৩ দিন অমন প্রোগ্রাম থাকাটা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। দৈনন্দিন কাজকর্মের মধ্যেই পড়ে অমন কর্মসূচী পালন। রাজনৈতিক অস্থিতরতার বদলে অন্যকিছু আপাতত পাওয়া যাবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

তবে তার মানে এই নয় যে, মানুষ এরশাদ সরকারের বর্তমান অবস্থান মেনে নিচ্ছে বা এই সরকারকে হটাবার বিপক্ষে। এ সরকার চলে যাক, আর কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে নির্বাচন হোক– এমন একটা ব্যবস্থার পক্ষে এখন প্রায় সকলেই। একেবারে তর্ক হয় না, তা নয়, কিন্তু সরকারের পক্ষ নিয়ে কথা বলার লোক ক্রমেই কমে আসছে। প্রেসক্লাবে যারা এরশাদের পক্ষে গলা উঁচিয়ে কথা বলতো, তাদের আজকাল প্রেসক্লাবে দেখা যায় না। এদিকে আমানউল্লাহ সাহেবও আজকাল কথাবার্তা খুব কম বলেন। ক'দিন আগেও নিউজের কিংবা রিপোর্টিং-এর লোকদের কাজকর্মে ভুল ধরতেন, আজকাল বড়রকমের ভুল-ভাল থাকলেও কিছু বলেন না। প্রায়ই সরকার বিরোধী আন্দোলন নিয়ে মন্তব্য করতেন, আজকাল ও ব্যাপারে বলতে গেলে মুখই খোলেন না।

সেদিন অফিসে একটু দেরিতে পৌছেছিলো রায়হান। বেলা ১২টা/১টা হবে। যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিউজের জামান এগিয়ে এসে জানায়, ঘন্টাখানেক আগে সমীরণ মিত্র টেলিফোন করে জানিয়েছেন রায়হান যেন এক্ষুণি একবার ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের এমারজেন্সিতে যান। তাঁর ছেলে নাকি জখম হয়ে হাসপাতালে।

রায়হানের বুকের ভিতরটা ধড়াস করে ওঠে। সে ছুটতে ছুটতে বেরুচ্ছিল। ঐ সময় গেটের কাছে সালেহউদ্দিনের সঙ্গে দেখা। সে অবাক হয়ে জানতে চাইল, কোথায় যাচ্ছেন, রায়হান ভাই ?

মুখ দিয়ে তখন কথা বের হয় না, চোখমুখ ফ্যাকাশে, দৃষ্টি বিভ্রান্ত। শুধু বলে, আমার ছেলে হাসপাতালে এমারজেন্সিতে– কথা বলার সময় নেই।

সালেহউদ্দিন হাত ধরে থামায়। তারপর জিজ্ঞেস করে, কোন ছেলে ? বড় জন, নাকি মেজো জন, নাকি ছোটটি ?

রায়হান সালেহউদ্দিনের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে। তখনও তাকে স্বাভাবিক মনে হয় না। সে সমীরণ মিত্রের নাম করে। বলে, সমীরণ নাকি টেলিফোন করে জানিয়েছে, নিউজের জামান খবরটা দিলো।

কোন সমীরণ, লোকটা কে ?

আরে আমাদের বন্ধু জার্নালিস্ট, অবজারভারের সমিরণকে চেনো না ?

বাহ্ সমীরণদা'কে চিনবো না ? সালেহউদ্দিন হেসে ওঠে। বলে, কী যে বলেন, না, কিন্তু কেন ?

রায়হানের মুখের দিকে তাকিয়ে সালেহউদ্দিন বলে, বাহ্ খবরটা আসলে কী তা জানবেন না ? কোন ছেলেকে দেখলেন, কী ধরনের জখম জিজ্ঞেস করবেন না ?

কিছুটা ধাতস্থ হয় রায়হান। কিন্তু তবু দাঁড়ায় না সে। বলে, গিয়ে দেখে আসতে দোষ কী ? মেডিক্যাল কলেজ তো দূরের কোনো জায়গা নয়।

সালেহউদ্দিন সঙ্গী হয় অগত্যা।

এমারজেন্সিতে গিয়ে খোঁজ নেয়। কিন্তু ঠিকমতো খবর কেউ দিতে পারে না। ডিউটিতে যে ডাক্তার সে নাকি তখন অপারেশন থিয়েটারে– কোন এক মহিলার নাকি পা কাটা হচ্ছে। একজন বলে, হ্যাঁ, ১৮/১৯ বছরের ২/৩টি ছেলে এসেছিলো ঘন্টা দুই আগে, সকাল সাড়ে ন'টার দিকে। জ্বি না, মেডিক্যালের কোনো ছাত্র ছিলো না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

১৩/১৪ বছরের, স্কুলে পড়ে এমন ছেলে ? রায়হান লোকটার মুখের কাছে ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করে।

লোকটি সম্ভবত মেল নার্স। সালেহউদ্দিন রায়হানের পরিচয় দিলে, লম্বা মতো খাতাটা খুলে ফের দেখে। তারপর দেখতে দেখতে বলে, এই যে একজনের নাম পাওয়া যাচ্ছে, আব্দুল করিম– ওকে ফার্স্ট এইড দিয়ে বেডে নেয়া হয়েছে। ঐ প্যাসেজে আছে। তার পরের জন মনসু, নামটা কেন যে পুরো লেখে না কালাম। হাঁ– ফের মনোযোগ দিয়ে দেখতে দেখতে বলে, মনসুরই হবে, তাড়াতাড়িতে 'র' টা লেখা হয়নি– বয়স ১৮/১৯। হ্যাঁ ছাত্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়– তার পরের জন–

লোকটাকে আর বলতে দেয় না রায়হান। দেখি দেখি বলে সে নিজেই খাতাটার ওপর ঝুঁকে পড়ে এবং দেখে নামের জায়গায় লেখা মনসু।

সে জিজ্ঞেস না করে পারে না। নামটা ঠিক লেখা হয়েছে তো ? মনসু না মনজু ?

লোকটি রায়হানের মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, তা তো কইতে পারি না স্যার– যা কইছে, তাই লিখছি। একটা মেয়ে ছিলো সাথে, আরও ২/৩ জন ছাত্র ছিলো– এই তো অল্প আগে চইলা গেলো– এক সাংবাদিক আইছিলো মেয়েরে নিতে– মেয়ে যাইতে চায় না, আমরা রুগীকে বেড-এ দিছিলাম, ভদ্রলোক যাওয়ার পর রুগী নিজেই যাইতে চাইলো, আমরাও ছাইড়া দিলাম। জখম তো বেশি না– মাস্তানের লগে মারামারি আর কি ? চেন দিয়া মারছে পিঠে ঘাড়ে আর মাথায়– পুলিশ কেইস হতে পারতো। কিন্তু খামকা অতো হাঙ্গামা কি ভালো, বলেন ?

রায়হানের মন বলে এ মঞ্জু না হয়ে পারে না– এ ঠিক মঞ্জু। কিন্তু কী কারণে ওকে চেন দিয়ে মারবে, সেটা সে আন্দাজ করতে পারে না। তার বিশ্বাস হতে চায় না, মঞ্জুর মতো ছেলে মাস্তানদের সঙ্গে মারামারি করতে যাবে। আর সাংবাদিক ভদ্রলোকটি কি সমিরণ নিজে ? আর ওর মেয়েই বা কেন সঙ্গে এসেছিলো এমারজেন্সিতে ?

এমারজেন্সি থেকে বেরুবার আগে আর একবার ভিতরের ওয়ার্ডে যায়। দুটো ওয়ার্ড এবং প্যাসেজে রাখা সব বেড ঘুরে ঘুরে দেখে– যদি মঞ্জুর মুখটা দেখতে পায়। কিন্তু দেখা গেলো, মঞ্জু নেই। ছেলেটা আসলেই মঞ্জু কি-না সে জানে না। তবু তার মন থেকে থেকেই বলে উঠছে– এ নিশ্চয়ই মঞ্জু। ও না হয়ে পারে না।

সে এমারজেন্সির গেট দিয়ে বেরুচ্ছে, ঠিক ঐ সময় পেছন থেকে রঞ্জুর ডাক তার কানে আসে। সে ঘুরে দাঁড়ালে রঞ্জু সামনাসামনি হয়ে হাঁফাতে হাঁপাতে বলে, একটু আগে খবর পেলাম, মঞ্জু এমারজেন্সিতে– উনিই বললেন। সে হাত তুলে একটি মেয়েকে দেখায়। মেয়েটির পরনে এ্যাপ্রোন আর গলায় স্টেথিস্কোপ ঝুলানো দেখে সিনিয়ার ছাত্রী মনে হয়, আবার নতুন ডাক্তারও মনে হয়। মঞ্জুর সঙ্গে দেখা হয়েছে ? রঞ্জু জিজ্ঞেস করে। জানতে চায়, ও কোথায় ?

ও নাকি চলে গেছে, রায়হান জানায়। বলে, জখম বেশি নয় বলে এরা ছেড়ে দিয়েছে। রঞ্জুর ভ্রূ কুঁচকে ওঠে। বলে, এমন তো নিয়ম নেই– কে নিলো ওর দায়িত্ব ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

সে ফের এমারজেন্সির দিকে ফিরে যাচ্ছিলো। রায়হান হাত ধরে ছেলেকে থামায়। তারপর বলে, ওদের বলে কী হবে, বরং খোঁজ করা দরকার ও গেলো কোথায়? বাসায় টেলিফোন করে খোঁজ নিতে হবে, ও বাসায় গেলো কি না– আর সমীরণের সঙ্গেও কথা বলা দরকার। তুমি ওকে দেখো নি? মনে পড়ে না?

রঞ্জু ডাইনে বাঁয়ে মাথা হেলালে রায়হান চেনাবার জন্য বলে, আমার বন্ধু, এখন অবজার্ভারে আছেন, উনিই অফিসে টেলিফোনে খবরটা জানান– কী হয়েছিলো নিশ্চয়ই বলতে পারবেন– ওঁর মেয়ে যখন হাসপাতাল পর্যন্ত এসেছিলো মঞ্জুর সঙ্গে।

আমি গেলাম, বলে ছেলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রায়হান অফিসের দিকে ছোটে।

সালেহউদ্দিন বলে, রায়হান ভাই, ব্যাপারটা বেশ গোলমেলে মনে হচ্ছে, চলুন বরং প্রথমে আপনার বাসায় যাই।

মঞ্জু ওদিকে তখনও বাসায় ফেরে নি। মাথার পিছন দিকে, ঘাড়ে, পিঠ ভয়ানক ব্যথা। প্রেসক্রিপশনটা পকেটে আছে, কিন্তু পয়সা সঙ্গে থাকলে তবে না ওষুধ কিনবে?

আব্বা-মা জানবে, সেই ভয়েই সে এমারজেন্সি থেকে বেরিয়ে এসেছে। ভেবেছিলো বলবে, রিকশার সঙ্গে ধাক্কা লেগে পড়ে গিয়েছিলো, তাই এমন মাথার পেছনে জখম। কিন্তু তার এখন সন্দেহ হচ্ছে, অমন কথা কেউই বিশ্বাস করবে না।

উনিশ

ব্যাপারটা সে প্রথম দিকে বুঝতে পারে নি। রাখি অন্যান্য দিনের মতো স্বাভাবিক ছিলো না, কথা বলতে বলতে ডাইনে বাঁয়ে তাকাচ্ছিলো। একেকবার কথা বলতে বলতে থেমে যাচ্ছিলো। দশটার ক্লাস শেষ হলে সে ক্লাসরুম থেকে বেরুতে চায় না। মঞ্জু তখন জিজ্ঞেসও করেছিলো, তোমার কী হয়েছে। সব সময় মনে হয়, কিছু যেন ভাবছো। রাখি বলে, না তেমন কিছু না। আমি এখন বাড়ি যাবো। আমাকে পৌঁছে দেবে?

মঞ্জুর অবাক লাগে। এমন অদ্ভুত কথা সে আগে কখনও বলে নি। রাখির মুখের দিকে তাকিয়ে সে ফের জিজ্ঞেস করে, কী হয়েছে রাখি, তোমাকে এমন অস্থির দেখাচ্ছে কেন?

না, প্লীজ, আমার সঙ্গে একটু চলো–

কিন্তু আমার যে সাবসিডিয়ারি ক্লাস একটু পরই। মঞ্জু জানায়। বলে, ক্লাসটা শেষ হোক, তুমি কোথাও কিছুক্ষণ বসো।

মঞ্জু লক্ষ্য করে, রাখির চোখেমুখে আতঙ্কের চিহ্ন। বলে, না প্লীজ, আমাকে বাসায় নিয়ে চলো, আমার পিছনে কাল থেকে ওরা লেগে আছে।

কারা? মঞ্জু ঘুরে তাকায় এবং দেখতে পায়, তিন চারজন ছেলে একসঙ্গে জটলা করছে আর সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে রাখির দিকে তাকিয়ে অশ্লীল হাসি হাসছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

মঞ্জু দু'জনকে চিনতে পারে। ফেরদৌসদের দলের কর্মীদের এক আসরে গিয়ে সেই যে বসেছিলো, যেখানে একজনের হাঁটুতে গুলি করে এক ড্রাগ খাওয়া ছোকরা– সেখানেই দেখেছিলো দু'জনকে। তার স্পষ্ট মনে পড়ে, ফুর্তিতে খুব নাচানাচি শুরু করে দিয়েছিলো।

সে জিজ্ঞেস করে, ওরা কি ছাত্র?

রাখি বলে, জানি না। একটু পর ফের বলে, মঞ্জু, তুমি প্লীজ চলো আমার সঙ্গে।

মঞ্জুরও খারাপ লাগে ছেলে ক'টির অমন ভঙ্গিতে তাকানো এবং তাদের মুখের অমন অশ্লীল হাসি দেখে। কী বলছিলো, বুঝতে পারে না। কিন্তু ভাবভঙ্গি দেখেই মনে হচ্ছিলো, রাখিকে নিয়েই ওদের মধ্যে কথা হচ্ছে। সে বলে, চলো যাই।

কিন্তু পথ ধরলে দেখে, কয়েকজন পূর্ব দিকের গেটে যাওয়ার পথ আগলে রয়েছে, পিছনে ফিরলে দেখে পশ্চিম গেটের পথও আগলানো।

মঞ্জু পশ্চিম গেটের দিকে পা বাড়ায়। বলে চলো, ওদিক দিয়ে বের হই।

গেটের কাছাকাছি পৌঁছতেই একজন এগিয়ে এসে বলে, হা-ই, কুনদিকে যাও ডার্লিং, পার্কে? বাসার রাস্তা তো এইটা না। রাখির দিকে হাত বাড়ালে মঞ্জু একহাতে রাখিকে জড়িয়ে পাশ কটিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে।

আব্বে তুই ক্যাঠা? এ্যাঁ? যাঃ ফুট!

মঞ্জুকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয় মাটিতে, আর একজন রাখিকে ধরতে যায়, রাখি তখন দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে উল্টো দিকে ছোটে। কোথায় যাচ্ছে হুঁশ নেই। কার্জন হলের ডান দিকের রাস্তা ধরে যেতে যেতে দরজা খোলা পেয়ে ঢুকে যায় এক ঘরে। সেখানে তখন বোধহয় বায়ো-কেমিস্ট্রির স্যারদের মিটিং হচ্ছিলো। তাঁরা একসঙ্গে বেরিয়ে আসেন। রাখি চিৎকার করে বলতে থাকে, মঞ্জুকে ওরা মারছে। স্যার, গেটের কাছে, ওকে বাঁচান।

সেও স্যারদের সঙ্গে বের হয়। ওদিকে যখন হামলাকারীরা পালিয়েছে, সবাই দেখে মঞ্জু উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে। তার মাথায় জখম, বেশ রক্ত গাড়াচ্ছে সেখান থেকে। রাখি ছুটে গিয়ে ওকে ধরে একখানা হাত নিজের ঘাড়ে পেঁচিয়ে নিয়ে দাঁড়াতে সাহায্য করে। সোজাসুজি দাঁড়ালে সে এক পা দু'পা করে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। আশেপাশে ছাত্ররা ছিলো, তাছাড়া একটু আগে মিটিং ছেড়ে যাঁরা বেরিয়ে এসেছেন, তাঁরাও দাঁড়ানো।

একজন এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করেন, কী হয়েছিলো? ওকে ওভাবে মারলো কেন? কারা মারলো।

রাখি মঞ্জুকে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতেই বলে, আমাকে অপমান করছিলো। এ বাধা দেয় তাতেই–

তুমি কে? কোন ডিপার্টমেন্টের? কী নাম? ছেলেটি তোমার কে হয়? ক্লাস মেট না আত্মীয়?

রাখি সব প্রশ্নের উত্তর দেয় না। কী জবাব দেবে? তার এখন যতো তাড়াতাড়ি পারা যায় মঞ্জুকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া দরকার। সে ঐভাবে হাঁটতে হাঁটতেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বলে, প্লীজ একখানা রিকশা ডেকে দিন না। কে একজন বলেন, ইউনিভার্সিটির মেডিক্যাল সেন্টারে নিয়ে যাও। কেউ বলে, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজেই নিয়ে যাওয়া ভাল। এসব বলাবলি হতে হতে কে একজন রিকশা ডেকে আনে এবং দু'জনকে রিকশায় তুলেও দেয় এবং তারা অন্য আর এক রিকশা নিয়ে পিছনে পিছনে সঙ্গে আসে।

মঞ্জুর মুখের দিকে বারবার করে তাকায় রাখি। থেকে থেকেই জিজ্ঞেস করে, এই কষ্ট হচ্ছে খুব, তাই না? ঘাড়ে প্যাঁচানো বাহুতে চটচটে ভাব টের পেলে বলে ওঠে ইশ্ কতো রক্ত যে গেলো– গেঞ্জিটা তো দেখছি ভিজে গেছে। হাসপাতালে গিয়েই প্রথমে গেঞ্জিটা খুলে ফেলবে, বুঝেছো?

রাখি এখন একেবারেই অন্য মেয়ে। উদ্বেগ আর উত্তেজনায় থর থর করে কাঁপছে। আর থেকে থেকেই বলছে, আমার জন্য হলো এসব, হ্যাঁ, আমার জন্য তুমি এভাবে মার খেলে। তার গলার স্বরে একই সঙ্গে ক্ষোভ আর মমতা মেশামিশি হয়ে যাচ্ছে। মঞ্জুর মাথার ব্যথাটা এখন আর তীব্র নয়। তবে মনে হচ্ছে, প্রকাণ্ড একটা বোঝা যেন তার মাথার ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। একটু ঘুম ঘুমও লাগছে তার। একেকবার চিন্তা হচ্ছে, হাসপাতালে গেলে তাকে নিয়ে ডাক্তাররা কী করবে? ঘাড়ের নিচে ডান দিকের কণ্ঠার হাড়ে কি ফাটল ধরেছে? ডান হাতখানা নাড়ানো যায় না কেন? রাখি কী যেন বলে চলেছে, ওর কথা একবার খানিক বোঝা যায়, একবার কিছুই বোঝা যায় না। একটু আরামও লাগছে, কোনো মেয়ে তাকে কখনও এমন বুকে জড়িয়ে ধরে রাখে নি।

হ্যাঁ, সারাটা পথ রাখি তার গায়ের সঙ্গে লেগে ছিলো। হাসপাতালের এমারজেন্সিতে পৌঁছলে ডাক্তার যখন তাকে বেডে শুইয়ে জামা-গেঞ্জি খুলে তার ঘাড়-পিঠ আর মাথার পিছন দিককার ক্ষতগুলো দেখছিলো, তখনও সে পাশে দাঁড়িয়ে। সে-ই ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলেছে, কোথায় কোথায় ব্যথাটা বেশি সেই সব প্রশ্নের জবাবও রাখিই দিয়েছে। আর ঐ সময়ই রাখির বাবা এসে যান। কে খবর দিয়েছিলো কে জানে। ভদ্রলোক এসে ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলেন প্রথমে। তারপর মঞ্জুকে জিজ্ঞেস করেন, বাড়িতে খবর দেয়া হয়েছে কিনা। শেষে নিজের থেকেই বলেন, তুমি চিন্তা করো না। আমি তোমার বাবাকে খবর দিচ্ছি। উনি এক্ষুণি এসে যাবেন।

ঐ ক'টা কথা বলার পর রাখির হাত ধরে বলেন, চল, আমরা এবার যাই।

রাখি তখনও মঞ্জুর মুখের দিকে তাকিয়ে। নজর না সরিয়ে বাবাকে বলে, আর একটু থাকি না বাবা, ওদের বাড়ি থেকে কেউ আসুক, তখন আমরা যাবো।

সমীরণ শোনেন না, হাত ধরে টানতে টানতে মেয়েকে নিয়ে এগোন।

মঞ্জুর মাথার ভারটা ততক্ষণে কমেছে কিছুটা। সে বলে উঠলো, আমি এখন ঠিক হয়ে গেছি। আপনারা যান, একটু পর আমিও চলে যাবো।

রাখি যেতে যেতে বারবার ফিরে ফিরে তাকায় মঞ্জুর দিকে।

তো এই হলো পুরো বৃত্তান্ত। মঞ্জু বেশ কিছুক্ষণ লম্বা হয়ে শুয়ে থাকে। তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

মাথার পিছন দিকে দুটো সেলাই পড়ে। তারপর বেশ শক্ত করে ব্যান্ডেজ বাঁধা হয় মাথায় ও ঘাড়ে। সে বুঝতে পারে বেশি রকমের ঝামেলা কিছু হয় নি। সে একটু হাঁটাচলাও করে। তারপর ডিউটির ডাক্তারকে ব'লে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে পড়ে। তবে বাসার দিকে যায় না, উল্টো দিকে হাঁটে। কিছুক্ষণ হাঁটার পর টের পায় তার পা টলছে, সেই সঙ্গে কষ্টও হচ্ছে হাঁটতে। তখন কোনোমতে পা ঘষে ঘষে পূর্ব গেট হয়ে শহীদ মিনারের উঁচু ঘাসভর্তি বেদীতে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে। গাছের ছায়ায় শুয়ে শুয়ে ঠাণ্ডা বাতাস খেতে খেতে সে চিন্তা করে, আব্বা আর মা তার অবস্থা দেখে কী ভাববেন, আর সে বলবেটাই বা কী।

ওদিকে বেলা গড়িয়ে তখন বিকাল। রায়হান কোথাও ছেলের খোঁজ পায় না। বাপের কথামতো হোস্টেলে ফিরে বাসায় টেলিফোন করে যখন খবর পায় যে মঞ্জু তখনও ফেরে নি, তখন সে ফের বেরিয়ে পড়ে হোস্টেল থেকে। এই ভাইটার ওপর তার বেশ রাগ হয়। যতো ঝামেলা সব ওকে নিয়েই বাঁধবে। ক্লাসমেটকে গুণ্ডার হামলা থেকে বাঁচাবার দায় কি শুধু তোর একার ? আর অন্য কেউ ছিলো না ? সে মনে মনে ঠিক করে, এখন থেকে সে মঞ্জুকে শাসন করবে। মায়ের ওপরও তার রাগ হয়। মা-ই আদর দিয়ে দিয়ে ছেলের মাথা খেয়ে বসে আছে।

রাতে হোস্টেলে সে নাও ফিরতে পারে এই খবরটা মনিরকে দেয়ার জন্য সে লাইব্রেরিতে যায়। তারপর সেখান থেকে ছুটতে ছুটতে বের হয়। গেটের কাছে রিকশার জন্য এদিক-ওদিক তাকাবার সময় শহীদ মিনারের বেদীতে ব্যান্ডেজ বাঁধা মাথা দেখে তার সন্দেহ হয়। সে এগিয়ে গিয়ে কাছে দাঁড়ালে মঞ্জু উঠে বসে। রঞ্জুর রাগ হয় না ঐ মুহূর্তে। বরং কষ্ট হয় বুকের ভিতরে। ভাইকে বেদী থেকে দু'বাহু ধরে নামাতে নামাতে বলে, আমার হোস্টেলে যাস নি কেন, এ্যাঁ ? আর এমারজেন্সি থেকে ওভাবে বেরিয়ে এসেছিস কেন ? তোর বুদ্ধি আর কবে হবে ? এই বোকাটা, কবে হবে তোর বুদ্ধি।

মঞ্জুকে কয়েক দিন বাসার ভেতরে বন্দী থাকতে হলো। একা একা শুয়ে-বসে থাকে আর চিন্তা হয় তার। ঘুরে ফিরে ঐ এক চিন্তা। মাস্তান ছেলেগুলোর পিছনে সরকারী দলের সমর্থন আছে আর তারই জোরে ওরা যা খুশি করে বেড়ায়। রাখির ওপর রাগ তো ওদের আরও বাড়বে। এবার পারলে ওরা রাখিকে চূড়ান্ত অপমান করার চেষ্টা করবে। আর সেও কি বাঁচবে ? তার সন্দেহ হয়। অমন যদি পরিস্থিতি দাঁড়িয়ে যায়, তখন কী হবে ? তাহলে কি রাখির ইউনিভার্সিটি যাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে? তার নিজেরও কি লেখাপড়া এখানেই শেষ ? সে চিন্তা করে কূল পায় না। কারুর সঙ্গে যে মন খুলে কথা বলবে, এমন কোনো বন্ধু তার নেই। দু'চার জনের সঙ্গে বসে আলাপ শুরু হয়েছিলো, তারপরই তো একটার পর একটা ঝামেলা। সে কাকে বলে নিজের চিন্তার কথা ?

সেদিন দুপুরে টেলিফোনে রিং হতে থাকলে সে রিসিভারটা কানে তোলে এবং কি আশ্চর্য, রাখির গলা শুনতে পায়। রাখি বলে, তুমি আর বদলালে না, একই রকম থেকে গেলে ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

কী রকম ? মঞ্জু জিজ্ঞেস না করে পারে না।

রকম আবার কী। রাখি ফুঁসে ওঠে ওদিকে। রাগী গলায় বলে, একটা ফোন করতে পারো না তুমি ?

বাহ্, তোমাদের ফোন নম্বর জানলে তো করবো।

জানলে তো করবো ? রাখি নিচু গলায় ভ্যাংচায়। বলে, আমি কীভাবে তোমাদের ফোন নম্বর যোগাড় করলাম। হাঁদা কোথাকার, অসভ্য। তোমার বাবার কাছ থেকে জেনে নিলে কী হয়, এ্যাঁ ?

মঞ্জুর মজা লাগে রাখির অমন কপট রাগী গলায় কথা শুনতে। বলে, তুমি সত্যি সত্যি রেগে গেছো, না ঠাট্টা করছো ?

ঠাট্টা কেন করবো ? তুমি কি আমার জামাই বাবু ? আর আমার রাগও অতো সস্তা নয় বুঝেছো হাঁদারাম হাঁদু। আর সব সময় মনে রেখো যে, মেয়েরা আগ বাড়িয়ে কোনো ছেলেকে ফোন করে না– মনে থাকবে কথাটা ?

হ্যাঁ, থাকবে, মঞ্জু স্বীকার করে।

মাথার সেলাই কেটেছে ? রাখি এবার হাসে না, শান্ত গলায় আরও জিজ্ঞেস করে, ঘাড়ের ব্যথাটা আছে ?

নাহ্, মঞ্জু শব্দ করে হাসে। বলে, আমি এখন নর্মাল বলতে পারো। তবে মনে হয় ডান দিকের কানে একটু কম শুনছি। আর আমাকে পিছন থেকে দেখলে নাকি বিচ্ছিরি লাগে, আমি তা দেখতে পাই না, টুকু বলে, ভাইয়া তোকে পিছন থেকে কাগতাড়ুয়ার মতো দেখতে লাগে।

কীসের মতো ? রাখি ঠিক বুঝতে পারে না।

আরে কাগতাড়ুয়ার মতো। গাঁয়ের সবজি ক্ষেতে দেখো নি ? মেটে হাঁড়িতে চুন আর কালি দিয়ে মানুষের মাথার মতো বানিয়ে সেটা বাশের খুঁটোতে বসিয়ে রাখে। তারপর একটা বাঁশের টুকরো আড়াআড়ি করে বেঁধে ওপরে চটের জামা পরিয়ে দেয়া হয়–

ও-ও, স্কেয়ার ক্রো, রাখি এবার খিল খিল করে হেসে ওঠে।

হ্যাঁ, মঞ্জু জানায়, ওটাকেই বাংলায় বলে কাগতাড়ুয়া– আমার মাথার পিছন দিককার চুলগুলো চেঁছে দিয়েছে তো–

মঞ্জু শোনো, রাখি এবার গম্ভীর হয়। বলে, কাল আমি ইউনিভার্সিটি যাবো ভাবছি, বাবা সঙ্গে যাবেন, তুমি তো যেতে পারছো না–

না, আমিও যাবো, মঞ্জু জানায়।

ও মা, তুমি যাবে মানে ? রাখি অবাক হয়, বলে, ঘা এখনও শুকোয় নি, মাথার পিছন দিকটা চাঁছা, ব্যথাও নিশ্চয় আছে একটু একটু, তার ওপর আবার কানেও–

বলতে বলতে রাখি হঠাৎ থেমে যায়। তারপর কিছু যেন চিন্তা করে বলে, এই শোনো ? আমার খুব ভয় হয়েছিলো সেদিন। মনে হচ্ছিলো তোমাকে ওরা মেরে ফেলবে। ইশ্, দৃশ্যটা মনে পড়লে এখনও আমার বুকের ভেতরটা শিউরে শিউরে ওঠে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

সে তুমি যা-ই বলো, আমি এখন ঠিক হয়ে গেছি, মঞ্জু বলে, কাল দেখা হচ্ছে তোমার সঙ্গে।

কী মুশকিল, রাখি যেন একটু বিরক্ত হয়। বলে, তুমি কীভাবে ইউনিভার্সিটি এলাকায় ঢুকবে অমন চেহারা নিয়ে?

কেন এ আর এমন কি কঠিন কাজ, মাথায় একটা পাগড়ি বেঁধে নিলেই হলো।

কী বাঁধবে? রাখি কান পাতে।

আরে পাগড়ি, কেন পাগড়ি দেখো নি?

হ্যাঁ দেখেছি, শিখরা মাথায় বাঁধে। রাখি বলে, কিন্তু তুমি তো শিখ নও– তবে বাঙালিরা, মানে মুসলমান বাঙালিরা পরে বিয়ের বর সাজলে, তুমি কি ইউনিভার্সিটিতে বিয়ের সাজ পরে যাবে?

মঞ্জুর হাসি পায় কল্পনা করে। বলে, বেশ হয় কিন্তু, তাই না?

কী বেশ হয়, রাখি বুঝতে পরে না।

মানে যতো ছেলে ইউনিভার্সিটিতে– সবার মাথায় পাগড়ি– পাগড়িঅলা ছেলেরা সব ইউনিভার্সিটি এলাকার চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে– খুব গ্র্যান্ড একটা ব্যাপার হয়– তাই না?

রাখি বলে, যাক, অনেক হয়েছে, আসল কথাটা বলো, আমি যদি কাল ইউনিভার্সিটিতে যাই, তাহলে কি আমার অসুবিধা হবে? ওরা কি এখনও আমার পিছনে লাগতে আসবে? বাবা তো জানেন না, ঐ সব ছেলে আসলে কী রকম– ওঁকে নিয়ে শেষে বিপদে না পড়ে যাই– তুমি কী বলো, যাবো কাল?

মঞ্জু কী বলবে ভেবে পায় না। আসলে সে নিজেও তো ঐ মাস্তান ছেলেদের সম্বন্ধে ভালো করে জানে না– যেটুকু জানে, সবই ভাসা ভাসা, ফেরদৌসের কাছ থেকে যতোটুকু জেনেছে। তবু সে বলে, আগামীকাল না গেলে হয় না? খোঁজখবর নিয়ে তারপর না হয়–

কিন্তু এভাবে কতো দিন? রাখি যেন চিৎকার করে উঠতে চায়। বলে, আমার অসহ্য লাগছে, সবাই ক্লাস করে, শুধু আমাকেই কেন হাত-পা গুটিয়ে বাড়িতে বসে থাকতে হবে, বলো? আমার একেক দিন দম বন্ধ হয়ে আসে।

অনেকক্ষণ কথা হয় দু'জনায়। ঠিক কতোক্ষণ, মঞ্জুর খেয়াল ছিলো না। এক সময় পাশের ঘরে এসে বীথি ছেলেকে অমন ঘনিষ্ঠ স্বরে কথা বলতে শুনে দরজার আড়ালে দাঁড়ায়। ছেলের চোখমুখ খুশিতে উজ্জ্বল দেখে তার বেশ মজা লাগে। ঘরের ভেতরে ঢুকে সে সোজাসুজি ছেলের চোখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, কে রে, কার সঙ্গে এতোক্ষণ ধরে কথা বলছিস?

মঞ্জু লজ্জা পেয়ে তাড়াতাড়ি কথা শেষ করে ফোনটা নামিয়ে রাখে। তারপর বলে, রাখি। আমার ক্লাসমেট।

রাখি? বীথি প্রথমে চিনতে পারে না। পরক্ষণেই স্মরণ হলে বলে, ও গীতার মেয়ে, কী বলছিলো?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

কাল ও ক্লাস করতে যেতে চায়– যাওয়া ঠিক হবে কি না জিজ্ঞেস করছিলো।

বীথির ঠোঁটের কোণে বিদ্রূপের হাসি ফোটে একটুখানি। তার মুখ দিয়ে ছোট একটু মন্তব্যও বেরিয়ে আসে। বলে, মনে হচ্ছে গীতার মেয়ের এখনও যথেষ্ট শিক্ষা হয়নি– সত্যি সত্যি যেদিন বিপদে পড়বে, সেদিন টের পাবে জেদ করে বাইরে যাওয়ার যেমন মজা– তুমি কিন্তু যাবে না, খবরদার। বীথি ছেলেকে শাসায়। বলে, যদি শুনি যাচ্ছো, তাহলে ড্রয়ারে যে হাতুড়িটা আছে, সেটা দিয়ে তোমার হাঁটু ভেঙে গুঁড়ো করে দেবো, হ্যাঁ– মনে থাকে যেন।

কিন্তু অমন রাগ দেখালে কি? সেদিন বিকালেই যখন এককালের বান্ধবী গীতা মিত্র মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে আসে তখন রাগফাগ কোথায় উবে যায় টেরও পায় না। গীতা প্রথমেই মঞ্জুকে দেখতে চায়। বীথি ছেলেকে ডাকলে গীতা তাকে কাছে টেনে নিয়ে গায়ে-মাথায় হাত বোলায় আর বলে, ইশ্ কি শুকিয়ে গেছে– বীথির দিকে তাকিয়ে বলে, ও যদি সেদিন ওভাবে মাস্তানদের ওপর ঝাঁপিয়ে না পড়তো তাহলে কি যে হতো– ভাবলেও গায়ে কাঁটা দেয়। মঞ্জুর মাথায় হাত বোলাতে বোলাতেই বলে, হ্যাঁ-রে সোনা, তুই আর গেলি না কেন মাসীর বাড়ি?

মায়ের কথায় হেসে ওঠে রাখি। বলে, মা তুমি যে কী না, ও কি পুরোপুরি সুস্থ? আর এই অবস্থায় কেউ বাইরে বেরুতে পারে?

গীতার হাত মঞ্জুর মাথার পেছন দিকে পড়লে সঙ্গে সঙ্গে সে বলে ওঠে, ও মা, একি! বীথির দিকে তাকিয়ে বলে, এ কী করে রেখেছো ছেলের হাল– অর্ধেক মাথায় চুল নেই– পুরো চুল ফেলে দিলে কী হতো?

বীথি হাসে। বলে, এই ছেলেটা যে কী জ্বালায় না– তার তুমি কী বুঝবে– ঐ জন্যে এমন শাস্তি। মাথাটা পুরো ন্যাড়া করে দিলে কবে সে বাইরে বেরিয়ে যেতো।

বীথি গীতার হাত ধরে সোফায় বসায়। রাখি মেঝেতে হাঁটু পেতে আলমারির বই দেখে কিছুক্ষণ। তারপর মাকে গল্পে মেতে উঠতে দেখে জানতে চায়, ও খালাম্মা মঞ্জুর ঘর কোনটা?

মঞ্জু পাশের ঘরের ভেতর থেকে সাড়া দিলে রাখি দেরি করে না। সোজা ঘরের ভিতরে চলে যায়।

ঘরের ভেতরে ঢুকেই বিছানা থেকে উঠে দাঁড়ানো মঞ্জুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ। সে মঞ্জুর কপাল দেখে, ভ্রূ দেখে, ঠোঁট দেখে, চিবুক দেখে, না-কামানো গাল দেখে, তারপর চোখের ভেতরটা পর্যন্ত দেখে নিতে চেষ্টা করে। বাইরে বিকাল তখন যাই যাই করছে, জানালা দিয়ে মেহগিনি গাছের পাতা দোলানো রোদের ঝিলিমিলি ঘরের দেয়ালে পড়ে কাঁপছে। একটা দোয়েল কোন গাছের ডাল থেকে যেন লম্বা শিস দিয়ে উঠলো। রাখি মঞ্জুর হাত ধরে বলে, এই খুব কষ্ট হয়েছিলো তোর, তাই না? খুব কষ্ট পেয়েছিস ব্যথায়, ঠিক না? একটু থেমে ফের বলে, আমার জন্য, অন্য কোনো কারণে না, শুধু আমার জন্য তোকে ওরা মেরেছে। রাখির গলার স্বরে আবেগ ফুঁপিয়ে ওঠে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

মঞ্জু রাখির অমন আবেগভর্তি কথার জবাবে শুধু হাসে বোকার মতো। বলে, আরে নাহ্ কোনো কষ্ট হয় নি আমার। আমি তো ভালো হয়ে গেছি–

রাখির যে কী হয় সে চেয়ারে বসে না– একেবারে সরাসরি বিছানায় গিয়ে বসে। তখনও তার চোখেমুখে আবেগের দাপাদাপি। বলে, জানিস তোর জন্যে আমার খালি অনুতাপ হয়েছে ক'দিন– দিনে-রাতে, সকালে-বিকালে দুপুরে– সব সময়। বাবার ওপর খুব রাগ হয়েছিলো আমার, কেন ওভাবে সেদিন হাসপাতাল থেকে আমাকে টেনে বের করে এনেছিলেন– যদি না আনতেন, তাহলে আমি ওখানেই থেকে যেতাম– সত্যি বলছি!

মঞ্জু রাখির অমন কথা শুনে বুঝতে পারে না কী করবে। থেকে থেকে শুধু দাঁত বের করে হাসে। এক সময় বলে, তুমি যে এমন ইমোশনাল হতে পারো কেউ বলবে না। তুমি এতো ইমোশনাল কেন হচ্ছো– সব কিছু নর্মাল হিসাবে দেখো না।

ঐ কথায় রাখি যেন কিছুটা ধাতস্থ হয়। স্বাভাবিক গলায় বলে, যে তোমাকে চেন দিয়ে মেরেছিলো, তাকে মনে আছে ? ওর নাম জানো ?

মঞ্জু কিছুই স্মরণ করতে পারে না– খালি মাথাটা আস্তে আস্তে ডাইনে-বাঁয়ে নাড়ায়।

রাখি বলে, আমি সেদিন ফার্স্ট পিরিয়ডের ক্লাস করার পর থেকেই আমাকে বাসায় পৌঁছে দিতে বলছিলাম কেন জানো ? ঐ ছেলেটার জন্যে, ওর নাম বাবুল। মগবাজারের দিকে থাকে– ভিকারুন্নিসাতে আমাদের সঙ্গে পড়তো সুমি নামে একটি মেয়ে। কলেজে যাওয়ার পথে ওকে একদিন তুলে নিয়ে যায়– সারাটাদিন কোথায় যেন আটকে রাখে। শেষে রাত দশটার দিকে ওদের বাড়ির সামনে নামিয়ে দিয়ে যায়– সুমি এখন পুরোপুরি পাগল হয়ে গেছে। ঐ বাবুল সেদিন কার্জন হলের গেটের কাছে আমার রিকশাটা থামিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলো, এই তুমি সুমির বান্দবী না ? আইজ দুপুরে চাইনিজ খাইতে যাইবা ? ওর অমন কথা শুনে আমার খুব ভয় হয়েছিলো। তাই সেদিন আমি তোমাকে বারবার বাসায় পৌঁছে দেয়ার কথা বলছিলাম।

মঞ্জু রাখির মুখের দিকে তাকিয়ে ওর কথা শুনে যায়– কিছু বলে না।

রাখির কথা ফুরোয় খানিক পরই। তবে সে শেষ প্রশ্নটা ফের করে। বলে, আমি তিমলিদের কাছ থেকে খবর নিয়েছি যে, ইউনিভার্সিটি এলাকায় ওদের আর দেখা যায় না আজকাল, তাহলে তো এখন আমি রেগুলার ক্লাস করতে পারি– পারি না ? বলো তুমি ? মঞ্জু জবাব দিতে পারে না– ইউনিভার্সিটির কোনো ছেলের সঙ্গে তার এখনও এমন বন্ধুত্ব হয় নি যে কেউ ওকে দেখতে আসবে। কেউ আসে নি। তার যোগাযোগ নেই কারো সঙ্গে– সে ইউনিভার্সিটি এলাকার খবর কিছুই জানে না। সে কেমন করে রাখির প্রশ্নের জবাব দেবে ?

ওদিকে দুই সখিতে মিলে অনেক গল্প হয়। কতো বছর পর দেখা, গল্পের কি আর শেষ আছে ? গীতা বলে, বয়স হলে মানুষের মন কেমন বদলে যায় দেখো– তোমার সঙ্গে কথা না বললে একসময় আমার পেটের ভাত হজম হতো না– অথচ দেখো এক শহরে আছি কতোদিন হয়ে গেলো, আমরা চাটগাঁ থেকে এসেছি কি আজ ? ধরো বছর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

সাতেক তো হলো, কিন্তু একবারও দেখা করার তাগিদ বোধ করিনি– সেদিন কী যে হলো, তোমার ছেলে গেলো। তারপর থেকেই মনের ভিতরটা কেমন করতে লাগলো। তবু আসি আসি করেও আসা হয়নি– শেষে মেয়ের চাপে পড়ে আসতে হলো।

বীথি এ-কথা সে-কথায় জানতে পারে ওর বড় বোন সীতাদিরা এখন আর ময়মনসিংহে নেই– কলকাতার কাছে নৈহাটিতে বাড়ি করে ওখানেই সবাই চলে গেছেন। আর তোমার মেজদা ? হোমিওপ্যাথি প্র্যাকটিস করতেন যিনি ? যার ছেলে মানিক সুন্দর তবলা বাজাতো– ওঁরা কোথায় ?

ওঁরাও নেই– দাদা ভাবেন নি যে যাবেন, কিন্তু কীভাবে থাকবেন ? বড় মেয়ের বিয়ে হলো শিলিগুড়িতে, ছেলে বর্ডারে থেকে এপার-ওপারের ব্যবসা করতো– তাই চলে যেতে হলো– এখানে কত ভালো প্র্যাকটিস, তবু গেলেন।

তাহলে বলো, শুধু তুমিই রয়ে গেলে ?

বীথির প্রশ্নের সরাসরি জবাব দেয় না গীতা। তার মুখে করুণ হাসি ফোটে। বলে, না ভাই আমরা যাচ্ছি না– এই মাটিতে জন্ম, মরণও যদি এখানেই হয়, তাহলে অন্তত সান্ত্বনা একটা থাকবে যে বিদেশে বিভুঁইয়ের মাটিতে দেহটা মিশলো না।

নানান কথায় দুই সখীতে আলাপ যা হলো, তাতে ঠিক হলো, আপাতত সপ্তাহ দুয়েক রাখির ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে কাজ নেই– এমনিতেই একেকদিন ক্লাস হয় না– ও বরং বাড়িতে বসেই নোট-ফোট যোগাড় করে পড়াশোনা করতে পারে, ক্লাসের অন্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখলেই তো জানবে কতদূর কী পড়ানো হলো।

রাখি বিদায় নেয়। যাওয়ার সময় মঞ্জুর চোখে চোখে তাকিয়ে থাকে– তাও মায়ের পিছনে দাঁড়িয়ে থেকে, মুখ দিয়ে একটা কথাও উচ্চারণ করে না। তবে ওভাবে চুপচাপ চলে গেলে কী হবে, মঞ্জুকে ভীষণ রকম এলোমেলো করে দিয়ে যায়। ও যা কাণ্ড করে যায়, তাতে কোনো ছেলের পক্ষে স্বাভাবিক থাকা অসম্ভব। মঞ্জু পড়ার টেবিলে দেখতে পায় খাতার ওপর বড় বড় করে লেখা, আমাদের টেলিফোন নম্বর ৪১৩০৫৬, দুপুর ২টা থেকে ৩টা। কথাগুলো খুব স্পষ্ট, একেবারে জ্বলজ্বল করে। লেখার নিচে নাম না থাকলে কী হবে, মঞ্জুর বুঝতে একটুও কষ্ট হয় না, লেখাটা কার। পরের দিন বিকালে সে টেলিফোন করে, আর সঙ্গে সঙ্গে ওদিকে রাখি রিসিভার তোলে। তারপর প্রথম কথাই বলে ধমক দিয়ে। বলে, এত দেরি কেন ?

তার মানে ? মঞ্জু ঠিক বুঝে উঠতে পারে না।

মানে আবার কী ? কানে বয়রা হয়েছো শুনলাম, কিন্তু চোখের মাথাও যে খেয়ে বসে আছো, তা তো বলো নি।

কী বলছো তুমি ? মঞ্জু বোকার মতো কথা বলে।

ঠিকই বলছি হাঁদারাম– অতো বড় বড় করে লিখে দিয়ে এলাম সময়টা, চোখেই পড়লো না ? চোখ বুঁজে থাকো নাকি! পড়ার টেবিলে ? এখন ক'টা বাজে ? ক'টার সময় টেলিফোন করতে বলেছি ?

এ রকম অভিমান ভর্তি ধমকাধমকি শেষ করে একটু পর শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করে রাখি, তা কী খবর ? কেন টেলিফোন করা হচ্ছে ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

না তেমন কিছু না, মঞ্জু আমতা আমতা করে। বলে, তোমার কাছে তো স্পেটের বইখানা আছে, আমাকে দেবে, ক'দিনের জন্য ?

হ্যাঁ দেবো, রাখি সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়। জানতে চায়, কে নিয়ে যাবে বইখানা ?

কেন, আমি গেলে হয় না ?

না হয় না, রাখি গম্ভীর হয়ে বলে, অমন আধমাথা চুল নিয়ে তোমাকে আসতে হবে না।

রাখির অমন নিষেধ শুনে মঞ্জু খানিক দমে যায় বটে, কিন্তু ইচ্ছাটাকে বাতিল করে না।

সেদিন সকাল বেলাতেই টুকুকে ধরে। বলে, টুকু তুই ক্রিকেট খেলার জন্য একটা ক্যাপ কিনেছিলি না ? ওটা কোথায় ?

কেন, টুকু হাসি মুখে ভাইয়ের মুখের দিকে তাকায়। তারপর জানতে চায়, তুই ন্যাড়া হবি ?

হ্যাঁ, ভাবছি, মঞ্জু জানায়। তারপর বলে, কেন, ন্যাড়া হলে মানুষ হাসবে ?

টুকু চোখে চোখে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বলে, বাইরের মানুষ কী করবে জানি না, কিন্তু আমরা, মানে বাড়ির লোকেরা, খুব হাসবো।

ক্যাপটা হাতে নিয়ে সে প্রথমে উল্টেপাল্টে দেখে। হালকা সবুজ রং, কপালে রোদ ঠেকাবার অংশটুকুর রং আবার খাকি। ক্যাপটা মাথায় এঁটে সে আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। ক্যাপ আঁটা মাথায় নিজের চেহারাটা মন্দ লাগে না। কিন্তু মাথার পিছন দিকটা কেমন দেখাচ্ছে বুঝতে না পেরে সে ফের ছোট ভাইকে ডাকে। বলে, দেখ তো, পিছন দিকটা ঢাকা পড়েছে কিনা।

মাথা নাড়ায় টুকু। বলে, নাহ্। বিচ্ছিরি লাগছে, ফিতের নিচে দিয়ে একপাশে চুল আর অন্য পাশে ন্যাড়া।

মঞ্জু ক্যাপটা মাথায় এঁটে বাসা থেকে বেরিয়ে পড়ে। তারপর গিয়ে ঢোকে মোড়ের সেলুনে। চেনা মানুষ গোবিন্দ শীলকে নিজের মাথাটা দেখায়। তারপর আর দেরি হয় না। গোবিন্দ দেয়ালে লাগানো আয়নার সামনে বসিয়ে মাথায় সাবান লাগায় প্রথমে, তারপর গুন গুন করে গান গাইতে গাইতে খুব সুন্দর করে মাথাটা মুড়িয়ে দেয়। মঞ্জু সামনের আয়নায় নিজের ন্যাড়া মাথার দিকে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর ভেজা তোয়ালে দিয়ে গোবিন্দ মাথাটা ভালো করে মুছে দিলে সে বেশ কায়দা করে ক্যাপটা মাথায় আঁটে। তারপর ফের আয়নায় নিজের দিকে তাকায়। গোবিন্দ শীল বলে, হ্যাঁ, এইবার সোন্দর দ্যাহা যায়, মনে হয় কিরকেট পেলেয়ার। গোবিন্দ শেভ করতে চাইলে সে রাজি হয় না। সেলুন থেকে বেরিয়ে সোজা গিয়ে রিকশায় ওঠে। তারপর মিনিট দশেক লাগে পুরানা পল্টনে রাখিদের বাসায় পৌঁছতে।

সেখানে গিয়ে দেখে রাখি ভিসিপি চালিয়ে ম্যাডোনার গান শুনছে।

মঞ্জুর দিকে তাকিয়ে রাখি হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে। বলে, তুমি সত্যি সত্যি মাথা ন্যাড়া করে দিলে। দেখি কেমন লাগে। ক্যাপটা খোলো তো ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

মঞ্জু হাসে, আবার খানিক বিব্রতও হয়। বলে, আরে নাহ্, ন্যাড়া মাথা কি একটা দেখবার মতো জিনিস নাকি যে দেখবে?

আহা দেখি না, একবারের জন্য টুপিটা খোলো, শুধু একবার।

মঞ্জু ডাইনে-বাঁয়ে তাকায়।

রাখি ফের খিলখিল করে হেসে ওঠে। বলে, ওমা এতে লজ্জার কি আছে, তা ছাড়া বাসায় এখন কেউ নেই। আদুরি পর্যন্ত বাইরে।

আদুরি কে? মঞ্জু জিজ্ঞেস না করে পারে না?

আরে আমাদের কাজের মেয়ে। ওকে নিয়ে মা বাজারে গেছেন, বাজার সেরে দীপুর স্কুলে যাবেন। স্কুল ছুটির পর বাসায় ফিরবেন। আমি এখন বাসায় একা। যা খুশি করতে পারি।

ওর কথা শুনতে শুনতে একটু বোধহয় বেখেয়াল হচ্ছিলো মঞ্জু। ব্যস ওতেই রাখি সুযোগ পেয়ে যায়। সে হাত বাড়িয়ে খপ করে মঞ্জুর মাথার ক্যাপটা টেনে নেয়। তারপর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলে, বাহ্ খুব সুন্দর দেখাচ্ছে এখন, একেবারে নাড়ু গোপাল।

হাসতে হাসতে হঠাৎ কী যেন মনে পড়ে রাখির। তখন তার মুখের হাসি মিলিয়ে যায়। মঞ্জুর চোখের ওপর চোখ রেখে কী যেন দেখে। নিচু গলায় প্রায় ফিসফিস করে বলে, এই, একটা সত্যি কথা বলবে?

রাখির গলার স্বর শুনে আর ওর অমন তাকানো দেখে মঞ্জুর মনের ভিতরটা টানটান হয়ে ওঠে। বলে, তুমি নিশ্চয়ই সিরিয়াস কথা বলতে চাইছো– না সিরিয়াস কিছু ব'লো না–

কেন বলবো না, রাখির গলার স্বর অন্য রকম শোনায়। সে কয়েক মুহূর্ত ফের চোখে চোখে তাকায়। তারপর মুখ নিচু করে কী যেন চিন্তা করে। শেষে মুখোমুখি তাকিয়ে বলে, তুমি সেদিন কেন ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলে? সত্যি করে বলো।

মঞ্জু ভেবে পায় না কী জবাব দেবে। ওদিকে রাখি কেমন যেন অধৈর্য হয়ে ওঠে। সে ফের বলে, কী হলো, বলো না, এই, কেন তুমি ওভাবে আমাকে বাঁচাবার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছিলে?

মঞ্জু রীতিমতো ফাঁপড়ে পড়ে যায়। কী অদ্ভুত কথা রাখির– এটা কি একটা প্রশ্ন হলো? একটি মেয়ের সঙ্গে হেঁটে যাচ্ছিলো পাশাপাশি। ঐ মেয়ের ওপর কেউ হামলা করতে চাইলে সে ঠেকাবে না? কী মুশকিল?

সে বলে, এটা কি বলার মতো কথা? একটি মেয়ের ওপর হামলা হলে সেটা আমি ঠেকাবো না? যে কোনো মানুষ ঠেকাবে।

না, তা নয়, রাখি মাথা নাড়ায়। বলে, আমার চারদিকে তখন অনেক ছেলে ছিলো। আমি চিৎকারও করে উঠেছিলাম। কিন্তু আর কেউ এগিয়ে আসে নি, তুমি কেন এগিয়ে এসেছিলে? বলো না– এ-ই!

মঞ্জু বোকার মতো রাখির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। রাখি ফের হাত ধরে বলে, প্লীজ বলো, আমি কিছু মনে করবো না, একটুও রাগ করবো না, বলো তুমি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বলতে বলতে রাখি নিজে সোফায় বসে মঞ্জুকেও টেনে পাশে বসায়। তারপর মঞ্জুর মাথা টেনে নিচে ঝুঁকিয়ে মাথার পিছন দিককার ক্ষতস্থানে আঙুল বোলায়।

এবার বলো, সঙ্কোচের কিছু নেই। বলো তুমি, আমরা এখন যথেষ্ট বড় হয়েছি।

মঞ্জু এবার মুখোমুখি সোজা হয়ে বসে। রাখির কপাল, ভ্রূ, কপালের ওপর এসে পড়া চুল, মসৃণ ফর্সা গলা, ঘাড়, তার নিচে বুকের স্ফীতি– সব দেখে এক এক করে। ঐ মুহূর্তে আবার এও মনে পড়ে, যে দু'জনের একই দিনে জন্ম হয়েছিলো, আসলেই কি দু'জনেই যথেষ্ট বড় হয়েছে তারা? সে ঠিক বুঝে উঠতে পারে না।

রাখি চোখে চোখে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বলে, এই শোনো, তুমি আমাকে ভালোবাসো, তাই না? বলতে লজ্জা পাও, ঠিক না? আমাকে ভালোবেসে তুমি প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারো, তাই না? বলো তুমি, লজ্জা করো কেন? এই, বলো তুমি, ঠিক না? এই মঞ্জু?

ডাকটা মঞ্জুর বুকের ভিতরে কোথায় যেন ধাক্কা মারে। তারও মনে প্রশ্ন জাগে, আসলেই কি সে রাখিকে ভালোবাসে? ওকে ভালো লাগে? ওকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়াতে ইচ্ছা করে? ওর সঙ্গে কথা বললে ভালো লাগে? এগুলোই কি ভালোবাসা? এভাবেই কি ভালোবাসা হয় ছেলেতে মেয়েতে। সে ভেবে থই পায় না। তার এখন কী করা উচিত তাও সে বুঝে উঠতে পারে না। সে কি এখন দু'হাতে রাখিকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরবে? তারপর ঠোঁটে চুমু খাবে? তারপর আর কী? আর কী করবে? আর কী করে ছেলেতে মেয়েতে ভালোবাসাবাসি হলে?

সিনেমায় দেখা, গল্পে পড়া অনেক দৃশ্যের কথা মনে পড়ে মঞ্জুর। কিন্তু ঐ, মনে পড়া পর্যন্তই– কিছুই করা হয় না তার। আর রাখিও ঐ সময় মঞ্জুর হাত দু'খানা কোলের ওপর নিয়ে হঠাৎ চুপচাপ হয়ে যায়।

কতোক্ষণ জানে না, এক সময় মঞ্জু বলে, বইখানা দাও, আমি এবার যাবো।

রাখি শক্ত করে মঞ্জুর হাত ধরে রাখে। বলে, না তুমি এখন যাবে না। বলতে বলতে সে উঠে দাঁড়ায়, আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মঞ্জুর মাথাটা বুকের ওপর টেনে নিয়ে ক্ষতস্থানে ওপর হাত বোলায়। বলে, তুমি আজ অনেকক্ষণ থাকবে আমার কাছে।

মঞ্জুর এমন অভিজ্ঞতা নতুন। মেয়েদের বুকের ওপর মুখ রাখলে অদ্ভুত অনুভূতি হয়। শারীরিক উত্তেজনা হয়। কিন্তু তার সঙ্গে আশ্চর্য স্নিগ্ধ একটা ভালোলাগায় সারাটা মন ছেয়ে যায়।

রাখি ফের যখন বলে– থাকবে তো আমার কাছে? কী হলো? থাকবে তো?

ঐ কথার হাসি পায় মঞ্জুর। বলে, কতোক্ষণ? সারা দিন? কিন্তু একটু পরই তো তোমার মায়ের ফিরে আসার কথা। তখন কী হবে? কী বলবে তাঁকে?

কিছু একটা বলবো, রাখি নিশ্চিন্ত ভঙ্গিতে বলে, মা কিছু মনে করবেন না, বাবাও না।

একটু থেমে ফের বলে, কেন বলবেন? আমরা খারাপ কিছু তো করি নি।

মঞ্জু রাখির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। তখনও সে মনে মনে ভাবে, তাহলে কি সত্যি সত্যিই ভালোবাসা হয়েছে তাদের। এইভাবে, এতো সহজে ছেলেতে মেয়েতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ভালোবাসা হয় ? তার হাত দু'খানি তখনও রাখির দু'হাতে ধরা। রাখি বলে, কী হলো, তুমি কিছু বলছো না কেন ? কিছু একটা বলবে তো ?

কী বলবো ?

কিছু একটা বলো, যা বলতে ইচ্ছে করে।

নাহ্। মঞ্জু ডাইনে বাঁয়ে তাকায়। তারপর বলে, আমার বিশ্বাস হতে চাইছে না।

কী বিশ্বাস হতে চাইছে না ? রাখি চোখ পাকিয়ে মুখোমুখি তাকায়। বলে, আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না, তাই না ?

তারপর মুহূর্তের মধ্যে কাণ্ডটা ঘটায় রাখি। তড়াক করে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ায়, তারপর মঞ্জুর মাথা বুকের মধ্যে চেপে ধরে ঠোঁটের ওপর ঠোঁট চেপে রেখে লম্বা চুমু খায় একবার। শেষে দু'পা পিছিয়ে দাঁড়ায়। জিজ্ঞেস করে এবার বিশ্বাস হচ্ছে ?

মঞ্জুর অবস্থা তখন বেজায় বেহাল। তার বুকের ভিতরে শঙ্কা আর আবেগ এক সঙ্গে তোলপাড় করতে থাকে। রাখিকে তার একেবারে অন্যরকম লাগে। একি শান্তশিষ্ট কম কথা বলা সেই রাখি, নাকি এ অন্য কোনো মেয়ে ?

রাখি তখনও হাসে। বলে, তুই একটা গাধা-বুঝলি, বিচ্ছিরি রকমের হাঁদা, আর হানড্রেড পার্সেন্ট বোকা।

আরও কিছু হয়তো বলতো। কিন্তু ঐ মুহূর্তে কলিং বেলের আওয়াজ হয় এবং রাখি এগিয়ে গিয়ে দরজা খোলে। আর দেখা যায় সমীরণ কাকা একটা ব্যাগ হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকছেন।

মাথার চুল গজাতে দিন সাতেক লেগে যায়। ঘাড়ের ব্যথাটা টের পাওয়া না গেলে কী হবে, ডান দিকের কানে কম শোনার সমস্যাটা থেকেই গেলো। কতো দিন আর ক্লাস কামাই করবে ? কম করে হলেও সপ্তাহ দুয়েক তো ইউনিভার্সিটি যাওয়া বন্ধ ছিলো। বাইরে যাওয়া মানে ভাইয়ার সঙ্গে ডাক্তারের কাছে যাওয়া। ব্যস ঐটুকু বেরুনো, একদিন যে সাহস করে রাখিদের বাসায় গিয়েছিলো ঐ তার শেষ যাওয়া। তার ধারণা রাখির বাবা নিশ্চয়ই কিছু সন্দেহ করেছেন। কারণ টেলিফোনেও বেশি কথা বলতে চায় না আজকাল রাখি।

মঞ্জুর ক্লাস আরম্ভ করারও দিন পাঁচেক আগে থেকে রাখি ক্লাস করছে। প্রথম দু'দিন গিয়েছিলো বাবার সঙ্গে তারপর দু'দিন গেছে মায়ের সঙ্গে, এখন একাই যায়। যাদের ভয়ে সে ক্লাস করতো না, তাদের এখন ইউনিভার্সিটি এলাকায় দেখা যায় না। কারণ প্রায় রোজই মিছিল নয়তো মিটিং হচ্ছে। একদিন ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ যদি আর্টস বিল্ডিং গরম করে রাখলো তো কার্জন হল এলাকায় মিটিং-মিছিল চললো সংগ্রামী ছাত্র জোটের। যেদিন বেশি উত্তেজনা দেখা যায়, সেদিন ক্লাস হয় না। অমন অবস্থা হলে রাখি সোজা লাইব্রেরিতে চলে যায়। কোনো দিন মঞ্জু সঙ্গে থাকে। কোনো দিন আবার থাকে না। আজকাল রাখির সঙ্গে আরও দু'তিনটি মেয়ের অন্তরঙ্গতা হয়েছে। মঞ্জুকে, মানে মাহিব রায়হানকেও এখন অনেকেই চেনে। সম্ভবতঃ মার খেয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

হাসপাতালে যাওয়ার কারণে তার এই পরিচয়টুকু বেড়েছে। আজকাল দু'টি ছেলে বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে, একজন সাঈদ হাসান আর অন্যজন প্রভাত পেরেরা। সাঈদ মেসে থাকে। হলে এখনও সিট পায় নি। আর প্রভাত থাকে তেজগাঁর দিকে; ওদিকে কোথায় খ্রিষ্টানদের একটা হোস্টেল আছে। দূর থেকে আসে বলে, ইউনিভার্সিটি এলাকায় গোলমাল বাধলে বেশ মুশকিল হয় দু'জনেরই। মঞ্জুর সঙ্গে ঘনিষ্ট হওয়ার সম্ভবত সেটাই কারণ। ওদের ধারণা ওদের বিপদ হলে মঞ্জু সাহায্য করবে।

ফলে ক্লাসে মুখ দেখাদেখি হয়, ক্লাসের বাইরেও এ ওকে দেখে, কিন্তু ঘনিষ্ঠ হওয়া আর হয় না। কারণ রাখি যদি তার দুই নতুন বান্ধবীকে নিয়ে একদিকে থাকে তো মঞ্জু তার নতুন দুই বন্ধুকে নিয়ে থাকে অন্যদিকে। আর কাছাকাছি হলেও রাখি কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে পড়ে। পাশাপাশি দু'জনে হাঁটছে, কি দাঁড়িয়েছে, দেখা যায় রাখি ডাইনে বাঁয়ে তাকাচ্ছে। অমন তাকাতে তাকাতেই হয়তো ফিসফিস করে বললো, এই, ওরা কি আমাদের দেখছে?

কারা? মঞ্জুও ডাইনে বাঁয়ে তাকিয়ে অন্য ছেলেমেয়েদের দিকে লক্ষ্য করে। তার মনে হয় না তাদের দিকে কেউ তাকিয়ে দেখছে– রাখির কাণ্ড দেখে মঞ্জু হাসে। বলে, তোমার অতো সাহস– এখন সেই সাহস কোথায়?

রাখি হাঁটতে হাঁটতে আড়চোখে তাকিয়ে বলে, আমরা এমন ঘনিষ্ঠ হয়ে কথা বললে ওরা সন্দেহ করবে না?

নিশ্চয়ই করবে। তা করুক, মঞ্জু হাসে। বলে যতো ইচ্ছে সন্দেহ করুক।

রাখির লাজুক মুখেও হাসি ফোটে। বলে, যাহ্ আমার ভীষণ লজ্জা করে।

রাখি একদিন মঞ্জুকে নিয়ে রিকশায় ওঠে। বলে, চলো আজ অন্যদিকে যাই, কথা আছে।

মঞ্জু বুঝতে পারে না অন্যদিক বলতে রাখি কী বোঝাচ্ছে। সে বলে, অন্যদিকে কোথায়?

কেন, দূরে কোথাও, চিড়িয়াখানার দিকে?

মাথা খারাপ? মঞ্জু রাখির প্রস্তাব হেসে উড়িয়ে দেয়। বলে, রাস্তাঘাটের যা অবস্থা, মিছিল-টিছিল বেরিয়ে গাড়ি ভাঙাভাঙি শুরু করে দিলে তখন কী হবে? সে রিকশাঅলাকে বেইলি রোডের দিকে যেতে বলে।

রাখি মঞ্জুর হাত ধরে বলে, সত্যি সত্যি কি এরশাদ দেশটাকে মুসলমানদের দেশ বানাবে?

মঞ্জু হাসে। বলে, মুসলমানদের দেশ বানাবে মানে? এটা তো মুসলমানদের দেশ হয়েই আছে– এ দেশে মুসলমান বেশি তা জানো না?

না, তা নয়, রাষ্ট্রধর্ম আইন নাকি পাস করতে যাচ্ছে?

হ্যাঁ, যাচ্ছে– ও আইন পাসও হয়ে যাবে, মঞ্জু এমন ভঙ্গিতে কথাটা বলে, যেন বিষয়টা নিয়ে চিন্তা করার কিছুই নেই।

রাখির দু'হাতের মুঠোয় মঞ্জুর হাত তখনও ধরা। সে মঞ্জুর মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, তাহলে আমরা?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

মঞ্জুর ভ্রূ কুঁচকে ওঠে। বলে, তোমরা কী ?

আমরা কোথায় যাবো ? আমরা এ দেশে থাকতে পারবো ?

বাহ্ কেন পারবে না ? মঞ্জু গলার স্বরে তখনও জ্বালা। বলে, এ দেশে এতোকাল যখন আছো, তখন রাষ্ট্রধর্ম হয়ে গেলেও থাকতে পারবে, আর যদি–

রাখি ফের মঞ্জুর মুখের দিকে তাকায়। বলে, আর যদি কী ?

যদি না থাকতে পারো, তাহলে চলে যাবে ?

ঐ কথার পর মঞ্জু অনেকক্ষণ কথা বলে না। রিকশা তখন নিউ বেইলি রোডের মাঝামাঝি, রাখি রিকশা থামায়। বলে, এখানে নামি চলো।

এখানে কী ? মঞ্জু অবাক হয়।

রাখি বলে, শাড়ি দেখবো। ছোট মামার বিয়ে, আমরা জলপাইগুড়ি যাচ্ছি, মা জামদানি শাড়ি দেখতে বলেছেন– ঢাকার জামদানির তো খুব নাম তাই–।

শাড়ির দোকানে মহিলাদের খুব ভিড়, মঞ্জুকে বাইরেই থাকতে হয়। রাখি ভিড়ের মধ্যে ঢুকে কিছুক্ষণ কী করে বোঝা যায় না তারপর এক সময় বেরিয়ে আসে। দু'জনে ফের রাস্তায় নামে। রাখি বলে, আমার মা বাবা কিন্তু খুব চিন্তায় পড়ে গিয়েছেন।

মঞ্জু ঠিক বুঝতে পারে না। বলে, কিসের চিন্তা, কেন ?

বাহ্ তোমাদের রাষ্ট্রধর্ম আইন পাস হয়ে গেলে অন্য ধর্মের লোকেদের অসুবিধা হবে না ? বাবা অবশ্যি ঠাট্টা করে বলছেন, আমরা মুসলমান হয়ে যাবো।

কী বলছেন ? মঞ্জু দাঁড়িয়ে যায়।

না, সিরিয়াসলি না– বললাম তো, ঠাট্টা করে বলছেন।

রাখির এ কথা শুনে মঞ্জুর খারাপ লাগে। বলে, কেন অমন কথা বলছেন ? তোমরা কি চলে যাবে ?

ধ্যাৎ, রাখি হাসে। বলে, তুমি একেবারে হাঁদা– যাবার কথা উঠছে কেন ?

বাহ্ যাবার কথাটাই তো উঠছে, মঞ্জু বলে, উনি তো ঐ কথাই বলছেন যে, এ দেশে থাকতে হলে মুসলমান হয়ে থাকতে হবে– এ দেশে থাকার জন্য দরকার হলে উনি মুসলমান পর্যন্ত হয়ে যাবেন।

রাখি হাঁটতে হাঁটতে দাঁড়িয়ে পড়ে। বলে, তুমি না একটা বাজে ছেলে– শয়তান– বাজে কথা নিয়ে খালি প্যাঁচাও।

কথা বলতে বলতে দু'জনে বইয়ের দোকানে ঢোকে। কিছুক্ষণ পত্রিকা দেখে, আলমারি ভর্তি কলকাতার বই দেখে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের বই দেখিয়ে রাখি বলে, দেশ পত্রিকায় 'সেই সময়' বেরিয়েছে, তুমি পড়েছো ? মঞ্জু মাথা নাড়ায়। বলে, আমার ভালো লাগে নি, দু'একটা সংখ্যা পড়েছি– বাজে–

রাখি হাসে। বলে, তোমার সঙ্গে এই একটা ব্যাপারে আমার মতে মিললো না।

শুধু এই একটা ব্যাপারই ? মঞ্জু পাল্টা জিজ্ঞেস করে।

এখন পর্যন্ত তো এই একটা ব্যাপারেই গড়মিল মনে হচ্ছে, পরে হয়তো আরও হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

হোক না, রাখি মঞ্জুর হাত ধরে। বলে, সব ব্যাপারেও যদি গরমিল হয় তাতেই বা কী ক্ষতি ?

তার মানে ? মঞ্জু হাসে। বলে, বইয়ের দোকানে যদি মতের অমিল হয়, তাহলে বইয়ের দোকান থেকে বের হও– এক্ষুণি।

রাস্তায় নেমে মঞ্জু স্মরণ করিয়ে দেয়, তোমার ছোট মামার বিয়ে, মনে আছে ? জামদানি শাড়ি দেখতে এসেছো তুমি।

দু'জনে তখন আর এক শাড়ির দোকানে ঢোকে। এ দোকানে ভিড় কম। কিন্তু ওদের দু'জনকে দেখে দোকানঅলাদের বোধহয় পছন্দ হয় না। রাখি যখন জিজ্ঞেস করে, ভালো জামদানি আছে ?

তখন লোকটি নিস্পৃহ চোখে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর বলে, হ্যাঁ আছে। শেষে ফের বলে, কিনবেন, না দেখবেন ?

দোকানের সেলসম্যানের অমন কথা শুনে রাখি রীতিমতো থতমত খায়। তখন মঞ্জু এগিয়ে সামনে দাঁড়ায়। লোকটার দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে। আপনারা বিক্রি করেন, না খালি দেখান ?

লোকটি শোকেসে ডামির গায়ে জড়ানো শাড়িখানা দেখিয়ে বলে, ঐ যে ওখানে গিয়ে দেখুন। রাখির গা জ্বলে রি রি করে। সে হাত ধরে মঞ্জুকে টেনে দোকান থেকে বাইরে বের করে আনে। বলে, আমারই ভুল হয়েছে– তোমাকে নিয়ে শাড়ির দোকানে আসা আমার উচিত হয় নি।

বাহ্ তা কেন ? মঞ্জু প্রতিবাদ করে। বলে, কোনো ভুল হয় নি– দু'জনে মিলে সবকিছু পছন্দ করাটাই ঠিক।

কে বলেছে তোমাকে– রাখি মুখিয়ে উঠে প্রশ্ন করে। বলে, মেয়েদের কী পছন্দ, ছেলেরা তার কী বোঝে ?

কে বলেছে বোঝে না, মঞ্জু জেদ করে বলে, ছেলেরা সব কিছু বোঝে। একশো বার বোঝে।

ঠিক আছে, রাখি হাঁটতে হাঁটতে হাসে। বলে, তাহলে এই আর একটা মতে আমাদের মিল হলো না। তাহলে কী দাঁড়ালো ? রাখিই ফের বলে, তোমার আমার মিল নাই, মিল নাই– তাই বাঁধিলাম রাখি।

বলতে বলতে রাখি মঞ্জুর দুই হাত নিজের দুই হাতে শক্ত করে ধরে।

আর ঠিক ঐ সময় পিছন থেকে একটা ভেসপা স্কুটার সামনে এসে দাঁড়ায়। দু'জন তরুণ সেই ভেসপা থেকে নেমে দাঁড়ালে রাখির চোখমুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়। তার মুখ দিয়ে অস্ফুট কথা বের হয়। বলে, ওরা কেন ? ওরা এখানে কেন ?

দু'জনেরই চোখে সানগ্লাস। মঞ্জু কাউকেই চিনতে পারে না। সে দু'পা সামনে এগিয়ে যায়। জিজ্ঞেস করে, আপনারা কি কিছু বলবেন ?

হ্যাঁ বলবো। একজন বুকের ওপর দু'হাত ভাঁজ করে বলে, তুমি দেহি ফিল্ডিং মারতে আইছো এই জায়গায় ? মিয়া আর জায়গা পাইলা না ? হিন্দু মাইয়ার লগে ফিল্ডিং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

মারতে খুব মজা, তাই না ? খবরদার কইয়া দিলাম আর যেন না দেহি– একেরে খরচ হইয়া যাইবা কইলাম।

এ্যাই মাইয়া। দ্বিতীয় যুবকটি রাখিকে ধমকে ওঠে। বলে, লও, ভ্যাসপায় উঠো। কুনো কথা কইবা না।

তার মানে! মঞ্জু আরও দু'কদম এগিয়ে যায়। রাখি বাঁচাও বাঁচাও বলে চিৎকার করে। কিন্তু কোনোদিক থেকে অন্য কোনো শব্দ শোনা যায় না। নিমেষে রাস্তাটা ফাঁকা হয়ে খাঁ খাঁ করতে থাকে। একজন রাখির হাত ধরে টানে। বলে, ডরাও ক্যান, এ্যাঁ ? ভয়ের কিছু নাই। আমরা তোমারে বাসায় দিয়া আমু– লও উঠো।

রাখি চিৎকার করে হাত-পা ছোঁড়াছুঁড়ি করে। মঞ্জু তাকে ধরতে গেলে তার পিঠে দু'হাত মুঠো করে কুশলী কায়দায় এমন একটা রদ্দা লাগায় যে, তাকে বসে পড়তে হয়। এবং বসতে বসতে সে নীল আসমানে হাজার হাজার ফুলকি দেখে প্রথমে, তারপর তার জ্ঞানখানি তরল হয়ে ঘোলাটে মোলাটে হয়ে যায়।

না, যা মনে হয়েছিলো সে রকম কিছু নাকি নয়। অন্তত আব্বা তাই বললেন, সমীরণ কাকাই জানিয়েছেন। খবরটা মঞ্জু জানতে পারে অনেক রাতে। জানা যায়, আবু আর সাবু দুই বন্ধুর কাজ ওটা। না পুলিশ কেস হয়নি– কেন হবে ? ওরা তো বিরোধী দলের ছেলেদের সঙ্গে ঘোরে, রাখিকে ওরা ঠিক ঠিক মতো বাবা-মায়ের কাছে পৌছেও দিয়েছে। মঞ্জু সেই রাতেই খোঁজ নিতে গিয়েছিলো, শুধু একবার চোখের দেখা দেখতো রাখিকে। কিন্তু সমীরণ কাকা আর গীতা মাসী বাড়ির গেটটাই খোলেন নি। মঞ্জু রাস্তায় চিৎকার করে রাখির নাম ধরে ডাকাডাকি করে শেষে ভোর রাতের দিকে বাসায় ফেরে।

কুড়ি

টুকুর স্কুলের ব্যাগটা ঝেড়ে পরিষ্কার করার সময় ট্যাবলেটের প্রায় ফুরিয়ে যাওয়া স্ট্রিপ দেখতে পায় বীথি। তার অবাক লাগে, ছেলের হঠাৎ কী অসুখ হলো যে তাকে ট্যাবলেট খেতে হচ্ছে ? স্ট্রিপের মধ্যে তখনও দুটো ট্যাবলেট আছে দেখে সে নামটা পড়ে : নিউ এ্যাকটিন। কিসের ওষুধ হতে পারে সে স্মরণ করতে চেষ্টা করে। কিন্তু মিনিট দুই চেষ্টার পরও মনে পড়ে না, এই নামের কোনো ট্যাবলেট সে কাউকে খেতে দেখেছে। তবে অনুমান করে নিউ এ্যাকটিন বোধহয় ব্যথাবেদনার কোনো নতুন ওষুধ। ব্যথাবেদনা ছাড়া আর কোন কারণে টুকু ট্যাবলেট খাবে ? উটকো চিন্তাটাকে সে মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে চায়। কিন্তু পারে না, মনের মধ্যে চিন্তাটা একটু একটু খোঁচাতেই থাকে। অগত্যা সে স্ট্রিপটা টেবিলের ওপর রেখে মনে মনে ঠিক করে, ছেলেকে সে আজই জিজ্ঞেস করবে– ওর কী হয়েছে যে ও এই ওষুধ খায়।

ছেলে ক্রিকেট পাগল হয়ে উঠেছে আজকাল। স্কুল থেকে বাসায় ফিরেই নাকে-মুখে কিছু গুঁজেই ফের ছুটে বের হয়, সোজা চলে যায় ধূপখোলার মাঠে। ফিরতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

কোনো কোনো দিন সন্ধ্যা হয়ে যায়। আর ছুটির দিন হলে তো কথাই নেই। সকাল বেলা থেকেই বাবুর সাজ সাজ রব। কী কারণ? না, বাবু আজ ম্যাচ খেলতে যাবেন।

ছোট ছেলেকে নিয়ে কোনো রকম চিন্তাই ছিলো না কিন্তু আজকাল চিন্তা হয় একেকদিন। চিন্তা অন্য কিছু নয়। চিন্তার কারণ ছেলেটা যেন হঠাৎ বড় হয়ে গেলো। এটাই কারণ। একই গর্ভে জন্ম কিন্তু তিন ছেলের চলন-বলন আর ধরন-ধারণ এমন আলাদা হয়ে যাচ্ছে যে বলার কথা নয়। বড়টা ধীর-শান্ত, পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত, কথাবার্তা বেশি বলতে চায় না। কিন্তু মনের দিক থেকে খোলামেলা, ওর ভাবনাচিন্তার খবর জানা যায়। মেজোটারও ঝোঁক লেখাপড়ার দিকে। কিন্তু ভীষণ চাপা, নিজেকে কিছুতেই খোলামেলা করতে পারে না, তার বন্ধু কেউ আছে কি না ধরা মুশকিল। কিন্তু ছোটটা একেবারে অন্য রকম– হাসিখুশি, ছটফটে, বইটই পড়ে না যে তা নয়, পড়ে কিন্তু খুব বেশি ঝোঁক ওদিকে নেই– ঝোঁক ওর খেলার দিকে। আর বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আড্ডা– সে যে কী কাণ্ড, না দেখলে বিশ্বাস করার উপায় নেই। সেবার গরমের ছুটিতে তিন বন্ধুর সঙ্গে রোজ সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সে আড্ডা দিতো, শুধু দুপুরে স্নান-খাওয়ার সময়টুকু বাদে। এই বয়সেই ওর কতো রকমের যে বন্ধু হিসেব রাখা যায় না। গেন্ডারিয়া, হাটখোলা, গোপীবাগ, ওয়ারী, আরামবাগ, পল্টন– সব পাড়ায় নাকি ওর বন্ধু আছে। সেদিন কে যেন বললো, সুইপার কলোনিতেও নাকি ওর বন্ধু আছে, তার নাম নাকি মনিলিঙ্গম।

দিনটা শুক্রবার, ছুটির দিন। সকাল বেলা থেকেই রায়হান উধাও। ফুলবাড়িয়ায় নাকি জমির সীমানা নিয়ে ঝামেলা হয়েছে। আজকাল মনে হয় টনক নড়েছে সায়েবের। বাড়িওয়ালা ভাড়া বাড়াবার জন্য চাপাচাপি শুরু করেছে, সেই কারণেই বোধহয় বাড়ি বানাবার কাজটা শুরু করার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। ছুটির দিনে তার এই এক কাজ, ঘরদোর বিছানা পর্দা এসব পয়পরিষ্কার করা। টুকুর ঘরের চাদর পর্দা বালিশের ওয়াড় বের করে সে মোমেনার হাতে দেয়। তারপর ঢোকে মঞ্জুর ঘরে। ওর ঘরের দেয়ালে একটা ঘড়ি আছে। ঘড়ির দিকে নজর পড়লে তার তাড়া বাড়ে, প্রায় দশটা বাজতে চলেছে, এখনও কাপড়ে সাবান লাগানো হলো না। আসলে গাফিলতিটা তার নিজেরই। কর্তা বেরিয়ে যাবার পরপরই বের হয় ছোটটি, সে যে কখন বেরিয়েছে সে টেরও পায় নি। রঞ্জু ছুটির দিনে সকাল বেলার দিকে এক পাক ঘুরতে যায়। সম্ভবত ওর জন্যই সে ভেতরে ভেতরে অপেক্ষা করছিলো। কিন্তু ছেলের টিকিটি পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না এখন পর্যন্ত। সে মঞ্জুর বিছানায় বালিশের ওয়াড় খুলতে গিয়ে একটা ছোট চিরকুট দেখে। হাতের লেখাটা মেয়েলি ছাঁদের মনে হওয়াতে সে হাতে তোলে চিরকুটটা। দু'টি লাইন মাত্র লেখা কিন্তু ঐ দু'টি লাইন পড়েই সে রীতিমতো চমকায়। মঞ্জু, তার মেজো। ঐটুকু ছেলে, তারও কাছে মেয়েরা চিঠি লেখে? নামটা পড়তে অসুবিধা হয় না। রাখি কে? প্রথমটা সে বুঝতে পারে না। কিন্তু খানিক পরই তার স্মরণ হয়, রাখি তো গীতার মেয়ের নাম। একই ক্লাসে পড়ে দু'জনে। তার একটু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

মজাই লাগে বলতে হবে। মনে মনে একটু হাসেও সে। মঞ্জুও কি তাহলে প্রেম করতে শিখে গেলো ? তবে মজা লাগার ভাবটা থাকে না দ্বিতীয়বার চিরকুটটার ওপর নজর পড়লে সে মনের ভেতরে রীতিমতো ঝাঁকুনি খায়, গীতা মেয়েকে কলকাতা পাঠিয়ে দিচ্ছে কেন ? এ কী কাণ্ড, পরের লাইনে এসব কী লেখা। মেয়েটা এমন কথা কেন লিখেছে ? আমার সেদিন সর্বনাশ হয়ে গেছে– এ কথাটা কেন লিখেছে ? কথাটার মানে কী ? তার পরে আবার লেখা আমাকে এখানে রাখবে না– এই কথারই বা কী মানে ? কে রাখবে না? কেন রাখবে না ?

বীথি মঞ্জুর বিছানায় বসে বারবার করে চিরকুটটা পড়ে। তার খেয়াল হয়, কিছুদিন ধরে যে মঞ্জুর ভাবসাব অন্য রকম হয়ে গেছে এই চিরকুটটাই কি তার কারণ ? নিজের জীবনের নানান পুরনো কথা মনে পড়ে। দিনের পর দিন উদ্বেগ আর চিন্তা। কত বয়স তখন বীথির ? আঠারোই হবে। কারণ সে তখন বিএ ক্লাসের ছাত্রী। তবে রায়হানের বয়স অত কম ছিলো না– হাঁ, যে যাই বলুক। বীথি আপন মনে হাসে। রুমমেট শাহিনা তো বলতো, তুই কিন্তু খুব চালাক– প্রেম করছিস কিন্তু ঠিকঠিক মতো, একেবারে হিসেব করে– আমাদের মতো তুই কাঁচা কাজ করিস না। সে মনে মনে হিসেব করে তবু মঞ্জুকেই পছন্দ করলো ? সে মনে মনে হাসে আর বলে, এক বয়সী ছেলের সঙ্গে যে ঝুলে পড়লি, তার পরিণাম কী হবে ভেবে দেখলি না একবার ? মনে মনে সে রাখিকে মুখোমুখি কল্পনা করে বলে, মঞ্জুর নিজের পায়ে দাঁড়াতে এখনও কতো দেরি, অতো দিন তুই অপেক্ষা করতে পারবি ? তোর বাবা-মা অপেক্ষা করতে দেবে ? আর মুসলমান ছেলেকে বিয়ে করা কি সোজা কথা ? তোর বাবা-মা রাজি হবে কিনা এসবের কিছুই ভাবলি না ? এমন বোকামি কেউ করে!

বীথি ময়লা কাপড় আর চিরকুটটা হাতে নিয়ে মঞ্জুর ঘর থেকে বেরিয়ে বসার ঘরে এসে দেখে, রঞ্জু টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে। আর তার হাতে নিউ এ্যাকটিনের সেই স্ট্রিপটা। মাকে দেখে রঞ্জু জিজ্ঞেস করে, এটা এখানে কেন ? কীভাবে এলো ? কে এনেছে ?

মার বলিস না, তোর ছোট ভাইয়ের কাণ্ড ও নিজেই আজকাল ডাক্তারি আরম্ভ করেছে, ওর স্কুলের ব্যাগ থেকে বেরুলো– ওটা তো ব্যাথার ওষুধ, তাই না ?

রঞ্জু মায়ের প্রশ্নের জবাব দেয় না। চুপচাপ বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ায়। তার মগজে খুব জোর একটা ধাক্কা লেগেছে স্ট্রিপটা টুকুর ব্যাগ থেকে বেরিয়েছে শুনে। কত বয়স টুকুর ? সে মনে মনে হিসেব করে, ছিয়াত্তরে জন্ম হলে এখন ওর বয়স বারো বছর, এই বয়সে ও ড্রাগ এ্যাডিক্ট হয়ে যাবে ? কীভাবে সম্ভব ? সে স্ট্রিপটা উল্টে-পাল্টে দেখে– অবশ্যি পুরোপুরি এ্যাডিক্ট এই ট্যাবলেট দিয়ে হয় না, সেটা তার জানা কিন্তু তবু এই ট্যাবলেটই বা সে কেন নেবে ? তার মগজে কোনো রকম ব্যাখ্যা খেলে না।

স্ট্রিপের সাইটা খোপ ফাঁকা– তার মানে পুরো স্ট্রিপটাই ও কিনেছে, অথবা ওকে কেউ দিয়েছে। সাইটা তার মতো হয়েছে এখন বাকি রয়েছে দুটো। তার মনে সন্দেহ জাগে সাইটা ট্যাবলেটই কি ও একা খেয়েছে ? নাকি বন্ধুবান্ধব মিলে খেয়েছে। মঞ্জু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

সাতপাঁচ চিন্তা করে মাকে কিছুই জানায় না। ছোট ভাই ড্রাগ খেয়ে নেশা করতে শিখেছে– এমন কথা কি মাকে হুট করে বলা যায়? মা তো ভেবে বসে আছে যে, ওটা ব্যাথাবেদনার ওষুধ। সে মাকে কিছু না বলে শুধু জিজ্ঞেস করে– ও কোথায় খেলতে গেছে জানো?

কেন, তুই জানিস না? গেণ্ডারিয়ার দিকে যে ধূপখোলার মাঠ আছে, ওখানেই তো শুনেছি খেলতে যায় ওরা।

ওরা কারা? রঞ্জু মায়ের মুখের দিকে তাকায়।

কেন, ওর স্কুলের বন্ধুরা? নাকি অন্য কোনো স্কুলের সঙ্গে ম্যাচ তাই সাত সকালে বেরিয়ে গেলো।

রঞ্জু তক্ষুণি বের হয় না। মায়ের সঙ্গে এটা-ওটা নানান কথা বলে। মঞ্জু আজকাল বাইরে বেশি ঘোরাঘুরি করে সেই কথা তোলে বীথি। সে একটু অনুযোগ মতোই করে। বলে, তোর আব্বা আজকাল বাসায় কম থাকে। তুই ওদিকে হোস্টেলে। এদিকে মঞ্জু, টুকুও যদি বাইরে বাইরে থাকে, তাহলে আমার কেমন লাগে চিন্তা কর?

মঞ্জুর কথা ফের ওঠে। বীথি বলে, তোদের কেমন যে মতিগতি কিছু বোঝা যায় না। কথাটা বলতে গিয়ে হাসি পেয়ে যায় বীথির। মুচকি হাসিটুকু হেসে ফের বলে। মঞ্জুর কতো বয়স চিন্তা কর? ওর কাছেও মেয়েরা চিঠি লেখে।

রঞ্জু অবাক হয় না। বরং খুশিই হয়। মঞ্জু যেমন নিজের ভেতরে গোটানো স্বভাবের ছেলে, তার যদি মেয়েদের সঙ্গে জানাশোনা হয়, মেলামেশা বাড়ে, তাহলে সেটা তো ওর জন্যে ভালোই। সে হাসতে হাসতে বলে, মা তুমিও যেমন. না হয় করলোই একটু চিঠি লেখালেখি। সেটা কি তোমার দেখা উচিত?

বাহ্ দেখবো না? ওর কি বয়স হয়েছে?

মায়ের কথায় রঞ্জু ফের একদফা হাসে। বলে, মা তুমি যে কী-ই না! চিঠি লেখালিখি হলেই ভাবতে হবে দু'জনায় সম্পর্ক হয়ে গেছে? আজকাল তো স্কুলের ছেলেমেয়েরাও চিঠি লেখালিখি করে, সে খবর জানো না?

বীথি হাসতে হাসতে তখন মঞ্জুর বিছানায় পাওয়া চিরকুটখানা রঞ্জুর দিকে এগিয়ে দেয়। বলে, দেখ, কী লিখেছে গীতার মেয়ে।

গীতার মেয়ে! রঞ্জু প্রথমটা ঠিকমতো চিনতে পারে না। তখন বীথি চেনাতে চেষ্টা করে। বলে, কেন, তোর গীতা মাসীকে মনে নেই?

রঞ্জুর তখন অস্পষ্ট মনে পড়ে। বলে, সেই যে সমীরণ কাকা। আব্বার বন্ধু ওরই মেয়ে মঞ্জুকে সেদিন হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলো, ঠিক না? ওর নামই তো রাখি, এখন মনে পড়ছে।

হ্যাঁ, সেই মেয়ে, কী লিখেছে পড়ে দেখ। দু'তিন লাইনের চিরকুট, পড়তে এক মিনিটও লাগে না। কিন্তু অর্থ বুঝতে পারে না। অমন কথা কেন লিখেছে রাখি? ওর কী সর্বনাশ হয়ে গেছে? ওকে এখানে, মানে ঢাকায় না রাখবে তো কোথায় রাখবে? আর এমন সব কথা মঞ্জুকে কেন লিখেছে? ক্লাসমেট হোক, কি বন্ধু হোক, কোনো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

মেয়ে কি কোনো ছেলেকে অমন কথা লিখতে পারে ? ক্লাসমেট ছেলের সঙ্গে এ কেমন সম্পর্ক, যে নিজের সর্বনাশের কথা খোলাখুলি লিখে জানাবে কোনো মেয়ে ?

রঞ্জু কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে বসে ভাবে। বাড়ির ভেতরে এসব কী এসে ঢুকছে! অল্প কিছুদিন আগেও তো এমন ছিলো না। ফেরদৌসের সঙ্গে মঞ্জু মেলামেশা করতো বলে, তার মনে অপরাধবোধ ছিলো। শোকে কাতর হয়ে শাহনি এ বাড়িতে কান্নাকাটি জুড়ে দিলে তার সে কী বিব্রত অবস্থা। অথচ এখন অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। আব্বা দিনের বেশির ভাগ সময় কেন বাইরে কাটান তা কেউ জানে না, টুকু কোন ধরনের ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশা করে তাও কেউ বলতে পারে না– মঞ্জুকেই বা সমীরণ কাকার মেয়ে কেন এমন চিরকুট লিখে পাঠায় সে খবরও কেউ জানে না। এদিকে তার নিজেরও একটা সমস্যা ঘনিয়ে আসছে। শাহনিকে যে সে কীভাবে নিরস্ত করবে, ভেবে পায় না– সে হুমকি দিয়ে বসে আছে, পরীক্ষা শেষ হলেই সে আর কোনো কথা শুনবে না, সোজা এসে এ বাড়িতে উঠবে। ঘটনা কোথায় গিয়ে ঠেকেছে, কিন্তু সে বাড়িতে কিছুই জানাচ্ছে না। এমন কি ছিলো এ বাড়ির লোকেরা ? সে ভেবে কূল পায় না। মঞ্জুকে লেখা রাখির চিরকুটখানা তাকে বেশ চিন্তায় ফেলে দেয়। মঞ্জুর ইউনিভার্সিটিতে মার খাওয়ার ঘটনাটা কেন ঘটেছিলো সেটা পরে হলেও সে জেনেছে। তার মনে প্রশ্ন জাগে, অমন ঘটনা কি ফের ঘটেছে ? রাখির ওপর যে হামলাটা শেষ পর্যন্ত করতে পারে নি সেদিন, সেটা কি করে ফেলেছে ? রাখির সর্বনাশ হওয়ার মানে কি অমন কোনো ঘটনা ? অর্থাৎ মেয়েটাকে ধরে নিয়ে গিয়ে চূড়ান্ত রকমের অপমান করে তারপর ছেড়েছে। টুকুর বিছানায় চিৎ হয়ে রঞ্জু শুয়ে থাকে আর তার মগজের ভেতরে রাখির লেখা চিরকুটের লাইনগুলো কেবলই পাক খায়।

ঐভাবে বিছানায় শুয়ে গড়াতে গড়াতেই তার নজরে পড়ে টুকুর পড়ার টেবিলে সায়েন্স ফিকশনের বই মেলে রাখা। সে বইখানা হাতে নিয়ে উল্টে পাল্টে দেখে। বুঝতে অসুবিধা হয় না যে গত রাতেও টুকু এই বই পড়েছে। যদি রাতে সে বই-ই পড়লো, তো ট্যাবলেট খেলো কখন ? অনেক রাতে ট্যাবলেট খেলে ভোর সকালে কি কেউ ক্রিকেট খেলার মাঠে যেতে পারে ? তার সন্দেহ হয়। তাহলে কি টুকু ট্যাবলেট খায় না ? ওর কোনো বন্ধু শয়তানি করে ওর ব্যাগে স্ট্রিপটা ঢুকিয়ে দিয়েছে ? নাকি ঐ ট্যাবলেট ও রোজ খায় না কোনো কোনো দিন খায়। কখনও কখনও বন্ধু-বান্ধবদের পাল্লায় পড়ে খায়। নানান উল্টোপাল্টা চিন্তায় মাথা গরম করে সে বিছানা থেকে ওঠে। ঘড়িতে একটা বাজে ঐ সময়। মাকে বলে, আমি একটু ঘুরে আসছি, দেরি হবে না– ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ফিরবো। রিকশায় চেপে যেতে যেতে দেখে জুম্মার নামাজ পড়ার জন্য মানুষ মসজিদে যাচ্ছে। তার সন্দেহ হয়, নামাজের সময় কি টুকুরা খেলতে পারবে ? তার বিশ্বাস হয় না। ভর দুপুরে মাঠে গিয়ে দেখে, তার অনুমান ঠিক। ধূপখোলার মাঠে খাঁ খাঁ রোদ। দক্ষিণ দিকের গ্যালারির নিচে কালিঝুলিমাখা হাফপ্যান্ট আর গেঞ্জি গায়ে তিনটি ছেলে মারবেল খেলছিলো। ওদের জিজ্ঞেস করলে ওরা এগিয়ে এসে বলে, আউজকা কিরকেট খেলা হয় নাই– এক পাট্টি আইলে কি হইবো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

অন্য পার্টি তো আহে নাই।

যারা এসেছিলো তারা কোথায় ?

ছেলেটি মাথা নাড়ায়। তারপর ঠোঁট উল্টে বলে, কি জানি কই গেছে– মনে হয়, বাইত গেছে ব্যাকটি–

আচ্ছা, ওদের কাউকে চেনো ? রঞ্জু ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করে।

পাশের ছেলেটি বলে, হ চিনি, হাবুল কাবুলরে চিনি, খুব চার্লি, খুব ভালো খেলায়, ব্যাট ধরলেই চাইর মারে।

ওদের মধ্যে একজনের নাম টুকু, রঞ্জু বুঝিয়ে বলতে চেষ্টা করে। বলে, তোমার চাইতে একটু লম্বা, ফর্শা, সুন্দর, লালচে চুল, কটা চোখ।

ছেলেটি বুঝতে পারে না। বলে, কী কইলেন ?

পাশের ছেলেটি বুঝিয়ে বলে, আরে বিলাই চোখ একটা আছে, দ্যাহস নাই ? সদরঘাটের স্কুলে পড়ে।

হ্যাঁ, কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্র, রঞ্জু জানায়।

ছেলেটি আগের মতোই ডাইনে বাঁয়ে মাথা নাড়ায়। বলে, কতো ছাত্র আছে কয়ডারে চিনা রাখা যায় কন ? তয় বিলাই চোখারে আমরা চিনি, ধোলাইর পাড় থাহে–

না, সে না, এ থাকে ওয়ারি। রঞ্জু জানায়। তখন ছেলেটি ফের মাথা নাড়িয়ে বলে, তাইলে, আমরা কইতে পারি না।

রঞ্জুর ঘোরাফেরা সার হয়। যেসব ছেলে খেলতে আসে স্কুল থেকে তাদের কোথায় পাওয়া যেতে পারে, সে কথা কেউ বলতে পারে না। রাস্তায় জুম্মা ফেরতা মুসল্লীদের ভিড় ঠেলে সে বাসায় ফেরে। যখন ফেরে, তখন ঘড়িতে প্রায় আড়াইটা, কিন্তু তখনও দেখে বাসায় কেউ ফেরেনি– না আব্বা, না মঞ্জু, না টুকু। মা বারান্দায় বসে খবরের কাগজ পড়ছিলো। বললো, কোথায় গিয়েছিলি ? টেবিলে খাবার দেবে ?

রঞ্জু মাথা নাড়ায়। বলে, এখন না, ওরা সবাই আসুক।

কিন্তু দেখা গেলো, যাদের আসবার অপেক্ষায় রইলো মা আর ছেলে, তাদের বাসায় ফেরার নাম নেই তার পরেও। দেখতে দেখতে লম্বা, গুমোট গরম দুপুর পার হয়ে বিকেল হয়ে যায়। তারপর সেই বিকেলও যায় এক সময় ফুরিয়ে। তবু তিনজনের একজনকেও বাসায় ফিরতে দেখা যায় না।

আব্বা ফেরেন সন্ধ্যার মুখে, তারপর টুকু, সবার শেষে মঞ্জু। রঞ্জু বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে না। সারাদিন খাটাখাটুনির পর মানুষ তো ক্লান্ত হয়ে পড়বেই। সে ছোট ভাই দু'টির মুখের দিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তাকায়। মঞ্জুর মুখ চোখ খুবই শুকনো আর কালো দেখে। কথা বলতে গিয়ে দেখলো, কথা বলতে চাইছে না। মাকে কী যেন জিজ্ঞেস করতে শুনলো। কিন্তু মঞ্জু পাশ কাটিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে বিছানায় গড়িয়ে পড়লো। আর টুকুকে দেখে মনে হলো যেন জোর করে হাসছে। জোর করে মায়ের সঙ্গে খুনসুটি করতে চাইছে, আর থেকে থেকেই দু'হাতের পিঠে চোখ কচলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

নিচ্ছে। রঞ্জু লক্ষ্য করে দেখে, টুকুর চোখ মুখ কেমন যেন ফোলা ফোলা। মনে হয়, এক্ষুণি যেন ঘুম থেকে উঠে এসেছে, চোখে মুখে এখনও ঘুমের রেশ।

বীথি ছেলের দিকে তাকায় না। তার মনের ভিতরে অন্য অস্বস্তি খচখচ করছে তখন। রায়হানের শরীর কি আবার খারাপ করলো? মানুষটা সারাটা দিন কাটালো বাইরে বাইরে। তারপর সন্ধ্যায় যদি বা ফিরলো, তো মুখে কথা নেই। চোখে মুখে দুশ্চিন্তার ছায়া। আর শরীরও যেন ক্লান্তির ভারে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না।

কী হয়েছে, এই কী হয়েছে তোমার, বলে সে এগিয়ে গিয়ে হাত ধরে, তো জবাবে শুকনো মুখে কষ্টের হাসি হাসে। বলে, আমার আবার কী হবে? কিচ্ছু হয় নি।

ঐ মুহূর্তে তাকে রান্নাঘরে চুলোর ওপরকার দুধ সামলাতে যেতে হয়। দু'মিনিট হয় নি রান্নাঘর থেকে বেরুতে। এসে দেখে, মানুষটা ডিভানের ওপর থেকে উধাও। সে ডাইনে বাঁয়ে তাকায়, ছেলেদের ডেকে বলে, ও রঞ্জু তোর আব্বা কোথায়? রঞ্জু শোয়ার ঘরের দিকে নজর ফেরালে, সেও নজর ফেরায় এবং দেখে পর্দার ফাঁক দিয়ে বিছানায় শোয়া মানুষটার জুতো মোজাসুদ্ধ পা দু'খানা দেখা যাচ্ছে। তার মানে, মানুষটা এমনই কাহিল হয়ে পড়েছে যে জুতো মোজা খোলার মতো শক্তিটুকুও তার নেই। বীথি বড় ছেলেকে ডাকে। বলে, রঞ্জু তোর আব্বাকে দেখ, শরীরটা বোধহয় ফের খারাপ হয়েছে, নইলে ওভাবে শুয়ে আছেন কেন?

রঞ্জুর সব মনোযোগ তখন মঞ্জুর দিকে। বিছানায় শোয়া ভাইয়ের মুখোমুখি চেয়ারে বসেছে সে। তার হাতে রাখির লেখা চিরকুটখানা। বলে, এমন চিরকুট কেন লিখেছে সমীরণ কাকার মেয়ে, কী হয়েছিলো খুলে বল!

মঞ্জু ভাইয়ের মুখোমুখি তাকাতে পারে না। বারবার নজর সরিয়ে নেয়। আর থেকে থেকেই বলে, কেন এসব কথা জিজ্ঞেস করছিস? বিশ্বাস কর, আমি জানি না কেন ওসব কথা লিখেছে–

একটু থেমে কী যেন চিন্তা করে। তারপর ফের বলে, সত্যি ভাইয়া, বিশ্বাস কর, আমি কিছু জানি না– কেমন করে জানবো? আমাকে তো ওর বাবা মা ওদের বাড়িতে ঢুকতেই দিলো না– আর শুনলাম, গতরাতে ওকে নিয়ে নাকি সমীরণ কাকা যশোরে চলে গেছেন।

ভাইয়ের কথা রঞ্জুর অবিশ্বাস্য মনে হয় না। কিন্তু তবু সে চিরকুটখানার দিকে তাকায়। বলে, এই সর্বনাশ হয়ে যাবার কথাটা কেন লিখেছে? এর মানে কী? তুই কিছু করেছিস?

মঞ্জু ভাইয়ের চোখের দিকে অদ্ভুত চোখে তাকায়। বলে, এ তুই কী বলছিস? আমি কী পারি, আর কী করতে পারি না, তা কি তুই জানিস না?

রঞ্জু লক্ষ্য না করে পারে না। মঞ্জুর চোখে মুখে দারুণ একটা উত্তেজনা থম থম করছে– দু'চোখ লাল হয়ে উঠেছে। সে মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলে, আমি কী করতে পারি বল? আবু আর সাবু'র নাম শুনেছিস তো– ইউনিভার্সিটি এলাকার নাম করা মাস্তান– ওরা দু'জনে রাখিকে জোর করে ধরে নিয়ে গেলো। আমি বাধা দিতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

গিয়েছিলাম, কিন্তু কী দিয়ে যেন মারলো আমার পিঠে, ঘাড়ের কাছে, তাতে আমি পড়ে গিয়েছিলাম– জ্ঞান ছিলো না– তারপর যখন জ্ঞান হলো, দেখি কাছাকাছি একটা মানুষ নেই– রাখি খুব চিৎকার করছিলো। সেটা আমার মনে পড়ে, তারপর আর কিছু জানি না– ওকে যে কীভাবে নিয়ে গেছে তার কিছুই আমি দেখি নি– বল, আমি কী করবো? শুধু ওদের বাসায় গিয়ে খবরটা দিয়েছি।

ভাইয়ের চোখে মুখে এমন হতাশা আর লাঞ্ছনার ছাপ আগে কখনও রঞ্জু দেখে নি। সে কিছুক্ষণ চুপচাপ মঞ্জুর হাত ধরে বসে থাকে। কোনো কথা বলতে পারে না। কী বলবে? যে তরুণ নিজের অক্ষমতা আর ব্যর্থতার পীড়নে বিপর্যস্ত আর হতাশায় ভেঙে পড়েছে, কোন কথা বলে তাকে সান্ত্বনা দেয়া যায়?

একই সঙ্গে রাখির জন্যেও তার খারাপ লাগে। তবে বেশি খারাপ লাগে সমীরণ কাকার কথা ভেবে। রাখিকে তিনি কোন্ ভরসায় ঢাকায় রাখবেন? সত্যি সত্যি যদি রাখির সর্বনাশ হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে রাখি কীভাবে এখানে স্বাভাবিক জীবন যাপন করবে? রঞ্জু কিছুই না বলে চুপচাপ মঞ্জুর ঘর থেকে বেরিয়ে আসে।

এদিকে চোখের ওপর হাত উল্টে রেখে চিৎ হয়ে রায়হান চুপচাপ শুয়ে আছে। বুকে ব্যথাটা অবশ্যি হচ্ছে না এখন। তবে অসম্ভব দুর্বল লাগছে নিজেকে। কেন যে আজ পাগলামিতে পেয়েছিলো মেরিকে। সে কিছুই আন্দাজ করতে পারে না। সেদিনকার বুকে ব্যথা হওয়ার ঘটনার পর মনে হতো, মেরি অমন কাজ করতে আর কখনও চাইবে না, কিন্তু কী যে হয়েছিলো আজ। খ্যাপামির কিছু বাকি রাখে নি। তারপর ওর হাসতে হাসতে বলা ঐ কথাটা। ওটা কি ঠাট্টা? নাকি সত্যি সত্যি বললো? যতবার কথাটা মনে পড়ছে ততবার বুকের ভেতরটা তার হিম হয়ে আসছে।

রঞ্জু কাছে এসে পাল্‌স দেখার জন্য হাত ধরলে সে হাত টেনে নেয়। বলে, এখন বিরক্ত করো না তো? আমার কিছু হয় নি। আমি ভালো আছি।

তবু রঞ্জু হাত ধরে নাড়ির স্পন্দন গোনে। চোখের পাতা সরিয়ে চোখের কোণ দেখে, পেটের ওপর বিছানো হাতের পাতায় ঘা মেরে পেটে গ্যাস জমেছে কিনা পরীক্ষা করে। তারপর মাকে বলে, না মা, এমনিতে কিছু বোঝা যাচ্ছে না, প্রেসারটা দেখতে পারলে বোঝা যেত।

মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, একটা প্রেসার দেখার মেশিন কেনা খুব দরকার।

সে বাবার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করে, আব্বা, ঘাড়ের কাছে ব্যথা হয়? মাথাটা ভার ভার লাগছে? বুকে ব্যথা হয়েছিলো? জিভের নিচে ট্যাবলেট দিয়েছিলে? রায়হান চোখ না মেলে নিজেকে স্বাভাবিক দেখাবার জন্যে জোর করে হাসে। বলে, খামোকা তোমরা অস্থির হচ্ছো– বললাম তো, আমার কিছু হয় নি, একটু বেশি খাটা খাটুনি গেছে, তাই টায়ার্ড লাগছে, আমাকে একটু জিরোতে দাও, সব ঠিক হয়ে যাবে।

এদিকে বীথি মোমেনার মাকে টেবিলে খাবার দিতে বলে, ছুটির দিনে রঞ্জু বাসায় আসে, তাই রাতের খাওয়া সবাই একসঙ্গে বসে খায়, বীথি নিয়মটা চালু রেখেছে। আগে রোজ রাতে একসঙ্গে খাওয়া হতো। রঞ্জু হোস্টেলে যাওয়ার পর থেকে সপ্তাহে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

একদিন কি দু'দিন একসঙ্গে খেতে বসা হয়? পরে এই একদিন দু'দিনের নিয়মটাও থাকবে কি না বলা মুশকিল। বীথির মনে একটা অস্পষ্ট আশঙ্কা মাঝে মাঝেই জেগে ওঠে। কেমন মনে হয়, রায়হান কেমন যেন দূরে সরে যাচ্ছে– ছেলেদের একজন তো এমনিতেই হোস্টেলে থাকছে, বাকি দু'জন যে বাড়িতে আছে ওদের নাগালই কি সে পায়? একেকদিন তো রীতিমতো অচেনা লাগে মঞ্জুকে।

খাবার টেবিলে প্লেট সাজাতে সাজাতে সে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে, রাত সাড়ে ন'টা। সে গলা উঁচিয়ে সবাইকে খেতে ডাকে। কারণ, রঞ্জুকে তো আবার হোস্টেলে ফিরতে হবে।

রঞ্জু তখন টুকুর ঘরে। প্রথমে তো দেখে, টুকু ঘুমিয়ে কাদা। মনের ভেতরকার সন্দেহটা ওর ঘুমন্ত চেহারা দেখে গাঢ় হয়। কিছুক্ষণ আগে যে দেখলো, তখনই তো ওর চোখমুখ ফোলা ফোলা ছিলো– এরই মধ্যে ফের ঘুমিয়ে কাদা! সে ছোটভাইকে ধাক্কা মেরে জাগিয়ে তোলে। বলে, ওঠ, রাত ন'টা বাজতে না বাজতেই ঘুম! পড়াশোনা নেই? টুকু উঠে বসার পরেও ঝিমোয়। রঞ্জু ধমক লাগায়। বলে, শিগগির যা, চোখে মুখে পানি দে– টুকুর পেছন পেছন সে বাথরুমের দিকে যায়। টুকু বেসিনের কল ছেড়ে চোখে মুখে পানির ঝাপটা দিতে থাকলে সে পেছন থেকে জিজ্ঞেস করে, কীরে– তুই ঘুমের ট্যাবলেট খেয়েছিস?

টুকুর মগজ তখনও ফাঁকা– নজরও ঝাপসা। ভাইয়ের কথা ওর মগজে ঢোকে বেশ দেরিতে। সে মাথা নাড়ায় আর ঘুম জড়ানো গলায় বলে, না ঘুমের ট্যাবলেট খাই নি।

তাহলে?

টুকু ভেজা চোখ মুখের ওপর দিয়ে গড়ানো পানিতে জামা ভেজাতে ভেজাতে, স্মরণ করতে চেষ্টা করে, ঘুমের ট্যাবলেট খায় নি সেটা স্পষ্ট মনে পড়ছে, কিন্তু তারপর? খেলা তো হলো না, তারপর?

রঞ্জু ভাইকে টেনে একপাশে আনে। তারপর কলের নিচে মাথাটা ঝুঁকিয়ে কল ছেড়ে দেয়। মাথার ওপরে পানির ধারা নামে শব্দ করে। মুখের ওপর দিয়ে দুই কানের পাশ দিয়ে, ঘাড় ভিজিয়ে ঠাণ্ডা স্রোতে বয়ে যায়। আর ওরই মধ্যে সে ভাইয়ের কথা শুনতে পায়। রঞ্জু বলে চলেছে, তুই মায়ের সঙ্গে যেভাবে কথা বলছিলি তখনই মনে হয়েছিলো। তোর ঘুমের ভাব কাটে নি– যদি ট্যাবলেট না খেয়েছিস তো সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘুমিয়েছিলি কেন? আজ তো তোদের ম্যাচ হয় নি।

আমি মাঠে গিয়েছিলাম– বুঝেছিস? আমি মাঠে গিয়েছিলাম তোকে খুঁজতে। কোথায় ছিলি তুই সন্ধ্যা পর্যন্ত? এ্যাঁ, কোথায় ছিলি? বল, ট্যাবলেট খেয়েছিলি?

রঞ্জু বারো মায়ের আড়ালে টুকুর সঙ্গে কথা বলছিলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আড়াল রাখতে পারলো না। বীথি এসে দাঁড়ালো পেছনে। কী রে, তোরা খেতে বসবি না? টুকুকে ঘুমের কথা বলে কী হবে– ওর ট্যাবলেট লাগে না– ও এমনিতেই যখন তখন ঘুমোতে পারে। টুকুর কানে মায়ের কথা এসে পৌঁছায়। যদিও মাথাটা তখনও কলের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

নিচে। সে বুঝতে পারছে। মা খেতে ডাকছে, কিন্তু মগজের ভেতরটা তখনও ঝাপসা মনে হচ্ছে, পরিষ্কার কিছুই মনে পড়ছে না। ভাইয়া ঘুমের ট্যাবলেটের কথা জিজ্ঞেস করেছে সেটা মনে আছে। কিন্তু কেন জিজ্ঞেস করছে, তা তার মাথায় ঢোকে না। কেমন করে ঢুকবে? তার বেশ মনে পড়ছে, আজ তো ট্যাবলেট খাওয়া হয় নি। আজ না হাকিম ভাই মধু খাওয়ালো। বললো, আফ্রিকার ডাইল মধু, একবার খাইলে মানুষ জীবনে ভুলতে পারে না– এ হইল বেহেশতি মধু। একবার খাইলে মনে হইবো তুমি আর দুনিয়ায় নাই, বেহেশতে চইলা গেছো। হ্যাঁ এমন সব কথা বলছিলো হাকিম ভাই– তারপর ওষুধ খাওয়ার ছোট্ট গ্লাসে করে সিকি গ্লাস গোলাপি রঙের মধু খাওয়াল এক এক করে সবাইকে। তারপর টুইনওয়ান চালিয়ে ব্যান্ড-এর বাজনা শোনা হলো– বাজনার সঙ্গে সঙ্গে নাচ জুড়ে দিলো নারিন্দার কাবুল আর হাবুল– ঐ বাজনা শুনতে শুনতে আর নাচ দেখতে দেখতে সে ঘুমিয়ে পড়েছিলো– শুধু সে একা নয়, শাইন, আতিক, শাকিল, মুন্না, সবাই।

হ্যাঁ, এখন স্পষ্ট মনে পড়ছে, টুকুর খেয়াল হয়– সন্ধ্যা পর্যন্ত হাকিম ভাইয়ের ঘরের মেঝেতে ঘুমিয়েছে তারা– তারপর ফিরেছে যার যার বাসায়। টুকুর সব ঘটনা মনে পড়ে এবং হুঁশিয়ার হয়ে যায় সে। মাথা মুখ জামা সব ভিজিয়ে সে পেছনে তাকায় এবং মা আর বড় ভাইকে দেখে। ঘুমের ট্যাবলেট খেয়েছে কিনা সেটা কি সে বলবে? তারপর হাকিম ভাইয়ের দেয়া ঐ মধু খাওয়ার কথা? অসম্ভব! সে কথা যে কোনো ভাবেই বলা যাবে না, সেটা সে বোঝে। ভাইয়ের প্রশ্নের জবাবে কিছুই বলে না সে। সোজা নিজের ঘরে গিয়ে মাথা মুখ মুছে কাপড় জামা বদলে খাবার টেবিলে গিয়ে বসে।

টেবিলটা গোলাকার। সবাই মিলে বসলে বেশ দেখতে লাগে। বীথির খুব পছন্দ গোল টেবিল। ওর পছন্দেই কেনা। তার মতে খাবার টেবিলটা অবশ্যই গোল হওয়া দরকার। অমন পছন্দের কারণও সে ব্যাখ্যা করে। বলে, গোল টেবিল ঘিরে বসলে সবার সঙ্গে সবার একই রকম কাছাকাছি হওয়ার সুযোগ হয়– আর গোলাকার অবস্থানে থাকা মানে যে একটা কেন্দ্রকে ঘিরে থাকা, সেটা কে না জানে? তার মানে মধ্যিখানের সঙ্গে নিজেকে মেলানো– সবার সঙ্গে সবাই মিলতে না পারলে ঘরবাড়িই বা কী, আর সংসারই বা কী।

বীথির খুব প্রিয় এই গোল টেবিলখানা। তার পুরোটা সংসার যেন এইখানে বাঁধা। স্বামী-সন্তান নিয়ে এক সঙ্গে বসতে পারলে তার মতো সুখ অন্য কিছুতে হতে পারে বলে তার বিশ্বাস হয় না।

কিন্তু আজ এমন কেন লাগছে? তার মনের ভেতরে কেউ যেন জানতে চায়। সে লক্ষ্য না করে পারে না সবার মধ্যে কেমন যেন ছাড়া ছাড়া ভাব। নিজের নিজের পাতে খাবার তুলে নিতে দেখা যায় সবাইকে– মুখেও তোলে, কিন্তু ঐ পর্যন্তই। মনে হয় না যে কেউ খাচ্ছে। বরং মনে হচ্ছে, যান্ত্রিক একটা ক্রিয়া করে চলেছে সবাই। কেউ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

কারুর দিকে তাকাচ্ছে না– কি অদ্ভুত কাণ্ড ! রঞ্জু আড়চোখে দু'ভাইয়ের দিকে একবার তাকিয়েছিলো। তাতে মনে হচ্ছিলো, ওরা টেবিল ছেড়ে উঠতে পারলে যেন বাঁচে। বীথিরও নজর এড়ায় না, ওদের ভাব ভঙ্গি। সেও লক্ষ্য করে, খাওয়ার দিকে রায়হানের মন নেই। ভয়ানক কোনো দুশ্চিন্তায় পড়েছে বলে মনে হচ্ছে। মাথাটা নিচু করে রেখেছে একই ভাবে, একবারের জন্যেও তোলে না। খাওয়ার জন্য সাজানো ভাত তরকারি প্রায় সবটাই গামলা আর বাটিতেই থেকে যায়– অথচ একে একে তিন বাপ ব্যাটাই খাওয়ার টেবিল ছেড়ে উঠে পড়ে।

এসব দেখে রঞ্জুরও খাওয়া হয় না। সে লক্ষ্য করে, মাও মুখে খাবার তুলছেন না। স্থির হয়ে বসে আছেন। দু'চোখে কেমন যেন শূন্য– দৃষ্টি, কিছু দেখছেন বলে মনে হয় না– দেয়ালের দিকে চোখ দুটো মেলে ধরা।

রঞ্জু উঠে গিয়ে মায়ের পেছনে দাঁড়ায়। বলে, মা, আপনি কিন্তু কিছুই খান নি– কেন খাচ্ছেন না ? কী হয়েছে ?

ছেলের কথায় বীথির যেন সম্বিত ফেরে। বলে, নাহ্ আমার খেতে একদম ইচ্ছে করছে না। তোর আব্বার কী যেন হয়েছে– অফিসে কোনো গোলমাল হলো কিনা কে জানে– নিজের থেকে তো কিছুই বলবেন না– সারাটা জীবন একই রকম থেকে গেলেন, নিজের কষ্টের কথা, নিজের সমস্যার কথা, নিজের দুশ্চিন্তার কথা, কাউকে কখনও বলবেন না– আমাকেও না– সারাটা জীবন নিজেকে আড়াল করে রাখলেন।

রঞ্জু ঘড়ির দিকে তাকায়। সাড়ে দশটা বেজে গেলো। মনে মনে সে চিন্তা করে। হোস্টেলে ফিরবে। না কি রাতটা বাসায় কাটিয়ে দেবে। একবার ভাবে বাসায় থেকে যায়। ফের মনে হয় নাহ্, কী দরকার, শুধু শুয়ে থাকার জন্য কি সে বাসায় এসেছিল ? ওদিকে সকালের দিকে শাহনি আবার খুঁজতে আসবে। সে বীথিকে বলে, মা, আমি যাই এবার– অনেক রাত হলো।

মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সে টুকুর ঘরে ঢোকে। দেখে, টুকু তখনও শোয় নি– পড়ার টেবিলের ওপর মাথা ঝুঁকিয়ে বসে আছে। সে পকেট থেকে ট্যাবলেটের স্ট্রিপটা তার চোখের সামনে মেলে ধরে। বলে, এসব জিনিস যদি ফের খাস, তাহলে হাসপাতালে ভর্তি করে দেবো– ড্রাগ এ্যাডিক্টদের হাসপাতাল কেমন জানিস তো ? হাতে-পায়ে শেকল দিয়ে বেঁধে রাখে। আর ক্রিকেট খেলার ঐসব সঙ্গীদের সঙ্গে মেশা বাদ দে।

কথা বলা শেষ করে সে দু'মুহূর্ত দাঁড়ায়। তারপর টুকুর ঘাড়ে হাত রেখে ঝাঁকুনি দেয় একটা। বলে, কী বললাম, বুঝেছিস ?

টুকু মুখে কিছু বলে না– শুধু মাথাটা আরও নিচের দিকে নুইয়ে দেয়।

রঞ্জু চলে যাওয়ার পরও বীথি চৌকাঠে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কেমন যেন আলগা-আলগা লাগে নিজেকে। মনে হয়, এই বাসা, এই সংসার, এই সব আসবাব আর জিনিসপত্র– এসবের কিছুই যেন তার নয়। ছেলেদের অচেনা লাগে। স্বামীকে মনে হয় দূরের কোনো অচেনা মানুষ– সে নিজে কেন প্রায় মধ্যরাতে এভাবে চৌকাঠে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তারও কারণ সে খুঁজে পায় না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

দেখতে দেখতে ওদিকে মোমেনার মা রান্নাঘরের কাজের পাট শেষ করে ফেলে। বাসনকোশন ধোয়াপাখলা হয়ে যায়। ঝাড়পোঁছ শেষ হয়– পট পট আওয়াজ করে রান্না ঘরের সুইচগুলো পর্যন্ত অফ করে দেয়। তারপর নিজের খাবার ভর্তি টিফিন ক্যারিয়ার হাতে ঝুলিয়ে সামনে এসে দাঁড়ায় এক লহমার জন্য। বলে, আপা অহন তাইলে যাই।

মোমেনার মা চলে গেলে বীথি গেট বন্ধ করে একটা একটা করে বাতি নেভায়। প্যাসেজের, বসার ঘরের, খাওয়ার ঘরের, বারান্দার, তারপর ঢোকে নিজের ঘরে। রায়হান মশারি ফেলে শুয়ে পড়েছে। মশারির ভেতরে ঢুকে সে মিনিটখানেক পাশ ফিরে শুয়ে থাকা আবছা লোকটার দিকে তাকিয়ে বসে থাকে। বুঝতে পারে না, মানুষটা ঘুমিয়ে, না জেগে। ঘুমোবার সময় রায়হানের এক একদিন খুব করে নাক ডাকে– আজ অমন নাক ডাকছে না। মানুষটা কি জেগে? তার সন্দেহ হয়। কিন্তু গায়ে হাত দেয় না সে। শুধু নিচু গলায় ডাকে, এই তুমি কি ঘুমিয়ে পড়েছো?

সাড়াশব্দ না পেয়ে সেও শুয়ে পড়ে। দু'জনের মধ্যে যথেষ্ট ফাঁক রেখে শোয়– মানুষটাকে জাগাতে চায় না সে। ভয়ানক ক্লান্ত দেখেছে আজ। মনে মনে বলে, ঘুমাও, একলাই যতো ঝামেলা পোয়াচ্ছো, আমাকে কিছু করতে দিলে না– যদি একটা চাকরি থাকতো আমার, তাহলে সুবিধা হতো না? বলো?

রায়হান ওদিকে নিঃসাড় হয়ে থাকে– নিঃশ্বাসটা পর্যন্ত নেয় সন্তর্পণে। মেরির উচ্ছল হাসি তার কানে এখনও ঝাপটা মারছে। দেখে মনে হচ্ছিলো, ওর কাছে ব্যাপারটা মোটেও দুশ্চিন্তার নয়– বরং যেন আনন্দের। বলতে বলতে আড়চোখে তাকাচ্ছিলো আর হাসছিলো। বলছিলো, আমি কিছু জানি না– এবার যা করার তোমাকেই করতে হবে, হ্যাঁ।

রায়হানের বুকের ভেতরে ধমাস ধমাস করে কেউ যেন ড্রাম পিটছে। সে বারবার জিজ্ঞেস করছিলো, তুমি ঠিক জানো?

দূর, তুমি কী যে বলো না, চার চারটা ছেলেমেয়ের মা হয়েছি আমি। আমি বুঝবো না প্রেগন্যান্ট হলে কী রকম লাগে?

তাহলে এখন কী হবে? রায়হান ভয়ে ভয়ে অস্ফুট গলায় জানতে চেয়েছিলো। কী করবে এখন?

বললাম তো, মেরি নির্বিকার ভঙ্গিতে জবাব দিয়েছে, কী করবো জানি না, ভেবেছিলাম, সাদেককে কাজে লাগিয়ে সামাল দেবার চেষ্টা করবো। কিন্তু লাভ হলো না– সাদেক একটু হেঁটে চলে বেড়ালে কী হবে– ও কিছুই করতে পারে না– ওর সঙ্গে শুতে চাইলে চেঁচামেচি করে।

তাহলে?

সে তুমি বোঝো। মেরি চোখে চোখে তাকিয়ে হেসেছে। বলেছে, আরে পুরুষ মানুষ, দায়িত্বটা তো তোমার– কী করবে, সেটা তুমি ভাববে– মানুষ তো দুটো বউ রাখে, রাখে না? তুমিও নিশ্চয়ই রাখতে পারবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ঠাট্টা করো না, রায়হান রেগে উঠেছিলো।

বাহ্, ঠাট্টা কোথায় করলাম, ফের খিলখিল করে হেসে উঠেছে মেরি। বলেছে, এখন আর মন-মেজাজ খারাপ করে কী করবে, এটাই ভাগ্য বলে মেনে নিতে হবে আমাদের– আমি সাদেককে ডিভোর্স করবো।

কী-ঈ! রায়হান রীতিমতো আঁৎকে ওঠে।

হ্যাঁ, মেরি মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। বলেছে, আমি তোমার সঙ্গে নতুন করে জীবন আরম্ভ করবো– আমি এ্যাবরশন কিছুতেই করবো না।

কিন্তু তোমার ছেলেমেয়েরা ?

ওরা বড় হয়েছে– নিজেদের জীবন ওরা নিজেরাই দেখাশোনা করতে পারবে। যদি আমাদের সঙ্গে থাকতে চায়, তাহলে থাকবে।

মেরির মুখে অমন ধরনের কথা শুনে, রায়হানের মুখে কথা সরে নি। তার মনে হচ্ছিলো, মেয়েলোকটা বদ্ধ পাগল, নয়তো চূড়ান্ত শয়তান। দুপুর দুটো তখন। সাদেক আর মিহিন গেছে কল্যাণপুর, বোনের বাড়ি– বড় মেয়ে ইউনিভার্সিটি– রায়হানের বুকের ওপর গোটা বাড়ির নির্জনতা বোঝার মতো চেপে বসছিলো। মনে হচ্ছিলো নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে। শাজাহানপুরের ঐ ভয়ানক নির্জন বাড়ি থেকে সে টলতে টলতে বের হয়ে এসেছে। তারপর কোথায় কোথায় গেছে, কোন কোন রাস্তা ধরে হেঁটেছে, সে কিছুই বলতে পারবে না। মগবাজারের রাস্তায় আব্দুল্লাহ তাকে দেখতে পেয়ে ধরে এবং রিকশায় তুলে নেয়। ওদিকে কোথায় যাচ্ছিলো জানতে চাইলে সে স্পষ্ট করে বলতে পারে না। একবার বলে, ফুলবাড়িয়া যাচ্ছি, একবার বলে বাসায় যাচ্ছি, ফের বলে আমানুল্লাহ খান তাঁর বাসায় যেতে বলেছেন। তার মুখে অমন কথাবার্তা শুনে, আর ভাবভঙ্গি দেখে আব্দুল্লাহর সন্দেহ হয়। সে রিকশায় চাপিয়ে নিয়ে যায় প্রেসক্লাবে। সেখানে বসিয়ে রাখে সারাটা বিকাল– তারপর তাকে বাসায় যেতে দেয়।

সকালে ফুলবাড়িয়া যাওয়া থেকে সন্ধ্যা বেলা বাড়ি ফেরা পর্যন্ত সব ঘটনা তার মগজে ঘুরপাক খায়– ওদিকে এক সময় বীথি ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু রায়হানের দু'চোখে ঘুম আসে না।

কেমন করে ঘুম আসবে ? তখনও থেকে থেকে মেরির হাসির আওয়াজ ঝড়ো হাওয়ার ঝাপটার মতো তার কানে এসে লাগছে। হাসতে হাসতে মেরির গড়িয়ে পড়ার দৃশ্য। বিছানায় দেহমিলনের পর যে ভঙ্গিতে বলেছিলো, সেই একটু কথা, সে একই ভঙ্গিতে বসার ঘরে সোফায় বসে বলেছে– যেন ভারী মজার কোনো কথা। একটা ভয়ানক রকমের ঘটনা যে ঘটেছে এবং ঘটতে যাচ্ছে– সেটা তার কাছে কোনো সমস্যাই নয়।

আচ্ছা, তুমি ভয় পাচ্ছো কেন গো। মেরি রায়হানের ঘাড়ে দু'হাত রেখে ঝুঁকে পড়ে সোহাগী বউয়ের মতো বলেছে, এতে ভয়ের কী আছে ? তুমি এমন কিছু বুড়ো হয়ে যাও নি যে, দুই বউ সামলাতে পারবে না। আমার বাবা পঞ্চান্ন বছর বয়সে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

আমার দূর সম্পর্কের এক বিধবা খালাকে বিয়ে করেন। আমরা দুই মাকে বেশ মিলেমিশে সংসার করতে দেখেছি। তোমাকে চিন্তা করতে হবে না, দেখো তুমি, আমি মানিয়ে নিতে পারবো– তোমার বউ তো বেশ নরম স্বভাবের মানুষ। আর ছেলে তিনটিও তো বেশ শান্তশিষ্ট। ওরাও, তুমি দেখো, শেষ পর্যন্ত মেনে না নিয়ে পারবে না– না মেনে কী করবে বলো? এই বয়সে তোমার বউ কি ডিভোর্স করে চলে যেতে পারবে? আর ছেলেরাই বা তোমাকে ছেড়ে যাবে কোথায়? লেখাপড়া শেষ করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারলে না হয় কথা ছিলো। কিন্তু সে অবস্থায় তো ওরা নেই– তাই তোমার দুশ্চিন্তার কোনো কারণও নেই, তুমি একটু শক্ত হলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

বলতে বলতে হেসেছে কখনও, কখনও গম্ভীর হয়েছে। তবু ওর কথা আর ফুরোয় না। শেষে বলেছে, আমার জন্যে চিন্তা করো না, আমি তো তোমার বার্ডেন হচ্ছি না– আমার নিজের যা আছে, তার সুদেই আমার দিব্যি চলে যাবে– ফুলবাড়িয়ার জমিতে একটা বাড়ি করে সেখানে থাকবো– তুমি চিন্তা করো না প্লীজ, আমি সব সামলে নেবো– শুধু ডিভোর্সের ঝামেলাটা মিটে যাক।

রায়হানের মুখ দিয়ে একটা কথাও বের হয় নি। গোটা ব্যাপারটা তার কাছে তখনও অবিশ্বাস্য আর অবাস্তব লাগছে। মেরির ঘামে ভেজা চকচকে হাস্যোজ্জ্বল মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে সে ভালো করে। এ কেমন মেয়ে মানুষ! তার মনে প্রশ্ন জাগে, একী স্বাভাবিক, নাকি পাগল, নাকি অন্যরকম কিছু। যার চারটি বয়স্ক ছেলেমেয়ে, ২২/২৩ বছর ধরে সংসার করছে যে, তার মুখে এসব কী শুনছে সে? আবার মনে হয়, গোটা ব্যাপারটাই বোধহয় বানানো, মজা করার জন্য এসব কথা বলে চলেছে মেরি। বোধহয় দেখতে চায়, রায়হান ঘাবড়ে গিয়ে কী করে!

কিন্তু নিশ্চিন্ত হতে পারে না রায়হান। মেরি হাসতে হাসতে গলা জড়িয়ে ধরছে গলার স্বরে আবেগ গাঢ় হয়ে উঠছে। একেকবার চুমু খাচ্ছে, খুশিতে চোখের কোণে পানি পর্যন্ত জমতে দেখা যাচ্ছে– এসব কি বানানো হতে পারে?

রায়হান তখনও পরিষ্কার চিন্তা করতে পারছিলো না। তবু এক সময় রুগ্ন পঙ্গু সাদেকের কথা স্মরণ হলে সে না বলে পারলো না। বললো, না মেরি, এ হবে না। তুমি পারবে না– সাদেক সাহেবের অমন অসুখ, পঙ্গু মানুষ। ওকে ছেড়ে যাওয়া কি তোমার ঠিক হবে? যেতে পারবে তুমি?

কেন পারবো না। মেরির মুখে কুটিল প্রতিহিংসার হাসি দেখা গেছে ঐ মুহূর্তে। বলেছে, ও তো ওর বস-এর কামরায় রাত বারোটার সময় আমাকে রেখে আসতে পেরেছিলো, কত বয়স তখন আমার? আঠার, নয়তো উনিশ– মফস্বল শহরের মেয়ে কীইবা বুঝতাম? আমাকে বুঝিয়েছিলো সায়েব সুবোদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে না পারলে নাকি ওপরে ওঠা যায় না– আর ঘনিষ্ঠ হতে হলে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা তো অবশ্যই করতে হবে– খুলনা সার্কিট হাউসে প্রথম আমাকে নিয়ে গিয়েছিলো সাদেক।

কথা বলার সময় মেরির নজর ছিলো জানালা দিয়ে বাইরে মেলে দেওয়া, স্বগতোক্তির মতোই সে বলে যাচ্ছিলো, ও যদি পেরে থাকে, তাহলে আমি পারবো না কেন? বলো?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

একটু থেমে লম্বা নিশ্বাস নিয়ে ফের জানিয়েছে মেরি, শুধু কি ঐ একবার ? বহুবার, বহু বসের কাছে আমাকে যেতে হয়েছে– ছোট ছেলেটার বাপ সাদেক কিনা এ ব্যাপারে এখনও আমার সন্দেহ হয়। আর একাত্তরের কথা ? ঐ সময়ের কথাও কি ভুলে গেছি আমি ? একবার শুধু কিছু বলে দেখুক– একটা একটা করে সব ঘটনার কথা আমি বলে দেবো।

রায়হানের তখন আবার হতভম্ব অবস্থা– কেউ যেন ডাল ঘোঁটার মতো ঘুটনি দিয়ে তার মগজের ভেতরটা ঘুঁটে দিয়েছে। তার বিভ্রান্ত চোখ মুখ দেখে মেরি আর এক প্রস্থ হাসে। বলে, এই, কী হয়েছে তোমার, বোকা বনে গেলে কেন– কিছু বলো? তুমি সহজভাবে নিচ্ছো না কেন ব্যাপারটা, এ্যাঁ ? তোমার কি বাইরে মুখ দেখাতে লজ্জা হবে ? এ কিন্তু অদ্ভুত কাণ্ড তোমাদের– ফূর্তি করার সময় এক পা এগিয়ে থাকো, কিন্তু দায়িত্ব নেবার বেলাতে নেই। রায়হানের ঘাড়ে হাত রেখে মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিলো মেরি। জিজ্ঞেস করেছিলো, কী চিন্তা করছো অতো ? বললাম তো, অতো চিন্তার কিছু নেই। আমি সমস্ত কিছু সামলে নেবো।

বলা যায়, বাধাই দিয়েছিলো মেরি। বলেছিলো, আর একটু থাকো, সাদেকের হাসপাতাল থেকে ফিরতে এখনও দেরি আছে। কিন্তু রায়হান থাকে নি।

রাত কাটলো তার কখনও তন্দ্রায়, কখনও জেগে। ভোর হতে না হতেই সে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে। আকাশ পরিষ্কার হতে শুরু করেছে, পাখিদের ডাকাডাকি আরম্ভ হয়ে গেছে ওদিকে। পৃথিবী নিজের নিয়মে আর একটা নতুন দিনের সূচনা করলো। সে কি আজও যাবে মেরির কাছে ? আজও তো দুপুর বেলা সাদেক হাসপাতালে যাবে ফিজিওথেরাপি নিতে। আজও দুপুর বেলা মেরির বাসা ফাঁকা– মেরি তাকে বলেও রেখেছে, এ মাসটা পুরো আমাদের সুযোগ একসঙ্গে হবার– এগারোটা থেকে তিনটা পর্যন্ত চার ঘন্টা ওকে ফিজিওথেরাপিস্ট-এর চেম্বারে থাকতে হবে। সুতরাং মেরির ওখানে যেতে বাধা নেই। কিন্তু সে নিজে কি যাবে ? রায়হান নিজের মনের দিকে তাকায়, কিন্তু কোনো জবাব পায় না। বরং কেউ যেন মনের ভেতরে বলে, যদি তুমি না যাও– যদি মেরি টের পায় যে তুমি তাকে অবহেলা করেছো– ও কি সহ্য করবে ? তোমার সমস্ত কীর্তিকাণ্ড ফাঁস করে দেবে। তোমার বাসার রাস্তা তো ওর চেনা। অফিসে যেতেও বাধা নেই– এসে বলবে, এই লোকটার জন্য আমি স্বামী সন্তান সংসার সমস্ত কিছু ত্যাগ করেছি। এর সন্তান গর্ভে ধারণ করেছি, একে আমি কেন ছাড়বো ? একে আমি কিছুতেই ছাড়বো না।

হ্যাঁ, অমনই করবে মেরি, রায়হানের মনের ভেতরে কেউ যেন বলে, তার পক্ষে অমন কাজ করা কঠিন কিছু নয় : যে মেয়ে মানুষ রুগ্ন স্বামীকে হাসপাতালে পাঠিয়ে প্রেমিকের সঙ্গে দুপুর কাটাবার ব্যবস্থা করতে পারে, ছেলেমেয়েদের সরিয়ে দিতে পারে কায়দা কৌশল করে, সবাইকে মিথ্যে কথা বলতে পারে, শুধু একজন পুরুষ মানুষের সঙ্গে দেহমিলনের জন্য : সে না পারে কী ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

আর তুমি ? তুমি নিজে ? রায়হানের মনের ভিতরে আর একদিক থেকে আর একজন বলে ওঠে, তুমিই বা না পারো কী ? তুমিও তো মিথ্যে কথা বলো। যে স্ত্রী তোমাকে বিশ্বাস করে, তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করো, সন্তানদের সঙ্গে করো মিথ্যাচার– তুমিই কি কম ?

রায়হান সেদিন ভিতরে ভিতরে অস্থির হয়ে পড়ে। বীথি রান্নাঘরে মোমেনার মাকে নিয়ে ব্যস্ত। তবু একবার এসে জিজ্ঞেস করে, তোমার কি শরীর খারাপ লাগছে ? টুকু দাঁত ব্রাশ করতে করতে অদ্ভুত চোখ মেলে বাপের দিকে তাকিয়ে দেখে। মঞ্জুর চোখেও অমন দৃষ্টি। সে এসে জিজ্ঞেস করে, আব্বা, তোমার কি রাতে ঘুম হয় নি ?

না, কিছু হয় নি আমার, রায়হান মুখ নিচু রেখেই জবাব দিয়েছে। বলেছে, তোমরা নিজের কাজ করো, আমি ঠিক আছি।

কথাটা বলে বটে, কিন্তু বিশ্রী লাগে নিজের কাছেই– তার আচরণ কি অস্বাভাবিক হয়ে উঠেছে যে স্ত্রী সন্তানরাও তাকে অন্য চোখে দেখতে শুরু করেছে ?

সেদিন সে জরুরী কাজ আছে বলে সকাল সকাল বেরিয়ে পড়ে। কোথায় যাবে, কার কাছে যাবে, জানা নেই। সে উদ্দেশ্যহীন কিছুক্ষণ হাঁটে। অফিসে গিয়ে লাভ নেই, কারণ বারোটার আগে কেউ অফিসে আসবে না। তাহলে কি প্রেসক্লাবে যাবে ? তার মন সায় দেয় না। কারণ এতো সকালে চেনা মানুষদের কাউকে পাবে বলে তার মনে হয় না। তাহলে ? ইত্তেফাকের মোড়ে দাঁড়িয়ে সে ডাইনে বাঁয়ে তাকায়। কোনো বন্ধুর কাছে কি সে যাবে ? যেমন মাহফুজ ? কিংবা হায়দার ? অথবা সায়ীদ, কতোকাল ওদের সঙ্গে দেখা হয় না। মাহফুজের সঙ্গে তবু দেখা হলো দলিল দেখানোর ব্যাপার নিয়ে, কিন্তু হায়দার আর সায়ীদের সঙ্গে তো বোধহয় দু'তিন বছর হতে চললো দেখা হয় না। সে ঘড়ির দিকে তাকায়। নাহ্ বেলা দশটা কোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা করার সময় হতে পারে না। বিশেষত সেই বন্ধুরা যদি উকিল কি ব্যবসায়ী হয়।

তাহলে সে কোথায় যায় এখন ? কোথায় যাবার জন্য সে বাসা থেকে বেরিয়েছে ?

প্রশ্নটার মুখোমুখি হয়ে সে আমূল চমকে ওঠে। তাহলে কি তার অবচেতন মন শাজাহানপুরের দিকেই তাকে টেনে নিয়ে চলেছে ? মেরিই কি তা হলে তাকে বাসা থেকে টেনে বের করে আনলো। ওর হাতেই কি তার জীবনের সমস্ত কিছুর নিয়ন্ত্রণ এখন ? ও-ই ঠাঁই নিয়েছে তার জীবনের কেন্দ্রে। যা ইচ্ছে করবে, ও যা বলবে, ওর যাতে ভালো লাগবে এখন থেকে তা-ই রায়হানকে করতে হবে ?

ফুটপাথে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সময় দেখে রায়হান আর নিজেকে জিজ্ঞেস করে, কোথায় যাবি তুই ?

রাস্তায় ওদিকে ভিড় বাড়ছে। অফিস যাত্রীরাই শুধু নয়, স্কুল, কলেজের ছেলেমেয়েরা আছে, ঢাকার বাইরে থেকে আসা মানুষেরা আছে, বাজারের ঝাঁকা মাথায় মিনতির সঙ্গে মাঝবয়সী গেরস্থ ভদ্রলোক আছে, রিকশা-বেবিট্যাক্সি আছে, ট্রাক-বাসের বহর আছে, সবাই নিজের নিজের লক্ষ্যে যাওয়ার জন্য রওনা হয়েছে। কি অদ্ভুত! তার হাসি পায়, সেও রওনা হয়েছে, কিন্তু তার পৌঁছাবার কোনো লক্ষ্য নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ঐ সময় একটা বাস ফুটপাথ ঘেঁসে দাঁড়ায়। কন্ডাক্টর মীরপুর মীরপুর বলে হেঁকে উঠলে তার কী যে হয়– মনে হয়, সে বরং ফুলবাড়িয়া চলে যেতে পারে– আর কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে বাসে উঠে পড়ে। বাসটা যে ফুলবাড়িয়া যাবে না, সেই খেয়াল তার ছিলো। কিন্তু তবু মনে হয়েছিলো সরাসরি ফুলবাড়িয়া তাকে নিয়ে না যাক কাছাকাছি কোনো জায়গা পর্যন্ত সে যেতে পারবে, এটাই বা কম কি।

বাস চলতে শুরু করলে সে স্বস্তিবোধ করে। যাক এবার সে একটা যাবার জায়গা খুঁজে পেয়েছে। উদ্দেশ্যহীন রাস্তার ফুটপাথে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না তাকে। আসনে বসে বাইরে তাকিয়ে মতিঝিল, তোপখানা, প্রেসক্লাব এই সব দেখে। তার প্রতিদিনের চলাচলের জায়গা, কিন্তু কেমন অচেনা লাগে। মনে হয় না ওই সব জায়গা দিয়ে সে কখনো হেঁটেছে। সব লোক ঐসব এলাকায় রোজ চলাফেরা করে, তাদের বোধহয় সে কিছুটা চেনে, প্রেসক্লাবের সামনে একজনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সে চিনতে পারে, হ্যাঁ, এই তো তার অল্প চেনা লোক রায়হান আলী, 'গণ একতা'র সহযোগী সম্পাদক, নাকি সে নয়! সে ফের জানালা দিয়ে গলা বাড়িয়ে ভালো করে দেখে এবং তার সন্দেহ হয়, লোকটা তাহলে বোধহয় আব্দুল্লাহ, নাকি সায়ীদ ? তার ফের মনে হয়, আমানউল্লাহ হতে পারে না কি ? হ্যাঁ, খুব হতে পারে। তার মন সায় দেয়।

বাসের ভিতরে বসে বাইরে তাকিয়ে নিজের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে তার বেশ লাগে। কিন্তু সেও বা কতোক্ষণ ? একটু পরই সে নিজের মনের দিকে তাকায় এবং তার মনে প্রশ্ন জাগে, হঠাৎ ফুলবাড়িয়া যাওয়ার চিন্তাটা তার মাথায় গজিয়ে উঠলো কেন ? মেরিকে এড়ানোর জন্যই কি ফুলবাড়িয়া যাবার চিন্তাটা তার মগজে হঠাৎ গজিয়ে উঠলো ? মেরিকে এড়ানোর জন্যই কি সে ফুলবাড়িয়া যাবার কথা ভেবেছে ? ফুলবাড়িয়া যাবার কথা কেন ভাবলো ? বাসাতেও তো সে ফিরে যেতে পারতো ? বাসায় ফিরে গেলো না কেন ? বাসায় ফিরতে তার কি ভয় লাগছে ? বীথি আর ছেলেদের মুখোমুখি হবার মতো এখন আর তার সাহস নেই ?

একুশ

ফুলবাড়িয়া বাসস্ট্যান্ড এ নেমে সে তার কেনা জায়গার দিকে ধীরে ধীরে হাঁটতে থাকে। গায়ের রাস্তায় লোকজন কম। যে দু'একজনের সঙ্গে দেখা হচ্ছে, তারা কৌতূহলী নজর তুলে দেখছে তার মুখের দিকে। রাস্তার পাশে আমগাছের তলায় সে দাঁড়ায়। সামনেই তার কেনা জমি– সীমানা ঠিক রাখার জন্য কংক্রীটের খুঁটি পোঁতা হয়েছে। ক'দিন ঐ খুঁটি পোতা নিয়ে মেরির দুই ছেলে কী ঝামেলাটাই না পাকিয়ে ছিলো। রায়হানের মনে পড়ে, পরে মেরি এসে ঝামেলাটা মেটায়। তার এখন মনে হয়, ওটা আসলে কোনো ঝামেলাই ছিলো না। তাকে ফুলবাড়িয়া পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাবার জন্য মেরিই ঐ বাহানাটা তৈরি করেছিলো। সে কেনা জায়গাটার দিকে তাকিয়ে থাকে। বাঁয়ে বাড়ি হবার কথা মেরির আর ডাইনে তার। কিন্তু মেরি যে কান্ড ঘটাতে যাচ্ছে, তারপর কি তার বাড়ি এখানে করা সম্ভব হবে ? সে নিজেকে প্রশ্ন করে কোনো রকম জবাব পায় না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

সকাল দশটার দিকে শহরের কোনো ভদ্র চেহারার মানুষ অমন পথের ধারে গাছতলায় যদি দাঁড়িয়ে থাকে, তাহলে গ্রামের মানুষ তার দিকে খেয়াল না করে পারে? তারা দূর থেকে শহরে মানুষটাকে দেখছিলো। এদিকে রায়হানও বা কতোক্ষণ একই ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে? সে একসময় আম গাছটার গুঁড়ি ঘেঁসে বসে পড়ে। আর তাতেই বোধহয় খবরটা চাউর হয়ে যায়। সম্ভবত সেই জন্যই খানিকপর কুতুবউদ্দিনকে আসতে দেখা যায়। আর তারপরে আসে বাহরুল্লাহ মুনশি।

বাহারুল্লাহ এসে পৌছতে না পৌছতেই ব্যস্ত হয়ে পড়ে। বলে স্যার, কী খবর, হঠাৎ আইয়া পড়লেন যে! বাড়ির কাম ধরবেন মনে হয়?

রায়হান আমতা আমতা করে। কী বলবে ভেবে পায় না। তাই মুনশির কথাতেই সায় দিয়ে যায়। বলে, হ্যাঁ, মুনশি, কিছু একটা করা দরকার। ভাবছি। এখানে বাউন্ডারি ওয়াল দেবো।

হ স্যার, কিছু একটা করেন, জমিন ফাঁকা থুইলেই বিপদ- দিন কাল খুব খারাপ- সাভার বাজারের লগে কিছু ফাঁকা জমিন ছিলো- ব্যাক দখল কইরা লইছে সালু শিকদারের পোলা মালু শিকদার।

কুতুবউদ্দিনও বলে, জমি ফাঁকা থোওনটা ঠিক না- ঘরটর কইরা থোওন ভালো-

একটু থেমে ফের বলে বুড়ো, আমি কই কি, পাকা দেওয়াল উঠাইতে তো খরচ কম না- পিলার তো গাইরা থুইছেনই। সীমানা লইয়া তো সমস্যা না, আমার মনে লয় উপ্রে টিন আর বাঁশের বেড়া দিয়া দুইখান ঘর উঠাইয়া লন, তারপর ভাড়া দেন।

রায়হান হাসে। বলে, এখানে কে আসবে ঘর ভাড়া নিতে?

স্যার কী কন। ভাড়া লওয়ার লোকের কি অভাব নাকি। কতো লোকে বড় রাস্তার বগলে ঘর তালাশ কইরা মরে- আপনে কন ভাড়া কে নিবো- আপনেরা তো বড় মানুষ, আপনেগো কাছে কেউ যায় না। কিন্তু আমাগো কাছে তো ঠিকই আসে।

কথা বলতে বলতে রায়হানকে বাসস্ট্যান্ডের কাছে নিয়ে আসে। কাছেই ইটখোলা- একজন ইট বিক্রির দালাল সামনে বসে চা খচ্ছিলো। দু'খানা ঘরের জন্য কতো ইট লাগবে তার হিসেবটা তারা খুব সহজেই করে ফেলে- সিমেন্ট কতো লাগবে, তারও হিসেব হয়ে যায়- তারপরে ঐ চা খেতে খেতেই বালি টিন কাঠ মিস্ত্রি, রাজ মিস্ত্রি, যোগালি, সমস্ত কিছুর হিসেব হয়ে যায়। মোটামুটি খরচের হিসেবটা করতেও ওদের দেরি হয় না।

হিসেবটা শেষ করে মুনশি হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করে, কি স্যার, ট্যাকায় কুলাইবো না?

রায়হান বোকার মতো হাসে মুনশির উৎসাহ দেখে, হ্যাঁ না কিছু বলে না।

ইটখোলা থেকে রায়হান ফের গাছতলার দিকে হাঁটে। কুতুবউদ্দিন পাশাপাশি হাঁটতে হাটতে বলে, চলেন সার আমার বাড়িত আইজ বেড়ান।

রায়হান হাসে। বলে, আজ আমাকে তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে, অনেক কাজ বাকি আছে অফিসে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

গাছতলায় ছিলো যারা, কিংবা যারা রায়হানের সঙ্গে কথা বলছিলো, তারা একে একে সবাই চলে যায়। খালি মুনশি সঙ্গে থেকে গাছতলায় বসে। একসময় সে বলে, স্যার একখান কথা কমু ?

রায়হান মুখ না ফিরিয়েই হাসে। বলে, বলুন কী বলবেন ?

মনে হয়, মনডা আপনের ভালা নাই, কী য্যান চিন্তা করতাছেন।

নাহ্, মন ঠিক আছে আমার, অনেক বেলা হয়েছে, এবার বাড়ি যান– আমি একটু পরই চলে যাবো।

এবার রায়হানের মুখের দিকে তাকায় মুনশি। তারপর বলে, না স্যার, আমার মনে হয়, আসলে আপনে খুবেই দুশ্চিন্তা করতাছেন– কেউর কি আওনের কথা ? কেউ কি আইবো কইছে ?

রায়হান মাথা নাড়ায়। বলে, নাহ্ কে আসবে এখানে ? আমার এখানে বসে থাকতে ভালো লাগছে, তাই বসলাম, একটু পরই চলে যাবো– আপনি বাড়ি যান– দুপুরের তো আর বাকি নেই।

মুনশি তবু নড়ে না, একই ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকে। বলে, আমি বইছি সাদেক সাবের বিবির লাইগা, কইছিলো কাইল আইবো, কিন্তু আহে নাই– মনে হয়, আইজ আইতে পারে।

একটু থেমে ফের বলে মুনশি, আচ্ছা স্যার আপনের লগে কি বিবি সাবের কথা হইছে ?

মুনশির কথা শুনে রায়হান বেশ অবাক হয়। গতকাল প্রায় সারাটা দুপুর একসঙ্গে কেটেছে দু'জনার, কিন্তু কই একবারও তো মেরি ফুলবাড়িয়া আসার কথা তোলে নি!

সে মাথা নাড়াতে নাড়াতে বলে, না, আমার সঙ্গে কোনো কথা হয় নি।

কিন্তু, তিন চারদিন আগে আমারে ডাইকা পাঠাইছিলো, কইলো একখান টিনের চালা ঘর খাড়া করতে– উপ্রে টিন, আর মুলী বাঁশের বেড়া। কইলো, মাল সামান থাকবো। আর উনি আইয়া কামের দেখাশুনা করবো– হ্যার মুখেই শুনলাম আপনেও নাকি খুব জলদি বাড়ির কাজে হাত দিবেন– কুতুবউদ্দিন আছিলো আমার লগে। হ্যায় কইলো, টিনের চৌয়ারি ঘর উঠাইবার কথা– তো বিবি সাবের মনে ধরছে কিনা প্ল্যানডা, বুঝি নাই, ভাবলাম, আপনে নিশ্চয় জানেন। আপনেরে কি আর না কইছে ? কয় নাই ?

রায়হান জবাবে কী বলবে বুঝতে পারে না। মুনশির কথাবার্তা শুনতে শুনতে খুব বিরক্তি লাগে তার। সে ফের বলে, আপনি বাড়ি যাবেন না ?

না অহনই যামু না, একটু দেইখা যাই, কাইল আহে নাই, আইজ মনে হয় আইবো– আইছি যহন এট্টু দেইখা যাইতে আর কী দোষ।

বলতে বলতে মুনশি মুখ ফেরায় বাসস্ট্যান্ড-এর দিকে। তারপরই সোল্লাসে বলে ওঠে, আরে, ঐ তো আহে বিবিসাব।

রায়হানকেও মুখ ফিরিয়ে তাকাতে হয়। এবং সে দেখে হালকা সবুজ রঙের শাড়ি পরা একজন পরিপূর্ণ মহিলা এগিয়ে আসছে, সঙ্গে একটি কিশোরী মেয়ে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

দূর থেকে ঠিক চেনা যায় না, তবে আন্দাজ হয়, ওটি মেরির ছোট মেয়ে। আজ তাহলে মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছে মেরি। বেশ অবাক লাগে রায়হানের, হঠাৎ মেয়েকে কেন সঙ্গে আনলো মেরি ? ও তো সাধারণত ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নিয়ে কোথাও যায় না।

কাছাকাছি এসে মেরি রায়হানের দিকে ফিরেও তাকায় না। এমন ভাব দেখায় যে মনে হয়, রায়হানকে ওখানে দেখতে পাওয়াটা কোনো ঘটনাই নয়। মেরির জন্য রায়হানের ওখানে অপেক্ষা করে থাকাটাই যেন নিয়ম। সে মুনশির সঙ্গে আলাপ জুড়ে দেয়। গতকাল কেন আসতে পারে নি তার কৈফিয়ত দেয় প্রথমে, তারপর বাড়ি তৈরির জন্য খরচপত্রের হিসেব জুড়ে দেয়। মীরপুরের ইট ভালো, না নয়ারহাটের, সেই বিবেচনাও হতে থাকে। একই সঙ্গে বালি-সিমেন্টের আলাপও আরম্ভ হয়। মুনশির পরামর্শ মেরি খুব মন দিয়ে শোনে। সরাসরি পাকা বিল্ডিং না তুলে সে প্রথমে টিনের বাড়ি করার প্রস্তাব দেয়। সে হাত তুলে রায়হানকে দেখিয়ে বলে, ঐ স্যারও তো কয়, উপ্রে টিনের চাল দিয়া পাকা দেওয়ালের ঘর উঠাইবো দুইখান। তখন মেরি রায়হানের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসে। বলে, এখানে আসা হয়েছে ? কতোক্ষণ ? রায়হান উত্তরে কিছু বলে না। মেরি ফের বলে, বাসায় টেলিফোন করলাম। তো শুনলাম বাসায় নেই, সকালের দিকেই নাকি বেরিয়ে পড়েছেন। অফিসে টেলিফোন করেও পেলাম না। শেষে নিজেই গেলাম অফিসে। ওখানেও কেউ কোনো খবর দিতে পারে না। এদিকে আসার কথা আছে কিনা সেটা জিজ্ঞেস পর্যন্ত করলাম। কিন্তু কোনো জবাব নেই।

মেরির কথাবার্তা শুনতে শুনতে থ' হয়ে যায় রায়হান। এমন নিখুঁত অভিনয় করতে পারে ক'জন ? কে বলবে ওর ঐ কথা বলার ভঙ্গি, ঐ ঠোঁটের কোণে অল্প অল্প হাসি, অমন কৌতুকোজ্জ্বল মুখ– সবই ভান, আর বানানো ? সব এমন নিখুঁত যে কারুর কোনোরকম সন্দেহ হওয়ার উপায় নেই।

ছোট মেয়ে মিহিন মায়ের পেছনে পেছনে হাঁটছিলো আর থেমে থেমে চারদিকে তাকিয়ে দেখছিলো। ওদিকে দ্বিগুণ উৎসাহে মুনশি তখন বলে চলেছে, আপনের একখান এল প্যাটার্নের বাড়ি হইলেই তো চলে, ঠিক না ? বারিন্দা থাকবো টানা, উত্তর দিক রাখবেন পাকের ঘর, বাথরুম, ইস্টোর, দক্ষিণে বেডরুম, ড্রয়িং– পুব দুয়ারি হইব বাড়িখান, ঠিক না? ওয়াল হইব চারোদিক, গেটের উপ্রে থাকব মাধবী না মালতী কি জানি কয়, সেই লতা, বাইরা দিকে একদিক ফুলের গাছ আর অন্য দিকে সবজি বাগান। আর ওয়াল বরাবর থাকব ফলের গাছ– আম, কাঁটাল, লিচু, গয়া, ডালিম এই গিনি, বেশি না, একটা কইরা– ঠিক কইছি না ?

লম্বা বয়ান শেষ করে নিজের বুদ্ধির তারিফ চায় মুনশি। বলে, দেইখ্যেন, গেরামে বাস করলে কত আরাম।

মিহিন মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, আমরা এখানে থাকবো আম্মু ? সত্যি সত্যি ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

মেয়ের বোধহয় বিশ্বাস হতে চায় না।

মেরি তার পিঠে হাত রেখে আদর করতে করতে বলে, কেন দোষ কি ? কেমন সুন্দর চারদিকে খোলামেলা জায়গা, ফ্রেশ বাতাস, কতো সুবজ গাছপালা।

মেয়ে মায়ের কথায় সায় দিতে পারে না। অস্পষ্ট ভঙ্গিতে ডাইনে বাঁয়ে মাথা নাড়ায়। বলে, এখানে কিভাবে থাকবো, আমার স্কুল সে-ই কোথায়– ভিকারুন্নিসা কি কাছে ? আপা ইউনিভার্সিটিতে কীভাবে যাবে ? ইলেকট্রিসিটি দেখছি না, পানি-গ্যাস আছে কিনা কে জানে! বলতে বলতে মিহিন ঝাঁকুনি দিয়ে মাথা নাড়ায় আর বলে, উঁহু, অসম্ভব।

হাঁটতে হাঁটতে জমির সীমানা বরাবর যায় মেরি, তার সঙ্গে অন্য সবাই, রায়হানও। তারপর আবার ফিরে আসে আমগাছতলায়। মুনশি হঠাৎ প্রস্তাব করে, আপা আইজ চলেন, গরিবের বাড়ি, একবার বেড়াইয়া যান।

জবাবে মেরি হাসে। বলে, আপনার বাড়ি তো এখানে নয়, এখানে হলে যেতাম, কুতুবউদ্দিন মিয়ার বাড়িতে একদিন গিয়েছিলাম– কোথায় যেন থাকেন আপনি ? সাভার, না আরও দূরে, নয়ারহাট ?

মুনশি মুখ কাচুমাচু করে জ্বে জ্বে বলে কয়েকবার; তারপর বলে, বেশি দূর না আপা, ওইতো সাভার বাজারের বগলেই। বাজার থিকা দুই মিনটের পথ।

বলতে বলতে রায়হানের মুখের দিকে তাকায় মুনশি। বলে, দুপুর হইয়া গেছে পারায়। লন যাই, ঐ বাস খাড়াইয়া রইছে।

রায়হান মুখ ফিরিয়ে নেয়। তার ভয়ানক বিশ্রী লাগতে আরম্ভ করেছে তখন। নিজের ওপর ভাব রাগ হয়। এতোক্ষণ কেন সে একসঙ্গে হাঁটলো ? এভাবে একসঙ্গে সে দাঁড়িয়েই বা আছে কেন ? কোন কারণেই বা মুনশির অমন বকবকানি শুনছে। কিংবা মেরি কী বলছে না বলছে সেদিকেই বা তার খেয়াল রাখার কী দরকার। সে কোনো কারণ খুঁজে পায় না। নিজেকে বিশ্রী রকম ফালতু মনে হয় তার। এর পেছনেও সে মেরিকেই দেখতে পায়। কাছাকাছি থাকার লোভেই কি সে মেরির সঙ্গী হয় নি ? মনকে সে যতই চোখ ঠারুক, আসলে মেরির আকর্ষণ তার সমস্ত শরীর আর মনে ছেয়ে আছে। মেরিকে উপেক্ষা করার মতো মনের জোর তার নেই। না হলে কিছুক্ষণ আগেও তো সে ঢাকায় ফিরে যাওয়ার জন্য রওনা দিয়েছিলো, কেন চলে গেলো না ? কঠিন কিছু ছিলো না। মুখোমুখি হলে শুধু সত্যি কথাটা বলতো যে তার অফিসে জরুরী কাজ আছে, তারপর সামনের দিকে পা বাড়িয়ে দিতো। কাজটা ছিলো খুবই সহজ, অথচ ঐ সহজ কাজটাই সে করে নি। ছি! আসলেই সে থার্ড ক্লাস লম্পট আর বিশ্রী রকমের লোভী, সেই সঙ্গে ভীতুও।

রায়হান নিজের মনের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ গা ঝাড়া দিয়ে ওঠে। বলে, আমার এখন যাওয়া দরকার, অফিসে জরুরী কাজ পড়ে আছে।

কথাটা বলে সে বাসস্ট্যান্ডের দিকে তাকায় এবং সামনের দিকে পা বাড়ায়।

আর তাতে মেরি পেছন থেকে চেঁচিয়ে ওঠে, আরে! হঠাৎ কী হলো ? কাজ তো আমাদেরও আছে– শুনছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

পেছন থেকে অমন ডাকাডাকি শুরু হলে অগত্য রায়হানকে থামতে হয়। এদিকে মেরি মেয়েকে এগিয়ে দেয়। বলে, যা আঙ্কেলকে ধর, যেতে দিস না– ওঁর সঙ্গেই তো সাভারে যেতে হবে।

মায়ের কথা মতো সত্যি সত্যি মিহিন ছুটে এসে রায়হানের হাত ধরে। বলে, আঙ্কেল একটু দাঁড়ান, আমরাও তো যাবো। মেরিও আসে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। বলে, আমাদের কথাই তো হলো না– দেখলেন তো কাণ্ডটা, বাড়ি তৈরি হবে আমাদের, কিন্তু ওদেরই যেন উৎসাহটা বেশি। খালি পয়সা মারার তালে থাকে।

রায়হান মেরির কথার জবাবে কিছু বলে না। পাশে মিহিন নিজের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলে, আমরা নদীর দিকে যাচ্ছি তো আম্মু, নাকি ফের অন্য কোথাও যাবে। মেরি হাসে। বলে, জিজ্ঞেস কর তোর আঙ্কেলকে।

রায়হান মা-মেয়ের মধ্যেকার কথা বুঝতে পারে না। সে বেকুবের মতো দাঁড়িয়ে যায়। মিহিন তখন হাত ধরে বলে, আঙ্কেল আমাকে কিন্তু নৌকায় চড়াতে হবে, অনেকক্ষণ নৌকায় চেপে ঘুরবো, আপনারা সবাই নাকি দল বেঁধে নৌকায় চেপে ঘোরেন?

এই কারণেই মেয়েকে নিয়ে আসা, রায়হান এতোক্ষণে মেয়েকে সঙ্গে আনার কারণ আবিষ্কার করে। মেয়ের আবদার ফেলতে পারবে না রায়হান। আর সেই ছুতোয় সারাটা দিন কাছে পাবে সে রায়হানকে। কারণটা আবিষ্কার করে বটে। কিন্তু নিশ্চিত হতে পারে না। উল্টো রকমের একটা সন্দেহ ভিতরে খোঁচা মারে। একবার মনে হয়, মেয়েও কি বায়না ধরতে পারে না? মেয়ের কাছে হয়তো গল্প করছিলো কোনোদিন, তারই ফলে মেয়ের অমন বায়না এবং মায়ের সঙ্গী হওয়া।

আঙ্কেল তাহলে আমরা নদীর দিকেই যাচ্ছি, তাই না?

রায়হান হাঁটতে হাঁটতেই মুখ ফিরিয়ে বলে, না মিহিন, আজ নয়, অন্য কোনোদিন তোমাকে নৌকোয় নিয়ে ঘুরবো।

আহা মেয়েটা অত করে বলছে, একবার গেলে কী হয়। ঘণ্টা দু'য়েকের তো ব্যাপার, মেরি প্রায় মিনতি করার মতো করে বলে।

না, অসম্ভব! রায়হান সোজাসুজি মেরির মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, আমাকে অফিসে গিয়েই লিখতে বসতে হবে।

মেরি রায়হানের মুখের ওপর থেকে নজর সরায় না। বলে, ছুটিও তো নেয়া যায়, যায় না? সাভার থেকে টেলিফোন করে জানিয়ে দিলেই হলো। বলবেন, ঢাকার বাইরে এসে জরুরী কাজে আটকে গিয়েছি, কিংবা এও বলতে পারেন যে, এ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। মেরিকে হাসতে দেখে রায়হানের গা জ্বলে যায়। বলে, খবরের কাগজের অফিসে অমন মিথ্যে কথা বলা যায় না।

রায়হানকে রাগতে দেখে মেরি ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়ায়। বলে, অত রাগ কেন? সেই সকাল থেকে হন্যে হয়ে খুঁজছি। বাসায় যতবার ফোন করি খালি বলে, সকাল বেলা বেরিয়ে গেছেন, অফিসে ফোন করুন। অফিসে ফোন করলে বলে, এখনও আসেন নি। কী মুশকিল, শেষে অফিসে নিজে গেলাম, যদি কোনো হদিস দেয় কেউ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ওরা কিছু জানলে তো হদিস দেবে। আমি অফিসে না গেলে ওরা কীভাবে জানবে?

রায়হানের কথা মেরি শুনতে চায় না। বলে, ওসব কথা এখন বলে কী লাভ। শেষে আব্দুল্লাহ নামে যে ইয়ং জার্নালিস্ট আছে একজন, সে বললো, তোমাকে নাকি দেখেছে প্রেসক্লাবের সামনে, বাসে চেপে মিরপুরে যাচ্ছো। ওর কথা শুনে আমার সন্দেহ হলো, নিশ্চয়ই ফুলবাড়িয়ার দিকেই সায়েব রওনা হয়েছেন, কেমন, অনুমান ঠিক ছিলো না আমার?

মেরি কথা বলতে বলতে হাসে। চোখে চোখে তাকায় আর মেয়ের ঘাড়ে হাত রেখে সামনের দিকে এগোয়। এভাবে কিন্তু আসা উচিত হয় নি। কাউকে জানিয়ে এলে পারতে, তোমাকে কী যে পাগলামিতে পায় একেক দিন।

মেরি কথা বলতে বলতে কখন তুমি বলতে আরম্ভ করে দিয়েছে তার খেয়াল নেই। মিহিন বোধহয় খেয়াল করে এবং সে একবার আম্মুর মুখের দিকে তাকায়, একবার আঙ্কেলের মুখের দিকে।

রায়হানের সেটা চোখে পড়ে এবং সে তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, আমি যাই, খুব তাড়া আছে ওদিকে।

মেরি হাত চেপে ধরে তখন। বলে, বাসে চেপে যাওয়ার কী দরকার। আমরা তো বেবিট্যাক্সি সঙ্গে করে এনেছি। তাড়াহুড়া না করলেও চলবে–

রায়হান অদূরে বাস স্ট্যান্ডে একখানা বেবিট্যাক্সিকে অপেক্ষা করতে দেখে এবং দমে যায়। তার নিষ্কৃতি নেই– লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে সে।

মায়ের কথা শুনে আর রায়হানের ভাবভঙ্গি দেখে মিহিন কী বোঝে সেই জানে। হঠাৎ সে মত পাল্টে ফেলে। বলে, না আম্মু আজ আর নৌকায় চাপতে ইচ্ছে করছে না– অনেক বেলা হয়ে গেছে, আমাকে তুমি কল্যাণপুরে নামিয়ে দিও।

তোদের মতিগতি বোঝা মুশকিল। মেরি রীতিমতো রেগে যায়। বলে, আসবার জন্যে তো পাগল হয়ে উঠেছিলি তখন– এখন অন্য কথা কেন?

বাহ্ আমি বুঝি বাড়িতে একলা থাকবো? মিহিনের গলার স্বরে ক্ষোভ স্পষ্ট শোনা যায়। বলে, আপা আব্বুকে হসপিটালে নিয়ে গেলো। পরে দেখলাম, তুমিও থাকছো না তখন আমি কী করবো, বলো?

কেন, আগে একলা বাসায় থাকো নি? মেরি চাপা গলায় হিস হিস করে ওঠে।

রায়হান ওদের পাশাপাশি হাঁটে আর মা-মেয়ের ঝগড়া শোনে। ওদের সংসারের অনেক খবর তার জানা কিন্তু– ছোট মেয়ে যে এক একদিন একাই বাড়ি পাহারা দিয়ে রাখতো সেটা সে জানতো না। ঐ সময় একখানা বাস আসতে দেখে রায়হান সোৎসাহে বলে ওঠে, আমি যাই, আমার বাস এসে গেছে।

সেকি! মেরি এবার রায়হানের হাত ধরে ধমকে ওঠে। বলে, এসব ছেলেমানুষীর কী মানে, এ্যাঁ? এতো ভ্রেদ করার কী হয়েছে, বললাম তো, সঙ্গে আমাদের বেবিট্যাক্সি আছে। রায়হান মিহিনকে অবাক চোখে মায়ের মুখের দিকে তাকাতে দেখে নিজেকে গুটিয়ে নেয়। তার অদ্ভুত লাগে ঐ মুহূর্তে, এ কোন খেলায় মেতেছে মেরি!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

গা ঘেঁসে হাঁটছে। হাত ধরলো। চোখে চোখ রেখে হাসছে, বার দু'য়েক তুমিও বলে ফেললো আর বাকি রইলো কী ? মিহিন তো ছোট নয় একেবারে। ১৩/১৪ বছরের মেয়ে। ক্লাস নাইনে পড়ে। ওর বুঝতে কি আর কিছু বাকি থাকবে ? সুতরাং রায়হান আর জেদ করতে পারে না।

কল্যাণপুরের মোড়ে বড় রাস্তার পাশে মেয়েকে নামিয়ে দেয় মেরি। বলে, মোড় থেকে রিকশা নিয়ে যাবি। আমার কথা জিজ্ঞেস করলে বলবি, বাড়ির প্ল্যানের কী হলো সেই খোঁজ নিতে ডিআইটিতে গেছি, বুঝলি ? তোর আব্বাকে বুঝিয়ে বলবি, আমার ফিরতে দেরি হবে।

মেয়ে নেমে যাওয়ার পর বেবিট্যাক্সি ফের চলতে শুরু করলে মেরি রায়হানের ঘাড়ে হাত রেখে আরাম করে বসে। তারপর বলে, মিহিনকে তোমার কেমন লাগে ? ভালো না ?

হ্যাঁ ভালো, রায়হান মাথা হেলায়।

ওর খুব বুদ্ধি, সব কিছু বোঝে, তোমাকে ওর খুব পছন্দ–

তার মানে ? রায়হান বিভ্রান্ত চোখে তাকায় মেরির মুখের দিকে।

মানে আবার কী ? মেরি হাসে। বলে, মানে কিছু নয়, তোমাকে তো বলেছি। আমি তোমার বার্ডেন হবো না– শুধু এই মিহিনকেই তোমার একসেপ্ট করতে হবে– মানে নিজের মেয়ের মতো দেখতে হবে।

এই বলতে বলতে মেরি চলন্ত গাড়ির ঝাঁকুনিতে রায়হানের ঘাড়ে গিয়ে পড়ে– তারপর আবার একটা ঝাঁকুনি এসে লাগলে রায়হানের মাথা ওপরের লোহার পাতে ঘা খায়। তবু ঐ অবস্থার মধ্যেও তাকে কান খাড়া রাখতে হয়। কারণ ঐ সময় যা বলছিলো মেরি তা না শুনে তার উপায় নেই। মেরির কথা শেষ হতে হতে বেবিট্যাক্সি বার তিনেক ট্রাফিক জ্যামে পড়ে, একবার ল্যামপোস্টে ঘষা খায় এবং একবার ট্রাফিক পুলিশের হাতের ব্যাটনের গুঁতো খায় ড্রাইভার। ফলে মতিঝিলের 'গণ একতা' অফিসে পৌঁছতে পৌঁছতে বেশ দেরি হয়ে যায়।

তবে দেরি যে হচ্ছে, তা টের পাচ্ছিলো না রায়হান। কেমন করে পাবে ? মেরি যা বলছিলো, তাতে সময়জ্ঞান তো দূরের কথা, হুঁশজ্ঞানও থাকার কথা নয়।

খুব সহজ ভাবে বলে যাচ্ছিলো মেরি, ঐ মেয়েটাকে নিয়েই যা একটু সমস্যা, বুঝলে ? নইলে অন্য সব কিছু আমার গুছিয়ে নিতে সময় লাগবে না। চন্দনার তো মেডিক্যালের একটি ছেলের সঙ্গে জানাশোনা হয়েছে। যে কোনো দিন ওরা বিয়ে করে ফেলতে পারে। আর ছেলে দু'টি ক্যাডেটের ছাত্র, ওদের ফাইনাল পরীক্ষার আর ক'দিনই বা বাকি। ওরা পাস করার সঙ্গে সঙ্গে আর্মিতে রিক্রুট হয়ে যাবে – বলতে পারো, আমি একরকম রেডি, সাদেককেও গত রাতে বলে দিয়েছি।

কী ? রায়হানের দম বন্ধ হয়ে আসছিলো প্রশ্নটা করার সময়।

কী আবার, ঐ কথাই– আজকাল একটু চলাফেরা করতে পারে। আমাকে খালি মারতে আসে যখন তখন। কাল রাতে বলে দিয়েছি, যদি তুমি মারো, তাহলে আমি তোমাকে ডিভোর্স করবো। মতিঝিলে অফিসের সামনে নামিয়ে দেয়ার সময় শেষ যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

প্রশ্নটা করে মেরি, তার জবাবে রায়হান কিছুই বলতে পারে নি। সে জিজ্ঞেস করেছিলো, তোমার বউকে জানিয়েছো ?

কী ?

বাহ্ তুমি যে আমাকে বিয়ে করবে, সেটা ওকে জানাবে না ? ওর পারমিশন ছাড়া বিয়ে করলে তো সে বিয়ে টিকবেই না, উপরন্তু তুমি কেসে ফেঁসে যাবে। জেলও হয়ে যেতে পারে। তুমি আইনটা জানো না ?

ঐ কথা শোনার পর ভাবলেশহীন মুখে তাকিয়ে ছিলো মেরির দিকে।

শোনো, ঘাবড়াচ্ছো কেন, মেরি ফের হাত ধরে বলেছিলো, এটা লাইফের প্র্যাকটিক্যাল দিক– রাগারাগি কান্নাকাটি করে এর সুরাহা হবে না, তোমার বউ শিক্ষিতা মহিলা, বুঝিয়ে বললে নিশ্চয়ই বুঝবে। তুমি যদি না পারো, আমি যাই তাহলে আজ সন্ধ্যার পর, যাবো তোমার বাসায় ?

রায়হানের জ্ঞান-বুদ্ধি বলে তখন কিছু নেই। তখন তার দাঁড়িয়ে থাকারও ক্ষমতা ছিলো না। মেরির ঐ প্রস্তাব শোনার পর সে একবার ডাইনে বাঁয়ে তাকিয়ে নেয়। চারদিকটা অসম্ভব ফাঁকা লাগে তার। মনে হয় না যে কাছাকাছি মানুষজন বলে কিছু আছে। সে টলতে টলতে অফিসের গেট পার হয়ে ভেতরে গিয়ে সোজা নিজের কামরায় গিয়ে বসে। কেউ তাকে ডাকছে কি না, তাও সে তখন বুঝতে পারে না। তার শুধু মনে হচ্ছিলো তখন, যে এই কামরাতেই তাকে থেকে যেতে হবে সারাজীবন। বাইরে সে আর কখনও বেরুতে পারবে না।

সে কতোক্ষণ ঐভাবে টেবিলের ওপর দু'হাতের ভাঁজে মাথা রেখে বসে ছিলো বলতে পারবে না। এক সময় বেয়ারা কালাম এসে ডাকলে সে মাথা তোলে। কালাম জানায়, এ্যাম ই সায়েবে আপনেরে সালাম দিছে।

এম ই মানে ম্যানেজিং এডিটর আমানউল্লাহ সাহেব। তার অনুমান হয়, আজ মিটিং-এ না থাকার জন্য নিশ্চয়ই ভদ্রলোক কথা শোনাবেন। সে ঘড়ির দিকে তাকায়। দেখে সাড়ে তিনটা। তার মানে এখনও সময় আছে, পোস্ট-এর জন্য অন্য কাউকে যদি লিখতে না বলা হয়ে থাকে, তাহলে সে-ই লিখতে পারে লেখাটা। ৫টা ৬টা পর্যন্ত কপি কম্পোজ-এ পাঠাবার সুযোগ তো রাখা হয়। তবু চিন্তামুক্ত হতে পারে না সে। আজ মিটিং-এ কী আলাপ হয়েছে, সেটা অন্তত জানা দরকার। সে কালামকে ডাকে। জিজ্ঞেস করে, এডিটর সাহেব আছেন ?

জ্বী না, কালাম হেসে জবাব দেয়। বলে, সেক্রেটারিয়েট গেছে, হুনলাম মিনিস্টার নাকি ডাইকা পাঠাইছে, আপনেগো ১২টার মিটিং হয়নি– আপনে আহেন না, আপনের লাই অপেক্ষা করতে করতে টেলিফোন আইলো, হ্যাযে কী করেন–

খবরটা শুনে কিছুটা আশ্বস্ত বোধ করে রায়হান, তাহলে পোস্টটা অন্য কাউকে লিখতে বলা হয় নি।

তবু নিশ্চিত হওয়ার জন্য আমানউল্লাহ সাহেবের কামরায় যাবার জন্য পা বাড়িয়েছে ঐ সময় টেলিফোন। রিসিভার কানে তুলতেই বীথির গলা শোনা যায়। বলে, কী ব্যাপার ? সকাল থেকে কোথায় ছিলে তুমি ? এদিকে তোমার অফিস থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

একের পর এক টেলিফোন আসে, আমি কিছু বলতে পারি না, কী হয়েছে ?

তেমন কিছু না, রায়হান জানায়। বলে, ওখানে শুনলাম জমি মাপামাপি হচ্ছে, কালই মুনশি একটা লোককে দিয়ে খবর পাঠিয়েছিলো– ওখানে গিয়ে আটকে গেলাম– কন্ট্রাক্টর মিস্ত্রি লেবার ইট বালি সিমেন্টের দালাল ওরা ছেঁকে ধরলো, ওদিকে আবার এসে গেলো–

মেরির কথাটা তুলতে পারে না রায়হান। তার আগেই ওদিক থেকে বীথি বলে ওঠে, কিন্তু আমাকে বলো নি কেন, যে তুমি ফুলবাড়িয়া যাচ্ছো ? তোমার কী যে হয়েছে আজকাল। বীথির গলার স্বরে অভিমান ফোটে। সে ফের বলে, ঠিক আছে, এখন বাসায় আসবে ?

এক্ষুণি না, রায়হান জানায়। বলে, দেরি হবে, লেখাটা এখনও শেষ হয় নি।

ফোনটা রেখে রায়হান টেবিল ঘেঁসে একইভাবে দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ। তার বেশ চিন্তা হয়। এখনও মিছে কথা গুছিয়ে বলতে পারে না। ফুলবাড়িয়া যাওয়ার যে কারণ সে বললো, তা বীথির বিশ্বাস হয় নি। জমি মাপামাপির কথা তো অবশ্যই না, কারণ তার এখন মনে পড়ছে, জমি মাপজোক করে পোক্ত পিলার দেয়ার কাজটা অল্প কিছুদিন হলো শেষ করা হয়েছে। সে ঘটনার কথা নিশ্চয়ই বীথি ভুলে যায় নি।

কিন্তু কথাটা অন্য আর কীভাবে বলা যেতো, তাও সে ভেবে পায় না।

কামরায় ঢুকে সামনে এগিয়ে যেতেই আমানউল্লাহ উঠে দাঁড়িয়ে হাতে হাত মেলান। আজকের মিটিংটা করা যায় নি, তা বোধহয় শুনেছেন, মিনিস্টার ডেকেছিলো বলে এডিটর সাহেব চলে গেলেন। আমাকে জানাতে বলে গেলেন, যেন সবগুলো কপি আপনি নিজে দেখে তারপর কম্পোজে পাঠান। তখন সবে একটা বেজেছে, আপনিও আসেন না, ঠিক তখনই আবার ব্যাংক থেকে তলব এসে গেলো। ওখানে গিয়ে দেখি মহা ঘাপলা, বিজ্ঞাপনের চেকগুলো ডেবিট হয়ে আসে নি– কী করি, তখন ঐ ব্যাংক থেকেই এ্যাড ফার্মগুলোকে একের পর এক টেলিফোন করতে হলো– ঐ সব করতে করতে এই এখন এলাম– তা এদিকের খবর সব ঠিকঠাক তো ?

রায়হান সরাসরি কিছু বলতে পারে না। জানলে তো বলবে! তার মুখের চেহারা দেখে আমানউল্লাহ সাহেব সম্ভবত অনুমান করেন যে, গতিক তেমন সুবিধার নয়। তিনি হাতে লেখা কয়েকখানা স্লিপ তুলে ধরে বলেন, এগুলো এডিটর সাহেব আপনাকে দেয়ার জন্য বলে গেছেন, কমপ্লিট করেন নি, তবু কেন যে দিয়ে গেলেন বুঝলাম না। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, বাকি ম্যাটারের কী হবে ? তো বললেন, রায়হানকে বলবেন, ও সামলে নেবে– কিন্তু আপনাকেই তো তখন পাওয়া গেলো না– এখন যে কী হবে, তাই ভাবছি।

কথাটা বলেন বটে। কিন্তু নিজেই জাহিদকে ডেকে পাঠান এবং সে এলে জিজ্ঞেস করেন, তার সেকেন্ড এডিটোরিয়াল লেখা কতোক্ষণে শেষ হবে। জাহিদের কী যে হয়, সেই জানে। বলে, একটু দেরি হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

মনে হচ্ছিলো আমানউল্লাহ সাহেব মেজাজ করবেন, কিন্তু দেখা গেলো, বেশ শান্ত রইলেন সারাটা ক্ষণ। তবে তাড়াতাড়ি লেখাটা শেষ করার জন্য তাগিদ ঠিকই দিলেন।

রায়হানের বলার কিছু ছিলো না– এমন পরিস্থিতি তার অভিজ্ঞতায় নতুন নয়। কুল্লে চারজন মানুষ, তার মধ্যে একজন দু'জনের এদিক ওদিক কিছু হলে ঝামেলায় পড়ে যেতে হয়। অসুস্থ আমজাদ ভাইকে তো হিসাব থেকে এমনিতেই বাদ রাখা হয়। যেদিন পারেন বাসা থেকেই লেখাটা লোকমারফত পাঠিয়ে দেন। ক'দিন ধরে অবশ্যি পাঠাচ্ছেন না, এদিকে একেকদিন আজকের মতোই এডিটর সাহেব কোথাও আটকে যান। আর জাহিদ মাস ছয়েক আগে জয়েন করলে কী হবে, ওর লেখার ওপর এখনও কলম চালাতে হয়। তাহলে ফল দাঁড়ায় কী ? ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো বলতে পাওয়া যায় রায়হান আলীকেই, অন্য কাউকে নয়। এমন অবস্থায় আমানউল্লাহ কীভাবে মেজাজ দেখাবেন ? হাজার হলেও মালিকের নিজের লোক তিনি।

কথা শেষ হলে রায়হান উঠছিলো। আমানউল্লাহ বলেন, রায়হান সাহেব আপনি একটু বসুন, জরুরী কথা আছে।

জাহিদ চলে গেলে ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করেন, মিনিস্টার কেন ডেকে পাঠিয়েছেন জানেন ?

রায়হান মাথা নাড়ায়। বলে, জ্বী না।

অন্য কোনো এডিটরকে ডেকেছেন কি না, সে ব্যাপারে কিছু শোনেন নি ?

এবারও রায়হানের একই জবাব।

খুব ইন্টারেস্টিং ঘটনা ঘটছে বুঝলেন ? আমানউল্লাহ গোপন খবর বলার মতো গলার স্বর নিচু করে জানান। অপোজিশন-এ তো ৭ দল ৮ দলের বড় দুটো ভাগ ছিলোই। এবার খোদ বিএনপিতে ভাঙন ধরেছে ঢাকা সিটিতে তো বটেই, ন্যাশনাল পর্যায়েও টোটাল শো ডাউন হতে যাচ্ছে।

রায়হান বুঝতে পারে না, ভদ্রলোক কেন এসব রাজনৈতিক দলাদলির কথা তাকে জানাচ্ছেন। সে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলে, আমান ভাই, ওসব খবর তো পরেও জানা যাবে, এখন আমার কতো কাজ বাকি–

ঐ কথায় আমানউল্লাহ একটুও নিরুৎসাহিত হন না। বলেন, আরে ভাই। এ খবরের পিছনে আরও খবর আছে, বুঝছেন না কেন, আমাদের কাগজের হেল্প চায় সরকার, কিছু আন্দাজ করতে পারেন ? সেই জন্য মিনিস্টার ডেকেছেন এডিটরকে।

এডিটর যদি রাজি না হন ?

ঠিক আছে এ কাগজে থেকে রাজি না হোন, প্রিন্সিপ্যাল ইনফরমেশন অফিসার হলে নিশ্চয়ই রাজি হবেন, কী বলেন, হবেন না ?

রায়হানের কাছে অবিশ্বাস্য বলে মনে হয় না, কিন্তু একটা খটকা তার মনের ভিতরে থেকে যায়। আর তা হলো, 'গণ একতা' কাগজকে কেন পছন্দ হচ্ছে সরকারী দলের ? ...ি সার্কুলেশনের কাগজ বাদ দিয়ে 'গণ একতাকে' কেন পছন্দ ওদের ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

শুনুন রায়হান সাহেব, আমানউল্লাহ হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যান। তারপর বলেন, একটা ব্যাপারে আমাদের দুজনের মধ্যে একটা ফয়সালা হওয়া দরকার। যদি এডিটর চলে যান 'গণ একতা' থেকে, আমি শিওর উনি চলে যাবেন, তখন এডিটরের পোস্টটা খালি হচ্ছে। মালিক পক্ষ চান না যে বাইরে থেকে নতুন লোক আসুক ঐ জায়গায়। সে অবস্থায় রইলাম আমরা দু'জন– আপনি ভালো লেখেন, কলমের জোর আছে, সুতরাং আপনার চান্স বেশি– কিন্তু আমিই বা ছাড়বো কেন? মালিকদের মধ্যে মাত্র একজন, আমাকে সাপোর্ট করবেন– সেক্ষেত্রে আমাকে ম্যানিপুলেট করতেই হবে। আপনার আন্ডারে আমি থাকতে পছন্দ করবো না। সেটা নিশ্চয়ই আপনি বোঝেন– আর ম্যানেজমেন্ট-এর ব্যাপারে আপনার কোনো রকম অভিজ্ঞতা নেই। সেক্ষেত্রে আপনি চীফ এডিটর হলে, আমার কোনো রকম কোঅপারেশন পাবেন না– তাতে কি আপনি কাগজটা চালাতে পারবেন? সেই জন্য আমাদের দু'জনের মধ্যে এখন একটা সমঝোতা হওয়া দরকার যে, এমন অবস্থায়, আপনি এডিটর এর পোস্ট-এর জন্য আমার নাম প্রোপোজ না করুন ক্ষতি নেই। তবে আপনি নিজে সম্পাদক হতে রাজি হবেন না, প্লীজ।

আমানউল্লাহর কথা শুনতে শুনতে রায়হানের ভীষণ হাসি পায়। সে কী বলবে ভেবে পায় না। ভদ্রলোক তাকে কী ভাবেন? উনি কি ভাবেন যে রায়হান তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী হবে?

সে বলে, আমান ভাই, আমি এবার উঠি, আমার ওদিকে অনেক কাজ বাকি।

হ্যাঁ, আর একটা কথা, আমানউল্লাহ ফের বলেন, এসব কথা লোভ বা ভয় দেখানোর জন্য বলছি বলে মনে করবেন না, প্লীজ! কারণ এই কাগজের এডিটর হওয়ার জন্য খুব বেশি লোভ আমার নেই। আমিও চেষ্টা করছি ফরেইন কোনো এ্যাসাইনমেন্ট-এর জন্য– যদি পেয়ে যাই, আশা করি পাবো– কারণ আমার কোনো চয়েস নেই– যেখানে পাঠাবে, আমি সেখানেই যেতে রাজি। তো যদি অমন কিছু পেয়ে যাই– বুঝলেন, তাহলে আমি আপনাকে 'গণ একতা'র এডিটরের চেয়ারে বসিয়ে তারপর যাবো।

আমানউল্লাহ খানের কথা শুনতে শুনতে রায়হানের হাসি এবং বিরক্তি দুই-ই চেপে রাখা দায় হয়ে ওঠে। সে হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়ায়। তারপর বলে, আমি এবারে উঠি আমান ভাই!

কিন্তু আপনি তো কিছু বললেন না।

কী বলবো! রায়হান ফের হাসে। বলে, আপনি কি কখনো আয়নায় নিজের চেহারা দেখেন?

তার মানে? আমানউল্লাহ ঠিক বুঝতে পারেন না।

মানে কিছু না, রায়হান জানায়। বলে, আমি আজকাল প্রায় রোজই নিজেকে আয়নায় দেখি– আর তাতে কী মনে হয় জানেন?

এক মুহূর্ত থেমে রায়হান ফের বলে, নিজেকে আমার বাঁদরের মতো লাগে– খেলা দেখায় যেসব বাঁদরকে দিয়ে, মনে হয়, আমাকেও ঠিক সেই রকম নাচিয়ে বেড়াচ্ছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

মতো দেখতে লাগবে এডিটরের চেয়ারে বসলে। বাঁদরঅলা যখন বলবে, ওঠো, তো আমি উঠবো, ফের যখন বলবে বসো, তো বসবো– ঐরকমই হুকুম মতো কখনো লাফাবো, ডিগবাজি খাবো– তাই বলছি, চারদিকের অবস্থা দেখার পরে অমন কাজ কে করতে যাবে বলুন ?

ঐ পর্যন্ত বলে রায়হান তারপর কথা না বাড়িয়ে নিজের কামরায় ফিরে এসে কাজে বসে যায়। আমানউল্লাহ সাহেবের লোভ দেখানো প্রস্তাব তার মনে একটুও আঁচড় কাটতে পারে না। এমন আপোস আর নিজেকে বিক্রি করার ঘটনা সে কতো দেখলো!

নিজের আসনে বসে সে প্রথমে একবার চোখ বুলিয়ে নিলো ফার্স্ট এডিটোরিয়ালটার ওপর। রাজনৈতিক সহনশীলতা নিয়ে লেখা– ছোট, কিছুটা অসমাপ্তও, কিন্তু তবু মনে হলো, যতটুকু লেখা হয়েছে তাতে এ লেখাটা চলতে পারে। স্লিপ ক'খানা সে কম্পোজ-এ পাঠিয়ে দিলো। তারপর বসলো নিজের জন্য বরাদ্দ লেখা নিয়ে। লিখতে বসে খেয়াল হলো, আইন শৃঙ্খলার অবনতি নিয়ে লিখতে গেলে তাকে কিছু তথ্য অবশ্যই দিতে হবে। অতএব ঘাঁটো পুরনো কাগজ। বেশি ঘাঁটাঘাঁটির দরকার হলো না। তিন চার দিনের কাগজেই পাওয়া গেলো বহু ঘটনার খবর। তারপর আর দেরি হলো না– খুব সহজেই লিখে ফেললো ১২ খানা স্লিপ। রাজনীতির লোকদের সঙ্গে মাস্তান আর পুলিশের লোকদের যে একটা গোপন স্বার্থের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, সেই বিষয়টা ঢোকাতে যাবার সময় একটু দোনামনা ভাব হচ্ছিলো, কিন্তু সে পাত্তা দিলো না। মনে যা সহজভাবে আসছিলো তাই টানা লিখে ফেললো।

লেখাটা শেষ করে কম্পোজ-এ পাঠিয়ে দিয়ে সে ঘড়ির দিকে তাকায়, ছ'টা, তার মানে এখনও সন্ধ্যা হতে কিছু দেরি। ঐ সময় বেয়ারা কালাম এক কাপ চা টেবিলে এনে রাখে। বলে, এ্যাম ই সাবে পাঠাইছে।

রায়হানের হাসি পায়। ভদ্রলোক তাহলে 'গণ একতা'র চীফ এডিটর হবার জন্যে আজ থেকে তদ্বির শুরু করে দিলেন।

চায়ের কাপে চুমুক দিতে না দিতেই টেলিফোন। রিসিভার কানে তুলতেই বীথির গলা শোনা যায়। বলে, এখন ক'টা বাজে, খেয়াল আছে ?

রায়হান ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলে, আমার আরও কিছু দেরি হবে।

দুপুরে কোথায় খেয়েছো ?

বীথির প্রশ্ন শুনে রায়হান মনের ভেতরে খানিক চমকায়। আজ দুপুরে আসলেই কি তার খাওয়া হয়েছে ? সে গলার স্বরে সহজ ভঙ্গি আনার চেষ্টা করে। বলে, এখানেই, মানে অফিসেই খাবার আনিয়ে খেয়ে নিয়েছি।

চিন্তা করে জবাব দিতে দেরি হয়। জবাবটা পুরো দেওয়ার আগেই বীথি ক্ষুব্ধ স্বরে বলে ওঠে। তুমি যে আমার কাছে মিথ্যে কথা বলতে পারো না, তা কি ভুলে গেছো ? শোনো, একটু আগে সাদেক সাহেবের মিসেস ফোন করেছিলেন।

কে ? রায়হানের বুঝতে যেন অসুবিধা হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

আরে মিসেস সাদেক, ন্যাকামি করো না তো ? মেরি ফোনে কথা বললেন, আমাকে কাল ফুলবাড়িয়া নিয়ে যেতে চান– খুব হাসি খুশি মহিলা– আর খুব মিশুক– খুব সহজে আপন হয়ে উঠতে জানেন। বললেন, আমাকে নাকি ওর বড় বোনের মতো দেখতে লাগে– ও এখন থেকে আমাকে বুবু বলে ডাকবে– শুনছো ?

রায়হান শুনতে শুনতে হুঁ হাঁ করতেও ভুলে যায়। বীথি ওদিক থেকে ফের ডাকে, হ্যালো শুনছো ? আমি ভাবছি, ওর সঙ্গে গেলে মন্দ হয় না। ভাবছি কাল যাই, কী বলো ? না এখনও মত দিই নি, বলেছি তোমার সঙ্গে কথা বলে পরে জানাবো। তুমি কখন আসছো ?

রায়হান জবাবে জানায়, একটু পরই আসছি, বেশি দেরি হবে না। জবাব দেয়ার সময় তার গলার স্বর খুব নিচু হয়ে একেবারে মিইয়ে যায়। তারপরই সে ফোনের রিসিভার নামিয়ে রাখে।

টেনে নিঃশ্বাস নেয় একবার। কাজের ভেতরে ডুবে থাকায় মাঝখানে মনের ওপরকার পীড়নের ভারটা টের পাওয়া যায় নি, এখন বীথির সঙ্গে কথা বলার পর সে টের পায়, সেই ভারটা মনের ওপর আবার চেপে বসেছে।

তাকে ফের নিজের মুখোমুখি হতে হয়। এবার ? এখন সে কী করবে ? মেরি যা চাইছে, তাতে রাজি হয়ে যাবে ? বীথিকে গিয়ে বলবে, আমি মেরিকে বিয়ে করতে যাচ্ছি তুমি এই বিয়েতে মত দাও।

বীথি যদি বলে, কেন ? কেন মত দেবো ? তখন তার কী জবাব হবে ? সে কি বলতে পারবে যে আমি মেরিকে ভালোবাসি, ওকে ছাড়া আমার চলবে না।

সে তো ভালো করে জানে, ঐ কথা বীথি মানবে না। বলবে, তুমি মিথ্যে কথা বলছো– তুমি অন্য কাউকে ভালোবাসতে পারো না– বলবে, আমি কিছুতেই মেনে নেবো না– তুমি যা খুশি করতে পারো, তোমার ছেলেরা তোমার নষ্টামি সহ্য করবে না, তুমি বদমায়েশি করে বেড়াবে আর আমরা তা মেনে নেবো ? কক্ষণো না। তখন ? তখন সে কী করবে ? বীথির কথা তো মিথ্যে নয়, আসলেও তো সে মেরিকে ভালোবাসে না, কখনোই অমন গভীর ধরনের সম্পর্ক হয়েছে বলে তার মনে হয় নি। মেরি আর সে দু'জনে মিলে যা করেছে তা তো নষ্টামিই– অন্য কিছু নয়। মানুষ যে বেশ্যাবাড়ি যায়, তার মানে কি সে বেশ্যাদের ভালোবাসে ? শুধু পেটে বাচ্চা বাঁধিয়েই না মেরি তার ঘাড়ে চেপে বসতে চাইছে– তাহলে ? বীথির কথাকে ফেরাবে কীভাবে ?

রায়হান ফের উল্টো দিকটাও কল্পনায় দেখতে পায়। সে যদি বলে দেয় মেরিকে যে তার পেটের বাচ্চার দায় সে নেবে না। বলবে, তুমি যে অন্য পুরুষ মানুষের সাথে মেশো না, তার কী গ্যারান্টি ?

সে আন্দাজ করতে পারে ঐ ধরনের কথা শুনলে মেরি ক্ষেপে যাবে, হৈ চৈ তুলে চিৎকার করবে। বাসায় গিয়ে লঙ্কাকাণ্ড বাধিয়ে দেবে, অফিসও বাদ দেবে না– অফিসে এসেও সবার সামনে অশ্লীল ভাষায় গালাগালি করবে। আর তাতে কোথাও তার মুখ দেখাবার মতো অবস্থা থাকবে না। বীথি আর ছেলেদের বিশ্বাস তো সে এমনিতেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

হারাবে। তারপরও তাকে বিবেক দংশনের মধ্যে পড়তে হবে। সর্বক্ষণ তার মনে একটা খোঁচা থাকবে যে একজন মহিলাকে সে ব্যবহার করে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। আর যদি মেরির পেটের সন্তান জন্ম নিয়ে বড় হয়ে ওঠে, তাহলে সেই ঘটনাও তাকে অহরহ পীড়ন করবে সারাটা জীবন ধরে। ঐ ছেলে বা মেয়েটির তো কোনো অপরাধ নেই। তার জন্মের জন্য তো সে নিজে দায়ী নয়। সারাজীবন অমন একটা পীড়নের বোঝা তাকে বইতে হবে– নাহ্, অসম্ভব।

সুতরাং রায়হান আলী, সে নিজেকে ডেকে বলে, তৈরি হও এবার। তোমার নিজের পায়ে নিজেই কুড়োল মেরে বসে আছো। তোমার পতন ঠেকাবার মতো তোমার পাশে কেউ নেই। তোমার কোথাও ঠাঁই হবে না– বন্ধু সহকর্মীদের সঙ্গে না, ঘরসংসারে না, কাজের জায়গায় না– কারণ কেউই তোমাকে বিশ্বাস করবে না, তুমি আউট।

দেখতে দেখতে ওদিকে আটটা বেজে যায়। নিউজ সেকশনের রাতের শিফট জমজমাট– আব্দুল্লাহর গলা শোনা যাচ্ছে। ওদিকে প্রুফ সেকশন থেকেও একসঙ্গে দু'তিনজনের কথা কানে আসছে। একবার কালাম এসে দরজা খুলে উঁকি মেরে দেখে যায়। তারপর আসে জাহিদ। বলে, রায়হান ভাই, আমি আমার কপির কারেকশানটা দেখে দিয়েছি, এবার যাই।

জাহিদ চলে যাবার পর দরজা ঠেলে আমানউল্লাহ ঢোকেন। বলেন, এডিটর সাহেব আজ আর আসছেন না– শুনলাম, সেক্রেটারিয়েটে অনেকক্ষণ ছিলেন, তারপর সোজা বাসায় চলে গেছেন. টেলিফোন ধরেন না– তাঁর বাসা থেকে বলে, উনি নাকি ঘুমোচ্ছেন, পরে টেলিফোন করুন। বিকালে ঐ কথা বললো, সন্ধ্যায়ও ঐ কথা– এখন ফোন করলাম, বললাম অফিস থেকে বলছি, তারপরও ঐ এক কথা– এখন ঘুমোচ্ছেন, পরে কথা বলুন– কিছু আন্দাজ করতে পারেন ?

রায়হান ভদ্রলোকের অঙ্গভঙ্গি দেখে আর কথা শোনে, কিন্তু কিছু বলে না। চুপচাপ মুখোমুখি তাকিয়ে থাকে।

তাতে বোধহয় আমানউল্লাহ খানের অস্বস্তি বোধ হয়। বলেন, আপনি কি আরও কিছুক্ষণ থাকবেন ?

রায়হান জবাবে মাথাটা খানিক ডাইনে হেলায়। মুখে কিছু বলে না।

আমি তাহলে চলে গেলাম, আমানউল্লাহ শেষ কথা বলে ঘর থেকে বেরিয়ে যান।

ভদ্রলোক চলে যাবার পরও রায়হান দরজার দিকে তাকিয়ে থাকে। তাকেও এখন যেতে হবে। কিন্তু সে যাবেটা কোথায়, বাসায় ? আজ না হয় গেলো, কিন্তু কাল ? কিংবা পরশু, কিংবা তার পরের দিন ? আগামীকাল যে মেরি বীথিকে নিয়ে ফুলবাড়িয়া যাবে, সে কি শুধুই বেড়ানোর জন্য ? সে তো জানিয়েই দিয়েছে যে, রায়হান যদি কথাটা না বলতে পারে, তাহলে সে নিজেই বলবে বীথিকে। যদি সত্যি সত্যি বলে ? তার চাইতে তার নিজেরই কি আগে বলা উচিত নয় ?

নিজেকে, খুব অসহায় লাগে রায়হানের। মেরির সঙ্গে তার এমন এক সম্পর্ক হয়েছে, যা সে অস্বীকার করতে চায়, কিন্তু পারে না। আর যদি বীথি আর ছেলেদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

তাকে হারাতে হয়, তাহলে তার নিজের অস্তিত্বই কি থাকে ? নিজের অস্তিত্বেরই তো কোনো ভিত্তি থাকে না। তাহলে ?

আমি কে ? রায়হান হিসেব করে। নিজেকে বলে, ধরলাম, আমি মেরি নামে একজন মেয়ে মানুষের স্বামী এবং তার বাচ্চার বাপ, তার সঙ্গে এক বাড়িতে থাকি। এক বিছানায় শোওয়াশুয়ি করি আর বাইরে কাগজের অফিসে করি লেখালেখির কাজ। কিন্তু তখনকার ঐ আমি কি আমার আমি ? আমার কাজের জায়গায় যারা সহকর্মী, যারা বন্ধু, যারা শুভাকাঙ্ক্ষী, যারা সুখ দুঃখের কথা বলে, যাদের সঙ্গে আড্ডা দিই আর হাসাহাসি করি, তারা কি আমার তখনকার আমিকে মনের দিক থেকে গ্রহণ করবে ? যখনই জিজ্ঞেস করবে, মিসেস কেমন ? কিংবা ছেলেরা কী পড়ছে ? তখন আসলে তারা কোন মিসেস আর কোন ছেলেদের কথা জানতে চাইবে আর সে নিজেও বা কার কথা বলবে ?

এখন আমি মেরির সঙ্গে লুকিয়ে ঘনিষ্ঠ সময় কাটাবার পর বেরিয়ে যাই। তো বেরিয়ে যাইটা কোথায় ? বেরিয়ে চলে যাই নিজের বাসায়– নিজের ঠাঁই নেওয়ার জায়গায়। যেখান আমি বরাবর গিয়ে থাকি– অসুখে-বিসুখে, আনন্দে-দুঃখে, আশা-হতাশায় যেখানে আমার ঠাঁই পাতা আছে পুরো জীবৎকালের জন্যে। যেখানে একখানি পানি-ভেজা শীতল কোমল হাত জ্বরতপ্ত কপালে থেকে থেকে এসে পড়ে, যেখানে আমারই সন্তান এসে রোগশয্যার পাশে বসে থাকে কিংবা পায়ে হাত বুলিয়ে দেয়। একখানি উদ্বিগ্ন মুখ আমার মুখের ওপর সর্বক্ষণ ঝুঁকে থাকে– সেই খানে যাই আমি।

সেখানে যাওয়ার পর কী করি ? মেরির সঙ্গে লুকিয়ে শারীরিক সময় কাটানোর জন্য নিজের সঙ্গে নিজেই বোঝাপড়া করি– নিজেকে জঘন্য পাপী বলে মনে হয়, নিজের কাছে করা প্রতিজ্ঞা ভাঙার জন্য গ্লানিতে ভুগি– তারপর ফের সয়ে যায় সবকিছু– পাপের গ্লানি কাটিয়ে উঠি ফের নতুন করে পাপ করার জন্য। পুরো ব্যাপারটা ঘটে একটা আশ্রয়ের নিচে– আমার এখনকার সময় পর্যন্ত জীবন ঐ আশ্রয়ের নিচে রয়ে গেছে। সেই আশ্রয়টা যদি না থাকে, তাহলে আমি কোথায় যাবো ? মেরি কি অমন আশ্রয় গড়ে তুলতে পারবে ? মানুষ অমন আশ্রয় একজীবনে কয়টা গড়তে পারে ? একটাই কি সবাই পারে ?

রায়হান প্রশ্নটা বারবার করে। তার মনের মধ্যে ছেলেদের মুখ বারবার দেখতে পায়। তার মনের ভেতরে কেউ যেন গম্ভীর গলায় বলে ওঠে, নাহ্– অসম্ভব।

সে বুঝে নেয়, তার কোনো ভবিষ্যত নেই। ঐ আশ্রয়ে যাবার পথ নিজের পাপ দিয়ে সে বন্ধ করে দিয়েছে। যদি সে মেরিকে অস্বীকার করে, তাহলেও তার ঐ পথ বন্ধ হয়েই থেকে যাবে– আর যদি মেরির সঙ্গী হয়, তাহলে তো ও পথ বন্ধ হয়ে রয়েছে।

ন'টা বাজলে ফের টেলিফোনের রিং বেজে ওঠে। কিন্তু সে রিসিভার তোলে না। কারণ তার অনুমান হয়, বীথির টেলিফোন, তার ফিরতে দেরি হচ্ছে দেখে সে খবর নিতে চাইছে। সে দেরি না করে তার কামরা থেকে বেরিয়ে পড়ে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

রাস্তায় নেমে সে রিকশা নেয় না, হাঁটে। আগস্টের মেঘ চাপা আকাশ, তারা দেখা যায় না, কেমন ধোঁয়াটে লাগে দেখতে। কখন যে বৃষ্টি নামবে বলা যায় না– ইতিমধ্যে বিকেলের দিকে এক পশলা হয়ে গেছে, পথঘাট এখনও ভেজা। গাছতলা দিয়ে যাবার সময় কয়েক ফোঁটা পানি ঝরে পড়লো মাথার ওপর। এ বছর জুন-জুলাইতে বৃষ্টি বলতে হয় নি, খবরটা কাগজে বেরিয়েছিলো, আগস্টে নাকি জোরে বৃষ্টি হবে।

দেখতে দেখতে ডিআইটির মোড়ে পৌঁছতেই ঝিরিঝিরি বৃষ্টি শুরু হয়ে গেলো। তখন সে ডাইনে বাঁয়ে তাকায়। কিন্তু রিকশা খোঁজার চেষ্টা তার বিফলে যায়– খালি রিকশা সে ডাইনে বাঁয়ে, সামনে পিছনে দেখে না। একটু পরই বৃষ্টি নেমে যায় ঝমঝমিয়ে। সে ফের ডাইনে বাঁয়ে তাকায়, কিন্তু জায়গাটা এমন যে কোথাও আড়াল নেওয়ার জায়গা নেই।

যখন বাসার দোরগোড়ায় পৌঁছলো, তখন একেবারে পানিতে চুবানো অবস্থা তার। বীথি দরজা খুলেই আঁৎকে ওঠে। বলে, এ কী অবস্থা তোমার, এভাবে ভিজেছো কেন? সে হাত ধরে টেনে ঘরের ভিতরে ঢোকায়। তারপর ছুটে গিয়ে তোয়ালে লুঙ্গি নিয়ে আসে। খাওয়ার ঘরে চেয়ারে বসিয়ে তোয়ালে দিয়ে মাথা মুখ মোছে– তারপর শার্ট প্যান্ট-এর বোতাম খোলে। শার্ট গেঞ্জি খোলা হলে, লুঙ্গিটা মাথার ওপর গলিয়ে কোমরে জড়িয়ে বেঁধে প্যান্টের দুই পা ধরে টান লাগায়। ঐ সব করতে করতে সারাটাক্ষণ সে বকবক করে যায়। বলে, বুড়ো হয়ে গেলে কিন্তু তোমার ছেলেমানুষিটা গেলো না– এভাবে কেউ ভেজে? ভদ্রমাসের বৃষ্টিতে ভিজলে জ্বর হয় শোনো নি? তোমার যে হার্টের অসুখ সে খেয়াল আছে? ঠাণ্ডা লাগলে খুব ঝামেলা হবে সে কথা বলে নি তোমাকে ডাক্তার? বলো, বলে নি? তাহলে?

তার কথায় যত না শাসন তার চাইতে মমতা বেশি ঝরে। আর সে জন্যেই কি না কে জানে, কী যেন হয় রায়হানের। সে হাত দিয়ে বীথিকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। বলে, বাদ দাও তো ওসব প্যানপ্যানানি, আমার ভালো লাগে না।

কেন বাদ দেবো? তোমার অসুখ হলে কষ্টটা কার হবে?

হলে আমার হবে। রায়হান ভয়ানক বিরক্ত হয়ে বলে, আমার অসুখ হলে সেটা আমি বুঝবো।

শুধু তোমার কষ্ট হবে, শুধু তুমি বুঝবে? এ কী বলছো তুমি?

বীথি অবাক হয়ে স্বামীর বিরক্ত মুখের দিকে তাকায়।

আমি ঠিকই বলছি, রায়হান শোবার ঘরের দিকে যেতে যেতে বলে, আমাকে কিছুক্ষণ একা থাকতে দাও, সব সময় তোমার আদিখ্যেতা ভালো লাগে না।

দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে তখন দুই ছেলে। বাবা মায়ের মধ্যে এমন রাগারাগির ঘটনা তারা জীবনে প্রথম দেখছে। বীথি দুই ছেলের চোখমুখের ভাব দেখে বলে, তোমাদের এখানে থাকার দরকার নেই, তোমরা নিজেদের ঘরে যাও।

কথাটা বলার পরও সে ছেলেদের দিকে তাকিয়ে থাকে, যতক্ষণ না ওরা চোখের আড়াল হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ছেলেরা চলে যাবার পর সে ঘরের দরজা বন্ধ করে। তারপর স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর বলে, এখন খাওয়া-দাওয়া করবে তো ? নাকি সেটাও করবে না।

রায়হান স্ত্রীর মুখের দিকে তাকায়। বীথির দু'চোখে সে সারাজীবনের বিশ্বাস আর ভালোবাসা একাগ্র হয়ে থাকতে দেখে। বেশিক্ষণ সে ঐ মেলে ধরা চোখের দিকে চোখ রেখে তাকাতে পারে না, চোখ নামিয়ে নিতে হয়। তারপর শান্ত গলায় বলে, চলো, খেতে যাই।

খেতে বসে, কিন্তু পারে না। পাতের ভাত পাতেই থেকে যায়। তাতে বীথির উদ্বেগ বাড়ে। জিজ্ঞেস করে, শরীর খারাপ লাগছে ? খাচ্ছো না কেন ?

রায়হান কোনো কথা না বলে উঠে পড়ে। ঘাড়ে রাখা তোয়ালে দিয়ে তখন ঘন ঘন কপাল ঘাড় মুখ মুছছিলো। ঘামতে ঘামতে সে শোবার ঘরে এসে ড্রেসিং টেবিলটার পাশে দাঁড়ায়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আবার ঘাম মোছে। বীথি লক্ষ্য করে ঘামে ভিজে তার গেঞ্জি গায়ের সঙ্গে লেপ্টে গিয়েছে। সে বলে, তুমি এমন ঘামছো কেন ? তোমার কী হয়েছে ?

রায়হান মুখ নিচু করে রাখে। নিজের ভিতরকার উত্তেজনা সামাল দেয়ার জন্য ঠোঁট কামড়ে ধরে রাখে কিছুক্ষণ। তারপর ঝাঁকি দিয়ে মুখখানা তুলে বীথির দিকে তাকায় মুহূর্তের জন্য, শেষে নজর দেয়ালের দিকে সরিয়ে বলে, আমাকে আবার বিয়ে করতে হবে।

বীথি শুনতে পায়, কিন্তু ঠিক বুঝতে পারে না। সে পাল্টা জিজ্ঞেস করে, কী বললে ?

আমাকে বিয়ে করতে হবে। রায়হান এবার স্পষ্ট করে মুখোমুখি তাকিয়ে বলে।

কী-ঈ ? বীথির চোখে মুখে গলার স্বরে কৌতুক আর উদ্বেগ মেশামিশি হয়ে যায়।

হ্যাঁ, রায়হান ফের বলে, মেরি ওর হাজবেন্ডকে ডিভোর্স করবে। তারপর বিয়ে হবে আমাদের– এখন ও প্রেগন্যান্ট– এছাড়া উপায় নেই।

বীথি পাথরের মতো স্থির হয়ে যায়। তার চোখের পলক পড়ে না– বিছানার কোণে যেভাবে বসেছিলো, সেইভাবেই বসে থাকে।

রায়হান বীথির দিকে তাকাতে পারে না। তার মাথা ঝিমঝিম করে। ঘরের ভেতরটা হলুদ হয়ে যাচ্ছে কেন, সে বুঝতে পারে না। হাত বাড়িয়ে সুইচ টিপে ঘরের বাতি নিভিয়ে দিয়ে বলে, শোনো, আমি মেরির সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছি, জানি আমাকে তোমার ঘেন্না হবে, তবু তোমাকে কথাটা বললাম। আমি না বললে মেরি নিজেই তোমাকে কথাটা বলতো। ও এ্যাবরশন করতে চায় না– হয়তো আমাকে ফাঁদে ফেলবার জন্যই– আমি ঠিক জানি না– তবু আমার উপায় নেই, বুঝেছো ? ইচ্ছা করলে তুমি আমাকে ডিভোর্স করতে পারো, শুনছো ?

বীথি একইভাবে বসে থাকে। নিঃশ্বাস নিচ্ছে কি না তাও বোঝা যায় না। ঘরের ভেতরে অন্ধকার আর নিঃশব্দতা অন্ধকার ভারী হয়ে ওঠে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

রায়হানের মনে হচ্ছিলো, কথাটা বলা হয়ে গেলে সে হালকা বোধ করবে, তখন সে সব কিছু ছেড়ে দেবে ভাগ্যের হাতে– যা হবার, হবে। কিন্তু এখন দেখছে, বীথির অমন চুপ হয়ে থাকার পীড়ন আরও বেশি অসহ্য। সে অন্ধকারের মধ্যে চিৎকার করে ওঠে, চুপ করে আছো কেন ? কিছু বলবে তো ? তোমার কী বলার আছে, বলো।

আরও হয়তো কিছু বলতো– কিন্তু গলায় জোর আনতে পারে না সে। বুকের ভেতরটা কোনো জানোয়ার যেন হঠাৎ খামচে ধরে। তার দম বন্ধ হয়ে আসতে চায়– হাঁটু দুটো তার শরীরের ভার ধরে রাখতে পারে না। অগত্যা তাকে বসে পড়তে হয়। বুকের বাঁ দিকটা ধরে সে মুখ মেলে নিঃশ্বাস নিতে থকে। ঐভাবে হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, আমাকে একটু পানি দাও, শুনছো ? একটু পর ফের বলে, টেবিলের ওপরে শিশিটা আছে, একটা ট্যাবলেট দাও।

রায়হান আরও কয়েক মিনিট ঐভাবে হাঁপাতে হাঁপাতে নিঃশ্বাস নেয়। ঐ অবস্থায় সে ফের বীথিকে ডেকে বলে, ফ্যানটা একটু বাড়িয়ে দাও। কিন্তু এবার তার কথা কারোর কানে যায় কি না বোঝা যায় না– কারণ তার সব কথাই তখন গোঙানির মতো শোনাচ্ছিলো।

বীথি তখনও একইভাবে স্থির বসে। কিছু শোনে কিনা, কিছু দেখে কি না, আন্দাজ করা মুশকিল। রায়হান আর একবার উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হলে, হামা দিয়ে টেবিলের দিকে এগোতে চেষ্টা করে। কিন্তু তা-ও না পারলে সে গড়িয়ে চিৎ হয়ে যায় এবং ঘন ঘন শ্বাস নিতে হয় তাকে। যথেষ্ট বাতাস ফুসফুসে যাচ্ছে না বলে সে ফের চিৎকার করে ডেকে ওঠে– বীথিকে, রঞ্জুকে, মঞ্জুকে, টুকুকে এক এক করে। শেষে শুধুই বীথিকে।

ঐ মুহূর্তে বীথির শরীরে ঝাঁকুনি দিয়ে তার গলায় একটা তীব্র চিৎকার উঠে আসে। সে দ্রুত উঠে দাঁড়ায়, তারপর প্রথমে সুইচ টিপে বাতি জ্বালায়। শেষে চিৎকার করে ডাকে মঞ্জু আর টুকুর নাম ধরে।

রাত তখন প্রায় ১২টা। দু'বাড়ি পরই ডাক্তার করিমের বাড়ি। টুকু ছুটে বেরিয়ে যায়। মঞ্জু বড় ভাইকে খবর দেয়ার জন্য হোস্টেল সুপারের অফিসে ফোন করার খামোকা চেষ্টা করে কয়েকবার। বীথি প্রথমে মানুষটাকে টেনে খাটের ওপর তোলে তারপর মুখে পানি দেয়। শেষে কৌটাটা খুলে নাইট্রো গ্লিসারিনের ট্যাবলেট এ্যানজাইসেড রায়হানের জিভের নিচে রাখে।

অনেক রাত হওয়া সত্ত্বেও টুকু ডাক্তার করিমকে ধরে নিয়ে আসতে পারে। কারণ রায়হানের সঙ্গে তাঁর ভালো চেনাজানা এবং টুকু তাঁর ছোট ছেলে হিমনের সঙ্গে পড়ে। ডাক্তার তাঁর স্টেথি'র মুখ বুকের ওপর বসিয়ে, পেটের ওপর হাত রেখে তাতে আর এক হাতের বাড়ি মেরে আওয়াজ তুলে যা যা দেখবার আর বুঝবার তা দেখলেন, বুঝলেন। শেষে বেশ উদ্বেগের সঙ্গেই বললেন। শিগগির হাসপাতালে নিয়ে যান। এক্ষুণি, একটুও দেরি করা চলবে না।

বলতে বলতে উনি নিজেই টুকুর হাত ধরে বাইরে বেরিয়ে গেলেন এবং তার মিনিট পাঁচেক পরই বেবিট্যাক্সির আওয়াজ শোনা গেলো, সিঁড়ির দরজায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

তারপর আলমারি খুলে টাকা-পয়সা ব্যাগে ভরে নিতে আর পুরনো মেডিক্যাল রিপোর্ট প্রেসক্রিপশনগুলো গুছিয়ে নিতে যা দেরি।

সারাটা পথ টেনে টেনে নিঃশ্বাস নিতে নিতে রায়হান মাথাটা কখনো ডাইনে হেলায়, কখনো বাঁয়ে। আর থেকে থেকেই বলে, আমি মারা যাচ্ছি, তুমি আমাকে মাফ করে দিও। আমি সব কিছু হারিয়েছি, আমার কোনো স্মৃতিও থাকবে না।

ঘাড়ের ওপর স্বামীর মাথা রাখা দেখতে দেখতে আর ঐ ধরনের কথা শুনতে শুনতে বীথির বুকের ভেতরটা একেকবার হিম হয়ে যায়। একেকবার আবার বুকের ভেতর থেকেই প্রশ্ন করে যেন কেউ, সত্যিই কি মরে যাবে? একেবারে মরে যাবে?

বীথি মানুষটার কপাল দেখছিলো, চিবুক দেখছিলো, ঠোঁট দু'খানি দেখছিলো– তারপর হাতের মধ্যে হাত নিয়ে তার হাতের তেলো দেখছিলো, আঙুল দেখছিলো। আর মনে মনে হিসেব করছিলো– এই শরীরের প্রতি ইঞ্চি তার চেনা। এই শরীরের উত্তাপ, গন্ধ, স্পর্শ, রস সবই তার শরীরের সঙ্গে মিলেমিশে রয়েছে। বছরের হিসেব তার মনে আসে না। মনে হয় হাজার হাজার বছর ধরে এই শরীর আর তার ভেতরকার মানুষটা তার সঙ্গে মিলেমিশে আছে। সেই মানুষটা সত্যি সত্যি মরে যাচ্ছে? যতবার রায়হান বলে, আমাকে তুমি মাফ করে দিও, আমি মারা যাচ্ছি। আর বলার সময় তার গাল বেয়ে চোখের পানি যতোবার গড়াতে দেখে, ততবারই সে মানুষটার মুখের দিকে তাকায় শুধু– তার মুখ দিয়ে কোনোরকম সান্ত্বনা বা আশ্বাস বা ভালোবাসা, কিছুই বের হয় না। কীভাবে বের হবে, বুকের ভেতরকার অচেনা স্বরের প্রশ্নটা তখনও হয়ে চলেছে, সত্যি সত্যি মরে যাবে তুমি? এখানে এই ছুটন্ত গাড়ির মধ্যেই? হাসপাতালে পৌছানোর আগেই?

বাইশ

হাসপাতালে পৌছাতে খুব বেশি সময় লাগে নি, কিন্তু বীথির মনে হচ্ছিলো, যেন অনন্তকাল। সোহরাওয়ার্দি হাসপাতালের এমারজেন্সি এক অদ্ভুত জায়গা। এমনিতে তো ৩/৪ ধাপ সিঁড়ি বেয়ে বারান্দায় ওঠার সময়ই দেখা গেলো, টিউব একবার জ্বলছিলো একবার নিভছিলো, তারপর মিনিটখানেক দাঁড়াতে না দাঁড়াতে রাজ্যের মশা একেবারে ছেঁকে ধরলো। যে তরুণ ডাক্তারটি ডিউটিতে ছিলো, রোগীর অবস্থা দেখে সঙ্গে সঙ্গে অক্সিজেন দেবার জন্য ডাকাডাকি শুরু করে দিলো। অক্সিজেন সিলিন্ডার আনা হলো। কিন্তু দেখা গেলো মাস্ক নেই। তখন আর কী করা, নলটা নাকের ফুটোয় ঢুকিয়ে গাল আর নাকের ওপর টেপ দিয়ে আটকে দেয়া হলো। ইসিজি করার সময় দেখা গেলো মেশিনখানি বেঠিক। রোগীর জামা খুলে বুকে হাতে পায়ে নলের লীডগুলো বসিয়ে দেয়ার পর দেখা গেলো, মেশিন চলে না। টেকনিশিয়ান তখন জোরে জোরে মেশিনের গায়ে দু'হাতে থাপ্পড় মারলে তবে চালু হলো মেশিন। ঐভাবে চালু করা মেশিনের ভেতর থেকে ফর্দের মতো যে লম্বা কাগজ বেরুলো তার ওপরকার নক্সার ছাপ দেখে ডাক্তার যেন নড়ে-চড়ে উঠলো। খুব জোরগলায় ডাকাডাকি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

হাঁকাহাঁকি হলো, একখানা কাগজের ওপর কী কী যেন লিখলো তারপর একজনের হাতে কাগজখানা ধরিয়ে দিয়ে বললো, আইসিইউতে শিগগির নিয়ে যাও। কথাটার মানে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট। ডাক্তারের কথামতো রায়হানকে নিয়ে ট্রলিখানা গড়গড়িয়ে চললো ইনটেনসিভ কেয়ারের দিকে।

বীথি সারাটাক্ষণ পাশে দাঁড়িয়ে। সে সবকিছু দেখছিলো, যখন দেখলো, ট্রলিখানা ক্রমেই দূরে চলে যাচ্ছে, তখন মনে হলো, শুধু তার কাছ থেকে নয়– রায়হান তার জীবন থেকেই যেন দূরে চলে যাচ্ছে। কোথায়, সে তখনও জানে না। মরণের দিকে কি ? তাও সে বলতে পারবে না– তবে রায়হানকে যে সে ফিরে পাবে না, সেটা সে টের পাচ্ছিলো– তার বুকের খুব ভেতরের দিকে কেউ অনবরত বলছিলো। আর ওকে পাবি না, ও চলে যাচ্ছে– হ্যাঁ, ও চলে যাচ্ছে– ওকে আর ফিরে পাবি না।

তার মনের ভেতরে ১৮/১৯ বছরের বীথি লুটিয়ে লুটিয়ে কাঁদে। যদি ও চলেই যাবে, তাহলে ঐ কথা কেন বললো, আমার স্মৃতি বলেও তো আর কিছু থাকবে না।

বীথি নজরে ধরে রেখেছিলো, এক সময় প্যাসেজের বাঁক ঘুরে ট্রলিখানা নজরের বাইরে চলে গেলো।

বড় ভাইকে নিয়ে মেডিক্যাল হোস্টেল থেকে যখন মঞ্জু সোহরাওয়ার্দিতে পৌঁছায় তখন রাত প্রায় দুটো। মাকে যেখানে যেভাবে বসিয়ে রেখে গিয়েছিলো এসে দেখে সেইখানেই, সেই একইভাবে মা বসে আছেন। সামনের দিকে নজর মেলে ধরা ছিলো, কিন্তু কিছু দেখছিলেন বলে মনে হয় না। মায়ের অমন উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা দেখে রঞ্জুর বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে। আব্বার আগের বার হার্টএ্যাটাক হওয়ার সময়ও মাকে দেখেছিলো সে। তখন তাঁর চোখেমুখে দুশ্চিন্তা ছিলো, উদ্বেগ ছিলো, কান্না ছিলো। কিন্তু আজ সে এ কী দেখছে ? মায়ের এমন চেহারা সে কোনোদিন দেখে নি– এমন নিঃস্ব, অসহায় আর পরাস্ত মা কখনও ছিলেন না। সে মায়ের ঘাড়ে হাত রেখে বলে আম্মা, ঘাবড়াবার মতো কিছু হয় নি, সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু অদ্ভুত কাণ্ড বীথির দিক থেকে কোনো রকম সাড় জাগে না। সে ছেলেকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ওঠে না, যেমন ছিলো, তেমনই পাথরের মতো স্থির হয়ে থেকে যায়। এমনকি চোখ মুখের ভাবেও কোনো হেরফের হতে দেখে না রঞ্জু। তাতে তার অনুমান হয়, আব্বার শরীর সম্ভবত সেরকম খারাপ হয়ে পড়েছিলো আজ, আর সেই ধাক্কাটা মা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেননি।

ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটের দরজা পার হয়ে ভেতরে উঁকি দিয়ে দেখে রঞ্জু। দু'পাশে দু'খানা করে বিছানা। অন্য তিনজনের মতো আব্বাকেও মনে হয় ঘুমোচ্ছেন। দেয়ালের সঙ্গে লাগানো ইসিজি মেশিনের পর্দায় হার্টবিট দেখানোর সবুজ আলোর ফোঁটা ঠিক মতোই লাফিয়ে চলেছে বলে তার মনে হয়। সে রোগীর খবর নেবার জন্য ডিউটি সিস্টারের কাছে গিয়ে নিজের পরিচয় দেয় প্রথমে। মেডিক্যালের ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র জানতে পেরে সিস্টার তাকে হেলা করতে পারে না, তারপর যখন আব্বার পরিচয় দেয়, তখন মহিলা একেবারে ঘুরে বসেন। মহিলা খাতা খুলে চোখ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বুলিয়ে নেন একবার, তারপর বলেন, উনি তো এখন ভালো আছেন– ঘুমোচ্ছেন– চিন্তার কিছু নেই।

কোনো কিছু ড্যামেজ হয় নি তো?

মহিলা খাতার দিকে আর একবার নজর রেখে বলেন, ওঁর লেফট ভেন্ট্রিকুলের কিছুটা ট্যায়ালুট তো আগের বারই হয়ে গিয়েছিলো– এবার নতুন কী হয়েছে তা কাল ডাক্তার বলতে পারবেন ইনভেস্টিগেশনের পর, আপনারা বাসায় চলে যান– এখানে যা মশা। কাল সকালে এলেও হবে, যা ওষুধ দেয়া হয়েছে তাতে তাঁর ঘুম থেকে জাগতে জাগতে বেলা আটটা বেজে যাবে।

মঞ্জু মায়ের কাছে ফিরে আসে। বীথি তখনও একই ভঙ্গিতে বসে। বড় ছেলে গা ঘেঁসে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসলেও সে মুখ ফেরায় না। বুঝতে পারে, বাপের কখন কী হয়েছিলো, কীভাবে হয়েছিলো, সে সব ছেলে জানতে চাইছে। কিন্তু সে কি ছেলেদের কাছে নিজের মুখে উচ্চারণ করে বলতে পারে সে ঘটনার কথা? সে খুব ভালোমতো জানে, কোন কারণে রায়হান অস্থির হয়েছিলো– কোন কারণে সে গতকাল থেকে বাইরে বাইরে সময় কাটিয়েছে, বাসায় ফিরে কেন মেজাজ করেছিলো প্রথমে– সবই সে জানে। এমনকি মেঝেতে পড়ে থাকবার সময় কী বলছিলো, তাও তার স্পষ্ট মনে আছে। সে সব ঘটনার কথা কি সে বলবে? বলবে কি যে তোমাদের বাবা অন্য এক মহিলার সঙ্গে মেলামেশা করেন– সেই মহিলা তার ছেলেমেয়ে সংসার ফেলে দিয়ে তোমার বাবার সঙ্গে থাকতে চান, তোমার বাবার এখন তাঁকে বিয়ে না করে উপায় নেই– কারণ মহিলার পেটে বাচ্চা, তোমার বাবার উপহার। এসব কথা কি সে বলবে? যদি বলে, তারপর কী হবে? সে তো ঠিক জানে না কী হবে। তবে ভয়ানক যে কিছু হবে, সেটা তো সে বোঝে।

আর যদি না-ই বলতে পারে, তাহলে কি তার চুপ করে থাকা উচিত নয়? বরং ছেলেরা অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝুক, বিশ্বাস কতো ঠুনকো জিনিস, সংসার কী রকম অর্থহীন একটা ব্যাপার, আর এও বুঝুক যে প্রয়োজনেই সম্পর্ক হয়, প্রয়োজন ফুরোলে সম্পর্কও আর থাকে না।

ওদিকে রাত ফুরিয়ে আসতে থাকে। রঞ্জু ভিজিটর্স রুমের চেয়ারে বসে বসে ঝিমোয়। রঞ্জুকেও ঝিমুনিতে পাচ্ছিলো, তাই সে পায়চারি করতে থাকে। ঐ পায়চারি করতে করতেই সে দু'তিনবার ইনটেনসিভ কেয়ার-এর ভেতরে ঢুকে বাবাকে দেখে আসে। একইভাবে শুয়ে আছেন, ঘুমিয়ে না জেগে, কিছুই আন্দাজ করা যায় না। প্রথম যখন দেখে, তখনকার মতোই, কোনোরকম হেরফের নেই।

শুধু বীথিরই ঘুম পায় না। সে চোখ মেলে একই ভঙ্গিতে বসে আছে, পিঠ চেয়ারে হেলানো। হাত দু'খানি কোলের কাছে, নজর সামনের দিকে মেলে ধরা, সামনে দেয়াল, তবু। একবারের জন্যেও সে মুখ খোলে নি। রঞ্জু একবার বলেছিলো, আম্মা, আপনি কথা বলুন, এভাবে চুপ করে আছেন কেন? জবাবে বীথি শুধু একবার ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলো। তারপরই নজর সরিয়ে নেয়। ব্যস ঐ টুকুই তার জবাব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বাইরে ভোর হচ্ছে তখন, কিন্তু ভোরের আলো, কি পাখিদের ডাকাডাকি, কি মানুষের কথা বা রাস্তা দিয়ে গাড়ি চলার আওয়াজ, পাশের ওয়ার্ডের লোকেরা শুনতে পেলেও আইসিইউ-এর ভেতরে কেউ কিছু টের পায় না। এক সময় খুবই নিচু গলায় কিছু স্বর রায়হানের কানে আসে। কারা অনেক দূরে থেমে থেমে কী যেন বলে চলেছে। চোখ মেললে সে শাদা ছাদ দেখতে পায়। বিছানাটা অন্যরকম লাগছে দেখে সে দু'পাশে তাকায়। বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, সে হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে আছে। একটু দূরে নার্সকে হেঁটে যেতে দেখে সে ডেকে ওঠে, সিস্টার বকুল! তার ডাকে সিস্টার সাড়া না দিলে তার সন্দেহ হয়। সিস্টার বকুল বোধ হয় ডিউটি সেরে চলে গেছে। এ অন্য কোনো সিস্টার। এখন কি তাহলে সন্ধ্যা ? ডাক্তার জালাল কি আসবেন আজ! ভদ্রলোক যে কী করেন, কতোদিন হলো সে হাসপাতালে এসেছে অথচ রিলিজ দেবার নাম নেই। নজর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে দেখতে তার হুঁশ হয়– এ তো ওয়ার্ড কিংবা কেবিন নয়। ইনটেনসিভ কেয়ার– এ কেন সে ? এখানে তাকে কখন আনা হলো ? অদ্ভুত কাণ্ড তো সে ফের সিস্টারকে গলা উঁচিয়ে ডাকে, গলার স্বর বেশ উঁচিয়ে।

তার চিৎকার শুনে ডিউটির সিস্টার প্রায় ছুটতে ছুটতে আসে। এসে জিজ্ঞেস করে, কী হয়েছে– কষ্ট হচ্ছে কোথাও ? রায়হান সিস্টারের মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, সিস্টার বকুল কোথায় গেলেন ? ওঁর আজ ডিউটি নেই ? নার্সটি সম্ভবত নতুন বদলি হয়ে এসেছে, সে হাসিমুখে বলে, আমি এখানে নতুন এসেছি, সিস্টার বকুল নামে কেউ আছে বলে শুনিনি– আপনার বোধহয় ভুল হচ্ছে।

রায়হান ফের চোখ বোঁজে। সত্যিই কি তার ভুল হচ্ছে ? সে মাথা নাড়াতে চেষ্টা করে– নাহ্ ভুল কেন হবে তার ? ফের সে জানতে চায়। বলে, সিস্টার ইনটেনসিভ কেয়ার-এ আমাকে কখন আনা হলো ?

তার রীতিমতো চিন্তা হয়, হাসপাতাল থেকে রিলিজ হতে যদি দেরি হয়, তাহলে মোহনগঞ্জ রওনা হতে আরও দেরি হবে– ওদিকে শাহাব অপেক্ষা করে থাকবে, বেচারা লোক পর্যন্ত পাঠিয়েছে। সেবার যেতে পারে নি– এবারও কি ঐ একই কথা লিখে পাঠাবে যে, আমার যেতে দেরি হবে!

বীথির খুব ইচ্ছে, সে যেন আর একবার যায়। একবার গিয়ে খালি হাতে ফিরে এসেছে, তাই বলে পরের বারও যে খালি হাতে ফিরতে হবে এমন তো নাও হতে পারে! সে স্মৃতিতে মোহনগঞ্জের দু'সারি আম গাছের মাঝখান দিয়ে যাওয়া রাস্তা দেখে। রাজার দীঘি দেখে, করোনেশন স্কুল দেখে– দেখতে দেখতে ভোর সকালের রেলস্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকার ঘটনাটা স্মরণ করে– তারপর হঠাৎ রঞ্জুর কথা মনে পড়ে যায়। আর তাতে সে রঞ্জু রঞ্জু বলে ডাকাডাকি আরম্ভ করে দেয়। বলে, রঞ্জু দেখো তো, আমার চশমাখানা ব্যাগে দেখছি না কেন– রঞ্জু ও রঞ্জু।

এই তো আব্বা, আমি এখানে, কিছু বলবে ?

রায়হান নজর ফিরিয়ে দেখে আর অবাক হয়। রঞ্জু বেশ বড় হয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে কেন ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

রঞ্জু এসে হাত ধরলে রায়হান গভীর স্বস্তিতে চোখ বোঁজে। তারপর বোঁজা চোখেই বলে, আমাকে এখানে কখন আনলো ? বেশ ভালোই তো ছিলাম জেনারেল ওয়ার্ডে।

রঞ্জু বাপের বিড়বিড়ানি স্পষ্ট বুঝতে পারে না– তবে অনুমান করে আব্বার মগজে পুরনো কোনো স্মৃতি জোরালো হয়ে ভেসে উঠেছে। সে বলে, তুমি কথা বলো না আব্বা– আম্মা সারারাত জেগে বসে আছেন, তুমি ওঁকে বাসায় যেতে বলো।

রায়হান চোখ মেলে তাকায়। তার মগজে সময়ের হুঁশ ফিরে আসে। ছুটন্ত বেবি ট্যাক্সি থেকে কি তাকে সোজাসুজি এখানে নিয়ে আসা হয়েছে ? সে মাঝখানে বসেছিলো। ডাইনে ছিলো মঞ্জু, বুকের বাঁ দিকে অসহ্য ব্যথা হচ্ছিলো তখন।

রায়হানের মগজের ভেতরকার ঝাপসা পর্দাগুলো একে একে সরে যায়। হ্যাঁ, স্পষ্ট স্মরণ করতে পারে, পোস্টটা লেখা শেষ করেছিলো শেষ পর্যন্ত। আমানউল্লাহ কি চীফ এডিটর সত্যি সত্যি হয়ে যাচ্ছেন ? ঐ একই সঙ্গে আর একখানা পর্দা সরে যায়। দেখতে পায় একখানা মুখ, এলোমেলো শুকনো চুলে ঘাড়-মুখ-কপাল সবই ঢাকা– ঘাড়, পিঠ, বাহুমূল, বুকের ঝুলেপড়া মাংসপিণ্ড দু'টি– থেকে থেকে খিলখিল করে হেসে উঠছে। বলছে, কি ? কেমন লাগলো, ভালো ? একেবারে খোলামেলা– পুরোপরি নিরাবরণ– তার হাসি, তার শরীর, তার কথা, সব সে দেখতে আর শুনতে পায়। কিন্তু বেশিক্ষণ না, ফের ঝাপসা হয়ে যায় এবং হঠাৎ তার গরম লাগতে শুরু করে। বুকের ওপর কী রকম একটা ভার চেপে বসে। সে মাথাটা ডাইনে বাঁয়ে করে কয়েকবার শিয়রের পেছনে দেয়ালে লাগানো যন্ত্রে পী-ঈ-ঈ শব্দ শুরু হয়ে যায়। তাঁর নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়।

আওয়াজটা সম্ভবত সিস্টারের কানে পৌছায় এবং তার চোখেও পড়ে রোগীর অস্থিরতাটা। ছুটে এসে অক্সিজেনের মাস্কটা নাকের ওপর বসিয়ে দিতে সে দেরি করে না।

ঠিক ঐ সময় মাকে সঙ্গে নিয়ে রঞ্জু দরজার কাছে পৌছেছিলো। তাদের দেখে সিস্টার চাপা গলায় বলে উঠলো, এখন না, এখন আসবেন না, রোগীর অবস্থা ভালো না– পরে আসুন। মা-ছেলে দু'জনকেই দরজার মুখে দাঁড়িয়ে পড়তে হয়। বীথি দূর থেকে উঁচু বিছানায় শোয়া মানুষটাকে দেখে। তার বুকের ভেতরকার শক্ত পাথরটা আরও ভারী হয়ে যায়। সে তাহলে আর কখনোই মানুষটার কাছে যেতে পারবে না। গতকাল থেকে সেই যে দূরে চলে যাওয়া শুরু হয়েছে, সেই দূরে যাওয়ার তাহলে আর শেষ নেই– দূরত্বটা তাহলে সারাজীবনের জন্য স্থায়ী হয়ে গেলো ?

সে রঞ্জুকে ডাকে, রঞ্জু, চলো আমরা এবার যাই।

রঞ্জু অবাক হয়। বলে, কোথায় ?

তার তখন ভয়ানক দুশ্চিন্তা, আব্বার শরীর ঘন ঘন খারাপ হচ্ছে কেন ? প্রেসার বাড়ছে বলে সমস্যা হচ্ছে, না হার্টবিট-এ গোলমাল, যথেষ্ট অক্সিজেন যাচ্ছে না হার্টে– কোনটা ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বাইরে ভোর হচ্ছে তখন, কিন্তু ভোরের আলো, কি পাখিদের ডাকাডাকি, কি মানুষের কথা বা রাস্তা দিয়ে গাড়ি চলার আওয়াজ, পাশের ওয়ার্ডের লোকেরা শুনতে পেলেও আইসিইউ-এর ভেতরে কেউ কিছু টের পায় না। এক সময় খুবই নিচু গলায় কিছু স্বর রায়হানের কানে আসে। কারা অনেক দূরে থেমে থেমে কী যেন বলে চলেছে। চোখ মেললে সে শাদা ছাদ দেখতে পায়। বিছানাটা অন্যরকম লাগছে দেখে সে দু'পাশে তাকায়। বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, সে হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে আছে। একটু দূরে নার্সকে হেঁটে যেতে দেখে সে ডেকে ওঠে, সিস্টার বকুল! তার ডাকে সিস্টার সাড়া না দিলে তার সন্দেহ হয়। সিস্টার বকুল বোধ হয় ডিউটি সেরে চলে গেছে। এ অন্য কোনো সিস্টার। এখন কি তাহলে সন্ধ্যা ? ডাক্তার জালাল কি আসবেন আজ! ভদ্রলোক যে কী করেন, কতোদিন হলো সে হাসপাতালে এসেছে অথচ রিলিজ দেবার নাম নেই। নজর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে দেখতে তার হুঁশ হয়– এ তো ওয়ার্ড কিংবা কেবিন নয়। ইনটেনসিভ কেয়ার– এ কেন সে ? এখানে তাকে কখন আনা হলো ? অদ্ভুত কাণ্ড তো সে ফের সিস্টারকে গলা উঁচিয়ে ডাকে, গলার স্বর বেশ উঁচিয়ে।

তার চিৎকার শুনে ডিউটির সিস্টার প্রায় ছুটতে ছুটতে আসে। এসে জিজ্ঞেস করে, কী হয়েছে– কষ্ট হচ্ছে কোথাও ? রায়হান সিস্টারের মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, সিস্টার বকুল কোথায় গেলেন ? ওঁর আজ ডিউটি নেই ? নার্সটি সম্ভবত নতুন বদলি হয়ে এসেছে, সে হাসিমুখে বলে, আমি এখানে নতুন এসেছি, সিস্টার বকুল নামে কেউ আছে বলে শুনিনি– আপনার বোধহয় ভুল হচ্ছে।

রায়হান ফের চোখ বোঁজে। সত্যিই কি তার ভুল হচ্ছে ? সে মাথা নাড়াতে চেষ্টা করে– নাহ্ ভুল কেন হবে তার ? ফের সে জানতে চায়। বলে, সিস্টার ইনটেনসিভ কেয়ার-এ আমাকে কখন আনা হলো ?

তার রীতিমতো চিন্তা হয়, হাসপাতাল থেকে রিলিজ হতে যদি দেরি হয়, তাহলে মোহনগঞ্জ রওনা হতে আরও দেরি হবে– ওদিকে শাহাব অপেক্ষা করে থাকবে, বেচারা লোক পর্যন্ত পাঠিয়েছে। সেবার যেতে পারে নি– এবারও কি ঐ একই কথা লিখে পাঠাবে যে, আমার যেতে দেরি হবে!

বীথির খুব ইচ্ছে, সে যেন আর একবার যায়। একবার গিয়ে খালি হাতে ফিরে এসেছে, তাই বলে পরের বারও যে খালি হাতে ফিরতে হবে এমন তো নাও হতে পারে। সে স্মৃতিতে মোহনগঞ্জের দু'সারি আম গাছের মাঝখান দিয়ে যাওয়া রাস্তা দেখে। বাজার দীঘি দেখে, করোনেশন স্কুল দেখে– দেখতে দেখতে ভোর সকালের রেলস্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকার ঘটনাটা স্মরণ করে– তারপর হঠাৎ রঞ্জুর কথা মনে পড়ে যায়। আর তাতে সে রঞ্জু রঞ্জু বলে ডাকাডাকি আরম্ভ করে দেয়। বলে, রঞ্জু দেখো তো, আমার চশমাখানা ব্যাগে দেখছি না কেন– রঞ্জু ও রঞ্জু।

এই তো আব্বা, আমি এখানে, কিছু বলবে ?

রায়হান নজর ফিরিয়ে দেখে আর অবাক হয়। রঞ্জু বেশ বড় হয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে কেন ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

রঞ্জু এসে হাত ধরলে রায়হান গভীর স্বস্তিতে চোখ বোঁজে। তারপর বোঁজা চোখেই বলে, আমাকে এখানে কখন আনলো ? বেশ ভালোই তো ছিলাম জেনারেল ওয়ার্ডে।

রঞ্জু বাপের বিড়বিড়ানি স্পষ্ট বুঝতে পারে না– তবে অনুমান করে আব্বার মগজে পুরনো কোনো স্মৃতি জোরালো হয়ে ভেসে উঠেছে। সে বলে, তুমি কথা বলো না আব্বা– আম্মা সারারাত জেগে বসে আছেন, তুমি ওঁকে বাসায় যেতে বলো।

রায়হান চোখ মেলে তাকায়। তার মগজে সময়ের হুঁশ ফিরে আসে। ছুটন্ত বেবি ট্যাক্সি থেকে কি তাকে সোজাসুজি এখানে নিয়ে আসা হয়েছে ? সে মাঝখানে বসেছিলো। ডাইনে ছিলো মঞ্জু, বুকের বাঁ দিকে অসহ্য ব্যথা হচ্ছিলো তখন।

রায়হানের মগজের ভেতরকার ঝাপসা পর্দাগুলো একে একে সরে যায়। হ্যাঁ, স্পষ্ট স্মরণ করতে পারে, পোস্টটা লেখা শেষ করেছিলো শেষ পর্যন্ত। আমানউল্লাহ কি চীফ এডিটর সত্যি সত্যি হয়ে যাচ্ছেন ? ঐ একই সঙ্গে আর একখানা পর্দা সরে যায়। দেখতে পায় একখানা মুখ, এলোমেলো শুকনো চুলে ঘাড়-মুখ-কপাল সবই ঢাকা– ঘাড়, পিঠ, বাহুমূল, বুকের ঝুলেপড়া মাংসপিণ্ড দু'টি– থেকে থেকে খিলখিল করে হেসে উঠছে। বলছে, কি ? কেমন লাগলো, ভালো ? একেবারে খোলামেলা– পুরোপরি নিরাবরণ– তার হাসি, তার শরীর, তার কথা, সব সে দেখতে আর শুনতে পায়। কিন্তু বেশিক্ষণ না, ফের ঝাপসা হয়ে যায় এবং হঠাৎ তার গরম লাগতে শুরু করে। বুকের ওপর কী রকম একটা ভার চেপে বসে। সে মাথাটা ডাইনে বাঁয়ে করে কয়েকবার শিয়রের পেছনে দেয়ালে লাগানো যন্ত্রে পী-ঈ-ঈ শব্দ শুরু হয়ে যায়। তাঁর নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়।

আওয়াজটা সম্ভবত সিস্টারের কানে পৌঁছায় এবং তার চোখেও পড়ে রোগীর অস্থিরতাটা। ছুটে এসে অক্সিজেনের মাস্কটা নাকের ওপর বসিয়ে দিতে সে দেরি করে না।

ঠিক ঐ সময় মাকে সঙ্গে নিয়ে রঞ্জু দরজার কাছে পৌঁছেছিলো। তাদের দেখে সিস্টার চাপা গলায় বলে উঠলো, এখন না, এখন আসবেন না, রোগীর অবস্থা ভালো না– পরে আসুন। মা-ছেলে দু'জনকেই দরজার মুখে দাঁড়িয়ে পড়তে হয়। বীথি দূর থেকে উঁচু বিছানায় শোয়া মানুষটাকে দেখে। তার বুকের ভেতরকার শক্ত পাথরটা আরও ভারী হয়ে যায়। সে তাহলে আর কখনোই মানুষটার কাছে যেতে পারবে না। গতকাল থেকে সেই যে দূরে চলে যাওয়া শুরু হয়েছে, সেই দূরে যাওয়ার তাহলে আর শেষ নেই– দূরত্বটা তাহলে সারাজীবনের জন্য স্থায়ী হয়ে গেলো ?

সে রঞ্জুকে ডাকে, রঞ্জু, চলো আমরা এবার যাই।

রঞ্জু অবাক হয়। বলে, কোথায় ?

তার তখন ভয়ানক দুশ্চিন্তা, আব্বার শরীর ঘন ঘন খারাপ হচ্ছে কেন ? প্রেসার বাড়ছে বলে সমস্যা হচ্ছে, না হার্টবিট-এ গোলমাল, যথেষ্ট অক্সিজেন যাচ্ছে না হার্টে– কোনটা ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বীথি ফের বলে, কী হলো, চলো!

রঞ্জুও জিজ্ঞেস না করে পারে না। বলে, কোথায় যাবেন?

কেন, বাসায়।

রঞ্জু মায়ের ভাবলেশহীন মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে। এমন চেহারা কেন হয়েছে মায়ের? আম্মা কি পাগল হয়ে যাচ্ছেন? রঞ্জুর বুকের ভেতর নতুন ভয় শিউরে ওঠে। সারাটা রাত কীভাবে বসে রইলেন, স্বাভাবিকভাবে তাঁর মুখ দিয়ে একটা কথাও বের হয় নি। তখন সিস্টার বলেছিলো, আব্বার অবস্থা ভালো, তবু। অথচ যখন নিজের চোখে দেখছেন আব্বার অবস্থা খারাপ, তখন কেমন সহজভাবে বলছেন, বাসায় যাবেন।

সে ভেবে পায় না এমন অদ্ভুত আচরণ কেন আম্মার।

রঞ্জুকে হাত ধরে বাইরের দিকে নিয়ে আসে বীথি। পেছনে পেছনে আসে মঞ্জু। বীথি মেজো ছেলেকেও বলে, চল বাসায় যাই আমরা।

মঞ্জু ভাইয়ের মুখের দিকে তাকায়। রঞ্জু মাথা নাড়িয়ে ইঙ্গিত করে মায়ের কথায় গুরুত্ব না দেয়ার। বলে, আর একটু থাকেন আম্মা, ডাক্তার আসতে তো দেরি নেই– ঘন্টা দু'য়েকের মধ্যেই এসে যাবেন– আব্বার অবস্থা ঠিক কী রকম, কী সমস্যা হয়েছে, সেটা না জেনে এখান থেকে যাওয়া কি ঠিক?

বড় ছেলের কথা বীথির কানে যায় না। সে বাইরের দিকে তাকিয়ে আকাশ দেখতে থাকে। মেঘে মেঘে কালো হয়ে আছে একেবারে, তার মনে হয়, একবার বৃষ্টি নামলে আর থামবে না। রাস্তার দু'দিকের গাছগুলো আরও লম্বা হয়েছে বলে তার মনে হয়, ঘনও। শিরিষ আর মেহগিনি– ওসব গাছ তিন বছরে এত বাড়ে? বাঁয়ে খানিক দূরে কোয়ার্টারগুলোর সামনের রাস্তায় কেড্‌স আর শর্টস পরা মাঝবয়সী তিন ভদ্রলোককে দৌড়াবার ভঙ্গিতে হাঁটতে দেখে বীথি। আর তাই দেখে মনে মনে বলে, আপনারা অনেকদিন বাঁচতে চান বোধহয়– তাই না? আপনাদের বাড়ির লোকেরাও নিশ্চয়ই অমনই চান– বাড়ির কর্তারা অনেকদিন বাঁচলে নানান সুবিধা। আমিও বলি, আপনারা অনেকদিন বেঁচে থাকুন। আর এমনভাবেই দৌড়ে বেড়ান সংসারের ওপর দিয়ে– শুধু দৌড়ানো কেন? নাচতেও তো পারেন– এক ঠ্যাং-এর নাচনও নাচুন প্রাণভরে। বাঁচুন কিংবা না বাঁচুন, নাচুন– যতদিন বাঁচুন, নাচুন–

শব্দ মেলাতে মেলাতে হাসি পাচ্ছিলো বীথির। সে পা বাড়িয়ে এগিয়েও যাচ্ছিলো। ঐ সময় রঞ্জুর বিপন্নগলার স্বর তার কানে এসে পৌঁছায়। আম্মা ওদিকে কোথায় যাচ্ছেন?

আম্মা, যাবেন না।

বীথিকে বহুকাল আগে এই ডাক শুনতে হয়েছিলো। বড় ভাই ডাকতে ডাকতে রাস্তায় বেরিয়ে এসেছিলেন। চিৎকার করে ডেকেছিলেন, বীথি যাস না, এভাবে যাস না– বীথি-ই-ই এভাবে যাওয়া ভালো নয়– যাস না।

অবিকল যেন সেই রকম ডাক বেরিয়ে আসছে রঞ্জুর গলা দিয়ে। সেদিন সে সমস্ত কিছু পেছনে ফেলে বেরিয়ে পড়েছিলো রায়হানের কাছে যাবার জন্য। আজ সে কার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

কাছে যাবার জন্য সামনের দিকে পা বাড়িয়েছে ? সামনে যে কোথাও যাবে, তেমন কোনো জায়গা নেই– কোনো জায়গার নাম সে কাউকে বলতে পারবে না। তাহলে ?

যেখানে সে আছে সেখানেই তাকে থেকে যেতে হবে।

বীথি দাঁড়িয়ে পড়ে। তার যাওয়া হয় না। মন তার বেরিয়ে পড়েছিলো, তবু শেষ পর্যন্ত সে পারে না। রঞ্জু ঘাড়ে হাত জড়িয়ে মাকে ফের হাসপাতালের ভিজিটর্স রুমের চেয়ারে নিয়ে গিয়ে বসায়।

'গণ একতা' অফিসের অবস্থা অল্প ক'দিনের মধ্যেই বেজায় বেহাল হয়ে পড়ে। আমজাদ সাহেবকে কোনোমতে ঠেকা দিয়ে চালানো হচ্ছিলো। সপ্তাহে-দু'সপ্তাহে একটা কি দুটো লেখা দিয়ে চাকরিটা টিকিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর পারা গেলো না।

অন্য কিছু নয়, সোজাসুজি কারণ হলো রায়হানের হাসপাতালে যাওয়া। ওদিকে সম্পাদক সাহেব দোনামনা করে দিন কয়েক কাটাবার পরে সরকারী চাকরি না নিয়ে গণ একতাতেই থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলে কী হবে, ফিরে এসে কাগজের দিকে মন দিতেই দেখলেন মহা ঘাপলা। লীডার রাইটার বলতে মাত্রই একজন, তা-ও সে আবার নতুন লোক। আমানউল্লাহ খান, যেভাবে চালান সেভাবে জাহিদ চলে। আমজাদ সাহেবের ভাই একদিন এসে জানিয়ে গেলো যে তার বড় ভাইয়ের ক্যানসার হয়েছে বলে সন্দেহ করছেন ঢাকার ডাক্তাররা, তাঁকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তবে সবচাইতে মারাত্মক খবর হলো রায়হান সাহেবের হার্টএ্যাটাক এবং তাঁকে বেড রেস্ট-এ থাকতে হবে দু'মাসের মতো। আপাতত হাসপাতালে, পরে বাসায়।

আমানউল্লাহ সাহেব মনমরা হয়ে পড়েছেন। তাঁর নতুন ক্যারিয়ারের ভাবনা চিন্তা আর উদ্যোগ আয়োজন সব কিছু ভেস্তে যাবার দশা। তাঁর বাড়তি দুশ্চিন্তার কারণ, মালিক পক্ষের যে ভদ্রলোক সরকারী দলের সঙ্গে ছিলেন, তিনি বোধহয় দিক বদল করছেন। প্রায়ই টেলিফোন করেন। বলেন, অপজিশনের খবর কম কেন আমাদের কাগজে ? শুধু খবরই নয়। অপজিশন থেকে সরকারের যে সব সমালোচনা হয়, তাও আমাদের কাগজে থাকা দরকার– বুঝলেন, আমাদের কাগজ সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকবে। মালিকপক্ষের সবাই রায়হান সাহেবের কথা বলেন। বলেন, ওঁকে ছাড়া চলবে না, বুঝেছেন ? ওঁর খোঁজ-খবর নেন তো ?

তাই আমানউল্লাহকে আসতে হয়েছিলো একদিন। সম্পাদক সাহেব আসেন নি। কিন্তু দু'দিন পরপরই টেলিফোন করেন ডাক্তার সাহেবের কাছে। তবে হ্যাঁ, আব্দুল্লাহ আসে, দু'দিন পরপর তো বটেই, আবার পরপর দু'দিনও এসেছে সে। এসে চেয়ার আসে, দু'দিন পরপর তো বটেই, আবার পরপর দু'দিনও এসেছে সে। এসে চেয়ার টেনে মুখের সামনে বসে থাকে। এটা ওটা কথা বলে নিজে হাসে আর রায়হানকে হাসাতে চেষ্টা করে। তবে রায়হানকে পারতপক্ষে মুখ খুলতে দেয় না। কারণ তার জানা আছে, হার্ট পেশেন্টদের বেশি কথা বলা বারণ।

কেন যে সে আসে, সেটা তার নিজেরও ভালো জানা নেই। থাকে সেই কোথায় লক্ষ্মীবাজার, সেখান থেকে মতিঝিলের অফিস, তারপর ফের অফিস থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

সোহরাওয়ার্দী হাসপাতাল। এতটা পথ যাওয়া-আসা– এ কি সোজা কথা ? রিকশা ভাড়াই কি কম ? ও তো আবার বাসে চাপতে পারে না। রায়হান ঐ কথা তুললে আব্দুল্লাহ রীতিমতো আহত হয়। একদিন বলেই ফেললো, রায়হান ভাই, আপনাকে যে আমরা কী চোখে দেখি, তা তো আপনি জানেন না– জানলে এমন কথা তুলতেন না। আমি যে আসি আর এসে কেমন দেখি, সব আমাকে অফিসের লোকদের কাছে বলতে হয়।

সাত আট দিনের মধ্যে আব্দুল্লাহ তিন চার দিন গেছে কিন্তু বীথিকে দেখেছে মাত্র একদিন। অবশ্য সে বিকেল বেলা যায়। সকালের দিকে কে থাকে তা তো সে বলতে পারবে না। তবে হ্যাঁ, ছেলেদের কাউকে না কাউকে সে রোজই দেখে।

একদিন সে জিজ্ঞেস করে, রায়হান ভাই, এক মহিলা প্রায়ই টেলিফোনে আপনার খোঁজ খবর নেন। নাম জিজ্ঞেস করলে বলেন না, আপনার বাসার টেলিফোন নাম্বার দিতে চাইলে বলেন, ঐ নাম্বার নাকি ওঁর কাছে আছে, বাসায় নাকি কেউ টেলিফোন ধরে না। আজকেও করলেন, কেমন আছেন, হাসপাতাল থেকে কবে ছাড়বে– এইসব জিজ্ঞেস করেন। যখন বলি, হাসপাতালে গিয়ে দেখে আসুন, তো ফোন রেখে দেন।

রায়হান শোনে এবং মনের ভেতরে বিলক্ষণ চমকায়। কিন্তু কিছু করার নেই তার। আর সে জানেই বা কী ? মাঝখানে যে কী হয়েছে তার কিছুই জানে না। সে কোনো কিছু অনুমানও করতে পারে না। মেরি কি পরের দিন এসেছিলো ? নাকি টেলিফোন করেছিলো ? নাকি বীথির সঙ্গে তার সরাসরি কথা হয়েছে! যদি হয়ে থাকে তাহলে কী কথা হয়েছে দু'জনায় ?

এই সব প্রশ্ন মনে জাগলে কী হবে– সে চিন্তা করতে পারে না। জটিল কিছু ভাবতে গেলেই তার মাথা ঝিমঝিম করে ওঠে প্রথমে, তারপরই ঘামতে শুরু করে। শেষে ভয়ানক রকম ক্লান্তি লাগে। তার নিজের শরীরের আসল অবস্থা কীরকম তাও তাকে জানতে দেয়া হয় না। ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করলে বলেন, না সব ঠিক আছে, ভয় পাওয়ার মতো কিছু হয় নি, নাথিং সিরিয়াস।

কার্ডিওলোজিস্ট মজুমদার সাহেবকে সে চেপে ধরেছিলো, তো তাঁরও ঐ একই ধরনের কথা, এ বয়সে এমন হতেই পারে, সেনসিটিভ টাইপের মানুষ, এমনিতেই হাইপারটেনসিভ, প্রেসার বেড়ে গেলেই এমন হবে– তাই নিয়ম মেনে চলতে হবে, রেগুলার ওষুধ খেতে হবে, তাহলে কোননো প্রবেলম হবে না আশা করি। স্মোকিং তো করেন না– করেন ? ব্লাড সুগারের ঝামেলা যখন নেই, তখন নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। ডাক্তার এই রকম নিশ্চিন্ত হওয়ার কথা বলেন, কিন্তু যখনই জানতে চাওয়া হয়, কবে রিলিজ করবেন, তখনই ভদ্রলোক হাসেন। বলেন, আহা থাকুন না আরও কয়েকটা দিন। ধরে নিন এখানে ভ্যাকেশন কাটাচ্ছেন– ছাড়া পেলেই তো ফের অফিসে যাবেন। আর অফিস মানেই তো পলিটিক্স নিয়ে লেখালেখির ঝামেলা– বলুন, ঝামেলা না ? অপজিশনকে যদি সাপোর্ট করে কিছু লিখলেন তো ভয়, সরকারী দলের চাঁইরা চটেমটে কিছু না করে বসে। আর অপজিশনের যদি সমালোচনা করেন, তো আপনার পিঠে দালালির ছাপ লাগিয়ে দেবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

সুতরাং কী দরকার অমন ঝামেলার মধ্যে যাবার ? এখানেই থাকুন।

কিন্তু কতোদিন ?

যতদিন পারা যায়।

অমন সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়ে হাসতে হাসতে ডাক্তার চলে যান। বীথির সামনে এসব কথা হলে সে হাসিমুখে এটা সেটা বলে, বেশ আলাপও জমিয়ে ফেলে, তখন সে হাসিখুশি দিব্যি এক মহিলা। কিন্তু ডাক্তার চলে গেলেই একেবারে অন্যরকম মানুষ। ফের সে গম্ভীর হয়ে যায়। হয় জানালার বাইরের দিকে নজর মেলে দিয়ে বসে থাকে, নইলে বেডের পাশে রাখা ছোট কেবিনেটের ওপরকার শিশি বোতল, ওষুধের ব্যাগ, কাপ প্লেট, চামচ, এই সব মোছামুছি করে। যদি রায়হান কিছু জিজ্ঞেস করে তো উত্তর দেয়, নইলে নিজের থেকে কিছুই বলে না। মাসের সাত তারিখ পার হলো যেদিন, তারপরের দিন যখন জিজ্ঞেস করলো, অফিস থেকে বেতনের টাকা দিয়ে গেছে কি না, তখন বীথি এক শব্দে জবাব দিলো, না।

তাহলে কীভাবে সংসার চলছে ?

চলছে কোনোভাবে, ছেলে টাকা দিয়েছে– রঞ্জু।

রঞ্জু টাকা কোথায় পেলো ?

ওর স্কলারশিপের টাকা।

বাড়িভাড়া কোত্থেকে দেবে ?

দেখি কোত্থেকে দেয়া যায়।

বীথির সঙ্গে আজকাল এমনই কাটা কাটা কথা হয়।

একদিন সে বলেই ফেললো, আমি এখানে আর থাকবো না, শুনছো ?

হ্যাঁ।

কী শুনলে ?

তুমি এখানে থাকবে না।

হ্যাঁ, আমি বাসায় যাবো, অফিসে জয়েন করবো।

বীথি ঐ কথা শোনার পরও কিছু বলে না– বলার প্রয়োজন বোধ করে না। যা করছিলো, অর্থাৎ ভেজা তোয়ালে দিয়ে বিছানার পাশে রাখা ক্যাবিনেটের ময়লা তুলছিলো ঘষে ঘষে, তাই করতে থাকে। এসব কাজ করার কথা হাসপাতালের লোকদের কিন্তু সে-ই আজকাল এসব করে। রায়হানের কথার জবাবে কিছু তো বলেই না– এমন কি মানুষটার দিকে ফিরেও তাকায় না।

আমি মরে গেলে বোধহয় ভালো হতো, তাই না ?

রায়হানের অমন কথাও বীথির মুখ ফেরাতে পারে না। সে মুখেও কিছু বলে না।

বীথি জানে না, মেরি পরে আসলেই কোনো রকম যোগাযোগ করেছিলো কিনা। আর যদি করে থাকে এবং জেনে থাকে যে, রায়হানের হার্টএ্যাটাক হয়েছে, সে মারা যেতে পারে, তাহলে সে কী সিদ্ধান্ত নিয়েছে ? রায়হানের হাসপাতালে আসার খবর জানার পরও কী সে ভাবছে যে, স্বামীকে তালাক দিয়ে ছেলেমেয়েদের ছেড়ে সে রায়হানের সঙ্গে নতুন করে সংসার পাতবে ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

প্রেম বিয়ে সংসার এসবের খবর শুনলে তার আজকাল হাসি পায়। কি নিদারুণ রকমের মূর্খতা মানুষের। পুরুষের যেমন, তেমনি মেয়েদেরও। মেয়েরা কেন যে ভাবে, একজন পুরুষ মানুষকে ভালোবাসবো, তাকে বিশ্বাস করবো সারাজীবন, তার সন্তান গর্ভে ধারণ করে সুখের সংসার গড়ে তুলবো আর ঐ সংসারে সারাটা জীবন কাটিয়ে দেবো। সে নিজে তো অমনই ভেবেছিলো। কে জানে মেরির স্বামীরও বোধহয় অমনই কিছু ধারণা ছিলো। মানুষটা অসুস্থ, ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে গেছে। এমন সময় ঐ মানুষটাকে ছেড়ে যদি চলে যায় মেরি, তাহলে বেচারা কী করবে। আর কেন চলে যাবে মেরি ? না একজন পুরুষ মানুষকে তার ভালো লেগেছে, তার সঙ্গে লুকিয়ে লুকিয়ে শোওয়াশুয়ি করে প্রেগনেন্ট হয়ে বসে আছে, সেই জন্যে ?

অদ্ভুত লাগে তার কাছে। সে ভেবে পায় না। শোওয়াশুয়ি বড়, না পেটে বাচ্চা আসাটা বড় ? পুরুষ সঙ্গ তো স্বামীর সঙ্গেও হয়েছিলো মেরির। ঠিক তেমনি, পেটে বাচ্চা আসার ঘটনাও ঘটেছিলো আর ভরাভরতি সংসারও ছিলো তার একটা– তাহলে? কোন কারণে লুকিয়ে লুকিয়ে শোওয়াশুয়ি আর পেটে বাচ্চা বাধানো ?

বীথির মগজের ভিতরে কয়েকদিন ধরে সর্বক্ষণ এই এক ভাবনা। মেরি কি তাহলে অসুখী ছিলো ? সে যুক্তি দাঁড় করায় মনে মনে। স্বামী হয়তো তাকে অবহেলা করে, অন্য কোনো মেয়ে মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করে। ঐ কারণে অসম্ভব কোনো মানসিক যন্ত্রণার কারণে রায়হানকে অবলম্বন করাটা তার দরকার হয়ে পড়েছিলো।

যদি তাই হয়। তাহলে যে মানুষটাকে সে অবলম্বন করেছে, সেও যে বিশ্বাসী থাকবে, তারই বা নিশ্চয়তা কোথায় ? সে মানুষও তো তার স্বামীরই মতো, নিজের স্ত্রীর কাছে বিশ্বস্ত থাকে নি। এতো বয়স হয়েছে মেরির, তার কি অমন সাধারণ একটা বিষয় নিয়ে বিবেচনা করারও বুদ্ধি নেই। নিজেকে মেরির জায়গায় কল্পনা করতে গেলে তার মনের ভিতরে ঘেন্না বিজ-বিজ করে ওঠে।

ফের মনে হয়, সে হয়তো পারে না, কিন্তু অন্য অনেকে তো আবার পারেও। শাহিদা আপার কথা মনে পড়ে। তখন বোধহয় প্রেগনেন্ট– এতো ভালোবাসতেন স্বামী যে আপাকে ধরে রিকশা থেকে নামিয়ে খুব আস্তে আস্তে হাঁটিয়ে কলেজের ভিতরে নিয়ে আসতেন। এক একদিন টিচার্স রুমে বসিয়ে পর্যন্ত দিয়ে যেতেন। আপার কী সুখ তখন। ছেলেপুলেও হলো। বড়ও হলো তারা। তারপর শোনা গেলো, আপা বাপের বাড়ি থাকেন। কেন ? না স্বামীর সঙ্গে বনিবনা হচ্ছে না। শেষে শোনা গেলো, ভদ্রলোক একটি অল্পবয়সী মেয়েকে, যার বয়স তাঁর নিজের মেয়ের মতোই হবে, বিয়ে করে বসে আছেন। নিজের বান্ধবীদের মধ্যে অমন ঘটনা ঘটেছে। কেন অমন ঘটনা ঘটেছে, তা কেউই ঠিক মতো বলতে পারে না।

নাশিদের কথা মনে পড়ে তার। ধনীলোকের দুলালী মেয়ে। গাড়ি চড়ে কলেজে আসতো– লাজলজ্জাও কম ছিলো না। মাথায় ওড়নার আঁচল তোলা থাকতো। ইন্টারমিডিয়েটে থাকতেই বিয়ে হয়ে গেলো। বিয়ে হয়ে যাবার পর থেকেই হয়ে গেলো দারুণ বেহায়া। কলেজের মাঠের গাছতলায় বান্ধবীদের নিয়ে আড্ডা দিতো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

আর অসভ্য কথা বলতো। মুখে কিছুই আটকাতো না। ওদিকে তার বাপ জামাইকে বিদেশী ডিগ্রী আনবার জন্য পাঠিয়ে দিলো বিলেতে। ব্যস তারপরই নাশিদের একেবারে যেন পাখা গজিয়ে গেলো। খালাতো মামাতো ভাইরা তো ছিলোই। ঐ ভাইদের বন্ধুদের সঙ্গেও শুরু করে দিলো ফষ্টিনষ্টি। কলেজের বান্ধবীদের কানে কানে বলতো, নতুন নতুন পুরুষ মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করতে কেমন মজা। সেই সব ঘটনার কথা অবলীলায় বলে যেতো, কোনো মেয়ের পক্ষেই যেসব কখনও বলা সম্ভব নয়। দু'জনে মিলে কাপড় খোলা থেকে আরম্ভ করে ফের কাপড় পরা পর্যন্ত কী কী হয়, সব কিছু সে বলে যেতো।

পরে জানা গিয়েছিলো যে নাশিদের মানসিক রোগ হয়েছে। মেরিও কি অমন মানসিক রোগী ? নিমফোমানিয়াক ? কোনো রকম বাছবিচার নেই। পুরুষ মানুষ দেখলেই টেনে বিছানায় তোলার জন্য হাত বাড়িয়ে রাখে সর্বক্ষণ ?

কিন্তু অমন ধারণাও তার ঠিক মনে হয় না। নিমফোরা বিয়ে করতে কেন চাইবে? তার পেটের বাচ্চাটাকেও বা রাখতে চাওয়ার কী কারণ ? ডিএনসি করতে আজকাল আর কত খরচ ? আর সময়ই বা কতটুকু লাগে। কতো বিবাহিতা মেয়ে আজকাল স্বামীর দেওয়া বাচ্চা পেট মুছে ফেলে দিচ্ছে আর এ তো লম্পটের দেওয়া বাচ্চা। হ্যাঁ লম্পটই তো। যে বিবাহিত পুরুষ নিজের বউ থাকতে অন্যের বউয়ের সঙ্গে বিছানায় যেতে পারে, তাকে লম্পট ছাড়া আর কী বলা যায় ? তো সেই বাচ্চাকেও যে মেয়েমানুষ দশ মাস পেটে ধরতে চায়। সেই বাচ্চার মা হতে চায়, আর সেজন্য স্বামী সন্তান সংসার পর্যন্ত ছেড়ে আসার জন্য তৈরি হয়, তাকে নিমফো কীভাবে বলা যাবে? বীথির মগজে পুরো ব্যাপাটা কিছুতেই ঢুকতে চায় না। রায়হানকে সে আজকাল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে। সামনাসামনি না, একটু আড়াল থেকে। হয় ব্যালকনি থেকে কিংবা করিডোর থেকে। হালকা পাতলা ছিলো মানুষটা। রং শ্যামলা হলে কী হবে, মুখ চোখ ভর্তি লাবণ্য ছিলো। বন্ধুদের সঙ্গে রাজনীতি নিয়ে তর্ক করার সময় দু'চেখের দীপ্তি ঝিলিক দিয়ে উঠতো। সেই মানুষ, হ্যাঁ, সেই মানুষ যে '৬৯-এর মিছিলে থাকতো '৭১-এ ছেলে বউ নিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে মুক্তিবাহিনীর কাজ করে দিয়েছে। '৭৫-এ ভালো চাকরির লোভ দেখানো সত্ত্বেও বাকশালে নাম লেখায় নি। সেই মানুষ কী হয়ে গেলো। এখন চোখ মুখ দেখলে নিভে যাওয়া লণ্ঠনের কথা মনে হয়। এখন মনে হয় না যে সে এই মানুষের হাত ধরে বাবা ভাই বোন সবাইকে ছেড়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিলো। সে মুখ ফিরিয়ে রায়হানের দিকে তাকায় আর মনে মনে নিজেকে শুধায় এই মানুষ কি সেই মানুষ ? তার বিশ্বাস হতে চায় না। যার হাত ধরে সে বেরিয়ে এসেছিলো সে নিশ্চয়ই অন্য মানুষ ছিলো।

ফের মনে হয়, এই মানুষ যদি সে-ই না হবে, তাহলে সে নিজে কেন আসে অসুস্থ মানুষটার কাছে। কেন চায় যে সে সুস্থ হয়ে উঠুক ?

আসলে বীথি নিজেকেই মনে মনে খোঁজে। কিন্তু পায় না। কীভাবে যেন, কবে থেকে যেন, নিজেকে হারিয়ে সে বসে আছে। বাসায় ফিরলে বাসাটাকে তার পুরোপুরি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

নিজের মনে হয় না। মনে হয় এক সময় এটা নিজের ছিলো, এখন যেন সে কিছুক্ষণের জন্য বেড়াতে এসেছে। তবে ছেলেরা কাছে থাকলে তার মন কিছুটা হালকা হয়ে ওঠে। নিজেকে যেন সে ফিরে পায়। সে জন্যেই যখন টুকু কাছে আসে, তখন তাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরার জন্য তার দুই হাত সে বাড়িয়ে ধরে। মঞ্জু বা রঞ্জু যখন কাছে এসে দাঁড়ায়, তখন সে ওদের ঘাড়ে হাত রেখে নিজের শরীরের পুরোটা ভর ছেড়ে দেয়। আম্মার এমনভাবে আঁকড়ে ধরে রাখার ভাবটা রঞ্জুকে রীতিমত ভাবায়। তার মনে হয়, আম্মা বোধ হয় আব্বার অসুস্থতায় অসহায় বোধ করছেন, অথবা ভয় পাচ্ছেন, তাই ছেলেদের আঁকড়ে ধরে রাখতে চাইছেন।

সে মায়ের চোখের দিকে তাকিয়ে দেখতে দেখতে বলে, আম্মা আপনি কেন এত চিন্তা করেন, আব্বা তো ভালো হয়ে যাচ্ছেন– কয়েকদিন পরই তো হাসপাতাল থেকে রিলিজ হয়ে যাবেন।

ছেলের অমন কথা শুনে বীথির মুখে করুণ হাসি ফোটে। মনে মনে বলে, কী যে ভাবে রঞ্জু, তোর বাবা ভালো হয়ে গেলে আমার কী ? কথাটা তার মন থেকে জেগে উঠে আবার মনের মধ্যেই মিশে যায়। বাইরে দেখায় শুধু ঐ করুণ হাসিটুকু। যার কারণ কেউ-ই জানে না। রঞ্জু আজকাল হাসপাতালে বেশিক্ষণ থাকতে পারে না। ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র হিসাবে ওয়ার্ড ডিউটি তো রয়েইছে, তার ওপর এক বিদেশী প্রফেসর এসেছেন, তাঁর সেমিনারের জন্য আয়োজন করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে যে তিনজন ছাত্রকে সে তাদের মধ্যে একজন। ঐ ব্যস্ততার মধ্যেই ফাঁক পেলে বাবাকে সে দেখে যায়। তা সে সকালে, দুপুরে, সন্ধ্যায় বা রাতে, যখনই হোক। তবে টুকু আর মঞ্জু নিয়মিত আসে। ওরা এলে তবে বীথির বাসায় ফেরা সম্ভব হয়। কিন্তু তাই বা কতক্ষণের জন্য ? খুব জোর ঘন্টা দু'তিন। তবু রক্ষা, ঐ দু'তিন ঘন্টা সময় তার ঘরের ভিতরে কাটে। ঘরটা পুরোপুরি নিজের মনে না হলেও সময়টা কাটে। যখন খাটের দিকে তাকায়, টেবিলের দিকে তাকায়, বুক কেসের দিকে তাকায়, ছেলেদের কামরার ভিতরে গিয়ে ঢোকে, তখন নানান কথা সে নিজের সঙ্গে বলতে পারে। সংসার আরম্ভ করার পর চৌকিতে শুতে হতো। খাট কেনা হলো কখন ? না যখন সে বললো আমার ছেলে জন্ম নিয়ে চৌকিতে শোবে ? কিংবা বুক কেস কেনা হলো কখন? সেও তো যখন ছেলে প্রথম কলেজে ভর্তি হলো– ঐ রকমই ড্রেসিং টেবিল কেনারও গল্প আছে। বুবু এসে একদিন বললেন, এতোদিন হয়ে গেলো সংসার করছিস, একখানা ড্রেসিং টেবিলও কিনতে পারে না রায়হান ? এইভাবে পুরনো কথা নিয়ে নিজে নিজেই সে দিব্যি সময় কাটিয়ে দিতে পারে। কিন্তু হাসপাতালে তো তার সময় নিথর হয়ে থাকে।

কেবিনের ভিতরে শুয়ে শুয়ে রায়হান খবরের কাগজ নয় তো ম্যাগাজিন পড়ে। আর মাঝে মাঝে এটা ওটা দরকারি কথা জিজ্ঞেস করে। সে বিরক্তি বোধ করে না, কারণ সেটা বরং ভালো। রায়হান তবু তো এটা ওটা জিজ্ঞেস করতে পারে। কিন্তু সে নিজে তো তাও পারে না। জিজ্ঞেস করার মতো কোনো কথাই তার মনে আসে না। এমন কি দরকারি কথাও না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

দায়সারা জবাব সে দেয়। তবে দায়সারা কথা আর মনের কথা কি একরকম হয় কখনও, নাকি হতে পারে। একেকদিন সে টের পায়, রায়হান আগের মতোই কথা বলতে চায়। চায়, বীথি কাছে গিয়ে গা ঘেঁষে বসুক, কপালে ঠাণ্ডা হাত রাখুক। কি আদর করতে করতে চুমু খাক। কিন্তু অমন মনে হলে কী হবে, বীথির মনের ভিতরটা আরও পাথরের মতো শক্ত হয়ে যায়– যখনই সে টের পায় রায়হান অমন কিছু চাইছে।

বেবিট্যাক্সি থেকে নামতেই দেখে, মুনশি মুখে হাসি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বলে, আপা খবর পাইয়া থাকতে পারলাম না, আইয়া পড়লাম– সারের শরীলডা কেমুন, ভালো?

হ্যাঁ কিছুটা। বীথি জানায়। বলে, দেখা করবেন?

জ্বী, না দেইখ্যা ক্যামনে যাই। দূর থিকা আইছি।

তাহলে আসুন আমার সঙ্গে। বীথি ডাকে মানুষটাকে। ইচ্ছে করে না, তবু। কেবলই মনে হয়, ঐ জমি কেনার ব্যাপারটা নিয়েই তো যতো গোলমাল, সুতরাং জমি কেনার ব্যাপারে যার ভূমিকা বেশি, তাকে তার ভালো লাগবার কথা নয়। কিন্তু ফের এও আবার মনে হয়, ও বেচারার কী দোষ, ও তো দালাল– যদি কেউ বলতো, অন্য কেউ কেন, সে নিজেও যদি বলতো, কারও সঙ্গে মিলেমিশে জমি কেনাবেচা পছন্দ করে না সে। তাহলে কি ঐ জমি কেনা হয়? অবশ্যই হয় না। অমন আপত্তি তো সে জানায় নি। তাহলে মুনশির দোষটা কোথায়?

আট নং কেবিনের দরজায় দাঁড়িয়ে সে, মুনশিকে ভিতরে ঢোকার পথ করে দিয়ে বলে, এখানে, এদিকে আসুন।

বীথির আগে ঢুকলে কী হবে, মুনশি বেডের কাছে যায় না, দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে যায়।

রায়হান অবাক হয়ে মুনশিকে দেখে। বলে, আরে আপনি? কোত্থেকে? খবর কোথায় পেলেন?

আর কইয়েন না স্যার, কাইল এক লোকেরে পাঠাইছিলাম আপনের অফিসে, লোকটারে তো চিনেন, কুতুবউদ্দিন ভাইয়ের পোলা, ফিরত গিয়া খবর দিলো যে আপনের নাকি অসুখ। কিন্তু এমুন আহাম্মক ব্যাটা, কী অসুখ, কুন হাসপাতালে আছেন, সেই খবর দিতে পারলো না। শ্যাষে কী করি আইজ সকালেই বাইরাইছি। গেলাম আপনের বাসায়। দেহি কেহ নাই। দরজায় তালা। কী করি তহন, গেলাম সাদেক সাবের বাসায়। দেহি অদ্ভুত কাণ্ড, সাদেক সাবে ভালো হইয়া গেছে।

এই পর্যন্ত বলে মুনশি ফের হাসে। বলে, না দেখলে বিশ্বাস যাইবেন না স্যার, দেইখ্যা বুঝার উপায় নাই যে মানুষটা দুইমাস আগেই বিছানায় পইড়া থাকতো– স্যার দেহি সে এক্কেরে ভালা মানুষ, সুন্দর হাঁইট্টা বেড়ায়– তয় হাঁটনের স'ম বাম পাও খান এট্টু য্যান ল্যাংড়ায় আর কথাও পষ্ট কইতে পারে না– সে কইলো আপনের নাকি হার্টের ব্যারাম, এই হাসপাতালে আইছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বীথি শুনছিল, সে নিজের কৌতূহল চাপতে পারে না। সোজাসুজি জিজ্ঞেস করে, সাদেক সাহেবের বিবির সঙ্গে দেখা হয় নি ?

হ, হইছে। মুনশি জানায়। বলে, তয় কথা হয় নাই, বিবি সাবের বাড়ি করার কতো হাউস, কতো কথা কইত, আইজ দেহি মুহে কথা নাই, সাবের বগলে খাড়াইয়া খালি আমার মুহের দিকে চাইয়া থাহে– বাড়ি বানাইবার কুনো কথাই উঠাইল না– যা কওনের সাদেক সাবেই কইল।

রায়হান শুধু শুনে যায়। বলার মতো কোনো কথাই খুঁজে পায় না– মেরির কথাটা তোলায় বীথির দিকে শুধু একনজর তাকিয়ে নেয়। মনের ভেতরে কেউ যেন বলে ওঠে, বীথি কি কিছু জানতে পেরেছে ? মেরি কি সত্যি সত্যি পরের দিন বাসায় এসেছিলো ?

সে মুনশিকে সরাসরি জিজ্ঞেস করে, খবর কি মুনশি ? তার গলার স্বরে কিছু বোধহয় ছিলো। মুনশি খানিক যেন তটস্থ হয়। তারপর বলে, কী আর কমু আপনেরে স্যার। দ্যাশের অবস্থা তো জানেন, চারদিক চোর চোট্টাতে ভইরা গেছে– আপনে গো জমিনের উপ্রে তো কিছু করন লাগে– ইদিক আপনের এমুন অসুখ, ক্যামে কী করবেন, বুজি না– উদিক সাদেক সাবেরে কইলাম, তো হ্যায়ও য্যান কেমুন-কেমুন করে, দেরি হইলে কিন্তু ঝামেলা হইতে পারে স্যার।

ঝামেলা ? রায়হান মুনশির কথা ঠিক বুঝতে পারে না। বলে, কিসের ঝামেলা ? জমি নিয়ে কিছু হয়েছে ?

জ্বে না, অহনও কিছু হয় নাই– কিন্তু হইতে পারে।

রায়হানের মগজে তখনও কিছু ঢোকে না। সে বলে, আপনি খুলে বলবেন তো, কী হয়েছে ?

হ স্যার, খুইল্যাই কইতেছি, আমাগো এলাকার কিছু লোক পুরানা খতিয়ান পরচা দলিল নক্সা যেহানে যা পায় ঘুষ টুষ দিয়া উঠায়া লইতেছে। আর খুঁইজা বেড়াইতেছে কুন জায়গা দখল করা যায়। ফাঁকা জায়গা পাইলেই আর ছাড়াছাড়ি নাই। চালামালা তুইল্যা মানুষ বসাইয়া থুইবো, তারপর জাল দলিল পাতি বানাইতে কতোক্ষণ ? মামলা মোকদ্দমা পারলে করতে থাহেন– জমিনের দখল তো তার– এমুন করতে করতে আপনেরে প্যাঁচে ফালাইবো– কইবো এই জমিনের আমরাও মালিক, জমিন যদি রাখতে চান তো আমাগো টাকা দিয়া দলিল রেজিস্টারি কইরা লন, যদি আপনের ট্যাকা না থাকে, তাইলে আমাগোরে দিয়া দেন জমিন, ট্যাকা লইয়া যান।

একটু থেমে ফের বলে মুনশি, স্যার দ্যাশে এই এক বিপদ আইছে, পাট্টির নেতা, থানা পুলিশ, সব অগোর হাতে– ঢাকা শহরের চারোদিক এই কাম চলতাছে। সাভারের দিক তিন চার পাট্টি এই কাম কইরা বেড়াইতেছে। পরশু দেহি, আপনেগো জমিনের সামনে তিন চারজন বইয়া বইয়া শলা করে– লগে এক আমিন আছে– অগো হাবভাব দেইখ্যা সন্দেহ হইল আমার। তাই দেরি করি নাই ঐ দিনই লোক পাঠাইলাম আপনের কাছে। সেই লোক আপনেরে পাইল না, গিয়া খবর দিলো আপনে নাকি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

হাসপাতালে– এহন তো দেহি সত্যিই আপনে হাসপাতালে রইছেন, এমুন অবস্থায় তো কুনো কাম হইবো না– আপনেগো বহুত ঝামেলা।

রায়হান বীথির মুখের দিকে তাকায়। দু'জনেই দু'জনের মুখ দেখে। কিন্তু কথা হয় না। মুনশি বলে জলদি জলদি কিছু কইরা থোওন দরকার স্যার– একখান টিনের চালামালা তুইল্যা থোন– আমিই ভাড়ার ব্যবস্থা কইরা দিমু নে– জমিন যে আপনের দখলে রইছে, তার তো প্রমাণ থাকা দরকার।

জমিজমার আইন কানুনের ব্যাপারে বীথির কিছুই জানা নেই। তবে এটুকু অনুমান করতে তার অসুবিধা হয় না যে বিষয়টা বেশ গুরুতর– আর বড় রকমের ক্ষতির আশঙ্কা থাকাতেই মুনশি বাড়ি বয়ে খবরটা দিতে এসেছে। কিন্তু অদ্ভুত লাগে তার নিজেরই কাছে, যে অমন খবর শোনার পরও তার মনে কোনোরকম প্রতিক্রিয়া হয় না। জমিটা হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে, এটা যে সে বুঝতে পারে না তা নয়। কিন্তু সেজন্যে আশঙ্কা, উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা কিছুই জাগে না তার মনে। বরং উল্টো এমন মনে হয় যে, হোক ঐ জমি হাতছাড়া, তাতে আমার কী ? সে খুব নিস্পৃহ ভাব নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে।

রায়হান হাসে মুনশির দিকে তাকিয়ে। বলে, আমার শরীরের অবস্থা কেমন তাতো দেখতেই পাচ্ছেন, ঐ জমির ব্যাপারে যা ভালো বোঝেন, তা আপনাকেই করতে হবে।

তাতো স্যার বুজি, মুনশি মুখ নিচু করে জানায়। বলে, কিন্তু স্যার, খরচপাতি কি কম ? বোজেনই তো জিনিসপাতির কেমুন দাম, এক বান্দ টিনের দাম আড়াই হাজার ট্যাকা, একটা লেবাররে দিতে হয় পঞ্চাশ ষাইট ট্যাকা, তারপরও তো খরচ আছে– গুনা, পেরেক, সুতলি, বহুত ঝামেলা স্যার।

রায়হান ফের বালিশে মাথা পেতে হেলান দেয়। বলে, তা হলে বাদ দিন, যা থাকে কপালে তাই হবে।

আরও কিছুক্ষণ বসে থাকার পর মুনশি ওঠে। বলে, তয় স্যার যাই, দেহি সাদেক সাবেরে কইয়া, তিনি যদি কিছু করে, তিনির শরীল তো অহন আল্লায় দিলে ভালো।

দরজার বাইরে এক পা রেখে ঘুরে দাঁড়ায় মুনশি। তারপর বীথিকে বলে, মানুষড়া য্যান কেমুন আপা, কুনো কামের না। তয় হ্যাঁ, বিবিসাব কিন্তুক খুব কামের মানুষ, কিন্তুক কী যান হইছে, মনে হয় অসুখ টসুখ হইতে পারে, কেমুন রোগা আর কালা দ্যাহা যায়– কথা বার্তি কয় না।

মুনশি মাথা নাড়াতে নাড়াতে বিদায় নেয়। যাবার সময় বলে যায়– আপা জমিন দখলে রাখতে হইলে কিন্তু জমিনের উপ্রে টিনের হোক, বাঁশের হোক, চালামালা উঠান দরকার–

বীথির জমিজমার ব্যাপারে কোনোরকম ধারণাই নেই। কারণ বাবা চাকরি করেছেন এদেশে পার্টিশনের পরে, যা কিছু ছিলো সব পড়ে গিয়েছিলো বর্ডারের ওপারে– বাবা কিংবা ভাইদের মুখেও সে জমিজমা নিয়ে আলাপ করতে কখনও শোনে নি। তবু মুনশির কথা শুনে আর তার ভাব ভঙ্গি দেখে তার আন্দাজ হয়, যে জমি কেনা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

হয়েছে সেটা হাতছাড়া হবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে– আর সেজন্যেই মুনশির অমন অস্থির হয়ে ছুটে আসা আর অমন হুঁশিয়ারি। আগে হলে কী হতো বলা যায় না। কিন্তু এখন ক্ষতির আশঙ্কা দেখা দিয়েছে জানার পরও তার মনে দুশ্চিন্তা বা উদ্বেগের কোনো আঁচড়ই লাগে না। বরং উল্টোভাব জাগে তার মনে। কেমন মনে হয়, ও জমি চলে যাওয়াই ভালো– ও জমি কেনার আয়োজন শুরু হওয়া থেকেই তার কপাল ভাঙারও শুরু।

নিজের মনের দিকে তাকিয়ে বীথিরও অবাক লাগে। তার বিশ্বাস ছিলো ঘর সংসারের জন্য পাকাপোক্ত ঠাঁই দরকার। এখন সেই বিশ্বাস তার কোথায়? ঠাঁই থাকলেই কী, আর না থাকলেও বা কী! কোনো কিছুতেই আসলে কিছু হয় না– যার হবার তার এমনি এমনিই হয়ে যায়।

যখন হাসপাতাল থেকে ছাড়ার কথা, তার আগেই ছাড়া পাওয়া গেলো। দুপুরের খাবার খাওয়ানো হয়েছে রোগীকে– টুকুও এসে গেছে তখন, বীথি বাসায় ফিরবে, ঐ সময় রঞ্জু এলো। ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করতে যাবার পর পাঁচ মিনিটও হয় নি। ফের ফিরে এসে বললো, আম্মা, চলুন, ডাক্তার সাহেব ডাকছেন, মনে হচ্ছে, আজই রিলিজ করে দেবেন।

ডাক্তার মজুমদার মা ছেলে দু'জনকেই সামনে বসিয়ে প্রেসক্রিপশন লিখলেন আর পরামর্শ দিলেন। রঞ্জুকে বললেন, ওয়েট যেন না বাড়ে, বাসায় ওয়েট মাপবার মেশিন রাখতে হবে। সেই সঙ্গে প্রেসারের মেশিনও, রেগুলার চেক করতে হবে। আইসোসরবিক রেগুলার চলবে, প্রেসারের ওষুধটাও। যদি তারপরও প্রেসার বাড়ে, তাহলে ডায়রিউটিক দিলাম মাইল্ড ধরনের, সেটা দেবে– তবে রেগুলার না। প্রেসার একশ' কুড়ি/আশির নিচে যেন না নামে– আইটিটি করিয়ে নিয়ে যেও সপ্তাহ দুয়েক পরে। সেই সঙ্গে ইসিজিও। বীথির মুখের দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বলেন মজুমদার সাহেব, খাসি, গরু, ডিম, দুধ ছানা মাখন– বীথি পাল্টা হাসে। ডাক্তারকে কথা শেষ করতে না দিয়ে বলে, জানি ওসব– আরও দু'বার হাসপাতালে আসতে হয়েছে– টেনশন করা চলবে না, সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠতে পারবে না, পকেটে নাইট্রো গ্লিসারিন রাখতে হবে।

কিন্তু হয়েছেটা কী? বীথি এবার চোখে চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে। বলে আপনারা স্পষ্ট করে কিছু বলেন না কেন?

আগের বার ডাক্তার জামান বললেন, আমার ছেলেকে বুঝিয়ে দেবেন, কিন্তু কী বোঝালেন, তার কিছুই আমরা বুঝতে পারি নি।

ডাক্তার মজুমদার বোধহয় একটু বিরক্ত হন। বলেন, এটাতো বোঝাবুঝির কিছু নয়। প্রব্লেমটা ওঁর হার্টে, আমরা অনুমান করছি, তার হার্টে যথেষ্ট রক্ত যাচ্ছে না বলে অক্সিজেন কম পাচ্ছে হার্ট আর সে জন্যেই ব্যথা হচ্ছে, মনে হয়, ওঁর আর্টারি দিয়ে রক্ত চলাচল কম হচ্ছে।

এটাকেই তো ব্লকেড বলা হয়, তাই না? বীথি ফের সোজাসুজি জিজ্ঞেস করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

রঞ্জু মাকে নিরস্ত করতে চেষ্টা করে। বলে, থাক ওসব কথা। আম্মা আমরা এবার যাই।

প্রেসক্রিপশন আর ডিসচার্জ লেটার হাতে নিয়ে রঞ্জু মাকে টেনে বাইরে নিয়ে আসে। তারপর বলে, কেন আপনি অতো কথা বলতে গেলেন ? দেখছিলেন না ভদ্রলোক চটে যাচ্ছিলেন।

কিন্তু, আমাকে বলবেন না, কী করবো আমরা রোগী নিয়ে ? বীথি ছেলের মুখের দিকে তাকায়।

সেটা তো বলেছেন প্রথমেই, আমি যখন গেলাম তখনই বললেন যে এনজিওগ্রাম করার ব্যবস্থা করতে হবে।

বীথি এনজিওগ্রামের ব্যাপারটা কিছু কিছু জানে। ছেলের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলে, কোথায় করাতে বললেন, ঢাকায় ?

রঞ্জুর কপালে ভাঁজ পড়ে। বলে, উনি বাইরে কোথাও করাবার কথা বললেন।

বাইরে কোথায় ? বীথি জিজ্ঞেস না করে পারে না। তা বললেন না, রঞ্জু জানায়। বলে, বোধহয় কলকাতার কথা বলতে চাইছিলেন।

বীথির মনের ভেতরে একটা প্রশ্ন তিরতির করে কেঁপে ওঠে। সে কি রায়হানকে মরে যেতে দেবে ? এনজিওগ্রাম-এর জন্য অনেক খরচ। যদি দেখা যায় ব্লকেড-এর সংখ্যা বেশি, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে অপারেশনে যেতে হবে– সেই খরচ কোত্থেকে যোগাড় হবে ? ভাবতে ভাবতে সে হাঁটে ছেলের পাশাপাশি। হাঁটতে হাঁটতেই নিজের হাতের দিকে নজর পড়ে। চুড়ি দেখে, আংটি দেখে, গলার চেন-এর লকেটটাও সে হাত দিয়ে ছোঁয়। তারপর ছেলেকে বলে, চিন্তা করে লাভ নেই, টাকার যোগাড় করা যাবে।

কেবিন থেকে বেরুতে দেরি হয় না। খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতেই রায়হান হেঁটে হাসপাতালের বাইরে এসে দাঁড়ায়। তখনও দুপুরের ঝাঁজ বাতাসে। ভাদ্রের আজ কতো ? সে মনে মনে আন্দাজ করে। ক'দিন আগে খুব জোর বৃষ্টি হয়েছে। আজও কি বৃষ্টি নামবে ? তাই এতো গরম ?

বীথি ছোট ছেলেকে পাশে নিয়ে পিছনে দাঁড়ায়। রঞ্জু যায় বেবিট্যাক্সি ডাকতে। টুকুর বোধহয় হাতের ব্যাগটাকে বেশি ভারী লাগে, সে ওটা পায়ের কাছে নামিয়ে রাখে।

রায়হান পেছনে ফিরে তাকায়। হাসপাতালের সামনের দেয়ালে প্রকাণ্ড আর গোল গোল ফোঁকরগুলোর দিকে এক নজর দেখে নেয়। মনে মনে বলে, আবার কি আসতে হবে আমাকে ? খুব শিগগির ? নাকি দেরি হবে এবার ? বীথির দিকেও সে তাকিয়ে দেখে। তার মনে হয়, তার হাসপাতালে আসায় দু'জনার জন্যই ভালো হয়েছে। দু'জনার কাছ থেকে দু'জনার দূরে সরে যাওয়ার ঘটনাটা ঘটে গেছে খুব চুপচাপ। বাসায় থাকা অবস্থায় এমন ঘটনা ঘটলে বিশ্রী কাণ্ড হতো। ছেলেদের সামনে দু'জনার ঝগড়াটগড়া বেধে গেলে নিজেদের মধ্যে যা হবার তাতো হতোই। মাঝখান থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বাড়তি ঝামেলায় পড়ে যেতো ছেলেরা। কারণ ওরা তো বাবা-মাকে কখনও ঝগড়া করতে দেখে নি।

দেখতে না দেখতে রঞ্জু দু'খানা বেবিট্যাক্সি নিয়ে আসে। টুকুকে ডেকে বলে, এই তুই এখানে আমার সঙ্গে আয়।

রঞ্জুর অমন ডাক দেয়ার জন্যই কিনা ঠিক বোঝা যায় না। বীথি টুকুকে সঙ্গে নিয়ে খালি বেবিট্যাক্সিতে উঠে পড়ে। তখন রঞ্জুকে নামতে হয়। নেমে বাবাকে ধীরে ধীরে গাড়িতে তুলে পাশে বসতে হয়। রায়হান বীথির কাণ্ডটা লক্ষ্য না করে পারে না। গাড়িতে বসে বসেই ভাবে, এই ভাবেই তাহলে চলতে হবে ভবিষ্যতে ? ঠিক আছে, নিজেকে সে বলে লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে, এভাবেই তাহলে বেঁচে থাকা যাক, যতোদিন পারা যায়। বাসায় ফেরার পরের সপ্তাহ থেকেই রায়হান লেখালেখির কাজ শুরু করে দেয়। অফিসে যায় আরও এক সপ্তাহ পরে। অফিসে ওদিকে গত এক/দেড় মাসের মধ্যেই জাহিদ শক্তপোক্ত লীডার রাইটার হয়ে বসেছে। আব্দুল্লাহ মাঝে মধ্যে আগে লিখতো, এখন প্রায়ই লেখে। সালেহউদ্দিনও মাঝেমধ্যে আজকাল পোস্ট লেখে।

খবরের কাগজে এখন আর উত্তাপ পায় না মানুষ। রাজনৈতিক আন্দোলনের খবর এখন মামুলি খবর হয়ে পড়েছে মানুষের কাছে। সবই যেন গা-সওয়া। বিরোধী দলের আন্দোলন ফের জোরেশোরে শুরু হবে মনে হচ্ছিলো– কিন্তু দলের ভেতরে, নয় তো জোটের ভিতরে ফাঁক থেকে যাওয়ার কারণে আন্দোলন থেকে থেকেই ঝিমিয়ে পড়ছিলো। ৮ দলের জোটের ভেতরে বাঁধন এখন আলগা। আবার ওদিকে ৭ দলের জোটের ভেতরকার মূল বিএনপি'র ভেতরেই খুব জোর কোন্দল– জাতীয় কমিটির সঙ্গে নগর কমিটির বিরোধ একেবারে তুঙ্গে। বিরোধী দল থেকে বেরিয়ে কিছু নেতা এরশাদের দলে যোগ দেয়ার জন্য নাকি তৈরি হয়ে আছে।

তবু বিরোধী দলের লোকেরা বসে নেই। সারা দেশের কোথাও না কোথাও, কোনো না কোনো বিরোধী দলের প্রোগ্রাম বলতে গেলে প্রায় রোজই থাকে। কিন্তু কাজের কাজ কিছু হয় না। সরকার হেলে দোলে না, একইভাবে থেকে যায়। মার্চের নির্বাচনে এরশাদ সাহেব আওয়ামী লীগকে শরিক করতে পারে নি। পার্লামেন্ট-এ বিরোধী দলের নেতা বলতে এখন টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া জাসদের এক গ্রুপের নেতা আ স ম আব্দুর রব। জুনের ৮ তারিখে সংসদে শাসনতন্ত্রের অষ্টম সংশোধনী এনে রাষ্ট্রধর্ম বিল পাস করানো হয়ে যায়। বাইরে তার জন্য খুব বেশি প্রতিবাদ হতে দেখা যায় নি। ধর্মঘট মিছিল মিটিং এসব হয়েছে– কিন্তু তবু মনে হচ্ছিলো, ঐ বিলের দিকে অনেকেরই সায় ছিলো।

তবে একটা কথা ঠিক যে কেয়ারটেকার সরকারের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দেয়ার দাবি এখন বলতে গেলে চারদিক থেকেই উঠছে। ইউনিভার্সিটির শিক্ষক, আইনজীবী, ডাক্তার, ব্যবসায়ী– বলতে গেলে সব পক্ষ থেকেই ঐ দাবির পক্ষে সমর্থন আসছে।

আজকাল বৃষ্টিও হচ্ছে খুব। জুন মাসের আগেই সিলেট অঞ্চলের কিছু এলাকায় বন্যা হয়ে গেলো এক দফা– উত্তরবঙ্গের কুড়িগ্রাম-লালমনিরহাটের দিকে বহু এলাকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ব্রহ্মপুত্রের ঢলে ভেসে যাওয়ার খবরও খবরের কাগজে দেখা গেলো। আব্দুল্লাহ আজকাল প্রায়ই বলে, এরশাদের কপাল ভালো, দেখবেন, এবারও বন্যা হবে আর তাতে বাংলাদেশ ভেসে যাবে, কিন্তু এরশাদ ঠিক বেঁচে যাবে।

জাহিদ তার কথায় সায় দেয়। বলে গত বছর এরশাদকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলো, মনে হয়, এবারও বন্যাই ওকে শেষ পর্যন্ত বাঁচিয়ে দেবে।

আমানউল্লাহ সাহেব আবার আগের মতো হয়ে গেছেন। মাঝখানের মুষড়ে পড়া ভাবটা এখন নেই। বেশ হেসে হেসেই কথা বলেন। বর্মার রাজনীতির দিকে তাঁর গভীর মনোযোগ। একেকদিন সম্পাদকের কামরাতেই আলোচনা শুরু করে দেন। বলেন, ওয়েস্টার্ন ডেমোক্র্যাসি আমাদের ইস্ট-এ চলবে না, দেখুন চিন্তা করে ইণ্ডিয়া ছাড়া কোথায় আছে ঐ ডেমোক্র্যাসি– আর ওখানেও তো হাজার রকমের জোড়াতালি– আর্মড ফোর্সেস-এর হাত থেকে ক্ষমতা ফিরিয়ে আনা সোজা কথা নয়– তার যোগ্য হতে হবে মানুষকে– প্রোগ্রেস আর ডেভেলপমেন্টের একটা স্টেজ-এ না পৌছান পর্যন্ত ডেমোক্র্যাসি আসে না– আসা উচিত নয়। দেখছেন না, পাশের দেশ বর্মাতে। কী হচ্ছে ? শুধু রেঙ্গুনেই তিন হাজার লোক মরলো পুলিশের গুলিতে– কিন্তু কিছু কি হয়েছে ? কিছু হয় নি– আমাদের দেশের অবস্থাও এমনই হবে– শেষ পর্যন্ত যারা ক্ষমতায় আছে, তারাই থেকে যাবে, দেখবেন ইলেকশন ফিলেকশন যা-ই হোক– ঘুরে ফিরে আর্মির হাতে শাসন থাকবেই।

এডিটর সাহেবই শেষ পর্যন্ত ওঁকে থামান। বলেন, আমানউল্লাহ সাহেব, মানুষকে না হয় গুলি মেরে থামিয়ে দেবেন কিন্তু বন্যাকে কীভাবে থামাবেন ? বন্যা তো ক্যান্টনমেন্ট সুদ্ধ ভাসিয়ে নিয়ে চলে যাবে। তখন আর্মির লোকেরা কী করবে। নিজেদের বাপ, মা-ভাই বোনকে বাঁচাবে, না পাবলিককে গুলি মারার জন্য রাস্তায় বেরুবে।

বলতে বলতে হাসেন সম্পাদক সাহেব, আমানউল্লাহ গম্ভীর মুখে উঠে পড়েন আসর থেকে।

আসলে বৃষ্টি যেন বেশি হচ্ছে। রায়হানের একেকদিন মনে হয়। আগে যে দিনের পর দিন টিপির টিপির বৃষ্টি পড়তো। আজকাল অমন বৃষ্টি হতে দেখে না। বৃষ্টি শুরু হয় ঝমঝমিয়ে। তারপর টানা হয়ে চলে বেশ কিছুক্ষণ। যদি সকালে হলো, তো দুপুরে ঢাকা শহরের রাস্তাঘাট থৈ থৈ পানিতে সয়লাব। রিকশায় উঠলেও রক্ষা নেই, পা গুটিয়ে সিটের ওপর তুলে রাখতে হয়।

আজকাল রায়হান বেশিক্ষণ অফিসে থাকে না। এগারোটার পরে আসে। মিটিং-এ কাটে ঘন্টাখানেক। তারপর লিখতে বসে, নিজের বরাদ্দ লেখাটা শেষ করেই বেরিয়ে পড়ে। না, বাসায় ফেরে না– বাসায় ফিরতে ইচ্ছে করে না তার–

খাওয়া দাওয়া সেরে বের হয়– তাই খেতে যাওয়ার দরকার পড়ে না। খিদে লাগলে প্রেসক্লাবে কিছু খেয়ে নেয়। কিন্তু ওখানে বেশিক্ষণ থাকতে ইচ্ছে করে না। তারপর বেরিয়ে পড়ে। কোনোদিন পাবলিক লাইব্রেরিতে যায়, কোনোদিন মিউজিয়ামে। পড়া বই-ই আবার নতুন করে পড়ে। দেখা জিনিসই ফের নতুন করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

দেখে। দূরের বাস দেখলে একেকদিন খুব ইচ্ছা করে চেপে বসতে। কিন্তু মনের ভেতর থেকেই আবার বাধা পায়। বই পড়ার ফাঁকে একেকদিন মেরির কথা মনে পড়ে। আর অদ্ভুত লাগে তার। আসলে ওর হলোটা কি ? ও কি শেষ পর্যন্ত ঢাকার বাইরে কোথাও চলে গেছে ? যদিও মুনশির কথা স্মরণ হয় যে ওকে সে দেখেছে। কিন্তু তবু তার বিশ্বাস হতে চায় না। একেকবার তার মনে হয়, আসলেই বোধহয় ও অন্য কোথাও চলে গেছে– না হলে একটা খবর পর্যন্ত নিলো না কেন ? নাকি বীথির সঙ্গে দেখা হয়েছিলো ওর– আর সেজন্যেই সে সরে গেছে। ঠিক আছে, গেলো না হয় সরে। কিন্তু ওর পেটের বাচ্চাটা ? যেটাকে ও নষ্ট করতে চায় নি, যেটা নিয়ে ও নতুন করে বাঁচতে চেয়েছিলো, সেই বাচ্চাটার কী হলো। রায়হানের বুকের ভেতরটা স্তব্ধ হয়ে থাকে কিছুক্ষণ মেরির পেটের ভ্রূণটার কথা স্মরণ হলে। তখন না হয় একেবারে প্রথম দিকের অবস্থায় ছিলো। গোপন করতে পারতো, কিন্তু এখন ? এখন তো তার পক্ষে শরীরের অবস্থা গোপন করা সম্ভব নয়। তার বাসায় দু'টি মেয়ে– ওদের চোখ এড়িয়ে সে থাকবে কেমন করে ? তাহলে কি শেষ পর্যন্ত বাচ্চাটাকে ও ফেলে দিয়েছে? যখন হাসপাতালে ছিলো, তখন আব্দুল্লাহর কাছে টেলিফোন করতো, এখন ও কি করে? নিশ্চয়ই করে না। করলে আব্দুল্লাহ অবশ্যই বলতো।

ঐ রকম একাকী যখন রায়হান, অফিস থেকে বেরিয়ে এদিক সেদিক ঘুরে ফিরে সময় কাটিয়ে সন্ধ্যা বেলা কি তারপর বাসায় ফেরে– ঐ রকম সময় ফের একদিন আসে বাহারুল্লাহ মুনশি। এসে টেবিলের ওধারে চেয়ারে বসে মুখোমুখি হয়। বলে, স্যার কিছু একটা করণ লাগে, দেরি করলে কী হইব কইতে পারি না। আমার ভয়– সেতু মিয়া মুহুরি কি য্যান প্যাঁচ কষতেছে।

সেতু মুহুরির পরিচয় দেয় বাহারুল্লাহ। বলে এক্কেরে পিচাশ একটা স্যার, অরে মানুষ কওন যায় না– কোর্ট কাছারি ঘুইরা ঘুইরা পুরান দলিল দেইখ্যা বেড়ায়। তারপর যদি হদিস পায় কুনো জমির, যে মালিক দেখাশুনা করতে পারে না। তাইলে ব্যাস, আর কথা নাই। ঐ জমিতে খুঁটিমুটি বহাইয়া সাইনবোর্ড লাগাইয়া দিবো। রায়হান স্থির বসে থাকে মুখোমুখি। মুনশি এক প্রসঙ্গ থেকে চলে যায় আর এক প্রসঙ্গে। সেতু মুহুরির পর শুরু করে সাদেক সাহেবের খবর। বলে, সাদেক সাহেব মনে হয় স্যার, জমিন বেইচ্যা দিবো। একটু থেমে কিছু যেন ভাবে। তারপর বলে, একদিন তো গাড়ি লাইয়া গেলো। লগে দুই ভর্দলোক, টাই কোট পিন্দা– চেহারা সুরত দেইখ্যা মনে হইল বেশ মালদার লোক। আপনের জমিন খানও দেখল– দেইখ্যা আপনের পরিচয় জিগাইল। মনে হয় আপনেরে চিনে, কইল আপনের লগে নাকি কথা কইব। আমারে জিগাইল, আপনে জমিন বেচবেন কিনা, আমি কি কমু, কিছু কই নাই– খালি কইছি, আমি স্যাররে জিগাইয়া পরে কইতে পারমু। আপনে কি জমিন বেচবেন স্যার ?

মুনশির অমন কথা রায়হানের মনের ভেতরে ঘুরে ফিরে এলে কী হবে। সে পাত্তা দেয় না। কারণ নিজের শরীরের যা অবস্থা, তাতে জমিজমার ঝামেলার ভেতর জড়িয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

পড়লে, দুশ্চিন্তা আর উত্তেজনা উদ্বেগে তার শরীর আরও খারাপ হয়ে পড়বে– আর যদি সে একেবারে বিছানায় পড়ে যায়, তাহলে ও জমি থাকলেই বা কী, আর না থাকলেই বা কী! সুতরাং জমির চিন্তা এলেও মন থেকে সেটা সে ঠেলে সরিয়ে দেয়।

তবে লক্ষ্য না করে পারে না যে বীথি মুনশির সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ ধরে কথা বলেছে। সে জানে জমির ব্যাপারে বীথিও মুনশিকে কিছু বলবে না– কিন্তু তবু অতক্ষণ ধরে কী আলাপ হলো দু'জনের মধ্যে সে কৌতূহলটা তার মনের মধ্যে লেগে থাকে। কারণ বীথির মধ্যে আজকাল সে কোনো ব্যাপারেই কোনো রকম আগ্রহ দেখে না। সংসারের ব্যাপারে এমন উদাসীন সে কোনো সময় ছিলো না। ঘরের মেঝে মোছা হলো কিনা সে খবর সে রাখে না, বিছানার চাদর পাল্টানো হয় না, জানালা-দরজার পর্দা একইভাবে দিনের পর দিন ময়লাই থেকে যায়, রান্নাবান্নার ব্যাপারেও তার যে খেয়াল আছে, তা মনে হয় না। মোমেনার মা নিজের ইচ্ছায় যা করে, তাই হয়। তার বেশি কিছু হতে দেখা যায় না, অন্তত রায়হানের চোখে পড়ে না। কিন্তু কথা কি আর চাপা থাকে? কারণ কিন্তু অন্য কিছু নয়, মুনশিই কারণ। সে কোন কারণে যেন হাল ছাড়ে না। কয়েকবারই সে আসে আর সেই একই কথা বলে। তার পুরো কথাই ফের শোনে স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই– কিন্তু তারা কিছু স্পষ্ট করে বলে না। কী বলবে? মুনশির কথা মতো ঘর তোলার সামর্থ্য থাকলে তো কিছু বলবে? আর দেখাশোনা করার লোকও বা কোথায়? এমনই একদিন হতাশ হয়ে ফেরার সময় মুনশির দেখা হয়ে যায় রঞ্জুর সঙ্গে।

রঞ্জু মুনশির ক্ষুব্ধ চেহারা দেখে দাঁড় করায়। তারপর মুনশির পুরোটা বয়ান শোনে। শেষে বলে, ঠিক আছে, আমি সামনের শুক্রবারই দেখতে যাবো, আপনি আসবেন।

সে মায়ের কাছে কথাটা তুললে দেখে মা ব্যাপারটা পাশ কাটিয়ে যেতে চাইছেন। বললেন, জমিজমার আমি কী বুঝি, তোমরা দেখো, কী করতে পারো। আর আব্বার কাছে কথাটা তুললে তাঁর মুখে হতাশ হওয়া হাসি দেখতে পায়। বলেন, যা হবার হবে, ওসব ব্যাপারে তুমি কোনো রকম মাথা ঘামাতে যেও না, পরীক্ষাটা ভালো করে দাও আগে, তারপর ওসব হবে। জমিজমা খুব খারাপ জিনিস, ওসব ব্যাপারে একবার জড়িয়ে পড়লে মানুষের পক্ষে অন্য কিছু করা সম্ভব হয় না।

রঞ্জুর কাছে গোটা ব্যাপারটা ধাঁধার মতো লাগে। আম্মাকে এ জমির ব্যাপারে কী দারুণ রকমের উৎসাহী দেখেছিলো সে! বলতেন, এতোদিনে একটা ঠাঁই বোধ হয় আমাদের হবে– এই সেদিনও রাতে থাকতে হয়েছিলো বাসায়, তো, টুকু নিজের বিছানা ভাইকে ছেড়ে দিয়ে বসার ঘরে সোফার ওপর শুয়েছিলো, তাই দেখে আম্মা বলেছিলেন, আর কিছুদিন কষ্ট করো তোমরা, এর পর তো নিজেদের বাড়ি হবে, তখন সবাইর নিজের নিজের আলাদা রুম পাবে। টুকুর সঙ্গে কথা বলার সময় একদিন শুনলো, দেখিস তোদের জন্য একটা পার্মানেন্ট লাইব্রেরি করে দেবো বাড়িতে– তোরা সবাই যখন বই পড়ার জন্য পাগল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

সেই মানুষ জমি বেহাত হয়ে যাবার খবর শোনার পরও গা করছে না দেখে মনে খটকা না লেগে পারে ?

কিন্তু ফয়সালাটা সে খুঁজে পায় না, মনের খটকা মনের ভিতরেই থেকে যায়। ফয়সালা খোঁজ করতে যাওয়ার আগেই শুনলো, ফুলবাড়িয়া যাওয়ার বাস বন্ধ, রাস্তায় বন্যার পানি। এক শুক্রবারে কথা হয়েছিলো। পরের শুক্রবারে মুনশির এসে নিয়ে যাওয়ার কথা ছিলো, কিন্তু পরের শুক্রবার এসে না যেতেই ঢাকা শহরের আশপাশের এলাকাগুলো পানির নিচে তলিয়ে যেতে আরম্ভ করে।

বন্যার খবর কাগজে পড়েছিলো। প্রথমে সিলেট, কুমিল্লা অঞ্চলের খবর পাওয়া যায় জুনের মাঝামাঝি সময় থেকে। জুলাইর মাঝামাঝি নাগাদ গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, সিরাজগঞ্জ টাঙ্গাইলে বন্যার পানি বাড়িঘর, ক্ষেত, ফসল ভাসিয়ে নিলো। আগস্টের মাঝামাঝি নাগাদ বন্যার পানি ঘিরে ধরলো ঢাকা শহরের চারদিক, সারা বাংলাদেশের অর্ধেকটা পানির নিচে তলানো। সেপ্টেম্বরে বন্যা আর বাধ মানলো না, ঢুকে পড়লো শহরের ভিতরে। শহরতলীর মানুষ তো পানিতে ভাসছিলোই এবার শহরের ভিতরের মানুষ পানিতে ভাসতে আরম্ভ করলো। মতিঝিলের রাস্তা পানিতে সয়লাব। কোনো কোনো রাস্তায় নৌকো আর রিকশা পাশাপাশি চলতে আরম্ভ করলো। ঢাকা শহরের লোক এমন বন্যা আগে কখনো দেখে নি। রিলিফ সেন্টার যে কতো খোলা হলো তার হিসাব নেই। মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রদের নিয়ে কয়েকটা টিম তৈরি হলো, তারা ঘুরে ঘুরে প্রত্যেক রিলিফ সেন্টারে গিয়ে চিকিৎসা সাহায্য দেবে।

রঞ্জুর টিমে আরও দু'জন সিনিয়র ছাত্র, একজন ইন্টার্নি ডাক্তার আর একজন মেডিক্যাল এ্যাসিস্ট্যান্ট। কাজ কঠিন কিছু না, শুধু দেখে বেড়ানো, ম্যালেরিয়া, সর্দিজ্বর আর ডায়রিয়া এই তিন রোগের ওষুধ সঙ্গে প্যাসিটামল, ওরাল স্যালাইন আর কুইনাইন ট্যাবলেট। তবে কুইনাইন দেয়া হয় না, কারণ ম্যালেরিয়া হয়েছে কিনা সেটা নিশ্চিতভাবে জানা না গেলে কুইনাইন কীভাবে দেয়া যায় ? ইন্টার্নি ডাক্তার সাহেদ ভাই, জ্বরের রোগী দেখলেই জিজ্ঞেস করেন জ্বর আসবার সময় কাঁপুনিতে ধরে ? আর ছেড়ে যাওয়ার সময় খুব ঘাম হয় ? জ্বর দিনে কয়বার আসে ? যদি কাঁপুনি ধরা জ্বর পাওয়া যায় তো ঘাম দিয়ে ছাড়া জ্বরকে পাওয়া যায় না– আর ছুটি পাওয়া জ্বর তো একেবারেই না সুতরাং কুইনাইনের প্যাকেট খোলা আর হয় না। রঞ্জুর বাকি দুই সঙ্গীর একজন মনির আর অন্যজন হুমায়ুন। শাহনিও রিলিফের কাজ করছে– রঞ্জুর মনে হয়েছিলো ও বোধহয় একই টিমে কাজ করার জন্য আগ্রহী হবে। কিন্তু দেখলো প্রথম দিকে শাহনির রিলিফের কাজেই অনিচ্ছা। তারপর দেখা গেলো, ও ইন্টার্নি ডাক্তার কামরান ভাইয়ের টিমে কাজ করছে। রঞ্জুদের কাজ মোহাম্মদপুর, মিরপুর এলাকায়। মিরপুর ব্রিজের পাশে একটা সেন্টারে যেতে হয় বেলা ১০টার দিকে। ওখান থেকে কল্যাণপুরের একটা সেন্টারে কিছুক্ষণ, তারপর মোহাম্মদপুর কম্যুনিটিতে বেলা দুটো পর্যন্ত। তারপর ছুটি– ফের কাজ শুরু বেলা চারটার পরে ঐ একই প্রোগ্রামে। মিরপুর কল্যাণপুর মোহাম্মদপুর; মোহাম্মদপুর কল্যাণপুর মিরপুর। রঞ্জু মিরপুর ব্রিজের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

পাশে মেডিক্যাল সেন্টারে গেলেই মনে মনে মুনশিকে খোঁজে। খুব বেশি দূর তো নয় ফুলবাড়িয়া, মুনশি কি একটু এদিকে আসতে পারে না ? সে অনেক সময় রাস্তায় দাঁড়িয়ে উত্তর-পশ্চিম দিকে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ।

হুমায়ুন একই ব্যাচের ছাত্র হলেও রঞ্জুর সঙ্গে ভালো পরিচয় ছিলো না। কিন্তু যেহেতু মনিরের সঙ্গে ওর খুব বেশি মাখামাখি, সেহেতু রঞ্জুর সঙ্গেও বন্ধুত্ব জমে উঠতে দেরি লাগলো না। একদিন দু'তিন জন ভদ্রলোক গাড়ি হাঁকিয়ে এসে হাজির। কোত্থেকে খবর পেয়েছেন, ঢাকা-আরিচা রাস্তা খুলে গেছে, সেই কথামতো মিরপুর পর্যন্ত এসেছেন। তারপর খোঁজ নিচ্ছেন সাভার পর্যন্ত যাওয়া যাবে কিনা। ব্রিজের পাশের পান সিগ্রেটের দোকানঅলারা হুঁশিয়ার করে দেয়। যাবেন না স্যার, গেলে বিপদ হতে পারে।

গাড়ি থেকে দু'জন নেমে রাস্তায় দাঁড়ালে আন্দাজ করা যায় ভদ্রলোকদের সাভার যাওয়া খুবই দরকার। একজন জিজ্ঞেস করেন, এখান থেকে নৌকা পাওয়া যাবে না ?

হ্যাঁ, খুব পাওয়া যাবে। একজন অল্পবয়সী পানঅলা জানায়। শুধু জানিয়েই ক্ষান্ত হয় না, ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি জুড়ে দেয়। নৌকো এলে দুই ভদ্রলোক আরও একজনকে গাড়ি থেকে নামান। ভদ্রলোকের বোধহয় হাঁটতে অসুবিধা, তাঁরা ভদ্রলোককে ধরে হাঁটিয়ে নৌকোর দিকে রাস্তার ঢালে নামালে, হুমায়ুন হঠাৎ বলে ওঠে, আরে! এতো চন্দনার আব্বা। কথাটা বলেই সে ছুটে যায় ভদ্রলোকদের দিকে।

রঞ্জু অবাক হয় হুমায়ুনের কাণ্ড দেখে। মনিরকে জিজ্ঞেস করে, চন্দনাটা কে ?

আছে, একটা মেয়ে, মনির হালকা জবাব দেয়।

তো ওভাবে ছুটে গেলো কেন ?

বাহ্ যাবে না, হবু শ্বশুরের যত্ন নেবে না!

ও-ও, রঞ্জু বুঝতে পারে। তারপর হাসতে হাসতে বলে, ল্যাংড়া শ্বশুরের জন্য এতো মায়া ?

ল্যাংড়া বলেই তো মায়া, তা না হলে কি ওভাবে ছুটে যেতো!

কবে বিয়ে ? রঞ্জু কৌতূহলী হয়।

কে জানে ? মনির তাচ্ছিল্যের হাসি হাসে। বলে, এমনিতে তো শুনি খুব শিগগির বিয়ে করছি, এসব ব্যাপারে দেরি করা ঠিক নয়- ফসকে যেতে কতোক্ষণ ?

তার মানে ? রঞ্জুর ভুরু কুঁচকে যায়।

মানে কিছু নয়, ওর ধারণা চন্দনা খুব বেশি রকম সুন্দরী, অমন সুন্দরী মেয়েকে যদি কোনো ধনীর দুলাল পছন্দ করে ফেলে তাহলে চন্দনা ওকে আর পুছবে না। তাই বিয়ের জন্য একেবারে মুখিয়ে আছে।

মেয়েটা সত্যিই সুন্দরী ? রঞ্জু ফের জিজ্ঞেস করে। তারপর জানতে চায়, তুই দেখেছিস ?

হ্যাঁ, মনির জানায়, বলে বেশ ভালো সুন্দরী, আমাদের মেডিক্যালের ছাত্রীদের মতো বই আর রোগ ব্যারাম ঘাঁটাঘাঁটি করে সময় কাটায় না, সৌন্দর্য চর্চাও করে।

মেয়েটা ওকে ভালোবাসে ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

কে জানে, মনির ফের ঠোঁট ওল্টায়। বলে, বাসে হয়তো, না হলে হুমায়ুন অতো পাগল কেন?

আরও কেউ তো পাগল হতে পারে, হুমায়ুন সেটা জানে?

তার মানে? মনির গা ঝাড়া দিয়ে সোজা হয়ে বসে। বলে, তুই অমন কাউকে চিনিস?

রঞ্জু হাসে। বলে, হ্যাঁ চিনি, ভালো করে চিনি।

কে, বল তো? বল, একবার বল, আমি শালাকে ফাঁদসুদ্ধ ঘুঘু দেখিয়ে দেবো।

কাকে? রঞ্জু জানতে চায়।

কাকে আবার? ঐ হুমায়ুন শালাকে।

কেন? ওর কী দোষ?

দোষ নয়, দুনিয়াসুদ্ধ সবাইকে বলে বেড়াচ্ছে যে, চন্দনা তাকে ভালোবাসে, তার প্রেমে পাগল।

বেশ তো, বলছে বলুক, তাতে তোর কী?

রঞ্জুর প্রশ্নে মনির থতমত খায়, বোধহয় তার হুঁশ হয়। ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বলে, হ্যাঁ ঠিকই তো, বলছে বলুক, আমার কী? রঞ্জুর বুঝতে অসুবিধা হয় না মনিরেরও কিছু দুর্বলতা আছে চন্দনা সম্পর্কে। সে বলে, একদিন দেখাস তো, দেখবো কেমন সুন্দরী মেয়ে। যে দেখে সে-ই কেন পাগল হয়ে যায়।

সেদিন বেশি কথা হয় না। কারণ খানিক পরই শাহেদ ভাই এসে যায় এবং রোগী দেখাও শুরু হয়ে যায়।

মিরপুর থেকে কল্যাণপুরে যায় টিম, কিন্তু হুমায়ুন থেকে যায় মিরপুরেই। শাহেদ ভাইকে জানায়, তার নাকি ওখানে জরুরী কাজ আছে, কাজটা সেরে সে মোহাম্মদপুরের সেন্টারে চলে যাবে।

কল্যাণপুরে রোগী বেশি ছিলো, তাতে দেরি হলো বেশ। ওখান থেকে বেরুবার সময় পথে সামনা সামনি এক গাড়ি এসে থামে। আর সেই গাড়ি থেকে নামে হুমায়ুন। সে নামলে তাকে সেই ভদ্রলোক, চন্দনার আব্বা, জানালা দিয়ে হাত বের করে সামনের দিকে একটা বাড়ি দেখিয়ে বলেন, ঐ যে, ঐ বাড়িটা, নীল রঙের গেট, ১৩ নং বাড়ি ওখানে চলে এসো।

গাড়ি চলে গেলে, মাইক্রোতে ওঠে হুমায়ুন। শাহেদ ভাই তখন জিজ্ঞেস করে, ভদ্রলোক কে হুমায়ুন?

উনি সাদেক সাহেব, আমার মামা হন, অবশ্যি দূর সম্পর্কের। ঐ সামনের বাড়িতে আমার খালা, মানে ওঁর এক বোন থাকেন।

রঞ্জুর হাত ধরে চাপ দেয় মনির। কিন্তু রঞ্জুর মনে তখন অন্য চিন্তা। এই ভদ্রলোকই কি সেই সাদেক সাহেব? যাঁর সঙ্গে মিলে আব্বা জমি কিনেছেন ফুলবাড়িয়ায়? উনি কি ফুলবাড়িয়ায় গিয়েছিলেন তাঁর জমি দেখতে? সঙ্গে যে দুই ভদ্রলোককে দেখা গেলো যাবার সময়, তাঁরা কোথায় রইলেন? মুনশি যে জমি বেদখল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

হয়ে যাবার আশঙ্কা করছে, এঁরা কি সেই ব্যাপারেই ফুলবাড়িয়া গিয়েছিলেন ? নাকি এঁরা জমি কিনতে চান ? নাকি এঁরাই জোরজবরদস্তি করে দখল করে নিতে চান তার আব্বার কেনা জমি ? রঞ্জু মনে মনে ঠিক করে একদিন হুমায়ুনের সঙ্গে গিয়ে সে সাদেক সাহেবের সঙ্গে দেখা করবে।

কেউ বলে বাংলাদেশের অর্ধেক, কেউ বলে তিন ভাগের এক ভাগ পানির তলায়। তুরাগ নদীর স্রোত রেলওয়ে ব্রিজ ভেঙে ফেলেছে, ডিএনডি বাঁধেরও ভাঙবে ভাঙবে অবস্থা। শীতলক্ষ্যা, ধলেশ্বরী, বুড়িগঙ্গা– কেউ কারও চাইতে কম যায় না। ওদিকে পদ্মা তো উথালপাতাল সমুদ্র। বিক্রমপুর, মুন্সীগঞ্জ এলাকা পাঁচ/ছয় হাত পানির নিচে। খবরের কাগজে আন্দোলনের আর খবর নেই। আটদল, সাতদল, পাঁচদল সব জোটেরই এখন বন্যার পানিতে তলিয়ে যাবার অবস্থা। কারণ প্রেসিডেন্ট আর মন্ত্রীরা বন্যাত্রাণের জন্য কোথায় কোথায় ত্রাণ দিতে গেছে সেই খবরেই কাগজ থাকে ভর্তি। এরশাদ সাহেব পায়ে গামবুট আর গায়ে বুশ শার্ট পরে পানি ভেঙে রিলিফ দিয়ে বেড়াচ্ছেন, এই ছবি কাগজে দেখা গেলো, টেলিভিশনের পর্দায় দেখা গেলো, রেডিওতে তার মর্মস্পর্শী বর্ণনা শোনা গেলো। একদিন শোনা গেলো মিরপুরের রাস্তা বন্ধ, কল্যাণপুরের ব্রিজের ওপারে আর বাস যাচ্ছে না। বাস না, ট্রাক না, গাড়ি না। ঢাকা মহানগরী এখন বিচ্ছিন্ন, খবরের কাগজে হেডলাইন হলো খবরটা। রায়হানকে একদিন রিকশায় করে মতিঝিল পার হয়ে যাবার সময় পাদানি থেকে পা সিটের ওপর তুলে বসতে হলো। অফিসের রিপোর্টাররা সবাই দারুণ ব্যস্ত। এমন কি নিউজের আব্দুল্লাহ পর্যন্ত। নতুন ফটোগ্রাফার ইসমাইলকে নিয়ে যে কাঁহা কাঁহা ঘুরে বেড়ায়, হদিস পাওয়াই মুশকিল। একদিন শুনলো মাতুয়াইল এলাকা ঘুরে এসেছে। নৌকো উল্টে যাওয়াতে বন্যার পানিতে আচ্ছামতো নাকানি চুবানি খেয়েছে। ওর কাছেই শোনা গেলো মোহাম্মদপুরের উল্টো দিকে নদীর ওপারে সবই ডুবে গেছে– ঘরবাড়িগুলো পর্যন্ত। শুধু খুব উঁচু জায়গার বাড়িগুলোর চাল দেখা যায়। আব্দুল্লাহর নিজের হাতে তোলা ছবি ছাপা হলো কাগজে। শহর রক্ষা বাঁধের কথা শুধু কাগজে কলমেই রইলো। তার কাজ কলতে কিছুই হলো না এমন একটা আলোচনা আমানউল্লাহ সাহেবের লেখা পোস্ট-এ ছাপানো হলো। ভদ্রলোকের দারুণ উৎসাহ। বলেন, এখন যদি মানুষকে মানুষের পাশে না পাওয়া যায়, তাহলে আর কখন পাওয়া যাবে ? নিজের চোখে সরকারী দলের রিলিফ কমিটির কাজ দেখে বেড়ান। কোনো কোনোদিন আব্দুল্লাহর সঙ্গে তাঁর লেগে যায়। একেকদিন জাহিদের সঙ্গেও। বলেন, এরশাদ সাহেব ক্ষমতায় আছেন বলে মানুষ ভরসা পাচ্ছে, মানুষের মনের ভিতরে সাহস আছে। আর্মি যেভাবে এমারজেন্সি বেসিসে রিলিফের কাজ করছে, এরশাদ ক্ষমতায় না থাকলে তা সম্ভব হতো ? কখনও না।

জাহিদ প্রতিবাদ করে। বলে, এসব আপনি কী বলেন আমান ভাই, অন্য কেউ ক্ষমতায় থাকলে আর্মি কাজ করতো না ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

না, করতো না, আমানউল্লাহ টেবিল চাপড়ে বলেন, করা সম্ভব হতো না, তুমি দেখো চিন্তা করে, বন্যা আগেও হয়েছিলো, তখন কে ছিলো ক্ষমতায় ? জিয়া, নয় কি? আর্মি তখনও সমান উৎসাহ নিয়ে কাজ করেছে, কিন্তু তার আগে ?

তার আগে কী ? জাহিদ পাল্টা জিজ্ঞেস করে।

তার আগে ছিলো পলিটিক্যাল সিভিল লীডারশিপ, বাকশাল, তারও আগে আওয়ামী লীগ, তখন কি আর্মি গেছে কাজ করতে ?

তখন বন্যা হলে তবে না কাজ করতে যাবে ? যেতে বলা হলে তবে না যাবে, আর্মিকে কি ডাকা হয়েছিলো ?

বন্যা না হোক, দুর্ভিক্ষ তো হয়েছিলো। আমানউল্লাহর ঘাড় এবং গলার স্বর একটুও নিচু হয় না।

একটু থেমে আমানউল্লাহ আবার বলেন, আর্মি ক্ষমতায় থাকলে চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষ হতো না, বুঝলে ?

রায়হান তর্কটা উপভোগ করছিলো। জাহিদের পক্ষ নিয়ে সে বলে ফেললো, আমান ভাই, ঐ দুর্ভিক্ষের প্রধান কারণ তো ছিলো ক্রপ ফেইলিওর, নয় কি ? তারও কারণ আবার খরা– তো আপনি কি বলতে চান আর্মি প্রেসিডেন্ট থাকলে তার হুকুমে বৃষ্টিও নামতো ?

আমানউল্লাহ মনে মনে উল্লাসের হাসি হাসেন সম্ভবত। ক্রপ ফেইলওর তো নতুন কোনো ঘটনা নয়– ব্যাপারটা হচ্ছে সিচুয়েশন ট্যাকল করা নিয়ে। বিদেশ থেকে সাহায্য আনার ব্যবস্থা কেন করা হয় নি ? কেন দেশ থেকে খাদ্য হাওয়া হয়ে গেলো বলুন ?

তর্কে ছেদ পড়ে যায়, কারণ ঐ সময় আব্দুল্লাহ এসে যায় মাঝখানে, তারপরে নিজের কামরা থেকে বেরিয়ে আসেন সম্পাদক নিজে। এসেই জিজ্ঞেস করেন, কী ব্যাপার ? তর্কটা কী নিয়ে ?

আমানউল্লাহ হাসি হাসি মুখ করে পাশ কাটাবার চেষ্টা করেন। বলেন, না তেমন কিছু না এমনি, নিজেদের মধ্যে আর কি।

জাহিদ কিন্তু পাশ কাটায় না। বলে, আমান ভাই, আর্মি রুলের পক্ষপাতী, তাঁর ধারণা আর্মি ক্ষমতায় থাকলে বন্যা হতো না।

সম্পাদক আমানউল্লাহর দিকে তাকিয়ে থাকেন। বলেন, মুখোমুখি তর্কের কী দরকার। আপনারা নিজের নিজের মত লিখে জানান না কেন মানুষকে ? আপনাদের তো লেখার সুযোগ আছে।

তর্কটা শেষে আর জমে না।

তেইশ

হুমায়ুন যে সাদেক সাহেবদের বাড়িতে প্রায়ই যায়, আর তাঁর মেয়েই যে চন্দনা ও খবরটা জানার পর রঞ্জুর খুব ইচ্ছা ছিলো, একবার সুযোগ পেলে চন্দনার সঙ্গে আলাপ করবে। আর যদি সেটা পারে, তাহলে সাদেক সাহেবের সঙ্গেও সে দেখা করতে যাবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

মোহাম্মদপুরের রিলিফ ক্যাম্প-এ একদিন চন্দনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলো হুমায়ুন। আলাপ শুরু হওয়ার পর, রঞ্জু লক্ষ্য করে, চন্দনা তার মুখের দিকে তাকিয়ে কিছু যেন দেখে। কী দেখে সে-ই জানে, কিন্তু ও ব্যাপারে কিছুই বলে না সে। ইউনিভার্সিটির একটা গ্রুপ শুকনো খাবার নিয়ে এসেছিলো। সেই খাবার যখন বিলি হচ্ছিলো, তারই এক ফাঁকে হুমায়ুনের কাছে এসেছিলো চন্দনা। চিকিৎসা কেন্দ্রে তখনও রোগী আসে নি। হুমায়ুন দু'জনকে পরিচিত করিয়ে দিলে রঞ্জু দুই প্রেমিক-প্রেমিকাকে নিরিবিলিতে কথা বলার সুযোগ করে দেয়ার জন্য বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছিলো। তাতে চন্দনা বলে ওঠে, আরে! আপনি কোথায় যাচ্ছেন ? আপনার বাইরে যাওয়ার দরকার নেই। আমরা গোপন কোনো কথা বলছি না। রঞ্জু তবু বাইরে বেরিয়ে আসে। আসবার সময় বলে, হুমায়ুন তো বলে, আপনার সঙ্গে আজকাল ওর নিরিবিলি কথা বলার সুযোগ হয় না। এখন তো এখানে আর কেউ নেই, আমি ছাড়া। তাই আমি বেরিয়ে যাচ্ছি, একটা সুযোগ অন্তত হোক।

আসলেই বেশিক্ষণ ওদের কথা হয় না। একটু পরই দু'জনে বেরিয়ে বারান্দায় আসে। চন্দনা বিদায় নেবার সময় রঞ্জুর মুখের দিকে তাকিয়ে ফের হাসে। বলে, যাই এবার, নিরিবিলি কথা বলার সুযোগ করে দেয়ার জন্য ধন্যবাদ।

রঞ্জু প্রশ্নটা ঐ সময় করে। বলে, আপনার আব্বার নাম তো সাদেক সাহেব, ঠিক না ? চন্দনা স্বীকার করে বলে, হ্যাঁ, কেন ? আব্বার পুরো নাম মোল্লা সাদেকুজ্জামান খান।

আপনাদের তো বোধহয় ফুলবাড়িয়া এলাকায় জায়গা কেনা হয়েছে।

আরে ? চন্দনার চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠে। বলে, সে খবর আপনি কীভাবে জানলেন।

রঞ্জু তখন জানায়। বলে, আপনাদের জমির পাশে আমরাও জায়গা কিনেছি।

আপনার আব্বা সাংবাদিক, তাই না ? ওর নাম রায়হান সাহেব। খুব নামকরা লোক আপনার আব্বা। আম্মা বলেছেন, একবার ওঁকে দেখেছি– কিছুদিন আগে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ছিলেন। খুব অদ্ভুত কাণ্ড মনে হচ্ছে না ?

কেন, অদ্ভুত কেন ? রঞ্জু জিজ্ঞেস না করে পারে না।

বাহ্ অদ্ভুত না ? চন্দনা হাসতে হাসতে বলে, আপনাদের সঙ্গে আমার আজ দেখা হচ্ছে। এক বছর আগেও তো দেখা হতে পারতো, এমনও তো হতে পারে যে, আমরা পাশাপাশি বাড়িতে বাস করছি।

আচ্ছা, আপনারা কি ওখানে বাড়িটাড়ি কিছু তুলবেন, খুব শিগগির ?

চন্দনা মাথা নাড়ায়। বলে, আমি ঠিক জানি না, আব্বা তো এখনও পুরো সুস্থ হন নি তবু সেদিন আব্বাকে বলতে শুনলাম যে, ফুলবাড়িয়ার লোকজন নাকি ভালো না। ওখানে বাড়ি করলে অসুবিধা হবে, ও জায়গা বিক্রি করে দেয়া ভালো, কয়েকদিন আগে তো দু'জন ভদ্রলোককে দেখলাম, জমি কেনার জন্য ঘোরাফেরা করছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

রঞ্জু শুনে যায়, আর কয়েকদিন আগে যে নৌকোয় চেপে ফুলবাড়িয়া গিয়েছিলেন তিন ভদ্রলোক, একজন ক্রাচে ভর দিয়ে হাঁটছিলেন, সেই ঘটনাটা মেলায় আর নিশ্চিত হয়।

চন্দনা কী বোঝে সে-ই জানে। বলে, আমার আম্মা বোধহয় জমিটা বিক্রি করতে রাজি না– ও জায়গাটা ওঁর খুব পছন্দ ছিলো– ওঁর মত না থাকলে ও জায়গা আব্বা বিক্রিও করতে পারবেন না, কারণ জায়গাটা তো কেনা হয়েছে দু'জনের নামে।

রঞ্জু বলে, আমি আপনার আব্বার সঙ্গে দেখা করতে পারবো ?

বাহ্ কেন পারবেন না চন্দনা হাসে। বলে, তবে ওঁর কথা এখনও পুরো স্পষ্ট হয় না। আপনি একদিন হুমায়ুনের সঙ্গে চলে আসুন বাসায়, আপনি তো বোধহয় শুনেছেন, আমরা শাজাহানপুরে থাকি, এলে কিন্তু সন্ধ্যার দিকে আসবেন, আব্বা আজকাল কিছুদিন থেকে অফিসে যাচ্ছেন।

চন্দনাকে গেট পর্যন্ত গিয়ে বিদায় দিয়ে হুমায়ুন পাশে এসে দাঁড়ালে রঞ্জু বলে, হুমায়ুন আপনার ভাগ্য খুব ভালো, চন্দনা শুধু দেখতেই সুন্দর নয়, ওর ব্যবহারও খুব মিষ্টি– বিয়েটিয়ে করার ইচ্ছে থাকলে ঝটপট করে নেয়াই ভালো, সময়কে বিশ্বাস নেই। টাইম ইজ মোস্ট ট্রেচারাস নাউ।

রঞ্জুর মনে হয়েছিলো, সাদেক সাহেবের সঙ্গে আলাপ করে ফুলবাড়িয়ার জমি সম্পর্কে একটা ধারণা নেয়ার চেষ্টা করবে। আর যদি জমিটা বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন ভদ্রলোক, তাহলে সেও আব্বা আম্মাকে রাজি করাবে। তার বিশ্বাস ওঁরা রাজি হবেন, কারণ আব্বার শরীরের যা অবস্থা, তাতে ঐ জমি নিয়ে দৌড়ঝাঁপ করা তাঁর পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হবে না, আর এখন টাকাও তো দরকার। টাকা না হলে আব্বার চিকিৎসা কেমন করে হবে ? কথাটা ভাবে বটে, কিন্তু ও ব্যাপারে সে কিছুই করতে পারে না। একে তো সময় পায় না, আর মনের অবস্থাও হয়ে পড়ে বেহাল।

যেদিন চন্দনার সঙ্গে কথা হলো সকাল দশটার দিকে, ঐদিনই বিকালের দিকে হাসপাতালের ওয়ার্ড ডিউটি সেরে বেরুচ্ছে, ঐ সময় শাহনির সঙ্গে দেখা। সে হোস্টেল থেকে সাজগোজ করে বেরুচ্ছে। সঙ্গে আরমান। আরমান সহপাঠীও বটে, বন্ধুও। শাহনি যে গ্রুপে রিলিফের কাজ করছিলো, আরমানও ছিলো সেই গ্রুপেই। সে বন্ধুকে দেখে হাত তুলে ডাকলো।

কী ব্যাপার ? রঞ্জু কৌতূহলী হয়।

আরমান হাসে। বলে, ফ্লাড রিলিফের চ্যারিটি শোতে যাচ্ছি। তুমিও চলো, টিকিট পেতে অসুবিধা হবে না। রঞ্জু লক্ষ্য করে, শাহনি মুখ ফিরিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে কিছু যেন দেখছে।

রঞ্জু জিজ্ঞেস করে, তোমাদের টিমের রিলিফ কাজ শেষ ?

আরে নাহ্, আরমান হালকা ভঙ্গিতে বলে, ওসব কাজ কি এতো তাড়াতাড়ি শেষ হয় ? পানি নেমে গেলে কী হবে, মানুষ শেল্টার ছেড়ে যেতে চায় না। গরিব তো সবাই– আমি রোটারাক্টি-এর মেম্বার– ওদের সঙ্গে কাজ করছি, সব জায়গাতেই একই অবস্থা। এই চ্যারিটি শো-এর প্রোগ্রামের সঙ্গেও আমি আছি, তাই আমাদের গ্রুপের খবর পুরোপুরি বলতে পারবো না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

শাহনির খবর কি ? ও নিশ্চয়ই বলতে পারবে ? রঞ্জু প্রায় গায়ে পড়ে জিজ্ঞেস করে।

শাহনি ঘুরে দাঁড়িয়ে ঠোঁট উল্টে বলে, ওসব খবর রাখতে আমার বয়ে গেছে! ঐ টিমে কাজ করতে বলেছিলেন রহিম স্যার। কাজ করে দিয়েছি সাত দিন, ব্যস, আর কতো?

শাহনির মুখের ভঙ্গি দেখে রঞ্জুর ভালো লাগে না। কিন্তু কিছু বলে না সে।

দু'জনে হাঁটতে হাঁটতে এগোয়। শাহনি একবার রঞ্জুর দিকে পেছন ফিরে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, কী হলো, তুমি আসবে না ?

রঞ্জু দাঁড়িয়ে থাকে। বলে, না, তোমরা যাও, আমি খুব টায়ার্ড, একটু ঘুমাবো।

শাহনি ঝাঁকি দিয়ে মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যায়। রঞ্জু লক্ষ্য করে, শুধু পাশাপাশি হাঁটে না, শাহনি আরমানের হাতটাও ধরে রাখে হাঁটবার সময়।

আরমান গাড়ির দরজা খুলে দাঁড়ায়। শাহনি গাড়িতে বসলে সে ভদ্দরলোকি কেতা দেখিয়ে দরজা বন্ধ করে ঘুরে এসে ড্রাইভিং সিটে বসে। রঞ্জু গোটা দৃশ্যটা দূর থেকে দেখে। তার জানতে ইচ্ছে করে, শাহনি যে রঞ্জুর সঙ্গে এক টিমে কাজ করতে চায় নি, সে কি এই জন্য ? আরমানের সঙ্গে ওর কি অন্য ধরনের সম্পর্ক দাঁড়িয়ে গেছে এই অল্প ক'দিনের মধ্যে ? ও কি এতোই হালকা স্বভাবের মেয়ে ? তার বিশ্বাস হতে চায় না। প্রায় বছরখানেক ধরে দু'জনের ঘনিষ্ঠতা, প্রথম প্রথম ঠোকাঠুকি হতো, তারপর তো ভালোরকম বন্ধুত্ব হয়ে গেলো। ওর ভাই খুন হওয়ার পর ওর অবস্থা কী হয়ে পড়েছিলো, সেটা তার মনে পড়ে– ঐ দুটো দিন সে বন্ধুর ওপর কেমন নির্ভর করেছিলো তাও তার মনে পড়ে। তার ঘাড়ে মাথা রেখে সে কতবার কেঁদেছিলো, তার হিসাব নেই। এই তো সেদিনকার কথা, অনেক রাতে হাসপাতাল থেকে হোস্টেলে ফেরার পথে রঞ্জু হাত ধরে ছিলো সারাটাক্ষণ। ঐ হাত ধরা অবস্থাতেই বলেছিলো, দেখো, আমি অতোসব নিয়মকানুনের জন্য অপেক্ষা করে বসে থাকতে পারবো না, তোমার বাবা-মা আমাকে অপছন্দ করেন নি, সেটা আমি জানি, ব্যস, তারপর আমার চিন্তা করার কিছু নেই, পরীক্ষার রেজাল্ট বেরুবার দিনই আমি তোমাদের বাড়িতে গিয়ে উঠবো।

হাসতে হাসতে কথাটা বলেছিলো। বর্ষার মেঘভাঙা আকাশে চাঁদ ছিলো, ভেজা হাওয়া এসে লাগছিলো চোখে মুখে, জোৎস্নাও ছিলো কপালে গালে চিবুকে। হাসতে হাসতে বললে কি ? ঐ কথা যে ওর বুকের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছিলো সেটা বুঝতে রঞ্জুর একটুও অসুবিধা হয় নি। সে মুখে কিছু বলেনি। তার মুঠোর ভেতরে ধরা শাহনির হাতটা সে আরো জোরে চেপে ধরেছিলো।

শাহনির আচরণ তার কাছে অবিশ্বাস্য লাগে। এখন যা ও দেখালো, সেটা কি ইচ্ছে করে ? রঞ্জুকে সে তুচ্ছ জ্ঞান করতে পারে সেটাই বোঝাবার জন্য ? নাকি আরমানের সঙ্গে ওর কোনো রকম বোঝাপড়া হয়ে গিয়েছে। চিন্তাটা মাথায় নিয়ে সে নিজের রুমে ফেরে। খানিক অবাকও লাগে তার। আসলে কি তার নিজের ভেতরেই কোনো রকম অসম্পূর্ণতা আছে ? মেয়েরা তাকে বন্ধু ভাবে, বন্ধু হিসাবে নির্ভরও করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

হয়তো। কিন্তু ঐ পর্যন্তই সীমানা, তার বেশি নয়। মোহনগঞ্জে খুকুর সঙ্গে যা হয়েছিলো, সেও তো এমনই। চিঠিতে কতো কিছু লিখেছিলো, যখন দেখা হলো, তখন তার চোখেমুখে খুশি একেবারে ঝলমল করছিলো। কিন্তু তারপর ? মোহনগঞ্জ থেকে ফেরার আগের দিন সে নিজেই নদীর ধারে বেড়াতে যেতে বলে আর সেখানেই তার আসল ভালোবাসার বিশ্ব নামের তরুণটির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। শাহনির ব্যাপারেও তো তাই হতে যাচ্ছে। রঞ্জু সে রাতে অনেকক্ষণ পর্যন্ত ঘুমোতে পারে না।

বাংলাদেশে গত ৩৩ বছরের মধ্যে আর এতো বড় ভয়াবহ বন্যা হয় নি। তার মানে '৫৪ সালের ভয়াবহ বন্যার পর এই '৮৮ সালের আর এক ভয়ঙ্কর সর্বগ্রাসী বন্যা। শেষ হিসেবে দেখা যাচ্ছে, উত্তরবঙ্গের কিছু এলাকা আর চট্টগ্রামের কিছু এলাকা বাদে গোটা বাংলাদেশ বন্যার পানিতে ভেসে গিয়েছে। মাঠের ধান যেমন, তেমনি গোলার ধানও দুইই ভেসে লোপাট– এখন রোপা আমনটা যদি ধরতে পারে কৃষাণ, তাহলে রক্ষা। না হলে যে কী হবে, তা কেউ-ই জানে না। ম্যাক্রো ইকোনমি, মাইক্রো ইকোনমি, ফ্রি মার্কেট, ফ্রি মুভমেন্ট অফ কমোডিটি এ্যান্ড ক্যাপিট্যাল, সেই সঙ্গে কনজুমার্স সোসাইটি, সিভিল সোসাইটি সব কিছু বানভাসিদের মতোই কয়েকদিন ভাসলো, পায়ের তলায় মাটির নাগাল পেলো না। বন্যার পানি নামলো ঠিকই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কি মাটির ভিত পাওয়া গেল ? উঁচু শক্ত ভিতের মাটি পেতে এখনও অনেক দেরি, কারণ পা দিলেই থকথকে কাদা। মানুষের পা, ফসলের বীজ, ইনফ্রাস্ট্রাকচার, সাহসী হয়ে লড়াই করার আহ্বান, সবই কাদার তলায় দেবে যায়।

খবর পাওয়া গেলো ৩০ লাখ টন খাদ্য আমদানি করতে না পারলে মরণ। তো মরণ কি শুধু ভাতের অভাবে ? মাথার ওপর ছাউনি না থাকলে মানুষ মরবে না ? অসুখ বিসুখ রোগ ব্যারাম নেই ? পথঘাট কি পানি সরে গেলেই পাওয়া যাবে ? ঢাকা শহর থেকে তো পানি নেমে গেলো, কিন্তু তবু আশ্রয় কেন্দ্র থেকে লোকজন সরে যায় না কেন ? এখনও ১০ লাখ লোক কেন থাকে ? কলেরা হাসপাতালে ঠাঁই নেই, রোগীর ভিড় এতো বেশি যে বাইরে তাঁবু খাটিয়ে রোগীর চিকিৎসা হচ্ছে, শুধু কলেরা হাসপাতালে নয়, সব হাসপাতালেই এক অবস্থা। যখন বন্যার পানি চারদিকে থইথই করতো, চারদিকে তখন রিলিফ সেন্টারে রোগীর ভিড় ছিলো না। এখন বন্যার পানি সরে যাচ্ছে, আর রোগীর ভিড় বাড়ছে। সেন্টারে গিয়ে পৌছতে না পৌছতে লম্বা লাইন লেগে যায়। মিরপুর, কল্যাণপুর গেলে, মোহাম্মদপুর যাওয়ার সময় থাকে না, আবার মোহাম্মদপুর, মিরপুর গেলে কল্যাণপুর বাদ দিতে হয়। পানি নেমে গেলে কী হবে, রাস্তাঘাটের এমন অবস্থা যে গাড়ি চলে না, দূরের মফস্বল গ্রামে কী হয় কে জানে, শহরতলীতেই চালের বস্তাবাহী ট্রাক উল্টে যাওয়ার খবর কাগজে পাওয়া গেছে। ট্রেন চলাচল শুরু হলো ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে। রাজনৈতিক আন্দোলন এখন বন্ধ। সরকারী বেসরকারী সাহায্য কী পরিমাণ আসছে, আর কতো সাহায্য মানুষকে কোথায় কোথায় দেয়া হচ্ছে সে সব খবরেই এখন কাগজ ভর্তি থাকে। এডিটোরিয়াল পেজ– এও ঐ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

একই ধরনের ছুতো ধরে লেখালেখি চলে। বিরোধী দলের পক্ষ থেকে রিলিফ চুরির অভিযোগ আর সরকারী দলের তরফ থেকে ঘন ঘন হুঁশিয়ারি যে, রিলিফ চুরির জন্য কঠিন শাস্তি দেয়া হবে– এই হলো এখনকার খবরের কাগজ। অন্য খবর থাকলেও তা মানুষের নজরে পড়ে না, পড়লেও তাতে কেউ মাথা ঘামায় না। বর্মায় যে সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে গণঅভ্যুত্থানের ঘটনা ঘটতে চলেছে, সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে বেজায় গোলমাল এসব খবর নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। খবরের কাগজের অফিসেও কেমন যেন ঝিমুনির ভাব। জাহিদ বলে, এমন বন্যা এলো এবার যে, মানুষের মগজ পর্যন্ত ভিজিয়ে স্যাঁতসেঁতে করে দিয়ে গেলো– এখন মগজ থেকে গরম কিছু বেরুনো মুশকিল। রায়হানের অফিসের কাজ আজকাল বেশ সহজ হয়ে গেছে। হয় বন্যা ত্রাণের ওপর, নইলে বন্যার পরে পুনর্বাসনের ওপর কিংবা খুব জোর হলে আইন-শৃঙ্খলার ওপর লিখতে হয় তাকে। এডিটর সাহেবের এটাই সিদ্ধান্ত, কারণ পুরনো লোক বলতে সে-ই এক নম্বরে আছে– '৭৩-৭৪-এর বন্যার সময় লিখেছিলো গতবছর '৮৭তেও সে ভালো লিখেছে বন্যা নিয়ে। সুতরাং ও দায়িত্ব যে তার ওপরই পড়বে সেটা সবাই জানতো। তাই ফার্স্ট সেকেন্ড কিংবা পোস্ট এডিটোরিয়াল পেজ-এ যেখানেই লিখুক, সে বন্যা নিয়েই লেখে। একদিন আব্দুল্লাহ জিজ্ঞেস করে বসলো, রায়হান ভাই, কী মনে হয়, দুর্ভিক্ষ হবে?

রায়হান জবাব দিতে পারে না। কারণ অনেকের অনুমান দুর্ভিক্ষ হবে। গুদামের অনেক খাদ্য নষ্ট হয়েছে, পথঘাট ভাঙাচোরা, ত্রাণসামগ্রী পৌঁছানো যাবে না ঠিক সময়মতো। আবাদের ক্ষতি হয়েছে, লোকজনের হাতে কাজ না থাকার জন্য জিনিস কেনার ক্ষমতা থাকবে না, এমন অবস্থায় দুর্ভিক্ষ না হয়ে পারে? আবার অনেকের ধারণা, তাড়াতাড়ি বন্যার পানি নেমে যাচ্ছে, সুতরাং গুদামের ক্ষতি কম হবে। পথঘাট চলাচলের উপযোগী হয়ে উঠতে দেরি হবে না। আর ফসলহানি হলেও হবে কম। তাছাড়া সরকার প্রথম থেকেই খুব হুঁশিয়ার– প্রেসিডেন্ট নিজে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন বন্যাদুর্গত অঞ্চলে, এমন অবস্থায় দুর্ভিক্ষ কীভাবে হয়? তার ওপরে বিদেশী সাহায্যও আসছে প্রচুর, সেটা খবরের কাগজ খুললেই দেখতে পাওয়া যায় না কি?

রায়হান আব্দুল্লাহর প্রশ্নের জবাব দিতে পারে না। আর সে জন্যই সম্ভবত আব্দুল্লাহ হাসতে হাসতে বলে, যতো পারেন আড়াল করুন সরকারকে। কিন্তু দেখবেন, এই বন্যাই এরশাদকে ডোবাবে।

রায়হানও পাল্টা হাসে। বলে, পরে কী হবে সেটা জানি না, কিন্তু এই বন্যা যে এরশাদকে আপাতত বাঁচিয়ে দিলো তাতো দেখতেই পাচ্ছি– বরং বন্যার কাদামাটিতে অপোজিশনের পা-ই যে দেবে গেছে, তা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না।

আব্দুল্লাহর উৎসাহেই কিনা কে জানে, একদিন জাহিদের লেখা সেকেন্ড এডিটোরিয়াল 'দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি' 'গণ একতা'র সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় বেরিয়ে গেলো। ব্যস, ঐ লেখার জন্যই টনক নড়ে উঠলো সরকারের। ঐ দিন দুপুরেই সচিবালয় থেকে টেলিফোন। ইনফরমেশন মিনিস্ট্রি জানতে চায় দুর্ভিক্ষ কোথাও হয় নি, ও সম্পর্কে কোনো রিপোর্টও বেরুচ্ছে না কোথাও, তবু কেন অমন এডিটোরিয়াল?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

মন্ত্রণালয় থেকে কোন পেয়ে সম্পাদক বেশ ফাঁপরে পড়ে যান। তিনি জাহিদের পক্ষে কিছু না বলে বা দুর্ভিক্ষের লক্ষণ যে দেখা যাচ্ছে, সে ব্যাপারে কিছু না বলে, ব্যাপারটা খতিয়ে দেখবেন এবং ব্যবস্থা নেবেন বলে তখনকার মতো পাশ কাটান। তারপর ঐ দিনই সন্ধ্যা বেলা রিপোর্টিং, নিউজ, এডিটোরিয়াল– সব সেকশনের সিনিয়রদের ডেকে মিটিং করেন। আমানউল্লাহ সাহেবকে বেশ উত্তেজিত মনে হয়। থেকে থেকেই বলেন, ইচ্ছামত সাজিয়ে গুছিয়ে মিথ্যা কথা লিখলে কি সেটা জার্নালিজম হয় ? এ ব্যাপারে ডিরেক্টরদের ওপিনিয়ন নেয়া দরকার– এ সরকার জার্নালিজমের দুর্নীতি কিছুতেই সহ্য করবে না– যদি আমাদের কাগজের ওপর হামলা হয়ে যায়, তখন কী হবে ? ইত্তেফাক গ্রুপের কাগজ ব্যান্ড যখন করতে পারে, তখন আমরা কোন ছার!

আব্দুল্লাহ উসখুশ করছিলো, ঐ কথার পর বলে উঠলো, করে দেখুক ব্যান্ড– তারপর বুঝবে কতো ধানে কতো চাল ?

আমানউল্লাহর স্বরে শ্লেষ ঝরে। বলে, কতো ধানে কতো চাল যে হয় তা বুঝছেন না এখন, 'যায় যায় দিন' ওয়ালারা ? পাঁচ বছর তো হয়ে গেল। পেরেছে কিছু করতে?

সম্পাদক সাহেব কথা বাড়তে দেন না। বলেন, বরং একটা ডিসিশন এরকম হোক যে সকালে যেমন মিটিং করি আমরা, এখন থেকে অমন একটা মিটিং বিকালেও করবো আমরা। যাতে আমরা দেখে বুঝে নিতে পারি, আসলে কোন ধরনের লেখা শেষ পর্যন্ত ছাপা হতে যাচ্ছে।

ব্যাপারটা গুরুতর কিছু ছিলো না– দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে, এমন কোনো কথাও ছিলো না ঐ সেকেন্ড এডিটোরিয়ালে। শুধু হুঁশিয়ারি দিয়ে বলা হয়েছিলো। খাদ্য ঘাটতির পরিমাণ যা দেখানো হচ্ছে তা আনুপাতিক হারে '৭৪ সালের মতোই কিন্তু পপুলেশন তো এখন অনেক বেশি– এই সঙ্গে যদি চালের দাম ক্রমাগত বাড়তে থাকে, তাহলে সেটা কি দুর্ভিক্ষের আশঙ্কাকে দূর করবে, না কি বাড়িয়ে তুলবে ? আশ্বিনে আউশ ওঠার পর যদি চালের দাম বাড়ে, তাহলে কার্তিকের মংগায় উত্তরবঙ্গের অবস্থা কী দাঁড়াবে ?

লেখাটা অমন যুক্তি দিয়ে লেখা হলে কী হবে, 'গণ একতা'কে যে সরকারের পোঁ ধরানো চাই। সরকারী দলের ভিতর থেকেই বোধহয় ইঙ্গিতটা দেয়া হয়েছিলো, আমানউল্লাহ সাহেবও এডিটর সাহেবকে সম্ভবত কিছু বুঝিয়েছিলেন। তাতে মনে হচ্ছিলো, সরকারের চাপে পত্রিকার মালিকপক্ষ কিছু শাসন নিশ্চয়ই করবে। অনেকেরই আশঙ্কা হয়েছিলো, মালিকপক্ষ হয়তো জাহিদকে সরিয়ে দেবে। জাহিদও অমনই কিছু আঁচ করেছিলো বলে মনে হতো। কথাবার্তা কম বলতো, আমানউল্লাহ সাহেবের সঙ্গে তো একেবারেই না। ও যে অফিসে আছে, তা টেরই পাওয়া যেতো না কিছুদিন।

শেষে দেখা গেলো অদ্ভুত কাণ্ড। ঘটনা ঘটেছে সম্পূর্ণ উল্টো। কিছুদিন আগে সম্পাদক নিয়ে যা ঘটেছিলো জাহিদের ব্যাপারেও তাই ঘটলো। বরং বলা যায় বেশি বেশিই ঘটলো। অর্থাৎ মালিকপক্ষ জাহিদের পক্ষে দাঁড়িয়ে গেলো। সরাসরি কেউ কিছু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বললেন না, তবে বোঝা গেলো জাহিদের লেখার মধ্যে দোষের কিছু কেউ দেখলেন না। বরঞ্চ একদিন চার মালিকের একজন, হারুন খান, সম্পাদকের চেম্বারে বসে দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি সম্পাদকীয়টার খুব নাম করে গেলেন। বললেন, যদি ফের কেউ টেলিফোন করে তো তাকে বলবেন, 'গণ একতা' কোনো পার্টির পত্রিকা নয়। কিংবা সরকারী কাগজও নয়– সুতরাং সরকারের বা কোনো দলের মুখের দিকে তাকিয়ে 'গণ একতা' চলে না।

ঐ দিনই কী যে হয় ভদ্রোলোকের। রায়হানের দিকে ঝুঁকে জিজ্ঞেস করেন, আপনি শরীরের যত্ন নিচ্ছেন তো ? ঠিকমতো ওষুধ না খেলে আর নিয়ম মেনে না চললে কিন্তু ঝামেলা হবে। আমার বড় ভাইকে শেষ পর্যন্ত বাইপাস অপারেশন করাতে হয়েছে। সিঙ্গাপুরে গিয়েছিলেন– দু'মাস থাকতে হয়েছিলো– পুরো ফ্যামিলির সে কি টেনশন! আপনি কিন্তু নেগলেক্ট করবেন না।

রায়হানের সঙ্গে হারুন সাহেবের অমন ব্যক্তিগতভাবে আলাপ করার দৃশ্যটা সবারই চোখে পড়ে। সম্পাদক একটু যেন অবাকই হন। কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করেন, আপনার সঙ্গে কি হারুন সাহেবের আগে থেকেই জানা শোনা ?

রায়হানেরও অবাক লাগে। বলে, নাহ্, ভদ্রলোকের সঙ্গে আগে কখনও দেখা হয়েছে বলে মনে পড়ে না– তবে এই কাগজে জয়েন করার পর প্রথম দিকে দেখা হয়েছে, কথাও হয়েছে, মাঝখানে বহুদিন দেখা হয় নি।

দেখা হবে কোত্থেকে ? সম্পাদক জানন, ভদ্রলোক তো ছিলেন না, সিঙ্গাপুর না মালয়েশিয়া কোথায় যেন ছিলেন। একটু থেমে ফের বলেন, আপনাদের সঙ্গে অমন ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ করছেন দেখে মনে হলো, নিশ্চয়ই আপনাদের পরিচয় অনেক দিনের ?

কী যে হয় ভদ্রলোকের, কয়েকদিনেব মধ্যেই সবাইকে অবাক করে দিয়ে বারান্দার শেষ মাথায় একটা ছোট রুম বানান, তারপর জাহিদকে সেই রুমে বসতে বলেন, নিজে নেন আমানউল্লাহ সাহেবের রুমটা, আর জাহিদের রুমে আমানউল্লাহকে বসতে বলা হয়। তবে রায়হানের জায়গা বদল হয় না– তাকে নিজের রুমেই থাকতে দেয়া হয়।

পরে জানা যায় যে, মালিকপক্ষ কাগজের ব্যাপারে বেশি মনোযোগী হচ্ছেন। মিডিয়া যে খুব বড় শক্তি সেটা তাঁরা বুঝতে পেরেছেন। ইন্ডাস্ট্রিতে হোক, কি বিজনেস-এ এবং পলিটিক্সে তো বটেই, যার হাতে মিডিয়া, তাকে সমঝে না চললে কারুরই উপায় নেই। ফ্রি ইকোনমি বা ফ্রি সোসাইটির জন্য দরকার তথ্যের অবাধ প্রবাহ– সেটা না হলে, পুঁজি বা পণ্যের অবাধ প্রবাহ কীভাবে হবে ? কনজুমারের সংখ্যা কেমন করে বাড়বে ? সুতরাং মিডিয়া যার আছে, তাকে সেটা শক্তভাবে ধরতে হবে এবং ভালোভাবে কাজে লাগাতে হবে– যার নেই, তাকে মিডিয়ার দ্বারস্থ হতে হবে। অতএব যার হাতে মিডিয়া আগে থেকেই আছে সেটাকে তার বড় করে তুলতে হবে– যদি সেটা সে না করে, তাহলে অন্যের সঙ্গে পাল্লায় সে টিকতে পারবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ফের একদিন রায়হানকে বললেন ভদ্রলোক, আপনি মন খুলে লিখুন, আপনার লেখার যে গুণ তা অনেকেরই নেই। আপনার লেখায় অদ্ভুত একটা ব্যালান্স থাকে, অমন ব্যালান্স রেখে সব কথা কেউ লিখতে পারে না। দুশ্চিন্তা করবেন না, কোনোরকম প্রব্লেম হলেই জানাবেন। যদি পার্সোনাল কোনো প্রব্লেম হয়, তা-ও। আর চিকিৎসার ব্যাপারে নেগলেক্ট করবেন না।

রায়হানের অবিশ্বাস্য লাগে। ১৯৫৬/৫৭ সালের দিককার কথা মনে পড়ে। ইউনিভার্সিটি থেকে তখনও বের হয় নি, নিউজের ডেস্ক-এ বসতো। সব ইউনিভার্সিটির ছাত্র কাজ করতো। অবশ্যি কাগজও বেশি ছিলো না– আজাদ, মর্নিং নিউজ, অবজারভার, সংবাদ, ইত্তেফাক, আর খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলা মিল্লাত। ঐ গরিব আর রোগা মিল্লাত থেকে দুই কিস্তিতে বেতন নিতে হতো ৪০+৪০=৮০ টাকা। তার মনে পড়ে, আহমদ ভাইয়ের টাকার খুব টানাটানি থাকতো। সেজন্য একবার কাবুলিঅলার কাছ থেকে টাকা ধার নিয়েছিলেন। কয়েক মাস পর দেখা গেলো, এক কাবুলিঅলা অফিসে ঢোকার মুখে রাস্তায় রোজ দাঁড়িয়ে থাকছে। একেকদিন আহমদ ভাই অফিসেই রাত কাটিয়ে দিতেন। একদিন তো তাঁকে অফিসের পিছন দিককার দেয়াল টপকে বাইরে বেরুতে হয়েছিলো।

আর এখন ? সিনিয়ার সাংবাদিককে হাতে রাখবার জন্য কতো তোষামোদ!

তুমি কি তাহলে কেউকেটা হয়ে গেলে, রায়হান আলী ? ঢাকাই এলিটদের আসরে কি তুমি এতোদিনে জায়গা পেতে যাচ্ছো ? ফরেন ডেলিগেশনের লিস্টিতে কি তোমার নাম উঠবে এবার থেকে ? কিংবা বঙ্গ ভবনের দাওয়াতে ? অথবা দূতাবাসের পার্টিতে ? রায়হান নিজের দিকে তাকায় আর তার মনের ভেতরে কেউ যেন একের পর এক প্রশ্ন করে চলে।

তবে এও ঠিক যে, সে যথেষ্ট উৎসাহ বোধ করতে পারে না। মালিক পক্ষের মন তুষ্ট করতে পারাটাই যে আসল কাজ, সেটা তার ভালো করে জানা। সে যে ঐ কাজটা শেষ পর্যন্ত করে যেতে পারবে, সেটা তার বিশ্বাস হয় না।

সপ্তাহ যায়নি হঠাৎ একদিন বিকেল বেলা হারুন সাহেব তার কামনায় ঢোকেন। রায়হানকে অবাক হয়ে উঠে দাঁড়াতে দেখে হাসতে হাসতে বলেন, আরে বসুন তো! নিজেদের মধ্যে অতো দূরত্ব আর ফর্মালিটিজ রাখার কোনো মানে হয় না। আপনার কাজ কি শেষ ?

জ্বী হ্যাঁ, রায়হান এক কথায় জবাব দেয়।

এখন বেরুবেন ?

জ্বী হ্যাঁ, রায়হানের একই জবাব।

আচ্ছা ভাই, শুনুন, একটা কথা বলি, হারুন হঠাৎ যেন আন্তরিক হয়ে ওঠেন। বলেন, আপনি আমাকে না চিনতে পারেন কিন্তু আমি আপনাকে চিনি। আমি তখন ঢাকা কলেজ থেকে বেরিয়ে সদ্য ইউনিভার্সিটিতে ঢুকেছি, আর আপনি তখন ইউনিভার্সিটি থেকে বেরিয়ে নাম করা সাংবাদিক হয়েছেন। ছাত্রদের মধ্যে তখনও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

আপনাদের অনেক ভক্ত– ওদের কাছেই আপনার নাম শুনি, দেখিও আপনাকে সেই তখনই। ঐ সময় যদি আলাপ হতো, তাহলে আমি আপনাকে ভাই বলে ডাকতাম– বলুন, ডাকতাম না ?

রায়হান হতভম্ব হয়ে কিছুক্ষণ হারুনের দিকে তাকিয়ে থাকে। বলবার মতো কথা খুঁজে পায় না। শুধু মাথাটা সামান্য দুলিয়ে বলে, তা ডাকতেন।

তাহলেই দেখুন, এখন থেকে আমি আপনাকে ভাই বলে ডাকতে পারি, পারি না? বলুন ? রায়হান হারুনের মধ্যে প্রায় পঞ্চাশ ছোঁয়া একজন বয়স্ক লোকের মধ্যে ছেলেমানুষি আবিষ্কার করে খুশি না হয়ে পারে না। ঐ মুহূর্তে হারুন হাত বাড়িয়ে দিলে সেই হাত শক্তভাবে মুঠোর মধ্যে ধরে হাসতে হাসতে ঝাঁকুনি দিয়ে বলে, কেন পারেন না ? অবশ্যই পারেন।

দেখতে দেখতে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই 'গণ একতা' প্রকাশনার চারজন মালিকের একজন সাইফুল্লাহ হারুন কাগজটাকে বেশ জমিয়ে ফেললেন। সবার সঙ্গে কথা বলেন, রিপোর্টারদের সঙ্গে এ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে কথা বলেন, এডিটোরিয়ালের এ্যাসাইনমেন্ট দেওয়ার সময়ও হাজির থাকেন। কথাও বলেন। একেক সময় মনে হয় উনিই বুঝি এডিটর ? কিন্তু, লক্ষ্য না করে পারা যায় না যে, এডিটর যা বলেন, তাই হারুন ব্যাখ্যা করছেন।

একদিন হারুন এসে বলেন, আচ্ছা রায়হান ভাই, আমাদের জার্নালিস্টরা নিজেদের গুটিয়ে রাখেন কেন, জানেন ? তাঁরা কি এক্সপোজার পছন্দ করেন না ?

রায়হান ঠিক বুঝতে পারে না। তার কপালে ভাঁজ পড়ে। বলে, কিসের এক্সপোজার ? খুলে বলুন।

আরে এই যে পার্টি ফার্টি হয়– এ্যাম্বাসিগুলোর তরফ থেকে পার্টি দেওয়া হয় না ? সেই সব পার্টির কথা বলছি। ঐ সব পার্টিতে টপ পজিশনের দেশী-বিদেশী লোকজন আসে। তাদের মধ্যে নানান বিষয় নিয়ে আলাপ হয়। অমন ধরনের পার্টিতে গেলে তো নানান ধরনের খবর পিকআপ করা যায়। যায় না বলুন ?

নিজেকে খোলাসা করার জন্য একটু ব্যাখ্যা করেন হারুন। বলেন, ধরুন বিজনেস ডেলিগেশনের মেম্বারদের সঙ্গে আলাপ হচ্ছে। সেখানে উঠে এলো ট্যারিফের বিষয়টা। যদি জানা যায় যে, বাংলাদেশের এক্সপোর্টের ওপর তাদের সরকার ট্যারিফ কমাতে কিছুতেই আগ্রহী নয় তখন তার প্রভাব কি বাংলাদেশের ট্রেড পলিসির ওপর পড়বে না ? এই রকম স্কুপ নিউজের কথা বলছিলাম আমি।

রায়হান পুরোটা বুঝতে পারে না। তবে আন্দাজ করে, হারুন চান যেন তাঁর কাগজের সাংবাদিকরা উঁচু মহলের পার্টিতে যায় এবং সেখান থেকে খবর সংগ্রহ করে। সে মাথা নাড়াতে নাড়াতে বলে, আপনার কথা বুঝেছি, কিন্তু আমি তো ভাই অমন পার্টিতে খুব একটা যাইটাই নি। মানে আমার সুযোগ হয় নি। ওদের দাওয়াতেরও একটা ব্যাপার আছে।

আহা সেটা তো সব সময়ই থাকে। আর সে দাওয়াত তো আসে এডিটরের কাছে। কিন্তু তিনি কি যান ঐ সব পার্টিতে ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

রায়হান জবাব দিতে পারে না। কী জবাব দেবে? সে কি সম্পাদক সাহেবকে গিয়ে জিজ্ঞেস করেছে কখনও যে, গতকাল আপনি অমুক এ্যাম্বাসির পার্টিতে গিয়েছিলেন? নাকি পরশু দিন যে রেহমান এ্যান্ড খান কোম্পানির পার্টি হলো, সেখানে গিয়েছিলেন?

হারুন নিজের থেকে জানান, কেউ যায় না রায়হান ভাই, গেলেও নতুন লোকদের সঙ্গে মেশে না– পুরনো চেনাজানা লোকেদের সঙ্গে বসে ড্রিংকস-এ চুমুক দিতে দিতে এটা ওটা কথা বলে এই মাত্র– অন্য কিছু হয় না তাতে। শুধু খানাপিনা আর চেনাজানা লোকেদের ভালোমন্দ কেচ্ছা গাওয়া হয়। আমার মনে হয়, ঐসব পার্টিতে এ্যাকটিভ জার্নালিস্টদের যাওয়া দরকার।

হ্যাঁ দরকার, রায়হান স্বীকার করে। বলে, কিন্তু তার আগে তো নিমন্ত্রণ পেতে হবে।

হ্যাঁ, অবশ্যই পেতে হবে, একশো বার পেতে হবে। হারুন হাসতে হাসতে বলেন, আমার মনে হয়, ঐসব পার্টিতে আপনাদের মতো সাংবাদিকদের বেশি করে যাওয়া দরকার।

ঐ রকম কথা হওয়ার দু'দিন পরই অফিস থেকে বেরুবার মুখে হারুন তাকে জোর করে গাড়িতে উঠিয়ে নিয়ে সোজা হোটেল শেরাটনের এক পার্টিতে যান। পথে যেতে যেতে বলেন, নামী দামী কেউ আসছে না– তবে গেলে বুঝতে পারবেন বিদেশী ক্যাপিটেল আর টেকনোলজি দিয়ে কীভাবে এদেশের লেবার এক্সপ্লয়েট করার ব্যবস্থা চালু হয়েছে।

এইসব পার্টিফার্টিতে যা সাধারণত হয় সে সব রায়হানের ভালো লাগে না। কেননা জানে, যারা পার্টি দেয়, তাদের বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নানান ধান্দাবাজির মতলব থাকে। মুখে হারুন যাই বলুন, স্পষ্ট না হলেও সে বুঝতে পারে, কোনো রকম উদ্দেশ্য থাকার কারণেই তাকে এই পার্টিতে নিয়ে আসা হয়েছে।

পার্টিটা কেন? না সিঙ্গাপুরের এক কম্পানির শিল্পপতি মালিক বাংলাদেশের এক উঠতি শিল্পপতির সঙ্গে জয়েন্ট ভেঞ্চারে গার্মেন্টস-এর ফ্যাক্টরি খুলবেন। চুক্তিটুক্তি হওয়া শেষ, এখন তারই সেলিব্রেশন হচ্ছে। বাংলাদেশের সৌভাগ্যবান ব্যক্তিটি কে? না শাহেদুল্লাহ হারুন, সাইফুল্লাহ হারুনের বড় ভাই। বিদেশীদের সঙ্গে যৌথ মালিকানায় ইন্ডাস্ট্রি হলে দেশে উন্নতির জোয়ার বয়ে যাবে। বাংলাদেশের অর্থনীতি তরতর করে এগোবে– এই আশার কথাই বলা হচ্ছে এবং আরও বলা হবে। তো বিদেশীরা কী দিচ্ছে? পুঁজি দিচ্ছে, যন্ত্রপাতি দিচ্ছে, কাঁচামাল দিচ্ছে, এমনকি যন্ত্রপাতি ব্যবহারের প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজটাও তাদেরই হাতে থাকছে। ব্যাপারটা তাহলে দাঁড়াচ্ছে কী রকম? বাংলাদেশের সস্তা লেবারটাই ওদের দরকার। সিঙ্গাপুরে যা মজুরি দেওয়া হয় তার দশভাগের একভাগ দিলেও এখানে লোক পাওয়া যায়। সুতরাং কেন বিদেশী পুঁজি আসবে না? তাদের দরকার একটা শক্তমতো খুঁটি। মালিকানার বাংলাদেশী অংশটা হবে সেই খুঁটি আর অমন খুঁটি হয়ে থাকার জন্যই সে মুনাফার অংশ পাবে। লেবাররা যেন গোলমাল না করে, সরকারের দিক থেকে যেন কোনো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

রকম অসুবিধা না হয়, রফতানির কোটা বাড়াবার চেষ্টা এবং ক্ষমতা যেন থাকে– এসবই হলো ঐ খুঁটির কাজ।

হারুন এর সঙ্গে কথা বলেন, ওর সঙ্গে কথা বলেন, আর জয়েন্ট ভেঞ্চারের গুণগান করেন। আলাপে টেকনিক্যাল নো-হাউ, এক্সপার্টিজ, ম্যানেজমেন্ট– এসবও আসে, তবে সবারই মুখে এক কথা, বাংলাদেশকে টিকে থাকতে হলে এটাই একমাত্র পথ। বিদেশী পুঁজি আসার পথ।

এর সঙ্গে, ওর সঙ্গে, তার সঙ্গে হাত মেলাতে হয়, হারুন পরিচয় করিয়ে দেন, ইনি আলহাজ করিম উল্লাহ, করিম টেক্সটাইলস-এর মালিক। আর এই যে ইনি আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু শামিম আফসার, হোসিয়ারি আছে এঁদের। এক্সপোর্টেবল হোসিয়ারি এঁরাই করেন। আর ইনি কিন্তু একেবারে আমাদের সার্কেলের বাইরের লোক। সফট ড্রিংক, ফ্রুট জুস, আচার, মোরব্বা এসবে হাত দিচ্ছেন– এঁর সঙ্গে আছে পাকিস্তানের দুই ধনী লোক। বলতে বলতে হারুন মাথা উঁচু করে ডাইনেবাঁয়ে তাকান– বলেন, ওই দু'ভদ্রলোকও আছেন ওখানে। ওঁদের সঙ্গে আলাপ করলে বুঝতেন, পাকিস্তান ভেঙে যাওয়াতে কী আফসোস এখন ওঁদের।

চলতে চলতে হারুন এক বয়স্ক দম্পতির মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেন। সামনাসামনি চোখ তুলতেই রায়হান চমকে ওঠে। ওদিকে হারুন পরিচয় করানোর জন্য বলতে থাকেন, ইনি সাদেকুজ্জামান আর ইনি মিসেস সাদেকুজ্জামান–

এই পর্যন্ত হারুন বলতে পারেন, তার আগেই সাদেক সাহেব বলে ওঠেন, ওঁর সঙ্গে আপনি কেন পরিচয় করাবেন ? বরং আমারই তো ঐ কাজটা করানোর কথা।

বলতে বলতে সাদেক এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে দেন। রায়হানের হাত এগোতে চায় না। সাদেক সাহেব তখন আবার এক মুখ হেসে বলেন, মডার্ন ফিজিওথেরাপি অদ্ভুত জিনিস– ডান বগলের নিচে ক্রাচটা দেখিয়ে বলেন, যদিও এটা এখনও সঙ্গে রাখি, তবে আমার শরীর এখন অনেক ভালো।

পাশে দাঁড়ানো মেরির সঙ্গে চোখাচোখি হলে সে মুখে হাসি ফুটিয়ে বলে, আপনার শরীর এখন ভালো ?

হ্যাঁ, ভালো, রায়হান চোখে চোখ রেখে জবাব দেয়। কিন্তু ঐ জবাবটুকু পর্যন্ত, তার মুখ দিয়ে আর কথা বের হয় না। একইভাবে সে তাকিয়ে থাকে।

কতোদিন ? রায়হানের বুকের ভিতরে প্রশ্ন করে কে একজন। বলে, মাত্র তো দু'মাস, দুইমাসে এতো বদলায় মানুষ! রায়হান মাথা থেকে পা পর্যন্ত দেখে মেরির। তার মন বিশ্বাস করতে চায় না যে মেরি তাকে নিজের কাছ থেকে সরিয়ে দিয়েছে।

মেরি মুখোমুখি তাকিয়ে থাকতে পারে না, নজর এদিক-ওদিক সরিয়ে নেয়। তবে মুখে হাসি নয়, হাসির ভঙ্গিটা ঠিকই ধরা থাকে।

রায়হান অনুমান করতে পারে না, কোন সুবাদে সাদেক আর মেরির এই পার্টিতে আগমন। একবার মনে হয়, সাদেক সাহেবও কি কোনো ইন্ডাস্ট্রি করে ফেলেছেন। অথবা করতে যাচ্ছেন ? ফের মনে হয়, যে লোককে এক/দেড় লাখ টাকার জন্য জমি কেনার সময় পার্টনার যোগাড় করতে হয়েছে এক বছর আগেও, সেই লোক কীভাবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ইণ্ডাস্ট্রি করতে যেতে পারে ? নাকি আত্মীয়-টাত্মীয় হবে হারুন সাহেবদের। কৌতূহলটা খুব বেশি খোঁচাতে থাকলে সে এক সময় কোল্ড ড্রিংকসের গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে জিজ্ঞেস করে, সাদেক সাহেবরা বোধহয় আত্মীয়, তাই না ?

আরে নাহ্, হারুন খানিক যেন বিব্রত বোধ করেন। বলেন, আত্মীয়-টাত্মীয় নন, আমার বড় ভাইয়ের পুরনো দিনের হ্যাংওভার বলতে পারেন– সাদেক সাহেব তো টেক্সটাইল কর্পোরেশনের এ্যাকাউন্টসে ছিলেন। আমার বড় ভাইও তখন ঐ কর্পোরেশনেই কাজ করতেন– তখন থেকেই মাখামাখি। কর্পোরেশনে থাকতে থাকতেই বড় ভাই গার্মেন্টিস আরম্ভ করেন, তারপর কর্পোরেশন ছেড়ে দেন, কিন্তু পুরনো সম্পর্কটা থেকে গেছে। আমার বড় ভাই আবার একটু ধার্মিক টাইপ, উপকার পেয়েছেন যার কাছে, তাকে কখনও ভোলেন না।

একটু থেমে ফের বলেন হারুন, শুনছি বড় ভাই নতুন একটা ইউনিট খুলতে যাচ্ছেন। সেই ইউনিটের পার্টনার করে নিতেও পারেন, কিছুই বলা যায় না, এখন তো গার্মেন্টিস সেক্টরটাই ফ্লারিশ করবে বলে মনে হচ্ছে।

রায়হানের মগজে তখন গার্মেন্টিস সেক্টর ফ্লারিশ করবে কি করবে না সেই চিন্তা ঢোকার পথ বন্ধ, সেখানে অদূর অতীতের এক জোড়া নর-নারীর যুগল মিলনের নানান ভঙ্গিমা জ্বলজ্বল করে উঠছে।

সাদেক সাহেব সিঙ্গাপুরের মারোয়াড়ি ব্যবসায়ী কানাইলাল সারোগীর সঙ্গে আলাপে ব্যস্ত হয়ে পড়লে রায়হান সেখান থেকে সরে আসে। হাতে তখনও কোকের গ্লাসটা। এদিকে হারুন সাহেব যে কোনদিকে চলে যায়, সে খেয়াল রাখতে পারে না। একটা পিলারের পাশে তখন সে দাঁড়িয়ে। পাশের দুই টবে দুটো পান জাতীয় বড় বড় পাতাঅলা গাছ। আর ঐ সময় সে মেরির গলা শুনতে পায়। মেরি বলে, আপনার শরীর খুব খারাপ হয়ে গেছে।

রায়হান ঘুরে দাঁড়ায় এবং একটুখানি হাসেও সে। বলে, লুকিয়েই যখন কথা বলছো, তখন আর আপনি কেন ?

অন্য কিছু বলা সম্ভব নয় বলে। মেরি দেওয়ালের বিজ্ঞাপন দেখতে দেখতে বলে, অন্য কিছুই আমি করতে পারি না, বন্দী দশাতেই আমাকে থাকতে হবে। যে আশা মনে জেগেছিলো, যে আশায় বুক বেঁধে তৈরি হয়েছিলাম, তা আমি ধরে রাখতে পারি নি।

বলতে বলতে দেয়াল থেকে নজর সরিয়ে স্থির চোখে তাকায় রায়হানের চেখের দিকে। বেশ কিছুক্ষণ ঐভাবে স্থির থাকে সে। তার চোখের ভিতরে অসম্ভব নিঃস্ব একটা ধূসরতা দেখতে পায় রায়হান। নজর না সরিয়ে মেরি ফের বলে, আমার সেই আশা ঝরে পড়ে গেছে। কথাটা বলে যেমন নিঃশব্দে এসেছিলো, তেমন নিঃশব্দে ধীর পায়ে সে চলে যায়।

মেরি চলে যায়, কিন্তু সত্যিই কি যায় ? যেতে পারে ? রায়হান মনের দিকে তাকিয়ে কোনো জবাব খুঁজে পায় না। কারণ ঐ মুহূর্তে তার মনের মধ্যে রাগ, ঘেন্না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

কিংবা অভিমান জাতীয় কোনো অনুভূতিই জাগে না। বরং অদ্ভুত ধরনের একটা মায়া জেগে ওঠে মেরির জন্য। সামান্য যে ক'টি কথা বললো, তার কী মানে, তা তার কাছে স্পষ্ট হয় না, কিন্তু তবু কেবলই মনে হতে থাকে, মেরির কোনো দোষ নেই– আসলেই সে বন্দীদশা থেকে বেরিয়ে আসতে চেয়েছিলো। যদিও তার মনে পড়ে, কী ধরনের চালাকি মেরি করতো। কেমন লোভ দেখাতো, এমনকি অন্য পুরুষ মানুষের সঙ্গে যে তার শারীরিক সম্পর্ক হয়েছিলো, সেসব মনে হওয়ার পরও তার মন মেরির ওপর বিরূপ হয় না।

ব্যাপারটা নিয়ে সে চিন্তা করে। ঐ একই জায়গায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আজ তার অদ্ভুত লাগে। যার কারণে তার নিজের দাম্পত্য জীবনের মাঝখানে প্রকাণ্ড একটা দেয়াল উঠে দাঁড়িয়েছে, যার জন্য তার সংসার ছারখার হতে চলেছে, যার জন্য সে মিথ্যাচারী হয়েছে, তাকে সে ঘেন্নাটুকু পর্যন্ত করতে পারছে না। এমনকি এই প্রশ্নটা পর্যন্ত করতে পারলো না যে কেন সে এমন একটা বাজে নোংরা আর নিষ্ঠুর খেলা খেললো। বরং মেরির মুখ দিয়ে উচ্চারিত কথা ক'টা তার মনের মধ্যে নানান প্রশ্ন তুলতে লাগলো। যে আশা নিয়ে সে বুক বেঁধেছিলো, সেই আশা কেন সে ধরে রাখতে পারে নি– তার ঐ আশা নাকি ঝরে পড়ে গেছে– এই কথাটারই বা কী মানে? এ কি কোনো হিসেব? সাদেকের অসুস্থ থাকার সময় তার মনে আশা জেগে উঠেছিলো। এখন সাদেক সুস্থ হয়ে ওঠাতে সেই আশা তার ঝরে পড়ে গেছে, নাকি ছেলেমেয়েদের কথা ভেবে সে মত পাল্টেছে– আর সে জন্যই সে পেটের বাচ্চাটা নষ্ট করে ফেলেছে। নাকি তাঁর এমনিতেই এ্যাবরশন হয়ে গেছে– কারণ বেশি বয়সে মেয়েদের গর্ভপাত বেশি হয় এমনিতেই। ঐ গর্ভপাতের ঘটনাটা বোঝাবার জন্যই ঐ আশা ঝরে পড়ার কথাটা সে বললো। নানান প্রশ্ন মনের ভিতরে নড়াচড়া শুরু হয়ে গেলে সে আর কী করে! কিছুক্ষণ একাকী দাঁড়িয়ে থাকে। শেষে যে প্রশ্নটা তাকে খুব বড় রকমের ঝাঁকুনি দেয় তা হলো গোটা ব্যাপারটাই কি মেরির এক রকমের খেলা হতে পারে না? পেটে বাচ্চা আনার ঘটনাটা যে সত্যি, তার কোনো প্রমাণ কি মেরি দেখিয়েছে? না হলে স্বামীকে ছেড়ে অন্য লোককে যে ভালোবেসে বিয়ে করার জন্য তৈরি হয়েছিলো, এ্যাবরশনের ঘটনাটা তাতে কেন বাধা হয়ে দাঁড়াবে? গর্ভ থেকে ভ্রূণ খসে গেলে কি ভালোবাসাও খসে যায়?

হারুন বোধহয় দু'জনকে ঘনিষ্ঠ হয়ে আলাপ করতে দেখেছিলেন। কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার? সাদেক সাহেবের সঙ্গে আপনার চেনা-জানা, সেটা তো প্রথমেই দেখলাম, কিন্তু ওঁর স্ত্রীর সঙ্গেও যে আপনার ঘনিষ্ঠ জানাশোনা আছে তা তো বলেন নি। ওঁদের সঙ্গে কি আপনার অনেকদিনের পরিচয়?

রায়হানের কান হারুনের গলার স্বরে বিদ্রূপের ছোঁয়াটুকু স্পষ্ট টের পায়। তাঁর প্রশ্নের জবাবে রায়হান কিছু বলে না। খালি হাসে। তাতে হারুন ফের বলেন, মহিলা এক সময় খুব সোশ্যাল ছিলেন। প্রায় সব ধরনের পার্টিতেই স্বামীর সঙ্গে আসতেন, সাদেক সাহেবের কেরিয়ার বিল্ডাপে ওঁর অনেক কন্ট্রিবিউশন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

হারুন যেন আরও কী কী বলেন, রায়হান সেসব খেয়াল করতে পারে না। কারণ মনে মনে সে তখন মেরিকে খুঁজছে। ডাইনেবাঁয়ে সে বারবার করে তাকায়, যদি একবার দেখতে পায়, তাহলে সে একটা কথা আজ জিজ্ঞেস করবে। জানতে চাইবে, যে বন্দীদশা থেকে সে মুক্ত হতে পারলো না, সেই বন্দীদশা থেকে সে আগে কখনও কি মুক্ত হতে চেয়েছিলো? আর ভবিষ্যতেও কি সে অমন কোনো চেষ্টা করবে?

হলঘরের এদিক-ওদিক ঘুরে লাউঞ্জে খোঁজ করে সে। সেখানেও সে সবুজ রঙের কাতান শাড়ি পরা কাউকে দেখতে পায় না। ফের সে হারুনের মুখোমুখি হয়। তাকে ওভাবে ঘুরতে দেখে হারুন জিজ্ঞেস করেন, আপনি কি সাদেক সাহেবকে খুঁজছেন? নাকি তাঁর মিসেসকে?

দু'জনকেই, রায়হান জবাব দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। এই মুহূর্তে যাবেন না ওঁদের সামনে, হারুন জানায়। বলেন, ওঁরা আমার বড় ভাইয়ের সঙ্গে বিদেশী গেস্টদের নিয়ে ক্লোজড ডোর মিটিংয়ে বসেছেন। রায়হানের অবাক লাগে। বলে, পার্টিতেও আবার ক্লোজড ডোর মিটিং হয় নাকি?

প্রয়োজন পড়লে সবই করা যায়, হারুন বলতে বলতে হাসেন। তারপর ফের জিজ্ঞেস করেন, মিসেস সাদেকের সঙ্গে আপনার আলাপ কি শেষ হয় নি? কথা শেষ না করেই কি উনি চলে গেছেন? আমি কি ওঁকে ডেকে আনবো?

রায়হান এবার হারুনের গলার স্বরে স্পষ্ট বিদ্রূপ শুনতে পায়। তাই জবাব না দিয়ে পারে না। বলে, আমি মিসেস সাদেককে খুঁজছি তা আপনাকে কে বললো?

তার গলার স্বরে সম্ভবত উষ্মা প্রকাশ পেয়ে থাকবে। হারুনের মুখে-চোখে খানিক অপ্রস্তুত হওয়ার ভাব ফোটে। তবে সেও মুহূর্তের জন্য। হারুন ফের স্বচ্ছন্দ হেসে উঠে বলেন, ওঁরা দু'জনেই, মানে স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই, এমন রিসোর্সফুল যে একবারের আলাপে ওঁদের সঙ্গে কথা শেষ হয় না, অন্যের কথা কী বলবো। আমার বড় ভাইকেই তো দেখেছি, দিনে দু'বার তিনবার টেলিফোন করতেন– এই পর্যন্ত বলে, হারুন বেয়ারাকে ইশারায় ডেকে ড্রিংকস দিতে বলেন। তারপর ফের বলেন, মাঝখানে ভদ্রলোক অসুস্থ হয়ে পড়াতে তেমন যোগাযোগ ছিলো না– এখন তো প্রায় সেই আগের মতোই মনে হচ্ছে– হারুন আরও কথা বলে যেতে থাকেন। কী বলেন, সেদিকে মন দিতে পারে না রায়হান। সে ৪/৫ খানা টেবিলে ছড়িয়ে বসা অতিথিদের এক এক করে দেখে। কাউকে কাউকে তার চেনা চেনা লাগে। হ্যাঁ, নঈমুদ্দিনকে সে চিনতে পারে, এক সময় খবরের কাগজে ঢুকেছিলো, মর্নিং নিউজে, পরে আর থাকে নি। শুনেছিলো এক্সপোর্টের ব্যবসা করে। রায়হানের সঙ্গে চোখাচোখি হলো, কিন্তু মনে হলো না যে চিনতে পেরেছে। কোণের দিকে বসেছিলো খায়রুল, ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় বেশ ঘনিষ্ঠ ছিলো। ইসলামিক হিস্ট্রির ছাত্র ছিলো। সে চিনলো, উঠে এসে সরাসরি হাতে হাত মিলিয়ে দাঁড়ালো। বললো, তুমি এখানে? রায়হান হাসে। বলে, কেন এখানে আসা বারণ?

না, তা নয়, আমার অবাক লাগছে– তুমি লেফটদের সঙ্গে চলাফেরা করতে, ঢুকেও গেলে জার্নালিজমে, তাতে কখনও মনে হয়নি যে তোমার মতটত বদলে গেছে– আজ এখানে দেখছি একেবারে ক্যাপিট্যালিস্টদের ঘাঁটিতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

কথাটা শেষ করে না খায়রুল। মুখোমুখি তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ। পরে বলে, তুমিও কি গার্মেন্টসে আসছো?

রায়হান হাসে। বলে, দেখি, কী করা যায়। পাশাপাশি তোমাদের সঙ্গে না হোক, পিছন পিছন আসা যায় কিনা তাই দেখছি– সোশ্যালিজমের তো মরণদশা করে ছাড়লো মস্কোঅলারা।

খায়রুলের সঙ্গে ঐ পর্যন্তই আলাপ হয়। ঐ সময় কোত্থেকে এক ভদ্রলোক হন্তদন্ত হয়ে আসেন এবং খায়রুলকে নিয়ে চলে যান লাউঞ্জের দিকে।

ফেরার সময় গাড়িতে ওঠার পর পরই হারুন সাহেব বললেন, রায়হান ভাই, কী মনে হলো পার্টিতে এসে? জয়েন্ট ভেঞ্চারে, মানে বিদেশীদের সঙ্গে মিলে ন্যাশনাল ইন্ডাস্ট্রি প্রমোট করা কি জরুরী নয়? বলুন? সরকারের এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হওয়ার কোনো অর্থ হয়, বলুন? আপনারা মিডিয়ার লোকেরা যদি পাবলিক ওপিনিয়ন গড়ে তুলতে পারতেন, তাহলে কাজের মতো কাজ হতো একটা–

রায়হান হারুনের মুখের দিকে তাকায়। খুব মনোযোগ দিয়ে গাড়ি চালাচ্ছেন, নজর সামনের দিকে। গাড়ি চলেছে ধীরগতিতে। পিছনের কয়েকটা গাড়ি পাশ কাটিয়ে সামনে এগিয়ে গেলো। কিন্তু হারুনের সেদিকে হুঁশ নেই। ফের বলেন হারুন সাহেব, চিন্তা করে দেখুন রায়হান ভাই– আমাদের কোনো লোকসান হচ্ছে না। কোনো রকম দায়ও থাকছে না– ক্যাপিটাল ওদের, মেশিনারিজও ওরাই আনছে, র'ম্যাটেরিয়ালও ওদের, এমনকি ম্যানেজমেন্ট, টেকনোলজি সবই ওদের– যদি লোকসান হয়, তাহলে তার দায়ও ওদেরই ওপর পড়ছে– অথচ মাঝখান থেকে জব অপরচুনিটি কী রকম বাড়ছে, চিন্তা করুন– হিসেব করে দেখুন। দেশে ফরেন ইনভেস্টমেন্ট হয়ে গেলে আর তো করার কিছুই নেই– আপনা থেকেই ফ্যাক্টরি চলবে। শহীদুল্লাহ হাসান তখন ইউরোপ ট্যুর করতে পারেন, অথবা হাওয়াইতে হলিডে করার জন্য যেতে পারেন।

হারুন গায়ে পড়ে এসব গল্প কেন শোনাচ্ছেন, রায়হান পুরোপুরি বুঝতে পারে না। বিদেশীদের সঙ্গে মিলেমিশে দেশের ভিতরে মিল-ফ্যাক্টরি বানানোর পক্ষে লেখালেখি তো কম হয় নি– এখনও হচ্ছে, তবু কেন হারুন তাকে এসব বলছেন, আর ওসব বিষয় নিয়ে লেখালেখি করার জন্য কি এত খুঁটিনাটি বিষয় জানার দরকার আছে? এক সময় সে আর পারে না। প্রশ্নটা করেই বসে। বলে, হারুন আপনি এসব কথা কেন আমাকে বলছেন, আমি কিন্তু কারণটা একদম বুঝছি না– যা বলছেন, এসব কি আমাকে লিখতে হবে?

একটু যেন ধাক্কা খান হারুন।

তারপর গম্ভীর হয়ে বলেন, আপনি কী লিখবেন, না লিখবেন, সেটা আপনি জানেন– যা বললাম এতক্ষণ, এসবই তো আলাপ– চেনা জানা মানুষ নিজেদের মধ্যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

নানা বিষয় নিয়ে আলাপ করে না। বলুন ? মনে করুন, আমি যা বলেছি সবই গল্প আর আলাপ। দেশে কেউকেটা নন, যেমন সিঙ্গাপুরের কানহাইয়ালাল আগরওয়ালা চুক্তি করেছেন শহীদুল্লাহ হাসানের সঙ্গে একটা গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি খুলে তা চালু করবেন– এরই মধ্যে এগিয়ে এসেছেন লী হুয়ান দেং নামে এক হংকং-এর লোক– কানহাইয়ালাল একদিকে ভর করছে শহীদুল্লাহ হাসানের ওপর, বাংলাদেশে পা রাখবার জন্য– তারপর বাংলাদেশের পা রাখার ব্যবস্থা হয়ে গেলে সে এখন ভর করছে হংকং-এর মানুষ লী হুয়ান দেং-এর ওপর– যাতে এক্সপোর্ট প্রমোশন জোনে ভালোভাবে ঠাঁই গাড়া যায়।

রায়হানের জানা খবর এসব– কিন্তু এতো খুঁটিনাটি জানতো না। শহীদুল্লাহ হাসানকে যে কিছুই করতে হবে না, সেটা তার জানা ছিলো না। হারুনের মুখ থেকে প্রথম শুনলো যে তার কাজ শুধু সঙ্গে থাকা এবং কাগজপত্রে সই দেয়া– আর খুব জোর হলে, একটা ভালো দেখে ল ফার্ম খুঁজে বের করা, সেই সঙ্গে দু'চারজন ম্যানেজার যোগাড় করা– ব্যস, তার কাজ শেষ। মিনিস্ট্রির সঙ্গে যোগাযোগ, ব্যাংক লোন, ডাইরেক্টরেটের ছোট কর্তা বড় কর্তাদের ঘুষটুষ দিয়ে লাইন রাখা, এসব কাজে ম্যানেজাররাই বেশি পোক্ত। প্রোডাকশন শুরু হয়ে যাবার পর দু'একটা কনসাইনমেন্ট এক্সপোর্ট, এই পর্যন্ত বলে হারুন কিছুক্ষণ চুপচাপ গাড়ি চালায়। তারপর বলে, রায়হান ভাই, আজ একটা কথা বলি আপনাকে, আপনি যদি 'গণ একতা' ছেড়ে চলে না যান, তাহলে আমাকে আপনার সঙ্গে বহুদিন কাজ করতে হবে– প্লীজ, আমাকে কখনো বস ভাববেন না।

বলে, আপনি কী লিখবেন না-লিখবেন, সেটা আপনার ব্যাপার, যা বললাম– এ তো শুধুই আলাপ, আপনি যদি সর্বক্ষণ ভাবেন, আমি আপনার ওপর বসিং করার জন্য এসব কথা বলছি, তাহলে তো আমি নাচার।

হারুন সাহেবের মুখে অমন কথা শুনে রায়হান বেশ অবাক হয়। ভদ্রলোক এমন অন্তরঙ্গ হতে কেন চাইছেন ? আসলেই যিনি বস তাকে বস না ভাবলে কীভাবে কাজ চলবে ? তার কাছে হারুন সাহেবের পুরো আচরণটাই ধাঁধার মতো লাগে।

অফিসের সামনে এসে গাড়ি থামলে দু'জনই নামে। হারুন বলেন, আপনি এক মিনিট দাঁড়ান, আমি ওপর থেকে আমার ব্যাগটা নিয়ে আসি।

রায়হান অবাক হয়, তার মানে ? আরও কোথাও যাবেন ?

নাহ এখন বাসায় ফিরবো। রাত নটা বাজতে চললো।

তাহলে দাঁড়াতে বললেন যে ?

বাহ আপনাকে বাসায় পৌছে দিতে হবে না ?

রায়হান হাসে। বলে, আপনি কেন খামোকা কষ্ট করবেন, ওদিকে গাড়ি নিয়ে যাওয়া বেশ ঝামেলার ব্যাপার, এই তো কাছেই আমার বাসা, রিকশায় চাপলে পাঁচ মিনিটেই পৌছে যাবো– ওয়ারির গলিতে গাড়ি নিয়ে যদি আটকে যান, তাহলে বেরুতে অনেক কষ্ট।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

হারুন চোখে চোখে তাকান। মুখে কৌতুক মাখানো হাসি। বলেন, কী ব্যাপার রায়হান ভাই, আমাকে বাসায় নিয়ে যেতে চান না কেন ?

ঐ কথা রায়হানকে অপ্রস্তুত করে দেয়। তাড়াতাড়ি সে বলে ওঠে, সে কি কথা– ঠিক আছে, চলুন তাহলে–

বলতে বলতে সে গাড়ির দরজার হাতল ধরে। কিন্তু গাড়ির আসনে বসে না। হাতল ধরে রাখা অবস্থাতেই বলে, কিন্তু আমাকে বাসার দরজায় পৌঁছে নামিয়ে দিলেই চলবে না, আমার বাসায় গিয়ে বসতে হবে।

হারুন এবার স্বচ্ছ এবং আন্তরিক হাসে। বলে, রায়হান ভাই, আজ থাক, অন্যদিন যাবো– আমি আজ দুপুরে বাসায় ফিরি নি। আজ আর দেরি করা ঠিক হবে না।

রিকশায় করে বাসায় ফেরার সময় মেরির কথা মনে হয় বটে, কিন্তু সে কোনো রকম আবেগ অনুভব করে না। ক্ষোভ না, অভিমান না, রাগ না, ঘৃণা না। দরজা বন্ধ ঘরে উঠতি ধনী আর হবু শিল্পপতিদের সঙ্গে সস্ত্রীক সাদেক সাহেব কিসের বৈঠক করছিলো সেই কৌতূহলটাই তার মনের ভেতরে আনাগোনা করে বেশি রকম। হারুন সাহেবের কথাও মনে পড়ে– যা বললেন ভদ্রলোক, তা যদি সত্যি হয়, তাহলে তো সাদেক সাহেবও ব্যবসা কিংবা ইন্ডাস্ট্রিতে যাচ্ছে বলে মনে হয়। তবে হারুন সাহেবের অন্তরঙ্গ হবার ঘটনাটা তার মনকে বেশ হালকা আর ভারমুক্ত করে দেয়।

বাসায় পৌঁছে যথারীতি কাপড়জামা বদলায় রায়হান, তারপর ফ্যান ছেড়ে বসার ঘরে বসে কিছুক্ষণ। ওদিকে টিভি চলছিলো। টুকু কি একটা ইংরেজি ছবি দেখছিলো তখন। বাপকে দেখে বললো, আব্বা এতো দেরি করলে কেন ? এখন রাত প্রায় দশটা, আমি সন্ধ্যা বেলা থেকে বাসায় একা।

কেন, মঞ্জু নেই ?

টুকু মাথা নাড়ায়। বলে, ভাইয়া তো আজ বিকালেও ফেরে নি। দুপুরে নাকি টেলিফোন করেছিলো, ওর ফিরতে রাত হবে।

আর এদিকে, টুকু ফের বলে, আম্মা গেছেন মহিলা সমিতির কোথায় যেন অনুষ্ঠান আছে, সেখানে– দীপু ভাইয়ের আম্মা জানু আন্টি এসে নিয়ে গেছেন।

বেশ ক্লান্ত লাগছিলো তখন। রায়হান নিজের ঘরে গিয়ে বাতি নিভিয়ে বিছানায় লম্বা হয়ে গড়িয়ে পড়ে। সে বিছানা থেকেই টুকুকে ডেকে বলে, আমি কিছু খাবো না, বাইরে থেকে খেয়ে এসেছি।

বিছানায় যাওয়ার আগে মনে হচ্ছিলো বিছানায় গা এলিয়ে দিতে পারলেই ঝেঁপে ঘুম নামবে দু'চোখের পাতায়। কিন্তু কিছুক্ষণ চোখ বুঁজে থাকার পর বুঝলো, উঁহু, ঘুম আর আসে না। একবার মঞ্জুর জন্য চিন্তা হয়। ভাবে, ছেলেটা এতো রাত পর্যন্ত কোথায় থাকে, কী করে, সে তার কিছুই জানে না। ছেলেটার জন্য তার খারাপ লাগে। এখন এমন একটা অবস্থা তার যে, ছেলেদের ব্যাপারেও সে দেখাশোনা করতে পারে না। বীথির বাইরে যাবার খবর শুনলে আজকাল তার ভালোই লাগে। বাসার ভেতরে একা একা গুমরে থাকার চাইতে এ বরং অনেক ভালো। বীথির ওপর কখনও তার রাগ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

হয় নি। এখনও হয় না। অসাধারণ সহ্য করার ক্ষমতা ওর। স্বামীর মুখে দ্বিতীয়বার বিয়ে করতে চাওয়ার খবর শোনার পর কি কোনো মেয়ে তা সহ্য করে স্বাভাবিক থাকতে পারে?

অথচ ও স্বাভাবিক ছিলো– তারপর রুগ্ন স্বামীর সেবাও করে গেছে অবিচলিতভাবে– এখন স্বামীর সঙ্গে এক ঘরে থাকে না। ছোট ছেলের সঙ্গে আলাদা ঘরে শোয়– কিন্তু কাউকে সে কিছু বুঝতে দেয় না। এমন কি ছেলেদের কাছেও সে কিছু বলে নি।

ওদিকে রাত বাড়ে। গেটে দরজা খোলার আওয়াজ হয়– বীথির গলা শোনা যায়। খানিক পর সে ঘরে এসে ঢোকে। টুকুকে জিজ্ঞেস করে, কখন শুয়েছে? শরীর খারাপ কি না জিজ্ঞেস করেছিস? জিজ্ঞেস কর, ঘুমিয়েছে না জেগে আছে।

টুকু বাবার শিয়রের কাছে ঝুঁকে পড়ে বলে, আব্বা ও আব্বা, ঘুমিয়ে পড়েছো?

রায়হান সাড়া দিয়ে বলে, না ঘুমাই নি, কেন, কী হয়েছে?

খাও নি কেন? এবার বীথি সরাসরি জিজ্ঞেস করে।

খিদে নেই, রায়হান সংক্ষেপে জবাব দেয়। বলে, বাইরে খেয়ে এসেছি।

ওষুধ খেয়েছো?

হ্যাঁ।

ব্যস, ওই পর্যন্ত কথা হয়। আলো জ্বলে না, অন্ধকারেই কথা শেষ হয়। মা ছেলে দু'জন বেরিয়ে যেতে যেতে দরজাটা ভেজায়, সেটাও টের পায় রায়হান। আর ঐ সময়ে একটা নতুন খবর সে জানতে পারে। যেতে যেতে বীথি জানিয়ে যায়, কাল থেকে আমি ওয়ারি মহিলা সমিতির প্রাইমারি স্কুলে কাজ করতে যাচ্ছি।

লম্বা শ্বাস নেয় রায়হান। তার মনে হয়, এ তো আরও ভালো খবর। বীথিকে আর নিজের সংসারের ঘেরাটোপের ভেতরে একাকী আর নিঃসঙ্গ থাকতে হবে না। আর ওকে দেখে এতোদিন যে তার মনের ভেতরে একটা অপরাধ বোধের ভার চেপে বসতো, সেটাও এখন থেকে আর চেপে বসবে না।

রাত আরও বাড়ে, কিন্তু তবু ঘুম আসে না রায়হানের দু'চোখে। চোখ বোঁজা থাকলে কী হবে, কান আপনা থেকেই সজাগ হয়ে থাকে। আর মনের ভেতরে উৎকণ্ঠা তীক্ষ্ণ হয়ে খোঁচায়। মঞ্জু কি এসেছে? রাত কতো এখন? পুরনো ঘড়িতে দশটার আওয়াজ শুনেছে সে অনেকক্ষণ আগে।

সে কি এখন উঠবে? খোঁজ করবে মঞ্জুর? যদি অনেক রাত হয়ে গিয়ে থাকে আর মঞ্জুও বাসায় না ফিরে থাকে, তাহলে সে কী করবে, কোথায় খুঁজতে বেরুবে ছেলেকে? ও ছেলের কেমন যে কপাল, খালি ঝামেলায় জড়ায় নিজেকে। প্রথমে তো থানার হাজতে পুরেছিলো পুলিশ, তারপর ওর বন্ধু ফেরদৌস মাস্তানদের হাতে খুন হলে কী ঝামেলাটাই পোহাতে হয়, তারপর আবার শেষে সমীরনের মেয়েকে নিয়ে মার খেয়ে হাসপাতালে যাওয়ার ঘটনা– ও যদি অমন কোনো ঝামেলায় আবার গিয়ে পড়ে থাকে, তাহলে সে কোথায় গিয়ে খোঁজ করবে? কে ওর খবর দেবে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

রায়হান এপাশ ওপাশ ফেরে। কান সর্বক্ষণ পেতে রাখা, কখন দরজা খোলার শব্দ হয় আর সে ছেলের গলার আওয়াজ শুনতে পায়। কিন্তু কোনো শব্দ হয় না আর সে কিছু শুনতেও পায় না।

এক সময় সে আর শুয়ে থাকতে পারে না। তাকে উঠতে হয়। প্রথমে সে বাতি জ্বালায়। তারপর হাতের কব্জি ঘুরিয়ে ঘড়িতে সময় দেখে, রাত বারোটা। সময় দেখার সঙ্গে সঙ্গে তার বুকের ভেতরে অদ্ভুত ধরনের ধাক্কা লাগে। মঞ্জু কি এখনও বাইরে?

সে ডাইনে বাঁয়ে তাকায়। দেখে মঞ্জুর ঘর অন্ধকার। টুকুর ঘরে বাতি জ্বলছে– মা ছেলে দু'জনেই কি তাহলে মঞ্জুর জন্য জেগে বসে আছে?

মঞ্জুর অন্ধকার ঘরে গিয়ে নিঃশব্দ পায়ে ঢোকে এবং খোলা জানালা দিয়ে আসা বাইরের আলোর আভায় মঞ্জুকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখতে পায়।

বুকের ভেতরকার দাপাদাপিটা তাতে শান্ত হয়। কিন্তু ফের নতুন কৌতূহলও জেগে ওঠে। সবাই যদি ঘরে ফিরে এসে থাকে, তাহলে টুকুর ঘরে বাতি জ্বলবে কেন? ওর তো বেশি রাত জাগার অভ্যাস নেই। তাহলে বীথি কি এখনও জেগে? সে দরজা মেলে ধরে উঁকি দেয় এবং দেখে বীথি বোধহয় কিছু পড়ছিলো। হাতে তখনও একটা ম্যাগাজিন ধরা। সেই অবস্থায় সে দরজার দিকে তাকিয়ে আছে।

বীথি উঠে বসে। কী ব্যাপার? তুমি ঘুমোও নি?

কী হয়েছে, শরীর খারাপ লাগছে? বুকে ব্যথা হচ্ছে?

বলতে বলতে বীথি বিছানা থেকে নেমে এগিয়ে আসে। আর তখন রায়হানকে পিছু হটতে হয়। সে বলে, না কিছু না, কিছু হয় নি আমার, শরীর ঠিক আছে। মঞ্জু ফিরলো কি না, তাই–

রায়হান কথা শেষ করে না। ওদিকে বীথিও মেঝের মাঝ বরাবর জায়গায় দাঁড়িয়ে যায়, আর সামনে এগোয় না।

নিজের ঘরে রায়হান ফিরে আসে। কিন্তু বিছানায় শুয়ে পড়তে পারে না। বসে থাকে, আর তার মনের ভিতরে কে যেন তাকে খোঁচায়। সে কি ফিরে এসেছে? নাকি এটা তার পালিয়ে আসা? আর যদি পালিয়ে এসে থাকে, তো কেন পালিয়ে এলো? কার ভয়ে পালিয়ে এলো? বাড়িময় ঘুমন্ত নিঃশব্দতার মাঝখানে নিজের ঘরের বিছানায় বসে সে কেবলই বুকের ভিতরকার প্রশ্নগুলোর খোঁচা খায়– কেন সে পালিয়ে এলো? কার কাছ থেকে পালালো? কোন ভয়ে পালিয়ে এলো? প্রশ্নগুলো তাকে খোঁচায় কিন্তু সে কোনো উত্তর খুঁজে পায় না।

ওদিকে তখনও বীথি দাঁড়িয়ে। তারও মনে প্রশ্ন, দরজার দিকে যেতে যেতে সে কেন মেঝের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়লো? ওইটুকু দূরত্ব সে কেন পার হলো না? যদি আর কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে মানুষটার মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়াতো, তাহলে কী এমন হতে পারতো! রায়হান তার গলা দু'হাতে পেঁচিয়ে ধরে বুকে টেনে নিতো? মুখে চুমু খেতো? নাকি জোর করে টেনে নিয়ে নিজের বিছানায় শোয়াতো?

মানুষটা যে সত্যি সত্যি ছেলে ঘরে ফিরলো কি না তা দেখতে এসেছিলো, এটা তো মিথ্যা নয়। আর সেই জন্যই সে এতো রাত অব্দি জেগে রয়েছে, এও তো ঠিক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

তার ছোট ছেলের ঘরে বউ শোয়। সে ঘরে এতো রাত পর্যন্ত কেন বাতি জ্বলছে, সেটা জানার জন্য সে অবশ্যই উঁকি দিতে পারে। কারণ সে স্বামী এবং বাবা দুই-ই। তাহলে?

সে কি ঘেন্না করে রায়হানকে? সে নিজের মনের মুখোমুখি হয় এবং আবিষ্কার করে, হ্যাঁ, অবশ্যই সে ঘৃণা করে। কেন করবে না? যে মানুষকে দেখলেই সে অন্য একটা মেয়েছেলের সঙ্গে বিছানায় উলঙ্গ হয়ে যৌনকর্ম করতে দেখে, কল্পনায় তাকে অবশ্যই সে ঘেন্না করবে। সে যে ঘেন্না করতে পারছে মানুষটাকে, সে জন্য তার বেশ ভালো লাগে।

কিন্তু সে ভালো লাগাই বা কতোক্ষণ? বিছানায় ফিরে গিয়ে ফের সে বিচিত্রার পাতা চোখের সামনে মেলে ধরে। কিন্তু তখন আর তার পড়তে ভালো লাগে না। সে উঠে গিয়ে বাতি নিভিয়ে ফের শোয় এবং চোখ বোঁজে।

তবে ঐ চোখ বোঁজা পর্যন্তই। ফের তার মনের ভিতরে কেউ যেন বলতে থাকে, তুই ঠিক জানিস– তুই তোর স্বামীকে ঘেন্না করিস? যদি ঘেন্নাই করিস, তাহলে সেদিন ওই কথা শোনার পর মানুষটাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলি কেন? সেবা শুশ্রূষা করেই বা সুস্থ করে তুললি কেন? তখন তো ঘেন্নার মানুষটার শরীর তুই বুকের মধ্যে চেপে ধরে রেখেছিলি, ওর মাথা কোলে নিয়ে রেখেছিলি। ওর মুখে পথ্য তুলে দিতে তো তোর হাত একটুও কাঁপেনি! তখন তো ঘেন্না করিস নি, এখন কাছে গিয়ে মুখোমুখি দাঁড়াতেই তোর যত ঘেন্না জেগে উঠলো? এমনও হতে পারে, মানুষটা মনের দিক থেকে খুব কষ্ট পাচ্ছে। সে জন্য ঘুমোতে পারে না। বাইরে বাইরে নানান জায়গায় ঘুরে ফিরে নানান কাজ করে নিজেকে ব্যস্ত রাখে। সে জন্য দুপুরে এক একদিন বাসায় পর্যন্ত ফেরে না। আর মানুষটার যা অসুখ, তাতে তার মারা পড়তে কতোক্ষণ? ও মরে গেলে তখনও কি তুই ওকে ঘেন্না করবি?

বীথি সে রাতে অনেকক্ষণ পর্যন্ত ঘুমোতে পারে না।

ওদিকে মঞ্জুরও চোখে ঘুম নেই, মাঝরাত পার হয়ে যায়, তবু। আজ অনেক দেরিতে সে বাসায় ফিরেছে। ভয় হয়েছিলো মা বোধহয় খুব বকুনি দেবেন। কিন্তু খুব আস্তে দরজায় ধাক্কা দেয়াতেই দরজা খুলে যায়। আর মা তাকে ধমক না দিয়ে ফিস ফিস করে বলেন, চুপ, কথা বলবি না, তোর আব্বা ঘুমোবার জন্য শুয়ে পড়েছেন–

সে একটু অবাকই হয়, মায়ের মুখে এ কেমন কথা? আব্বা শুয়ে পড়েছেন বলে আস্তে কথা কেন বলতে হবে?

সে জানতে চায়, ঘুমোচ্ছেন?

বোধহয়, মা জবাবটুকু দিয়ে দরজা বন্ধ করে দেন। মঞ্জুর অবাক হওয়ার আর এক কারণ, আব্বা তো এগারোটার পরে ঘুমোতে যান। আজ আগে কেন ঘুমোতে গেলেন? সে অনুমান করে, নিশ্চয়ই আব্বার শরীর ফের খারাপ হয়েছে।

খাওয়ার টেবিলে সে কয়েক মিনিটের জন্য বসে মুখে কিছু দিয়েই নিঃশব্দে উঠে নিজের বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

কিন্তু ঘুম আর আসে না। আব্বা যে তার ঘরে এসে ঘুরে গেলেন তা সে দিব্যি টের পেলো, কিন্তু কোনো রকম সাড়া দিলো না। ওদিকে মায়ের সঙ্গে আব্বার কিছু কথা হয়, সেটাও তার কানে আসে। দু'চোখ মেলে রাখে সে খোলা জানালার দিকে। মাঝরাতে কৃষ্ণপক্ষের ভাঙা চাঁদটাকে দেখতে পায় সে এক সময়। অথচ ঐ চাঁদের আলো যে অনেক আগেই তার ঘরের ভিতরে এসে পড়েছে তা সে টেরও পায় নি।

কিছুতেই সে ঘুমোতে পারছে না। কারণ রাখির চিঠি পেয়েছে সে আজ দুপুরে। তিমলি দুপুরের দিকে তাকে এসে পাকড়াও করোল। সে তখন লাইব্রেরিতে। খুঁজতে খুঁজতে পাশে এসে দাঁড়ালো প্রথমে। তারপর খুব নিচু গলায় ডাকলো, এই যে গণ্ডার সাহেব, আপনার কি একটু সময় হবে?

সে বেশ অবাক হয় তিমলির অমন ভঙ্গি দেখে। বলে, কেন, আপনি কি আমার কাছে কিছু জানতে চান? গেণ্ডারিয়ার বানরদের খোঁজখবর আপনার কি জানা দরকার।

জ্বী হ্যাঁ, তিমলির চোখেমুখে কোনো রকম কৌতুকের ভাব নেই। ধীর শান্ত আর খুবই স্থির ভঙ্গিতে সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলে, আমি পরশু থেকে খুঁজছি, কিন্তু আপনাকে আজ সকালেও পেলাম না। শুনলাম আপনি ডিপার্টমেন্ট ছিলেন, ক্লাসও করেছেন। কিন্তু তারপর থেকে নাকি আর পাত্তা নেই আপনার। শেষে একজন লাইব্রেরির কথা বললো, আর তারই কথামতো এসে দেখি, ঠিক জায়গাতেই এসেছি– তা আপনার কি সময় হবে?

মঞ্জুকে আসন ছেড়ে উঠে আসতে হয়। দু'জনে পাশাপাশি লাইব্রেরি থেকে বেরিয়ে পেছনে লনের দিকে আসে। তারপর একটা বাচ্চা বকুল গাছের নিচে দাঁড়িয়ে হুকুম করে, বসো, কথা আছে।

থ' হয়ে মেয়েটার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে মঞ্জু, কী অদ্ভুত মেয়ে। এমন সরাসরি তুমি বলছে কীভাবে? সে আন্দাজ করতে পারে না, তিমলি তার সঙ্গে কেন অমন নাটকীয় ব্যবহার করছে।

তিমলি বলে, রাখি আর আমি স্কুলে যখন পড়ি, তখন থেকেই আমরা বন্ধু সে খবর কি জানো?

হ্যাঁ, মঞ্জু মাথা হেলায়। বলে, রাখি আমাকে বলেছে সে কথা।

কলেজেও আমরা খুব ঘনিষ্ঠ ছিলাম।

তা-ও জানি, মঞ্জু জানায়।

রাখি এখন কোথায়, তা জানো?

না, মঞ্জু মাথা নাড়ায়। বলে, শুনেছি ওর বাবা ওকে ইণ্ডিয়া পাঠিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু ঠিকানা জানি না।

জানবার চেষ্টা করেছিলে কখনও? তিমলি চোখে চোখে তাকিয়ে প্রশ্নটা করে।

মঞ্জু মাথা নাড়ায়। বলে, না।

কাওয়ার্ড কোথাকার! তিমলি ধমকে ওঠে। বলে, একটা মেয়ে তোমাকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতো। তোমার কাছ থেকে তাকে তুলে নিয়ে গেলো কয়েকটা গুণ্ডা-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বদমাশ। তার ওপর চূড়ান্ত অত্যাচার করা হলো, মান ইজ্জতের কথা ভেবে তার মা বাবা তাকে দূরে পাঠিয়ে দিলেন, আর তুমি কিছুই করলে না ? অদ্ভুত পুরুষ মানুষ তুমি।

কথা বলতে বলতে তিমলির মাথা উঁচু হয়ে ওঠে। চিবুকটা ধারালো দেখায়। চোখের নজরও হয়ে ওঠে প্রখর। বলে, আমি দু'দিন আগে ওর চিঠি পেয়েছি, তোমাকে বলতে হবে, রাখিকে কি তুমি ঘেন্না করো ?

মঞ্জুর ভয়ানক রাগ হয় অমন প্রশ্ন শুনে। সে বলে, এ প্রশ্ন তুমি কেন করছো, তোমার কাছে কি প্রমাণ দেখাতে হবে যে, আমি রাখিকে ভালোবাসি, না ঘেন্না করি ? তুমি কে ? কেন আমি তোমাকে অমন প্রশ্নের জবাব দেবো ?

তার অমন রেগে ওঠাতে তিমলির উত্তেজিত চেহারা শান্ত হয়ে আসে। মুখে কোমলতা ফিরে আসে, ঠোঁটের কোণে হালকা হাসির আভা দেখা যায়। মঞ্জুর চোখমুখের দিকে সে তার মায়াভর্তি নজর মেলে রাখে কিছুক্ষণ। তারপর খুব কোমল গলায় জিজ্ঞেস করে, তুমি ওকে এখনও খুব ভালোবাসো, তাই না ?

মঞ্জু ফের রেগে ওঠে। বলে, এসব ফাজলামির কী মানে ? খবরদার, রাখিকে নিয়ে কোনো রকম কথা বলবে না আমার কাছে– আমি তোমার সঙ্গে আর কথা বলতে চাই না।

কথাটা বলে সে উঠে দাঁড়ায়। তার গলা তখন আবেগে ধরে এসেছে, কথা বেরুচ্ছে না মুখ দিয়ে।

তার অবস্থা দেখে তিমলিরও যে কী হয়। সেও লাফিয়ে উঠে দাঁড়ায়, তারপর মঞ্জুর হাত ধরে টেনে বসাতে বসাতে বলে, আহা রাগ করছো কেন ? আমার সঙ্গে তো তোমার কোনো রকম শত্রুতা নেই। রাগ করার কী হয়েছে– একটু চুপ করে বসোই না– দেখো, আমি কী করি–

বলতে বলতে সে নিজের ব্যাগ খুলে একটা খামের ভিতর থেকে আর একটা খাম বের করে মঞ্জুর দিকে এগিয়ে ধরে। বলে, নাও এটা তোমার।

মঞ্জু মুখ বন্ধ খামটা হাতে নিয়ে উল্টে দেখে ওপরে তার নাম লেখা। ডাকনাম নয়, একেবারে পুরো নাম– মাহিব রায়হান। রাখির হাতের লেখা চিনতে তার একটুও অসুবিধা হয় না।

তিমলি বলে, তুমি ওভাবে রিএ্যাক্ট করবে, আমি ভাবতে পারি নি। আমাকে লেখা চিঠির খামের ভিতরে সে তোমাকে লেখা খামসুদ্ধ চিঠিটা ভরে দিয়েছে। আর দেখো, কী লিখেছে– তোমাকে ঐ চিঠি দেয়ার ব্যাপারে।

সামনের দিকে চিঠিটা এগিয়ে ধরে তিমলি কিন্তু মঞ্জু হাত বাড়ায় না। অন্যকে লেখা চিঠি সে পড়বে কেন ?

অগত্যা চিঠিটা তিমলি ফের খামে ভরতে ভরতে বলে, থাক, ও চিঠি পড়ে তোমার কাজ নেই। ও চিঠি পড়লে তুমি আবার ক্ষেপে যেতে পারো।

মঞ্জু হাসে ঐ কথায়। বলে, ঠিক আছে, চিঠি পড়বো না, কিন্তু কী লিখেছে সেটা বলো ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

তিমলিও হাসে। বলে, লিখেছে, চিঠিটা যেন সোজাসুজি তোমার হাতে না দিই– তার আগে যেন জিজ্ঞেস করে নিই, তুমি ওকে–

এই পর্যন্ত বলে সে সকৌতুকে মঞ্জুর দিকে তাকায়। তারপর একটু থেমে বলে, না তুমি যা ভাবছো, তা নয়– ও কথা জানতে চায় নি যে, তুমি ওকে ভালোবাসো কিনা– ও লিখেছে, আমি যেন জিজ্ঞেস করে নিই, তুমি ওকে ভুলে গেছো কি না।

ঐ কথা বলে তিমলি মঞ্জুর কাছে গিয়ে ঘন হয়ে দাঁড়ায়। তারপর বলে, আমি যে তোমাকে গণ্ডার বলে ডাকি তাতে তোমার খুব রাগ হয়, তাই না?

মঞ্জু জবাবে বলে, আমি তো কিছুই টের পাই না, গণ্ডারের চামড়া কেমন মোটা তা তো নিশ্চয়ই তোমার জানা।

ঐ কথার পর তিমলি কী যে হয়, সে আর দাঁড়ায় না, কোনো কথা না বলে চুপচাপ চলে যায়। মঞ্জু ফের বসে ঘাসের ওপর। তারপর খাম ছিঁড়ে রাখির চিঠি বের করে পড়ে। অল্প কয়েকটা লাইন শুধু, যার মধ্যে লেখা, ওই গুণ্ডা দু'টি আমাকে সম্পূর্ণ নষ্ট করে দিয়েছে, তবু আমি তোমার কথা ভুলতে পারি না– আমি সব সময় তোমার কথা ভাবি, বোধহয় সারাজীবন আমাকে তোমার কথাই ভাবতে হবে, তোমার একটা ফটো পাঠাবে? ব্যস, এই রকম ক'টি কথা চিঠিতে।

রাখিকে ওই নষ্ট করে দেয়ার কথাটা তার মনে কাঁটার মতো বেঁধে। তবু সে বারবার করে পড়ে চিঠিখানা। ডাইনে বাঁয়ে তাকায় সে একবার। মনে মনে হিসেব করে, রাখির জীবনকে যারা নষ্ট করে দিয়েছে, সেই আবু আর সাবু দুই মাস্তানকে ইউনিভার্সিটি এলাকায় সে কতবার দেখেছে?

একবার দু'বারের বেশি ওদের দেখেছে বলে তার মনে পড়ে না। আজকাল ওদের দু'জনকে দেখতে পায় না কেউ।

লাইব্রেরিতে ফিরে গিয়ে সে তার বই নিয়ে বসতে পারে না। যে নোটটা তৈরি করছিলো, সেটা বাদ থেকে যায়। খাতাপত্র গুটিয়ে নিয়ে ব্যাগে পোরে সে। তারপর বেরিয়ে পড়ে। বড় রাস্তায় গিয়ে পড়লে পিছনে স্লোগানের আওয়াজ শুনতে পায়– কিন্তু তবু সে পেছনে তাকায় না। তার জানতেও ইচ্ছে করে না, কাদের ওই মিছিল আর স্লোগান, ছাত্রলীগের না ছাত্রদলের। তবে এটুকু সবার মতো তারও জানা যে, ওই মিছিল আর স্লোগান দুই দলের মধ্যে একদলের হবে। কেননা সরকারী দল জাতীয় ছাত্র সমাজ আজকাল ইউনিভার্সিটি এলাকায় যখন তখন মিটিং মিছিল করতে পারে না।

কার্জন হল এলাকায় ফিরে এলে ফের সে ডিপার্টমেন্টে ঢোকে। কিছুদিন হলো হামিদ নামে নরসিংদীর একটি ছেলের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হয়েছে, ঐ হামিদের আবার দুই বন্ধু আছে সয়েল সায়েন্সের ছাত্র– একজন দীপন, বাড়ি কুষ্টিয়া আর একজন শাহীন বাড়ি বগুড়া। ওরা ছাত্র আন্দোলনের ধার দিয়েও যায় না কিন্তু সর্বক্ষণ রাজনীতি আর ইতিহাস নিয়ে আলাপ করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

রাখির চিঠিখানা বুকপকেটে রাখার পর থেকে সর্বক্ষণ, বলা যায় প্রত্যেকটা মুহূর্ত সে অনুভব করছে যে, রাখির হাতের লেখা তার বুকের ওপর আছে। চিঠিখানা বুকের কাছে রাখার জন্যই কি না কে জানে, নিজেকে তার খুব ছোট মনে হয়। খুবই দুর্বল আর ক্ষুদ্র। ফেরদৌস খুন হয়ে গেলো, কিন্তু সে কিছুই করতে পারে নি। বরং সে নিজেই প্রাণের ভয়ে লুকিয়ে বেড়ালো কিছুদিন। নিজের মনকে তখন সে বুঝিয়েছে যে, নিজেদের দলের মধ্যে বখরা নিয়ে ভাগাভাগির জন্য সে মারা পড়েছে। সে জানতো কারা খুনী, কিন্তু সেই খুনীদের নাম সে কারুর কাছে এতদিনেও বলতে পারলো না– এতই সে অসহায় আর ভয়কাতর। তখন নিজেকে অসহায় ভাববার কারণ না হয় এই যে, সরকারী দলর গুণ্ডারা ফেরদৌসকে খুন করেছিলো। কিন্তু এখন? রাখির সর্বনাশ যারা করেছে, তারা তো সরকারী দলের কেউ নয়, তাদের ব্যাপারে সে কী ভাবছে? আবু সাবু দুই মাস্তান ভাই তো সরকারী দলের কেউ নয়। বলা যায়, সরকারের বিরুদ্ধে যারা আন্দোলন করছে, তাদের সঙ্গেই আবু সাবুর অবস্থান– এখনও তবু কেন সে নিজেকে অসহায় আর দুর্বল ভাবছে? তাহলে কি তিমলির ধারণাই ঠিক, সে একটা কাওয়ার্ড! সে পুরুষ মানুষ এখনও হয়ে উঠতে পারে নি?

হামিদকে তার দুই বন্ধুর সঙ্গেই পাওয়া গেলো শহীদুল্লাহ হলের পুকুর ঘাটে। তিনজন মিলে চলছিলো তুমুল তর্ক। তর্কের বিষয়টা কী? না বিপ্লবের নেতৃত্ব কে দেবে, শ্রমিকরা, নাকি কৃষকরা? সর্বহারা আসলে কারা?

মঞ্জু ঐ আলাপের মাঝখানে গিয়ে পড়লো। বললো, তোমরা এখানে তর্ক নিয়ে ব্যস্ত, ওদিকে দেখো গিয়ে– কত বড় মিছিল বেরিয়েছে।

দীপন হাসে। বলে, তুমি চলে এলে কেন? ওদের সঙ্গে থাকতে, মিছিলের সঙ্গে ঘুরতে। বুর্জোয়াদের ল্যাজ ধরে ঘুরলে কিছু-না কিছু নিশ্চয়ই পেয়ে যেতে।

মঞ্জু খোঁচাটা হজম করে। কারণ দীপন মফস্বলের ছেলে হলে কী হবে, ওর পড়াশোনা প্রচুর।

হামিদ জিজ্ঞেস করে, আজ কাদের দাপট বেশি দেখলে।

ছাত্রদলের না ছাত্রলীগের?

শাহীন হেসে ওঠে। বলে, দাপট যাদেরই হোক, তাতে আমাদের কী? ক্ষমতায় তো সকলেই ছিলো, এখনও আছে, তাতে কারো লাভ হয়েছে, বলো?

হামিদ বিরক্ত হয়ে বলে, আহা খবরটা জানতে দোষ কি–

এই রকম এলোমেলো কথা হতে হতে বিকেলও ফুরিয়ে যায়। মঞ্জুর বুকের কাছে তখনও রাখির চিঠি লেগে আছে। দীপন আর শাহীন চলে গেলে মঞ্জু হামিদকে জিজ্ঞেস করে, আন্ডারগ্রাউন্ড রাজনীতির সঙ্গে তোমার সত্যি সত্যি যোগাযোগ আছে?

হামিদ হাসে। বলে, তুমি তো বেজায় আহম্মক? যোগাযোগ থাকলেও কি আমি বলবো? বলো, বলে কেউ?

আচ্ছা এমন কি হতে পারে না, যারা এখন ছাত্রলীগ আর ছাত্রদল করছে তারা সবাই বিপ্লবী কোনো দলের মেম্বার হয়ে গেলো– হতে পারে না কি? তখন নিশ্চয়ই বিপ্লব হয়ে যাবে? কী বলো, হবে না?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বন্ধুর মুখে ছেলেমানুষী প্রশ্ন শুনে হামিদ হাসে। বলে, বিপ্লব জিনিসটা কী, সেটা জানতে হবে আগে, তারপর না বিপ্লব করার প্রশ্ন।

আচ্ছা, মঞ্জু ফের প্রশ্ন তোলে, বিপ্লব হলে এই যে, মাস্তান টাস্তানগুলো আছে। এরা কি তখনও থাকতে পারবে ? আমি শুনেছি বিপ্লবী দেশে নাকি সোশ্যাল সিকিউরিটি সবচেয়ে বেশি থাকে ?

হ্যাঁ, থাকে। হামিদ স্বীকার করে।

মঞ্জু বলে তাহলে সবাই ঐ বিএনপি আর আওয়ামী লীগের পিছনে ছোটে কেন ?

জ্ঞানবুদ্ধির বিকাশ ঠিকমতো হয় নি, তাই।

পুকুর ঘাট থেকে উঠে হামিদ নাজিমউদ্দিন রোডে তার মেসের দিকে রওনা হয়। মঞ্জু সঙ্গ ছাড়ে না। ওদিকে দেখতে দেখতে সন্ধ্যার আজান পড়ে গেলো। দু'জনে মেসে পৌছালো সন্ধ্যার পর। মঞ্জু এক সময় জিজ্ঞেস করে বললো, হামিদ তুমি নিশ্চয়ই ট্রেনিং নিয়েছো।

কিসের ট্রেনিং ? হামিদ অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। তাকে ওভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে মঞ্জু জিজ্ঞেস করে, তুমি না সেদিন বললে, আন্ডারগ্রাউন্ড পার্টির সঙ্গে তোমার যোগাযোগ আছে। যোগাযোগ তো আর এমনি এমনি হয় নি। নিশ্চয় তুমি পার্টিতে কোনো সময় ছিলে ?

গোটা মেস তখন নির্জন। এ সময় মঞ্জু হামিদের কাছে নিজের কথা বলতে শুরু করে। বলে শোনো, আমার অসহ্য লাগে, খুবই অসহ্য লাগে ঐ মাস্তানদের দেখলে, যদি সব মানুষ একসঙ্গে আর্মস হাতে নিয়ে রুখে দাঁড়াতো তাহলে কতো ভালো হতো, চিন্তা করে দেখো।

সুন্দর চেহারার বন্ধুটির আশায় জ্বলজ্বল মুখের দিকে তাকিয়ে খানিক বয়সে বড় হামিদের মায়া জেগে ওঠে মনে। বলে, মঞ্জু, হঠাৎ করে বিপ্লব হয় না, আর হঠাৎ করে তা বোঝাও যায় না, আমার বাবা যখন ছাত্র ছিলেন, আমাদের মতো বয়সেই তিনি অনেক কিছু জানতেন, আমরা কিছুই জানি না।

কথায় কথায় রাত হতে আরম্ভ করে। মঞ্জুর বুকের ওপর রাখির চিঠির লাইনগুলো বুকের খুব ভিতরের দিকে কোথায় যেন দাগ কেটে কেটে বসে যেতে থাকে। সে ঘুরেফিরে ওই একই কথা বলে, বিপ্লব ছাড়া তো মাস্তানবাজি খতম হবে না। বলো হবে ? আন্ডারগ্রাউন্ড পার্টির সঙ্গে তোমার যোগাযোগ, আমাকে তুমি ওদের কাছে একদিন নিয়ে যাবে ?

এই পর্যন্ত কথা হয়, তার একটু পরই হামিদের রুমমেট ভদ্রলোক এসে যাওয়ায় মঞ্জুকে বাসায় ফেরার রাস্তা ধরতে হয়।

রাখির চিঠি বুকের কাছে রেখে সে রাত জাগে। আর মনে মনে বলে, রাখি আমিও তোমার কথাই সারাজীবন ভাববো– তুমি দেখো। নিজেকে সে ঐ কথা শোনায় আর মনে মনে ভাবে, সে কি বিপ্লবের জন্য কাজ করতে পারে না ? যে বিপ্লব হলে আব-সাবুদের মতো মাস্তানদের নিশ্চিহ্ন করা যায়!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

চব্বিশ

পরীক্ষা শেষ হওয়ার আগে পর্যন্ত রঞ্জু টের পায় নি তার মনের ওপর যেন একটা বোঝা চেপে ছিলো। দেড়-দু'ঘন্টা ধরে এটা সেটা হ্যানো ত্যানো প্রশ্নের জবাব দেয়া কি সোজা কথা! শেষ দিন ছিলো 'গাইনী' আর ওই পেপারটাই তার কাছে ছিলো বেশি ভয়ের। হলে হবে কি, স্যারদের দয়ামায়া বলে কিছু থাকে না। আর এক্সটার্নাল যাঁরা আসেন তাঁরা তো ছাত্রদের বেকায়দায় ফেলার জন্য যেন প্রতিজ্ঞা করে আসেন। ইন্টার্নালের প্রশ্নের জবাব দিতে হলো একের পর এক– প্রশ্ন আর ফুরোয় না। তারপর ধরলেন এক্সটার্নাল। মনে হচ্ছিলো, সন্ধ্যা পর্যন্ত বোধহয় তাকে শুধু প্রশ্নের উত্তরই দিয়ে যেতে হবে। কনজেনিটাল কারণে মিসক্যারেজ হতে পারে কি না এই প্রশ্নটার জবাব শুধু সে দিতে পারে নি। ওটাই ছিলো শেষ প্রশ্ন। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পরও উত্তর না পেয়ে এক্সটার্নাল হেসে ফেললেন। জবাবটা নিজেই দিয়ে বললেন, তুমি এবার যেতে পারো। রুম থেকে বেরিয়ে প্রথমে সে লম্বা নিঃশ্বাস নিলো একটা। তারপর বাইরে পা রাখতেই নিজেকে ভীষণ হালকা লাগলো তার। শীতের শেষ বেলার রোদ গালে-মুখে লাগলে ভারী মিষ্টি লাগলো। বাইরে তাকালে সঙ্গে সঙ্গে নজর ফেরাতে পারলো না। মনে হলো, বহুদিন পর যেন আকাশ দেখছে মাথার ওপর। অগাধ নীলের মধ্যে এক ঝাঁক কার যেন পোষা পায়রা উড়ছিলো। ওড়ার ধরন দেখেই বোঝা যাচ্ছিলো, কোনো শৌখিন মানুষ ওগুলোকে ওড়াচ্ছে। তার মনে পড়ে ছেলেবেলায় একটা কুকুরের বাচ্চা সে কুড়িয়ে বাসায় এনেছিলো। বাচ্চাটাকে কেউ বোধহয় ড্রেনে ছুঁড়ে ফেলেছিলো। ময়লা পানিতে চুবানি খাওয়ার পর কোনো রকমে ড্রেন থেকে উঠে এক পাঁচিলের কোণ ঘেঁসে কেঁউ কেঁউ করছিলো। তখন তারা নারিন্দার ভূতের গলিতে থাকতো। বাচ্চাটাকে কোলে করে বাসায় সিঁড়ির নিচে লুকিয়ে রেখেছিলো। ভেবেছিলো, কেউ জানতে পারবে না। কিন্তু ঐদিন আব্বা-আম্মা দু'জনেই জানতে পারেন। কিন্তু কিছু বলেন নি। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই বাচ্চাটা বড় হয়ে উঠেছিলো। আব্বা কুকুরটাকে দেখেই বোধহয় একদিন একজোড়া টিয়াসুদ্ধ একটা খাঁচা কিনে এনে বারান্দায় ঝুলিয়ে দেন। আম্মা কিন্তু তখনই বলতে শুরু করেন, এসব ভালো, কিন্তু যদি এক ঝাঁক পায়রা থাকতো আমাদের, তাহলে বেশ হতো। পাশের বাড়ির এক বুড়ো ভদ্রলোকের এক ঝাঁক পায়রা ছিলো। তিনি রোজ দুপুর বেলা হাতে তালি দিয়ে দিয়ে পায়রার ঝাঁকটাকে ওড়াতেন। হাতের তালি শুনে একেকটা পায়রা আকাশে উড়তে উড়তে এমন ডিগবাজি দিতো যে মনে হতো এই বুঝি ধপাস করে মাটিতে পড়লো। কিন্তু পড়তো না।

রঞ্জু উড়ন্ত পায়রার ঝাঁক দেখতে দেখতে হাঁটে। তার কুড়িয়ে আনা কুকুরের বাচ্চা টমিকে মনে পড়ে, সেই সঙ্গে টিয়া পাখি দুটোকেও। একাত্তরের ২৭শে মার্চে তারা বুড়িগঙ্গা পার হয়ে ভিক্সিরা চলে গিয়েছিলো। সেখানে আব্বার এক বন্ধুর বাড়িতে ছিলো দুই রাত। তারপর ধলেশ্বরী পার হয়ে আরও দূরে চলে গিয়েছিলো। এক গ্রাম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

থেকে আর এক গ্রামে। সেখান থেকে আবার আর এক গ্রামে। দুই মাস কাটে ওইভাবে, তারপর আব্বার টাকাপয়সা ফুরিয়ে গেলে ফিরে আসতে হয়। ফিরে এসে দেখে, বাসার দরজা ভাঙা, টিভিটা নেই, মায়ের সেলাই মেশিন উধাও, কাপড়-চোপড়, ট্রাঙ্ক-সুটকেস, আলমারি কিছুই নেই। টমিকে খুঁজেছিলো রঞ্জু, পায় নি। খাঁচাসুদ্ধ টিয়াপাখি দুটো কে নিয়ে গিয়েছিলো, সে খোঁজও পাওয়া যায় নি।

বহু দিন পর রঞ্জু মনের ভিতরে ছেলেবেলার অনেক ছবি দেখতে পায়।

একাকী হোস্টেলের দিকে অলস ভঙ্গিতে হেঁটে হেঁটে ফিরছিল। মনের ভিতরটা হালকা আর সেখানে কিছু ছেলেবেলার স্মৃতি। হঠাৎ ঘাড়ের ওপর হাত এসে পড়লে সে ফিরে তাকায়। দেখে মনির, হাসছে। চোখমুখ থেকে খুশি যেন ঠিকরে বেরুচ্ছে। বললো, যাস্ শালার পড়াশোনা আজ থেকে খতম, আর বই মুখস্থ করতে হবে না– এবার ছুটি।

মনে হচ্ছে পরীক্ষা খুব ভালো দিয়েছিস ? রঞ্জু হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করে।

অফকোর্স ভালো দিয়েছি। দু'এক্সটার্নালের একজনও আমাকে আজ আটকাতে পারে নি। সবার আগে আজ আমার সিরিয়াল ছিলো, স্যারদের মনমেজাজ কেমন থাকে প্রথম দিকে, তাতো জানিসই।

মনিরের উচ্ছ্বাস থিতিয়ে যায় খানিক পরই। তখন বলে, তুই তো ঢুকলি সবার পরে, শাহনির কাণ্ড দেখিস নি, খুশিতে একেবারে লাফাচ্ছিলো।

রঞ্জুর কোনোরকম কৌতূহল জাগে না। নিস্পৃহ ভঙ্গিতে শুধু বলে, তাই ?

কী হয়েছিলো ?

মনির তার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। তারপর পাল্টা প্রশ্ন করে– আরমানরা কি খুব বড়লোক ?

রঞ্জু হাসে। বলে, তা তো জানি না। একটু চিন্তা করে ফের বলে, হ্যাঁ, বড়লোক হতে পারে, কেন ?

না, কিছুদিন ধরে দেখছি, শাহনির সঙ্গে খুব ঘোরাফেরা করছে। আজ আরমানের পরীক্ষা ছিলো না, তবু দেখলাম, সারাটা সময় কাছাকাছি ঘোরাফেরা করছিলো, মনে হলো শাহনির জন্যেই অপেক্ষা করছিলো। ওদের মধ্যে কি কিছু হয়েছে ? মনির রঞ্জুর মুখের দিকে তাকায়।

রঞ্জুর একটু হাসি পায় বোধহয়। সে পাল্টা প্রশ্ন করে, কী হবে ?

না, মানে কোনো এ্যাফেয়ার ট্যাফেয়ার চলছে কি না, কিছু জানিস ?

রঞ্জু মাথা নাড়ায়। বলে, উহুঁ, আমি কোত্থেকে জানবো ?

সে কিরে! মনির রীতিমতো অবাক হয়! বলে, আমি শুনেছিলাম, তোর সঙ্গে ওর এ্যাফেয়ার অনেক দূর এগিয়েছে, মেয়েদের মধ্যে অনেকেই জানে, পরীক্ষা হতে যা দেরি, তারপর আর দেরি হবে না, সোজাসুজি বিয়ে।

রঞ্জু শুনে যায়, কিছু বলে না। কী বলবে ? এমন কথা তো শাহনি নিজের মুখে বলেছিলো, সুতরাং মনিরের কী দোষ!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

আমাকে তুই কখনও বলিস নি। অন্যের মুখে শুনতাম, মনে হতো, হবে হয়তো, তুই আমাকে পরে বলবি, কিন্তু বলিস নি কী হয়েছিলো ? কেন তোর সঙ্গে আর মেশে না ?

কী জানি! রঞ্জু উদাস স্বরে বলে। তারপর জানায়, আমি কিছু জানি না মনির।

কিন্তু ও নাকি বলে বেড়াচ্ছিলো পরীক্ষা শেষ হলেই ও বিয়ে করবে, একদিনও দেরি করবে না।

রঞ্জুরও মনে পড়ে। মুখোমুখি তাকিয়ে হাতে হাত ধরে তাকেও বলেছিলো অমন কথা। সে কোনো মন্তব্য না করে পা চালিয়ে হাঁটে।

মনিরও পায়ে গতি আনে। বলে, আমি নিজের কানে শুনি নি। আমাকে বলেছে নীহার।

বন্ধুর কথা শুনে রঞ্জু দাঁড়িয়ে যায়। বুঝতে পারে না, কার কথা বলছে মনির।

আরে নীহার, খার্ড ইয়ারে পড়ে, ফাংশনে গান গেয়েছিলো। মনে নেই ? বলতে বলতে মনিরের মুখ বোধহয় একটু লাল হয়। বলে, আমাকে কিছু দিন আগে ওই প্রথম বলেছিলো। আপনার রুমমেট তো পরীক্ষার পরপরই বিয়ে করতে যাচ্ছে, আপনার কী খবর! ওর মুখেই শুনেছিলাম, শাহনি নাকি রেগুলার তোদের বাসায় যায়। তোর বাবা মা ওকে খুব আদর করেন। এদিকে তোর সঙ্গে ঘুরতে ফিরতেও দেখতাম, মনে হতো, ঠিকই বোধহয় খবরটা। তারপর আবার দেখছি আরমানের সঙ্গে ঘুরছে ফিরছে। ব্যাপারটা আসলে কী ? তোর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে ?

রঞ্জু মাথা নাড়ায়। বলে, নাহ্, আমার সঙ্গে কেন ঝগড়া হবে! আমাকে কখনও কারুর সঙ্গে ঝগড়া করতে দেখেছিস ?

ওই পাল্টা প্রশ্নের পর ও বিষয়ে আর মনির কথা বাড়ায় না। শুধু নিজের মনে বলে, শালা এই মেয়ে মানুষের জাতটাই যত ঝামেলার, কখন যে কী মতিগতি হবে ওদের, কিছুই বলা যায় না, এজন্যই আমি ভাই ওদের কাছ থেকে দূরে থাকতে চাই।

রঞ্জুর হাসি পায় বন্ধুর কথা শুনে। বলে, তাই বুঝি ? নীহারের কাছ থেকেও তুই দূরে থাকতে চাস, তাই না ? ওর আগে ইউনিভার্সিটির ওই মেয়েটা, কী যেন নাম, শায়লা, ঠিক না ? ওর কাছ থেকেও– তো তুই দূরেই থাকতে চেয়েছিলি, কী বলিস ?

হাসতে হাসতে রঞ্জু কথাটা বলে। মনিরও তার সঙ্গে হাসে। কিন্তু ঐ প্রসঙ্গ আর থাকে না দু'জনের কথায়। নিজেদের রুমে গিয়ে দু'জনেই পাশাপাশি বিছানায় লম্বা হয়ে চুপচাপ পড়ে থাকে কিছুক্ষণ। দরজা ভেজানো। ঘরখানা এমনই চুপচাপ হয়ে থাকে যে বাইরে থেকে তখন বোঝা মুশকিল, ঘরের ভেতরে কেউ আছে কি না।

অনেকক্ষণ চুপচাপ থাকার পর রঞ্জু পাশ ফিরে মনিরের দিকে তাকায়। তারপর জানতে চায়, বিএনপি কী করতে যাচ্ছে জানিস ?

নাহ্, ওদিকে যাই নি, পরীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। মনির থেমে থেমে অচল সিলিং ফ্যানটার দিকে তাকিয়ে থেকে বলে, কী আর করতে যাবে, বন্যাটন্যা গেলো, তখন কিছু করতে পারে নি, এখন বোধহয় আন্দোলন টান্দোলনের দিকে যাবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

একলা যাবে ? রঞ্জু ফের জিজ্ঞেস করে।

না একলা কি আর যাবে, ৭ দল তো সঙ্গে রয়েইছে।

৮ দলের সঙ্গে আন্দোলন করবে না ?

রঞ্জু ফের জানতে চায়।

আরে নাহ্। মনির জবাব দেয়, বলে, আওয়ামী লীগের সঙ্গে কীভাবে যাবে ? যদি যায়, তাহলে বিএনপি'র নাম নিশানা থাকবে ?

ঠিক আছে, আওয়ামী লীগের সঙ্গে মাখামাখি না করুক কিন্তু জামায়াতের সঙ্গে অত গলায় গলায় ভাব রাখার কী দরকার বল ? এটা কি ঠিক ?

কী জানি, মনির অস্পষ্ট জবাব দেয়। বলে, ব্যাপারটা আমিও ঠিক বুঝি না– আর ভালোও লাগে না এসব আজকাল। নিজের কথা বেশি ভাবছি, কেন জানি না, আগে ভাবতাম না। ভাবতাম দেশের কোটি কোটি মানুষ দুঃখকষ্টে জীবন কাটিয়ে দিচ্ছে, ওদের কষ্টের জীবন দেখতে দেখতে কি কখনও নিজের জীবনকে সুখী করতে পারবো? এইসব কথা মনে হতো। আর সেজন্য নিজেকে নিয়ে আলাদাভাবে ভাবতে আমার খারাপ লাগতো। নিজেকে স্বার্থপর মনে হতো। ওই সময় শায়লার সঙ্গে জানাশোনা হয়। দেশের মেয়ে, অল্প কিছু দিনের মধ্যেই ভালো ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেলো। ওদের বাড়িতে নিয়ে গেলো একদিন, ওর বাবা জানালেন আমার আব্বা নাকি ওঁর ছেলেবেলার বন্ধু, ওদের বাড়িতেও আমার বেশ খাতির যত্ন হতো। শায়লা ওর অনার্স পরীক্ষা শেষ হওয়ার পরপরই বলে বসলো, আমার বাবার কাছে লোক পাঠাও তোমরা, না হলে কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে। বড় ভাই অন্য কোথাও আমার বিয়ে দিয়ে দেবে। নিজের মুখে বললো মেয়েটা, অথচ আমি কিছুই করলাম না। দিব্যি পাশ কাটিয়ে থেকে গেলাম। সত্যি সত্যি শায়লার সে দফায় বিয়ে হয় নি, বিয়ে হলো পরের বছর ওর এম এ পরীক্ষা দেয়ার পর, কিন্তু আমার সঙ্গে সম্পর্ক আর ছিলো না।

একটু থেমে ফের বলে মনির, আমার দোষ কি জানিস ? আমি নিজের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারি না। এখনও আমার ওই একই সমস্যা, নীহারের বেলাতেও। বল কী করি ? বিয়ে করে সংসার পেতে বসতে আমার একদম মন চাইছে না এখন, দেখ তুই চারদিকে তাকিয়ে, মানুষের কী রকম কষ্ট, আমরা তো রোজই দেখি হাসপাতালের বারান্দায় সিঁড়িতে গেটের কাছে রাস্তার ধারে কত মানুষ পড়ে থাকে। সবাই কিন্তু এসেছে চিকিৎসার জন্য। আমরা চিকিৎসা দিতে পারি ? বল, পারি ? যারা এসে ওইভাবে থাকে তাদের মধ্যে কতোজন ঐভাবে পড়ে থাকতে থাকতেই মরে যায়। যায় না, বল তুই ? অমন দৃশ্য দেখার পর নতুন বিয়ে করা সুন্দরী বউয়ের গলা জড়িয়ে ধরতে পারবো ? তার শরীরের কাপড় সরিয়ে যখন বুকের সৌন্দর্য দেখবো তখন ওই সিঁড়িতে পড়ে থাকা মেয়েটার উদোম শুকনো পাঁজরঅলা বুক মনে পড়বে না ? মনে পড়বে না তার শুকনো মুখ, খোঁদলে ঢুকে যাওয়া চোখ আর জেগে ওঠা উঁচু চোয়াল? চিন্তা করে দেখ। ফের বলে মনির, যদি অমন দৃশ্য মগজের ভিতরে সাঁটা থাকে তখন সেক্স বলে কি কিছু জাগবে আমার শরীরে ? তখন বউ তো ইম্পোটেন্ট বলে লাথি মেরে ফেলে দেবে ফুলশয্যার বিছানা থেকে। বল দেবে না ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ওর কথার ধরন দেখে হাসি পাওয়ার কথা। কিন্তু রঞ্জু হাসে না। সে জানে, মনির একটু বেশি সেনসিটিভ টাইপের ছেলে। কিন্তু সে যে বুদ্ধিসুদ্ধিতও কিছুটা ছেলেমানুষ তা তার জানা ছিলো না। তার মায়া লাগে মনিরের যন্ত্রণাক্লিষ্ট মুখের চেহারা দেখে। মনে হয়, খামোকা ও অদ্ভুত অদ্ভুত চিন্তা-ভাবনা করে কষ্ট পাচ্ছে। বলে, তুই খামোকা বেশি বেশি চিন্তা করিস। বুঝলি, তুই যেভাবে ভাবছিস ওভাবে কিছু হয় না। মানুষের স্বাভাবিক যেসব সেনসিটিভিটি থাকে, সেগুলো আপনা থেকে কাজ করে। যে সব দৃশ্য চোখ সওয়া হয়ে গেছে, সে সব দৃশ্য শকিং হলেও স্বাভাবিক নার্ভাস সিস্টেমকে ডিসরাপ্ট করতে পারে না। তুই যা ভাবিস অমন কিছুই হয় না, তুই যা, আজই বিয়ে করে ফেল। বল, আমিই না হয় যাই নীহারের বাবার কাছে প্রস্তাব নিয়ে– ওদের বাড়ির ঠিকানাটা শুধু কষ্ট করে জানাতে হবে তোকে, বাকি সব কাজ আমিই করতে পারবো।

হাসাহাসির মধ্য দিয়ে দুই বন্ধুর কথা শেষ হয়। কিছুক্ষণ পর দু'বন্ধুতে মিলে বাইরে বের হয়। উদ্দেশ্যহীন হাঁটে কিছুক্ষণ। হাঁটতে হাঁটতে কোন দিকে যাবে ভেবে পায় না। লাইব্রেরির দিকে যায় প্রথমে কিন্তু লাইব্রেরির গেটে পৌছবার আগেই মনির দাঁড়িয়ে যায়। বলে, না থাক, লাইব্রেরিতে ঢুকবো না।

তাহলে কোথায় ? রঞ্জু মুখোমুখি তাকায়। বলে, ওয়ার্ডের দিকে যাবি ?

না, মনির রাজি হয় না। বলে, আজ অন্য কিছু করা যাক। সিনেমা দেখতে যাবি ?

কোন সিনেমা ? ঢাকার তৈরি ? রঞ্জু জিজ্ঞেস না করে পারে না।

কেন, দোষ কী ? মনির মুখোমুখি তাকায়। বলে, মোটা আর মুটী নায়ক-নায়িকাদের লাফালাফি দেখলে ভয় লাগে তোর ?

বাহ্, ভয় লাগবে না ? রঞ্জু হাসে। বলে, এক দৃশ্যে দেখেছিলাম গান গাইতে গাইতে নায়িকা চিৎ হয়ে থাকা নায়কের ওপর উপুড় হয়ে পড়েছে, কি বিশাল বুক, আর থাইগুলোও যা মোটা না, মনে হচ্ছিলো নায়ক বাবাজির দফা এবার রফা।

ওই পর্যন্ত বলে রঞ্জু হেসে উঠলে কী হবে, মনির কিন্তু গম্ভীর হয়ে যায়। বলে, অমন নায়িকাদের কিন্তু চাহিদা কমে না, সেটা জানিস তো ?

শুনেছি, ওদের বেজায় চাহিদা।

কিন্তু কেন ?

হাঁটতে হাঁটতে রঞ্জু মাথা নাড়ায়। বলে, উঁহু জানি না। বলতে পারবো না।

কারণটা বোঝা কঠিন কিছু না। হাসপাতালে তো দেখছিস বস্তির মেয়েরা আসে, রিকশাচালক, মুটে, মজুর, ঠ্যালাগাড়িঅলাদের মেয়ে বউরা কেমন হাড় চিমসে হয় দেখিস না!

রঞ্জু মাথা হেলায়। মোটা মোটা মেয়ে মানুষ বস্তিতে কি থাকে ? তার মনে হয় না। সে বলে, হ্যাঁ খুব রোগা হয় ওরা।

তো অমন হাড্ডিসর্বস্ব মেয়েছেলে যার ঘরে, সে যদি মোটাতাজা মেয়েছেলে কল্পনায় দেখতে চায়, তাহলে কি সেটা অস্বাভাবিক কিছু! আর সেজন্যেই মোটামুটী নায়ক-নায়িকাদের চাহিদা বেশি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

দু'জনে হাঁটতে হাঁটতে হাইকোর্টের গেট পর্যন্ত পৌছলে মনির রিকশা ডাকে। রিকশাঅলাকে বলে, নিউ বেলি রোড যাবে ?

রিকশাঅলা অল্পবয়সী। জিজ্ঞেস করে নেয়, নাটক দ্যাখতে যাইবেন ?

হ্যাঁ, তুমি চেনো ?

জ্বে।

মনির বন্ধুকে বলে, অনেক দিন নাটক দেখা হয় না। চল, আজ দেখে আসি।

আজ কার নাটক জানিস ?

রঞ্জুর প্রশ্নের জবাবে মনির ঠোঁট ওল্টায়। বলে, কী জানি, হবে হয়তো সেলিম আলদীনের, মামুনুর রশীদেরও হতে পারে, আবার আব্দুল্লাহ আল মামুন বা মমতাজউদ্দীনেরও হতে পারে।

ভালো লাগবে ? রঞ্জু ফের জিজ্ঞেস করে।

মনির হাসে। বলে, ভালো লাগা মন্দ লাগা আবার কী ? নাটক দেখা নিয়ে কথা।

রিকশায় চেপে যেতে যেতে রঞ্জুর মনের ভেতরে কেউ যেন বলে, কোথায় যাস রঞ্জু? কী এড়াবার জন্য তুই কোথায় যাস ?

সে মনের ভিতরে খোঁজে। সত্যি কি সে শাহনিকে মনের দিক থেকে এড়াতে পারছে না ? কবে কোন সময় কথাটা বলেছিলো শাহনি, হয়তো কথার কথা হিসাবে বলেছিলো, আর সেটা সে মনের ভিতরে এমন করে ধরে রেখেছিলো যে এখন আর এড়াতে পারছে না। কথাটা তো এই যে, পরীক্ষা শেষ হলেই সে দেরি করবে না, সোজা রঞ্জুদের বাড়িতে গিয়ে উঠবে। আজ পরীক্ষা শেষ হলো। ভাইভা শেষ করে সে প্যাসেজে কাউকে দেখে নি। প্যাসেজেও সে ডাইনেবায়ে তাকিয়ে ছিলো, কোন দিকেই কেউ ছিলো না। সিরিয়ালে তার নাম ছিলো সবার শেষে, সুতরাং অন্য কারুর থাকবার কথা নয়। তবু সে সামনে-পিছনে ডাইনে-বাঁয়ে তাকিয়ে দেখেছিলো। তাহলে তার নিজের অজান্তেই কি সে তখন শাহনিকেই খুঁজছিলো ?

পরে অবশ্য মনিরের মুখে শুনলো, পরীক্ষা শেষ হলে আরমানের সঙ্গে কোথায় যেন গেছে। আজ নাকি খুব হাসিখুশি ছিলো শাহনি।

থিয়েটার পাড়ায় যখন পৌছলো তখন সন্ধ্যা পার। তবু হলের গেটের কাছে, সামনের রাস্তায় ছেলেমেয়েদের ভিড়। মনির রিকশা থেকে নেমে সোজা টিকিট কাউন্টারের দিকে চলে গেলে রঞ্জু রিকশার ভাড়া মিটিয়ে দেয়ালে সাঁটানো পোস্টার দেখতে থাকে। আজ সেলিম আলদীনের নাটকই হচ্ছে। আগামী সপ্তাহে আরম্ভ হবে মামুনুর রশীদের নাটক। পোস্টারের কাছে দু'পা এগিয়ে যাচ্ছিলো, এই সময় ডাক শুনলো– রাজিব, শোনো।

রঞ্জু মুখ ফিরিয়ে দেখে আরমান।

কি ব্যাপার ? রঞ্জু হাসে। বলে, নাটক দেখতে ?

বলতে পারো। আরমান শান্ত আর স্থির গলায় জবাব দেয়। বলে, আজ আমরা দল বেঁধে অনেকেই এসেছি, নিশাত, শাহনি, নিভা, হুমায়ুন, কামাল ওরা সবাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ভিতরে। আমি টয়লেটে গিয়েছিলাম, বেরুবার মুখে মনিরকে দেখলাম, মনে হলো তুমিও আসতে পারো। তোমার পরীক্ষা নিশ্চয়ই ভালো হয়েছে?

রঞ্জু হাসে। বলে, হ্যাঁ হয়েছে একরকম আর কি? তোমার?

ভালো। আরমান খুব সংক্ষিপ্ত জবাব দেয়। তারপর বলে, আমি কি তোমার সঙ্গে একটা ব্যাপারে এখানে কথা বলবো?

তার মানে? রঞ্জু অবাক হয় আরমানের কথা বলার ভঙ্গি দেখে। জিজ্ঞেস না করে পারে না।

বলে, সিরিয়াস কিছু?

হ্যাঁ, সিরিয়াস বলতে পারো।

রঞ্জু ডাইনেবাঁয়ে তাকায়, তারপর বলে, এখানে? এই অবস্থায়?

হ্যাঁ, এখানেই। আরমানের গলা গম্ভীর আর স্থির শোনায়। তার চোখ রঞ্জুর মুখের ওপর।

রঞ্জু বলে, ঠিক আছে, খুব পারসোনাল যদি কিছু হয়, তাহলে শিগগির বলো, এক্ষুণি মনির এসে যাবে।

আমার বেশিক্ষণ লাগবে না, আরমান জানায়। বলে, শুধু এক কথায় আমার প্রশ্নের উত্তর দেবে, ইয়েস অর নো।

রঞ্জু অনুমান করে কী জানতে চাইছে আরমান! নিশ্চয়ই ও শাহনির সম্পর্কে কিছু জানতে চাইছে। সে মনে মনে তৈরি হয়। মুখোমুখি তাকিয়ে বলে, তাহলে বলে ফেলো, দেরি করছো কেন?

না দেরি নয় আর, আচ্ছা তুমি একটা সত্যি কথা বলো, শাহনিকে কি তোমার বিয়ে করার কথা? তোমাদের দু'জনের মধ্যে কি অমন কথা হয়েছিলো?

আরমানের চোখেমুখে কঠিন আর শক্ত একটা ভাব। দু'দিকের চোয়ালের পেশিতে খুব মিহি ঢেউ খেলে। রঞ্জু কী জবাব দেবে ভেবে পায় না, ভীষণ বিরক্তি লাগে তার। সে বলে, এসব কী বলছো তুমি? তুমি তো ভদ্রলোকের ছেলে।

আমি যারই ছেলে হই, আরমান খুব ধীর আর কঠিন স্বরে বলে, যা বলছি ঠিকই বলছি, তুমি কী বলবে, সেটা বলো।

রঞ্জু কিছু বলার আগেই ওই সময় দূর থেকে মনিরের গলা শোনা যায়, আরে আরমান তুমি? আরও হয়তো কিছু বলতো কিন্তু কাছাকাছি এসে দু'জনকে গম্ভীর মুখে সামনা-সামনি দাঁড়ানো দেখে কিছুটা অপ্রস্তুত বোধ করে। বলে, মনে হচ্ছে, তোমরা কোনো গোপন কথা বলছো?

না, গোপন না। রঞ্জু জানায়। বলে, তুমি একটু সরে দাঁড়াও, আরমানের সঙ্গে আমার কিছু পারসোনাল কথা হচ্ছে।

ওকে ওকে, মনির দু'হাত তুলে আশ্বস্ত করতে করতে আর পিছন দিকে সরতে সরতে বলে, আমি দূরেই থাকছি, কিন্তু শোনো, টিকিট পাওয়া যায় নি।

আরমান তখনও চোখে চোখে তাকিয়ে রয়েছে। সে ফের বলে, তুমি কিন্তু আমার প্রশ্নের জবাব দাও নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

দেখো, রঞ্জু বুঝিয়ে বলার মতো করে বলে, কবে কোন কথা হয়েছে, আর কী শুনেছো তুমি কার কাছে, সেসব কথা নিয়ে–।

নো, নো, ডোন্ট ট্রাই টু এ্যাভয়েড, আরমান বাধা দিয়ে বলে ওঠে। বলে, আনসার স্ট্রেইট, ইয়েস অর নো। ওর গলার স্বর ভয়ানক টানটান শোনায় ওই মুহূর্তে।

এদিকে রঞ্জুরও সহ্য হয় না। তারও দু'চোখে জেদ আরও ঝলসে ওঠে। বলে, ঠিক আছে, তাহলে আমার কিছুই বলার নেই। তোমার প্রশ্নের কোনো জবাব নেই আমার কাছে, ডু হোয়াট এভার ইউ লাইক, ওকে?

আরমান দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরে। তারপর চাপা গলায় হিস হিস করে ওঠে। বলে, কাওয়ার্ড, ইউ আর এ রিয়েল কাওয়ার্ড।

রঞ্জু ওকে ধরার জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলো, মনির লাফিয়ে পড়ে ওকে থামায়। ওদিকে আরমান ততক্ষণ হলের ভেতরে।

দু'বন্ধুতে তারপর কথা হয় না বেশ কিছুক্ষণ। রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দু'বন্ধুতে দু'বোতল কোক খায়। তারপর খুব হালকা ভঙ্গিতে দু'জনে ফুটপাথ ধরে হাঁটে। ওই সময় মনির জিজ্ঞেস করে, আরমান হঠাৎ বুনো শুয়োরের মতো ক্ষেপে উঠলো কেন? শাহনির কাছ থেকে কি ছ্যাঁয়েছে?

কে জানে? রঞ্জু হালকা ভঙ্গিতে জানায়। বলে, তবে মনে হলো, ওরা বোধহয় খুব শিগগির বিয়ে করতে যাচ্ছে।

মনির বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে জানতে চায়, তোর কি তাতে আপত্তি আছে?

নাহ্, আমার কেন আপত্তি থাকবে? আমাদের দু'জন ক্লাসফ্রেণ্ড বিয়ে করবে, সংসার পাতবে, এ কি কম আনন্দের কথা! আমি তো বলি গড ব্লেস দেম, এ্যান্ড লেট দেম লিভ টুগেদার হ্যাপিলি এভার আফটার।

বীথির বেশ মুশকিল হয় আজকাল। সকাল দশটার মধ্যে বেরিয়ে পড়তে হয়। ফেরে সেই তিনটে বাজার পরে। সংসার পুরো গুছিয়ে আসতে পারে না একেক দিন। মোমেনার মায়ের সঙ্গে রান্নাঘরের কাজে নিজেও হাত লাগায়, তবু। সকালে নাস্তার পাট চুকতে না চুকতেই দুপুরের ব্যবস্থা করে ফেলতে হয়। ওদিকে সবার আগে বেরিয়ে যায় মঞ্জু, কী খায় না খায় বীথি নজর দিতে পারে না। তারপর ওদের আব্বা কখন খায়, খেয়ে বেরিয়ে যায়, একেক দিন টেরও পাওয়া যায় না। তারপর দরজা বন্ধ করে। তালা লাগিয়ে ছোট ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে রিকশায় ওঠে বীথি। মাঝপথে সে নেমে যায়। টুকু রিকশা নিয়ে যায় একেবারে স্কুল পর্যন্ত। যাওয়ার সময় তবু এক সঙ্গে যেতে পারে। কিন্তু ফেরাটা এক সঙ্গে কোনোদিনই হয় না। কারণ টুকুর ছুটি হতে হতে একেক দিন পাঁচটা বেজে যায়।

রায়হান যেন আজকাল বেশি চুপচাপ হয়ে গেছে। বীথি লক্ষ্য করে। কিন্তু কারণ আন্দাজ করতে পারে না। সে দেখে, মানুষটা রাতে ফিরে একেক দিন খায় না। দুপুরে বাসায় ফেরে কিনা তাও মাঝে মাঝে বোঝা যায় না। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারটাও আজকাল তার নজরের বাইরে চলে গেছে। যদি বাইরে খেয়ে আসে, তাহলে সেটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

তার জানবার কোনো উপায়ই নেই। তবে যেদিন বাসায় ফিরে ভাত বেড়ে নিয়ে খায়, সেদিন তার চিহ্ন থাকে এঁটো থালায়। কিন্তু কী খেয়েছে, কতখানি খেয়েছে তা বোঝা যায় না। নিরামিষের বাটিতে রাখা চামচ থাকলে বোঝা যায় নিরামিষ খেয়েছে, কিন্তু ঐ চামচ দিয়েই মাছমাংস তোলা হয়েছিলো কি না, তা কীভাবে বুঝবে! একেক দিন চোখে পড়ে, ইস্ত্রি করা জামা-কাপড় বের করে বিছানায় রাখা হলেও সেগুলো গায়ে দেয়া হয়নি। যেমন দেখে গিয়েছিলো সেই রকমই আছে। তার মানে দু'তিন দিনের ব্যবহার করা জামা-কাপড় পরে চলেছে।

আজকাল কথাও কম বলছে মানুষটা। স্ত্রীর সঙ্গে তো বলেই না। প্রশ্ন করলে হুঁ হাঁ করে জবাব দিয়ে খালাস, ছেলেদের সঙ্গেও কথা বলতে দেখা যায় না।

একেক দিন চিন্তা হয় বীথির, তার এই ভাবেই কি জীবন চলবে? কিন্তু অন্য আর কোন ভাবে জীবন চলবে, তাও সে ভেবে উঠতে পারে না। ওদিকে দুই ছেলের দিকে লক্ষ্য করলে ও দেখে, ওরা দু'জনেই যেন নিজেদের গুটিয়ে নিয়েছে। ওদের কথাবার্তাও শুনতে পায় না। ওদিকে বড় ছেলেও বাসায় আসা কমিয়ে দিয়েছে, ওর নাকি পরীক্ষা চলছে। আগে টুকুর বন্ধুদের বাসায় আসতে দেখতো, আজকাল ওরাও আসে না। একাকী বাসায় ফেরার সময় কোনো কোনোদিন তার মনের ভিতরে কেউ যেন জিজ্ঞেস করে, বীথি তুই কোথায় যাস? যেখানে তুই থাকিস, সেটা কি তোর বাসা? সেখানে আসলেই কি তোর সংসার আছে? যদি থাকে, তাহলে সেটা তোর কেমন সংসার?

নিজের মনের ভিতরকার প্রশ্নের জবাব সে খুঁজে পায় না।

ওই রকম বিকেলে বাসায় ফেরার সময় দেখে, বাহারুল্লাহ মুনশি বাসার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। সে গেট খুলতে গেলে মুনশি এগিয়ে আসে। মুখোমুখি তাকিয়ে হাসে। বলে, আপা বাসার গেটে তালা দেইখ্যা বড় চিন্তায় পইড়া গেছিলাম, হ্যাষে লণ্ডিঅলারে জিগাইলাম, হ্যার কাছে শুনলাম আপনেরা কোথাও যান নাই। তারপর আপনেগো কামের বেটির লগে দ্যাহা হইল, হ্যায় কইল, আপনে নাকি চারকি লইছেন।

দরজা খুলে বসার ঘরে মুনশিকে বসতে বলে সে নিজেও বসে।

মুনশি ফের বলে, দুইপরে আইছি, স্যারের অফিস গিয়া হুনি বাইরাইয়া গেছে, কহন আসে ঠিক নাই, কী আর করি, বাসায় আইয়া পড়লাম, স্যারের লগে দ্যাহা হওনটা খুব দরকার আপা, বুঝলেন? বহুত চিন্তার কথা, খবর পাইয়াই আমি ছুইট্টা আইছি, বুজলেন?

খবরটা জানবার জন্য বীথি মুনশির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। তখন মুনশি বয়ান শুরু করে। বলে, আপনেরা যার লগে জমিন কিনছেন, হ্যারা তাগো জমিন বেইচ্যা দিছে, আপনেগো কেউ খবর দিছে? সাদেক সাবের তো উচিত আছিল খবরটা দেয়ার। দ্যাহেন কেমুন স্বার্থপর হয় মানুষ, আমি খবর পাইয়া দ্যাখতে গেলাম, গিয়া দেহি ঘটনা সইত্য, রাজমিস্ত্রি পাকা ওয়াল দিতেছে। জিগাইলাম তো কইল, ঐ জমিন কুন এক খান সাবে কিইন্যা লইছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বীথি ঠিক বুঝতে পারে না প্রথম দিকে। জিজ্ঞেস করে, আপনি কার জমির কথা বলছেন ? সাদেক সাহেবের জমি উনি বেচে দিয়েছেন ?

হ আপা, যারা কিনছে, হ্যারা পাকা ওয়াল দিতাছে, অহন আপনেরাও কিছু করেন, আপনেগো জমিনের উপ্রে, নাইলে কিন্তু বিপদ হইয়া যাইবো।

মুনশি হুঁশিয়ারিটা জোর দিয়ে জানালে কী হবে, বীথি বুঝে উঠতে পারে না কোন বিপদের কথা বলছে মুনশি। বরং ভাবতে ভালো লাগে যে ফুলবাড়িয়ায় যদি কখনও তারা বসবাস করতে যায়, তাহলে অন্তত আর যাই হোক মেরির মতো মেয়ে মানুষের মুখোমুখি হতে হবে না।

সে মুনশিকে যেতে দেয় না। চা-টা খাইয়ে বলে, আপনি বিশ্রাম করুন। সাহেবের সঙ্গে দেখা না করে যাবেন না। জমিজমার আমি কী বুঝি ? যা বলার সাহেবকেই বলবেন। ঘণ্টাখানেক পর টুকু স্কুল থেকে ফিরলে তাকে দিয়ে রায়হানের অফিসে ফোন করায়।

ওদিক থেকে জবাব আসে রায়হান সাহেব সকালেই অফিস থেকে বেরিয়ে গেছেন। কোথায় গেছেন, বলে যান নি।

তাহলে ? বীথির চিন্তা হয়। লোকটাকে কতক্ষণ বসিয়ে রাখবে ? যদি বেশি রাত হয়, তখন মানুষটাকে কীভাবে বলবে, এবার তুমি বাড়ি যাও।

দেখতে দেখতে সন্ধ্যা যায় যায়। মঞ্জুও একসময় বাসায় ফেরে। কিন্তু রায়হানের খবর নেই। মঞ্জুকে মুনশি ফুলবাড়িয়ার জামির পাশে যে পাকা দেওয়াল ওঠানো হচ্ছে, সেই খবরটা জানায়। কিন্তু তাকে আগ্রহী হতে দেখে না বীথি। রাত আটটা বাজলে মুনশি আর বসতে চায় না। বলে, না আপা, আর ক্যাম্নে দেরি করি, আরও দেরি হইলে তো বাস পামু না।

আপনে সায়েবরে বুজাইয়া কইলেই তো হয়– আপনে বুজাইয়া কইবেন, আমি পরশু/তরশু আইয়া পড়মু।

মুনশি অস্থির হতে আরম্ভ করলে ফের অফিসে ফোন করা হয়। এবার ফোন করে রঞ্জু। কিন্তু ওদিক থেকে সেই একই খবর, রায়হান স্যার অফিসে নেই, কাজ শেষ করে দশটার পর বের হয়ে গেছেন, তারপরে আর অফিসে আসেন নি।

বীথির চিন্তা হয় এবার। মানুষটা কোথায় যাবে সকাল বেলা ? যাবে তো যাবে। একেবারেই যাবে! কাউকে একটা খবর পর্যন্ত দিয়ে যাবে না ?

ছটফট করতে করতে একসময় আর পারলো না মুনশি। রওনা হয়ে গেলো বাড়িমুখো। রায়হান এলো তারও ঘণ্টাখানেক পরে, তখন রাত প্রায় সাড়ে দশটা। বীথি ছেলেদেরকে মুনশি কী বলে গেছে, তা জানাতে বললে দু'ছেলেই সাদেক সাহেবের জমি বিক্রি করে দেয়া, নতুন মালিকের পাঁচির তোলা এ দুটো খবর তো বলেই– এমনকি ওপরে ঘরটর না তুললে জমিখানা যে বেদখল হয়ে যেতে পারে, মুনশির সেই আশঙ্কার কথাও ঠিক ঠিক মতো বাবাকে বলে দেয়।

রায়হান শোনে শুধু, কিছু বলে না। কী বলবে ? ফুলবাড়িয়ার ওই জায়গায় শক্তপোক্ত ঘর তোলার টাকা সে এখন কোথায় পাবে ? আর ছোটাছুটি দৌড়ঝাপের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

কাজগুলোইবা করবে কে ? জমিটার ব্যাপারে মুনশির পরামর্শ কী হতে পারে, সেটা তার ভালো রকম জানা। কিন্তু এখন তার না আছে পয়সা কড়ি না আছে শরীরের সামর্থ্য। কারণ অল্প কিছুদিন আগে ও দুটোই সে হাসপাতালে দিয়ে এসেছে। হাজার পনেরো টাকা বাড়তি থাকলে মুনশির পরামর্শ মতো দু'বাঁধ টিন দিয়ে দু'খানা মুলী বাঁশের চালাঘর সে তুলে ফেলতে পারতো। কিন্তু এখন ওই টাকা সে পায়টা কোথায়? আর দৈহিক পরিশ্রম বেশি করলে ফের যদি এনজাইনার ব্যথাটা বাড়তে শুরু করে, তাহলে তো আবার হাসপাতালে এবং আবার এককাঁড়ি টাকার শ্রাদ্ধ।

সে ছেলের কাছে শুধু বলে, তোমার মা তো ছিলেন, উনি কিছু বললেন না কেন ?

বীথি তখন গলা চড়ায়। বলে, টুকু বল তোর বাবাকে, মুনশিকে যেন জানিয়ে দেন যে, আমরা ওখানে টিনের ছাপড়া ঘর তুলতে চাই, মুনশি যেন ব্যবস্থা করে আর আমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে যায়।

রায়হানও গলার স্বর উঁচিয়ে ছেলেকে বলে, শুধু ঘর তুললে কি আর হবে ? ওই ঘর পাহারা দিয়ে রাখবার জন্য ওখানে গিয়ে বসবাস করতে হবে না ? অমন বাঁশের খুঁটি দেওয়া মাচাং-এর ওপর তোলা টিনের চালা ঘরে থাকতে পারবি ?

সে-রাতে ওই পর্যন্ত কথা হয়। কারণ রাত বেশি হয়ে যাচ্ছিলো। তবে সবাই ঘুমিয়ে পড়লেও রায়হানের দু'চোখে ঘুম আসতে দেরি হয়। তার মগজে নতুন এক দুশ্চিন্তা খোঁচাতে আরম্ভ করে। সাদেক সাহেবকে সেদিন শহীদুল্লাহ হারুন সাহেবের পার্টিতে যে দরজা বন্ধ করে উঠতি ধনীদের সঙ্গে মিটিং করতে দেখলো, তারই ফল কি ভদ্রলোকের এই জমি বিক্রি ? এই জমি বিক্রির টাকা কি কোনো ইন্ডাস্ট্রিতে লাগাবে? কথাটা তার মনে হয় বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে এ প্রশ্নও মনে জাগে যে, ওই তিন/চার লাখ টাকা দিয়ে কি ইন্ডাস্ট্রি হয় আজকাল ? তো ওই প্রশ্নের উত্তরও সে আবার খুঁজে পায় যে, তিন/চার লাখ টাকা দিয়ে হয় না বলেই তো অমন দরজা বন্ধ করে মিটিং করতে হয়। দু'জন এক সঙ্গে হলে আট লাখ, ব্যাংক ধার দেবে চার ভাগের তিন ভাগ। তো কতো দাঁড়ালো ? তারপর মেশিনারিজ দিচ্ছে বিদেশী পার্টনার। র-মেটেরিয়ালও তাদের, তাহলে ?

রায়হানের মনে হয় অনুমানটা তার ভুল নয়। সাদেক আসলেই ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট হতে যাচ্ছে। তা না হয় হলো, রায়হান নিজেকে জিজ্ঞেস করে। কিন্তু এক সঙ্গে যে জমি কেনা হয়েছিলো, সেই বাকি জমির কী হবে ? ওই বাকি জমির কল্যাণে আমিও কি ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট হতে পারবো ? নিজের দিকে তাকিয়ে সে হাসে। আর বলে, কেমন লাগবে হে তোমাকে, রায়হান আলী ? তুমি তো সাংবাদিক, নাকি ইন্ডাস্ট্রিয়লিস্ট ? কোন পেশা তোমার পছন্দ ?

পরের দিন হারুন যা জানায়, তাতে সে বুঝে নেয় যে, তার অনুমানে গতরাতে যা যা মনে হয়েছিলো– সবই ঠিক। চার লাখ টাকাতেই জমিটা বিক্রি হয়েছে। কিনেছে টাঙ্গাইল জেলার ইউনিয়ন কাউন্সিলের এক চেয়ারম্যান। এদিকে সাদেকুজ্জামান আর আখতার মোল্লা নামে গাবতলী হাটের এক গরুর ব্যাপারী এক সঙ্গে মিলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

পাটনারশিপে এক কম্পানির নাম রেজিস্ট্রি করিয়ে নিয়েছে। তাদের ব্যাংক হচ্ছে ইস্টার্ন প্রগ্রেসিভ আর পদ্মা প্রাইম– দুটোই নতুন। এখন শুধু বিদেশী কে এসে জুটবে তারই অপেক্ষা– হংকংওয়ালা না সিঙ্গাপুরওয়ালা।

পরের দিনই রায়হান ফুলবাড়িয়া যায়। গিয়ে দেখে, সত্যি সত্যি পাশের জমি ঘিরে পাঁচিল তোলার কাজ চলছে, তিন দিকের কাজ প্রায় শেষ, শুধু রায়হানের জমির সীমানার পাঁচিলটা পুরো বাকি। পাশের জমির নতুন মালিককেও দেখলো। ভদ্রলোক বেশ লম্বাচওড়া মানুষ। পরণে স্যুট-টাই, অদূরে গাড়িও দাঁড়ানো, দু'তিনজন লোকের সঙ্গে খুব গুরুতর বিষয় নিয়ে আলোচনা করছেন বল মনে হলো। ওদেরকে ওভাবে অলাপ করতে দেখেই সম্ভবত মুনশি বললো, স্যার আমরা এই দিক বাড়াই, উদিক যাওয়ার কী দরকার?

রায়হানের একটু খটকা লাগে। বলে, কেন মুনশি, অসুবিধা কী। নতুন পড়শি হয়েছেন, যাই একটু আলাপ করি।

অহন না স্যার, ওই যে দ্যাহেন, টাক মাথা মানুষটা, ওই-টা জব্বর শয়তান, হ্যারই নাম সাতু আমিন। এই এলাকার জমিজমা লইয়া যতো ভেজালের মামলা সব হ্যার কাম। হিন্দু গো দলিল পরচা আর নকশা কতো যে আছে হ্যার কাছে, তার শুমার নাই।

রায়হানের মনে পড়ে আরও একবার এই লোকের কথাই বলেছিল মুনশি। সে নাকি অফিসে অফিসে ঘুরে পুরনো রেকর্ড ঘেঁটে খুঁজে বার করে কোন হিন্দুর জমি কে দখল করে আছে? তারপর ঐ জমি নিয়ে এমন ঝামেলা বাধায় যে জমির মালিকের টাকাপয়সা দিয়ে আপোস করা ছাড়া আর উপায় থাকে না। রায়হান দূর থেকে হলেও লোকটাকে নজর করে দেখে। হাতে কিছু কাগজপত্র আর একটা ফাইলের মতো জিনিস। পরনে ছাই রঙের ট্রাউজার্স আর ওপরে হাওয়াই– পায়ে চপ্পল আর চোখ চশমা, রং তো বেশ ফর্সা। দেখলে চেহারায় পোশাকে-আশাকে ভাবে-ভঙ্গিতে রীতিমতো ভদ্রলোক মনে হয়। রায়হান মন্তব্যটা করেও। বলে, লোকটার চেহারা দেখে তো ভদ্রলোকই মনে হয় মুনশি।

মুনশি হতাশ স্বরে বলে, স্যার আপনে যে কী না– আরে ওইটাই তো এক নম্বরের শয়তান আর লাফেঙ্গা– ফল্‌স দলিল, ফল্‌স পরচা, ফল্‌স নাম খারিজের রশিদ, সব আপনি হ্যার কাছে পাইবেন– আমার তো সন্দেহ হইতেছে স্যার, নতুন যে জমিন কিনছে, হ্যার ক্ষতি না করে শয়তানটা– সাতু আমিন এম্নে এম্নে আইছে, এমুন স্যার মনে হয় না; শয়তানি কুনো মতলব না থাকলে তো হ্যার আওনের কথা না।

একই জায়গায় দাঁড়িয়ে একখানা টিনের চালাঘর তোলার একটা হিসেব রায়হান নেয়। তারপর মুনশিকে দু'দিন পরে বাসায় দেখা করার কথা বলে ফেরার পথে রওনা হচ্ছিলো। ওই সময় পেছন থেকে ডাক। অগত্যা দাঁড়াতে হয়, নতুন প্রতিবেশী ভদ্রলোক, কীভাবে সে উপেক্ষা করে? কাছে এসে হাত বাড়িয়ে দেয় লোকটা প্রথমে, তারপর রায়হানের পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে আলাপ শুরু করে ফেলে, আমার নাম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

হায়দার, আমি টাঙ্গাইলের মানুষ আপনের নাম আমি শুনছি, আপনে সাংবাদিক, নামী লোক, ভাবলাম আমরা তো এখন পড়শি হইতেছি– যাই একটু আলাপ করি।

রায়হান কোনো কথা বলার সুযোগ পায় না। যা বলার হায়দার মিয়াই বলে যায়, শুধু মাঝে মাঝে তাকে হাসতে হয় একটু।

এ কথা সে কথার পর হায়দার আলী হঠাৎ জিজ্ঞেস করে, আপনে সত্য সত্যই ওই জমিনে বাড়ি করবেন ?

তার মানে ? রায়হান রীতিমত দাঁড়িয়ে যায়।

মানে কিছু না, হায়দার আলী মুখোমুখি তাকিয়ে হাসে। বলে, আমার বিশ্বাস হয় না– এট্টু চেষ্টা করলেই ডিআইটি'র প্লট নিতে পারেন আপনেরা– খামাখামা ক্যান এই জঙ্গলের ভিতরে বাড়ি করবেন।

রায়হান রাগে না, বিরক্তিও প্রকাশ করে না। হাসি মুখে বলে, আমি এখানেই বাড়ি করবো, জায়গাটা আমার খুব পছন্দ।

হ্যাঁ, আপনের কথা ঠিক। হায়দার মাথা দোলায়। বলে, জায়গাটা খুবই ভালো কিন্তুক মানুষ গিনি ? মানুষ গিনি তো সুবিধার না– চোর চোট্টা গুণ্ডা বদমাইশ, চারোদিক ঘুইরা বেড়ায়। আমার তো মনে হয় না যে, এইখানে ছেলে মেয়ে নিয়া বসবাস করা যাইবো। বাসস্ট্যান্ডের কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়ে পড়ে হায়দার আলী। বলে, আপনেরে একটা কথা কই ভাইসাব, বাড়িঘর যা করার জলদি জলদি কইরা ফালান। এই জায়গার মানুষ গিনি আমার ভালো ঠ্যাকে না, বুঝলেন ?

লোকটা চলে গেলে তার গমন পথের দিকে রায়হান অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে। তার চিন্তা হয়। লোকটা প্রথম আলাপ করতে এসে অমন কথা কেন বললো ?

মুনশি পিছিয়ে পড়েছিলো। সে কাছে এসে জানতে চাইলো। বললো, কী কইলো স্যার আপনেগো টাঙ্গাইলের চেয়ারম্যান ?

রায়হান হাসতে হাসতে বলে নতুন কিছু না, আপনি যা বলছেন, সেই কথাই বললেন, জায়গাটার ওপরে কিছু তোলা উচিত– আরও বললেন, আপনারা খারাপ লোক, আপনাদের বিশ্বাস করা যায় না– চারদিকে চোরচোট্টা আর বদমাইশে ভর্তি।

মুনশি হাসে না। বলে, তারে আপনে কী কইলেন ?

বাহ, আমি আর কী বলবো, রায়হানের হাসি পায় ঐ মুহূর্তে। তবু বলে, আমাকে কথা বলার সুযোগ দিলে তো আমি কথা বলবো।

আপনের কী মনে হয় ? ফের মুনশি জানতে চায়। বলে, ক্যান আপনেরে কইল ওই সব কথা ?

কে জানে! রায়হান ঠোঁট উল্টে তাচ্ছিল্যের ভাব দেখায়। মুনশি তখন বলে, দুইদিন পর না স্যার, আপনে কাইলই টাকা রেডি রাইখ্যেন আমি কাইলই আইতেছি।

পরের দিন সত্যি সত্যিই মুনশি এসে হাজির। তার কাছে খবর শুনে বীথি একজোড়া মোটা সোনার বালা মুনশির হাতে এনে দেয়। তারপর জিজ্ঞেস করে, বালা দু'খানা বেচলে যা পাওয়া যাবে তাতে খরচ কুলাবে না ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বিবি সায়েবের কাণ্ড দেখে একেবারে বেকুব বনে যায় মুনশি। রায়হান কাছাকাছি ছিলো না, সে এসে দেখে ওই অদ্ভুত কাণ্ড। মুনশির বিপন্ন চোখমুখ দেখে প্রথমে তার হাসি পায়। তারপর বীথিকে বলে, ওটা এখন রেখে দাও। মাসের শেষ, দেখি দু'দিন আগে বেতনটা নেওয়া যায় কি না।

বীথি তারপরও গয়না দু'খানা ফেরত নেওয়ার জন্য হাত বাড়াচ্ছে না দেখে রায়হান ফের বলে, এখন তো দরকার হচ্ছে না, যখন দরকার হবে তখন দিও।

এবার কাজ হয়। বীথি বালাজোড়া হাতে নিয়ে ভেতরে রাখতে গেলে রায়হান বলে, মুনশি আপনি নিচে গিয়ে রিকশা ধরেন, আমি আসছি।

অফিস থেকে সহজেই টাকাটা তুলতে পারে রায়হান। হাজার দুয়েক নিজের কাছে রেখে সে বাকিটা মুনশির হাতে তুলে দেয়। এই আপাতত দিলাম, যে ভাবে হোক ঘরখানা তুলে ফেলবেন। এবং কথা রাখে মুনশি। দু'দিন পর রায়হান গিয়ে দেখতে পায়, বাঁশের খুঁটির ওপর মাচার মতো, তার ওপরে বেড়া এবং ছাউনিটা টিনের। ভেতরে ঢুকে দেখে রায়হান এবং খুশি হয়। বলে, ঘর তো হলো, কিন্তু থাকবে কে?

তারও ব্যবস্থা করছি স্যার, বলে সে চালাঘর থেকে বেরিয়ে রাস্তার দিকে মুখ করে। গলা উঁচিয়ে জয়ধর, ও জয়ধর বলে কিছুক্ষণ ডাকাডাকি করে।

খানিক পরে দেখা যায় ধুতি আর নিমা পরা একজন মাঝবয়সী লোক মাথায় গামছা প্যাঁচাতে প্যাঁচাতে এগিয়ে আসছে।

মুনশি পরিচয় দেয়। বলে, জাতেই স্যার এরা ঋষি, বুঝেন তো ঋষি কারে কয়?

রায়হান হাসে। বলে, মুচিদের বলা হয়, তাই না?

হ তাগোরেই আমরা ঋষি কই– এই লোক ঋষির কামই করে– তয় ছিঁড়া জুতা সিলি করে না। শহর থিকা অর্ডার আর মালসামান আনে। তারপর নিজ হাতে জুতা বানাইয়া সাপ্লাই দেয়, আপনে নিজে আলাপ কইরা দ্যাহেন।

বাড়ি কোথায়? সেটা খোঁজ নিয়েছেন? রায়হান জিজ্ঞেস না করে পারে না।

সেইটা আপনেরে চিন্তা করতে হইবো না। আমার চিনা মানুষ, বাড়ি ক্যান, হ্যার চৌদ্দগুষ্ঠিরে আমি চিনি। নয়ারহাটের ব্রিজের উত্তরে যে গেরামখান দ্যাহা যায়, সেই গেরাম। নাম শিমইল।

জয়ধর এসে সামনে দাঁড়ালে– তাকে বহুকাল ধরে লাঙ্গল চষা দুর্বল বলদের মতো দেখতে লাগে। রায়হান জিজ্ঞেস করে, তুমি এখানে একলা থাকবে?

জে, আমি আর আমার ভাই হলধর।

রায়হান এ জবাব শোনার পর করার মতো মতো আর প্রশ্ন খুঁজে পায় না।

মুনশি জয়ধরকে বলে, তুমি এইবার কও ভাড়া ঠারা কী দিবা?

জয়ধর লাজুক মুখে হাসে। বলে, আমার কি ভাড়া দেওনের খ্যামতা আছে স্যার। ধরেন, আমি পঞ্চাশ ট্যাহা সেলামী দিমু আর কি।

আরে এইডা তুমি কী কও? সেলামী কারে কয় জানো? পেরতেক মাসে দিবা তো?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

হ, জয়ধর মাথা হেলিয়ে একবার মুনশির একবার রায়হানের মুখের দিকে তাকায়।

ঠিক আছে। আর পঁচিশ ট্যাহা বাড়াইয়া দিবা, বুঝলা?

জয়ধর, ফের মাথা হেলায়। বলে, জে, আইচ্ছা।

রায়হান তার কথার ধরন দেখে হেসে ওঠে। বলে, থাক, তোমাকে পঁচাত্তর টাকা দিতে হবে না– ওই পঞ্চাশ টাকাই দিও। প্রত্যেক মাসে তুমি মুনশিকে পঞ্চাশ টাকা দিয়ে দিও, আমাকে কিছু দিতে হবে না। বুঝেছো?

ওই কথা শুনে জয়ধরের মুখে হাসি ফোটে। মুনশি বলে, একখান রশিদ বহি কিনা লাগে স্যার– ভাড়া যা-ই দিক, সে যে আপনেরে ভাড়া দিতাছে– আপনি যে মালিক– তার প্রমাণ ওই রশিদ। আর, সই হোক, টিপসই হোক, রশিদে লইয়া থুমু, আপনি চিন্তা কইরেন না।

সেদিন ফেরার সময় রায়হান অনেকবার ঘুরে ঘুরে পেছনে তাকিয়ে দেখেছে। তাহলে সত্যি সত্যি একটা ঠাঁই তার খাড়া হচ্ছে। ওই চালা ঘরখানাকেই সে একেকবার একটা একতলা বাড়ি হয়ে যেতে দেখে।

শহরের দিকে ফিরতে ফিরতে মনে মনে হিসেবও করছিলো। আসলে এক হাজার স্কয়ার ফুটের একতলা বাড়িতে কতো খরচ হতে পারে। দোতলা সে করবে না, কারণ তাতে লাভ নেই। শহর থেকে এতো দূরে কেউ বাড়ি ভাড়া নিতে আসবে না। একতলা পর্যন্ত খরচটাই সে ঘুরে ফিরে হিসেব করে। বছর দুয়েক আগের একটা হিসেব জানা ছিলো। তাতে এক হাজার স্কয়ার ফুটের দোতালা বাড়ির খরচ দেখানো হয়েছিলো সাত লাখ টাকা। সেই হিসেবে একতলা পর্যন্ত করতে খরচ হতে পারে লাখ চারেক কি তার কিছু বেশি। যদি হাউজ বিল্ডিং থেকে লোন নিতে পারে তাহলে পুরো ব্যাপারটা খুবই সহজ হয়ে যায়। কেননা লোন শোধের ব্যাপারটা সমস্যা নয়। কারণ যে টাকা সে এখন বাড়ি ভাড়া দেয়, লোনের মাসিক কিস্তি তার চাইতে কম বই বেশি হবে না। এখন ভিত পর্যন্ত তৈরি করাটাই সমস্যা। কেননা ওটা, অর্থাৎ ইনিশিয়াল ইনভেস্টমেন্ট না থাকলে হাউজ বিল্ডিং লোন দেয় না। তার মানে এক/দেড় লাখ টাকা জোগাড় করতে পারলেই সে বাড়ি তৈরির কাজে হাত দিতে পারে। এখন এই গোড়ার সমস্যাটাই তাকে প্রথমে মেটাতে হবে। অর্থাৎ টাকাটা তাকে জোগাড় করতে হবে। কিন্তু টাকাটা সে পাবে কোথায়? অফিস থেকে সে পেলেও পাবে খুবই সামান্য। কারণ প্রভিডেন্ট ফান্ডের পুরো টাকাটাই সে জমি কেনার সময় তুলে নিয়েছে। আর এক বছরের এ্যাডভান্সও নিয়েছে। খুব জোর যদি পায়, তো মাস ছয়েকের এ্যাডভান্স পাবে, কিন্তু তারপর বাকিটা? সেও তো সত্তর/আশি হাজার। সেটা তাকে কে দেবে? বাসায় পৌঁছতে পৌঁছতে তিনবার সে হিসেব করে আর বীথির গয়নাগুলোকে ঝলমল করে উঠতে দেখে মনের ভেতরে। আর তখনই ধিক্কার দেয় নিজেকে, ছি রায়হান। ছি!

বাসায় পৌঁছায় একেবারে শেষ বিকেলে। দেখে, গেটের সামনে রঞ্জু রিকশা থেকে মালপত্র নামাচ্ছে। তার মনে পড়ে রঞ্জুর পরীক্ষা শেষ। কিন্তু তাই বলে হোস্টেল থেকে কেন চলে আসবে? সে জিজ্ঞেস করে, কী ব্যাপার রঞ্জু? এসব কী?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

রিকশাঅলাকে ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে রঞ্জু বাবার দিকে এগিয়ে যায়। বলে হোস্টেল থেকে চলে এলাম।

কেন ?

রঞ্জু রাস্তার ওপরই ঝুঁকে পড়ে বাপের পা ছুঁয়ে সালাম করে।

আরে কী হয়েছে! এখানে কেন ? বাসার ভেতরে চলো।

আব্বা, আমি পাস করেছি।

রায়হান ছেলেকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে ওঠে, বীথি, বীথি-ই, বীথি-ই-ই।

তারপর নিজেই ব্যাগ বিছানা টানাটানি শুরু করে দেয়।

একটু আগে বীথি ইস্কুল থেকে ফিরেছে। অমন চিৎকার শুনে সেও দোতলা থেকে ছুটতে ছুটতে নেমে আসে। তার পেছনে পেছনে আসে টুকু। রায়হান তখন ছেলেকে আর একবার বুকে জড়িয়ে ধরে বলে, তোমার রঞ্জু পাস। তোমার রঞ্জু ডাক্তার হয়ে গেছে শুনছো, আমাদের রঞ্জু এখন ডাক্তার।

পায়ের কাছে রঞ্জু ঝুঁকে পড়লে বীথিও নিজেকে সামলাতে পারে না। ছেলের মাথা বুকে টেনে নিয়ে পাগলের মতো কপালে গালে চুমু খেতে থাকে। মায়ের আবেগের উচ্ছ্বাসটা কিছু কমলে রঞ্জু এক হাতে মায়ের গলা আর অন্য হাতে বাপের গলা জড়িয়ে ধরে নিজেকে দু'জনের সঙ্গে মিশিয়ে রাখে কয়েক মুহূর্ত। তারপর গলা জড়াজড়ি করে তিনজন একসঙ্গে বাসায় ঢোকে। ওদিকে টুকু একটা একটা করে ব্যাগ বিছানা সুটকেস ভেতরে নিয়ে যায়।

বীথির যে কী হয়। সে নিজেই বুঝতে পারে না। টুকুকে কাগজ কলম আনতে বলে। কাগজ কলম নিয়ে এলে বলে, যা যা বলি লেখ। তখন সে পোলাও'র চাল, মুরগির মাংস, নানান ধরনের মশলা সব একটা করে বলে। আর টুকু লেখে। লেখা শেষ হলে ফর্দটা দেখে নিয়ে বলে, যা এটা নিয়ে তোর আব্বাকে দে, বল এক্ষুণি যেন বাজারে যায়। তুই কিন্তু সঙ্গে যাবি। আজ আমরা মুরগা মোসাল্লাম খাবো।

টুকু ফর্দটা নিয়ে বাপের হাতে দিয়ে মায়ের হুকুমের কথা বললে, রায়হানেরও উৎসাহ বেড়ে যায়। সে একটুও দেরি না করে সঙ্গে সঙ্গে রওনা হয়ে যায়। যখন সিঁড়ি দিয়ে নামছিলো, ওই সময় সে বহুদিনের পুরনো একটা ডাক শুনতে পায়, এই শোনো।

রায়হান পেছনে তাকিয়ে সিঁড়ির মুখে বীথিকে দেখতে পায়। বীথি বলে, আসবার সময় দই আর মিষ্টি এনো।

একটু যেন থমকায় রায়হান। ঠিক অমন ডাক শেষ কবে ডেকেছিলো বীথি ? টুকুর প্রথম জন্মদিনে কি ? নাকি তার আগে ? রঞ্জুর জন্মদিনে ? নাকি তারও আগে ? বাজারের পথে হাঁটতে হাঁটতে তার মনে হয়, বহুকাল পরে যেন বীথি তার সঙ্গে কথা বললো।

বীথি বসার ঘরে দেখে টুকু রঞ্জুর সঙ্গে গল্প জুড়ে দিয়েছে। বড় ভাইকে ইংরেজি সায়েন্স ফিকশনের গল্প বলছে। বীথির হাসি পায় ছেলের কাণ্ড দেখে। বলে, এই গাধা, তুই যে গল্পটা বলছিস ওটা তো ইংরেজিতে লেখা। তুই ওটা পড়েছিস ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

রঞ্জু ছোট ভাইয়ের পক্ষ নেয়। বলে, আচ্ছা ওকে বলতে দিন না মা– ভালোই তো বলছে।

হুঁ। চোরের সাক্ষী গাঁটকাটা, বোঝা যাচ্ছে তাহলে, ওর মাথা চিবোবার জন্য আরও একজন জুটলো।

বীথি ছেলেকে বলে, টেলিফোনে খবর দাও। তোমার বন্ধুরা আসুক দু'চারজন, অন্তত মনির আর শাহনিকে ডাকো।

রঞ্জু হাসে। বলে, না আম্মা, আজ অন্য কেউ নয়, শুধু আমরা, শুধুই আমরা।

বাজার এসে গেলে আর অন্যদিকে খেয়াল রাখা যায় না। একবার মনে হয়েছিলো অবশ্যি, যে অন্য কাউকে না হোক, অন্তত শাহনি আসুক– কথাটা সে শেষ দিকে বলবে রঞ্জুকে। কিন্তু বাজার আসার পর সব ওলটপালট হয়ে গেলো। মোমেনার মাকে সরিয়ে দিয়ে নিজে বসলো চুলোর কাছে। বহুকাল পর আজ নিজের হাতে সে বাপের বাড়িতে শেখা মোগলাই কেতার খানা পাকাবে। বাইরে লোক কেউ না আসুক, ঘরের লোকেরাই হোক শুধু। তবু সে আজ খুব যত্নের সঙ্গে রান্নাটা করবে। কারণ তার ছেলে আজ ডাক্তার হয়েছে।

রান্না যখন শেষ হয়ে এসেছে ঐ সময় টুকু এসে হাজির। বলে, আম্মা একটা কথা।

এখন কোনো কথা শুনবো না, পরে, বীথি মুসাল্লাম-এর রং দেখতে দেখতে বলে।

না। এখনই বলতে হবে, টুকু জোর দিয়ে বলে, ভাইয়া জিজ্ঞেস করলো, ও কোথায় শোবে।

কেন ? ওর ঘরে ও শোবে।

আমি ?

তুমি চলে যাবে মঞ্জুর ঘরে, আগের মতো– বলে দাও, আগের মতোই সব কিছু হবে।

কথাটা বলার পরপরই বীথির খেয়াল হয়। এ সে কী বললো ? আগের মতো সব কিছু হওয়ার মানে তো তাকে আবার ফিরতে হবে নিজের ঘরে, মানে রায়হানের সঙ্গে এক ঘরে এবং এক বিছানায় ? এ সে কী বললো ?

রান্না ছেড়ে সে এদিকে এসে দেখে রঞ্জুর খাটে বিছানা পাতা হয়ে গেছে। টুকুর খাটটা সরানো হচ্ছে মঞ্জুর ঘরে। সত্যি সত্যিই সব হতে যাচ্ছে আবার আগের মতোই। মায়ের বিছানা রঞ্জু নিজে মায়ের ঘরে রেখে এসেছে।

মঞ্জু আসে প্রায় রাত আটটার পরে। বড় ভাইয়ের পরীক্ষা পাসের খবর আর সেই জন্যে বাসায় ভালো খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন দেখে সেও খুশি হয়। কিন্তু নিজের কামরায় টুকুর খাটখানা ঢোকানো হতে দেখে সে একটু গম্ভীর হয়ে যায়। মুখে কিছু বলে না প্রথমে। কিন্তু খানিক পরই মায়ের কাছে এসে খুন খুন করে। বলে, আম্মা, আমার ঘরে টুকু থাকবে ?

হ্যাঁ থাকবে, বীথি জানায়। বলে, ওতো ওই ঘরেই থাকতো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

আমাকে তো এখন অনেক রাত জেগে পড়তে হয়। বাতি জ্বালানো থাকলে ও ঘুমোতে পারবে ?

ঠিক আছে। কালই দুটো টেবিল ল্যাম্প কিনে দেবো।

ওই কথার পর মঞ্জুর বলার আর কিছু থাকে না। সে রান্না ঘরের দরজায় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর নিজের ঘরে চলে যায় আর একটু পরই আসে টুকু। বলে, আম্মা, ছোট ভাইয়া আমাকে জোরে জোরে পড়া মুখস্থ করতে দিচ্ছে না– বলছে মনে মনে পড়তে– মনে মনে পড়লে পড়া মুখস্থ হয় ? আমি কি তাহলে এবার ফেল করবো ?

বীথির মুসাল্লাম তখন লাল হয়ে এসেছে। কড়াই নামিয়ে এখন অন্য কড়াইতে রান্নার কাজটা আরম্ভ করতে হবে। মশলাটা ভুনা করে দমে দিয়ে রাখলেই তার রান্নার কাজ শেষ।

টুকু কড়াইতে আস্ত মুরগি দেখে বলে, কটা ডিম পাড়বে আম্মা।

বীথি জানতে চায়, তুই কটা খাবি ?

আমি সবগুলো খাবো।

ঠিক আছে, খেতে পারলে খাবি– এখন যা, পড়া মুখস্থ কর গিয়ে।

কোথায় যাবো ?

কেন বসার ঘর দেখতে পাস না ?

ওখানে তো আব্বা টিভি দেখছেন।

এ তো মহা মুশকিল! বীথি কী বলবে, ভেবে পায় না। শেষে বলে, বারান্দায় গিয়ে বস তাহলে, ওখানে কেউ যাবে না।

ওখানে তো ঠাণ্ডা। আমার বুঝি শীত লাগে না ?

শেষে বিরক্ত হয়ে বীথি বলে, তোর তাহলে পড়া মুখস্থ করার দরকার নেই এখন।

ঠিক আছে, টুকু রাগে গজ গজ করে ওঠে। বলে, কথাটা মনে থাকে যেন, পরীক্ষায় ফেল করলে তোমরাই সে জন্য দায়ী হবে, বলে দিলাম।

বীথি ছেলে দু'টিকে ফেরায়। কিন্তু নিজের বেলাতে কী করবে ? রান্না তার শেষ হয়ে যায়। কিন্তু চিন্তাটা যায় না। নিজের রাত কাটানোর কী ব্যবস্থা হবে, সেটাই সে চিন্তা করে কুল পায় না। তবু রক্ষা যে নিজের হাতে বিছানাটা ও ঘরে নিয়ে যেতে হয় নি। সে রকম কিছু করতে হলে তো আরও লজ্জার হতো। সে অনুমান করে, রায়হান নিশ্চয়ই মনে মনে হাসছে। তা হাসুক, ওতে সে কিছু মনে করছে না। তার আসল সমস্যা, রাতে সে শোবেটা কোথায় ? মেঝেতে বিছানা পাতবে ? কিন্তু কয়দিন ? রঞ্জু দেখবে না ? মঞ্জু দেখবে না ? যদি জিজ্ঞেস করে তো তখন কী বলবে ? যদি বলে তোমাদের আব্বা অসুস্থ মানুষ। এক বিছানায় থাকলে ওঁর অসুবিধা হবে। তো সেই কথা ওরা বিশ্বাস করবে ? ওরা কি বড় হয় নি ?

নিজেকে বেশ অসহায় লাগে বীথির।

কিন্তু বেশিক্ষণ ওই রকম ভাব মনের মধ্যে রাখতে পারে না। কারণ দশটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে রঞ্জু এসে বলে, আম্মা খেতে দেবেন না ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

আর তাতেই যেন পুরনো বীথি জেগে ওঠে। ইস্কুল থেকে ফেরার পর অমনভাবেই তো ক্ষুধার্ত ছেলে তার কাছে খাবার চাইতো। মোমেনার মাকে ডাকে নিজের হাতে ডিশে, গামলায় খাবার বাড়ে, প্লেটে সালাদ সাজায়, পিরিচে আচার চাটনি দেয়।

তারপর একসঙ্গে বসে সবাই। বীথিও বসে কিন্তু প্লেটে কিছু নেয় না। বলে, আমি পরে খাচ্ছি, তোমরা খাও– আমি তোমাদের খাওয়া দেখি। টুকু বলে, কই আম্মা, আপনার মুরগি তো ডিম পাড়ছে না ? ডিম পাড়ুক, আমরা দেখি। মুরগির পেটে সেদ্ধ ডিম আর আলু মশলা ঢোকানোর পর যে সেলাইটা দেওয়া হয়েছিলো সেই সেলাইর সুতো ধরে টান দিতেই সেলাইটা খুলে যায় আর মুরগির পেটের ভেতরকার ভাজা মশলা আর বেরেস্তা কিসমিস আলু বোখারা মাখানো আস্ত আস্ত ডিম আর আলু দেখা যায়। টুকু মুরগিটার গলা ধরে তুলে একবার করে ঝাঁকুনি দিতে থাকে আর একটা দুটো করে ডিম আর আলু পড়তে থাকে। আর টুকু এক দুই তিন করে গুণতে থাকে।

ওই সময় রায়হান বলে, শুধু কি দেখবো আমরা ? নাকি খেতেও হবে আমাদের?

হঠাৎ কী যেন মনে পড়ে রঞ্জুর, সে ছুটে যায় বসার ঘরে। সেখানে রাখা তার টু-ইন-ওয়ানটা চালু করে দেয়। আর তাতে ধীর মৃদু লয়ের বাজনায় ঘরখানা ভরে যায়। দেখাদেখি মঞ্জুও উঠে যায়। সেও বসার ঘরের তাক থেকে দুটো আধপোড়া মোমবাতি জ্বালিয়ে এনে দুই বাতিদানে করে টেবিলের দু'দিকে সাজিয়ে দেয়।

রায়হান কান খাড়া করে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর ছেলের কাছে জানতে চায় কি দিয়েছো ? বীটোফেন ?

বীথি তখন মোসাল্লামটা টুকরো করছিলো। রায়হানের প্রশ্নটা তার কানে গেলে সে হেসে ওঠে। বলে, সব দেখি ভুলে গেছো। বীটোফেন আর মোজার্টের পার্থক্য বুঝতে পারো না।

রায়হানের খেয়াল হয়। হ্যাঁ মোজার্টই হবে। বাসায় বীটোফেনের যা আছে, সবই তো চড়া গ্রামের সিম্ফনি, এ তো শুনছে কোমল সুর।

আচ্ছা, বীথি বলে, এই মোগলাই খানার সঙ্গে, অমন ইউরোপিয়ান মিউজিক কি ভালো লাগছে, বলো ? তার চাইতে বিসমিল্লাহ খান কি আমজাদ খান দিলে ভালো লাগতো না ?

রঞ্জু ফের উঠে বসার ঘরে চলে যায়। মিনিট দুই পরে ফেরে আর তখন আমজাদ খানের সেতারে ইমনের সুর বাজতে শুরু করে। চেয়ারে বসতে বসতে রঞ্জু আড় চোখে মায়ের দিকে তাকায়। বলে, এবার পছন্দ হয়েছে ?

বীথি ছেলের খোঁচাটা উপভোগ করে। বলে, হাঁ হয়েছে।

রায়হানও হাসে। বলে, পছন্দ তো হবেই, নিজের সেতারটা অযত্নে অবহেলায় পড়ে নষ্ট হতে চলেছে, তার কী হবে ?

বীথি আড়চোখে তাকায় রায়হানের দিকে। একবার ইচ্ছে হয় বলে, কী সুখেই না রেখেছিলে আমাকে যে গান বাজনার চর্চা করবো! কিন্তু বলে না সে। আসলে সত্যিই খারাপ অবস্থার মধ্য পড়তে হয়েছিলো ওই সময়। যুদ্ধের পর সংসার চালানোই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

সমস্যা। তখন আবার টুকু কোলে। ওর দুধ কেনা হবে, না সেতার শেখানোর মাস্টারকে মাইনে দেবে ? সুতরাং আর কী করা। সেতার সেই যে আলমারির মাথায়, সেখান থেকে আর নামে নি।

খাওয়া দাওয়া শেষ হতে হতে পুরো একটা ঘন্টা পার হয়ে যায়। বীথির দেখতে খুব ভালো লাগে। বহুদিন পর সবাই মিলে খেতে বসেছে। সে পাতে তুলে দিচ্ছে খাবার। বুটি কাবাব কে নিলো না, কে শামি কাবার বাদ রাখলো; মুসাল্লামের ডিম কে খেলো না। মিষ্টি দুটো খাওয়া দরকার– হ্যাঁ দই-ও, একটু টক লাগছে দই। তাহলে ভালোই তো। হজম হবে ভালো। একই সঙ্গে শেষের দিকে কিছু খাবার তুলে নিয়ে বীথিও খেয়ে নিলো। তারপর ঝাড়পোঁছ, গোছগাছ, মোমেনার মা বিদায় নিলো। গেটে তালা দেওয়া হলো। এবার বিশ্রাম– ঘরে যাও ছেলে কর্তা গিন্নীরা– রাতের বিশ্রামের জন্য বিছানা ডাক দিচ্ছে, একই সঙ্গে ডাকছে তন্দ্রা, ঘুম আর স্বপ্ন। বিছানায় যাও হে সংসারের মানুষেরা, এবার বিছানায় যাও। মনের ভেতরে এসব কথা প্রতিধ্বনিত হয় বটে কিন্তু আসলে এসব ধ্বনিত হয় অন্ধকারে, অতীতে, ভালোবাসায়, হৃদয়ের পরিপূর্ণতায়।

রায়হান এদিকে তখনও টিভির সামনে বসে। শেষ প্রোগ্রাম হয়ে গেছে, তবু। এরপর কী করবে রায়হান ? সে বুঝতে পারে না। ওই সময় বীথি এসে দাঁড়ায় দরজায়। বলে, কী হলো তোমার, শুতে যাচ্ছো না কেন ?

রায়হান উঠে দাঁড়ায়। বলে, হ্যাঁ যাই। তারপর চুপচাপ শোবার ঘরের ভেতরে এসে বিছানায় বসে। দেখে, রঞ্জু যে তোষক বালিশ চাদর খাটের তলায় রেখে গিয়েছিলো সেগুলো সব টেনে বের করে মেঝেতে পাতা হয়েছে। বীথি বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে রায়হানকে বিছানার ওপর বসে থাকতে দেখে বলে, আবার কী হলো ? বসে আছো কেন ? শুয়ে পড়ো।

হ্যাঁ শুচ্ছি, বলে রায়হান খাটের মাথায় গিয়ে গা এলিয়ে দেয়, পুরোপুরি শোয় না। তারপর ঐ আধশোয়া অবস্থাতেই বলে, খুব মশা হয়েছে, মশারি না টাঙ্গালে নিচে শোয়া যাবে না।

বীথি হয়তো কিছু বলতো কিন্তু পারলো না। কারণ ঠিক ঐ সময় রঞ্জুর হাঁক শোনা যায়। বলে, আম্মা অনেক রাত হয়েছে, বাতি জ্বলছে কেন ? আব্বার কি শরীর খারাপ হয়েছে ?

ছেলের অমন হাঁক শুনে বীথির মনে হয় ও বোধহয় এক্ষুণি এসে ঘরের ভেতরে ঢুকবে। সে তাড়াতাড়ি প্রথমে ঘরের দরজাটা বন্ধ করে। তারপর বাতি নেভায়।

কাজটা করার সময় জানে না কেন, তার দারুণ হাসি পাচ্ছিলো। আর ছেলেবেলার কথা মনে হচ্ছিলো বারবার। মেজো ফুফুর বড় মেয়ে শালু বুবু খুব জেদী মেয়ে ছিলো আর যখন তখন বায়না ধরতো। ওর বায়না না শুনলে একেক দিন মেঝেতে মাদুর বিছিয়ে শুয়ে পড়তো। ফুফু কতো ডাকাডাকি করতো কিন্তু শুনতো না। কিন্তু যেই আব্বার সাড়া পেতো তক্ষুণি লাফিয়ে উঠে প্রথমে দরজা বন্ধ করতো আর সঙ্গে সঙ্গে বাতিটা নিভিয়ে দিতো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

জানালা দিয়ে বাইরের আলো আসছিলো। সেই আবছা আলোয় রায়হানকে বসে থাকতে দেখে ফের চাপা গলায় বলে ওঠে বীথি, আচ্ছা তোমার হয়েছেটা কী বলো তো? শুয়ে পড়ছো না কেন?

হ্যাঁ, এই তো শুচ্ছি, বলে রায়হান আধশোয়া অবস্থা থেকে লম্বা হয়। তারপর নরম গলায় নিজেকেই যেন বলে, এইতো সেদিন জন্ম হলো ছেলেটার। হাসপাতালে যাওয়ারও সময় পাওয়া যায় নি। ওর সব কিছুতেই তাড়াতাড়ি, দেখতে না দেখতে কেমন ডাক্তার হয়ে গেলো।

রায়হানের গলার স্বরে কী ছিলো কে জানে, ওর ঐ নরম গলায় স্মৃতিচারণ শুনে বীথির শরীর মন হঠাৎ শান্ত আর স্থির হয়ে যায়। তার নিজের প্রথম মা হওয়ার ঘটনাটা মনে পড়ে। যখন সন্ধ্যার পর ব্যথাটা আরম্ভ হয়, তখন বুবু বলেছিলো, ওটা আসল ব্যথা নয়, ডেলিভারির আগে নাকি এমন ব্যথা হয়। এর নাম ফলস পেইন। বুবু খালি বলছিলো, কিছুক্ষণ পরই কমে যাবে, একটু সহ্য কর।

সে নিজেও অমনই ভাবছিলো। কেননা ডাক্তারের দেওয়া তারিখ জুলাই মাসের শেষ দিন– তার তো অনেক দেরি। সুতরাং পেইনটা ফলসই হবে। কিন্তু রাত বাড়তে থাকলে ব্যথাটা যখন আরও বাড়ে, তখন বীথির রীতিমতো ভয় লাগতে শুরু করে। বুবু আশ্বাস দিলে কী হবে? সে কঁকাতে কঁকাতে খালি জিজ্ঞেস করে, ও আসে নি? আর কখন আসবে? ন'টা বাজে নি এখনও? বেজে গেছে? তাহলে আসছে না কেন?

বীথির সব মনে পড়ে। রাত ন'টা নাগাদ রায়হান বাসায় ফেরে, বুবু তখনও বলে, ওটা বোধহয় ফলস পেইন। কিন্তু রায়হানের মন মানে না, তার একটু একটু ভয়ও লাগতে শুরু করে। সে ডাক্তার খোদেজাকে খবর দিতে ছোটে শান্তিনগর। আবার ঐ সময়ই আরম্ভ হয়ে যায় ঝমঝম বৃষ্টি। এমন বৃষ্টি যে মনে হচ্ছিলো, সারা বছরের বৃষ্টি ঐ এক রাতেই বোধহয় ঝরে পড়বে। খিলগাঁওয়ের কাঁচা রাস্তায় থকথকে লাল মাটির নরম কাদা, জায়গায় জায়গায় হাঁটু পর্যন্ত দেবে যায়। তো ডাক্তার খোদেজার ফিয়াট ৬০০ গাড়ির চাকাও কাদার মধ্যে পড়ে আর উঠতে পারে না। রায়হান গাড়ির পেছনটা ধরে সামনের দিকে প্রাণপণ ঠেলে, কিন্তু গাড়ি নড়ে চড়ে না। রায়হানকে পাড়ার কয়েকটি ছেলে বোধহয় চিনতো। একজন জার্নালিস্টকে ওভাবে বৃষ্টিতে ভিজতে আর গাড়ি ঠেলতে দেখে ওরা এগিয়ে এসে খুব জোর ধাক্কা লাগায়। আর তাতেই গাড়ি ফের সামনের দিকে এগোয়। রায়হানের বাসার দোরগোড়ায় পৌছায় আরও আধঘন্টা পরে।

ডাক্তার যখন রোগী দেখেন, তখন রাত এগারোটা। তারপর রায়হানকে ডেকে বললেন, এখন আর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার মতো সময় নেই। যা করার এখানেই করতে হবে। আর বুবুকে ডেকে বলেন, আপনি গরম পানির ব্যবস্থা করুন। বাচ্চার কান্না যখন রায়হানের কানে আসে, তখন রাত সাড়ে বারোটা।

বীথিও শোনে নিজের পেটের ছেলের প্রথম কান্না। ছেলের মাথা বেরুবার সময় খুব কষ্ট হয়েছিলো। মনে হচ্ছিলো কোমরের নিচের অংশটা বোধহয় ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে। সেই হঠাৎ হালকা হয়ে যায় তার সমস্তটা শরীর। সারা শরীরময়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

এমন একটা ভাব, যা সে আগে কখনোই অনুভব করে নি। শরীরময় তখন যেন ঘুম নামছে। আর ঐ সময় সে কান্নার আওয়াজটা প্রথম শোনে। তার শিথিল আধাঘুমন্ত চেতনা দিয়ে সে অনুভব করে কান্নার শব্দটা। মনে হয় শব্দটা উঠে আসছে তার একেবারে বুকের ভেতর থেকে। বুবু মুখের ওপর ঝুঁকে ছিলো, কপালে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলো। বীথি তখন দু'চোখের পাতা মেলে রাখতে পারে না এতো ঘুম পাচ্ছিলো তার। তবু ঐ অবস্থাতেই সে জিজ্ঞেস করেছিলো। বুবু, কোথায়, আমার ছেলে কোথায়?

হঠাৎ হাতের চাপড়ে মশা মারার শব্দ হলে বীথি আবছা আলোয় বিছানায় শোয়া মানুষটার দিকে তাকিয়ে দেখে কিছুক্ষণ তারপর স্ট্যান্ডে লটকানো মশারিটা টেনে নামায়। মশারির ধারগুলো তোষকের নিচে গুঁজতে গুঁজতে তার কেবলই মনে হতে থাকে। এটাতো তারই বিছানা– এই বিছানা তার নিজের। এতে শোয়ার অধিকার তার– অন্য কারোর নয়, তাহলে কেন সে অন্য বিছানায় শোবে? আর মেঝেতেই বা তার শোয়ার কী দরকার! তার মনে হয়, তার অন্যঘরে গিয়ে শোয়া উচিত হয় নি। তার তো কোনো পাপ ছিলো না, সে কেন এই বিছানায় শোয়ার অধিকার হারাবে?

মশারি গোঁজা শেষ হলে সে এক-পা দু'পা করে ঘরের ভেতরে পায়চারি করে। বিছানায় শুতে কেন তার সঙ্কোচ হচ্ছে, সেটাই মনে মনে খোঁজে। কিন্তু পায় না। আজ যা ঘটেছে সবই তো আনন্দের। আজ আনন্দের খবর শুনেছে সে, তারপর ছেলের খুশিতে সবাইকে শামিল করার আয়োজন সে নিজে করেছে, রান্না যে করলো সেও নিজের আনন্দে। সবার পাতে খাবার বেড়ে দিয়েছে। ছেলেদের মুখে গল্প শুনেছে, তাদের মুখে হাসি দেখেছে– সবই তো তাকে আনন্দ দিয়েছে। বলা যায় এমন খুশি সে আগে কখনো হয়নি– তাহলে? তাহলে কেন তার সঙ্কোচ? তার সংসার তারই আছে, তার স্নেহ-ভালোবাসা সবই আছে, তাহলে কেন তার সঙ্কোচ? মানুষটাকে তার ছুঁতে ইচ্ছে করে না, ঠিক আছে, ছোঁবে না সে। নিজের বিছানায় না শোওয়ার কী মানে?

বীথি মনকে ধমকে এক ঝটকায় মশারি তুলে বিছানার একদিকে বালিশে মাথা রেখে শুয়ে পড়ে। দেয়ালের দিকে মুখ রাখে সে। কিন্তু দু'চোখে তার ঘুম আসে না। চোখ বুঁজলে কী হবে, কান যে তার সজাগ হয়ে থাকে, তার সে কী করবে? মানুষটা ঘুমলো কি না সেটার জানান শোনার জন্য যদি তার দুই কান জেগে থাকে, তাহলে সে কী করতে পারে? এক সময় রায়হান কথাটা বলে। সে বলে, বীথি, আমাকে ক্ষমা না করতে পারলে করো না, কিন্তু তবু এক বিছানায় শুয়ো। না হলে ছেলেরা খুব কষ্ট পাবে– বেশিদিন তো না, আমি আর ক'দিনই বা বাঁচবো?

রায়হানের মুখে অমন ন্যাকামি ভর্তি কথা শুনে বীথির ভয়ানক রাগ হয়। ইচ্ছে হয় লোকটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে দু'হাতে তার গলার নালী চেপে ধরে। মরে যাক, তার হাতেই মরণ হোক ওর।

রাগটা হয়, শরীরে জ্বালা ধরে। কিন্তু কি অদ্ভুত কাণ্ড– থাকে না। খানিক পরই ফের সে শান্ত, পরে স্বাভাবিক হয়ে যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

রায়হান আবার বলে, এখন তো ওদের জীবন আরম্ভ হচ্ছে, ক'দিন পর ওরা বিয়ে করবে, ওদের ছেলেপুলে হবে।

বীথির অস্তিত্বের খুব ভেতরের দিকে কোথাও যেন ঘা দেয় রায়হানের ঐ কথা। হু হু করে কেউ যেন কেঁদে ওঠে তার বুকের ভেতরে। সে তখন পাশ ফিরে শোয়। আবছা আলোয় মানুষটার শরীরের অবয়ব রেখা ঝাপসা দেখায়। তবু সে মানুষটার শরীরের দিকে তাকিয়ে থাকে। তার কথা বলতে মন চায় না। তবু তার ভেতর থেকে কেউ যেন বলে ওঠে, থাক, যথেষ্ট হয়েছে, এবার ঘুমোও। অনেক রাত হলো।

কথাটা বলে সে রায়হানের মাথায় আলতো করে নিজের হাত রেখে সেটা বোলাতে শুরু করে।

পঁচিশ

রঞ্জুর ইন্টার্নিশিপ দেখতে দেখতে শুরু হয়ে যায়। তার অন্য সহপাঠীরা কেউ হোস্টেল ছাড়ে নি। সে আর মনির ছাড়লো। সে অবশ্যি এমনিতেই ছাড়তো, কারণ মনে মনে সে হাঁপিয়ে উঠেছিলো হোস্টেলে থাকতে থাকতে। তবে মনিরের তাড়াতে আগেই ছাড়তে হলো। রেজাল্ট বেরুবার আগে থেকেই বলছিলো, ওর দাদুর বাড়ি চলে যাবে। দাদু মানে ওর আব্বার মামা। এলিফ্যান্ট রোডে বেশ বড় বাড়ি। ভদ্রলোক প্রথম দিকের সিএসপি, এখন সেক্রেটারিয়েটের কোনো মিনিস্ট্রির যেন সেক্রেটারি। মনির হোস্টেল ছাড়ার কারণটা প্রথম দিকে পুরোপুরি বলে নি। তবে যেটুকু বলেছিলো তাতেই রঞ্জুর বোঝা হয়ে গিয়েছিলো। বলেছিলো আর্মড ক্যাডারদের নামিয়ে দিয়েছে সরকারী দল। ইউনিভার্সিটি এলাকায় ওদের দাপট বাড়ছে, কে কে ওদের টার্গেট তা জানা না গেলেও কিছু লোকের ওপর যে ওরা হামলা করবে, সে ব্যাপারে সন্দেহ রাখার মানে হয় না। মেডিকেল কলেজ ছাত্র ইউনিয়নের মধ্যে সে ভালো রকম এ্যাকটিভ। ছাত্রদলের ওপর যদি ওদের রাগ থেকে থাকে, তাহলে কি ওরা আমাকে হিসেবের বাইরে রাখবে ? আর যদি আমি হিসেবের মধ্যে থাকি, তাহলে কি বাঁচবো ? সেবার দোতলার বারান্দার রেলিং ডিঙিয়ে ঝুলতে ঝুলতে নেমে পালাতে হয়েছিলো। সে কথা মনে নেই ? মনির স্মরণ করিয়ে দেয়। রঞ্জুর মনেও এমন একটা হিসেব ছিলো। এসএম হলের ছাত্র আলম পায়ে গুলির জখম নিয়ে এমারজেন্সিতে এসেছিলো। ওর পায়ের জখমটা সেলাই টেলাই করে দিয়েছিলো সে নিজেই। দিন দুই ছিলো হাসপাতালে। সে-ই বলেছিলো, জাতীয় ছাত্র সমাজ ক্যাডারদের নামিয়ে দিয়েছে। ওরা এখন হল আর হোস্টেলের বাইরে-ভেতরে সর্বত্রই থাকবে। কোথাও কোনো রকমের নড়াচড়া দেখলেই ওরা আঘাত করবে। তাতে যা হবার হবে। আলম বলেছিলো, এস.এম হল থেকে অনেক ছাত্র এখন আত্মীয়স্বজনের বাসায় চলে গেছে।

আলম দু'দিন পরই চলে যায়। তার দু'দিন পরই মনির প্রস্তাবটা করে। বলে, যদি এখানে রাতের বেলা এসে হামলা করে, তাহলে আমরা কি কিছু করতে পারবো,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বল ? রঞ্জুর কাছে আশঙ্কাটা অমূলক মনে হয় নি। কারণ কলেজ ইউনিয়নের এজিএস হিসেবে মনিরকে কিছু না কিছু দায়িত্ব তো নিতেই হয়, আর যে কাজেই আজকাল হাত দেয় ওরা, সেখানেই বিরোধী পক্ষ ঝামেলা পাকায়। এমন অবস্থায় কখন কী হয় তার ঠিক আছে কিছু ?

সুতরাং মনে মনে তৈরি ছিলো দু'জনেই। তাই যেদিন রেজাল্ট বেরুলো সেদিনই দু'জন এক সঙ্গে বেরিয়ে পড়লো। বাসায় আসার আরও একটা কারণ রঞ্জুর মনের ভেতের কাজ করছিলো। মা-বাবার কথাবার্তা আর চালচলনের মধ্যে কেমন কেমন যেন একটা ঠাণ্ডা ভাব সে লক্ষ্য করছিলো। ব্যাপারটা অবশ্যি আব্বার হাসপাতালে থাকার সময়েই তার চোখে পড়ে। সে বুঝতে পারে, দু'জনের মধ্যে আগের মতো সম্পর্কটা গাঢ় নয়। কোথায় যেন একটা ফাঁক থেকে যাচ্ছে। তারপর এও লক্ষ্য না করে পারে না যে, মা টুকুর সঙ্গে আলাদা ঘরে শুচ্ছে। হার্টের রোগীর সঙ্গে এক বিছানায় শোয়া ঠিক নয় এমন একটা কারণ সম্ভবত আম্মা দেখাতে চাইতেন, কিন্তু রঞ্জুর কাছে সেটা যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হতো না। সে বুঝে নিয়েছিলো, ভেতরে ভেতরে দু'জনের সম্পর্কের মধ্যে কোনো বাধা তৈরি হয়েছে। কিন্তু প্রথম রাতেই যেভাবে হাসিখুশি আর খাওয়া-দাওয়ার মধ্যে মা-বাবা দু'জনকেই মেতে থাকতে সে দেখলো, তাতে সন্দেহটা তার অনেকখানি কেটে যায়। পরের দিন সকালে যখন দেখলো মা-বাবা দু'জনেই এক বিছানায় শুয়েছিলেন আর তার চিহ্ন বিছানা জুড়ে লেপ্টে আছে, তখন মনের ভেতরে সন্দেহের কোনো চিহ্ন পর্যন্ত রইলো না।

তবে মঞ্জুর কথাবার্তা আর হাবভাব দেখেশুনে তার বেশ চিন্তা হয়। মনে হয়, ফের ও কোনো রকম ঝামেলার মধ্যে পড়ে গিয়েছে। একে তো অনেক রাত পর্যন্ত বাতি জ্বালিয়ে কী কী যেন পড়ে ও। তারপর যেদিন জিজ্ঞেস করলো, ভাইয়া আমি যদি এবার সাবসিডিয়ারি পরীক্ষা না দিই তো কী হয়, আব্বা কি খুব রেগে যাবেন ?

রঞ্জু মুখোমুখি তাকায় ভাইয়ের দিকে। জানতে চায়, কেন, কী হয়েছে তোর ? কেন পরীক্ষা দিবি না ?

আমার প্রিপারেশন ভালো হয় নি।

সাবসিডিয়ারিতে আবার প্রিপারেশন ভালো হবার কী আছে ? ওতে পাস মার্ক পেলেই তো চলে– তোর কি পাস মার্ক পাওয়ার মতোও প্রিপারেশন হয় নি ? কী করেছিস তুই এতোদিন ? মঞ্জু জবাবে কিছু বলে না, মাথা নিচু করে নিজের ঘরে চলে যায়।

তবে ওর যাওয়ার ভঙ্গি, কথা না বলা, দূরে দূরে থাকা– সব মিলিয়ে দেখে রঞ্জুর মনে হয়, ভাইটি তার নতুন কোনো ঝামেলা পাকিয়েছে। সে একদিন তার ঘাড়ে ঝোলানো ব্যাগের ভেতর থেকে উঁকি মারতে থাকা লাল মলাট দেখে একখানা বই টেনে বের করে। দেখে বইয়ের নাম সমাজ সভ্যতার ক্রমবিকাশ ও শ্রেণীসংগ্রাম। একখানা বুকলেটও ঐ বইয়ের ভেতর থেকে বের হয়, যার মলাটে লেখা– শ্রেণীশত্রু খতম করো, গণবিপ্লব সফল করো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বই আর বুকলেট দেখা হলে সে ব্যাগ হাতিয়ে দেখে অমন বই আরও আছে কিনা। বই পায় না, কিন্তু খাতার ওপর দেখে নানান ধরনের শ্লোগান লেখা। মুক্তির একই পথ– সশস্ত্র বিপ্লব, বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক, শ্রমিক কৃষক অস্ত্র ধরো– নিজের হক আদায় করো।

রঞ্জু অনুমান করে মঞ্জু সম্ভবত মার্ক্সিজমের দিকে ঝুঁকেছে। ইন্টারমিডিয়েট পড়ার সময় সেও একবার ওদিকে ঝুঁকেছিলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওদিকে তার যাওয়া হয়নি। পুঁজির ওপর পড়া আরম্ভ করেছিলো, তার আগেই এসে গেলো ভর্তির ঝামেলা। তারপর ভর্তি হয়ে ডাক্তারীর বই পড়তে পড়তে সময় চলে গেলো। ওদিকের বই আর পড়াই হলো না। সে মনে মনে ঠিক করে, এবার সময় পাওয়া গেলে, মার্ক্স, আর এ্যাঙ্গেলসের বই অবশ্যই সে পড়ে শেষ করবে।

তার মনে পড়ে, ছোটবেলায় দেখেছে, আব্বা লেনিনের ওয়ার্কস খুব পড়তেন। মাও সে তুং-এর বইও সে পড়তে দেখেছে। বইগুলো যে কোথায় গেলো, আজকাল সে ওসব বই বাসায় দেখে না। তা না হয় হলো, সে নিজেকে বলে, কিন্তু মঞ্জুর ব্যাপারে কী করবে সে ? বলবে, এসব বই পরে পড়তে, আপাতত খেটেখুটে যেন সাবসিডিয়ারি পরীক্ষাটা ভালোভাবে দেয়– এই কথা বলবে, নাকি বলবে চালিয়ে যাও ভাই, বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক!

মঞ্জুর ব্যাগ আর বই দেখে দোষের কিছু সে পায় না। কিন্তু তবু মনের খটকাটা যায় না। ও কেন খোলামেলা হয় না, কেন বেশির ভাগ সময় বাড়িতে কাটায় ?

তার আরও আশ্চর্য লাগে, মা কিংবা আব্বা কেউ-ই মঞ্জুর হাবভাবে অস্বাভাবিক কিছু দেখতে পান না। ঐ রকম সময়ে একদিন হাসপাতালে ওটি'র কাজ শেষ করে সে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে, তখন দেখে সামনে মঞ্জু। কী ব্যাপার, তুই এখানে ? তার বুকের ভেতরটা ধক করে ওঠে। আব্বার কিছু হলো কী ? সে জিজ্ঞেস করে, কোত্থেকে আসছিস ?

মঞ্জু কিছু যেন চিন্তা করে। তারপর চোখে চোখে তাকিয়ে বলে, ভাইয়া তুই একজনের উপকার করবি ?

ভাইয়ের প্রশ্ন শুনে মুখোমুখি তাকাতে হয়। লক্ষ্য করে মঞ্জু সম্ভবত কোনো গোপন কথা বলতে চায়। সে ভাইয়ের মুখের ওপর থেকে নজর না সরিয়ে জানতে চায়, কী করতে হবে বল।

মঞ্জু ডাইনে বাঁয়ে তাকিয়ে নিয়ে বলে, একটু নিচে আসবি ?

রঞ্জু ছোট ভাইয়ের সঙ্গে দোতলা থেকে নিচে নামে। করিডর দিয়ে হেঁটে পশ্চিমের বারান্দায় যায়, তারপর ঐ বারান্দাতেই এক্সরে ডিপার্টমেন্টের সামনের বেঞ্চে একটি তরুণকে বসে থাকতে দেখে। রঞ্জুকে দেখে ছেলেটি উঠে সামনে এসে দাঁড়ায়। আর ঠিক ঐ সময় মঞ্জু বলে, ভাইয়া একজনের চিকিৎসার দরকার।

কিসের চিকিৎসা ? কী হয়েছে ? কার ?

মঞ্জুর সঙ্গী ছেলেটি বলে, আমার নাম হামিদ আফতাব, আমাদের খুব বিপদ, আপনি সাহায্য না করলে একজন মারা যেতে পারে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

রঞ্জু একবার এর মুখের দিকে, একবার ওর মুখের দিকে তাকায়। তারপর বলে, আমি তোমাদের কথা কিছুই বুঝতে পারছি না, কী হয়েছে খুলে বলছো না কেন ? যদি কেউ অসুস্থ হয়ে থাকে, তাহলে এতো কথা বলার কী দরকার ? সোজাসুজি হাসপাতালে নিয়ে এসো।

হাসপাতালে ওকে আনা যাবে না ভাইয়া, মঞ্জু মুখ নিচু করে জানায়।

সে কি ! কেন ? রঞ্জু অবাক হয়।

পলিটিক্যাল ব্যাপার, হামিদও নিচু গলায় জানায়। বলে, গুলিতে উন্ডেড।

রঞ্জু অনুমান করে, মস্তানবাজির ব্যাপার। মঞ্জুর ওপর কিছুটা রাগও হয় তার। নজর আপনা থেকেই তার বাঁকা হয়ে যায়, গলাতেও ঠাট্টার স্বর ফোটে। সে জানতে চায়, কোন পার্টি– ছাত্রদল না ছাত্রলীগ ? সরকারী দলের ছাত্র সংগঠনের নাম সে করে না। কারণ জানে, তাদের কিছু হলে মঞ্জুর মতো ছেলের সাহায্য দরকার হতো না।

প্রশ্নের জবাব না পেয়ে রঞ্জু ফের জিজ্ঞেস করে, কী হলো, বলছো না কেন, কোন পার্টি ? ছাত্রলীগ ছাত্রদল ছাত্র ইউনিয়ন– এসব নয়। তাহলে কোন পার্টি ?

আন্ডার গ্রাউন্ড পার্টির ছেলে, মঞ্জু নিচু গলায় জানায়। রঞ্জু মনের ভেতরে চমকে ওঠে। আণ্ডার গ্রাউন্ড পার্টের ছেলেদের সঙ্গে মঞ্জুর যোগাযোগ কেন ? ক'দিন আগে মঞ্জুর ব্যাগ থেকে বের করে দেখা লাল মলাটের বইখানা তার মনের ভেতরে ঝলসে ওঠে। সে দু'জনের মুখের দিকেই ভালো করে তাকিয়ে দেখে। এবারে সে আর পার্টির নাম জানতে চায় না। জিজ্ঞেস করে, কোথায় লেগেছে ? পায়ে ?

না, কোমরের নিচে, ডান দিকের হিপে।

কবে ?

গতকাল ভোররাতে।

হাসপাতালে না আনলে ওকে বাঁচাতে পারবে ?

জানি না, হামিদ বলে। জানায়, আমাদের পার্টির দু'জন ডাক্তারের একজনও ঢাকায় নেই। এদিকে ডাক্তার দেখানো খুব দরকার, ব্লিডিং বন্ধ হয় নি এখনও।

রঞ্জু আন্দাজ করে, বড় রকমের ক্ষতি কিছু হয় নি, পেলভিস কিংবা হিপ জয়েন্টে গুলি লাগলে এতোক্ষণে মারাও যেতে পরতো। সে ব্যাপারটা পুরোপুরি জানার জন্য হামিদকে জিজ্ঞেস করে, তুমি কি পার্টির ?

জী না, এখনও হই নি। হামিদ জানায়। বলে, আমার সঙ্গে ওদের ভালো যোগাযোগ আছে।

কাড়ি কোথায় ?

আমার বাড়ি নরসিংদী।

ঘটনাটা কোথায় ঘটেছে ?

নরসিংদীর কাছে।

কার সঙ্গে, পুলিশ ?

জ্বী না, হামিদ বলে, অন্য একটা গ্রুপের সঙ্গে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ওরা কারা ? জাসদ ? গণবাহিনী ?

হামিদকে কেমন যেন বিভ্রান্ত দেখায়। বলে, আমি ঠিক জানি না। মাসুমও ঠিক করে বলতে পারে না।

রঞ্জু শেষ প্রশ্ন করে, তোমরা নিশ্চয়ই সর্বহারা পার্টির ? হামিদ কিছু বলে না, তবে মঞ্জু মাথা হেলায় ? রঞ্জুর মনের ভেতরে একটু ইতস্তত ভাব জাগে। সে কি যাবে ওদের সঙ্গে। ডাক্তার বই তো নয়! যদি সে না যাওয়ার কারণে ছেলেটি মারা যায়, তাহলে তো সেই অপরাধ বোধ তার ঘাড়ে সারাজীবন ধরে চেপে থাকবে।

সে দেরি না করে ওপরে গিয়ে ডিউটিতে যিনি ছিলেন তার কাছ থেকে দু'ঘণ্টার ছুটি নিয়ে ঘাড়ের ব্যাগটা হাতে নিয়ে হামিদের সঙ্গী হয়। ভাইকে বলে, আমাদের সঙ্গে তোমার যাওয়ার দরকার নেই। যা দেখার আমিই দেখতে পারবো। নাজিমুদ্দিন রোডের বাঁদিকে একটা চাপা গলির ভেতরে ঢুকতে হয় প্রথমে, তারপর রিকশা ছেড়ে হাঁটতে হয় কয়েক মিনিট। তারপর ঘুপচি মতো জায়গায় একটা ঘরে নিয়ে ঢোকায় হামিদ। জায়গাটা গলি ঘুপচির মধ্যে হলে কি হবে, চারদিকে উঁচু উঁচু দালান না থাকায় ঘরের ভেতরে বেশ আলো। তাছাড়া জানালা দরজাও খোলা ছিলো, উঠোনে রোদ ছিলো।

রঞ্জু দেখলো, হামিদের বয়সী একটি ছেলে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। তরুণটির মুখে দাড়ি। অতিরিক্ত রক্তপাতের জন্যই বোধহয় চোখমুখ ফ্যাকাশে।

একখানা লুঙি প্যাডের মতো ভাঁজ করে ক্ষতের ওপর গামছা দিয়ে বাঁধা। ক্ষতটা দেখে রঞ্জু বুঝতে পারে, ওটা রাইফেলের গুলিতে হয় নি, হলে হয়েছে পিস্তল কিংবা রিভলবারের গুলিতে।

তরুণটির গায়ে বেশ জ্বর। কিন্তু উঃ আঃ বা ছটফট করছিলো না। রঞ্জুকে দেখে বললো, ডাক্তার সাব, গুলিটা বাইর কইরা দ্যান খালি, তাইলেই চলবো।

রঞ্জু নতুন হলেও কয়েকদিন আগেও শরীর থেকে গুলি বের করার কাজ করেছে। ছুরি বসিয়ে খানিক গভীর করে ক্ষত বরাবর জায়গাটা চিরে দেয় প্রথমে। তাতেই ছুরির ডগায় শক্ত আর ধাতব জিনিসটার অবস্থান কোথায় তা বুঝতে পারে। তারপর আর দেরি হয় না। ফরসেপটা ঢোকানো আর তার দুই দাঁতাল মাড়িতে চেপে ধরে গুলিটা বের করে আনা, তারপর জায়গাটা পরিষ্কার করে মুছে ওপর দিয়ে ব্যান্ডেজ বাঁধতে আর কতোটুকু সময় লাগে? পুরো কাজটা ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই শেষ করে সে বেরিয়ে আসে।

কাজটা যখন করছিলো, তখন অন্য কিছু চিন্তা মনে আসে নি। কিন্তু কাজটা শেষ করে বেরিয়ে আসার পর তার মনের ভেতরে রীতিমতো চিন্তা শুরু হয়ে যায়। শেষে পুলিশের হাঙ্গামায় না পড়তে হয়। নিজের জন্য নয়, কেননা ডাক্তার হিসেবে আহত লোকের চিকিৎসা করাটা তার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। রোগীর চিকিৎসা করাটা তার দায়িত্ব, পরিচয় জানাটা তার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না। তার চিন্তা হয় মঞ্জুর জন্য। যদিও হামিদ জানিয়েছিলো যে, সে পার্টির মেম্বার নয়। কিন্তু যে রকম ঘনিষ্ঠভাবে সে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

মাসুম আর সঙ্গের ছেলেটির সঙ্গে কথা বলছিলো, তাতে বুঝতে অসুবিধা হয় নি যে, সে পার্টির মেম্বার না হয়ে পারে না। আর ঐ ধারণা হওয়ার পর থেকে ঘুরে ফিরে মনের ভেতরে থেকে থেকেই একটা প্রশ্ন জেগে উঠছে। মঞ্জু কি তাহলে আন্ডারগ্রাউন্ড পার্টির সঙ্গে জড়িয়ে পড়লো।

অন্যসব আন্ডার গ্রাউন্ড কম্যুনিস্ট পার্টির মতো সর্বহারা পার্টিতেও যে বহু রকমের ভাংচুর হয়েছে সে খবরটা জানা ছিলো। এও শুনেছিলো, শ্রেণীশত্রু খতমের লাইন থেকে অনেক গ্রুপই সরে এসেছে। তবে অনেক গ্রুপ আবার ঐ লাইন ধরে রেখেছে– এও ঠিক। অবশ্যি কোনো কোনো গ্রুপ স্রেফ লুটপাট করে আর চাঁদা তুলে মানুষের ওপর জুলুম করে, এ খবরও তার জানা। আবার অনেকে আত্মসমর্পণ করছে, এ খবরও তো কাগজে ছাপা হতে দেখেছে। একসময় গণবাহিনী আর জাসদের সঙ্গে সর্বহারাদের খুব খুনোখুনি হতো। ইন্টারমিডিয়েট পড়ার সময় তার বন্ধু ছিলো আতাহার। ফরিদপুরে ওদের বাড়ি ছিলো। ওর মামা প্রায় অন্ধ। ভদ্রলোক এমএ.তে সেকেন্ড ক্লাস ফার্স্ট হয়েছিলেন। গ্রামের স্কুলে মাস্টারি করতে গিয়েছিলেন। সর্বহারাদের সঙ্গে অতীতে এক সময় সম্পর্ক ছিলো বলে সেই মাহতাব মামাকে দা দিয়ে নাকি কুপিয়ে কুপিয়ে মারে জাসদের ক্যাডাররা। সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্যটা বর্ণনা করতে করতে আতাহার শিউরে শিউরে উঠতো। কষ্ট পেয়ে কাঁদতে থাকা বন্ধু আতাহারের মুখটা রঞ্জুর মনে পড়ে। এই সেদিনও তো পূর্ববাংলা আর বিপ্লবী এই দুই গ্রুপের হানাহানিতে শাহনির ভাই মারা পড়লো। শাহনি তার ঘাড়ে মাথা রেখেই তো ভাইয়ের শোকে বুক ভাসিয়ে কেঁদেছিলো। সে ভেবে পায় না, আন্ডার গ্রাউন্ড রাজনীতির যখন এই রকম অবস্থা তখন কীভাবে ওদের সঙ্গে মঞ্জুর সম্পর্ক আর যোগাযোগ হলো ? সম্পর্ক যে হয়েছে সেটা তো সে নিজের চোখেই দেখলো। তা না হলে মঞ্জু একজন পার্টি মেম্বারের চিকিৎসা করানোর জন্য কেন তার কাছে ছুটে আসবে!

আরও আশ্চর্য কাণ্ড, যে-মঞ্জু বলতে গেলে তাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিলো পার্টির একজন কমরেডের চিকিৎসার জন্য, সেই মঞ্জু একেবারে নির্বিকার। যার চিকিৎসার জন্য এতো দুশ্চিন্তা আর দৌড়াদৌড়ি, সেই মানুষটা মরলো না বাঁচলো সে ব্যাপারে কিছুই জানতে চায় না ? রঞ্জুর রীতিমতো খটকা লাগে। মঞ্জু কি অমন স্বভাবের ছেলে? একদিন সে জিজ্ঞেসও করেছিলো, হামিদের সঙ্গে দেখা হয় কি না, তো সেদিন রঞ্জু পাশ কাটিয়ে যায়– এলোমেলো দু'একটা কথা বলে তাড়াতাড়ি কেটে পড়ে। ঐদিনই তার সন্দেহটা গাঢ়তর হয়, সে মনে মনে ঠিক করে, সে মঞ্জুকে সরাসরি জিজ্ঞেস করবে, সর্বহারা পার্টির সঙ্গে তার সম্পর্কটা আসলে কতোখানি আর কী ধরনের।

কিন্তু তার আগেই মাসুমরা উধাও হয়ে গেলো। সে একদিন মাসুমকে দেখতে নাজিমউদ্দিন রোডের বস্তিতে গেলে দেখে, ঘরের দরজায় মস্ত একটা তালা ঝুলছে। পাশের ঘরের লোককে জিজ্ঞেস করলে সে লোক কোনো হদিসই দিতে পারে না। মাসুমদের ঐ উধাও হয়ে যাবার ঘটনাটা তাকে বেশ চিন্তায় ফেলে দেয়। কেননা তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

আগের দিন সে মাসুমের বন্ধু আবিদের মুখে শুনেছিলো যে, মাসুম সম্পূর্ণ সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত ঐ বাসাতেই থাকবে। সে এও জানায় যে বাসাটা তারা পার্টির কাজের সুবিধার জন্য ভাড়া করে রেখে দেবে। কারণ, নাজিমউদ্দিন রোড এলাকাটা নাকি শেলটার হিসাবে যথেষ্ট নিরাপদ। মঞ্জুর ব্যাপার সেদিন ও নিজের থেকেই জানিয়েছিলো যে ওকে এখনও পার্টির মেম্বারশিপ দেয়া হয় নি। তবে ভবিষ্যতে হয়তো দেয়া হবে। আপাতত হামিদের সঙ্গে বন্ধুত্বের সুবাদে যেটুকু দেখা যায়, পার্টির সঙ্গেও তার অতোটুকুই সম্পর্ক।

কিন্তু এখনও, ওদের সঙ্গে দেখা না হওয়ায় তার মনে হচ্ছে, আবিদ সত্যি কথা বলে নি। তার সন্দেহ হচ্ছে মঞ্জু সর্বহারা পার্টির সঙ্গে নিজেকে ভালো রকমই জড়িয়ে ফেলেছে। না হলে সাবসিডিয়ারী পরীক্ষা দিতে সে কেন চায় না। কেন বলে যে তার পরীক্ষার প্রিপারেশন হয় নি। আসলে কি এতোদিন সে লেখাপড়া বাদ দিয়ে পার্টির কাজ করে বেড়িয়েছে।

সে লক্ষ্য রাখে আর তাতে মনে হয়, বাড়ির সঙ্গে মঞ্জুর সম্পর্ক যেন ক্রমেই শিথিল হয়ে পড়েছে। রোজ সকালে বেরিয়ে যায়। দুপুরে কোনোদিন ফেরে, কোনোদিন ফেরে না। যেদিন ফেরে, সেদিন বিকালের দিকে বেরিয়ে ফেরে একেবারে রাতে। একেকদিন ফিরতে রাত এগারোটা/বারোটা বেজে যায়।

রঞ্জু একদিন কথাটা মায়ের কাছে তুললো। তো দেখে, মা তার কথা শুনে কোনো রকম পাত্তাই দিতে চান না। বলেন, ও তো বরাবরই একটু খেয়ালি টাইপের, তুই তো জানিস, জানিস না? বোধহয় কোনো বন্ধুর সঙ্গে পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত থাকে।

কিন্তু ও যে বলে সাবসিডিয়ারি পরীক্ষা দেবে না? রঞ্জু শেষ পর্যন্ত কথাটা না তুলে পারে না। বলে, ওর নাকি ভালো প্রিপারেশন হয় নি– পড়াশোনাই যদি করবে, তাহলে সে পরীক্ষা না দেয়ার কথা বলে কেন?

ছেলের মুখে অমন কথা শোনার পরেও বীথি গায়ে মাখে না। বলে, ও তো এখন বড় হয়েছে, ওর ব্যাপারে কি খবরদারি করা ঠিক?

ঐ কথার পর রঞ্জুর মুখ দিয়ে সর্বহারা পার্টির কথাটা বেরিয়ে যাচ্ছিলো, শেষ মুহূর্তে সে নিজেকে সামলে নেয়। কারণ জানে, কথাটা বললে মা সেটা আব্বার কানে তুলবেন আর তাতে আব্বা অস্থির হয়ে শরীর খারাপ করে বসবেন– দুশ্চিন্তা আর উদ্বেগে পড়ে ফের যদি হাসপাতালে যেতে হয় তাঁকে, তাহলে ঝামেলার অন্ত থাকবে না। শেষে একদিন রাতে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে সে মঞ্জুকে নিজের ঘরে ডেকে এনে বসায়। তারপর জিজ্ঞেস করে, সারাদিন কোথায় থাকিস? তো মঞ্জু একটুও না ঘাবড়ে সোজাসুজি জানায়, আর কোথায় থাকবো? লাইব্রেরিতে থাকি।

দুপুরে খাস কোথায়?

কেন, বাসায়! যেদিন বাসায় ফিরতে পারি না, সেদিন ক্যান্টিনে।

ফিরতে রাত হয় কেন?

বাহ সামনে পরীক্ষা। পড়তে হবে না? আমার বন্ধু ফারুকের বাসায় যাই– ওখানেই পড়াশোনা করি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ভাই সোজাসুজি প্রশ্নের জবাব দিলেও রঞ্জুর মনে সন্দেহ বাড়ে বই কমে না। তার মনে হয় না, মঞ্জু তার কাছে সত্যি কথা বলছে। কিন্তু ভাইকে কীভাবে বোঝাবে, আর কী বললে সে সত্যি কথা বলবে, তাও সে ভেবে পায় না।

এদিকে মঞ্জু মুখোমুখি বসে থাকলে কী হবে, তার চোখ নিচের দিকে নজর ফেলে রাখে। কারণ সে জানে, বড় ভাই আজ সহজে ছাড়বে না, কারণ ওর স্বভাবটাই কিছুটা একগুঁয়ে, শেষ পর্যন্ত না দেখে ছাড়তে চায় না। তার আরও একটা দোষ সে আবিষ্কার করেছে। আর সেটা হলো, অন্যের ব্যাপারে সে বেশি বেশি নাক গলায়। তার অনুমান হয়, ভাইয়া মাসুম আর আবিদের খবর জানতে চাইবে। কারণ কিছুদিন ধরে আবিদের সঙ্গে নাকি ওর বেশ ঘনিষ্ঠতা হয়েছে। যদি জানতে চায়, কেন ওরা নেই, কিংবা কোথায় গেছে ? তাহলে কি সে তার প্রশ্নের জবাব দিতে পারবে ? বলতে পারবে কি যে শত্রুপক্ষের নজরে পড়ে যাওয়ার জন্য ওদের সরে যেতে হয়েছে। যদি বলে, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তো প্রশ্ন করবে, শত্রুপক্ষটা কে ? আর কোথায় গেছে, সে প্রশ্নের উত্তর তো তার এমনিতেই জানা নেই, তাকে কেউ বললে তবে না সে জানবে। অবশ্যি তার জানতে খুব বেশি দেরি হবে না, হামিদের সঙ্গে দেখা হলেই সে জানতে পারবে, পার্টির নতুন শেলটার এখন কোথায় হয়েছে। তবে হামিদ কবে ফিরবে তারও তো কোনো ঠিক নেই, যাবার সময় শুধু এইটুকু জানিয়ে গেছে যে, সে বোধহয় এবার পরীক্ষা দিতে পারবে না। পার্টির সমসার চাইতে তার বাড়ির দিককার সমস্যাও নাকি জটিল হয়ে উঠেছে।

আর অন্য যে তিনটি ছেলেকে নিয়ে তাদের এখনকার গ্রুপটা তৈরি, তারা এখন জিঞ্জিরায় মেস করে থাকে। ওখানেই আলাপ-টালাপ মিটিং-বৈঠক যা হবার হয়। ওদের মধ্যে কামরুল হাজারীবাগে চামড়ার ফ্যাক্টরিতে কাজ করে আর রাতের বেলায় শেখ বোরহানুদ্দিন কলেজে আইকম পড়ে। ফয়েজ তার মতো শুধুই ছাত্র আর অনিমেষ বিএ ফেল করে প্রাইভেট টিউশনি করে জিঞ্জিরা এলাকাতেই। হামিদের কাছে শুনেছে, এক সময় ঢাকা শহরে নাকি সর্বহারা পার্টির অনেক গ্রুপ কাজ করতো। কমরেড সিরাজ শিকদার বেঁচে থাকতে মুজিব বাহিনীর দাপট সর্বহারা পার্টি রুখে দিয়েছিলো। ৭৫ এর পর তো শুধু ভাঙন আর ভাঙন। হামিদই তাকে শোনার পূর্ববাংলা কমিউনিস্ট পার্টি, বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টি, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি, এমএল এসব বিপ্লবীপার্টির কথা। দেশের রাজনীতিতে ক্ষমতার ভাগাভাগি নিয়ে কুকুরের মতো কামড়া কামড়ি যারা করে তাদের ওপর মানুষের যে একেবারেই আস্থা নেই সে কথা বলতে বলতে হামিদ এও বলে যে, যদি কোন বিপ্লবী শক্তি ওপরে উঠে আসতে পারে, তাহলে জনগণ তাদের পক্ষে চলে আসবে। মুৎসুদ্দি পুঁজির সেবাদাস, সাম্রাজ্যবাদের পা-চাটা কুকুর আর লুটেরা শোষকদের শেষ ঘণ্টা বাজতে আর দেরি নেই, আধিপত্যবাদেরও এ দেশে জায়গা হবে না। সমাজে গুণ্ডামি, মস্তানি, চাঁদাবাজি, ধর্ষণ– এসবই হচ্ছে ঐ লুটেরা শোষকদের রাজনীতির কারণে।

হামিদ আজকাল এই ধরনের কথা বলে। যখন বলে, তখন মনে হয় যেন বক্তৃতা দিচ্ছে। এই একই ধরনের কথা সে মাসুমের কাছেও শুনেছে, এমনকি কামরুলও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

আজকাল এসব কথা বলছে। এদিকে সে নিজেও বা কম কি ? তারও মুখ দিয়ে আজকাল এমন কথা বেরিয়ে পড়ে। ইউনিভার্সিটির কার্জন হল এলাকায় যেদিন ছাত্রলীগের ছেলেদের ওপরে পিস্তলের গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে হামলা করল ছাত্রসমাজের ক্যাডাররা। সেদিন তো সে ক্লাস রুমের বাইরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছোটখাটো একটা বক্তৃতাই দিয়ে ফেললো। বললো, এদের দিন শেষ হয়ে এসেছে। জনগণ জেগে উঠতে আর দেরি নেই– এবার দেখবেন, খুব শিগ্‌গীর এরা নেংটি ইঁদুরের মতো গর্তে লুকাবে।

রাখিকে দেয়ার জন্য সে একখানা চিঠি তিমলির হাতে দিয়েছে। তাতে ঐ কথাই সে লিখেছে যে খুব শিগ্‌গীর রাখিকে ঢাকায় ফিরিয়ে আনবে, রাখি যেন তৈরি হয়ে থাকে।

এদিকে ছাত্রদের সমাবেশ হলেই সে মনে মনে আবু সাবু এই দুই মাস্তান ভাইকে মনে মনে খোঁজে। হঠাৎ হঠাৎ একেকদিন দেখতে পায়। তবে বেশিরভাগ দিনই তার খোঁজাখুঁজি সার হয়। ওদের দেখিয়ে সে হামিদের কাছে একটা পিস্তল চেয়েছিলো। হামিদ দেয়নি। বলেছিলো ও কাজ তোমার নয়, যারা করার তারা ঠিক সময়েই কাজটা করবে।

বড় ভাই রঞ্জুকে সে শেষ পর্যন্ত কিছুই খুলে বলতে পারে না। তার অনুমান বড় রকমের যে গোলমালটা আরম্ভ হবে, তাতে শহরগুলোর কোনো কিছুই স্বাভাবিক থাকবে না। পরীক্ষা-টরিক্ষা লেখাপড়া ব্যবসা-বাণিজ্য সবকিছু শিকেয় ঝুলবে কিছুদিন। যারা অনার্স ক্লাসে ভর্তি হয়েছে তাদের কতোবছর যে লাগবে পাস করে বেরুতে তা কেউ বলতে পারে না। এমনিতেই কয়েক সেশনের ছেলেমেয়েদের পরীক্ষা আটকে গেছে। তার ওপর সরকারকে ফেলে দেয়ার যে আন্দোলন শুরু হয়েছে তার শেষ কোথায় তা কেউ জানে না। এরশাদ সরকারের পতন হলেও যে আন্দোলন থেমে যাবে এমন কথা নিশ্চিতভাবে কেউই বলতে পারে না। একবার মনে হয়, সরকার পতনের এই আন্দোলনই শেষ আন্দোলন। আবার মনে হয়, এ তো সবে শুরু পরে যে কী হবে কেউ জানে না। গতবছর মনে হচ্ছিলো ৭ দল আর ৮ দলের দুই জোট বোধহয় একে অন্যের পিছনে চিরকালের জন্য লেগে থাকবে। গত বছর নূর হোসেন পুলিশের গুলিতে মারা যাওয়ার পর ঢাকা অবরোধের যে ডাক দেয়া হয়েছিলো, তা পুরোপুরি সফল হয় নি। এবার কিন্তু দেখা গেল হাসিনা আর খালেদা দু'জনে মিলে একসঙ্গে কর্মসূচী দিচ্ছেন আর সেই কর্মসূচী পালনও করা হচ্ছে।

তাদের কর্মসূচী অনুযায়ী একই দিনে দু'দুটো বড় সমাবেশও হয়ে গেল। ৭ দল করলো গুলিস্তানে আর ৮ দল করলো বঙ্গবন্ধু এ্যাভিনিউতে আওয়ামী লীগ অফিসের সামনে। মঞ্জু প্রথমে কিছুটা সময় ৭ দলের, পরে বাকিটা সময় ৮ দলের নেতাদের বক্তৃতা শুনেছে। কোন দলের কথাই তার শেষ পর্যন্ত ভালো লাগেনি। মনে হচ্ছিলো যা বলছে সব সাজানো কথা। সবই মানুষের মনকে ভোলানোর জন্য বলা। বলা যায়, বিরক্ত হয়েই সে বাসায় ফিরে এসেছে। একই কথা বারবার মানুষ কতো শুনবে ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ফেরদৌসদের কেন মারা হয়, রাখিদের কেন রেপ করা হয়, কারা করে, সে ব্যাপারে কোনো দলের কোনোরকম কথা নেই। দু'দলের মুখেই এক বুলি, গণতন্ত্র আর গণতন্ত্র। তার জানতে ইচ্ছা করে, কেন বাপু, তোরা গণতন্ত্র করিস আবার তোরাই কেন গণতন্ত্র ভেঙে ফেলিস? মানুষের কাছে দফায় দফায় কখনও গণতন্ত্র আসে আবার কখনও সামরিকতন্ত্র আসে। দুই জোটের কথাবার্তা তার পছন্দ হয় না বটে, কিন্তু এটা ঠিকই বুঝতে পারে যে, এরশাদ সরকারকে ফেলে দেয়ার আন্দোলন এবার সত্যি সত্যি শুরু হতে চলেছে। অন্তত, ছাত্রদের মিছিল দেখে তার তাই মনে হয়। ঠিক কবে এরশাদ গদি থেকে নামবে তা বোঝা না গেলেও এটা ঠিকই বোঝা যাচ্ছে যে এরশাদের বিদায় না নিয়ে উপায় নেই, ছ'মাস পরে হোক, কি এক বছর পর, এরশাদকে চলে যেতে হবে। ওরই মধ্যে একদিন দৈনিক সংবাদে পুলিশের দেয়া এক খবর বেরুলো যে, সর্বহারা পার্টির কাজকর্ম দেশ জুড়ে বেশ জোরেশোরেই চলছে। তাদের পুরনো ঘাঁটি বরিশাল, ফরিদপুর, কুষ্টিয়া, যশোর, পাবনা, বগুড়া অঞ্চলে তো বটেই। এমনকি রাজধানী ঢাকার কাছাকাছি এলাকা যেমন, নরসিংদী, বেলাব, গাজীপুর, মানিকগঞ্জের মতো জায়গাগুলোতেও নাকি সর্বহারা পার্টির লোকেরা ছড়িয়ে পড়েছে এবং তাদের পার্টির কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে। খবরটা খুব মনোযোগ দিয়ে পড়ে মঞ্জু। তার অনুমান হয়, পার্টির কাজকর্ম জোরেশোরে শুরু হওয়ার কারণেই মাসুম আর আবিদ কোনো নিরাপদ জায়গায় ঠাঁই নিয়েছে। আর হানিফও সেই একই কারণে ইউনির্ভার্সিটিতে আসা বাদ দিয়েছে, সম্ভবত তার সাবসিডিয়ারি পরীক্ষা না দিতে চাওয়ার এটাই আসল কারণ। মঞ্জু নিজের মধ্যে বেশ অস্থিরতা বোধ করে। যদি মানিকগঞ্জ, নরসিংদী, বেলাব গাজীপুর এলাকায় অর্থাৎ রাজধানীর উত্তর-পূর্বে-পশ্চিমে সর্বহারা পার্টি তৎপর হয়ে ওঠে, তাহলে দক্ষিণ দিকটা কি বাদ থাকবে? এক সময় তো দক্ষিণেও সর্বহারা পার্টির ঘাঁটি ছিলো। যদি দক্ষিণেও সর্বহারা পার্টির কাজকর্ম বেড়ে যায়, তাহলে আর বাকি থাকে কী? সর্বহারাদের বিপ্লব কি তাহলে আসন্ন?

উনিশ/কুড়ি বছরের ইউনির্ভার্সিটি ছাত্র মাহিব রায়হানের মনের ভিতরে বিপ্লবের স্বপ্ন দোল খেতে আরম্ভ করে। তখন কে তাকে বোঝাবে যে পুলিশের দেয়া ঐ খবর সর্বহারা পার্টির ওপরে হামলা চালাবার খবর চাপা দেয়ার জন্যই ছাপানো হয়েছে। সে তখন স্বপ্ন দেখছে। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে নেতৃত্ব চলে গেছে বিপ্লবীদের হাতে, শহরাঞ্চল ওদের হাতে যাওয়াটা এখন শুধুই সময়ের ব্যাপার। মঞ্জু হিসাব করে, কতোদিনে ঘটতে পারে এমন ঘটনা। খুব কি দেরি হবে? খবরের কাগজে তো দেখছে বার্মায় টালমাটাল কাণ্ড শুরু হয়ে গেছে। ছোট্ট দেশ মালদ্বীপ সেখানেও শুরু হয়েছে বিদ্রোহ আর বিপ্লব, পাশের দেশ নেপালেও বুর্জোয়া নেতৃত্বের দশা বেজায় কাহিল।

মঞ্জু লাইব্রেরি থেকে বাইরে বেরিয়ে পড়ে একেকদিন। রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে মিছিল দেখে। আজকাল ইউনির্ভার্সিটি এলাকায় প্রায় রোজই মিছিল বের হয়। একদিন আবু সাবু দুই ভাইকেই দেখলো ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ব্যানার হাতে নিয়ে মিছিল করছে। তার মনে পড়ে, অল্প কিছুদিন আগেও ওরা ছাত্রদলের সঙ্গে মিছিল করতো। তার মনে পড়ে, অল্প কিছুদিন আগেও ওরা ছাত্রদলের সঙ্গে মিছিল করতো। দৃশ্যটা দেখে তার খারাপ লাগে। এসব গুণ্ডা আর মাস্তানরা যদি আন্দোলনের সামনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

সারিতে থাকে, তাহলে সেই আন্দোলনের ফল ভাল কীভাবে হবে ? সে মনের ভিতর থেকে ঐ প্রশ্নের জবাব পায় না।

ঐ রকম সময়ে টিএসসি'র মোড়ে হঠাৎ একদিন তিমলির সঙ্গে দেখা। সে-ই তাকে ডাকে। কাছে গিয়ে মুখোমুখি দাঁড়ালে বলে, আমি তোমাকে কয়েক দিন ধরে খুঁজে খুঁজে হয়রান। কিন্তু কোনো পাত্তা পাই না, তোমার ক্লাসের ছেলেমেয়েরাও তোমার খোঁজ দিতে পারে না, কোথায় থাকো তুমি ? মঞ্জু তিমলির গলার স্বরে অন্তরঙ্গতার ছোঁয়া টের পায়। বলে, আমি আবার কোথায় থাকবো, এদিকেই থাকি–

তার কথা শেষ হয় না, তার আগেই তিমলি বাচ্চা মেয়ের মতো ভেংচি কেটে বলে, থাকি তো এদিকেই, শয়তান কোথাকার ?

মঞ্জুর ধাঁধা লেগে যায়। তিমলি এমন অন্তরঙ্গ কবে থেকে হলো ? সে স্মরণ করতে পারে না। তিমলি জিজ্ঞেস করে, রাখির চিঠি পেয়েছো ? মঞ্জু অবাক হয়। বলে, না তো।

যদি না পেয়ে থাকো তা হলে শিগ্‌গিরই পাবে, তিমলি জানায়। তারপর, বলে, ওখানে ও ভালো নেই, সব সময় নাকি আমাদের কথা ওর মনে পড়ে– ওখানে তো ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হতে পারে নি। বছর নষ্ট যাতে না হয় সে জন্যে মফস্বলের এক কলেজে ভর্তি হয়েছে– তাতে ওর ভালো না লাগারই কথা। ওর চিঠি পড়ে মনে হলো, ও ঢাকায় ফিরে আসার কথা ভাবছে।

সে কি! মঞ্জুর বিশ্বাস হতে চায় না। কিন্তু মুখে সে কিছু বলেও না। তিমলি চোখে চোখ রেখে হাসে। বলে ও এলে তুমি খুশি হও, তাই না?

মঞ্জু নিজের মনের দিকে তাকায়, আসলেই কি সে খুশি হয় ? দু'দিন আগে মিছিলে দেখা আবু সাবুর চেহারা সে মনের ভিতরে দেখতে পায়। আর একই সঙ্গে রাখিকে তুলে নিয়ে যাওয়ার ঘটনাটা তার মনে পড়ে। আর তাতে মনের ভিতরে কিছু যেন এসে বিঁধে যায়। নিজেকে তার ভীরু আর কাপুরুষ মনে হয়ে। সেদিন সেই মুহূর্তে না হয় সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলো। কিন্তু তারপর ? তারপর তো সে কিছু করে নি। যদি সে ভীরু আর কাপুরুষ না হয়, তাহলে ভীরু কাপুরুষ আর কে ?

সে বলে, না তিমলি, ওর এখানে ফিরে আসা ঠিক নয়। ওকে তুমি ফিরে আসতে বারণ করে দিও।

দু'জনে হাঁটতে হাঁটতে লাইব্রেরির দিকে এগোয়। যেতে যেতে তিমলি বলে, আমার কিন্তু বারণ করতে ইচ্ছা করে না।

বাহ কেন ? মঞ্জু দাঁড়িয়ে পড়ে।

মানুষ কি শুধুই পালাবে ? তিমলি প্রশ্ন করে। তারপর একটু থেমে ফের বলে, গুণ্ডা বদমাশদের ভয়ে মানুষ লুকিয়ে থাকবে, না হয় পালাবে, এভাবে কতোদিন চলতে পারে, বলো ?

তিমলি ফের বলে, রাখির না হয় পালাবার জায়গা আছে, কিন্তু আমার বেলাতে কী হবে ? আমি কোথায় পালাবো, বলতে পারো ? মঞ্জু তিমলির প্রশ্নের জবাব দিতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

পারে না। তিমলি ফের বলে, এতো যে আন্দোলন হচ্ছে। মেয়েদের ওপর হামলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে কেউ ? শুনেছো তুমি ?

তিমলি এ ধরনের কথা আগে কখনও বলে নি। মঞ্জুর বরাবরই মনে হয়েছে। ও ছেলেমানুষিতে ভর্তি আদুরে হালকা স্বভাবের মেয়ে। তার মুখে অমন সিরিয়াস কথা শুনে মঞ্জুর অবাক লাগে। কিন্তু তবু সে মন দিয়ে শোনে।

ফের তিমলি বলে, আমি রাখির চিঠির জবাব দিয়েছি। কিন্তু ওর ফিরে আসার ব্যাপারে কিছু লিখি নি। হ্যাঁও না, নাও না। ভেবেছিলাম তোমার সঙ্গে কথা বলে তারপর জানাবো। কিন্তু তোমার সঙ্গে দেখাই হয় না।

লাইব্রেরির লনে পৌঁছে তিমলি মুখোমুখি দাঁড়ায়। তারপর মুখোমুখি তাকিয়ে বলে, একটা কথা স্পষ্ট করে বলবে ?

মঞ্জু ম্লান হাসে। বলে, বলো, কী বলবো

তুমি কি রাখিকে ভালোবাসো ?

মঞ্জু ফের হাসে। বলে, এই প্রশ্ন করার আর সময় পেলে না।

পাশ কাটালে চলবে না, সত্যি করে বলো। তিমলি রীতিমতো দাবি জানায়।

হ্যাঁ বাসি, মঞ্জু জানায়। তারপর প্রশ্ন করে, কিন্তু তাতে কী হবে।

তুমি ওকে বিয়ে করতে পারো না ?

মঞ্জু চমকে ওঠে। এ কি বলছে তিমলি। সে মাথা নিচু করে রাখে। বলে, আমি পাগল, না তুমি পাগল ?

বাহ এতে পাগলামির কী দেখলে, তিমলি যেন বুঝতে পারে না।

পাগলামি না, বলো ? বিয়ের জন্য বয়স লাগে না ? রোজগার লাগে না ? সংসার পাততে হয় না ?

কেন, তোমার বয়স হয় নি ?

মঞ্জু মাথা নাড়ায়। বলে, এখনও দু'বছর বাকি।

ঠিক আছে, তিমলি বলে, রাখিকে ঐ কথাই লিখবে। ও যেন দু'বছর পর ঢাকায় ফেরে।

কিন্তু তখনই বা কী লাভ হবে।

কেন, তুমি ওকে বিয়ে করবে ?

বাহ্ তখন কি আমি সংসার পাততে পারবো ? আমার লেখাপড়া কি শেষ হবে ?

লেখাপড়া শেষ করার কথা কেন ভাবছো ?

তা না হলে চাকরি পাবো ?

চাকরির সঙ্গেই বা কী সম্পর্ক তোমার বিয়ের।

চাকরি না পেলে রোজগার হবে কোত্থেকে ? খাবো কী ?

কেন, কাজ করবে ? তিমলি বলে রিকশা চালাবে, ডে লেবারার হবে। পিয়ন, চাপরাশি, যা পাওয়া যায় সেই কাজই করবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

মঞ্জু লক্ষ্য করে তিমলি যেন খানিক উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। তখন সে ফের মুখোমুখি তাকায়, তারপর জিজ্ঞেস করে, রাখি কি রিকশাঅলার বউ হতে চাইবে? বলো চাইবে?

তিমলি মঞ্জুর কথা শুনে মাথা উঁচু করে ডাইনে বাঁয়ে তাকিয়ে নেয় একবার। তারপর বলে, যদি রিকশাঅলার বউ হবার জন্য তৈরি সে না থাকে, তাহলে বুঝবো ও তোমাকে ভালোবাসে নি, আর তুমি যদি রিকশাঅলা হতে না চাও, তাহলে বুঝবো, তোমার ভালোবাসাও কথার কথা। বাজে রকমের একটা ফাতরামি। বুঝেছো? নাথিং বাট এ রিয়েল আন এ্যাডলটেরেটেড ফ্লার্ট– ইট জাস্ট কামস ডাউন টু দ্যাট ওনলি।

মঞ্জুকে হতভম্ব করে দেয় তিমলির ঐ উত্তেজিত কথাবার্তা। সে কিছু বলার আগেই তিমলি বিদায় নেয়। বলে, আমি চললাম।

রাখিকে তুমি ফিরে আসতে নিষেধ করে দিও, মঞ্জু পেছন থেকে বলে।

দু'দিন পর একজন বুড়োমতো ভদ্রলোককে ডিপার্টমেন্টের সামনে মঞ্জু দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে। ভদ্রলোক বোধহয় স্যারদের মধ্যে কারুর সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন। পিয়ন আইয়ুব আলী ভেতরে ঢুকতে দেয় নি। ভদ্রলোক তবু দরজার মুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন। মঞ্জু ব্যাপারটা দূর থেকেই লক্ষ্য করছিলো। দু'টি ছাত্রকে দেখে তাদের দিকে ভদ্রলোক এগিয়ে গিয়ে কিছু যেন বললেন। তাতে ছাত্র দু'টি ভদ্রলোককে এড়িয়ে গেলে তিনি বেশ অসহায়ের মতো ডাইনে বাঁয়ে তাকাতে আরম্ভ করেন।

খানিক পর ডিপার্টমেন্টের সিনিয়র টিচার ডঃ আজিজ ডিপার্টমেন্টে ঢুকবার মুখে অমন এক বয়স্ক লোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখেন কিছুক্ষণ। অনুমান করতে অসুবিধা হয় না যে, উনি আগন্তুক ভদ্রলোককে চিনতে চেষ্টা করছেন। চিনতে না পেরে দরজার দিকে পা বাড়িয়েছেন, ঐ মুহূর্তে আগন্তুক ভদ্রলোক ফের ডাক দিলে ডঃ আজিজ ঘুরে দাঁড়ান। তখন বুড়ো ভদ্রলোক কী যেন বলেন। তাতে ডঃ আজিজ খানিক যেন বিরক্তিবোধ করেন। মঞ্জু ততোক্ষণে কাছ এসে গিয়েছিলো এবং ডঃ আজিজের কথা সে দিব্যি শুনতে পায়। ডঃ আজিজ বলছিলেন, আমরা কী করতে পারি, বলুন, আপনি থানায় যান। থানার লোকেরাই ও ব্যাপারে যা করার করবে। এখানে আপনার বিপদের কথা বললে কে শুনবে বলুন? কথাটা বলেই মুখ ঘুরিয়ে ডঃ আজিজ ভেতরে চলে যান।

মঞ্জু ততোক্ষণে কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিলো। ডঃ আজিজের সব কথাই তার কানে যায়। ভদ্রলোককে অসহায় হয়ে ডাইনে বাঁয়ে তাকাতে দেখে সে সামনে না গিয়ে পারে না। শুধু সে নয়, আরও একটি ছেলে বোধহয় ভদ্রলোকের অসহায় অবস্থাটা দেখছিলো, সেও এগিয়ে আসে।

ভদ্রলোক নিজের পরিচয় দিলেন। খিলগাঁও প্রাইমারি স্কুলে মাস্টারি করেন। তাঁর মেয়ে খিলগাঁও কলেজের সেকেন্ড ইয়ারে পড়ে। ইউনিভার্সিটির জিওগ্রাফি ডিপার্টমেন্টের ছাত্র হাবিবকে তাঁর দরকার। ওর ব্যাপারেই তিনি ডিপার্টমেন্টের হেড-এর সঙ্গে কথা বলবেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

কী ব্যাপারে কথা বলবেন, সেটা আর ভদ্রলোক বলেন না।

কোন হাবিবের কথা বলছেন ভদ্রলোক, মঞ্জু বুঝতে পারে না। এক হাবিবুল্লাহ তো গত বছরই পাস করে বেরিয়ে গেছেন, হাবিব নামে আর কে আছে ডিপার্টমেন্টে সে মনে মনে খুঁজে পায় না। ভদ্রলোককে দেখে তার মায়া লাগছিলো। আবার, কেন দেখা করবেন চেয়ারম্যানের সঙ্গে, সেটা খুলে না বলার জন্য বিরক্তিও লাগছিলো। সে এক সময় ঠিক করে, আর সময় নষ্ট করার মানে হয় না, সে এবার চলে যাবে। আর সেই সময়ই অন্য ছেলেটি বলে ওঠে, আপনি কি হাবিবউল আলমের কথা বলছেন? আপনার মেয়েকে পাচ্ছেন না, তাই না? না,

ভদ্রলোক বিভ্রান্ত চোখে ছেলেটির মুখের দিকে তাকান, বলেন, বাবা তুমি তো তাহলে ওকে চেনো– ওকে কোথায় পাওয়া যাবে। বলতে পারো?

ছেলেটি খানিক যেন বিরক্ত হয়। বলে? আপনি এখানে কেন এসেছেন? আপনার তো সোজাসুজি থানায় যাওয়া উচিত ছিলো।

ভদ্রলোক অসহায় আর হতাশ ভঙ্গিতে ডাইনে বাঁয়ে তাকান। বলেন, থানায় গিয়ে কী হবে, বলো? মেয়েকে তো ওরা রাতেই বাড়ির সামনে নামিয়ে দিয়ে গেছে। আমি হাবিবের সাথে কথা বলতে চাই, ওর টিচারদের সঙ্গে কথা বলতে চাই। ওর বাবা মায়ের সঙ্গে কথা বলতে চাই। ওরা বলুক, হাবিব নিজে বলুক, আমার মেয়ে বেঁচে থাকবে, না মরে যাবে– যদি হাবিব ঐ-মেয়েকে বিয়ে না করে, তাহলে ঐ মেয়ে কীভাবে বাঁচবে, তোমরাই বলো? কোনো ঘটনার খবরই তো শেষ পর্যন্ত গোপন থাকে না, বলো, থাকে? আমার মেয়ে কি আর কলেজে যেতে পারবে? কোনো আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে তার জায়গা হবে? ওকে কেউ বিয়ে করবে? বলো, আমি কি খিলগাঁও এলাকায় স্বাভাবিক জীবনাপন করতে পারবো? আর স্কুলের চাকরিই বা করবো কীভাবে? সবাই তো আমার দিকে আঙুল তুলে দেখাবে– বলবে, ঐ যে নষ্ট মেয়ের বাপ যাচ্ছে।

ভদ্রলোক সামনের দিকে শূন্য দৃষ্টি মেলে দু'টি অচেনা তরুণের সামনে দাঁড়িয়ে নিজের কথা একের পর এক বলে যেতে থাকেন। তাঁর গলায় হাহাকার নেই, আবেগ নেই, হতাশা নেই। যন্ত্রের মুখ দিয়ে বেরুবার মতো তাঁর মুখ দিয়ে কথাগুলো বেরিয়ে আসে।

তাঁর কথা শেষ হবার আগেই মঞ্জু মুখোমুখি দাঁড়ানো ছেলেটির মুখের দিকে তাকিয়ে চিনতে চেষ্টা করে। ছেলেটি তার তাকানোর ভঙ্গি দেখে কী বোঝে, সেই জানে। সে বলে, হাবিবউল আলম এ বছরই ভর্তি হয়েছে। কমলাপুর বাসাবো এলাকার ছেলে। সরকারী দলের ক্যাডার। ওকে গ্রামের কলেজ থেকে পাস করিয়ে এনে ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি করানো হয়েছে।

মঞ্জু তবু হাবিবকে চিনতে পারে না। ছেলেটি আরও খবর জানায়। বলে, কয়েক মাস আগে বেইলি রোড এলাকায় আমাদের ডিপার্টমেন্টেরই একটি মেয়েকে তুলে নিয়ে গিয়েছিলো আবু আর সাবু, আপনার মনে আছে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

মঞ্জু লক্ষ্য করে তিমলি যেন খানিক উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। তখন সে ফের মুখোমুখি তাকায়, তারপর জিজ্ঞেস করে, রাখি কি রিকশাঅলার বউ হতে চাইবে ? বলো চাইবে ?

তিমলি মঞ্জুর কথা শুনে মাথা উঁচু করে ডাইনে বাঁয়ে তাকিয়ে নেয় একবার। তারপর বলে, যদি রিকশাঅলার বউ হবার জন্য তৈরি সে না থাকে, তাহলে বুঝবো ও তোমাকে ভালোবাসে নি, আর তুমি যদি রিকশাঅলা হতে না চাও, তাহলে বুঝবো, তোমার ভালোবাসাও কথার কথা। বাজে রকমের একটা ফাতরামি। বুঝেছো ? নাথিং বাট এ রিয়েল আন এ্যাডলটেরেটেড ফ্লার্ট– ইট জাস্ট কামস ডাউন টু দ্যাট ওনলি।

মঞ্জুকে হতভম্ব করে দেয় তিমলির ঐ উত্তেজিত কথাবার্তা। সে কিছু বলার আগেই তিমলি বিদায় নেয়। বলে, আমি চললাম।

রাখিকে তুমি ফিরে আসতে নিষেধ করে দিও, মঞ্জু পেছন থেকে বলে।

দু'দিন পর একজন বুড়োমতো ভদ্রলোককে ডিপার্টমেন্টের সামনে মঞ্জু দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে। ভদ্রলোক বোধহয় স্যারদের মধ্যে কারুর সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন। পিয়ন আইয়ুব আলী ভেতরে ঢুকতে দেয় নি। ভদ্রলোক তবু দরজার মুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন। মঞ্জু ব্যাপারটা দূর থেকেই লক্ষ্য করছিলো। দু'টি ছাত্রকে দেখে তাদের দিকে ভদ্রলোক এগিয়ে গিয়ে কিছু যেন বললেন। তাতে ছাত্র দু'টি ভদ্রলোককে এড়িয়ে গেলে তিনি বেশ অসহায়ের মতো ডাইনে বাঁয়ে তাকাতে আরম্ভ করেন।

খানিক পর ডিপার্টমেন্টের সিনিয়র টিচার ডঃ আজিজ ডিপার্টমেন্টে ঢুকবার মুখে অমন এক বয়স্ক লোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখেন কিছুক্ষণ। অনুমান করতে অসুবিধা হয় না যে, উনি আগন্তুক ভদ্রলোককে চিনতে চেষ্টা করছেন। চিনতে না পেরে দরজার দিকে পা বাড়িয়েছেন, ঐ মুহূর্তে আগন্তুক ভদ্রলোক ফের ডাক দিলে ডঃ আজিজ ঘুরে দাঁড়ান। তখন বুড়ো ভদ্রলোক কী যেন বলেন। তাতে ডঃ আজিজ খানিক যেন বিরক্তিবোধ করেন। মঞ্জু ততোক্ষণে কাছ এসে গিয়েছিলো এবং ডঃ আজিজের কথা সে দিব্যি শুনতে পায়। ডঃ আজিজ বলছিলেন, আমরা কী করতে পারি, বলুন, আপনি থানায় যান। থানার লোকেরাই ও ব্যাপারে যা করার করবে। এখানে আপনার বিপদের কথা বললে কে শুনবে বলুন ? কথাটা বলেই মুখ ঘুরিয়ে ডঃ আজিজ ভেতরে চলে যান।

মঞ্জু ততোক্ষণে কাছাকাছি পৌছে গিয়েছিলো। ডঃ আজিজের সব কথাই তার কানে যায়। ভদ্রলোককে অসহায় হয়ে ডাইনে বাঁয়ে তাকাতে দেখে সে সামনে না গিয়ে পারে না। শুধু সে নয়, আরও একটি ছেলে বোধহয় ভদ্রলোকের অসহায় অবস্থাটা দেখছিলো, সেও এগিয়ে আসে।

ভদ্রলোক নিজের পরিচয় দিলেন। খিলগাঁও প্রাইমারি স্কুলে মাস্টারি করেন। তাঁর মেয়ে খিলগাঁও কলেজের সেকেন্ড ইয়ারে পড়ে। ইউনিভার্সিটির জিওগ্রাফি ডিপার্টমেন্টের ছাত্র হাবিবকে তাঁর দরকার। ওর ব্যাপারেই তিনি ডিপার্টমেন্টের হেড-এর সঙ্গে কথা বলবেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

কী ব্যাপারে কথা বলবেন, সেটা আর ভদ্রলোক বলেন না।

কোন হাবিবের কথা বলছেন ভদ্রলোক, মঞ্জু বুঝতে পারে না। এক হাবিবুল্লাহ তো গত বছরই পাস করে বেরিয়ে গেছেন, হাবিব নামে আর কে আছে ডিপার্টমেন্টে সে মনে মনে খুঁজে পায় না। ভদ্রলোককে দেখে তার মায়া লাগছিলো। আবার, কেন দেখা করবেন চেয়ারম্যানের সঙ্গে, সেটা খুলে না বলার জন্য বিরক্তিও লাগছিলো। সে এক সময় ঠিক করে, আর সময় নষ্ট করার মানে হয় না, সে এবার চলে যাবে। আর সেই সময়ই অন্য ছেলেটি বলে ওঠে, আপনি কি হাবিবউল আলমের কথা বলছেন? আপনার মেয়েকে পাচ্ছেন না, তাই না? না,

ভদ্রলোক বিভ্রান্ত চোখে ছেলেটির মুখের দিকে তাকান, বলেন, বাবা তুমি তো তাহলে ওকে চেনো– ওকে কোথায় পাওয়া যাবে। বলতে পারো?

ছেলেটি খানিক যেন বিরক্ত হয়। বলে? আপনি এখানে কেন এসেছেন? আপনার তো সোজাসুজি থানায় যাওয়া উচিত ছিলো।

ভদ্রলোক অসহায় আর হতাশ ভঙ্গিতে ডাইনে বাঁয়ে তাকান। বলেন, থানায় গিয়ে কী হবে, বলো? মেয়েকে তো ওরা রাতেই বাড়ির সামনে নামিয়ে দিয়ে গেছে। আমি হাবিবের সাথে কথা বলতে চাই, ওর টিচারদের সঙ্গে কথা বলতে চাই। ওর বাবা মায়ের সঙ্গে কথা বলতে চাই। ওরা বলুক, হাবিব নিজে বলুক, আমার মেয়ে বেঁচে থাকবে, না মরে যাবে– যদি হাবিব ঐ-মেয়েকে বিয়ে না করে, তাহলে ঐ মেয়ে কীভাবে বাঁচবে, তোমরাই বলো? কোনো ঘটনার খবরই তো শেষ পর্যন্ত গোপন থাকে না, বলো, থাকে? আমার মেয়ে কি আর কলেজে যেতে পারবে? কোনো আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে তার জায়গা হবে? ওকে কেউ বিয়ে করবে? বলো, আমি কি খিলগাঁও এলাকায় স্বাভাবিক জীবনাপন করতে পারবো? আর স্কুলের চাকরিই বা করবো কীভাবে? সবাই তো আমার দিকে আঙুল তুলে দেখাবে– বলবে, ঐ যে নষ্ট মেয়ের বাপ যাচ্ছে।

ভদ্রলোক সামনের দিকে শূন্য দৃষ্টি মেলে দু'টি অচেনা তরুণের সামনে দাঁড়িয়ে নিজের কথা একের পর এক বলে যেতে থাকেন। তাঁর গলায় হাহাকার নেই, আবেগ নেই, হতাশা নেই। যন্ত্রের মুখ দিয়ে বেরুবার মতো তাঁর মুখ দিয়ে কথাগুলো বেরিয়ে আসে।

তাঁর কথা শেষ হবার আগেই মঞ্জু মুখোমুখি দাঁড়ানো ছেলেটির মুখের দিকে তাকিয়ে চিনতে চেষ্টা করে। ছেলেটি তার তাকানোর ভঙ্গি দেখে কী বোঝে, সেই জানে। সে বলে, হাবিবউল আলম এ বছরই ভর্তি হয়েছে। কমলাপুর বাসাবো এলাকার ছেলে। সরকারী দলের ক্যাডার। ওকে গ্রামের কলেজ থেকে পাস করিয়ে এনে ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি করানো হয়েছে।

মঞ্জু তবু হাবিবকে চিনতে পারে না। ছেলেটি আরও খবর জানায়। বলে, কয়েক মাস আগে বেইলি রোড এলাকায় আমাদের ডিপার্টমেন্টেরই একটি মেয়েকে তুলে নিয়ে গিয়েছিলো আবু আর সাবু, আপনার মনে আছে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

মঞ্জু 'হ্যাঁ' 'না' কিছু বলতে পারে না। শুধু কান পেতে শুনে যায়। আর সেদিন আবু আর সাবুর সঙ্গী ছেলে দু'টির চেহারা স্মরণ করার চেষ্টা করে। কিন্তু পারে না। স্মৃতি একেবারেই অন্ধকার সেখানে। ঘটনাটা ঘটেছিলো রাতের বেলা, কিন্তু তবু ছায়ামূর্তি দু'টি তো স্মরণে থাকবে। সে স্মৃতিতে ঐ ছায়ামূর্তিও খুঁজে পায় না। মাস্টার সাহেবকে মঞ্জু কিছুই বলতে পারে না। কেননা তখন তার বুকের ভেতরে কী যেন জ্বলে যাচ্ছে। সে বলতে পারে না। কিন্তু ছেলেটি পারে। বলে, স্যার, আমাদের স্যার ডঃ আজিজ ঠিকই বলেছেন, আপনার প্রথমে থানাতেই যাওয়া দরকার। সেখানে একটা এজাহার দেয়া না থাকলে কোনো দিকেই এগোতে পারবেন না। থানায় এজাহারটা দিয়ে আসুন, তারপর দেখা যাবে, কী করা যায়।

ছেলেটিকে মঞ্জুর ভালো লেগে যায়। সে ঘনিষ্ঠ হওয়ার জন্য নিজের নাম বললে ছেলেটি হাসে আর বলে, আমি কিন্তু আপনার নাম জানি। বরং আপনিই আমার নাম জানেন না। আমার নাম নাবিল, নাবিল আহসান। সে পুরনো ঢাকার গেন্ডারিয়ায় থাকে তাও জানিয়ে দেয়। তারপর মাস্টার সাহেবকে দেখিয়ে বলে, ইনি তো একেবারেই ভেঙে পড়েছেন, এঁর সঙ্গে আর কেউ আছে কি না, তাও তো বোঝা যাচ্ছে না। মনে হয়, এঁকে বোধহয় থানায় আমাদেরকেই নিয়ে যেতে হবে।

ভদ্রলোককে মঞ্জু বোঝতে চেষ্টা করে। বলে, দেখুন, আপনি একটু শক্ত হোন। আপনার থানায় যাওয়াটা খুবই জরুরী, পরে যেখানে যা বলার বলবেন।

মঞ্জুর কথা ভদ্রলোকের কানে যায় কি না বলা মুশকিল। কারণ তাঁর চোখ মুখে কোনো রকম ভাবান্তর দেখা যায় না।

আপনার সঙ্গে আর কেউ আসে নি ? নাবিল একটু পর জিজ্ঞেস করে।

ভদ্রলোক মাথা নাড়াতে নাড়াতে বলেন, না আমার সঙ্গে কেউ নেই, আত্মীয়-স্বজন চায় না খবরটা জানাজানি হোক।

একটু থেমে ফের বলেন ভদলোক, আমিও চাই না কেসটেস হোক– ওতে কোনো লাভ হয় না, আমি বহু দেখেছি– আমি হাবিবের সঙ্গে শুধু একবার কথা বলতে চাই।

ওর সঙ্গে কী বলবেন ? নাবিল জিজ্ঞেস না করে পারে না।

বলবো, তুমি কেন অমন কাজ করলে, আমার মেয়েটার এখন কী হবে ?

আপনার কথা কি ও বুঝবে ? মঞ্জুও প্রশ্ন না করে পারে না। বলে, ওসব কথা ওদের কানে যায় না। তাছাড়া ওকে আপনি পাচ্ছেনটাই বা কোথায় ?

কেন, ও ক্লাস করে না ? ভদ্রলোক যেন অবাক হন।

নাবিল হাসে ভদ্রলোকের প্রশ্ন শুনে। বলে, স্যার, ওদের ক্লাস করতে হয় না, পরীক্ষা দিতে হয় না তবু ওরা বছরের পর বছর ধরে ছাত্র পেকে যায়।

ভদ্রলোকের কী মনে হয়, কে জানে। হঠাৎ বলে ওঠেন, আমি ভাইস চ্যান্সেলর-এর সঙ্গে দেখা করতে চাই, বাবা তোমরা আমাকে একবার তাঁর কাছে নিয়ে চলো।

মঞ্জু ভদ্রলোকের মুখের দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে। সে বুঝতে পারে না। ভদ্রলোকের কেন মনে হচ্ছে যে ওপরের লোকদের কাছে তাঁর দুঃখের কথা বললে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

তাঁরা শুনবেন। সে চোখে চোখে তাকায়। তারপর জিজ্ঞেস করে, ভিসি যদি আপনার সঙ্গে দেখা করতে না চান ? কিংবা কথা না শোনেন ?

দেখি, শোনেন কি না ? ভদ্রলোক লম্বা নিঃশ্বাস নিয়ে বলেন, তোমাদের অসুবিধা থাকলে সঙ্গে যাবার দরকার নেই, শুধু অফিসটা আমাকে দেখিয়ে দাও।

নাবিল আপত্তি করার কারণ খুঁজে পায় না। সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে বলে, ঠিক আছে চলুন।

তিনজন মিলে তারপর এক সঙ্গে বেরিয়ে পড়ে। কার্জন হল থেকে বেরিয়ে দোয়েল চত্বর পার হয়ে বাংলা একাডেমীর দিকে কয়েক পা এগিয়েছে সবে। হঠাৎ দু'খানা মোটর সাইকেল পিছন থেকে এসে সামনে রাস্তার বাঁ পাশে দাঁড়ায়। চারজন আরোহী এক সঙ্গে বাহন থেকে নামে।

ওদের দেখে নাবিল নিচু গলায় জানায়, ঐ যে হাবিব, লম্বা গেঞ্জি পরা, শামলারঙের। জুলফিঅলা, আর হাতের মাসল দেখানো লাল গেঞ্জি পরা ছোকরাটাকে মঞ্জুর কেমন যেন চেনা চেনা লাগে। সেদিন মগবাজারের গলির মোড়ে সাবু আর আবুর সঙ্গে এই বদমাশটাই কি ছিলো ? আবছা আলোয় দেখা লম্বা কাঠামোটা বোধহয় দেখেছিলো কিন্তু গালে অমন লম্বা জুলফি ছিলো কি ?

হাবিব তার তিন সঙ্গীকে সঙ্গে নিয়ে ধীর পায়ে সামনে এসে দাঁড়ায়। তারপর নাবিল আর মঞ্জুর দিকে নজর তুলে বলে, কি খবর মিয়া, বুইড়ারে লাইয়া কই যাও ?

মাস্টার সাহেব সম্ভবত আন্দাজ করেন সামনে ওরা কারা। তিনি গম্ভীর মুখে বলেন, আমাকে কেউ কোথাও নিয়ে যাচ্ছে না, আমি একলাই এদিকে যাচ্ছি।

কিন্তু যাচ্ছেনটা কোথায় ? এবার হাবিবের সঙ্গীদের মধ্যে বেঁটে মতো তরুণটি ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করে।

কেন, উনি কোথায় যাচ্ছেন সেটা তোমাদের বলতে হবে ?

হ্যাঁ একশো বার বলতে হবে, আর তোমরা কে ? এ্যাঁ ? তোমরা কথা কও ক্যান ?

ছেলেটি ঠাণ্ডা গলায় জিজ্ঞেস করে। তার শীতল দুই চোখের ভিতরে হিলহিলে একটা হিংস্র সাপ কেবলি কুণ্ডলী পাকায়।

বেলা তখন ঠিক দুপুর, আগস্টের সূর্য মাথার ওপরে। চার জনের মুখই মনে হয় যেন পাথরের তৈরি। রাগ, ঘৃণা, খুশি, বিরক্তি কোনো ভাবের ছায়া, কোনো মুখে নেই। একজন বলে, চলো পার্কের ভেতরে যাই, আলাপ আছে।

তার কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে একজন নাবিলকে ধাক্কা দিয়ে ঘন গাছপালার ছায়াভর্তি সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের দিকে যেতে বলে।

নাবিল ঘুরে দাঁড়ায়। বলে, কেন পার্কের ভেতরে কিসের আলাপ ? এখানে বলতে অসুবিধা কি ? তোমরা কে ? কী চাও তোমরা ?

ও হাবিব ক, কইয়া দে কী চাস ? লম্বা চুল পিছনে ব্যান্ড দিয়ে বাঁধা পাংখু মার্কা ছেলেটি হাবিবকে উস্কায়। বলে, কি, তর শরম করে ? এ্যাঁ ? ঠিক আছে, আমিই কইয়া দি তুই কী চাস ? কমু ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

আরে এইটাতে কী কওনের আছে, অন্য একজন বলে ওঠে। আমার ভাই স্পষ্ট কথা। আমি কইতে ডরাই না, ভাই আপনেরা রাগ কইরেন না, আমরা আপনাগো বইন গিনিরে চাই।

এ্যাঁই চোপ ? হাবিব হঠাৎ ধমকে ওঠে। বলে, আজাইরা প্যাঁচাল ক্যান পাড়স, কইয়া দে না পার্কে যাইতে।

আমি বুঝতে পারতেছি না, আপনেরা কে ? ক্যান আমাদের আটকাইতেছেন।

মঞ্জু ঐ সময় চারদিকে তাকিয়ে দেখে। রাস্তার সামনে পিছনে খাঁ খাঁ, একটা মানুষ নজরে আসে না– কাছাকাছি কেউ থাকলেও সাড়া শব্দ হয় না একটুও। নিস্তব্ধতা হঠাৎ যেন ভারি হয়ে ওঠে।

একজন বেশ জোরে ধাক্কা দিতে দিতে মঞ্জুকে রাস্তার পূর্বদিকে নিয়ে যায়। যেতে যেতে বলে, বুইড়ারে ভিসির কাছে নিলে আমগো কুনো বাল ফালানি যাইবো ? ক ? হাবিবরে তরা কী করতে পারবি– তোমাগো বুদ্ধিতেই না বুইড়া ফাল দিয়া আইছে, ভিসির কাছে নালিশ দিবো, এ্যাঁ ? মনে করো, আমরা খবর পাই না।

চারজনের মধ্যে দু'জনই কেন কোমর থেকে পিস্তল বের করে, কেন পিস্তালের নল নাচাতে নাচাতে শাসায়, মঞ্জু তার কিছুই বুঝতে পারে না।

যেতে যেতে তিনজনকেই ওরা উদ্যানের ভেতরে নিয়ে যায়। চারদিকে গাছ আর গাছ, নিচু হয়ে তাকালে ডাইনে বাঁয়ে দু'দিকেই ছুটন্ত গাড়ি আর রিকশা দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু কোথাও কোনো শব্দ নেই। তিনজনকে এক সারিতে পাশাপাশি দাঁড় করায়। মঞ্জুর অবিশ্বাস্য লাগে। একেকবার মনে হয়, সে ঠিক দুঃস্বপ্ন দেখছে। ঐ সময়ে নাবিল হঠাৎ জিজ্ঞেস করে, তোমরা কি আমাদের মেরে ফেলার জন্য এভাবে দাঁড় করিয়েছো ?

ঐ কথায় হাবিব হেসে ওঠে বলে, তুমি ক্যান্নে বুজলা এ্যাঁ ? তুমি তো দেহি জব্বর ইনটেরিজেন্ট-হ, মারতে চাইছিলাম, কিন্তু পরে দেখলাম, তোমরা তো আবার পার্টি করো না। পার্টি না করলে শত্রুতামি ক্যান্নে হয় ? বুঝি না। পার্টি কারো না, তা-ও ক্যান আমাগো পিছে লাগো– এইবার থিকা আর লাগবা না কইয়া দিলাম।

হাবিব একে একে তিনজনের মুখের দিকে তাকিয়ে ফের বলে– আমার কথা মনে থাকবো ? আমার লগে তোমাদের কুনো শত্রুতামি নাই, ঠিক আছে ?

আচ্ছা বাবা, মাস্টার সাহেব হঠাৎ যেন ঘোর থেকে জেগে ওঠেন। বলেন, তুমি তো বাবা দেখছি বেশ বুদ্ধিমান ছেলে, কিন্তু আমাদের মারলে কেন ? কী দোষ করেছিলাম আমরা।

যা হইছে ভুইলা যান চাচা, আমরা নেশা করি তো, কুন সময় কী করি, হুঁশ থাকে না।

আর একটা কথা, মাস্টার সাহেবের গলা ভয়ে একটুও কাঁপে না। সোজাসুজি হাবিবের মুখের দিকে চেয়ে বলেন, আমার মেয়ে সাজেদাকে বাবা তুমি বিয়ে করো, বুঝলে ? যদি তুমি বিয়ে না করো, তাহলে ওর বিয়েই হবে না, তুমি একটু দয়া করো বাবা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বুড়োর কথা শুনে হাবিবের এক সঙ্গী হো হো করে হেসে ওঠে। বলে, হাবিব, বুইড়া কী কয় বুঝছস ?' বুইড়া তো দেহি কিছুই বুঝে না, বুঝাইয়া দিমু ?

না থাক, হাবিব হাত তুলে নিষেধ করে।

কী বুঝিয়ে দিতে চায়, সেটা এদিকে তিনজনের কেউই বুঝতে পারে না।

আর ঠিক ঐ মুহূর্তেই একটা ঘুঁষি এসে পড়ে মঞ্জুর নাকের ওপর।

ঘাসপাতার ওপরে সে চিৎ হয়ে পড়ে। দু'চোখে অন্ধকার দেখে, তবে জ্ঞান হারায় না তার। নাক দিয়ে যে রক্ত বেরিয়ে আসছে, তা সে দিব্যি টের পায়। নাবিলকেও শুয়ে থাকতে দেখে মঞ্জু। অনুমান করে, ওর জ্ঞান তখন নেই। থাকলে অমনভাবে কাত হয়ে কেউ পড়ে থাকে না।

লম্বা চুলঅলা তখন বলতে শুরু করে, তুমি সাংবাদিকের পোলা। তুমি আমাগো এইদিকে ক্যান আইবা কও ? আমাগো জিনিসের উপর ক্যান তোমার নজর, তুমি আমাগো দিকে আইবা না, আমরা তোমাগো দিক যামু না, বুঝছো ?

নাবিল তখন সবে উঠে বসেছিলো, ঐ সময় একজন তার চুল ধরে টেনে তুলে চোখে চোখে তাকিয়ে বলে, ভিসির অফিসে যাইবা ? কও যাইবা ?

তাকে প্রশ্ন করা হয়, আর সঙ্গে সঙ্গে দেয়া হয় মাথার চুল ধরা হাতে একটা করে ঝাঁকুনি। নাবিল কিছু বলে না। মঞ্জু বারবার হাতের মুঠোর উল্টো পিঠ দিয়ে দু'চোখ মোছে। কিন্তু তবু দু'চোখের ওপরকার পর্দাটা সরাতে পারে না। সব কিছু সে ঝাপসা দেখে।

ঐ সময় কী যে হয় মাস্টার সাহেবের। তিনি চিৎকার করে ওঠেন, এইসব কী করো তোমরা ? তোমরা কি আমাদের খুন করবে, এ্যাঁ ? খুন করতে চাও ? খুন করা এতো সোজা ? আমি থানায় যাই নাই, কেস-এর কথা ভাবি নাই। আমি তোমাদের কাছে একটা রিকোয়েস্ট করছি। ভিসির কাছে ওরা নিতে চায় নি, আমিই নিজের আগ্রহে ভিসির কাছে যেতে চেয়েছি।

আমি নালিশ করতাম না, তাঁর কাছেও আমি রিকোয়েস্ট করতাম, কিন্তু তোমরা একি করছো ?

ও কিছু না, তালইসা'ব, এট্টু হুঁশ করাইতেছি আর কি ?

নাবিল কী কী যেন তখন বলে চলেছে। মঞ্জুর মনে হয়, ছেলেটা ভুল বকতে শুরু করেছে। ওসব কথা যদি ভুল বকা না হয়, তাহলে ভুল বকা আর কাকে বলা যাবে ?

মঞ্জুর কানে এক একবার নাবিলের স্বর পৌঁছায়, এক একবার আবার পৌঁছায় না : একবার শুনলো, আমি কেন তোমাদের পার্টি করবো ? যদি করি কখনও, তাহলে মানুষের জন্য যারা সত্যি সত্যি কিছু করতে চায়, তাদের সাথে কাজ করব– না, তোমাদের অপোজিশন-এ যারা আছে তাদেরও আমি সমর্থন করি না, কখনও করবো না– যারা রেপ করে, খুন করে, চুরি ডাকাতি করে, ছিনতাই করে, আমি তাদের পক্ষে কেন থাকবো ? হ্যাঁ, তুমি আমাকে মারছো। তুমি মাহিবের নাক থেঁতলে দিয়েছো ! তোমরা মেয়ের সর্বনাশ করে আবার এখন মেয়ের বাবা মাস্টার সাহেবকে মারছো– একশো বার বলবো, কেন বলবো না?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ছেলেটা কার কাছে এসব কথা বলছে ? মঞ্জু দু'হাতের পিঠে বারবার করে চোখ কচলায় কিন্তু তবু সামনে কাউকে দেখতে পায় না, কীভাবে দেখবে ? চোখের ওপরকার পর্দাটা সরলে তো ?

তারপর হঠাৎ কী যেন হয়। একটা নতুন মানুষের গলা শোনা যায়। সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার, ধমক, গালাগালি, সমস্ত কিছু থেমে যায়। হাবিবের গলার স্বরে পর্যন্ত ত্রস্ত ভাব ফোটে। সে সঙ্গীদের হুঁশিয়ার হতে বলে। একজন জিজ্ঞেস করে, নীরু আছে লগে ? তুই দেখছস ? একজন বলে, আরে হোগ্গ গিনি রাস্তায় ফালাইয়া খোওয়া উচিত হয় নাই, বুঝছো ? অহন হোগ্গ পাইবা বইলা মনে হয় না।

একই সঙ্গে লম্বা চুলঅলার গলাও শোনা যায়। সে বলে, আরে রাখ তো, এ গো ফের একদিন মেরামত করা যাইবো। কিন্তু হোগ্গা গেলে আর সহজে পাইবি ?

ঐ কথা ক'টিই ওদের সেদিনকার মতো শেষ কথা। তারপর আরও কিছু বললেও সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের মাঝখানে পড়ে থাকা দু'টি তরুণ ার একজন প্রৌঢ়ের কানে পৌছায় না। কারণ তখন বাংলা একাডেমীর দিক থেকে যেমন, তেমনি ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট-এর দিক থেকেও ধর ধর আওয়াজ এবং পিস্তলের গুলির শব্দ হতে থাকে।

মঞ্জু এদিকে নাবিলকে টেনে তোলে। তার নিজের থেঁতলে যাওয়া নাক দিয়ে যে দর দর করে রক্ত ঝরছে সেদিকে খেয়াল নেই। মাস্টার সাহেবও ততক্ষণ ছুটে এসেছেন, তিনি নাবিলের ডান বাহু ধরেন। মঞ্জুর দিকে তাকিয়ে বলেন, তোমার নাক দিয়ে এখনও রক্ত পড়তেছে। চলো, আগে মেডিক্যাল-এ যাই। নাবিল বারবার করে মাথা ঝাঁকিয়ে মগজ আর নজর পরিষ্কার করার চেষ্টা করে আর বলে, হাসপাতালে পরে যাবো। আগে ভিসির কাছে যাওয়া দরকার।

স্থির হয় না, প্রথমে কোথায় যাওয়া হবে। তবু নাক থেকে গড়ানো রক্তে-ভেজা শার্ট নিয়ে মঞ্জু অর ফেটে যাওয়া ভুরু আর ফোলা গাল নিয়ে নাবিল মাস্টার সাহেবের সঙ্গে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের ভেতর দিয়ে হাঁটতে থাকে। মাস্টার সাহেব ফের বলেন, প্রথমে চলো ঢাকা মেডিক্যাল-এ যাই।

নাবিল মঞ্জুর ঘাড়ে শরীরের ভর রেখে হাঁটে। কিন্তু তবু সে মাথা নাড়ায়। বলে, হাসপাতালে যাওয়ার দরকার নেই, আমরা ঠিক আছি। আপনি ভিসির কাছে চলুন প্রথমে। দেখুন, ভিসি কী বলেন, তারপর কোনো কাগজের অফিসে যাবেন।

মাস্টার সাহেব কথা বলেন না, চুপচাপ হাঁটেন। গাছের গুঁড়ি এড়িয়ে এড়িয়ে আঁকাবাঁকা পায়ে চলা পথ। দূর বেশি নয়, কিন্তু মনে হচ্ছিলো অনেকক্ষণ ধরে হাঁটছে। এক সময় তারা সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের গেটে পৌছে যায়। টিএসসি চত্বরে ছাত্রছাত্রীদের ভিড় এখন কম মনে হচ্ছে। কারণ সময়টা এখন ভর দুপুর। এদিক ওদিক বসে থাকা কিংবা দাঁড়ানোদের মধ্যে চেনা জানা কাউকে মনে হলো না। তবে মোড়টা পার হবার সময় লক্ষ্য করলো রাস্তার মানুষ তাদের দিকে তাকিয়ে দেখছে। হঠাৎ কোনদিক থেকে যেন নাবিলের পরিচিত ২/৩টি ছেলে এসে জুটল। সবার মুখে একটাই প্রশ্ন, কী হয়েছিলো ? কেন এমন অবস্থা ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

নাবিল খুলে কিছু বলে না। খুব সংক্ষেপে জানায়, হাবিবরা আমাদের এমনভাবে মেরেছে। টিএসসির মোড় থেকে ভিসির অফিস পর্যন্ত যেতে যেতে ছোটখাট একটা মিছিল হয়ে দাঁড়ায় চলন্ত জটলাটা। তবে স্লোগান দিচ্ছিলো না কেউ।

ততোক্ষণে দুপুর গড়িয়ে গেছে। ভাইস চ্যান্সেলর বোধহয় বাইরে গিয়েছিলেন। ফেরার পথে গেটের কাছে জটলা দেখে গাড়ি থামালেন। তারপর গাড়িতে বসেই শুনলেন মাস্টার সাহেবের কথা। শুনে রীতিমতো বিরক্ত হলেন। বললেন, আপনি আমার কাছে কেন এসেছেন ? আপনার মেয়ে তো ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়ে না, পড়ে কি ?

একটি ছেলে পেছন থেকে বলে ওঠে। ঢাকা ইউনিভার্সিটির একজন ছাত্র কাজটা করেছে স্যার।

তাতে কী হলো ? ভিসি ছেলেটির মুখের দিকে তাকিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করেন। বলেন, ওর মেয়েকে তুলে নিয়ে যাওয়ার ঘটনাটা ঘটেছে কোথায় ? নিশ্চয়ই ক্যাম্পাসে নয়। তা হলে ? বাইরের ঝামেলা এখানে টেনে আনা কেন ? তোমাদের এসব কেমন পলিটিকস ? ঐ মন্তব্যটুকু করে ভিসি ড্রাইভারকে সামনে যাবার হুকুম দেন। মাস্টার সাহেব কী বোঝেন তিনিই জানেন, একইভাবে স্থির দাঁড়িয়ে থেকে তিনি ভিসির গাড়ি এগিয়ে যাওয়া, গাড়ি বারান্দায় থামা, ড্রাইভার বেরিয়ে এসে দরজা খুলে দিলে ভিসি সাহেবের বেরিয়ে তর তর করে সিঁড়ি বেয়ে বারান্দায় ওঠা, সব দেখেন এক এক করে। তাঁর নজর ডাইনে বাঁয়ে সরে না।

ভিসির অফিসে চলুন স্যার, একটি ছেলে বলে। ততোক্ষণে মাস্টার সাহেবের পরিচয় অনেকেই জেনে ফেলেছে। ছেলেটি ফের বলে, ব্যাপারটা মুখে বললে কিছু হবে না। লিখিতভাবে জানান।

ঐ কথায় ভদ্রলোক হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ান। তারপর মঞ্জুর দুই হাত জড়িয়ে ধরে বলেন, বাবারা আমাকে তোমরা মাফ করে দিও। আমার জন্যে তোমাদের এমন হেনস্থা হলো।

ওসব কথা বাদ দিন। পাশ থেকে নাবিল ধমক দেওয়ার মতো করে বলে, আপনার মেয়ের কী সর্বনাশ হয়েছে তা তো আর কারুর জানতে বাকি নেই– আপনি এখন খবরের কাগজের অফিসে চলুন, যা বলার ওখানেই বলবেন– ভিসি যা বললেন, তাও বলবেন।

মাস্টার সাহেব শোনেন কি না বোঝা যায় না। দূরে রাস্তার দিকে নজর মেলে দিয়ে নিজেকেই বোধহয় বলেন, না, আমি আর কোথাও যাবো না। আমার বোঝা শেষ। বলে টলে কোনো কাজ হবে না।

কথা ক'টি উচ্চারণ করেই ভদ্রলোক সামনের দিকে হাঁটতে শুরু করে দেন।

তাঁর অমন কাণ্ড দেখে নাবিলের চেনা একটি ছেলে বলে ওঠে, এইসব ভীতু লোকদের দিয়ে কোনো কাজ হয় না। খামোকা তোমরা ওকে নিয়ে এসেছো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

মঞ্জুর একবার ইচ্ছে হয় যে প্রতিবাদ করে। পরক্ষণে ফের এও মনে হয়, প্রতিবাদ করে কী লাভ, যা হবার তা তো হয়েই গেছে। ছেলেটির মন্তব্যের প্রতিবাদ করলেই কি আর মাস্টার সাহেব সাহস দেখাবার মতো কোনো কাজ করবেন ? ছেলেটি আরও কিছু মন্তব্য করে কিন্তু মঞ্জু সেদিকে কান দেয় না। নাবিল ততোক্ষণে, ভিসি অফিসের গেট থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তার দিকে পা বাড়িয়েছে। মঞ্জুও তার সঙ্গী হয়।

দু'জনে পাশাপাশি হাঁটতে থাকলে সেটা দেখবার মতো দৃশ্য হয়। একজনের ফোলা গাল মুখের মাঝখানে ক্ষত, ডান চোখটি লাপাত্তা, আর অন্যজনের ফাটা নাক ফোলা ঠোঁট আর সেই সঙ্গে শার্টের বুক রক্তে ভেজা। চেনাজানা লোকেরা কী হয়েছিলো, সেটা জানবার জন্য প্রশ্ন করে। কিন্তু ওরা পাত্তা দেয় না। নাবিল তবু দুটো একটা কথা বলে, কিন্তু মঞ্জুর মুখ দিয়ে কোনো কথাই বের হয় না।

বড় রাস্তায় উঠে নাবিল লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে বলে, আসলেই মাস্টার সাহেবের সঙ্গে জড়িয়ে পড়াটা আমাদের উচিত হয় নি।

হঠাৎ এ কথা কেন ? মঞ্জু প্রশ্ন না করে পারে না।

লাভ তো কিছু হলো না। খামোকা ক'টা গুণ্ডা মাস্তানের হাতে মার খেতে হলো। যদি ভদ্রলোক ভিসির কাছে আসার আগে ছাত্রদের কোনো গ্রুপের কাছে যেতেন, তাহলে ভিসি তাঁর কথা ওভাবে উড়িয়ে দিতে পারতেন না।

মঞ্জু হাসে। বলে, তাতেই বা লাভ কী হতো ? উনি তো কোনো রকম বিচার চাইতে আসেন নি।

অভিযোগও করলেন না, বলেছিলেন– আমরা তো জানতাম উনি কাকুতি মিনতি করতে যাবেন, বলো, জানতাম না ?

নাবিল জবাব দেয় না। হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ সে দাঁড়িয়ে পড়ে। তারপর বলে, তোমার নাকটা কিন্তু বেজায় ফুলে উঠেছে।

মঞ্জুর হাসি পায় নাবিলের কথা শুনে। নিজের কী দশা, সেদিকে হুঁশ নেই। অন্যের দিকে নজর। বলে, তোমার ডান দিকের চোখটা কোথায় ? গাল আর কপাল ফুলে এমন ঢোল হয়ে গেছে যে চোখের হদিস নেই।

আমাদের বোধহয় ডাক্তারের কাছে যাওয়া উচিত, নাবিল খানিক বাদে জানায়। তারপর জানতে চায়, যাবে ?

কোথায় ?

আরে এই তো, ঢাকা মেডিক্যালের এমারজেন্সিতে। আমার ছোট দুলাভাই ওখানে ডাক্তার। যাবে না কি বলো।

মঞ্জু একটু ইতস্ততঃ বোধ হয়। কারণ বড় ভাই রঞ্জুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে, নানান ঝামেলার মধ্যে পড়তে হবে। ফের এও মনে হয়, এখন তো ওর ওটিতে ব্যস্ত থাকার কথা– এমারজেন্সির খবর সে কোত্থেকে পাবে ? তাছাড়া তার নাক মুখের ব্যথা যে ভাবে বাড়ছে, তাতে ঝামেলা বেড়ে যে কোথায় ঠেকবে, তারও কি ঠিকঠিকানা আছে কিছু ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

মনের ভেতরকার ইতস্ততঃ ভাবটা কাটিয়ে উঠে সে নাবিলের সঙ্গে পা মেলায়। আর ঠিক ঐ সময় ব্রিটিশ কাউন্সিলের গেট দিয়ে বেরুবার সময় তিমলি মঞ্জুকে দেখতে পায়। আর সঙ্গে সঙ্গে সে চিৎকার করে ওঠে। মাহিব, এই মাহিব, দাঁড়াও। রাস্তা পার হয়ে তিমলি মুখোমুখি দাঁড়ায়। মঞ্জুর অবস্থা দেখে তার মুখ দিয়ে কিছুক্ষণ কথা বের হয় না। তারপর বলে ইশ্, এ কী অবস্থা হয়েছে তোমার।

ঐ অবস্থাতেও মঞ্জু হাসতে চেষ্টা করে। বলে, ও কিছু না। ঢাকা ইউনিভার্সিটির ছাত্র হলে, মাস্তানদের হাতে মার খেতে হয়।

তার মানে ? তিমলির গলার স্বরে রীতিমতো জ্বালা ফুটে ওঠে।

মঞ্জু তারপরও হাসে। বলে, মানে তো দেখতেই পাচ্ছো, সরকারী দলের ক্যাডাররা মেরে গণ্ডারের নাক ফাটিয়ে দিয়েছে।

কোথায় ? কখন ? কী হয়েছিলো ?

মঞ্জুর সবিস্তার বর্ণনা করতে ইচ্ছে করে না। সে পাশ কাটাতে চায়। কিন্তু পারে না। কারণ নাবিল সংক্ষেপে হলেও পুরো ঘটনাটা জানিয়ে দেয়।

তিমলির দু'চোখ তখন মঞ্জুর মুখের ওপর স্থির। সে বলে, এই নিয়ে ক'বার হলো? তিনবার, তাই না ?

একটু থেমে ফের বলে তিমলি, যে তোমার সঙ্গে ছিলো তাকে তুমি বাঁচাতে পারো নি। তবু কেন গিয়েছিলে ? ঐ মাস্টারের মেয়েকে তুমি চিনতে ? তাকে কখনও দেখেছো ?

মঞ্জু পাশ কাটাবার জন্য বলে, ওসব কথা এখন থাক, আমি এখন যাই। পরে কথা বলবো।

তিমলি ঘুরে দাঁড়ায়। বলে, কোথায় যাবে চলো, আমিও যাচ্ছি তোমার সঙ্গে।

এবার নাবিল আপত্তি জানায়। বলে, তুমি কেন যাবে আমাদের সঙ্গে ? আমরা তো হাসপাতালের এমারজেন্সিতে যাচ্ছি, ওখানে গিয়ে কী করবে ? তাছাড়া হাবিবের সাঙ্গপাঙ্গরা তো কাছাকাছি ঘুরছে ফিরছে। আমাদের সঙ্গে তোমাকে দেখলে কখন কী ঝামেলা করে বসবে তার ঠিক আছে কিছু ?

তিমলির কী মনে হয় সে আর পা এগোয় না। কয়েক পা এগিয়ে, যেখানে থেমেছিলো, সেখানেই সে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর বলে, রাখিকে কিন্তু আমি লিখবো যে তোমার উঁচু নাক মাস্তানরা ভেঙে থেবড়ে দিয়েছে।

এমারজেন্সিতে নাবিলের দুলাভাইকে ঠিকই পাওয়া যায়। নাবিলের কাছ থেকে খবর শুনে তিনি ভীষণ গালাগাল শুরু করে দিলেন। মনে হচ্ছিলো, পারলে তক্ষুণি কিছু একটা করেন। ভদ্রলোক বোধহয় বিএনপির সমর্থক। বারবার করে বলতে লাগলেন, ছাত্রলীগ জানে না তোমাদের এমন অবস্থা কে করেছে ? নিশ্চয়ই জানে– জানলেও ওরা কিছু বলবে না, যদি ছাত্রদলের ছেলে কেউ থাকতো, তাহলে ওদের আচ্ছা মতো শিক্ষা দিয়ে দিতো। বলতে বলতেই তিনি একটি লোককে কোন এক মহসিনকে ডেকে আনতে বলেন। তারপর তিনি নাবিলের মুখচোখ দেখতে আরম্ভ করেন। দেখতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

দেখতেই এখানে টেপেন, ওখানে টেপেন, আর বলেন, ঐ মাস্টারগুলোই হচ্ছে যতো নষ্টের গোড়া, বুঝলে ? নিজেরা ভালো মানুষ সেজে ভেজা বেড়ালের মতো মিউ মিউ করবে। আর ওদিকে শয়তানদের বাড় বেড়েই চলবে। যতোসব আহাম্মকের কারবার, বুঝলে ?

বলতে বলতে তিনি ফের নাবিরের আঘাত আর জখমের বিষয়ে চলে যান। বলেন, তোমার চোখটা অল্পের জন্য বেঁচে গেছে, বুঝলে ? তাছাড়া অন্যকিছু দেখছি না। একটু ব্লিডিং হয়েছে আর জায়গাটা ফুলে গেছে। দু'দিন রেস্ট-এ থাকলে সব ঠিক হয়ে যাবে– তবে ওষুধ খেতে হবে– ওতে ছাড়াছাড়ি নেই।

কিন্তু মঞ্জুর নাকের দগায় আঙুল দিয়ে নাকটা সামান্য উঁচু করতে গেলে মঞ্জু ব্যথায় কাতরে ওঠে। আর সেটা শুনেই কি না কে জানে, ডাক্তার কামালের ভুরু কুঁচকে ওঠে। বলেন, তোমার জখমটা তো ভাই ভালোই সিরিয়াস। মনে হচ্ছে সেপ্টামের হাড় ভেঙে গিয়েছে, বোধহয় সার্জারি লাগবে।

মঞ্জুর নাক চোখ মুখ তখন জ্বালা এবং ব্যথায় ঝনঝন করছে। মগজের ভেতরে পী-ঈ-ই মতো একটা আওয়াজ হচ্ছে, চোখেও দেখছে ঝাপসা। তক্ষুণি সে কিছু বলতে পারে না। ব্যথার দমকটা খানিক কমলে সে জানতে চায়, আপনি ঠিক করে দিতে পারবেন না ?

ডাক্তার কামাল চিন্তিত মুখে মাথা ডাইনে বাঁয়ে দোলান। বলেন, এটা আমার কাজ নয়, ইএনটির সার্জনদের কাছে তোমাকে যেতে হবে। আমি ওদের একজনের কাছে তোমাকে রেফার করে দিচ্ছি।

মঞ্জু চুপ করে থাকে। কী বলবে বুঝতে পারে না। ডাক্তার কামাল ফের বলেন, আমি বরং তোমার ভর্তির ব্যবস্থাটাই করে দিই, কী বলো ? তুমি ভর্তি হয়ে যাও। দেরি হলে ইনফেকশন হয়ে যেতে পারে।

আরে নাহ নাবিল আপত্তি জানায়। বলে, ওর বাবা মা আছেন, ওর বাবা আবার সাংবাদিক, ওঁরা কিছু জানবেন না, আর ছেলে এদিকে হাসপাতালে ভর্তি হয়ে যাবে– একি হয় ?

যুক্তিটা ফেলবার মতো নয়। ডাক্তার কামাল ব্যাপারটা বোঝেন। তবু বলেন, তোমার কিন্তু অপারেশন লাগবে, যতো তাড়াতাড়ি হয়, ততোই ভালো। যদি অপারেশন না করাও, তাহলে সেপ্টামের হাড় ভাঙা আর বাঁকা অবস্থাতেই জোড়া লেগে যাবে– তখন নাকটা থাকবে এক দিকে বেঁকে– সারাজীবন সাইনাস-এর কষ্ট পাবে– বছরের বারো মাস সর্দিতে ভুগতে হবে। বুঝেছো ?

ডাক্তার কামালের কথা শেষ হবার আগেই একজন ছাত্র কিংবা নতুন ডাক্তার কামরায় এসে ঢোকে। তার পরণে এ্যাপ্রোন। তাকে দেখে ডাক্তার কামাল খুশি হন। বলে ওঠেন, আরে মহসিন সাহেব এসো এসো। আজকাল তোমার দেখাই পাওয়া যায় না, স্টুডেন্ট পলিটিকস আমরাও করেছি বুঝেছো ?

আর বলবেন না কামাল ভাই, মহসিনের গলার স্বরে বিব্রত হওয়ার ভাব ফোটে। বলে, এতো ব্যস্ত থাকতে হয় যে বলার কথা নয়– আপনাদের সময় তো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

পোলারাইজেশন-এ শুধুই দুটো পক্ষ ছিলো, কিন্তু এখন দেখুন। কতোগুলো পক্ষ দাঁড়িয়ে গেছে।

মহসিন ভূমিকা লম্বা না করে সোজাসুজি কথায় আসতে চায়। বলে, তো খবর কী বলুন, কেন ডেকে পাঠিয়েছেন ?

খবর কিছু নয়, এদের দিকে তাকিয়ে দেখো একবার। ডাক্তার কামাল তাঁর দুই রোগীকেই দেখান। মঞ্জু আর নাবিলের দিকে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ মহসিন। তারপর বলে, এরা তো বেশ জখম হয়েছে দেখছি।

হ্যাঁ, সরকারী দলের পান্ডারা কাজটা করেছে– তোমাদের স্টুডেন্ট উইংটা কোন ঘোড়ার ডিমটা করে। এ্যাঁ ? মহসিনকে একটু উস্কানির মতোই দেন ডাক্তার কামাল। তাই তার মধ্যে একটা টেনশনের ভাব জেগে উঠতে দেখা যায়। বলে, আমি খোঁজ নিয়ে দেখছি, কী ব্যাপার। বেরিয়ে যেতে যেতে ফের একবার ফিরে আসে মহসিন। নাবিলের কাছে জানতে চায়। কী যেন নাম বললে ? হাবিব, তাই না ? জিওগ্রাফির ছাত্র, ঠিক তো ?

নাম পরিচয় জেনে নিয়ে মহসিন বেরিয়ে যায়। কিন্তু তারপর বেশিক্ষণ না, মাত্রই বোধহয় পাঁচ মিনিট মতো হবে। তার মধ্যেই ফের এসে ঢোকে মহসিন। এবার সে একা নয়। সঙ্গে যাকে দেখে, তাতে মঞ্জু বেশ ঘাবড়ে যায়। বড় ভাইয়ের বন্ধু ডাক্তার মনিরকে দেখে সে মুখটা ঘুরিয়ে রাখে। কিন্তু তাতে লাভ হয় না। মনির ঠিকই তাকে চিনতে পারে এবং এগিয়ে এসে বলে, মঞ্জু তুমি ? তোমার এমন অবস্থা কীভাবে হলো ?

ছাব্বিশ

কিছুদিন ধরে রায়হানকে বেশিক্ষণ অফিসে থাকতে হচ্ছে। সম্পাদক সাহেব লম্বা ছুটিতে লন্ডন গেছেন। বলে গেছেন, মাস খানেক থাকবেন, কিন্তু লন্ডনে থেকে আমেরিকা ঘুরে আসতে মাস দুই সময় যে লেগে যাবে তা কে না বোঝে। অন্যান্যবার সম্পাদক ছুটিতে গেলে আমানউল্লাহ চার্জ-এ থাকেন। এবারে হারুন সাহেবের কী যে খেয়াল হলো এডিটোরিয়াল পেজ-এর পুরো দায়িত্বটা চাপিয়ে দিলেন রায়হানের ঘাড়ে। বাকি সব রাখলেন নিজের কাছে। রায়হানের কামরায় একদিন বিকেলে এসে সোজাসুজি বললেন, রায়হান ভাই, শুনেছেন বোধহয়, সম্পাদক সাহেব ছুটিতে যাচ্ছেন, এখন থেকে এডিটোরিয়াল পেজ-এর পুরো দায়িত্ব আপনার ওপর রইলো।

কোথায় সে একটু ফাঁক খুঁজছিলো যাতে ফুলবাড়িয়ার জমিতে পাকাপোক্তা একটা কিছু করা যায়– কাজের ঝামেলা বেড়ে যাওয়ায় গেলো সব কিছু ভণ্ডুল হয়ে। এখন নিজের লেখাটা তো লিখতেই হয়। তারপর আহিদকে বুঝিয়ে দিতে হয় কী লিখবে। আমানউল্লাহ সাহেবকে নিয়ে মুশকিল হয়ে গেছে এই যে, তিনি যে কখন তাঁর কপি পাঠাবেন তার ঠিকঠিকানা কিছু থাকে না। এই রকম ঝামেলার মধ্যে থাকতে থাকতে একদিন মুনশি এসে জানালো যে, ফুলবাড়িয়ায় কিছু লোকের কথাবার্তা শুনে তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ভালো ঠেকছে না, ওখানে খুব শিগগির পাকা কিছু না তুললে সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে।

মনের ওপর ফুলবাড়িয়ার জমিটার চিন্তা বেশ ভারী হয়ে উঠেছে তখন। এদিকে আমানউল্লাহ সাহেব বিকেল তিনটা পার হয়ে যাওয়ার পরও যখন কপি পাঠাননি, ঐ সময় রঞ্জু টেলিফোনে তাকে খবরটা জানায়, খবরটা পেয়ে কিছুক্ষণ সে থ' হয়ে বসে ছিলো। টেলিফোনে ওদিকে রঞ্জু হ্যালো হ্যালো করে যাচ্ছিলো, কিন্তু তার কিছুক্ষণ হুঁশ ছিলো না যে কিছু বলে। কয়েকবার ডাকাডাকির পর সে ছেলের ডাকে সাড়া দেয়। রঞ্জু তখন ফের খবরটা বলে। সে বুঝিয়ে বলার পর তার হুঁশ হয় এবং সে বুঝতে পারে যে ইউনিভার্সিটি এলাকায় মারামারি হয়েছে আর তাতে সরকারী দলের মাস্তানদের হাতে তার মেজো ছেলে মঞ্জু বেদম মার খেয়েছে। হাড় ভেঙে তার খাড়া নাক এখন থেবড়ে গিয়েছে।

রঞ্জু ফের হ্যালো হ্যালো বলে। ডাকে, আব্বা, ও আব্বা, তুমি শুনতে পাচ্ছো তো?

হ্যাঁ শুনছি, রায়হান জানায়। কিন্তু তারপর ফের কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। শেষে জিজ্ঞেস করে, আমাকে কি যেতে হবে?

বাপের প্রশ্ন শুনে ছেলে বোধহয় ওদিকে থমকে যায়। সেও কিছুক্ষণ কথা বলে না। বোধহয় চিন্তা হয় তার। শেষে সে বলে দেয়, নাহ্ কী দরকার, তুমি এসে কী করবে। আমি ভাবছি ওকে হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে দিই। নাক অপারেশন করে চেপ্টানো হাড়টা সেট করে প্লাস্টার করে দিতে হবে। প্লাস্টার করা নাক নিয়ে ও কয়েকদিন হাসপাতালে থাকুক। ওর কিছু শিক্ষা হওয়া দরকার– শুধু ও-ই কেন ঝামেলার মধ্যে গিয়ে পড়ে?

ছেলের ক্ষুব্ধ স্বর শুনে রায়হানের মনের ভিতরকার ক্ষোভ কিছুটা কমে যায়। কারণ তার নিজের মনের কথাটাই সে ছেলের মুখ থেকে শুনতে পাচ্ছে। আসলেও তো ছেলেটা হক না-হক উদ্ভট সব ঝামেলার মধ্যে জড়িয়ে পড়ে। এমন এক ছেলের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব ছিলো, যাকে মাস্তানদের গুলি খেয়ে রাস্তায় মরে পড়ে থাকতে হয়, আর তাই নিয়ে যতো ঝামেলা পোয়াতে হয় তাকে। তারপর ফের ঝামেলায় পড়লো সমীরণের মেয়ে রাখিকে নিয়ে। মেয়েকে সমীরণ ইন্ডিয়ায় পাঠিয়ে না দিলে ব্যাপারটা কতোদূর পর্যন্ত গড়াতো কে জানে। শেষে ফের এই নাক থেবড়ে যাওয়ার নতুন ঘটনা– ও ছেলের অবশ্যই শিক্ষা হওয়া উচিত। মনে মনে সে বড় ছেলের সিদ্ধান্তের তারিফ করে।

হাতে তখন কাজ বলতে জাহিদের পোস্টটা দেখা, নিজের লেখাটা দুপুর বেলাতেই দিয়ে রেখেছে। আর আমানউল্লাহ সাহেব যদি ঠিক সময় লেখা না দেন তো সেটা তার দায়িত্ব। ভদ্রলোককে ফের তাগিদ দেবে কিনা এমন যখন ভাবছে, এমন সময় রিপোর্টার সালেহউদ্দিনের টেলিফোন। সে জানতে চায়, মাহির রায়হান মঞ্জুকে কি রায়হান ভাই চেনেন?

কেন? রায়হানের বুকের ভেতরটা ধরাস করে ওঠে। সালেহউদ্দিন ওদিক থেকে জানায়, ইউনিভার্সিটির দিকে গোলমাল হয়েছে খবর পেয়ে ওদিকে গিয়েছিলাম। গিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

শুনি দু'টি ছেলে আর একজন বুড়ো লোককে সরকারী দলের মাস্তানরা ভীষণ মারধর করেছে। মাথা টাথা ফাটিয়ে একাকার। ওদের মধ্যে একটি ছেলের নাম জানলাম মাহিব রায়হান এমন কি এও জানালো যে, ছেলেটির বাবা সাংবাদিক। তাই মনে হলো নিশ্চয়ই ও আপনার চেনা জানা কেউ হবে– আচ্ছা আপনি কি খবর পেয়েছেন ? ছেলেটি কি এখন হাসপাতালে ?

হ্যাঁ, ওকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। মাহিব রায়হান আমার মেজো ছেলে, বুঝেছো ?

এ পর্যন্ত বলে রায়হান ফোনটা নামিয়ে রাখে। আর তখনই তার মনে হয়, বীথি নিশ্চয়ই এতোক্ষণে হাসপাতালে পৌছে গেছে। ছোট ভাইয়ের অমন একটা দুঃসংবাদ রঞ্জু কি আর মাকে জানায়নি! নিশ্চয় জানিয়েছে।

সে কব্জি উল্টে ঘড়ির দিকে তাকায়। দেখে পাঁচটা বাজে। তার মানে শীতের দিনে সন্ধ্যা হতে আর দেরি নেই। দেরি না করে রায়হান বেরিয়ে পড়ে। অফিস থেকে বেরুবার মুখে শুধু আমানউল্লাহ সাহেবকে জানিয়ে দেয় যে, জরুরী দরকারে সে অফিস থেকে আজকের মতো চলে যাচ্ছে। আমানউল্লাহ কিছু বলেন না, শুধু মাথাটা একদিকে হেলান।

হাসপাতালে পৌছে দেখে টুকুকে সঙ্গে নিয়ে বীথি বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। রায়হান পাশে গিয়ে দাঁড়ালে বীথি জানায়, মঞ্জু এখন ওটিতে। রঞ্জু ওর সঙ্গে আছে, বেরুতে দেরি হবে।

রায়হান ঐ সময় দেখে বারান্দা দিয়ে হেঁটে আসছে সালেহউদ্দিন, আর তার পেছনে পেছনে ফটোগ্রাফার অসীম। কাছে এসে বললো, আমাকেই আসতে হলো আবার।

আপনি কতোক্ষণ ?

রায়হান ম্লান হাসে। কিছু বলে না। সালেহউদ্দিন ফের বলে, অফিসে গিয়ে খবরটা শুধু বলেছি। আব্দুল্লাহ ভাই সঙ্গে সঙ্গে বললেন, এক্ষুণি ফটোগ্রাফার নিয়ে চলে যাও। পুরো ঘটনাটা ইন ডিটেল নোট করে নিয়ে আসবে। তাই আমাকেই আসতে হলো।

হাসি পায় রায়হানের সালেহউদ্দিনের কথা শুনে। কারণ সে তো জানে ঘটনাটা যদি গুরুতর কিছু হয়ে থাকে, তাহলে তো আজ রাতেই টেলিফোন আসবে অফিসের নিউজ টেবিলে আর গম্ভীর গলায় হুকুম হবে– জনস্বার্থের পরিপন্থী ঐ খবর ছাপানো যাবে না। ব্যস, হয়ে গেলো, সাংবাদিকের লম্ফঝম্ফ শেষ।

সে তবু জিজ্ঞেস করে, ঘটনাটা আসলে কী ঘটেছিলো তুমি খবর নিয়েছো ?

দু'তিন রকমের খবর পাচ্ছি রায়হান ভাই, সালেহউদ্দিন জানায়। বলে, এক খবর এই যে, এক প্রাইমারী স্কুলের মাস্টারের কলেজে পড়া মেয়েকে নিয়ে দু'তিনজন ইয়ংম্যানের মধ্যে রাইভালরি থেকে এই মারামারির ঘটনা। একজন বললো, খিলগাঁও প্রাইমারী স্কুলের মেয়েকে ধরে এনে দু'জন মাস্তান রেপ করতে গিয়েছিলো। তাতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

মাহিব আর নাবিল নামে দু'জন ছাত্র বাধা দিতে যায়, আর সেই থেকে মারামারি লেগে যায়। আবার এক খবর জানা গেলো যে, রেপের ঘটনা ঘটেছে কয়েকদিন আগে। মেয়ের বাবা ঐ মাস্টার সাহেব এসেছিলেন ভাইস চ্যান্সেলরের কাছে বিচার চাইতে। ভদ্রলোককে মাহিব আর নাবিল নামে দু'টি ছাত্র সাহায্য করছিলো আর সেটা জানতে পেরে মাস্তানরা এক সঙ্গে ঐ তিনজনের ওপর চড়াও হয়ে মারপিট করে, আরও কতো কিছু শোনা যাচ্ছে।

সালেহউদ্দিন খবরের সংখ্যা আর বাড়ায় না। কিন্তু যতোটুকু ও জানায়, তাতেই রায়হানের ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়তে শুরু করে, মাথা ঝিমঝিম করতে থাকে। বীথি পাশ থেকে বলে ওঠে, এসব কী নোংরা কথা বলছেন আপনি। আমার মঞ্জু রেপ করতে যাবে কোনো মেয়েকে? আপনি জানেন, একটি ভদ্রলোকের মেয়ের সম্মান বাঁচাতে গিয়ে ওর কি রকম হেনস্থা হয়েছিলো? ঐ ছেলে যাবে রেপ করতে– ছিছিছি আপনাকে ঐসব মিথ্যে কথা বললো আর আপনি তা শুনলেন?

আমরা কী করবো বলুন? ভাবী, আপনি আমার ওপর রাগছেন কেন? ওসব খবর যে বাজে আর মিথ্যা সেটা প্রমাণ করার জন্যই তো মাহিবের সঙ্গে কথা বলা দরকার। ওর কাছ থেকেই ইন ডিটেল সব জানতে চাই– আসল ঘটনাটা কী!

আর একটি ছেলের কথা তুমি বললে, ওর কাছে গিয়েছিলে? রায়হান প্রশ্নটা না করে পারে না। সালেহউদ্দিন বলে, আপনি বলছেন ঐ কথা রায়হান ভাই, আমরা তো ট্রেসই করতে পারছি না ছেলে দু'টি কে? ঐ রায়হান নামটা শুনে আপনার কথা মনে পড়েছিলো। আর তাই তো এতদূর পর্যন্ত আসা সম্ভব হলো। মঞ্জু যদি অন্য ছেলেটির ঠিকানা দিতে পারে, তাহলে তো ব্যাপারটা খুবই ইজি হয়ে যাবে।

তা না হয় হলো, খবরটা তোমরা জানলে, রিপোর্টও করলে, কিন্তু ঐ খবর কি ছাপাতে পারবে?

রায়হানের কথা শুনে সালেহউদ্দিন কষ্টের হাসি হাসে। তারপর বলে, এমন খবর শেষ পর্যন্ত ছাপানো যায় কিনা তা তো আপনি ভালো জানেন, রায়হান ভাই, ও কথা বলে কেন আমাকে লজ্জা দিচ্ছেন? ও খবর ছাপানো যাবে কি না সেই হুকুম তো আপনাদের মতো ওপরের দিককার সাংবাদিকদের কাছেই প্রথম আসে, আমরা তো চুনোপুটি।

রায়হান সালেহউদ্দিনের মুখের ওপর থেকে নিজের নজর সরিয়ে নেয়। সে বুঝতে পারে না, সেটা লজ্জায় নাকি ক্ষোভে।

মঞ্জু হাসপাতাল থেকে ছাড়া পায় দিন পাঁচেক পরই। তবে নাকের ওপর টেপ সেঁটে রাখা ছিলো তারপরও বেশ কয়েকদিন। দুপুরের পর বীথি হাসপাতালে ছেলের কাছে থাকতো। ওদিকে রঞ্জুর খবরদারি তো ছিলোই। বীথি গিয়ে না পৌঁছানো পর্যন্ত ঘণ্টায় ঘণ্টায় ডাক্তার কিংবা নার্স এসে দেখে যেতো। রঞ্জু নিজেও আসতো দু'তিনবার। এসে পত্রপত্রিকা দিয়ে যেতো, নইলে মজার মজার কথা বলে ছোট ভাইয়ের মনে ফুর্তি জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করতো। যেসব ঠাট্টা আগে কখনও করে নি, সেইসব ঠাট্টা করতো। একদিন তো বললো, তুই তো দেখছি সত্যি সত্যি রোমিও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

হয়ে যাচ্ছিস। তোর এক রাখি গেলে কি হবে, অন্য রাখিরা তো দেখছি লাইন দিতে শুরু করেছে।

অমন ঠাট্টা করার কারণও ছিলো। তার ক্লাসমেটদের কেউ তাকে দেখতে আসে নি। বরং এসেছিলো তিমলি, পর পর দু'দিন। দু'দিনই সে তার দুই বান্ধবীকে নিয়ে এসেছিলো! দ্বিতীয় দিন এসেছিল যে বান্ধবীকে নিয়ে, সে বেশিক্ষণ ছিলো না। দু'একটা কথা বলেই সে বিদায় নিয়েছিলো। তারপর দু'জন দরজা বন্ধ কেবিনে একাকী। টুলের ওপর বসেছিলো চুপচাপ, প্রথম দিকে কথা বলে নি। তারপর এক সময় জিজ্ঞেস করেছিলো, আচ্ছা তুমি কেন ঐ মাস্টার সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে ভিসির কাছে যাচ্ছিলে, ঠিক করে বলো তো?

মঞ্জু তিমলির প্রশ্নটা ঠিকমতো বুঝতে পারে নি, বিভ্রান্ত চোখ মেলে মুখোমুখি তাকিয়ে ছিলো কিছুক্ষণ। তারপর বলেছিলো, তুমি কী বলতে চাইছো বুঝছি না।

কি মুশকিল। তিমলি যেন একটু বিরক্ত হয়। বলে, তুমি ঐ বুড়ো মাস্টার সাহেবকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছিলে? ভিসির কাছে তো? কিন্তু কেন?

বাহ্ তুমি শোনো নি? মঞ্জু চোখে চোখে তাকিয়ে বলে, একটা মেয়ের সর্বনাশ করে দিয়েছে যারা, তারা এমনি এমনি পার পেয়ে যাবে?

আমি সেই কথাটাই তো জানতে চাইছি, তিমলি ফের জিজ্ঞেস করে, তুমি মাস্টার সাহেবের মেয়ের কথা ভেবে গিয়েছিলে, নাকি রাখির কথা মনে পড়েছিলো বলে গিয়েছিলে।

তার মানে? মঞ্জু বিভ্রান্ত চোখে তিমলির মুখের দিকে তাকায়।

মানে অন্য কিছু না, যারা রাখির সর্বনাশ করেছে, তারাই আবার অন্য আরেকটি মেয়ের সর্বনাশ করেছে– এখন রাখির সর্বনাশের প্রতিশোধ নেয়ার একটা সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে ভেবেই তো তুমি ঐ ভাবে মাস্টার সাহেবকে নিয়ে বেরিয়েছিলে, ঠিক না? আসলে রাখির কথাই তখন তুমি ভেবেছিলে।

মঞ্জু নিজের মনের দিকে তাকায় আর চিন্তা করে, সত্যিই কি রাখির অপমানের প্রতিশোধ নেয়া যাবে, এই চিন্তা ছিলো তখন তার মনে? একবার মনে হয়, হ্যাঁ– ফের মনে হয়, না, তা কেন হবে? হাবিবের ওপরে তার রাগ ছিল বটে। কিন্তু সেই জন্যই কি সে মাস্টার সাহেবকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলো? সে মনের ভেতর থেকে কোনো জবাব পায় না। বরং পাল্টা প্রশ্ন জেগে ওঠে তার মনে। সে না হয় রাখির লাঞ্ছনা আর অপমানের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য ঐভাবে মাস্টার সাহেবকে ভিসির কাছে নিয়ে যাচ্ছিলো। কিন্তু নাবিল? নাবিলের তো অমন কোনো ঘটনা ছিলো না। তাহলে সে কেন গিয়েছিলো?

মঞ্জু নিজের মনের ভেতরে প্রশ্নের জবাব পেয়ে যায়। সে তখন বলে, শুধু রাখির কথা ভেবে কেন যাবো? ধরেও যদি নিই যে আমি রাখির কথা ভেবে গিয়েছিলাম, কিন্তু নাবিল? ও কেন গিয়েছিলো? তার তো রাখির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক ছিলো না।

ঐ রাখির সঙ্গে সম্পর্ক না থাক, অন্য কোনো রাখির সঙ্গে যে তার কোনো সম্পর্ক নেই, তা কি তুমি বলতে পারো?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

সে কি!' মঞ্জু অবাক হয়। বলে, অমন কেউ আছে, তুমি ঠিক জানো ?

তিমলি ম্লান হাসে। বলে, সোশ্যালজির ছাত্রী অনিতাকে চেনো ? গেণ্ডারিয়া এলাকায় ওদের বাড়ি, ওর ওপর হামলা করেছিলো। ইউনিভার্সিটি থেকে ফেরার পথে রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে যেতে চেয়েছিলো। কিন্তু পারে নি। পাড়ার লোকেরা রাস্তা আটকে দেয়ায় পাঁচিল টপকে পালায়।

মঞ্জু খবরটা শুনে থ' হয়ে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ। তিমলি বলে, নাবিল সেদিন পাড়ার লোকদের সঙ্গে ছিলো– ওকে সেদিন চিনতে পারে নি। চিনলে সেদিন ওরা ওকে মেরে ফেলতো–

এই পর্যন্ত বলে তিমলি চোখে চোখে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর ফের বলে, তোমাকেও কি ওরা চিনতে পেরেছিলো যে, রাখির সঙ্গে সেদিন যে ছেলেটি ছিলো সে তুমি!

মনে মনে তিমলির কথা বোঝার চেষ্টা করে মঞ্জু। কিন্তু পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারে না। তখন রাখিকে তুলে নিয়ে যায়, তখন তো সে বাধা দিয়েছিলো, ওদের সঙ্গে ঘুষোঘুষিও তার হয়েছিলো অথচ তাকে চিনে রাখবে না ওরা, এ কী হতে পারে ?

তিমলি বলে, শোনো, খবরের কাগজে খুব লেখালেখি হচ্ছে। তাতে পুলিশ কেস হতে পারে আর তখন হয়তো তোমাদের সাক্ষী দেয়ার জন্য ডাকতে পারে আর তোমরা কেউ যদি সাক্ষী দিতে যাও, তাহলে কি মনে করো ওরা কাউকে ছাড়বে ? কিছুতেই ছাড়বে না। একেবারে শেষ করে দেবে। অনিতার কাছে শুনলাম, নাবিলের বাবা ছেলেকে বিদেশে পাঠিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছে। ওদের তো অনেক টাকা। হয়তো পাঠিয়ে দেবে শিগগির। কিন্তু তুমি ? তুমি কী করবে ?

মঞ্জু মনোযোগ দিয়ে তিমলির কথা শোনে। কথা বলার সময় তার চেহারা অন্য রকম দেখায়। আদুরে হালকা স্বভাবের মেয়ে বলে তখন একদম মনে হয় না। সে তিমলিকে দেখে আর তার মনে প্রশ্ন জাগে। মেয়েটা তাকে এভাবে কেন সাবধান হওয়ার কথা বলছে ? সে হাসতে হাসতে বলে, তুমি দেখছি রীতিমতো ডিটেকটিভের কাজ নিয়েছো– এতো খবর তুমি কীভাবে যোগাড় করলে ? আর এসব খবর আমাকে শোনাচ্ছোইবা কেন ? আমার মাথায় কিছুই ঢুকছে না।

তিমলি হাসে। বলে, ঢুকবে না তা জানি, গণ্ডার নামটা তো আর এমনি এমনি দিইনি– যদি গণ্ডার না হয়ে অন্য কিছু হতে, তাহলে মগজে ঠিকই ঢুকতো যে আমি সাবধানে চলাফেরা করার জন্য এসব বলছি। এবার বুঝেছো হাঁদারাম কোথাকার ? তোমার মতো হাঁদা ছেলে আমি জীবনে দেখি নি।

মঞ্জুর হাত ধরে তিমলি। কৌতুকে না আবেগে সেটাও মঞ্জু ঠিক বুঝতে পারে না। তিমলি বলে, প্লীজ ওভাবে তুমি মাস্তানদের সঙ্গে লাগতে যেও না– আমার কেমন ভয় লাগে আজকাল; সেদিন যখন তোমাকে দেখি, তখন আমার ভীষণ ভয় লেগেছিলো। মনে হচ্ছিলো, হাসপাতালের পথে আবার ওরা তোমার ওপর হামলা করবে।

বোকার মতো তাকিয়ে থাকে মঞ্জু। তার বিশ্বাস হতে চায় না। জামা-কাপড়ে, চলাফেরায়, কথাবার্তায়, লেখাপড়ায় অত্যন্ত স্মার্ট বুদ্ধিমতী, সুন্দরী তিমলি নামের মেয়েটি কি সামনে বসে তার হাত ধরে রয়েছে, নাকি এ অন্য কোনো মেয়ে!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আরও ঘটনা ঘটে সেদিন। বীথি কেবিনে ঢোকার মুখে পর্দার আড়াল থেকে তিমলিকে অমনভাবে মঞ্জুর হাত ধরতে দেখেছিলো। সে থমকে দাঁড়ায় এবং মিনিটখানেক দাঁড়িয়ে তিমলির কথা শোনে। কেবিনের ভেতরে ঢুকে সে তার ছেলের সামনে অন্তরঙ্গ ভাবে বসা মেয়েটিকে ভালো করে দেখে। প্রথমে তার মনের ভেতরে খুশি আর কৌতুক দুই-ই ছলকে ওঠে কিন্তু বাইরে সেটা সে প্রকাশ করে না। কারণ ঐ মুহূর্তে শাহনির কথাও তার মনে পড়ে। তবে মজা যে লাগে, সেটা সে অস্বীকার করতে পারবে না। বিছানায় ছেলের পাশে বসে মুখোমুখি তাকায় সে। তারপর ছেলের দিকে তাকিয়ে বলে, এরই নাম তিমলি। তাই না?

মঞ্জু অবাক হয়। আম্মা কীভাবে ওর নাম জানলেন? ততোক্ষণে তিমলি হাত তুলে সালাম জানিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। বলে, আমি এবার যাই–

বীথি তার হাত ধরে থামায়। বলে, এক্ষুণি উঠবে কেন? আমার সঙ্গে একটু গল্প করবে না?

ঐ কথায় মেয়ের মুখে লজ্জার আভা দেখা যায়। বীথি হাসতে হাসতে বলে, আমার এই ছেলেটা খুব বোকা, এমন বোকা যে তোমার নামটাও আমার কাছে কখনও বলে নি। তোমরা কি একই ক্লাসে পড়ো?

তিমলি মুখ নামানো অবস্থাতেই বলে, না আমি হিস্ট্রি পড়ি। আমার ক্লাস হয় আর্টস বিল্ডিংয়ে।

বীথির মজা লাগে, বেশ কৌতূহলও হয়। ছেলের দিকে এক নজর তাকিয়ে দেখে নেয়। ছেলে তো আর ছোটটি নেই। এক সঙ্গে এক ক্লাসে পড়ে না, তবু বান্ধবী বানিয়ে বসে আছে। তিমলি ফের উঠে দাঁড়িয়ে বলে, এবার আমি যাই।

বীথি হাত ধরে জিজ্ঞেস করে, কবে তুমি আমাদের বাসায় আসবে, সেটা আগে বলো, তারপর তোমাকে আমি যেতে দেবো।

তিমলি মাথা নিচু করে হাসে। বলে, যাবো একদিন, আপনাকেও আমাদের বাসায় আসতে হবে।

হ্যাঁ অবশ্যই যাবো, কিন্তু তুমি কবে আসছো?

খুব শিগগিরই একদিন চলে যাবো, হঠাৎ গিয়ে আপনাকে চমকে দেবো।

তিমলি চলে গেলে বীথি মন্তব্য করে, বেশ তো মেয়েটি? কতোদিন ধরে তোদের বন্ধুত্ব?

এই তো অল্প কিছুদিন, মঞ্জু মাথা নিচু করে জবাব দেয়।

মঞ্জু তিমলির সলজ্জ ভঙ্গি, আবেগে তার হাত জড়িয়ে ধরা, তার উদ্বিগ্ন গলার স্বর এ সবের কোনো কিছু নিয়ে ভাবে না। তার খালি চিন্তা হয়, নাবিলের খবরটা শুনে– সত্যি সত্যি কি ও বিদেশে চলে যাবে? মাস্তানরা ওকে মেরে ফেলবে শুধু এই ভয়ে? পুলিশী মামলা হলে ওকে সাক্ষ দিতে হতে পারে, সে জন্যই সে পালাবে?

চিন্তাটা তার মনের ভেতরে খালি ঘোঁট পাকাতে থাকে। মাস্তানরা যে খুন করতে পারে, সেটা তো তার চেয়ে আর ভালো কেউ জানে না। ফেরদৌসকে কীভাবে খুন করা হয়েছে, সেটা তো তার অজানা নেই। মাস্তানরা অবশ্যই খুন করতে পারে। কিন্তু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

শুধু সাক্ষী দেয়ার জন্য কেন খুন করবে, সেটাই তার মাথার মধ্যে ঢুকতে চায় না। ফেরদৌসকে না হয় টাকার জন্য খুন করেছে। কিন্তু সাক্ষী দেয়ার জন্য কেন খুন করবে? সাক্ষী দেয়া মানেই তো আর শাস্তি নয়। মামলা চললে পক্ষে-বিপক্ষে সাক্ষী দেয়া হয়, বহুদিন ধরে শুনানি চলে, তারপর রায় হলে তবে না শাস্তির ঘটনা– অনেকের মামলায় তো শাস্তি হয়ও না– তাহলে?

কিন্তু কতোকাল ধরে এসব চলবে? তার কুড়ি বছর বয়সের জীবনের দিকে তাকিয়ে সে প্রশ্ন করে। কতোদিন ধরে এসব চলবে? গুণ্ডামি বদমায়েশি, মাস্তানি, রেপ এসব কি কখনই বন্ধ হবে না? সরকার যে গুণ্ডা-বদমায়েশদের পুষে রাখে, সেটা তো সবাই জানে। বিরোধী দলের রাজনীতি যারা করে, তাদেরও তো ঐ একই কাজের ধারা। তার মানে, সেই ক্ষমতায় বসা। আজ যদি এ-পক্ষ তো কাল ও-পক্ষ। তার মানে তাকে আবার মার খেতে হবে– হয়তো তিমলি যে ভয় করছে, তেমন ভাবেই তাকে মরে পড়ে থাকতে হবে রাস্তায়। আজ হোক, কিংবা কাল। নইলে ল্যাজ গুটিয়ে পালাতে হবে।

হাসপাতালে থাকতে থাকতেই এই এক চিন্তা তাকে অস্থির করে তোলে। ঐ সময়ই বারবার করে হামিদের কথা মনে পড়তো। জনগণের বিপ্লব হলে এসব থাকবে না। থাকার কোনো পথই থাকে না। এঙ্গেলসের বইটা এখনও সে পড়ে শেষ করতে পারে নি। শুধু থিসিস এন্টিথিসিসের ব্যাখ্যাটা সে বুঝেছে। সারপ্লাস ভ্যালু কীভাবে ক্যাপিটাল বাড়ায় আর ক্যাপিটাল বাড়লে কীভাবে শোষণ বাড়ে, এটাও সে অল্প অল্প বুঝতে পারে। কিন্তু গোটা ব্যাপারটা কীভাবে ঘটবে, সেটাই তার মাথায় আসে না। হামিদ খালি বলে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে সবকিছু হবে কিন্তু শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বটাই বা কীভাবে হবে, সেটা সে ব্যাখ্যা করে বোঝাতে পারে না।

হাসপাতাল থেকে বেরুবার আগের দিন হামিদ আসে তাকে দেখতে। নাকের ওপর তখনও পট্টি বাঁধা। ওটা দেখে হামিদ হাসে। বলে, শেষ পর্যন্ত তোর নাকের ওপর হামলাটা চালালো ওরা?

মঞ্জু পাল্টা হাসে। বলে, কী করবো নাকটাকে যে পিছিয়ে রাখা যায় না, ওটাই যে শরীরের ফ্রন্টাল পয়েন্ট।

হামিদ হাসে না। বলে, আমি সব শুনেছি, আমি বুঝি না, তুই এসব ঝামেলার সঙ্গে নিজেকে কেন জড়াস? একাকী এসব করা যায়? সংগঠন দরকার, একাকী কিছু করতে গেলে খামোকা মার খাবি।

কিন্তু কেউ কিছুই করবে না। এটাও কি ঠিক? মঞ্জু প্রশ্ন না করে পারে না।

হামিদ স্বীকার করে। অবশ্যই তা ঠিক নয়, কিন্তু তুমি যে প্রতিবাদ করবে সেটা কোন শক্তিতে, কিসের ওপর দাঁড়িয়ে, সেটা বিবেচনা করতে হবে না? যদি বিপ্লবী সংগঠন থাকতো ইউনিভার্সিটি এলাকায়। তাহলে মাস্তানি বলে কিছুই থাকতো না– ওরা তো আসল শক্তি না, ওদের পেছনে যারা আছে, তারা হলো আসল দোষী আর ঐ দোষীদের গায়ে কেউই হাত দেবে না– সরকার না, পুলিশ না। সুতরাং খামোকা একাকী বাধা দিতে যাওয়া কেন। কাজের কাজ কিছুই হবে না। খামোকা মার খেয়ে মরবে, আর তা[illegible]র দাপট আরও বাড়বে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

তাহলে ? মঞ্জু পট্টি বাঁধা নাকটাকে ছাদ বরাবর তুলে ধরে চিৎ হয়ে জিজ্ঞেস করে, তাহলে আমার বন্ধুত্ব করা বন্ধ, লেখাপড়া বন্ধ, ভালোবাসা বন্ধ, এমনকি বাইরে যে বন্ধু-বান্ধবী নিয়ে ঘুরে ফিরে বেড়াবো, তাও বন্ধ– তাই না ? তাহলে কী করবো ?

হামিদ হাসে। বলে, কেন, প্রেমিকাকে নিয়ে হোটেলে-রেস্তরাঁতে যাবে। সেখানে খাবে-দাবে, প্রেম করবে। ওসব জায়গায় হামলা কম হয়। কারণ হোটেল মালিকদের ব্যবসা চালাতে হবে।

হাসাহাসিটা শেষ পর্যন্ত ভালোমতো জমে না। কারণ হামিদ একটা দুঃসংবাদ শোনায়। বলে, একটা দুঃসংবাদ আছে– মাসুমরা ধরা পড়েছে।

মঞ্জুর বিশ্বাস হতে চায় না। বলে, কীভাবে, কোথায় ? হামিদ লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে বলে, যেভাবে হয়, সেভাবেই– বলেছিলাম, কিছুদিন থেকে যা– শুনলো না। বললো, অনেক কাজ আছে– নিজের জায়গাতে যাই– মাধবদীতে– ওদিকে আবার গ্রুপিং ছিলো। এটা-ওটা নিয়ে গ্রুপে গ্রুপে বিরোধ ছিলো, এখনও আছে। এক গ্রুপ কথায় কথায় নেতৃত্বের ব্যর্থতার কথা বলতো, আর বলতো, এমন আন্ডারগ্রাউন্ড রাজনীতির আর দরকার নেই– এখন আমরা ওপেন রাজনীতি করতে চাই। এই ধুয়া তুলে কয়েকজন পুলিশের কাছে সারেন্ডারও করে বসলো। ফলে শুরু হয়ে গেলো সন্দেহ আর অবিশ্বাস। সবাই সবাইকে সন্দেহ করে। অমন একটা অবস্থা সামাল দেয়ার জন্য মাসুম গিয়েছিলো। অমন কাহিল শরীরে কি ধকল সয় ? নতুন জায়গায় সরে যাওয়ার পথে ও ধরা পড়ে গেলো।

তাহলে, এখন ? মঞ্জুর মুখ দিয়ে প্রশ্নটা যেন আপনা থেকে বেরিয়ে আসে।

এখন যে কী হবে, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। মঞ্জু হামিদের কথা শুনে চুপ হয়ে যায়।

জীবন তাহলে এমনই থেকে যাবে ? এই একই রকম ? মানুষকে শোষণ করা হবে নির্বিচারে গুণ্ডামি চলবে, বদমায়েশি চলবে, মিথ্যাচার চলবে বছরের পর বছর ধরে, যুগের পর যুগ ধরে, রাখি, মাস্টার সাহেবের মেয়ে কিংবা হতে পারে তিমলিও– এই একই পাকচক্রে বাঁধা।

মঞ্জু এক সময় হামিদের হাত ধরে। বলে, হামিদ তুই আমাকে অন্য কমরেডদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিবি ?

মঞ্জুর আগ্রহ দেখে হামিদ কী ভাবে, সে-ই জানে। সোজাসুজি হ্যাঁ বলে না। অনিশ্চিত ভঙ্গিতে জানায়, দেখি ওরা যদি এদিকে আসে, তাহলে বলে দেখবো··· রাজি হবে কিনা বলা মুশকিল।

ভেতরে ভেতরে কিছুটা আহত হলেও মঞ্জু বাইরে সেটা প্রকাশ করে না। বরং সাগ্রহে জানতে চায়, তুই ফের কবে আসবি ?

হামিদ এবারও অনিশ্চিত ভঙ্গিতে বলে, দেখি কবে আসা যায়। ইউনিভার্সিটিতে রেগুলার ক্লাস হচ্ছে না, ভাবছি, এখন কিছুদিন বাড়িতে গিয়ে থাকি।

ঐ কথা বলে হামিদ বিদায় নেয়। ও চলে গেলে মঞ্জুর সন্দেহ হয়, হামিদ কি তাকে বিশ্বাস করে না ? চিন্তাটা তার মনে ভালো করে ঠাঁই গাড়তে না গাড়তেই রঞ্জু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

এসে কেবিনে ঢোকে। বলে, যা আজই তোর ছুটি– রিলিজ করে দেয়া হচ্ছে তোকে। মা এলে তুই মায়ের সঙ্গে বাসায় চলে যাবি।

ছেলে বাসায় চলে এলেও রায়হান নিশ্চিন্ত বোধ করতে পারে না। কারণ ইউনিভার্সিটি এলাকার নানান খবর তার কানে আসছিলো। তারপর আমানউল্লাহ নিজের থেকে সেদিন যা বললেন, তারপরে কোন বাপ নিশ্চিন্ত বোধ করতে পারে ?

সেদিন সালেহউদ্দিন আর নতুন দুই রিপোর্টার আদিব আর কায়সারকে নিয়ে ইউনিভার্সিটির ঘটনা নিয়ে আলাপ করছিলো। ঐ আলাপে কথা উঠেছিলো ছাত্রদের ঐক্যের প্রশ্ন নিয়ে। আর নতুন দুই রিপোর্টারই বলছিলো, ছাত্রদের ঐক্য এই হলো বলে। ঐ সময় আমানউল্লাহ ওদের মধ্যে গিয়ে পড়েন। ওদের আলাপ শুনতে শুনতে এক সময় হেসেও ওঠেন। রায়হানও ওদের আলাপ শুনতে শুনতে চা খাচ্ছিলো। সে কিছু বলে নি। কিন্তু আমানউল্লাহ সাহেবকে ঐভাবে হেসে উঠতে দেখে তার মনে একটু খটকা লাগে। সে তাঁর পেছনে পেছনে যায়। আমানউল্লাহ নিজের কামরায় না ঢুকে প্যাসেজে দাঁড়ান। রায়হান কিছু প্রশ্ন করার আগেই বলে উঠলেন, শুনলেন ওদের কথা ? সাংবাদিক হতে এসেছে, কিন্তু বুদ্ধির বহরটা দেখলেন ? কী আলাপ হচ্ছিলো শুনেছেন ?

হ্যাঁ শুনলাম তো, রায়হান স্বীকার করে।

চিন্তা করুন, কী সব ধারণা। ঐ বুদ্ধি নিয়ে ওরা রিপোর্টার হবে ?

কেন, রায়হান জানতে চায়, ওদের বুদ্ধির মধ্যে কী দেখলেন।

বাহ্ শুনলেন তো, ছাত্ররা আন্দোলন করবে আর তাতেই সরকার ধপাস করে উল্টে পড়ে যাবে– যেন গাছের পাকা আম আর কি ! ঢিল ছুঁড়লেই টুপ করে পড়ে যাবে।

রায়হানের হাসি পায় আমানউল্লাহ সাহেবের কথার ধরন দেখে। বলে আমান ভাই, দল বেঁধে ঢিল ছুঁড়লে তো কাঁচা হোক, পাকা হোক, সব আমই পড়ে যায়। যায় না, বলুন ? আইয়ুব মোনেম খান তো ঐভাবেই গিয়েছিলো, আমরা সবাই জানি, যায় নি, বলুন ?

আরে নাহ্, কী যে বলেন না আপনি! ব্যাপারটা অতো সোজা নয়– ছাত্রদের ঐ ঐক্য ফৈক্য হচ্ছে না– আর এদিকে সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে, কোনো রকম বাড়াবাড়ি সহ্য করা হবে না, পুলিশ যদি ঠিকমতো কাজ না করে, তাহলে সরকারী ছাত্রদলের ক্যাডাররা সেই কাজ করবে। তাদের বলে দেওয়া হয়েছে। যেভাবে পারে তাদের আন্দোলন ঠেকাতে হবে, যদি তাতে খুন জখম হয়ে যায়, কোনো পরোয়া নেই– দেখুন না কী হয়– ইউনিভার্সিটি এলাকায় ছাত্রদের লম্ফঝম্ফ এই শেষ হয়ে এলো বলে, সাধারণ ছাত্ররা জাতীয় ছাত্র সমাজে যোগ না দিয়ে পারবে না।

আমানউল্লাহ সাহেবের মুখে ঐ কথা শোনার পর রায়হানের রীতিমতো চিন্তা হয়। মঞ্জুর ওপরে এরই মধ্যে দু'তিনবার হামলা হয়ে গেলো, ওতো এখন অনেকের কাছেই চেনা। ছাত্র রাজনীতি করলে না হয় ওকে নিজের দলের ছেলেরা পাহারা দিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

রাখতো– ওর তো কোনো দল নেই। ও একা একা মেয়েদের ওপর হামলা ঠেকাতে যায়– যদি কোনো মাস্তানের সঙ্গে ফের মুখোমুখি হয়, তখন কি সে মঞ্জুকে ছাড়বে? সরকারী দলের পক্ষ থেকে তো বলেই দেওয়া হয়েছে, দু'চারটা খুন জখম হয়ে গেলেও তাতে কিছু হবে না। রায়হানের বুকের ভেতরে আশঙ্কা থমথম করে।

মঞ্জুর জন্য আশঙ্কা শুধু রায়হানের নয়, বীথির তো বটেই। এমন কি রঞ্জুরও। একদিন রঞ্জু এসে বলে গেল, খবরদার তুই ইউনিভার্সিটিতে কিছুদিন যাবি না।

কিন্তু আমার যে ক্লাস নষ্ট হচ্ছে? মঞ্জু বোঝাতে চেষ্টা করে। কিন্তু রঞ্জু তার কথায় কানই দেয় না। বলে, আমি তোর কোনো কথা শুনতে চাই না– তোর বাড়ি থেকে বেরুনো বন্ধ।

একদিন আব্দুল্লাহ বললো, খবর শুনেছেন রায়হান ভাই, ছাত্রদের দুই গ্রুপে নাকি ঐক্যের সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে?

রায়হান শুনে অবাক হয়। বলে, আমার বিশ্বাস ছিল ঐক্য হবে, কিন্তু এতো তাড়াতাড়ি? আমার বিশ্বাস হতে চায় না।

সেদিন বাড়ি ফেরার সময় রায়হান হাঁটে। দূর তো বেশি নয়। হাঁটতে হাঁটতে লক্ষ্য করে রাত বেশি না হলেও গাড়ি চলাচল কেন কম? রিকশাও বেশি দেখা যায় না। তার পুরনো দিনের কথা মনে পড়ে। '৬৮/'৬৯-এও এমনই রাতের কাজ সেরে হাঁটতে হাঁটতে সে বাসায় ফিরতো, তখনও গাড়ি কমে যেতো রাস্তায়। কোনো স্লোগান শোনা যেতো না, তবু। গুলির আওয়াজও শোনা যেতো না। তবু মনে হতো, কোথাও যেন কিছু হচ্ছে। আজও তার এমনই মনে হচ্ছে। তবে বাতাসের গন্ধটা অন্য রকমের, বারুদের মতো কি? সে টেনে নিঃশ্বাস নেয়। কিন্তু গন্ধটা বারুদের বলে মনে হয় না। তবে গন্ধটা যে অন্য রকমের তা ঘ্রাণে সে স্পষ্ট টের পায়। সময়ের কি তাহলে পাশ ফেরার সময় হয়েছে? মানুষের আশা আর সাধ কি ফের ফুলে ফেঁপে উঠেছে? বন্দুক রাইফেলের বিরুদ্ধে কি সম্মিলিত মানুষের মুষ্টিবদ্ধ হাত আকাশের দিকে উৎক্ষিপ্ত হওয়ার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছে। স্মৃতি থেকে ঘ্রাণ যেন ভেসে আসে– আর আসে দিগন্ত প্রসারিত আসন্ন স্লোগানের আভাস। ঘণ্টা বাজবার যেন আর দেরি নেই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই হয় না। স্মৃতির ছবি এবং গন্ধ পুরোপুরি পাবার আগেই সে বাসায় পৌঁছে যায়।

পরদিন সকালেই দরজায় ঘন ঘন ধাক্কা। দরজা খুললে দেখা যায় বাহারুল্লাহ মুনশি দাঁড়িয়ে। তার চোখে মুখে উদ্বেগ আর উত্তেজনার চিহ্ন। রায়হান জিজ্ঞেস করে, কী খবর মুনশি?

স্যার, মুনশির গলা ভেঙে যায় কথা বলার সময়। বলে, আপনের জমিন দখল কইরা নিছে, গুণ্ডা মাস্তানগিনিরে আমি চিনি না– কই থিকা যে আইছে, কইতে পারি না। দরজায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মুনশি হড়বড় হড়বড় করে কী যে বলে, ঠিক বুঝতে পারা যায় না। লোকটাকে ঘরের ভিতরে এনে বসানো হয় তখন। তারপর মুনশি ঘটনাটা বর্ণনা করে। বলে, স্যার আপনারে কইছিলাম, পাকা কিছু কইরা ফালান, কিন্তুক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

হোনেন নাই, অহন কী হইবো কন ! যারা দখল করছে, তাগো মনে হয় বহুত শক্তি, শুনলাম মেম্বর চেয়ারম্যান তো অগো সাথে রইছেই, থানা পুলিশের লগেও হ্যাগোর লাইন পাকা।

ঘটনাটা কী হয়েছে, সেটা বলেন না কেন ? বীথি বিরক্ত হয়ে বলে।

কী আর হইবো আপা, আইজ ভোরে জয়ধর ঋষির পোলা শশধর আইয়া কইল, তার বাপরে কয়েকটা লোক নাকি কাইল রাইতে আইয়া মাইরা খেদাইয়া দিছে, আর এমন মারছে যে ল্যাংড়াইতে ল্যাংড়াইতে সে বাড়িত যাইয়া সেই যে বিছানায় হুইছে আর উঠতে পারে না। ঐ খবর হুইনা আমি আর থাকতে পারলাম না, ছুইট্টা গেলাম। গিয়া দেহি, চালাঘরখান ঠিকই আছে, কিন্তু বেড়ার লগে যে সাইনবোর্ডখান লাগাইছিলেন সেইখান নাই। খুটাত বাইন্দা একখান নতুন সাইনবোর্ড লাগাইছে– আবার চালাঘরের ভিৎরে বইয়া তিনটা ব্যাটা বিড়ি টানতাছে, আমারে দেইখা ধমক দিল, এই ব্যাটা কী চাস এইহানে– যা ফুট্ এখান থিকা।

আমি কইলাম, ক্যান, আপনেরা কেডা ? জয়ধর ঋষি কই ? তো কয়, ঋষি ঠিষি এইহানে থাহে না– আমরা এই জমিনের মালিকের লোক। আমি কই, মালিক কে ? তো আমারে জবর একখান ধমক দিল, কইলো, ক্যান চোউক্ষে দ্যাহো না– সাইনবোর্ড রইছে, পড়বার পারো না ? আমি দেহি ল্যাহা রইছে, সিএস খতিয়ান পরচা মূলে এই জমির মালিক মৃত গরিবুল্লাহ মুনশির পুত্র আর কন্যার পুত্র কন্যারা— তারপর লিখা জমিনের দাগ নম্বর খতিয়ান নম্বর সবই। আমি কী করি, ছুইটা গেলাম কুতুবউদ্দিন ভাইয়ের বাড়ি, গিয়া কইলাম সব বির্তান্ত, তো হ্যায় কইল, সব তাগো শয়তানি, এক খতিয়ানে গরিবুল্লাহ মুনশি থাকলে কি ? তিদিব দত্ত সেই জমিন কিনছে সাতাইশ সালে। সেই তিদিব দত্তের থিকা কিনছে আমার বাপে। আমার বাপের নামে তো জমিন রেকর্ড হইছে, আমরা খাজনা পাতি সবই দিছি, ২৫ বচ্ছর ধইরা আমরা চাষাবাদ করছি ঐ জমিন, তাইলে এইসব কী কয়। আরও কইল, হ্যারা কিছু করতে পারব না। আইন আছে না ? তাও আমার মন মানল না। তাই ছুইট্টা আইছি– আপনের যাওন লাগব, চলেন একবার অক্খনই– দেরি করা ঠিক না।

রায়হান প্রথম দিকে বুঝতে পারে না। কারণ জমি কেনার সময় তো কাগজপত্রের সমস্ত কিছুই সে তার উকিল বন্ধু মাহফুজকে দেখিয়ে নিয়েছে। কুতুবউদ্দিন তার হাতে এসএ পরচা, আরএস পরচা, নাম খারিজের কাগজ, খাজনার রসিদ– এমন কি তার নিজের নাম জারি করার ব্যবস্থাও কুতুবউদ্দিনই করে দিয়েছে– তারপরও জমি বেদখল কীভাবে হয় ? তাহলে কি মাহফুজ দলিলপত্র ভালো করে না দেখেই জমিটা কেনার পরামর্শ দিয়েছে ? সে ডায়েরি খুলে মাহফুজের ফোন নম্বর বের করে ফোনে তাকে জিজ্ঞেসা করে। মুনশি যা যা বলেছিলো সব জানালো। মাহফুজ মনোযোগ দিয়ে পুরোটা শোনে। তারপর বলে, তুমি একবার নিজে যাও। ব্যাপারটা দেখে এসো, আর যে সাইনবোর্ড লাগিয়েছে তাতে যা যা লেখা আছে সব টুকে এনো। আর শোনো, মাহফুজ গলার স্বর এবার গম্ভীর করে বলে, একা যেও না, কেউ যেন সঙ্গে থাকে, বুঝেছো ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

রায়হান জবাবে হাসে। বলে, বুঝেছি, ওখানকার লোকই থাকবে আমার সঙ্গে।

ডোন্ট টক ননসেন্স! মাহফুজ প্রায় ধমক দিয়ে ওঠে। বলে, ঐ ধরনের লোকের কথা আমি বলি নি, আমি নিজের লোক বলতে ছেলে, ভাই, ঘনিষ্ঠ বন্ধু, এদের মীন করেছি। তোমরা খবর পাও কিনা জানি না, কিন্তু আমরা তো খবর পাচ্ছি, ঢাকা শহর আর তার আশপাশের এলাকাগুলোতে জমি দখলের হিড়িক পড়ে গেছে, মামলা মোকদ্দমা তো হচ্ছেই। খুন জখমও হচ্ছে বিস্তর, এমন অবস্থায় সাবধান থাকলে সেটা দোষের কিছু নয়, তারপর ফোনটা নামিয়ে রাখে। তবে মাহফুজের সঙ্গে ঐ কথা হওয়ার পর সে চিন্তায় পড়ে যায়। সে যদি ফুলবাড়িয়ায় যায়, তাহলে কি বিপদ হতে পারে তার ? তাকে কি কেউ খুন করে ফেলতে পারে ? তার বিশ্বাস হতে চায় না। আর যদি অমন ভয় থাকেও, তাহলে কি সে যাবে না ? তার নিজের কেনা জমি অন্য লোক দখল করে নেবে ?

সে মুনশিকে বলে, ঠিক আছে, তাহলে আর দেরি কেন ? চলুন বেরিয়ে পড়ি।

মুনশি পা বাড়িয়েও থেমে যায়। বলে, আর কেউরে লইবেন না ?

কেন, আমি একলা গেলে হবে না ?

মুনশি মুখ নিচু করে বলে, তা হইব, কিন্তু জমিজমার ব্যাপার, বুঝেনই তো– দিনকাল তো ভালা না।

ওরা কি মারামারি করতে পারে ?

মুনশি মুখ নিচু রেখেই মাথা দোলায়, বলে, কইলাম তো, কিছু কওন যায় না, কেউ লগে থাকলে ভালো।

রায়হান চিন্তায় পড়ে যায়। সঙ্গে সে কাকে নেবে। ছেলেরা হিসাব থেকে বাদ, বড়টি হাসপাতালের ডিউটিতে, মেজোটি বিছানায় শোওয়া আর ছোটটি তো অপোগন্ড নাবালক– ভাই বলতে একজন, সেও ঢাকায় আছে কিনা, জানে না। এ সময় তো সে ট্যুর করতে যায়। আর রংপুর যে ভাই থাকে, তাকে খবর দিয়ে ঢাকায় আনতে গেলে তিন চারদিনের ধাক্কা– এ তো গেলো ছেলে আর ভাইয়ের হিসাব। বাকি রইলো কে ? ঘনিষ্ঠ বন্ধু– তো ঘনিষ্ঠ বন্ধু কি তার আছে ? ছিলো কখনও ? তার মনে পড়ে না। তাহলে সালেহউদ্দিনকে ? সে মনে মনে পথের সঙ্গী খুঁজতে থাকে। ভেবে পায় না শেষ পর্যন্ত, কাউকে সে সঙ্গে নিতে পারবে কিনা।

ওদিকে মুনশির তাগিদ ক্রমেই জোরালো হয়ে উঠতে থাকে। সে এমন অস্থির হয়ে ওঠে যে, মোমেনাকে নাস্তা তৈরির সময়টুকু পর্যন্ত দেয় না। দোকান থেকে পাউরুটি আর ডিম দিয়ে নাস্তা সেরে দু'জনে বেরিয়ে পড়ে।

মুনশিকে সঙ্গে নিয়ে সে প্রথমে অফিসে যায়। তার মনে হচ্ছিলো, মুনশিকে সে আগেভাগে বিদায় করে নিজে কোনো সঙ্গীকে নিয়ে রওনা হবে। কথাটা মুনশিকে বলা হলে সে এমন ভাব করে যেন কী বলা হচ্ছে তার আগামাথা সে কিছুই বুঝছে না। বার তিনেক বুঝিয়ে বলা হলে সে যেন কিছুটা বুঝলো। তবে তার এক কথা, সঙ্গী একজনকে নিতে গেলে যদি দেরি হয়, তাহলে হবে– দেরি করতে সে রাজি, কিন্তু সে কিছুতেই একাকী যাবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

যদি বেশি দেরি হয় ?

হইলে হোক, তার ফল আপনে টের পাইবেন, আমার কি ? মুনশি যেন একটু রাগ করছে বলে রায়হানের মনে হয়।

শান্তশিষ্ট লোকটা যে রাগতেও পারে তার প্রমাণ এই প্রথম পেলো রায়হান। সে বললো, ঠিক আছে তাহলে আপনি বসুন, আমি ওদিকে দেখি, কাউকে পাওয়া যায় কিনা।

মুনশি টেবিলের পাশে চেয়ারে বসে খবরের কাগজের ফাইল দেখতে দেখতে মশগুল হয়ে গেলে সে টেলিফোনে হারুন সাহেব আর আমানউল্লাহ সাহেবকে দুপুর বেলা অফিসে থাকতে না পারার ব্যাপারটা বোঝায়। তারপর অফিস থেকে যে একজনকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে সে খবরটা জানাতেও সে ভোলে না।

এদিকে দেখতে দেখতে দশটা বেজে যায়। একে একে সবাই এসে যায়। শুধু দু'জনেরই পাত্তা নেই। না সালেহউদ্দিন, না আব্দুল্লাহ। এদিকে মুনশি অস্থির হয়ে উঠলে সে আর দেরি করে না। অফিস থেকে বেরিয়ে সোজা বাসে গিয়ে চাপে।

টিনের চালা ঘরখানি দুপুরের রোদে দূর থেকেও পরিষ্কার চোখে পড়ে। এমন কি তার বন্ধ ঝাঁপখানিও দিব্যি দেখা যায়। কাছাকাছি হলে লক্ষ্য করে, কি যেন নেই ঘরখানিতে। পরক্ষণে স্মরণ হয়। মুনশি বলেছে, বেড়ার গায়ে লাগানো সাইনবোর্ডখানা খুলে নিয়ে গেছে। তাতেই যে একটু অন্য রকম দেখতে লাগে চালা ঘরখানাকে– তার ওপর সে লক্ষ্য করে। কাঠের খুঁটিতে লাগানো সাইনবোর্ডখানা থাকায় পুরো জায়গাটাই খানিক যেন বদলে গেছে। সাইনবোর্ডে যা লেখা তা হাঁটতে হাঁটতে এক নজরে পড়া যায় না। বেশ লম্বা একটা বিবরণ। খতিয়ান পরচা, দলিল ইত্যাদির সঙ্গে মালিক আর তার ওয়ারিশদেরও নাম লিখে দেয়া হয়েছে সাইনবোর্ডে। ঐ লম্বা বয়ান পড়তে হলে দাঁড়াতে হবে। রায়হান দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে– সিএস পরচা মোতাবেক, মৌজা ফুলবাড়িয়ার ৩৭৭ নং দাগের জমির ষোল আনা মালিক মোহাম্মদ গরিবুল্লাহ মুনশি, তাহার মৃত্যুর পরে দুই সন্তান করিমউল্লাহ এবং মোসাম্মাৎ শহরবানু ৩৭৭নং দাগের জমির মালিক হন। করিমউল্লাহর মৃত্যুর পূর্বেই তাহার পুত্র মৃত হইলে ঐ সম্পত্তির ওয়ারিশ সূত্রে বর্তমান মালিক শহরবানুর দুই পুত্র মোবারক হোসেন ও গোলজার হোসেন এবং করিমউল্লাহর কন্যা চাঁদ বানুর তিন কন্যা ১। আকিমুন্নেছা, ২। আয়েতুন্নেছা এবং ৩। গোলবদন বেগম– এই পাঁচ জন ৩৭৭ নং দাগের সমুদয় জমির ওয়ারিশসূত্রে বর্তমান মালিক।

পড়তে গেলে মাথা গুলিয়ে যায়। চার পুরুষের বৃত্তান্ত ঐ এক সাইনবোর্ডে লটকানো, মাথা ঠিক রাখা সোজা ব্যাপার নয়। রায়হান নজর সরিয়ে চালা ঘরের ওপর এনে মনোযোগী হয়। চালা ঘরের ঝাঁপ ভিতর থেকে বন্ধ। তাতে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, ভিতরে লোক আছে। রায়হান ঝাঁপটা খোলার জন্য ভিতরের দিকে ঠেলা দেয়। কিন্তু ভিতর থেকে কোনো সাড়া শব্দ আসে না। শেষে হাতের তালু দিয়ে জোরে জোরে কয়েকটা চাপড় মারলে ভিতর থেকে পুরুষ মানুষের গলায় অশ্লীল গালাগাল শুরু হয়ে যায়। বলে, কুন শুয়োরের বাচ্চা আইছে, এ্যাঁ ? এ্যাই তুমি ক্যাডা, হালার মায়েরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

চুদি– হালায় কয় জমিন কিন্যা থুইছে– আরে কার জমিন কে কিনে– জমি কিনা অতো সোজা না ? ও-ই হারু কুত্তার পয়দা গেলি ?

রায়হান গালাগাল শুনতে শুনতে মুনশিকে বলে, দেখা যাক কতোক্ষণ বলতে পারে।

আরে! হালায় তবু কথা কয়– এ্যাই গেলি তরা ? যাবি না ? তাইলে খাড়া তগো একদিন কি আমাগো একদিন।

গালাগাল আর ধমক হতে থাকলে মুনশি হাত ধরে রায়হানকে টেনে পিছনে সরিয়ে আনে। আনতে আনতে চাপা গলায় বলে, স্যার আপনে ক্যান যাইতেছেন, সামনে ? অরা তো ব্যাকটি ভাড়া করা গুণ্ডা। মিরপুর থিকা আনছে অগো।

রায়হান নিজেকে জোর করে ছাড়িয়ে নেয়। তারপর ফের সামনের দিকে পা বাড়ায়। বলে, দেখি না মানুষটার চেহারা–

দু'কদম সম্ভবত এগিয়েছিলো, তার আগেই চালার ঝাঁপটা খুলে যায় আর একটা ঝাকড়া চুলঅলা লুঙ্গি গেঞ্জি পরা গাট্টা লোককে বেরিয়ে আসতে দেখা যায়। লোকটার হাতে খুবই ধারাল লম্বা আর চকচকে একখানা ছুরি, ঐ ছুরি দিয়ে বাঁশের একটা বাখারি চাঁছতে চাঁছতে এগিয়ে আসে লোকটা। কয়েক পা এগিয়ে ফের পিছন ফিরে তার সঙ্গীকে চিৎকার করে জানায়– আরে ও সুন্দর আলি, বাইরা রে বাইরা এক সাবে আইছে তরে লইতে, জলদি বাইরা। একবার বাইরাইয়া দেইখা যা।

লোকটা সামনে এসে মুখোমুখি দাঁড়ালে রায়হান সোজাসুজি জিজ্ঞেস করে, জয়ধর কোথায় ?

বাঁশের বাখারিখানা চাঁছতে চাঁছতে নির্বিকার ভঙ্গিতে লোকটা জবাব দেয়, আপনে কার কথা কন ? জয়ধর টয়ধররে আমি চিনি না।

আপনারা কে ? এখানে কি চান ?

লোকটা ঘাড় হেলিয়ে রায়হানের দিকে তাকিয়ে বলে, আমরা এই জমিনের মালিকের লোক– আমরা জমিন আর ঘর পাহারা দিই।

বলতে বলতে হাতের ছুরিখানা দেখিয়ে বলে, মালিক আমার হাতে এইখান দিয়া জমিন পাহারা দিতে কইছে।

একটু থেমে লোকটা ফের বলে, আমার কাম কেউরে জমিনের সীমানার ভিৎরে ঢুকতে না দেওয়া, জোর কইরা ঢুকলে–

বাকিটুকু সে মুখে বলে না। বুকে ছুরি মারার কসরত দেখিয়ে বোঝায়। বলে, আপনে ভর্দলোক– আপনের এইখানে অইসা কুনো লাভ নাই। যা কইবার ঐ সাইনবোর্ডে যাগো নাম আছে তাগো কাছে গিয়া কন।

রায়হানের নজরে পড়ে যায় চালা ঘরের ভিতরের দিকটা– দেখে সেখানে আরও ২/৩ জন লোক আছে। সে কয়েক পা পিছিয়ে দাঁড়ায়। কারণ সামনে দাঁড়ানো লোকটার মুখ দিয়ে বাংলা মদের বিশ্রী গন্ধ বেরিয়ে আসছে।

লোকটা ছুরি দিয়ে তখনও বাঁশের বাখারিখানা চেঁছে চলেছে। বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, ধারালো ছুরিখানা দেখাবার জন্যই ঐ বাখারি চাঁছার কাজ। বাখারি দিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

কিছু বানাবার জন্য নয়। কারণ বাখারিখানা চাঁছতে চাঁছতে এতোই পাতলা হয়ে গেছে যে, ওটা দিয়ে আর কিছুই বানানো সম্ভব নয়।

জমি জবর দখলের গল্প সেই ছেলেবেলায় অনেক শুনেছে। একবার তো নিজের চোখে দেখেছিলো একদল লোককে জমি দখল করতে। মোহনগঞ্জের ঘটনা। মানু গোঁসাইদের বাগানের পিছনে একটা ছোট আম বাগান ছিলো তাদের– ঐ আম বাগানের আম পাড়া হচ্ছিলো, তখনও দুপুর হয় নি। ওদিকে বিলের পাড়ের জমিতে দু'জন লোক দু'খানা লাঙ্গল নিয়ে হাল চাষে ব্যস্ত ছিলো। মাঝে মাঝে আম পাড়তে পাড়তে হৈহল্লা হচ্ছিলো আর তাতে লোক দু'টি বাগানের দিকে তাকিয়ে হাসছিলো। হঠাৎ কোন দিক থেকে যেন রে রে বলে চিৎকার করতে করতে একদল লোক ছুটে এসে চাষী দু'জনকে লাঠি দিয়ে পেটাতে শুরু করে দিলো। লাঙ্গলের জোয়ালে যোতা গরুগুলো নিজের থেকেই পালালো না ওগুলোকে ধরে নিয়ে কেউ কোন দিকে গেলো, কিছুই বোঝা গেলো না। একজনের মাথায় লাঠির বাড়ি পড়েছিলো। কপাল বেয়ে দরদর করে রক্ত পড়তে দেখা গিয়েছিলো। আর একজনের লেগেছিলো পায়ে। সে ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে ছুটছিলো। দু'জনেই ছুটে আসছিলো আম বাগানের দিকে। প্রথমে তারা পাঁচিল টপকে গোঁসাইদের বাগানে ঢোকে। তারপর ফের পাঁচিল টপকে চলে আসে রায়হানের বাবা মোরশেদ আলি প্রধানের কাছে। দু'জনে এসে বাবার পা জড়িয়ে ধরে হাঁফাতে হাঁফাতে শুধু বলে, আমাদের বাঁচান– আমাদের বাঁচান নইলে ওরা আমাদের মেরে ফেলবে।

ততোক্ষণে গাছের ওপরে যারা ছিলো তারা নিচে নেমে এসেছে। বাবা তখন যে চিৎকার করে কাকে কী বলছিলেন তার এক বর্ণও বোঝা যাচ্ছিলো না। তবে দেখা গেলো– গাছের ওপর থেকে আমপাড়া লোকগুলো সার বেঁধে দাঁড়িয়েছে। তার সঙ্গে দাঁড়িয়েছে তিন গরুর গাড়ির তিন গাড়োয়ান। ধাওয়া করে আসা লোকগুলোর দিকে এরা পাল্টা ধাওয়া করে গেলে, নিমেষের মধ্যে যে লোকগুলো কোথায় যায় তার হদিস পাওয়া যায় না।

ঘটনাটার সব দৃশ্য মনে পড়ে না, তবে মার খেয়ে পালানো চাষী দু'টিকে ছুটে আসার দৃশ্যটা সে মনের মধ্যে স্পষ্ট দেখতে পায়। আর দেখতে পায় বাবার হুঙ্কার দিয়ে রুখে দাঁড়ানোর ঘটনাটা।

সে মনে মনে কল্পনা করে, তার অবস্থা কি মার খেয়ে পালানো লোক দু'টির মতো হবে? তাকেও কি তাড়া খেয়ে মাঠের ওপর দিয়ে আল ডিঙ্গিয়ে ছুটে পালাতে হবে। তারপর তাকেও কারুর পায়ের কাছে পড়ে আশ্রয় ভিক্ষা করতে হবে?

সে ডাইনে বাঁয়ে তাকিয়ে দেখে– খানিক দূরে বাসস্ট্যান্ড, সেখানে দু'টি দোকানের সামনে সব মিলিয়ে জনা চার পাঁচেক লোক হবে। যদি সামনে ছুরি হাতে দাঁড়ানো লোকটা আর চালার ভিতরকার সঙ্গীরা তাকে আর মুনশিকে তাড়া করে, তাহলে ভয় পেয়ে অবশ্যই সে পালাবে, পালিয়ে যদি ঐ বাসস্ট্যান্ডে যায়, তাহলে কি ওরা কেউ আশ্রয় দেবে? তাদের বাঁচাতে রুখে দাঁড়াবে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

সে মনের ভিতর থেকে সায় পায় না। বরং মনে হয়, তাদের পালাতে দেখে বাস স্ট্যান্ডের লোকগুলোও পালাতে আরম্ভ করবে– কেউ কাউকে সাহায্য করার জন্য কিছু করবে না। রুখে দাঁড়ানো তো অনেক দূরের ব্যাপার।

সামনে দাঁড়ানো লোকটি তখনও বাখারি চেঁছে চলেছে। রায়হান জিজ্ঞেস করে, আপনার মালিকের নাম কি বলবেন?

ঐ কথায় লোকটার মুখে চাপা হাসি দেখা যায়। সে পিছন ফিরে চিৎকার করে বলে, তা অ সুন্দর আলি, সাবে নাম জিগায় রে– নাম কমু?

চালার ভিতর থেকে জবাব আসে, নাম দিয়া কাম কি? কাম থাকলে সেই কামের কথা জিগা।

ঐ সময় মুনশি কী বোঝে সে-ই জানে। পেছন থেকে ডাকাডাকি আরম্ভ করে। বলে, স্যার আইয়া পড়েন, অগো লগে প্যাচাল পাইড়া কুনো লাভ নাই–

সামনের লোকটি ঐ মুহূর্তে ঝুঁকে পড়ে, বলে, কি চিন্তা করেন। কামের কতা কি কইবেন?

রায়হানের ঐ মুহূর্তে নিজেকে ভীষণ অপমানিত বোধ হয়। মনে হয়, কেউ যেন প্রকাশ্যে রাস্তার ওপর তার দুই কান মলে দুই গালে থাপ্পর লাগিয়ে দিয়েছে।

তার ভিতরে ঐ মুহূর্তে কী যেন হয়ে যায়। কে চিৎকার করে ওঠে। বলে, এ্যাই বের হ– চিৎকার করতে করতে রায়হান চালা ঘরের দিকে এগিয়ে যায়।

তবে অমন চিৎকার শোনার জন্যই সম্ভবত চালার ঝাঁপ খুলে যায় আর ভিতর থেকে আরো দু'জন গুণ্ডা মতো লোক বেরিয়ে আসে। তারা সামনে থেকে এসে দু'জনে দু'দিক থেকে রায়হানের দুই বাহু ধরে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে বড় রাস্তায় নিয়ে গিয়ে তারপর ছাড়ে। মুনশি ওদিকে চিৎকার করে ধমকায়। গালাগাল দেয় আর থেকে থেকেই বলে, ও-ই শয়তানের বাচ্চা শয়তান। ওই কমিনার বংশ– কার লগে লাগতে যাইতাছস হুশ আছে কিছু? মুরুখ্য ভূত কোনহানকার, গুণ্ডামির জায়গা পাও না– আরে ওই মানুষ যদি চ্যাতে তুই বাঁচতে পারবি?

ঐ রকম চিৎকার করতে করতেই মুনশি ছুটে এসে রায়হানকে ধরে বড় রাস্তার দিকে টেনে নিয়ে যায়।

রায়হান অবশ্যি কয়েক মিনিটের মধ্যেই আবার স্বাভাবিক হয়ে আসে। নিজের কাছেই তার অবাক লাগে, হঠাৎ কেন অমন একটা বোকামির কাজ সে করতে যাচ্ছিলো। অবশ্যি অপমানের জ্বালাটা তখনও বুকের ভিতরে সমানে জ্বলে যাচ্ছিলো– কিন্তু তবু মনে হচ্ছিলো, ওভাবে উত্তেজিত হয়ে তার এগিয়ে যাওয়া একদম উচিত হয় নি। আসলে ঘটনাটা কী তা জানার জন্য বাসস্ট্যান্ড থেকে কয়েকজন লোক এসে দু'জনকে ঘিরে দাঁড়ায়। মুনশি ঘটনাটা বয়ান করে বোঝাতে চেষ্টা করে। কিন্তু দেখা যায়, মুনশির পুরো বয়ান শোনার মতো ধৈর্য অনেকেরই নেই। ওরই মধ্যে একজন বলে ওঠে, আপনে ভাইসাব, ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যানের কাছে যান– তার কাছে সব খুইলা কন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

সঙ্গে সঙ্গে একজন বলে, কিয়ের চেয়ারম্যান ? হ্যার কাছে গেলে কি হইবো– হ্যায় কুন বাল ফালাইবো ? হ্যার আপনা লোকই তো ওই হারিস আলি আর ফাতু আমিন–

স্যার আপনে কারও কথা শুনবেন না। আইনের আশ্রয় লন– থানা পুলিশ কী করে দ্যাহেন পরথমে, তারপর কোর্ট কাছারি তো রইছেই।

আরও একজন মাথা দোলাতে দোলাতে বলে, আমি ওই দিন হারিস মিয়ারে দ্যাকলাম আমিন বাজারে এক রেষ্টরেন্টে বইয়া বইয়া টাইগার কামাইল্যা আর সুন্দর আলি মাস্তানের লগে ফুসুর ফাসুর করতাছে। অহন না বুজতাছি ক্যান অতো ফুসুর ফাসুর।

আপনে কিন্তু ছাড়বেন না অগো– শালারা বহুত জ্বালাইতাছে এলাকার মানুষ গো–

যার মুখ দিয়ে ঐ কথা বের হয়। রায়হান তাকিয়ে দেখে। বক্তাটি বয়সে একেবারেই তরুণ।

সে আরও বলে, যতো জমি দখল, চাঁদাবাজি, ফেনসিডিলের কারবার– সব কিছুর পিছে ওই একই পার্টি। থানায় যান, অগো দ্যাখবেন, কোর্ট কাছারিতে যান, দ্যাখবেন অরা ঠিক হাজির. মিরপুর ব্রিজে হুজ্জত হাঙ্গামা লাগছে, খোঁজ নিলে দ্যাখবেন তারও পিছে অরাই রইছে– অন্য কেউ না।

বাসস্ট্যান্ডের লোকদের ঐসব কথাবার্তা আর পরামর্শ রায়হানের কানে যায়। কিন্তু সে বুঝতে পারে না আসলে এখন তার ঠিক কী করা উচিত। তার মাথার ভিতরটা ঝাঁ ঝাঁ করে। কেমন মনে হয়, নিজেকে সে চেনে না। গুলিস্তানের মোড়ে তাকে কান ধরে ওঠবস করিয়েছিলো পাকিস্তান আর্মি। এ যেন তার চাইতেও বেশি। তার লেখাপড়া, তার মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক, তার রুচি, তার আদর্শ– এগুলো সবই কেমন অর্থহীন একটা ব্যাপার।

কেউ যেন তার বুকের ভিতরে জিজ্ঞেস করে, এবার ? এবার তুই কী করবি ?

কে একজন ফের বলে তার নিজেরই ভিতর, খবরদার, ভয় পাওয়া চলবে না, ঘাবড়াবেও না– শান্ত থাকো– নিজেকে দেখো। চারদিকে দেখো। ঐ জমির টুকরোটাই জীবনের সমস্ত কিছু নয়।

সে ডাইনে বাঁয়ে তাকায়। মাথার ভিতরটা ঝাঁ ঝাঁ করে। সাল, তারিখ, জরিপ, জমি রেকর্ডের পরচা– নতুন পুরনো, সিএ, এসএ, আরএস– কার নাম বাদ গেলো, কার নাম উঠলো, নামজারি কার নামে হয়েছিলো, এসব কথাবার্তা হয়ে চলে তাকে ঘিরে। আর ওরই মধ্য থেকে চারটা নাম বারবার উচ্চারিত হতে শোনে। এক, সুন্দর আলী যার নাম ধরে ডাকাডাকি করছিলো কামাইল্যা টাইগার। আর তৃতীয় জন গরিবুল্লাহ মুনশির নাতজামাই হারিস আলী, মিরপুরে যার ছাগলের আড়ত খুলেছে। আর চতুর্থ জন দলিল পত্র উল্টাসিধা করার নাটের গুরু ফাতু আমিন। এই চারটা নাম তার মনের ভিতরে দাগ কেটে বসে যায়। ওদিকে সাইনবোর্ডে দেয়া নামগুলোও সে টুকে নেয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

কী করা উচিত তা ভেবে পায় না। কিন্তু কিছু যে একটা তাকে করতে হবো সে ব্যাপারে তার মনের ভিতর কোনো রকম দ্বিধা নেই। কিন্তু কাজটা কী আর কীভাবে এগোবে সেটাই সে ভেবে উঠতে পারে না। একবার মনে হয়, হারুন সাহেবের কাছে সাহায্য চায় কিন্তু পরক্ষণে মনে হয় তাকে দিয়ে আসল কাজটা হবে, নাকি সব ভণ্ডুল হয়ে যাবে ? কারণ 'গণ একতা' কাগজ যে সরকারের বিরোধী হয়ে উঠেছে তার পেছনে তো ঐ লোকটি। তাতে বরং হিতে বিপরীত হয়ে যেতে পারে। তাহলে আর কে ? পুলিশের কর্তাদের মধ্যে কেউ ? নাকি মন্ত্রী-এমপিদের কাছে যাবে।

ঐ দিনই সে বিকালে মাহফুজের চেম্বারে যায়। সে চুপচাপ ঠাণ্ডা মাথায় গোটা ব্যাপারটা শোনে। তারপর বলে, তুমি ইমিডিয়েটলি ঐ লোকগুলোর বিরুদ্ধে ইনজাংশনের মামলা শুরু করে দাও।

সেটা কী ?

মাহফুজ হাসে। বলে, তোমার জমি জোর করে দখল করে নিতে চাইছে, সেই কাজ থেকে তাদের বিরত রাখার হুকুম চাইবে তুমি।

কিন্তু ওরা তো অলরেডি দখল করে নিয়েছে।

আরে ওটা দখল নয়, সাইনবোর্ড লকালেই দখল প্রমাণিত হয় না। এসব হচ্ছে আইনের মারপ্যাঁচ, বুঝলে ? আর থানাতে ডায়েরি করেছো ? কাল সকালেই ঐ কাজটা করবে– ওটাই তোমার প্রথম কাজ। মামলা করতে হলে কিন্তু ওটা লাগবে, আর সাক্ষীও ঠিক রাখবে।

কী রকম সাক্ষী ?

আরে স্থানীয় ২/৩ জন লোক হলেই হয়, যারা বলবে তুমি ঐ জমিটা কিনে ভোগ দখল করছো। আর যে লোকের কাছ থেকে কিনেছো সেই লোক বহু বছর ধরে ভোগ দখল করার পর জমিটা তোমার কাছে বিক্রি করে দিয়েছে– ব্যস এইটুকু বলবে, পাবে না এমন লোক ?

ঐ মুহূর্তে হঠাৎ রায়হানের সাদেক সাহেবের কথা মনে পড়ে। সে বলে, ঐ একই প্লটের জমি এক সঙ্গে ভাগাভাগি করে কিনেছে যে লোক সেও তো সাক্ষী হতে পারে?

হ্যাঁ, অফকোর্স। একই প্লটের জমি ঐ জমির ওপর কোনো দাবি নেই, শুধু তোমার জমির ওপর দাবি, এ কী করে হয়। এমন সাক্ষী কোর্টে হাজির করতে পারলে তো খুবই ভালো হয়।

আমানউল্লাহ কথাটা শুনে ভয়ানক ক্ষেপে উঠলেন বললেন, এতোখানি সাহস। এ তো টলারেট করা যায় না, যদি এসব হতে থাকে, তাহলে তো সমস্ত কিছু কোলাপ্স করবে!

ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে সাভার এলাকার এমপি'র ফোন নাম্বার যোগাড় করলেন। তারপর একনাগাড়ে অভিযোগ করলেন। তারপর যখন অপরদিক থেকে জবাব আসতে লাগলো তখন দেখা গেলো ভদ্রলোকের চোখে-মুখে ক্ষুব্ধ, উত্তেজিত যে ভাবটা দেখা যাচ্ছিলো, সেটা কেটে যাচ্ছে। রায়হানকে বললেন, আপনি আজই এমপি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

সাহেবের সঙ্গে দেখা করুন; চিন্তা করবেন না, ও ঠিক হয়ে যাবে, ওর সঙ্গে আমার কথা হলো, কী করতে হবে তিনি বলে দেবেন। আরে ফাজলামি নাকি ? দেশে কি আইনকানুন নেই ?

হারুন সাহেবের সঙ্গে আলাপ করার কথাটা বারে বারেই তার মনে আসছিল। কিন্তু খবর শুনলো, ভদ্রলোক আগের দিনই বিদেশে রওনা হয়ে গেছেন। তার মনে পড়ে বিলেত আর কানাডা যাওয়ার কথা প্রায়ই বলতেন কিন্তু এভাবে হঠাৎ করে চলে যাবেন, অন্তত 'গণ একতা'র কেউ সে রকম ভাবে নি।

আমানউল্লাহ সাহেব এমপি সাহেবের ফোন নাম্বারটা দিয়ে রেখেছিলেন, তাঁর কথামতো ঐদিনই সন্ধ্যার দিকে সে টেলিফোন করে তাঁর মিরপুরের বাসায়। কিন্তু যতোবার রিং করে ততোবারই এক খবর– স্যার অফিসে নেই, রাত আটটার পরে ফোন করুন।

সাতাশ

মাহফুজের কথামতো একখানা দরখাস্ত লিখে সেটা সঙ্গে করে পরের দিনই সকাল সকাল সাভার থানায় যায়। থানার ওসি তখন সদ্য অফিসে এসেছেন। কিন্তু তা হলে কি, তার কামরায় ঐ সকাল বেলাতেই প্রচুর লোক। ভদ্রলোক প্রথমে রায়হানের পরিচয় জানতে চাইলেন। তারপর বললেন, সাংবাদিক মানুষ হয়ে কী ঝামেলায় পড়ে গেছেন, তাই না ? আপনার কথা কালই এমপি সাহেব আমাকে জানিয়েছেন। ভদ্রলোক আগন্তুক লোকদের সঙ্গে হেসে হেসে কুশল বিনিময় করলেন কিছুক্ষণ। তারপর সবার উদ্দেশ্যে বললেন, আপনারা একটু বসুন, আমি এই সাংবাদিক ভাইয়ের কথাটা আগে শুনে নিই।

রায়হান মনে মনে খুশি হয়, মনে সেই সঙ্গে আশাও জাগে। বোধহয় ঠিক জায়গাতেই সে এসেছে– এখানেই তার কাজ হয়ে যাবে।

ওসি মনোযোগ দিয়ে রায়হানের কথা শুনলেন। তারপর চেয়ারের পিঠে হেলান দিয়ে আয়েশী ভঙ্গিতে বললেন, ঠিক আছে, যা ইচ্ছা ওরা করুক, আইন চলবে আইনের মতো। আপনি একটা জিডি করে যান, দেখি আমরা কী করতে পারি, আমরাও আইনের কাছে বাঁধা, বোঝেনই তো, আইন যে মানে না সে যা ইচ্ছা তাই করতে পারে কিন্তু যাকে আইন মেনে চলতে হয় তার পক্ষে ইচ্ছামতো কিছু করা সম্ভব নয়। আপনি যদি বলেন, আমার জমিটা উদ্ধার করে দেন, তাহলে আমি সঙ্গে সঙ্গে পারবো না। আমাদের দায়িত্ব শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করা, অন্যের সম্পত্তি উদ্ধার করা নয়, কিন্তু সেটাও আমরা পারি, খালি কোর্ট থেকে যদি একটা অর্ডার পাই। তাহলে আমাদের আর কেউ ঠেকাতে পারে না। এমনিতে এখন আমার লোক ঐ জমির সীমানার ভিতরে ঢুকবে না, ঢুকবে তখনই, যখন শান্তি নষ্ট হবার মতো অবস্থা হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

রায়হান ওসি ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে সারাটাক্ষণ। ভদ্রলোক যান্ত্রিকভাবে কথাগুলো বলে যাচ্ছিলেন, নজর প্রায় সর্বক্ষণই সামনের দেয়ালের দিকে রাখা। দু'একবার চোখাচোখি যে না হচ্ছিলো না তা নয়। তবে চোখে চোখে পড়লেই তিনি নজর সরিয়ে নিচ্ছিলেন। একেবারে দেয়াল ঘেঁসে পাতা চেয়ারগুলোতে যারা বসে ছিলো তাদের কারুর কারুর মুখের দিকে তাকিয়ে হাসছিলেন আর বলছিলেন, আইনের বাইরে আমরা এক পাও যেতে পারি না। পারি কি ? না পরি না।

ওসি সাহেবের কথার মাঝখানেই কয়েকবার একজন মানুষের আর্তনাদ শোনা যায়। পাশের কোনো ঘরে কেউ আর্তনাদ করতে করতে বলছে, আমি কিছু জানি না সার, আমি কিছু দেখি নাই। শ্রোতাদের মাঝখান থেকে একজন ঘটনাটা কী দেখার জন্য উঠে পা বাড়ালে, ওসি সাহেব হাসেন, বলেন, ও কিছু না, আমাদের রুটিন ওয়ার্ক, ক্রিমিনালরা সহজে কথা বলতে চায় না। তাই–

হ্যাঁ, যা বলছিলোম, ওসি সাহেব ফের তার বক্তৃতা শুরু করেন। সেও প্রায় আধঘন্টার মতো চলে। ভদ্রলোকের বক্তৃতা শেষ হলে রায়হান উঠে পড়ে, আর না, কথাই শোনা হলো। কাগজের এক পৃষ্ঠায় যে অভিযোগটা লিখে এনেছিলো, সেটা জমা দিয়ে তাঁর ফটোকপিতে একজন দারোগার সই নিয়ে সে থানা থেকে বেরিয়ে আসে। সে বুঝতে পারছিলো না ওসি ভদ্রলোকের অমন বক্তৃতাবাজি কাকে লক্ষ্য করে। লক্ষ্যটা যদি সে নিজে হয়ে থাকে তাহলে তো তাকে বুঝিয়ে দেয়া হলো যে থানা-পুলিশ তার জমি উদ্ধারের জন্যে কিছু করবে না। আবার এও মনে হয়, এমপি সাহেব যে দেখা হওয়ার আগেই থানায় বলে রেখেছেন, সেটা তো ওসি নিজের মুখেই বললেন, যদি ভদ্রলোক সাহায্যই না করতে চাইবেন তাহলে এমপি সাহেবের সঙ্গে আলাপ হওয়ার কথাটা বললেন কেন ? সে ধাঁধায় পড়ে যায়।

তবে থানা থেকে বেরিয়ে আসার সময় খেয়াল করে শার্টপ্যান্ট পরা একজন মাঝবয়সী লোক তার পিছনে পিছনে আসছে। সে ঘুরে দাঁড়ালে লোকটা দাঁত বের করে হাসে। তারপর দু'পা এগিয়ে এসে বলে, একটা কথা কমু আপনেরে ? কই ? আপনার জমি নিয়ে গোলমাল হইছে, ঠিক না।

রায়হান একটু বিরক্ত হয়। বলে, আপনি কীভাবে জানলেন ?

আমরা ভাইসাব মানুষের মুখ দেখলেই বুঝতে পারি, সাভার থানা এলাকায় রাস্তার বগলে যতো উঁচা জমি দেখা যায়, তার ফিফটি পারসেন্ট জমি নিয়াই মামলা-মোকদ্দমা, সবগিনি জবর দখলের কেইস– তাই আপনেরে একখান কথা কইতে চাই– কমু ?

রায়হান হাঁ না কিছুই বলে না। তবু লোকটি ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়ায়। বলে, মনে কিছু নিয়েন না, আপনে শিক্ষিত ভদ্রলোক, আপনার মামলা-মোকদ্দমার ভিতরে যাওয়া ঠিক না– মামলা, মোকদ্দমায় বহুত ভ্যাজাল, বরং যারা ঝামেলা করতেছে তাগো লগে একটা ফয়সালা কইরা ফ্যালান।

রায়হান হাসি হাসি মুখ করে লোকটার চোখে চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, আপনার নাম কিন্তু বলেন নি, কী করেন তাও বলেন নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

লোকটা এবার আকর্ণ হাসে। বলে, আমার নাম আবুল খায়ের, পুলিশে চাকরি করি- হাওলদার, এই থানাতেই আজ বারো বচ্ছর রইছি- আল্লায় দিলে মানুষের উপকার ছাড়া অপকার কখনও করি নাই- আপনে খোঁজ নিয়া দেখতে পারেন।

রায়হান মুখে হাসি ধরে রেখেই বলে, আপনার কথা শুনে কিন্তু মনে হচ্ছিলো আপনি দালালীর কাজ করেন।

আরে নাহ্, কী যে কন ভাইসাব- মনে হয়, আমার কথা আপনের ভালো লাগে নাই- অবশ্য লাগার কথাও নয়; সৎ রোজগারের পয়সা দিয়া কিনা জমি যদি অন্যলোক দখল কইরা লয়- তাইলে ক্যামনে ভালো লাগে? তবে বুঝবার কথা আছে একখান, আপনের দলিলের ভিতর একখান কিন্তুক ফাঁক আছে। ঘোষ বাবুরা জমিদার ছিলেন, তার প্রজা ছিলো গরিবুল্লাহ মুনশি, পুরান পরচায় তার নাম আছে, কিন্তুক ঐ একই দাগের জমি কুতুবউদ্দিনের বাবা কিনছে তিদিব দত্তের থিকা ১৯২৭ সালে, কিন্তু তিদিব দত্ত ক্যামনে ঐ জমির মালিক হইলো, তার কিন্তু কুনো কাগজ নাই।

রায়হান লোকটার দিকে তাকিয়েই থাকে, এসব কি শুনছে সে? এতো মালিকানার ধারাবাহিকতার বিচ্যুতি। তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে লোকটা এবার হাসে। বলে, ঘাবড়াইতেছেন ক্যান স্যার। ঘাবড়ানির কিছু নাই, এই রকম কেইস বহুত আছে। ঐ জমিদার বাবুরা এক প্রজা খেদাইয়া নতুন প্রজা বসাইতো। কাগজ দিতো একখান পাট্টা- তো ঐ পাট্টা কি আর কুতুবউদ্দিনের বাপেরে দিছে তিদিব দত্ত? আর কুনো কপিও তো পাইবেন না যে পুরানা কাছারি বাড়ি আছিলো চণ্ডী বাবু নায়েবের, সেই কাছারি ঘরখানা তো পাকিস্তান আর্মি জ্বালাইয়া দিছে, যদি মামলা হয় কতো বছর মামলা চলবো তার কি কুনো ইসটিশন আছে?

লোকটা প্রায় ছিনে জোঁকের মতোই রায়হানের সঙ্গে লেগে থাকে। সঙ্গে আসে একেবারে বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত। রায়হান বাসে উঠে বসলেও তার কথা ফুরায় না। সে জানালার পাশে দাঁড়িয়ে বলতে থাকে- আপনার খরচ বেশি লাগবো না স্যার, ধরেন আশি হাজার দিলেই হবে। আপনি শিক্ষিত মানুষ, আপনি তো সবই বোঝেন। সবারেই কিছু কিছু দিতে হয়- লোকাল মাস্তান লইবো, মেম্বর সাবে লইবো, আমাগোরে কি আর কিছু দিবেন না?

রায়হান বাসের সিটে বসে থ' হয়ে থাকে। পুলিশের লোক দুর্নীতি করে সে খবর তার শোনা ছিলো কিন্তু তার চেহারা যে এমন- এতোটা সে কল্পনাও করতে পারে না। সে কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা হাবিলদার সাহেব, আপনি যে এসব কাজ করেন, থানার ওসি তা জানে?

কী যে কন স্যার, আমরা সব কাজ করি একমত হইয়া; কেউরে লুকাইয়া কিছু কেউ করে না, ওসি সাবে কইলো তো আপনেরে, এমপি সাবের লগে তার কথা হইছে- তাইলে?

রায়হানের তবু বিশ্বাস হতে চায় না। কারণ আশি হাজার টাকা এমন টাকা নয় যে তার জন্য মাস্তান গুণ্ডা থানা পুলিশ এমপি সবাই ষড়যন্ত্র শুরু করে দেবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

এমপির সঙ্গে দেখা হলো পরের দিন। ভদ্রলোক বেশিক্ষণ বসিয়ে রাখেন নি। দিব্যি খোলামেলা আলাপ করলেন, থানার ওসিকে একরকম উসকেই দিলেন। বললেন, আমি আপনাকে বললাম, ভদ্রলোককে হ্যারাস যেন না করে কেউ। সাংবাদিক মানুষ তাঁর ক্ষতি হলে সেটা পলিটিক্যাল ইস্যু তৈরি হয়ে যাবে, বুঝেছেন?

ভদ্রলোক ফোন রেখে দিয়ে বলেন, আপনি পরশু থানায় যাবেন কাগজপত্র নিয়ে, আর লোকাল ইউনিয়ন কাউন্সিল-এর চেয়ারম্যানের সঙ্গে দেখা করবেন। সবাইকে একসঙ্গে বসিয়ে কাগজপত্র দেখে একটা সিদ্ধান্ত দেয়ার কথা বললাম ওসিকে। আশা করি আর কোনো প্রব্লেম হবে না।

খুব সমাদর করে চা খাওয়ালেন ভদ্রলোক। রাজনীতি নিয়ে কিছুটা আলাপও করলেন। জিজ্ঞেস করলেন, সত্যি সত্যি অপজিশনের ঐক্য হচ্ছে কিনা, যদি হয় তাহলে পাবলিক কী করবে– এরশাদকে কি সত্যিই পাবলিক পছন্দ করে না?

রায়হান খুব সংক্ষেপে দু'চারটা কথা বলে, যার মানে, এ-ও হতে পারে ও-ও হতে পারে। তারপর উঠে পড়ে। তার মনে তখন বেশ স্বস্তির ভাব। যে ভাষায় ভদ্রলোক থানার ওসি'র সঙ্গে কথা বললেন, তারপর তাতে কাজ না হয়ে পারে?

কিন্তু দেখা গেলো এমপি সাহেবের থানা পুলিশকে অমন ধমকাধমকি সত্ত্বেও কাজের কাজ কিছুই হয় না। থানার ওসি শেষ পর্যন্ত কিছুই করতে পারে নি। নাকি চায় নি, সেটাও অবশ্য তার কাছে এখনও রহস্য হয়ে আছে। ওদিকে সে ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যানের সঙ্গেও দেখা করে। এমপি সাহেবের কথা বললে ভদ্রলোক হাসেন। বলেন, এমপি সায়েবরা তো উপরের দিকে থাকেন, মাটিতে তাঁদের নজর পড়ে না, জমিজমার মামলার ফয়সালা আমি কীভাবে করবো? আমি কি জজ সাহেব না উকিল ব্যারিস্টার?

অমন ক্ষোভের কথা কেন বলেন ভদ্রলোক, রায়হান বুঝতে পারে না। কারণ দু'জনে একই পার্টি করেন বলে তার জানা ছিলো। শেষ পর্যন্ত রায়হান সব ঘটনা খুলে বললে বলেন, শোনেন ভাই, আপনে শহরের মানুষ, ভদ্রলোক, এইসব জমি জায়গার হ্যাঙ্গাম-হুজ্জত সামাল দিতে পারবেন না, পারলে আপোস ফয়সালা করেন– তা যদি না পারেন, তাহলে বিক্রি করে দেন। যদি বিক্রি করবেন বলে ঠিক করেন তাহলে আমাকে জানাবেন। আমার কথা বুঝছেন তো? এই এলাকার মানুষ খুব খারাপ, আপনেরে শান্তিতে থাকতে দিবে না।

কথা বলতে বলতেই ঝকঝকে পাজেরো জীপ আসে একখানা। আর তখন 'আমি যাই কাজ আছে' বলে চেয়ারম্যান সাহেব সেই জীপ গাড়িতে গিয়ে ওঠেন এবং তাঁর জরুরী কাজে চলে যান।

পরের দিন সকালে সে থানায় যায়। একা নয়, মাহফুজকে সঙ্গে নেয়। থানার ওসি ভদ্রলোক রায়হানকে দেখেই হারিস আলিকে ডাকতে লোক পাঠান।

হারিস আলি দু'জন বোরখাপরা মহিলা আর একজন উকিলকে সঙ্গে নিয়ে থানায় হাসতে হাসতে এসে ঢোকে। ওসির সঙ্গে হাত মেলাতে মেলাতে বলে, আরে ওসি সাব, কী যে ঝামেলা করেন আপনে, সকালে কতো কাম থাকে, কামে যাইতেছিলাম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ওইসম আপনের লোকে গিয়া হাজির– কী সংবাদ ? না থানায় বিচার আছে। কন তো, তারপর না আইয়া পারি ? তো কন খবর টবর কী ?

খবর অন্য কিছু না, আপনি এক ভদ্রলোকের জায়গা দখল করে নিয়েছেন। এটা তো ঠিক না।

হারিস আলি মহাবিরক্ত হয়ে রায়হানের দিকে তাকিয়ে বলে, এইসব আপনে কী কন ওসি সাব ? আমি ক্যান অন্যের জায়গা দখল করতে যামু, এ্যাঁ ? আমার কি কিছু কম আছে ? আমি তো ফকিরণীর পোলা না। উনি ক্যান্নে ঐ জমিনের মালিক হইলেন, আগে তারে জিগান। কাগজপত্র না দেইখ্যা জমি কিনলেই হইল ? কন ? আমার দাদা শ্বশুরের জায়গা, লাম্বা প্লটের ৩৭৭ নং দাগ, সি-এস পরচার মইদ্যে কিলিয়ার লিখা আছে গরিবুল্লাহ মুনশি জমিনের মালিক, তার মাইয়া শহরবানুর পোলা গোলজার হোসেন। তিনি আমার দাদাশ্বশুর, তিনি কিছু জানলো না জমিন বিক্রি হইয়া গেলো ? মগের মুলুক নিকি ?

ইনি তো কিনছেন এক বছর হয়ে গেলো, ওসি বলেন, নাম খারিজ করছেন, খাজনা দিছেন, তারপর ঘর উঠাইছেন।

আরে খোন। হারিস আলি প্রায় ধমকে ওঠে। বলে, আপনে দ্যাখতে চান। আমি আপনের এই থানার জায়গার নাম খারিজ কইরা দ্যাখাইতে পারি। বলতে বলতে হাসে হারিস আলি।

আপনি খাজনাপাতি দেন তো ?

হ, দেই, দিমু না ক্যান, জমিন থাকলে খাজনা দিতে হইবো না ? আমরা কি দু'এক বচ্ছরের গিরস্থ নাকি ? আমরা হইলাম গিয়া ব্রিটিশ আমলের গিরস্থ।

ওসি সাহেব গম্ভীর হয়ে থাকেন। বলেন, আপনার কাছে কাগজপত্র আছে তো ?

হ, আছে, কাগজপাতি কেমুন না থাকে, সব কাগজ আছে।

তো ঠিক আছে দেখান আপনার কাগজ। ওসি রায়হানের দিকে তাকালে সে মাহফুজের হাত থেকে ফাইলটা নিয়ে এগিয়ে দেয়। বলে, ওর মধ্যে বায়া দলিলের কপি আছে। আর ১৯৬৮ সালের নাম খারিজ করেছিলো কুতুবউদ্দিন, ও জমির আগের মালিক, সেই কাগজটাও আছে।

ওসি উল্টেপাল্টে কাগজগুলো দেখে বলেন, হুঁ, সব কাগজই তো আছে দেখছি, এবার আপনার কাগজ দেখান।

হারিস আলির মুখোমুখি তাকিয়ে কথাটা বলেন ওসি। তাতে লোকটা পাল্টা হাসে বলে, কী যে ঝামেলা করেন ওসি সাব, কইলাম তো আমার কাছে সব কাগজ আছে, আমি তো ভেজাল কাম করি না, দুই নম্বরী কাম করছি চুনোসম কন ?

ঠিক আছে, মানলাম আপনার কাগজ আসল কিন্তু দেখাচ্ছেন না কেন ?

কাগজ তো আমি লগে আনি নাই, সময় তো পাইলাম না। আপনের লোক গিয়া কইলো ওসি সাব ডাকে– বাস, চইলা আইলাম।

কিন্তু গতকালই তো আপনকে খবর দেয়া হয়েছিলো যে কাগজপত্র নিয়ে আপনাকে থানায় আসতে হবে। খবর দেয় নি আপনাকে ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

হ দিছিলো, কিন্তু আমার অন্য কামও তো থাকে, আর আপনে অস্থির ক্যান হইতেছেন, ঐ জমির ফায়সালা আপনে ক্যামনে করবেন ? ফায়সালা তো আপনে থানায় করতে পারবেন না। পারবেন কন ?

হারিস আলি এমনভাবে মুখোমুখি তাকায় যেন মনে হয় চ্যালেঞ্জ করছে। তাতে বোধহয় ওসি বিরক্ত হন। বলেন, অতো কথা বলবেন না তো। আপনি বলছেন কাগজপত্র আছে আপনার কাছে, তাহলে দেখাচ্ছেন না কেন ? দেখিয়ে দিন। না হলে তো আমার কাজ আমাকে করতে হবে, দেখান আপনার কাগজ।

হ দ্যাখামু, কইলাম তো, কিন্তুক তার আগে এই কাগজখানা দেইখ্যা লন।

হারিস আলি একখানা কোর্টের নোটিশ জাতীয় কাগজ ওসির হাতে ধরিয়ে দেয়।

এটা কিসের কাগজ ? ওসি কাগজখানা মেলে ধরে দেখতে দেখতে বলেন, আরে এটা তো দেখছি কোর্টের নোটিশ। এটা দেখে আমি কী করবো ?

আরে সাব এইটা দেইখ্যাই তো আপনেরে কাম করতে হইবো, বুইজাও না বোজার ভান ক্যান যে করেন বুজি না। আসলে আপনে তো কেইসটা ফায়সালা করতে চান। চান না ? তাই কাগজখানটা দ্যাখাইলাম আর কি, অহন যা ফায়সালা হইবার তা কোর্টেই হইবো, বাইরে কেউর কিছু করনের নাই।

কথাটা বলে হারিস আলি বিজয়ীর হাসি হাসতে হাসতে ডাইনে বাঁয়ে তাকায়।

ওসির কপালে যেন চিন্তার রেখা দেখা যায়। রায়হানের দিকে তাকিয়ে বলেন, আপনার ওপর কেন ইনজাংশন জারি করা হবে না, তার কারণ দেখতে বলা হয়েছে নোটিশে। চতুর্থ সহকারী জজ কোর্ট থেকে। হারিস মিয়া তো দেখছি ঠিকই বলেছে, এখানে আর কিছু করা সম্ভব হবে না। আমি এমপি সাহেবকে জানিয়ে দিচ্ছি, রায়হান সাহেব আই'ম সরি। আপনিও বরং কোর্টেই যান।

বলতে বলতে ভদ্রলোক মাহফুজের দিকে কাগজখানা এগিয়ে ধরেন। কিন্তু মাহফুজ কাগজখানা হাতে না নিয়ে ঝুঁকে প'ড়ে ওসি'র হাতে ধরা অবস্থাতেই কাগজখানার ওপর একপলক চোখ বুলিয়ে নেয় তারপর রায়হানের দিকে তাকিয়ে বলে, এখানে বসে আর কী লাভ, চলো আমরা বের হই– ভিতরের খবর তো নিশ্চয়ই আন্দাজ করতে পারছো ? কী পারছো না ?

রায়হান মাহফুজের দিকে তাকালে সে হাসে। বলে, কি চমৎকার ঘটনা, তাই না ? তোমার কেনা জায়গা। তুমি ঘর তুলেছো, এখন তোমাকেই তোমার ঘরে ঢুকতে দেয়া হবে না। ঐ জন্যই ইনজাংশন, কোন দেশে বাস করো কিছু কি বুঝতে পারো ?

ঐ মুহূর্তে রায়হানের মনে পড়ে দিন তিনেক আগে এই এলাকারই হাবিলদার লোকটির কথা, সে আপোস করিয়ে দেয়ার জন্য প্রস্তাব করেছিলো তার কাছে। সে ডাইনে বাঁয়ে তাকিয়ে দেখে কিন্তু লোকটাকে সে দেখতে পায় না।

মাহফুজ ফের তাগিদ দেয়– আরে দেরি করে কী লাভ ? চলো, রওনা হই, এখন রওনা হলে আমি হয়তো কোর্ট ধরতে পারবো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

দু'জনে বেরিয়ে পড়ে, তারপর হাঁটতে হাঁটতে কথা হয়। মাহফুজ জানতে চায়, কোনো সময় কেউ কিছু বলেনি ? তোমার একবারও সন্দেহ হয়নি ? যখন জমি মাপামাপি হয়েছে, কি সীমানার খুঁটি গাড়া হয়েছে কিংবা যখন মিউটেশন করতে গিয়েছো তহসিল অফিসে অথবা যখন চালাঘরখানা তুললে, কখনও কেউ তোমাকে কিছু বলে নি ?

রায়হান মাথা নাড়ায়, না কেউ কিছু বলে নি, কোনো রকম সন্দেহ হয় নি। তবে বাহারউল্লাহ মুনশি একবার দু'বার বলেছিলো যে ফাতু আমিনকে এদিকে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়।

কোন ফাতু আমিন, কেমন লোক ?

আমি চিনি না, কখনও দেখেছি বলে মনে পড়ে না। তবে ঐ লোক নাকি পুরনো দলিলপত্র নিয়ে নানা ধরনের র‍্যাকেটিয়ারিং করে। আর ঐসব দলিল দেখিয়ে জমির মালিকানা দাবি করে টাকা পয়সা আদায় করে।

মাহফুজ চুপচাপ শুনে যায়। তারপর জিজ্ঞেস করে, তুমি যার কাছ থেকে কিনেছো তার নামেই তো এসএ পরচায় রেকর্ড আছে, ঠিক তো ?

হ্যাঁ, রায়হান জানায়। বলে, তোমাকে তো আমি সব কাগজই দেখিয়েছি। ওসব দেখেই তো তুমি জমিটা কিনতে পরামর্শ দিয়েছিলে। তোমার মনে নেই ?

হ্যাঁ, খুব মনে আছে, মাহফুজ জানায়। তারপর বলে, আমি বুঝতে পারছি না এটা কীভাবে সম্ভব ? কাগজপত্র কিছু নেই, অথচ ইনজাংশনের মামলা করে বসলো ? জজ যখন কাগজপত্র দেখতে চাইবে, তখন ওরা কী দেখাবে ?

যদি নকল কাগজ দেখায় ? রায়হান নিজের আশঙ্কার কথা বলে।

মাহফুজ তার কথা শুনে হাসে। বলে, পারে না যে তা নয়, কিন্তু ঐসব কাগজপত্র দিয়ে মালিকানা কীভাবে প্রমাণ করবে ?

মাহফুজ হাঁটতে হাঁটতে একবার হোঁচট খায়। তারপর বলে, অবশ্য এদেশে এখন সবই সম্ভব। গ্রামের দিকে এটা এখন খুব হচ্ছে। নানান কায়দা কৌশল করে ছোট ছোট হোল্ডিং-এর জমি লোকাল গুণ্ডাপাণ্ডার সাহায্য নিয়ে হাতিয়ে নিচ্ছে এক শ্রেণীর নব্য ধনী। পদ্ধতিটা খুবই সোজা। উল্টোপাল্টা কাগজপত্র তৈরি করে মামলা মোকদ্দমা চাপিয়ে দিচ্ছে গরিব মানুষদের ওপর। তখন বাধ্য হয়ে তারা আপোস করছে। আপোস মানে কিছু টাকা পয়সা নিয়ে জমিটা ছেড়ে দেয়া। ল্যাণ্ড গ্র্যাবিং-এর এই এক কায়দা দেশজুড়ে চলেছে– চোর ছ্যাঁচোর, ব্লাকমার্কেটিয়ার, স্মাগলার, ড্রাগ ট্রেডার এদের হাতে যতো কালো টাকা তারা সেই কালো টাকা দিয়ে এখন জমির মালিক হয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের নতুন দুই ক্লাস, মার্ক্সিস্টদের ভাষায়, নিও বুর্জোয়া আর লুম্পেন প্রলেতারিয়েত হাত ধরাধরি করে বেড়ে উঠছে।

রায়হানের হাসি পায়। মাহফুজের মুখে নিও বুর্জোয়া শব্দটা শুনে। পরে খেয়াল হয় মস্কোঅলাদের সঙ্গে মাহফুজদের খুব গলায় গলায় মিল হয়েছিলো। তার মাথায় ঢোকে না। হারিস আলিকে মাহফুজ কীভাবে নিও বুর্জোয়াজি বলে গণ্য করছে। সে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

প্রসঙ্গ পাল্টাবার জন্য বলে, ওসব তত্ত্বকথা বাদ দাও। হারিস আলিও আসলে লুম্পেনই অন্য কোনো ক্লাসে ও বিলং করতে পারে না। তুমি এখন আমার কী করণীয় তাই বলো।

মাহফুজের কপালে ফের চিন্তার রেখা জেগে ওঠে। বলে, মামলাটা করা উচিত ছিলো আমাদের অথচ ওরাই আগে করে বসলো। ঠিক আছে, করুক, আমরাও মামলা করতে জানি, বেটার লেট দ্যান নেভার। ওরা সিভিল কোর্টে গেছে, আমরা ক্রিমিনাল কোর্টে যাবো।

রায়হান সেদিন অফিসে না গিয়ে সোজাসুজি বাসায় ফেরার পথ ধরে। ভেবেছিলো বাসায় ফিরে কিছুক্ষণ ঘুমোবে। কিন্তু পথে পথেই তার বিশ্রামের সময়টা কেটে গেলো। ভিড়ের মধ্যে জ্যামে আটকে গেলো তিন চারবার। রোদে গরমে ঘামতে হয় রিকশায় বসে বসে। কিছুই করার থাকে না এমন অবস্থায়। অমন ঘামতে ঘামতেই তার তুলনাটা মনে আসে, তার বাড়ি বানানোর ব্যাপারটাও এমনই একটা ব্যাপার। শেষ পর্যন্ত এই দাঁড়িয়ে গেলো, যে মাঝপথে আটকে গেছে সে। এখন আর কিছুই করার নেই। এভাবেই আটকে থাকতে হবে। কিন্তু কতোদিন? নিজেকে যে প্রশ্ন করে, যার কোনো জবাব সে খুঁজে পায় না। কারণ সে কি জানে? কতোদিনে মামলা শেষ হবে? নাকি আদৌ শেষ হবে না। নিজের জীবৎকালে কি সে মাথার ওপর একটা ছাউনি তুলতে পারবে?

বীথির কাছে সে আজকাল কিছুই খুলে বলে না। জমি বেদখল হয়ে যাবার ঘটনাটা সে পুরো জানায় নি। শুধু এইটুকু জানিয়েছে যে, জমি নিয়ে গোলমাল শুরু হয়ে গেছে। ব্যস শুধু এইটুকুই।

এ ব্যাপারে তার নিজের একটা হিসেব এই যে, এসব ঝামেলার মধ্যে সে কেন ওদের জড়াবে! যাদের করার মতো কিছুই নেই খামোকা কেন ওদের দুশ্চিন্তার মধ্যে ফেলা! বড় দুই ছেলেরই বয়স কম। যদি ওরা সামনা সামনি রুখে দাঁড়াতে যায়, বাবা হয়ে সে অমন কিছু কেমন করে হতে দেয়? রঞ্জুর তবু হুঁশজ্ঞান আছে, অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করতে পারে। কিন্তু মঞ্জুর তো ওসবের বালাই নেই। সব কিছু জেনেশুনে কীভাবে সে জমি বেদখলের ঘটনা সবাইকে খুলে বলে? আর বীথি? তার দিকটাও তো দেখতে হয় তাকে। সে বেচারি ঘরে বসে দুশ্চিন্তা করবে সারাদিন– এরও কি কোনো মানে হয়? সে অবশ্য [illegible] করতে পারে আর তা হলো মহিলা সমিতির ওপরের দিককার কোনো নেত্রীকে [illegible] মন্ত্রীটন্ত্রির কাছে নালিশ জানানো। বেচারি ঐ কাজটা অবশ্যই করবে। কিন্তু ওতে যে কাজ হবে না, সেটা তো সে জানে না। বেচারির দুশ্চিন্তা আর ছোটাছুটিই সার হবে। সুতরাং ঘটনাটা বাড়ির লোকদের না জানানোটাই ঠিক। যখন জানবে ওরা যে ওদের বাবা নিজের কেনা জমি অন্যে দখল করে নিলেও কাউকে কিছু জানায় নি– তখন বাবাকে ভীরু আর দুর্বল ভাববে ওরা। তা ভাবুক, রায়হান নিজের মনকে তৈরি করে। আসলে ব্যাপারটা তো একটা দুটো সীসের গুলি, নয় তো যে ছুরিখানা টাইগার কামালের হাতে দেখেছে। অমন ছুরি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

একবার কি দু'বার বুকের মধ্যে চুকিয়ে দেয়া। এই তো ব্যাপার, তারপর কী হলো না হলো, তাতে কার কী? সুতরাং ঐ ব্যাপারে কোন বিচারে সে বাড়ির লোকদের জড়ায়? নিজের সিদ্ধান্তে রায়হান কোনো রকম ভুল দেখে না।

তবে রায়হান জানাতে না চাইলে কী হবে। বীথির কানে সব খবরই এসে পৌঁছায়। স্বামী বাসায় ফিরলে তার ক্লান্ত আর দুশ্চিন্তাক্লিষ্ট মুখ দেখে সে মনের ভেতরে খুব কষ্ট পায়। প্রথম দিনই ফুলবাড়িয়া থেকে ফেরার পর সে জিজ্ঞেস করেছিলো, কিন্তু মানুষটার যে কী হয়েছিলো, খুলে কিছুই বলে নি। সেদিন না, তারপরেও না। জিজ্ঞেস করলে খুব সংক্ষেপে উত্তর দেয় আজকাল। বলে, ঝামেলা নতুন কিছু হয় নি সবই পুরনো, চেষ্টা করছি, দেখা যাক কী হয়– কিছু একটা হয়ে যাবে নিশ্চয়ই।

কিন্তু এভাবে কতোদিন চলবে? প্রশ্ন করার সময় বীথির গলা কেঁপে যায়।

যতোদিন চলে, কপালে দুর্ভোগ থাকলে কী করা যাবে, তবে কিছু একটা হয়ে যাবে। ওপরের কর্তাদের ধরার চেষ্টা হচ্ছে।

হালকা ভঙ্গিতে বললে কী হবে, মঞ্জু কাছাকাছি ছিলো সে শুনতে পায়। ওদিকে রঞ্জুকে জানানো হলে সে গম্ভীর হয়ে যায়। কারণ বাবার শরীরের অবস্থা নিয়ে তার চিন্তা হয়।

জমি হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে এই দুঃসংবাদটা তার মনে কোনো রকম আঁচড় কাটে না। নিজের আশঙ্কার কথা মাকে না বলে সে পারে না। বলে, হার্টের রোগী, এভাবে টেনশন আর ছোটাছুটির মধ্যে থাকছেন, কখন কী হয় বলা মুশকিল। আব্বাকে আপনি বাইরে বেরুতে দেবেন না।

ছেলের কথা শুনে বীথির হাসি পায়। বলে, তোর বাবার স্বভাব তুই জানিস না? আমার কথা শুনবে? সারাটা জীবন তো দেখলাম। নিজের কোনো কাজেই অন্যকে জড়াতে চায় না। নিজের অসুখ-বিসুখ হলেও না।

রঞ্জু যাবার সময় বলে যায়, আব্বার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলবো।

পরের দিন মুনশি রায়হানের খোঁজে এলে বীথি তাকে বসায়। তারপর তার মুখ থেকে শোনে, যা যা ঘটেছে সমস্ত কিছু।

মুনশি কিছুই গোপন করে না। সায়েব যে রাগের মাথায় তেড়ে গিয়েছিলো মাস্তান দুটোর দিকে সে কথা তো বলেই। একজনের হাতে যে ধারাল লম্বা একখানা ছুরি ছিলো সে খবরটা জানাতেও সে ভুল করে না– আর একটা মামলা যে চাপিয়ে দেয়া হয়েছে, সে খবরটাও সে জানাতে বাকি রাখে না।

বীথি শোনে আর তার বুকের ভেতরটা শিউরে শিউরে ওঠে। মঞ্জুও মায়ের পেছনে দাঁড়িয়ে মুনশির বর্ণনা শোনে আর তার দু'হাতের মুঠো একবার শক্ত হয়, ফের আলগা হয়।

মঞ্জুর বাইরে বেরুনো বারণ। কিন্তু কোন ফাঁকে যে ও বেরিয়ে যায়, বীথি নজর রাখতে পারে না। তারপর সারাটা দিন ছেলের আর পাত্তা নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

সেদিন বীথির স্কুল ছিলো না। প্রাইমারী শিক্ষকদের সেদিন দাবিনামা পেশ করার জন্য মিছিল করে শিক্ষা ভবনে যাওয়ার কথা। কিন্তু বাসায় থাকলে কী হবে, প্রত্যেকটা মুহূর্ত তার অস্থিরতার মধ্যে কাটে। সে কয়েকবার রঞ্জুকে টেলিফোন করেও পায় না। যতোবারই ফোন করে, ততোবারই এক উত্তর– ডাক্তার রাজিব ওটিতে আছেন। আজ তার বেরুতে দেরি হবে। অগত্যা কী করে। ওকে বাসায় আসার কথাটা জানিয়ে সে ফোন রেখে দেয়। ওদিকে রায়হানকেও পাওয়া যায় না। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে যায়, তবু যতোবার টেলিফোন করে, ততোবারই এক খবর– রায়হান স্যার এখনও ফেরেন নি। কোথায় গেছেন, সে খবরও কেউ বলতে পারে না– শুধু বলে অফিসের কাজে যান নি, তাঁর ব্যক্তিগত কোনো দরকারে বেরিয়েছেন। আপনার যদি কোনো মেসেজ থাকে তাহলে বলুন, আমরা তাঁকে জানিয়ে দেবো।

অমন কথা শোনার পর কে শান্ত থাকতে পারে? দুশ্চিন্তা আর উদ্বেগ মনের ওপর চেপে বসে।

তখন একটাই চিন্তা, মানুষটা কি ফুলবাড়িয়া গেছে? না হলে গেলো কোথায়? দুপুর বেলা টেলিফোন করে প্রথম, তখন থেকে নেই। এদিকে মঞ্জুটাও বাসায় নেই। থাকলে ওকেই পাঠাতো। আব্দুল্লাহ অথবা সালেহউদ্দিন নিশ্চয়ই খোঁজ-খবর করে দেখতো। যদি ফুলবাড়িয়া গিয়ে থাকে আর এতোক্ষণ সময় পার হয়ে যাবার পরও না ফেরে, তাহলে তো রীতিমতো চিন্তা হওয়ার কথা। তার মনের ভেতরটা আশঙ্কার কাঁটায় ক্ষতবিক্ষত হতে থাকে।

নিজের উপরে তার রীতিমতো রাগ হয়। কেন যে একটা নিজের বাড়ির স্বপ্ন তাকে পেয়ে বসেছিলো, নিজেই জানে না। সবাইকে দিয়ে কি সবকিছু হয়? অনেকেরই তো নিজের বাড়িঘর নেই। করতে পারে নি– তাই বলে কি তারা বেঁচেবর্তে নেই? সংসার করছে না? ছেলেমেয়েরা মানুষ হয় না? তাহলে?

যতোবার মুনশির মুখে শোনা ঝাঁকড়া চুলো, লম্বা ছুরি হাতে লোকটার কথা মনে পড়ে, ততোবারই তার বুকের ভেতরটা ভয়ে সিঁটিয়ে যেতে থাকে। যদি ঐ ঝাঁকড়া চুলো লোকটা বুকের ওপর বসিয়ে দিতো ছোরাখানা? ওদের বিশ্বাস আছে? ওরা না পারে কী? কাগজে তো অহরহ খবর বেরুচ্ছে যে দু'তিন হাজার টাকা দিলেই ভাড়াটে খুনীরা মানুষ খুন করে থাকে।

বিকেল পার করে রঞ্জু বাসায় আসে। কিন্তু তখন পর্যন্ত না মঞ্জু, না ওর বাবা, কারুরই পাত্তা নেই। রঞ্জু মায়ের কাছ থেকে সব কিছু শোনে। মুনশি যা যা বলেছিলো সব একটা একটা করে বীথি ছেলেকে জানায়। রঞ্জু সব শোনার পর বলে, ঐ জমিটা যদি হাতছাড়া হয়ে যায়, তাহলে আমরা কী করতে পারবো, বলেন? যারা ওখানে ভাড়াটে গুণ্ডা পাঠিয়েছে, তাদের সঙ্গে সরাসরি যদি লাগতে হয় তাহলে আমাদেরও বেশি সংখ্যায় গুণ্ডা পাঠাতে হবে। সেটা কি আমরা করতে পারবো? নাকি করতে চাইবো! আর দুই নম্বর পথ হলো মামলা মোকদ্দমায় যাওয়া। তাতে খরচের কোনো হিসাব নেই। তারপর কতোদিনে মামলার ফয়সালা হবে তারও কোনো ঠিক ঠিকানা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

নেই– দু'বছরে হতে পারে আবার দশ বছরও লাগতে পারে–। এখন বলেন, অতোসব ঝামেলার মধ্যে গিয়ে লাভ আছে কিছু ?

মঞ্জুও মাথা নাড়ায়। বলে, একশো বার ঠিক নয়। না না, মামলা মোকদ্দমায় যাওয়া ঠিক নয়। বীথি জানায়, চিন্তা করে দেখুন, হাত-পা নড়াচড়া করেও কি আমরা কিছু করতে পারবো ? জানি, আব্বাকে সিনিয়র জার্নালিস্ট হিসাবে অনেকেই চেনে-জানে। সেজন্যে পুলিশের বড় কর্তারা সাহায্যের কথা বলবে, চাই কি মন্ত্রীদের কাছ থেকেও আশ্বাস পাওয়া যাবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা যাবে সবই ওপর ওপর। কাজের কাজ কিছুই হবে না। এসব ব্যাপারে কখনও কেউ কিছু করে দেয় না।

ছেলের কথা শুনে বীথির অবাক লাগে। এতো বড় একটা ক্ষতি হতে যাচ্ছে অথচ ছেলের মধ্যে কোনো রকম বিকার দেখছে না! এমনভাবে কথা বলছে যেন জমি হাতছাড়া হয়ে যাবার ঘটনাটার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই, জমিটা যেন অন্য লোকের, তার বাবার নয়!

বীথির বুকের ভেতর থেকে লম্বা একটা নিঃশ্বাস বের হয়। সে নিজেকেই বোধহয় শুনিয়ে শুনিয়ে বলে, আমার কপালটাই খারাপ। যা করতে চাই, তাতে সব সময় বাধা পড়ে– নিজেদের বাড়ি আমার কপালে নেই।

মায়ের দীর্ঘশ্বাস আর আক্ষেপের কথাগুলো রঞ্জুর কানে আসে। তার বেশ খারাপ লাগে। সে তখন মায়ের ঘাড়ে দু'হাত রেখে শান্ত গলায় বলে, আম্মা, কেন আপনি এসব চিন্তা করে মন খারাপ করছেন ? চিন্তা করে দেখুন মন খারাপ করে লাভ আছে কিছু ? আসলে কি কেউ পোক্ত ঠাঁই করতে পারে ? নাকি সেটা থাকে শেষ পর্যন্ত ? আমার নানার ছিলো শেষ পর্যন্ত ? তিনি বাড়িঘর করেন নি, বড় আশা ছিলো রিটায়ার করার পর চলে যাবেন কলকাতার ভবানীপুরের বাড়িতে। পেরেছিলেন ? পারেন নি। তারপর যে দিনাজপুরে বাড়ি করলেন, সেখানেও কি থাকতে পেরেছেন ? আমার দাদারও তো একই রকম ঘটনা– দুটো জেনারেশন যেতে না যেতেই সমস্ত কিছু কেমন ওলটপালট হয়ে গেলো। সবই তো দেখেছেন আপনি। কে কোথায় যে ছিটকে পড়লো এখন হিসাব রাখাই মুশকিল।

এসব কথা বীথি যে কখনও ভাবে নি তা নয়। কিন্তু তার মন মানতে চায় না। আমার বাড়ি বলতে কী বোঝায় তা সে কোনোদিন অনুভব করতে পারলো না। অথচ বিয়ের পর থেকেই সে ভেবে আসছে যে, এক সময় তার নিজের একটা বাড়ি হবে। গেট খুলে ভিতরে ঢুকলেই মনে হবে এটা আমার বাড়ি। এ বাড়ি ছেড়ে আমাকে আর কোথাও যেতে হবে না। এখানেই আমার জীবন কাটবে। ছেলেরা বিয়ে করবে। নাতি নাতনি লনে বা উঠোনে খেলা করবে। কিংবা ছেলের বউরা রঙিন শাড়ির আঁচল উড়িয়ে বারান্দার রেলিঙে ঝুঁকে পড়ে প্রতিবেশীর সাথে আলাপ করবে। আর তাতে মনে হবে– হ্যাঁ, এটা আমার বাড়ি। আমার ছেলের বউ ওরা। কিংবা ওরা আমারই নাতি নাতনি।

এটা কি নেহাৎই স্বপ্ন ? বেঁচে থাকার অবলম্বন ? বীথির মনের ভেতরে কেউ যেন বারবার করে বলে, তোর ছেলেরা না থাকলে কি তুই থাকতে পারবি ? ছেলের বউ,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

নাতি নাতনি এদেরকেও তো তোর দরকার। আর সমস্ত কিছুর জন্য দরকার একটা পোক্ত ঠাঁই। একটা না হলে কোনোটাই হয় না বলে তার ধারণা।

রঞ্জুর সঙ্গে কথা বলে বীথি কোনো রকম ভরসা পায় না। কেবলই মনে হয়, ক্ষতি যা হবার তা না হয় হবে, কিন্তু রায়হান যদি ধকলটা সামলাতে না পারে তখন কী হবে? অন্যান্য দিনের মতোই রায়হান অনেক রাতে বাড়ি ফেরে। তবে অন্য দিনের মতো চুপচাপ থাকে না আজ। বীথির সামনে এসে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলে, মাহফুজকে বলে দিলাম, কালই যেন ইনজাংশনের মামলাটা আরম্ভ করে দেয়।

বীথি কথাটা শোনে। ঐ সময় রঞ্জু মায়ের মুখের দিকে তাকায়। এমন ভঙ্গি করে যেন মামলাটা যে আরম্ভ করা হবে, সেটা তার জানা ছিলো।

এতো তাড়াহুড়ো করে মামলা করতে যাওয়ার কি খুব দরকার ছিলো? বীথির মুখ দিয়ে প্রশ্নটা যেন আপনা থেকে বেরিয়ে যায়।

কী করবো, বলো? রায়হানের বুকের ভেতর থেকে লম্বা নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে। সে বলে, এমপি ভদ্রলোক থানার ওসিকে বলেছিলেন যাতে একটা কিছু ফয়সালা করে দেওয়া হয়।

ওসি ভদ্রলোক ওদের থানায় ডাকিয়েও এনেছিলেন, কিন্তু হলে হবে কী, ওরা তো কম ঘোড়েল না। আলোচনার টেবিলে বসতে না বসতেই জানিয়ে দিলো, থানায় কোনো ফয়সালা হবে না– যা হবার কোর্টেই হবে। তখনই ওরা জানালো যে, আমার বিরুদ্ধে ওরা ইনজাংশনের মামলা করেছে, আমার কেনা জমিতে আমাকেই ঢুকতে দেবে না। ঐ কথা শোনার পর মাহফুজ ও বললো, এখন আর উপায় নেই। তোমাকেও মামলার মধ্যে যেতে হবে। ওর ঐ কথার পর আর কী করা যায় বলো? শেষে বলে দিলাম, ঠিক আছে, মামলাই করো তাহলে।

তারপর কয়েকটা দিন কাটলো দারুণ উত্তেজনা আর উৎকণ্ঠার মধ্যে। মাঝখানে মঞ্জু দু'দিন উধাও হয়ে রইলো। ওকে নিয়ে আবার অন্য দুশ্চিন্তা– দুশ্চিন্তাটা মা-বাবার চাইতে বেশি হচ্ছিলো রঞ্জুর। কারণ, তার খালি মনে হচ্ছিলো, মঞ্জু কোনো আন্ডার গ্রাউন্ড পার্টির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে। সে খোঁজাখুঁজিও করেছিলো নানান জায়গায়। কিন্তু কেউ-ই কিছু বলতে পারে না। ওর নতুন বন্ধু নাবিল কিছু বলতে পারে না। সে নিয়ে গেলো তিমলির কাছে। সেও কিছু জানে না। খবরটা শোনার পর মেয়েটা কেমন যেন অন্যরকম হয়ে গেলো। রঞ্জু কিছুটা অবাকই হয়। তার কনিষ্ঠ ভ্রাতাটি তাহলে বেশ আনন্দেই আছে। বিদায় নেবার সময় তিমলি বললো, ও ঠিকই আছে, মনে হয় না। অন্য কেউ ওকে আটকে রেখেছে। আপনাদের একটা জমি নিয়ে নাকি খুব ঝামেলা হয়েছে– ও বলছিলো, এবার থেকে আমিও মাস্তানি করবো– মাস্তানদের সবাই ভয় পায় বলে ওর মাস্তান হবার শখ। বলতে বলতে তিমলি খুব হাসে– হাসতে হাসতে রঞ্জুকে রাখির কথা শোনায়। বলে, ও রাখির জন্য পাগল। কিন্তু–

রঞ্জু সমীরণ কাকার মেয়ে রাখির ব্যাপারটা জানে। তিমলি কী একটা বলতে গিয়ে থেমে গেলে সে তার মুখের দিকে তাকায়। বলে, কিন্তু কী?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

না মানে, তিমলি বার দুই আমতা আমতা করে। তারপর তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, রাখি বোধহয় আজকাল অন্য কথা ভাবছে। অবশ্যি ভাবাটাই স্বাভাবিক, ওদেশে চলে গেলে তারপর ফিরে কেউ আসতে পারে ?

তার মানে ? রঞ্জুর মনের ভিতরে একটা নতুন দুশ্চিন্তার কাঁটা খোঁচা দেয়, তাহলে কি মঞ্জু সমীরণ কাকার মেয়ের জন্য বিবাগী হয়ে কোথাও চলে টলে গেছে ? সে তিমলিকে আশঙ্কার কথাটা বললে সে হাসতে হাসতে একেবারে গড়িয়ে পড়ে। বলে, মঞ্জু কিন্তু অমন ছেলে না রঞ্জু ভাই ও অমন ছেলেমানুষি কখনোই করবে না।

মনের ভিতরে দুশ্চিন্তা থাকলেও হাঁটতে হাঁটতে দু'জনায় কথা হয় বেশ। কিছুক্ষণ। তিমলি বলে, ও খুব সিরিয়াস– যা করে, সিরিয়াসলি করে।

আচ্ছা, ও কী পলিটিক্স করে ? মানে ছাত্রলীগ কি ছাত্রদলের ছেলেদের সঙ্গে ওর কি বেশি মেলামেশা ?

তিমলি হাসে। বলে, ওটা তো আপনি ভালো জানবেন আমার চাইতে।

কথা শেষ করে রঞ্জু বিদায় নেয়। টিএসি'র মোড়ে সে মঞ্জুকে দেখতে পায়। ছুটে গিয়ে সে ভাইয়ের হাত ধরে একটা রিকশার ওপর টেনে তোলে। তারপর কোথায় গিয়েছিলো, কেন গিয়েছিলো, বাসায় না ফিরে এখানে কেন ? এসব প্রশ্ন একটার পর একটা করে যায়। কিন্তু মঞ্জু না কোনো প্রশ্নের জবাব দেয়, না ভাইয়ের মুখোমুখি তাকায়। শুধু বলে, আমার কাজ ছিলো।

বেশ তো কাজ ছিলো, ভালো কথা– কিন্তু বাসায় বলে যাস নি কেন ?

মঞ্জু মুখ থেকে জবাব না পেয়ে রঞ্জুর রীতিমতো রাগ হয়। সে বলে ওঠে, দেখ, তুই কিন্তু খুব বেশি বাড়াবাড়ি করছিস। বেশি বেশি পাগলামি করলে কিন্তু পাগলা গারদে ঢুকিয়ে দেবো। বুঝলি ? কথাটা মনে থাকে যেন।

মঞ্জু গম্ভীর মুখে বলে, কেন, বাড়ির মধ্যে অমন একটা সমস্যা, সে ব্যাপারে আমার কিছু করার থাকতে পারে না ?

হ্যাঁ অবশ্যই পারে। রঞ্জু বলে, কিন্তু উধাও হয়ে থাকবে পুরো দুটো দিন আর একটা রাত। একটা খবর পর্যন্ত দেবে না। এটা কী ধরনের কাজ হলো ?

আমি খবর পাঠিয়েছিলাম, মঞ্জু খুব সংক্ষিপ্ত জবাব দেয়।

বেশ ভালো কথা। রঞ্জু জিজ্ঞেস না করে পারে না। বলে, খবর পাঠিয়েছিলে তো আমরা পেলাম না কেন ?

তুমি পেয়েছিলে। মঞ্জু ফের বলে, তোমাকেই খবরটা দেয়া হয়েছিলো। কিন্তু তুমি কানে তোলো নি, তখন খুব ব্যস্ত ছিলে।

ঐ কথার পর রঞ্জু ভাইয়ের মুখের দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে। তার তখন মনে পড়ছে– সকাল বেলার দিকে সে একটা এমারজেন্সি অপারেশনের জন্য ছুটতে ছুটতে যাচ্ছিলো, ঐ সময় একটি তরুণ পাশ থেকে বলেছিলো, মাহিব দু'দিনের জন্য ঢাকার বাইরে গেছে। রঞ্জু কথাগুলো স্মরণ করতে পারে। গলার স্বরটাও, কিন্তু তরুণটির মুখ কিছুতেই স্মরণ করতে পারে না। কারণ ঐ সময় তার রোগী মরতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বসেছিলো। সরকারী দলের ছাত্রনেতার দুই বডিগার্ড মোটরবাইক নিল বেশ্যাপাড়ায় ঢুকেছিলো। ঐখানে পাড়ার গুণ্ডাদের সঙ্গে তাদের মারামারি লেগে যায়। গোলাগুলিও হয় প্রচুর। ঘটনাটা ঘটেছিলো মাঝরাতের দিকে। তারপর বাকি সময় সমানে রক্ত ঝরেছে দু'জনের শরীর থেকে, কাইয়ুম স্যার ফোনে বলে দিয়েছিলেন, ছেলে দুটোকে বাঁচাতেই হবে। বাই এনি মীনস। ওদিকে গেটের বাইরে থেকে সম্মিলিত চিৎকার হচ্ছিলো, ভুটান ভাইয়ের যদি কিছু হয়, তাহলে আমরা সব কিছু ভেঙে ফেলবো। ঐ রকম অবস্থায় যদি কেউ কানের কাছে কোনো খবর দেয়, সেটা কি স্মরণ থাকার কথা? কারুর থাকে কখনও?

মঞ্জু তখনকার মতো কিছু বলে না। কিন্তু পরে ভাইকে সমস্ত কিছু খুলে জানায়। বলে, বাবার অমন একটা দুশ্চিন্তা, খালি ছুটে বেড়াচ্ছেন। একদল মাস্তান আর গুণ্ডার জন্য। আমার অসহ্য লাগছিলো দেখতে। তাছাড়া একজন মানুষের জমি কথা নেই বার্তা নেই অস্ত্র আর গায়ের জোরে গুণ্ডা বদমাশরা দখল করে নেবে, আর আমি কিছুই করবো না? আমার খুব খারাপ লাগছিলো ভাইয়া। মঞ্জু বলে, কেবলই মনে হচ্ছিলো, আমি কিছুই করবো না, ঘরে বসে বসে বুড়ো আঙুল চুষবো? এ কী হতে পারে। তাই আমি বেরিয়ে গিয়েছিলাম।

কিন্তু গিয়েছিলিটা কোথায়?

নরসিংদী, আমার বন্ধু হামিদকে তো চিনিস? মনে নেই?

হ্যাঁ, মনে আছে, কিন্তু কেন?

ওর সঙ্গে কিছু আর্মড ক্যাডারের এখনও যোগাযোগ আছে। আমার মনে হয়েছিলো, হামিদ আমাদের এমন বিপদে কিছু একটা করবে। ওর মেসে গিয়ে দেখি ও নেই। একজন বললো, ও দেশের বাড়ি গেছে। এক সপ্তাহ পর ফিরবে। ওদের গ্রামের নাম জানতাম। নরসিংদী শহর থেকে ৪/৫ মাইল দূরে। ওদের গ্রামের নাম হোসেনপুর। যখন বললো যে, ও গ্রামের বাড়ি গেছে, তখন মনে মনে ঠিক করলাম ওকে গ্রামের বাড়িতে গিয়েই ধরতে হবে।

রঞ্জুর হাসি পায় ছোট ভাইয়ের চিন্তার বহর দেখে। হাসতে হাসতে বলে, দেখছি খুবই পাকা বুদ্ধি তোর। আরে বোকা, ওরা যদি সত্যি সত্যি পার্টি ক্যাডার হয়ে থাকে, তো এসব কাজে আসবে কেন?

মঞ্জু বলে, আসতো। কারণ ওদের পার্টির ভিতরে অনেক ভাংচুর হয়ে চলেছে। ওরা দলছুট হয়ে এখন ভাড়া খেটে বেড়ায়।

বেশ, তাও না হয় হলো, তোর কথা মানলাম। কিন্তু তোর কথায় ওরা কেন আসবে? তোর পয়সা দেয়ার মুরোদ আছে? আর এতো দূরে এসে ওরা তোর কাজ করে দিয়ে যেতে পারবে? ওদের প্রাণের ভয় নেই?

মঞ্জু আসল ঘটনা খুলে বলতে পারে না। কীভাবে বলবে যে হামিদকে তো সে পায়ই নি, এমনকি তার বন্ধু সুলতানকেও না। মঞ্জুর পরিচয় পেয়ে হামিদের বাবা বললেন, তুমি বাবা এইখানে থাইকো না। অখনই চইলা যাও। প্রত্যেক রাইতে পুলিশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বাড়ি বাড়ি আইসা রেইড করে। তোমারে দেখলে কুনো কথা শুনবো না, সিধা চালান কইরা দিবো।

ভদ্রলোককে ঐ মুহূর্তে ভয়ানক উদভ্রান্ত আর উত্তেজিত দেখাচ্ছিলো। এ কথা শোনার পর সে আর দাঁড়ায় নি, সোজা বড় রাস্তায় গিয়ে বাস ধরেছে। সে তার ব্যর্থতার কথাটা বড় ভাইয়ের কাছে খুলে বলতে পারে না। মুখ নিচু করে বসে বসে বড় ভাইয়ের ধিক্কার শোনে। ছি, মঞ্জু আব্বা-আম্মা দু'জনেই ভয়ানক অশান্তির মধ্যে আছেন। তুই কোথায় তাঁদের চিন্তা দূর করার চেষ্টা করবি, তা না করে তুই দুশ্চিন্তার ভার আরও বাড়িয়ে দিলি। ছি, মঞ্জু ছি।

আঠাশ

টুকু মনে মনে ঠিক করে ইংরেজি স্যারের ক্লাস কিছুদিন করবে না। তার মানে, ক্লাস থেকে সে পালাবে। রোজ স্যার বকাবকি করেন, আর হোমওয়ার্কের খাতাখানা লালদাগে ভর্তি করেন। সেখানা সবার সামনে মেলে ধরে দেখান। রোজই বলেন, পারবে না বাবা, পরীক্ষা সাগরে তুমি সাঁতার দিতে পারবে না। নির্ঘাত তুমি ডুববে, বুঝলে? ডাব্বা আর ডুবা একই কথা তাই না? একটাতে শুধু একটা বি বেশি লাগে- ডিইউবিএ আর ডিইউবিবিএ- তোমার আর উপায় নেই, সোনার চাঁদ, কতো করে বললাম, কোচিং করো, কোচিং করো, শুনলে না- এখন? সামনে ছুটি এসে গেলো, তারপরই তো এ্যানুয়াল- এই ইস্কুলে তো ফেলটু ছাত্রদের রাখা হয় না, সেটা জানো তো, বলেছো তোমার গার্জিয়ানকে? তুমি লাল্টু মার্কা সুন্দর ছেলে কিন্তু সবাই তোমাকে ফেলটু বলবে, তখন কী করবে।

স্যারের চিবিয়ে চিবিয়ে বলা কথা শুনে ক্লাস সুদ্ধ ছেলেরা হাসে, টুকু তখন কী করবে? তাকে মাথা নিচু করে সিটে বসে থাকতে হয়।

এমন অবস্থা হলে তার আর উপায় কী? মাকে সে অনেকবার বলেছে, মা তার কথায় কান দেন না। কী সব জমিজমা কেনা নিয়ে মামলা-মোকদ্দমায় ব্যস্ত আছেন, এখন এসব কথা নাকি বলা যাবে না। মা বলেন, কেন, বাড়িতে বসে পড়তে পারো না? আমার কাছে তো দেখিয়ে নিতে পারো, না হলে মঞ্জুকে বলো না কেন?

টুকু ক্লাস শেষ হওয়ার পরও ইংরেজি হোমওয়ার্কের খাতাখানা সামনে নিয়ে বসে থাকে। পরের ক্লাসে ভূগোল স্যার প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেন, বাংলাদেশের অক্ষাংশ-দ্রাঘিমাংশ কতো?

হঠাৎ প্রশ্ন শুনে খানিক ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে উত্তরটা দিতে যাবে। এমন সময় স্যার খেঁকিয়ে ওঠেন, এই রকম একটা সাধারণ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারো না? ফাইনাল পরীক্ষায় কী করবে তুমি? হ্যাঁ? তুমি বরং তোমার বাবা মাকে আগে থেকেই বলে দাও যে এই ইস্কুলে তোমার পড়াশোনা করতে ভালো লাগে না, বুঝেছো? পরীক্ষায় ফেল মারলে যখন এই ইস্কুলে রাখবে না তখন তো আরও অসুবিধা। ফেলটু ছাত্র বলে অন্য কোনো ইস্কুলে তোমাকে নেবে না, বুঝেছো?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

পর পর দুই ক্লাসে অমন হেনস্থার পর টুকু শেষ ক্লাস না করেই ইস্কুল থেকে বেরিয়ে আসে।

বাসায় ফিরে জামা জুতো না ছেড়ে সোজা বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে থাকে। পিঠে তখনও স্কুলের ব্যাগ।

মোমেনার মা তখন ঘরদোর ঝাঁটপাট দিচ্ছিলো। সে বলে ওঠে, কী হইছে বাবু? শরীলডা খারাপ?

খবর পেয়ে বীথি এসে ছেলেকে দেখে। কী হয়েছে, আরে বলবি তো? কার ওপর রাগ করেছিস? উঠবি তো? মুখে কিছু দে!

ছেলেকে বোঝাতে অনেক সময় লাগে বীথির। সেও অল্প কিছুক্ষণ আগে ইস্কুল থেকে বাসায় ফিরেছে।

টুকু উঠে বসে, কিন্তু কথা বলে না। পিঠ থেকে ব্যাগটা নামিয়ে তার ইংরেজি হোমওয়ার্কের খাতাখানা মায়ের সামনে মেলে ধরে, তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে পাশের ঘরে চলে যায়।

খাতাভর্তি শুধু লাল দাগ দেখে বীথির খুব খারাপ লাগে। পৃষ্ঠাগুলো উল্টেপাল্টে দেখতে দেখতে তার চোখ পড়ে লাল কালিতে কেটে দেওয়া একটা বাক্যের ওপরে। 'গত শুক্রবার হইতে আমি জ্বরে ভূগিতেছি'র ইংরেজি করতে টুকু ভুল করে নি, হ্যাভ বিন লিখেছে, সিঙ্গও ঠিকমতো বসিয়েছে। তবু ঐ লাইনের ওপর লাল কালির মোটা একটা দাগ। খাতাখানা আরও উল্টেপাল্টে দেখে বীথি। ঐ রকম কাণ্ড আরও করা হয়েছে টুকুর হোমওয়ার্কের ওপর। আর তাতে রীতিমতো চিন্তায় পড়ে যেতে হয় তাকে।

নিজের ওপর রাগ ধরে, কেন আগে টুকুর দিকে নজর দেয় নি। তার মনে পড়ে, কোচিংয়ে ভর্তি হওয়ার কথা টুকু বছরের প্রথম দিকেই বলেছিলো। তখন অবশ্যি মনে হয় নি যে, ওর কোচিং দরকার হবে। কিন্তু এখন? এখন তো দেখছে কোচিং-এ ভর্তি হওয়ার দরকার, ইস্কুলে নাম রাখার জন্যও।

অনেকক্ষণ ধরে সে খাতাখানা উল্টেপাল্টে দেখে। দেখতে দেখতে আরও বেশি মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। একবার এমন রাগ উঠলো যে, পারলে তক্ষুণি রওনা হয়ে যায় ভদ্রলোকের বাসার দিকে। টুকুকে ডাকাডাকি করে না পাওয়ায় তখনকার মতো রাগটা দমিয়ে রাখা সম্ভব হলো। তবে রাতের বেলা রায়হান বাসায় ফিরলেই সে কথাটা তুললো, টুকুর খাতাখানা এনে দেখালো পর্যন্ত। কিন্তু দেখলো, রায়হান খুব একটা মনোযোগ দিচ্ছে না। সে যে অস্থির হয়ে রয়েছে ছেলের চিন্তায়, সেটা দেখেও যেন দেখছে না। শেষে চেপে ধরলে, রায়হান বললো, কিছু করার নেই বীথি। কিছু হয়তো করা যেতো, কিন্তু সেটা বছরের প্রথম দিকে অথবা মাঝামাঝি সময়ে। এখন করলে টুকুর ক্ষতি হয়ে যাবে। এমনিতে যা ক্ষতি হবার তা তো হয়েই গেছে, এখন এই নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করলে হয়তো টুকুকে ফেল করিয়ে দেবে।

স্বামীর কথা শুনে বীথি থ' হয়ে থাকে কিছুক্ষণ। বলে, এটা কি মগের মুল্লুক নাকি যে যা ইচ্ছে তাই করবে ইস্কুলের মাস্টাররা?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

রায়হান শান্ত গলায় বলে, রাগারাগি করে কোনো লাভ হবে না। বরং তুমি যেটা করতে পারো তা হলো, টুকুকে বুঝিয়ে দিতে পারো তার হোমওয়ার্কের মধ্যে আসলে কোনটা ভুল, ওর টিচার সেটা ভালো করে না দেখেই কাটাকুটি করে রেখেছে।

স্বামীর কথা বীথির মনে ধরে না। বলে, বাহ্ তাহলে টিচারদের সম্পর্কে ছেলের ধারণা কেমন হবে, সেটা চিন্তা করো? আর যদি টুকু ক্লাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে জোর করে বলে, আমি যা লিখেছি সব ঠিক, আপনি অন্যায়ভাবে আমার হোমওয়ার্কের কাজ ভুল বলে কেটে দিয়েছেন, তখন কী হবে ভেবে দেখেছো?

রায়হান বীথির যুক্তি ফেলতে পারে না। তখন দু'জনে ঠিক করে যে, টুকুর হোমওয়ার্ক কিংবা তার টিচার সম্পর্কে কিছুই বলা হবে না, এখনও যদি টুকুকে কোচিং-এ ভর্তি করে নিতে চায়, তাহলে ওকে ভর্তি করে দেয়া হবে।

কিন্তু তাহলে যে ভুল শিখবে? বীথির মুখ দিয়ে প্রশ্নটা বের হয়। ফলে শেষ পর্যন্ত কোনো সিদ্ধান্তই নিতে পারে না মা-বাবা।

রায়হান পরদিন রিপোর্টিং সেকশনের সালেহউদ্দিনকে কোচিং সেন্টার সম্পর্কে খোঁজখবর নেয়ার কথা বললে সে হাসে। বলে, রায়হান ভাই ব্যাপারটা খুবই জটিল, ইস্কুল টিচার, কলেজ টিচার ধরনের লোকেরা ইনভলভড্, ক্লাসে না পড়িয়ে এরা ছেলেমেয়েদের নিজেদের কোচিং সেন্টারে যেতে বলে– এটাকে র‍্যাকেটিয়ারিং ছাড়া অন্য কিছু কি বলা যায়? কিন্তু খোঁজখবর নিতে গেলে কোচিং-এর মালিকরা মুখই খুলতে চায় না। কোনো কোনো এলাকায় তো লোকাল মাস্তানরাও ইনভলভড্।

তাহলে? রায়হানের মুখ দিয়ে প্রশ্নটা আপনা থকেই বের হয়ে পড়ে।

সালেহউদ্দিন বলে, কিছুই করার নেই রায়হান ভাই– স্কুল লেভেলে তো তবু কিছু কিছু কাজ হয়, কিন্তু পাবলিক এক্সামিনেশনের অবস্থা খুবই খারাপ। নকল, খাতা দেখা, নম্বর বাড়ানো– এসব যে কতো হয়, তার হিসাব করা কঠিন।

রায়হান ভেবেছিলো সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় বিষয়টা নিয়ে লিখবে। কিন্তু হারুন সাহেব সোভিয়েত ইউনিয়নের রাজনৈতিক বিপর্যয়ের বিষয়টা ঘাড়ের ওপর চাপিয়ে দিলেন। ভদ্রলোককে সে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলো। তো তিনি পাল্টা বোঝাতে আরম্ভ করলেন, আপনি এসব কথা কতো লিখবেন বলুন? দুর্নীতি কোথায় নেই? সমস্ত কিছুর মূলে যে লিডারশিপ সেটা তো মানেন, সেখানে যদি করাপশন থাকে, তাহলে আপনি কী করতে পারেন? আসল ব্যাপারটা হলো লিডারশিপ, সেটা যতোক্ষণ ঠিক না হচ্ছে, ততোক্ষণ এসব লেখালেখি করে কোনো লাভ নেই। রায়হান যদিও ভেবে রাখে যে, পরে কয়েকদিন ধরে সে ইস্কুল কলেজ, ইউনিভার্সিটি, পাবলিক পরীক্ষা– এসব বিষয় পরপর কয়েকটা লেখা লিখবে। কিন্তু অফিসে থাকতে থাকতেই এক সময়ে লক্ষ্য করে যে, ব্যাপারটা নিয়ে কোনো কিছু লেখারই সে উৎসাহ পাচ্ছে না।

এদিকে টুকু পরের দিনও ক্লাস পালায়। কারণ আগের দিন যে হোমওয়ার্ক দেয়া হয়েছিলো সেটা সে কারুর কাছ থেকে জেনে নেয় নি, আর হোমওয়ার্ক দেখাতে না পারলে ইংরেজি স্যার আবার রাগারাগি বকাঝকা করবেন। সুতরাং পালানোই তার জন্য ভালো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

তিনদিনের দিন ইস্কুলের বারান্দায় ইংরেজি স্যার তার ঘাড় চেপে ধরলেন। কয়েকবার ঝাঁকাঝাঁকি করে টেনে নিয়ে গেলেন এ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টারের কাছে। সেখানে আবার একদফা বকাবকি, কান ধরে টানা– এসব শাসন চললো। এ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার হাতে একখানা চিঠি ধরিয়ে দিলেন। বললেন, তোমার আব্বাকে দেবে, উনি এই চিঠির উত্তর দেবেন আর সেটা তোমাকে আমার কাছে পৌছাতে হবে।

টুকু বকাবকি শুনে কানমলা খেয়ে চিঠিখানা পকেটে নিয়ে তখনকার মতো বেরিয়ে আসে। টিফিন শেষে ক্লাসে ঢুকতেই ক্লাসের ছেলেরা হৈ হৈ করে উঠলো। একজন এসে দাঁত বের করে হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলো, কেমন লাগলো খেতে ? স্যারের ঐ পাকা কলা ? খুব মিষ্টি তাই না ?

সেদিন ইংরেজি ক্লাস ছিলো না, তবু শেষ পিরিয়ডের সমাজবিজ্ঞানের ক্লাসটা টুকু করলো না। কানমলা খাওয়ার ঘটনাটা সে কিছুতেই ভুলতে পারছে না। হাত লাগলেই বাঁ কানটা ঝাঁ ঝাঁ করে ওঠে। বাড়িতে কেউ কখনো তার গায়ে হাত তোলে নি, আব্বা-আম্মা না, ভাইয়ারা না, আত্মীয়স্বজনরা না– এতোদিন ইস্কুলে পড়ছে, কেজিতে যখন পড়তো, তখন না, এই ইস্কুলে তার তিনবছর হচ্ছে, এখানেও কখনো কেউ তার গায়ে হাত তোলে নি। অথচ আজ! সে যে কী করবে, ভেবে পায় না। পকেটে এ্যাসিস্ট্যান্ট হেড স্যারের চিঠিটা যে সে বয়ে নিয়ে চলেছে সেটাও সে ভুলতে পারছে না। চিঠিটা আব্বাকে তার দেয়া উচিত, কিন্তু যদি সে না দেয় ?

না দিলে কী হতে পারে সেটা সে আন্দাজ করতে পারে না, একবার মনে হয় আব্বা তাকে ধরে খুব জোর পিটুনি দেবেন। পরক্ষণে মনে হয়, আব্বা পিটুনি দিবেন না কারণ তাঁর হার্টের অসুখ। তবে খুব যে রাগবেন সেটা সে বোঝে। আর সেজন্যে তাঁর অসুখটা বেড়ে যেতে পারে, তাও সে আন্দাজ করতে পারে। তাহলে ? সে বুঝতে পারে না আসলে সে চিঠিখানা নিয়ে করবেটা কী।

সিঁড়িতে ভিড়। অন্য কোনো ক্লাসের স্যার বোধহয় ছুটি দিয়ে দিয়েছেন। ভিড় ঠেলে সে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামে। গেটের কাছেও ভিড়। শাহিনের সঙ্গে দেখা হয়। ও কখন ক্লাস থেকে বেরিয়েছে সে খেয়াল করে নি। ওর পাশে বি সেকশনের ফয়সালকেও দেখে সে। সে কিছুটা অবাক হয় যখন ফয়সালের পাশে ক্লাস নাইনের কায়সারকে দেখতে পায়। চোখে চোখ পড়লো কায়সার ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করে, কি খবর, গুডবয় ? ক্লাস থিকা পলাইলা ক্যান ?

টুকু হাসতে চেষ্টা করে। বলে, তোমরা যে কারণে ক্লাস পালিয়েছো, আমারও সেই একই কারণ।

নবাববাড়ির ছেলে ফয়সাল বলে, আমি কিন্তু পড়ার ডরে ক্লাস পলাই নাই, আমার প্রবলেম স্যাররে লইয়া, স্যার বোর্ড পিছনে রাইখা সামনের দিকে চায়, তখন আমার গরুর কথা মনে হয়, যতোবার দেখি ততোবারই মনে হয় বুলফাইটের একটা ষাঁড় য্যান চশমা লাগাইয়া লাল চোখ মেইল্যা চাইয়া রইছে, কখন যে কারে টুঁশ মারে ঠিক নাই– মাতাদোর কই পলাইছে কেউ জানে না, আর রিং-এর বুল দর্শকের দিক তাক কইরা রইছে– ক। ডর লাগে না ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

শাহিন হেসে ওঠে বলে, দূর গাধা, স্যারকে গরু বলদ বলা উচিত নয়।

ক্যান, বললে কী হয়, ফয়সাল শাহিনের মুখোমুখি তাকায়।

সে কিছু বলার আগেই পাশ থেকে কায়সার বলে, না, কিছু হয় না, ঐ কথায় স্যারের অপমান হয় না, স্যার যদি বলদ না হয় তো আমরা গাধা ক্যামনে হই– স্যার তো আমাগো গাধাই কয়, কয় না ?

টুকুর বেশ মজা লাগে কায়সারের কথা শুনে।

চারজনে গেট পার হয়ে দাঁড়ায়। ঐ সময় শাহিন টুকুর কানের কাছে মুখ নিয়ে বলে, চিঠিখানা কিন্তু তোর আব্বাকে দিস, না হলে বেশি ঝামেলা হবে।

টুকু কোনো জবাব দেয় না।

কায়সার জিজ্ঞেস করে, গুডবয় কি এখন বাসায় যাইব্যা, বাসায় গিয়া দুদু ভাতু খাইবা ?

টুকু খোঁচাটা গায়ে মাখে না। বলে, তোমরা কোথায় যাচ্ছো ?

শাহিন টুকুকে সামনের দিকে ঠেলে দিয়ে বলে, যা তুই বাসায় যা, আমরা এখন অন্যদিকে যাবো।

আহা, ক্যান তুমি বাধা দ্যাও, ফয়সাল বলে, সে যদি আসে তো তোমার কি ? এ্যাঁ ? গুড বয়রা কি সদরঘাটে আসে না ? সেন্ট গ্রেগরির পোলা দ্যাহো নাই ? ঢাকা কলেজের ? ইউনিভার্সিটির বড় ভাইরাও তো আসে কুনো কুনো দিন, বলো, আসে না ?

সদরঘাট থেকে উজিয়ে ওদের সঙ্গে যেতে হয় ওয়াইজঘাটের দিকে, সেখানে একটা প্রাচীন ভাঙা বাড়ির ভিতরে ঢুকতে হয়। সেখানে দেখে কয়েকটি বয়স্ক ছেলে মেঝেতে বসে গল্প করছে, আর মাঝে মাঝে সিগারেট টানছে। জনা দুই ছেলে চিৎপটাং হয়ে মেঝেতে শুয়ে, টুকুর একটু ভয় ভয় লাগে। তার বুঝতে অসুবিধা হয় না যে যারা এখানে আসে তারা নেশা করার জন্যেই আসে। শাহিনের কানে কানে সে বলে, আমি কিন্তু এসব সিগারেট কখনও খাই নি।

এমনি সিগারেট কখনও টেনে দেখিস নি ? শাহিন তার মুখের দিকে তাকায়।

তা টেনে দেখেছি দু'একবার, টুকু স্বীকার করে।

এও অনেকটা একই রকম। প্রথমে দু'একটা টান দিলে ঐরকমই মনে হবে, আসল কাজ শুরু হবে পরে।

দেখতে দেখতে ফয়সাল আর কায়সার টেবিলে বসা লোকটার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। তারপর পাঁচ ছয়টা সিগারেট নিয়ে আসে। ফয়সাল জিজ্ঞেস করে, গুডবয়, পকেটে পয়সা আছে ?

টুকু মাথা নাড়ায় বলে, না, রিকশা ভাড়া আছে শুধু।

পাশ থেকে শাহিন একখানা দশ টাকার নোট বাড়িয়ে ধরে বলে, ওর কাছ থেকে টাকা নিচ্ছো কেন ?

বাহ আইজ তো দ্যাখতাছি ভালোই মাল সরাইছ।

একটু থেমে ফের জিজ্ঞেস করে কায়সার, কই পাইছো, বাপের পকেট থিকা, না মায়ের তহবিল থিকা ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

হাসাহাসি হতে হতে ফয়সাল সিগারেট ধরায়। তার দেখাতেই শাহিন। ধোঁয়ার গন্ধটা অদ্ভুত রকম বোঁটকা। টুকু জিজ্ঞেস করে, সিগারেটের ভিতরে কি শুধু তামাক ?

দূর বোকা, শাহিন লাল চোখ তুলে তাকায় আর বলে, শুধু তামাক থাকলে কি এখানে আসতো মানুষ ?

আরে মিয়া, টেস্ট কইরা দ্যাখো একবার, এরে কয় হাশিশ, বুঝলা ? বাংলায় যার নাম গাঞ্জা। আমরা সব খাঞ্জা খাই– গাঞ্জা খাই, পথে ঘাটে গান গাই।

বলতে বলতে, ফয়সাল হাতের আধপোড়া সিগারেটটা এগিয়ে দেয় টুকুর দিকে। আর কি যে হয় তার। সে দুই ঠোঁটের মাঝখানে চেপে ধরে, দমটা টানে। সিগারেটের ধোঁয়ার মতো গলা জ্বলে কাশি ওঠে না, তবে ঝিনঝিন করা একটা অনুভূতি গলা থেকে মগজে পৌঁছে যায় যেন। দ্বিতীয়বার টান দিলে একটু যেন আরাম লাগে, তবে নিঃশ্বাস জোরে নিতে ইচ্ছে করে না, শেষবার টান দেয়ার পর তার ঘুম ঘুম পেতে থাকে।

সামনের টেবিলসুদ্ধ মানুষটাকে মনে হয় হাওয়ার ওপর ভাসছে, মেঝেতে যারা বসে ছিলো তার পাশে কাউকেই তার চেনা মনে হয় না, সবাইকে মনে হয় যেন সাঁতার কাটছে। কীরে, ঘুম পাচ্ছে ? কে যেন তার কানের কাছে চিৎকার করে বলে। কিন্তু তার হাসি পায় ভীষণ। হাসতে হাসতে সে মেঝেতে গড়িয়ে পড়ে।

এক তলার সিঁড়ির দরজায় পড়ে থাকা অবস্থায় ওকে আবিষ্কার করে মঞ্জু। সন্ধ্যার পরে যখন বাসায় ফেরে তখন দেখে টুকু সিঁড়ির মুখে কাত হয়ে শুয়ে আছে। ইস্কুলের ব্যাগ তখনও তার ঘাড়ে। ওদিকে তখন বাসায় আম্মা নেই, মোমেনার মা বললো, টুকুকে খুঁজতে গেছে আম্মা। ওদিকে আব্বাও এসে যান খানিক পর, তারপর আম্মা আসে। ডাক্তার ডাকা হয়। মাথায় ঠাণ্ডা পানি ঢালা হয়। অনেকক্ষণ পর ছেলে উঁ আঁ করলে সবার মধ্যে স্বস্তি ফিরে আসে। ডাক্তার যদিও বারবার করে বলছিলেন, ঘাবড়াবার কিছু নেই, এখনই ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু কারুর বিশ্বাস হচ্ছিলো না তাঁর কথা। টুকু কয়েক ঢোক পানি খেয়ে ঘুমিয়ে গেলে তার ভেজা জামা খোলার সময় এ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টারের চিঠিখানা বীথি আবিষ্কার করে। খাম খুলে চিঠির ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে সে কিছুক্ষণ ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে থ' হয়ে বসে থাকে। তার অবিশ্বাস্য লাগে, শেষ পর্যন্ত টুকু এমন কাজ করলো ? ছেলেটা এমনভাবে নষ্ট হয়ে গেলো ? কতো বয়স ওর ? মাত্রই তের বছর। তার এই কাণ্ড ! চিঠিখানা নিয়ে সে স্বামীকে দেখাতে যায়। রায়হান ওদিকে ডাক্তারকে বিদায় করছে। পাশে মঞ্জু। ডাক্তার সিঁড়ির ধাপে পা রেখে বলছেন বয়ঃসন্ধির সময় বাচ্চারা খুব সাইকোলজিক্যাল ক্রাইসিস-এ ভোগে, এ রকমই কোনো কারণ আছে মনে হয়। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গদোষেও এমন হতে পারে, তবে এ্যাডিকশনের কেস এটা নয়, আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, ওকে কিছুদিন বাড়িতে ক্লোজ ওয়াচ-এ রাখবেন, ওকে টেনশনের মধ্যে ফেলবেন না আর আপনারাও টেনশন তৈরি করবেন না।

পেছন থেকে ডাক্তারের কথা শুনতে শুনতে বীথি হাতের খোলা চিঠিখানা ফের ভাঁজ করে খামে ঢুকিয়ে ফেলে, তার কেমন মনে হয়, রায়হান খুব রেগে যাবে। সে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

মনে মনে ঠিক করে চিঠিখানা সে কাউকেই দেখাবে না, বরং একদিন নিজে গিয়ে এ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টারের সঙ্গে দেখা করে আসবে। রায়হান অফিস থেকেই টুকুকে যে পাওয়া যাচ্ছে না সেই খবর রঞ্জুকে জানিয়েছিলো। রঞ্জু এসে পৌছায় ডাক্তার চলে যাবার পর। রঞ্জু ভাইকে দেখে। তার বুঝতে একটুও দেরি হয় না ঘটনাটা কী। তার মনে পড়ে, বেশ কিছুদিন আগে ওর ব্যাগ-এ ড্রাগ-এর ট্যাবলেট দেখেছিলো। তখনই কেন ব্যাপারটা সবাইকে জানিয়ে দেয় নি ভেবে তার আফসোস হয়, অন্তত ওর বন্ধু সংসর্গটা কেমন, সেদিকে নজর রাখা উচিত ছিলো। রায়হান ছেলেকে ডেকে জিজ্ঞেস করে, তার আসতে কেন দেরি হলো, খবর তো দেওয়া হয়েছিলো সন্ধ্যার আগেই। রঞ্জু বাবার প্রশ্নের জবাব সঙ্গে সঙ্গে দিতে পারে না। শুধু বলে তাকে খবরটা জানানো হয়েছে কিছুক্ষণ আগে। আরও জানায়, বিএমএ'র মিটিং ছিলো। মিটিং-এ জরুরি সিদ্ধান্ত নেয়া হবে বলা হয়েছিলো।

তাই মিটিং শেষ করে তবে আসতে হলো। মিটিং-এ অনেক তর্কবিতর্ক হয়েছে।

ছেলের কৈফিয়ত শুনতে রায়হানের ইচ্ছে করে না। বলে, মিটিং-এর কথা থাক। এখন টুকুর ব্যাপারে কী করা যায় সেটা বলো। ওকে তো বোধহয় শাসন করা দরকার।

রঞ্জু বাবার কথায় সায় দিতে পারে না। বলে, ক্লাস পালিয়েছে, নেশা করার জন্য, না কি অন্য কোনো কারণে সেটা আগে জানা দরকার, ওর বন্ধুদের কাছে জিজ্ঞেস করতে হবে, অন্যান্য ক্লাস টিচারের কাছ থেকেও জানতে হবে, অন্যান্য বিষয়ে পড়াশোনা ও কেমন করে। তারপর ঠিক করতে হবে কী করা যায়।

রায়হান তার কিশোর ছেলের ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। কি নিষ্পাপ দেখতে, অথচ ঐ নিষ্পাপ মুখের আড়লে কতো ভয়ানক বিনাশের বীজ রক্তের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। তার মনের ভিতরে প্রশ্ন জাগে, কে ঠেকাবে আসন্ন ঐ ধ্বংসকে ?

টুকুর পকেটে পাওয়া চিঠিখানা তাকে ভারী দুশ্চিন্তার মধ্যে ফেলে দিয়েছে। ছেলেটা কি শেষ পর্যন্ত মানুষ হবে না ? তার মনে থেকে থেকেই প্রশ্নটা জেগে ওঠে। চিঠিতে লেখা, অনেক অভিযোগ। ছেলে হোমওয়ার্ক করে না। ক্লাস থেকে পালায়। বাড়ি থেকে পড়াশোনা করে আসে না, এমন ছেলেকে যদি সংশোধন না করেন, তাহলে ওকে আমরা কীভাবে ইস্কুলে রাখবো ? ওর প্রভাব তো অন্য ছেলেদের ওপর পড়তে পারে। সুতরাং ছেলেকে সংশোধনের জন্য কী ব্যবস্থা নিয়েছেন, তা আমাদের জানানোর জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। এই হলো চিঠির ভাষা।

রায়হান একবার পড়ে। দু'বার পড়ে, তিনবার পড়ার পরও চিঠির উত্তরে কী লিখবে অথবা ইস্কুলে গিয়ে সরাসরি হেডমাস্টারের কাছে গিয়ে কী বলবে তার ভাষা খুঁজে পায় না। সে কি গিয়ে বলবে যে ছাত্রদের ওপর কেন কোচিং ক্লাসে ভর্তি হবার জন্য চাপ দেয়া হয় ? কিংবা এমন কি বলতে পারবে– আপনাদের ইস্কুলে কিছু ছেলে ড্রাগ এ্যাডিক্ট, সে সব ছেলেকে কি সংশোধনের চেষ্টা করেছেন ? না কি বলতে পারবে যে অল্পবয়সী ছেলেদের নিষ্ঠুরভাবে মারধর কেন করেন ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

আসলে সে কিছুই বলতে পারবে না। কোচিং ক্লাসের কথা না, ড্রাগ এ্যাডিক্টদের কথা না, ইস্কুলে বাচ্চা ছেলেদের ওপর অত্যাচারের কথা না। তার অদ্ভুত লাগে। নিজের জমি– কিন্তু বাধ্য হয়ে ছেড়ে দিতে হলো। তার ছেলেকে মেরে আধমরা করে ফেলে রাখে রাস্তায়, বাচ্চা ছেলেটিকে ড্রাগ খেতে শেখানে হচ্ছে, বন্ধুর মেয়েটিকে রাস্তা থেকে ধরে নিয়ে রেপ করলো সরকারী দলের মাস্তানরা, তবু বলার কিছু নেই। বলারও নেই, লেখারও নেই। এসব নিয়ে লেখার জন্য কাগজের পৃষ্ঠায় জায়গা কোনো কোনো দিন অবশ্যি থাকে, তবে রাজনৈতিক ঘটনা আর নেতানেত্রীদের বক্তৃতা-বিবৃতি ছাপানোর পর, যদি জায়গা থাকে।

কেয়ারটেকার সরকারের তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা এখন কাগজের পৃষ্ঠায় পাকাপোক্তভাবে ঠাঁই নিয়েছে। তারপর থাকে বিরোধী দলের হরতাল আর বিক্ষোভের খবর। প্রেসিডেন্ট আর মন্ত্রীদের দয়া মায়া আর দেশের মানুষকে ভালোবাসার খবরও ছবিসুদ্ধ ছাপা হয়। মিছিল করা আর মিছিল ভাঙা– ১৪৪ ধারা জারি আর তা ভাঙা। লাঠিচার্জ আর গুলি, আর গ্রেফতার, আর কারফিউ, এই সব খবর আর ঘটনার ভাষ্য ছাপানোর পর বিজ্ঞাপন থাকে। তারপর আর জায়গা থাকে না যে কেউ লিখবে টেররিস্টদের কারা কীভাবে লালন পালন করে। ড্রাগের ব্যবসার পিছনে কারা থাকে, কোন সব লোকেরা সরকারী জায়গা জমি বেমালুম দখল করে নেয়, ব্যাংকের টাকা ধার নিয়ে তা আর ফেরত দেয় না, এসব ঘটনা আর ঘটনার নায়কদের নিয়ে কিছু কেউ বলতে পারে না। রায়হানের মনে পড়ে রুশ তেল অনুসন্ধানকারী দলের নেতা বাংলাদেশে অনুসন্ধান করে কী পাওয়া গেছে তার রিপোর্ট মানুষকে জানাবার জন্য প্রেস কনফারেন্স করেন। কিন্তু সেই প্রেস কনফারেন্সের রিপোর্ট সরকার ছাপতে দেয় নি।

সবই মানতে হবে, মেনে চলাটাই যেন জীবন।

টুকুর জন্য তাকে ইস্কুলে গিয়ে এ্যাসিস্ট্যান্ট হেড মাস্টারের সঙ্গে কথা বলতে হয়। তারপর কথা বলতে হয় ইংরেজির টিচার কামাল সাহেবের সঙ্গে। শেষে ছেলেকে ভদ্রলোকের কোচিং সেন্টারে ভর্তি করার ব্যবস্থা করে তবে ফিরতে হয়।

টুকুর বন্ধু কারা, কোথায় কোথায় সে যায়, সে সব খবরও পাওয়া যায়, কিছু খবর টুকু নিজে দেয়। কিছু জোগাড় করে মঞ্জু নিজে। রঞ্জু পারে নি, কেননা তার তখন অনেক কাজ। বিএমএ'র অফিসে তাকে প্রায় রোজই বসতে হয়। বাংলাদেশ মেডিক্যাল এ্যাসোসিয়েশন তার দাবি নিয়ে সরকার বিরোধী আন্দোলনে কীভাবে শরিক হতে পারে তাই নিয়ে আলাপ আলোচনা চলছে। সেই আলোচনায় তাকে হাজির থাকতে হয়। ডাক্তার মিলন আজকাল তাকে সঙ্গে থাকতে বলে। কিন্তু কেন, সেটা সে বুঝতে পারে না। মনিরের কথা সে তুলেছিলো, তো মিলন ভাই বলেন, সবাইকে দিয়ে সব কাজ হয় না, সেটা তো বোঝো। নাকি বোঝো না! মনির তো সরাসরি পার্টি করে। ও বিএনপির লোক, ওকে রাখলে আওয়ামী লীগের সমর্থকরা কথা বলার সুযোগ পাবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

রঞ্জু কথাটা শোনে এবং তার হাসিও পায়। খুব বলতে ইচ্ছে করে, ডাক্তার জামালের সঙ্গে যে আপনি ঘোরাঘুরি করেন? তিনিও তো ডাইরেক্ট আওয়ামী লীগার, কই তাকে তো আপনি বাদ দিয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নেন না। এটুকু সে বোঝে যে ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব একটা বড় রকমের ব্যাপার, সে যেমন মনিরের কথা ভাবে, মিলন ভাইও সম্ভবত ডাক্তার জামালের কথা সেই ভাবেই ভাবেন। ডাক্তার শামসুল আলম মিলন খুব জোরের সঙ্গে যখন বলেন, এদেশে বিপ্লব হবেই, তখন তাঁর চোখে মুখে আলাদা ধরনের আলো ঝলকায়।

রঞ্জু মুখোমুখি তাকিয়ে বলে, সোভিয়েট ইউনিয়নের দশা দেখার পরও আপনার বিপ্লবের কথা মনে হয়?

রিভিশনিস্টদের ষড়যন্ত্রের জন্য অমন ঘটনা ঘটেছে। যদি রিভিশনিস্টদের গোড়াতেই উঠতে না দেয়া হয়, তাহলে অমন কাণ্ড নিশ্চয়ই হবে না।

রঞ্জু শুধু শুনে যায়। একবার ভাবে চীনের কথা তোলে। বলে, দেং শিয়াও পিংকে পার্টিপ্রধান করে তোলার পরও কি চীনের পার্টিকে কম্যুনিস্ট পার্টি বলা যাবে? প্রশ্নটা কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে করে না। মিলন ভাই নিজেই বলেন, আমাদের এখানেও সত্যিকার অর্থে কোনো মার্ক্সিস্ট পার্টি নেই। পুরোপুরি মার্ক্সিস্ট পার্টি বোধহয় কোথাও নেই।

রঞ্জু জাসদের প্রসঙ্গ তোলে না। জানে, জাসদের সঙ্গে এক সময় ছিলেন মিলন ভাই, ওদের সঙ্গে থাকার সময়ই তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাভাবনার শুরু। এখন সরাসরি রাজনীতি করেন না। তবে বলেন, প্রতিটি আন্দোলনেই পিপল বিপ্লবের দিকে এক ধাপ এক ধাপ করে এগোয়, এই '৯০-এর আন্দোলনও এমনই একটা ধাপ বলে মনে করতে হবে। প্রোগ্রেসিভ ফোর্সকে এই আন্দোলনে থাকতেই হবে।

উনত্রিশ

মামলা-মোকদ্দমা আরম্ভের সময় খুব উত্তেজনা থাকে কিন্তু একবার শুরু হয়ে গেলে অমন উত্তেজনা আর থাকে না। তবে দুশ্চিন্তাটা দুর্ভার বোঝার মতো মাথার ওপর চেপে থাকে। মাহফুজ সাক্ষী যোগাড় করতে বললে সে মুশকিলে পড়ে যায়। কারণ সাদেক সাহেবকে সে কীভাবে সাক্ষী মানে? লোকটার বাড়িতে তাকে যেতে হবে, সেখানে অবশ্যই মেরির সঙ্গে দেখা হবে। আর দেখা হলে যদি মেরি কোনো রকম পাগলামি করে বসে? কিংবা সে নিজেও তো পা পিছলে পড়তে পারে। তখন কী হবে? সাদেক সাহেবকে সাক্ষী মানতে তার মনের দিক থেকে বাধা আসে। কিন্তু তা হলেও উপায় নেই।

সাদেকের ব্যাপারে তাকে ইতস্ততঃ করতে দেখে কুতুবউদ্দিন মিয়া সাক্ষী দিতে রাজি হয়েছে। তো ঠিক আছে, মাহফুজ বলে, কেননা ওর কাছ থেকেই তোমরা জমি কিনেছো। কিন্তু সেই সঙ্গে যার সঙ্গে মিলে জমি কিনেছো, তাকেও তো দরকার। তুমিই তো সেদিন বললে লোকটাকে সাক্ষী হিসাবে পাওয়া যাবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

রায়হান হুঁ হ্যাঁ করে, কিন্তু খুলে কিছু বলে না। কী কারণে সে সাদেক সাহেবকে জড়াতে চায় না, সেটা সে কীভাবে বলে ? অনেক চিন্তাভাবনা করে আর দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কাটিয়ে সে একদিন দুপুর বেলা অফিস থেকে টেলিফোন করে। মনের ভিতর তখনও অস্বস্তি, মেরি যদি ফোন ধরে তাহলে কী বলবে ? পরিচয় দেবে না ? কিন্তু মেরি যে তার গলার স্বর চেনে, তার কী হবে ? ফোনে বার তিনেক রিং হয়, তারপর উৎকণ্ঠার কয়েক মুহূর্ত পর হলে সে সাদেক সাহেবের গলার স্বর শুনতে পায়। তারপর কুশল বিনিময়ের পর রায়হান গোটা ব্যাপারটা সংক্ষেপে জানায়। সাদেক সাহেব ধৈর্য ধরে শোনে কিছুক্ষণ, তারপর বলে, ভাই সাহেব, আমি তো ঐ জমির ঝামেলা মিটিয়ে ফেলেছি সেই কবে। ওর মধ্যে আবার কেন আমারে জড়াইতে চাইতেছেন কন ?

অমন কথার পর বলার মতো কিছু থাকে না। তবু রায়হান অনুরোধ করে। বলে, শুধু একটা কথাই আপনাকে বলতে হবে। দেখুন না চিন্তা করে, প্লীজ, একদিনই শুধু কোর্টে যেতে হবে।

সাদেক সাহেব বোধহয় কিছু চিন্তা করেন। কারণ বেশ কিছুক্ষণ কথা বলেন না। তারপরে এক সময় বলেন, দেখুন ভাই, মামলা-টামলার ঝামেলায় আমি যেতে পারবো না। আই'ম সরি– এ ব্যাপারে পরে এক সময় কথা বলবো, এখন আমি একটা কাজ নিয়ে ব্যস্ত আছি।

ভদ্রলোকের কথায় স্পষ্ট বোঝা যায় যে, তিনি সাক্ষী দিতে রাজি নন কিন্তু একেবারে পুরোপুরি না-ও বলতে পারছেন না। কেন, সেটা রায়হান আন্দাজ করতে পারে না। অগত্যা সে তখনকার মতো ফোনটা নামিয়ে রাখে। মনে মনে ঠিক করে, ভদ্রলোকের সঙ্গে মুখোমুখি কথা বলে দেখবে একবার।

মামলার তারিখ ১৩ জুলাই। মাঝখানে ৩ দিন সময়। সে জানে না কুতুবউদ্দিন ওদিকে আবার কোনো ঝামেলা করবে কিনা।

ঐদিনই বিকাল বেলা সে ফুলবাড়িয়া যায় এবং লোকটাকে ধরে। কিন্তু অদ্ভুত কাণ্ড। লোকটার অমন শীতল ব্যবহার কেন ? সে ভেবে পায় না। রায়হানকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে কথা বললো এবং তারও ঐ একই কথা– মামলা-মোকদ্দমায় যেতে তার অসুবিধা আছে।

কেন কিসের অসুবিধা ? রায়হান কারণ জানবার জন্য রীতিমতো জেদী হয়ে ওঠে।

তখন কুতুবউদ্দিনের ছেলে সামনে এসে দাঁড়ায়। বলে, স্যার আমরা গেরামে থাকি। আমাদের অসুবিধাটা আপনারা কী বুঝবেন ? একটু থেমে সে মুখোমুখি তাকায়। তারপর বলে, টাইগার কামাইল্যারে তো দেখছেন, সে আইসা ডর দেখাইয়া গেছে কাইল। কইছে সাক্ষী-টাক্ষী দিলে লাশ ফালাইয়া দিবো। ঐ শাসানির পর কে যাইবো সাক্ষী দিতে, কন ?

কুতুবউদ্দিন মোল্লার ছেলের মুখে অমন কথা শোনার পর রায়হান বোকার মতো লোকটার মুখোমুখি তাকিয়ে থাকে। বলবার মতো কোনো কথাই খুঁজে পায় না। যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

মামলায় সে বিবাদী, তাতে যেমন সাক্ষী দরকার, তেমনি যেটাতে সে বাদী তাতেও সাক্ষী দরকার। অথচ যেসব সাক্ষী তার খুবই নির্ভরযোগ্য আর বাঁধা বলে মনে হতো, তাদেরই সে জোটাতে পারছে না। ওদিকে মাহফুজ বারবার করে বলে দিয়েছে, এসব মামলায় স্থানীয় সাক্ষীই আসল, জনাতিনেক সাক্ষী পাওয়া গেলেই আর কিছু লাগে না। দুটো শুনানির পরই রায় পাওয়া যায়– এদিকে কাগজপত্র তো পরিষ্কার। সবই তোমার ফেভারে। ১৯২৭ সালের পর থেকে মালিকানার কন্টিনিউটি পাওয়া যাচ্ছে। মিউটেশন হয়েছে ঠিকমতো। খাজনা দেয়া হয়েছে বরাবর, রসিদ আছে তার– আরএস রেকর্ডে কুতুবউদ্দিনের নাম আছে– হিসেব করলে ষাট বছর ধরে মালিকানার একটা কন্টিনিউটি– একি সোজা কথা– শুধু ঐ সাক্ষী দরকার জনাকয়েক। স্থানীয় লোক বুঝলে ? থাক না সিএস পরচায় অন্য লোকের নাম, কুতুবউদ্দিনের বাপ কিনেছে ত্রিদিব দত্তের কাছ থেকে, এখন ত্রিদিব দত্ত হয়তো সরাসরি খরিদসূত্রে মালিক নাও হতে পারে। জমিদার হয়তো আগের প্রজার কাছ থেকে, কোনো কারণে জমি ফিরিয়ে নিয়েছিলো– প্রজাস্বত্ব বলে কিছু জমিদাররা মানতে চাইতো না। কয়েক বছর খাজনা না নিয়ে খাজনা অনাদায়ের কারণে বহু প্রজা উচ্ছেদ করা হয়েছে ঐ সময়। অমন কিছু যে ঘটে নি তা-ই বা কে বলবে। কারণ জমিদারের কাছারি তো '৭১-এ জ্বালিয়ে দিয়েছে পাকিস্তানের আর্মি।

মাহফুজ লম্বা বয়ান দেয় তার মামলার পক্ষে। বুঝিয়ে বলে কাগজপত্র নিয়ে চিন্তার কোনো কারণ নেই। শুধু যদি সাক্ষী পাওয়া যায় কয়েকজন, যারা বলবে জমিটা তুমিই কিনেছো, বেড়া দিয়েছো, ঘর তুলেছো, সেই ঘর এখনও আছে, তাহলে ওদের মামলা খারিজ হয়ে যাবে। আর তাতেই তোমার মামলা দাঁড়িয়ে যাবে– তখন তুমি লোক দিয়ে ওদের ঘাড় ধরে তোমার জমির সীমানার বাইরে বের করে দেবে। অমন ক্ষেত্রে পুলিশ তোমাকে প্রকেটশন দিতে বাধ্য।

তার মানে ? রায়হান বুঝতে পারে না। বলে জমি আমার সেটা প্রমাণ পর্যন্ত হয়ে যাবার পরও আমাকে গায়ের জোর খাটাতে হবে ?

ও ইয়েস, মাহফুজ হাসে। বলে, রবি ঠাকুরের ঐ কথা ঠিক নয় যে, রমণীর মন সহস্র বর্ষের সাধনার ধন– জমি আর মেয়েছেলে এ দুই জিনিস রাখতে গেলে গায়ের জোর দরকার।

মাহফুজের কথা শুনে রায়হানের হাসি পায় না। বরং সে রীতিমতো দিশেহারা বোধ করে প্রথম প্রথম। তারপর তার জেদ চেপে যায়। সে ফের এক সময় সাদেক সাহেবকে টেলিফোন করে। বলে, আপনার সঙ্গে আমার জরুরী আলাপ আছে। কোথায় দেখা করবো, একটু বলুন।

ওদিক থেকে বেশ কিছুক্ষণ জবাব আসে না, ভদ্রলোক হ্যালো বলে সাড়া দিয়ে ফোন ধরে রাখেন, বোধহয় কিছু চিন্তা করেন। তারপর বলেন, বাসাতেই আসুন, কিন্তু কখন আসতে চান ?

ধরুন, কাল সকালে ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

না সকালে পারবো না, তখন আমাকে হাসপাতালে যেতে হবে।

ও, রায়হান অপ্রস্তুত বোধ করে। তার গলার স্বর বদলে যায়। সে জিজ্ঞেস না করে পারে না। বলে, আপনার শরীরটা কি আজকাল খারাপ যাচ্ছে?

জ্বী না, সাদেক সাহেব যেন গা ঝাড়া দিয়ে কথা বলেন। আমার শরীর ঠিকই আছে। প্রবলেম আমার মিসেসকে নিয়ে।

রায়হান মনের মধ্যে খুব জোরে একটা ধাক্কা খায়। সে কান পেতে রাখে, সাদেক সাহেব আরও কিছু বলেন কিনা, তা শোনার জন্য। তবে ভদ্রলোক খুলে কিছু বলেন না। শুধু জানান, ওর শরীরটা বেশ খারাপ যাচ্ছে।

তো যে কথা হচ্ছিলো, সাদেক সাক্ষাতের সময়ের কথায় ফিরে আসেন। বলেন, পারলে আজই চলে আসুন, বুঝলেন? আপনাকে কী বলি, সাংবাদিক মানুষ আপনি। আজই চলে আসুন।

আজই? রায়হানের গলা দিয়ে প্রতিধ্বনি বের হয় শুধু।

হ্যাঁ, আজই। সাদেক সাহেবও একই শব্দের প্রতিধ্বনি তুলে জবাব দেন। কথা হচ্ছিলো দুপুরের পর। ফার্স্ট এডিটরিয়াল লেখা হয়ে গিয়েছে তখন। ঐ সময় আমানউল্লাহ আসেন। বলেন, কেয়ারটেকার গভর্নমেন্টের দাবির ভ্যালিডিটি নিয়ে কিন্তু আপনি এখনও কিছু লিখলেন না। ভদ্রলোক খানিকটা চ্যালেঞ্জের মতোই কথাটা রায়হানের মুখের ওপর ছোঁড়েন। রায়হানের বিরক্তি লাগে ভদ্রলোকের কথা শুনে। আজকাল নানান ধরনের উল্টাপাল্টা কথা বলেন। সে বলে, ভ্যালিডিটি আবার কী? পিপলস ডিম্যান্ড– ব্যস, ওটাই একমাত্র ভ্যালিডিটি, গভর্নমেন্ট ছাড়া কেয়ারটেকার সরকারের বিরোধিতা আর কেউ করেছে? দেখেছেন কোথাও?

রায়হানের অমন কথা শুনে আমানউল্লাহ খানিকটা যেন চুপসে যান। বলেন, না আমি ভাই অন্য কিছু মীন করি নি, আমরা কেয়ারটেকার গভর্নমেন্টের পক্ষে তো লিখেছি। ওই ভ্যালিডিটির প্রশ্নটা নিয়েও আমাদের আলোচনা করা দরকার। সেই জন্য বলছিলাম– ভদ্রলোক ঐ পর্যন্ত বলেই সরে যান। রায়হানের তখনও পোস্টটা লেখা হয় নি। সে বাসায় জানিয়ে দেয় যে, দুপুরে আজ সে অফিসেই কিছু খেয়ে নেবে।

শাজাহানপুর যাওয়ার পথে তার মনের ভেতরটা কেমন এলোমেলো হয়ে যায়। রাস্তাটা খুবই চেনা। কিন্তু দু'পাশের মানুষজনের দিকে তাকাতে তাকাতে মনের ভিতরে বিচিত্র অনুভূতি জাগে। বছর দুই আগে যখন সে এই পথে যেতো, তখন একদিকে লোভ আর পাপবোধ। অন্যদিকে ধরা পড়ার আশঙ্কায় তার মনের ভিতরটা ছেয়ে থাকতো। আজ মনের ভিতরে লোভ নেই, কিন্তু বাজে রকমের একটা অস্বস্তি ক্রমেই চেপে বসছিলো।

শেষ বিকালে হেমন্তের মেদুর আকাশ ছিলো মাথার ওপরে। আর মনের ভিতরে কেউ যেন বলছিলো, কী বলবে তুমি, যদি মেরি দরজা খোলে। কিংবা হাত ধরে নিয়ে গিয়ে বসায়। সেই আগের মতো? কোনো রকম জরুরী কারণে সাদেক যদি বাইরে গিয়ে থাকে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

রায়হানের মনের ভিতরে নিষিদ্ধ স্মৃতি থেকে থেকে ঝলসে ওঠে। আর তাতে তার মন সঙ্কুচিত হতে থাকে।

রাস্তায় ট্রাফিক জ্যাম-এ পড়তে হয় বার দুই। তাতে গন্তব্যে যখন পৌঁছলো, তখন রাস্তার বাতি জ্বলে উঠেছে।

এবং কী আশ্চর্য! দরজার কলিংবেল টিপতেই সে মেরির গলাই ভিতর থেকে শুনতে পায়। তবে দরজাটা খোলে একটি কাজের মেয়ে। তার পিছনে মেরির ছোট মেয়ে মিহিনকে দেখতে পায়। চেহারায় খুব একটা বদলায় নি, যদিও লম্বা হয়েছে খানিকটা। সে রায়হানকে দেখে বেশ অবাক হয়। বলে আরে! আংকেল, আপনি? ভিতরে আসুন, ইশ্ কতোদিন পরে এলেন!

অতিথিকে বসিয়ে রেখে মেয়ে ভিতরে চলে যায়। তারপর আর কেউ আসে না। শুরু হয় অপেক্ষা। রায়হানের খারাপ লাগছিলো একাকী বসে থাকতে, কিন্তু সেই সঙ্গে মনের ভিতরে আবার পুরনো ঘটনার স্মৃতিও জেগে জেগে উঠছিলো। প্রথম দিন যেদিন আসে, সেদিনও তো তাকে এমনভাবেই, এই একই সোফায় বসিয়ে রেখে ভিতরে চলে গিয়েছিলো মেরি। সেদিনও তাকে অনেকক্ষণ বসে থাকতে হয়েছিলো।

সে ঘন ঘন ঘড়ির দিকে তাকায়। সাদেক সাহেব কি বাসায় নেই? নাকি মেরি খুব বেশি রকম অসুস্থ?

অবশ্যি একটু পরই ওর গলা শোনা যায়। সে কিছু যেন বোঝাতে চাইছে কাউকে। একটু পর সাদেক সাহেবের গলাও তার কানে আসে। লোকটা কোনো কথা যেন আমলে আনতে চায় না। একটু পর ব্যাপারটা খানিক স্পষ্ট হয় রায়হানের কাছে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেই আলাপটা হচ্ছে। মেরির কথার জবাবেই সাদেক বলছে, আরে তাতে আমার কী? অন্যের ক্ষতি সামাল দিয়ে বেড়াবার কাজ নাকি আমার? আমার দেয়া বায়নার টাকাটা বাঁচিয়ে দিয়েছিলো কি দয়া করে? নাকি নিজে জায়গা জমির মালিক হবে সেই আশায়? আমার সোজা কথা, তুমি কিছু বলতে যাবে না– যা বলার আমিই বলবো।

ব্যাপারটা আর অস্পষ্ট থাকে না, স্বামী-স্ত্রীর ঐ কথাবার্তা রায়হানকে নিয়েই। তার মন রীতিমতো আড়ষ্ট হয়ে পড়ে।

স্বামী-স্ত্রীর কথা শেষ হয়ে যায়। তবু একইভাবে বসে থাকতে হয়। একসময় কাজের মেয়েটি চা বিস্কুট দিয়ে যায়। প্রথমে তো ওসব ছুঁতে পর্যন্ত ইচ্ছা করে না তার। কিন্তু একাকী বসে থেকে করেটাই বা কী! আর তোষামোদ করার জন্যই যখন সে এসেছে, তখন মনের ইচ্ছা-অনিচ্ছা আর ঘেন্না-লজ্জা-ভয়কে পাত্তা দিয়ে লাভ আছে? সে অপেক্ষা করতে করতে খুব ধীরে ধীরে চুমুক দিয়ে চা-টা খায়। বিস্কুট মুখে তোলে না।

চা শেষ হয়ে যাবারও বেশ কিছুক্ষণ বাদে সাদেক সাহেবের আবির্ভাব ঘটে। পর্দা সরিয়ে ভিতরে ঢুকেই খুব ব্যস্ততার সঙ্গে বলে, চা খেয়েছেন তো! আরে ভাই কি যে ঝামেলা না– এই ব্যবসা ট্যবসা আর ইভাস্ট্রি, বুঝলেন? খুব বাজে জিনিস–

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

রায়হান ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে দেখে। মনেই হয় না এই লোক বিছানায় শুয়ে শুয়ে গোঙাচ্ছিলো, কথা পর্যন্ত বলতে পারতো না। মুখটা গিয়েছিলো বেঁকে। এমনকি গত বছর বন্যার সময় যাকে দেখেছিলো ক্র্যাচে ভর দিয়ে হাঁটতে– সেই অবস্থার চিহ্নমাত্র নেই কোথাও। খাড়া দাঁড়িয়ে আছে সামনে। ঝকঝকে পালিশ করা মুখ। গাঢ় রঙের স্যুট পরনে, টাইটাও ঝকঝকে আর ধারালো। চোখে মেটাল ফ্রেমের চশমা, গম্ভীর মুখ।

বললেন, আই'ম সরি, একটু দেরি করে ফেললাম। যাচ্ছি পার্টিতে, কিন্তু ইন্ড্রাস্ট্রিয়ালিস্ট আর বিজনেসম্যানদের পার্টি– বুঝতেই পারছেন, মিনিস্টার-সেক্রেটারিরাও আসবে– একটু তৈরি তো হতেই হয়। তা ভাই আলাপটা আমরা করে ফেলি, আমার হাতে সময় কম।

রায়হান লক্ষ্য না করে পারে না। ঢাকার নব্য ধনীদের কেতা-কায়দা ভালোই রপ্ত করে ফেলেছে মিস্টার সাদেকুজ্জামান। সরকারী দলের লোকদের সঙ্গে কি গাঁটছড়া বাঁধা হয়ে গেছে ? ব্যাংক লোনও নিশ্চয়ই এসে গেছে হাতে–

হ্যাঁ, এবার বলুন, সাদেক মুখোমুখি বসে। রায়হান কীভাবে আরম্ভ করবে বুঝতে পারে না। সে বোঝে, মানুষটা তাকে ভড়কে দিতে চাইছে– কিন্তু তার তো উপায় নেই। সে অনুরোধ করে। বলে, আপনার বেশি সময় নষ্ট করবো না, আমার সমস্যার কথাটা তো ফোনেই আমি জানিয়েছি। আপনি শুধু একবার কোর্টে গিয়ে দাঁড়াবেন– বলবেন, আমরা একসঙ্গে কুতুবউদ্দিন মোল্লার কাছ থেকে জমি কিনেছি– ব্যস, শুধু এই একটা কথা, আর কিছু না।

সাদেক বিরক্তি গোপন করে না। সোজাসুজিই বলে, আরে ভাই আপনি তো দেখছেন আপনার দিকটা। কিন্তু আমার দিকটা কে দেখবে ? ধরুন সেদিন আমার জরুরী কাজ পড়ে গেলো, কর্পোরেশনের কোনো কর্তার সঙ্গে কিংবা সেক্রেটারিয়েটে কোনো সেক্রেটারির সঙ্গে। তখন কী হবে ? কিংবা ধরুন ঐ দিনই ঢাকার বাইরে চলে গেলাম। অথবা ঢাকার বাইরে ছিলাম, ঠিক সময় অর্থাৎ সকালে না পৌঁছে, পৌঁছলাম বিকালে, তখন ? এমন অবস্থায় আপনাকে আমি কীভাবে কথা দিই, বলুন ? আমার মনে হয় না আমার ওপর নির্ভর করা আপনার উচিত হবে। তবে আপনি মানী লোক, আপনার অনুরোধ আমার ফেলা উচিত নয়– আমি যদি ঢাকায় থাকি ঐ সময়, তাহলে অবশ্যই যাবো। আমার অবস্থাটা আপনি আশা করি বুঝেছেন।

রায়হান চুপচাপ শুনে যায়। শুনতে শুনতে সে সাদেকের কাঁচা-পাকা শ্যাম্পু করা শুকনো চুল, তার টাই, জামার কলারে রং– এসব দেখছিলো। কেননা লোকটার মনের কথা কি সেটা ততোক্ষণে তার জানা হয়ে গিয়েছে। সে অপেক্ষা করছিলো, কতোক্ষণে লোকটা তার কথা শেষ করে।

তবে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় না, তার কথা শেষ হওয়ার আগেই নিচে গাড়ির হর্ন শোনা যায়– আর তাতেই সাদেক উঠে দাঁড়ায়। বলে, আমার গাড়ি এসে গেছে, বুঝলেন ? কিছু মনে করবেন না, আমাকে এবার যেতে হবে। বলতে বলতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

দরজা খুলে সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করে। রায়হান তখন আর দেরি করার যুক্তি খুঁজে পায় না, সেও সাদেকের পিছন পিছন নামে।

দেখা যায়, সত্যি সত্যি গেটে একখানা গাড়ি দাঁড়ানো। সাদেক একবারও পিছন ফিরে তাকায় না, সোজাসুজি গাড়িতে গিয়ে ওঠে আর সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি চলতে শুরু করে। প্রায় একই সঙ্গে রায়হানও গেট দিয়ে বেরিয়ে পড়ে। রাস্তায় নেমে কয়েক পা এগোতেই পিছন থেকে ডাক, আঙ্কেল ও আঙ্কেল, একটু দাঁড়ান।

মেয়ের গলার চিৎকার শুনে রায়হান ঘুরে দাঁড়ায় এবং দেখতে পায় মিহিন তাকে হাত তুলে ডাকতে ডাকতে এগিয়ে আসছে। অগত্যা দাঁড়াতে হয়। মিহিন ছুটতে ছুটতে কাছে এসে হাঁফাতে হাঁফাতে বলে, আপনি চলে এলেন কেন? আম্মু আপনার সঙ্গে কথা বলবে, জরুরী কথা আছে, চলুন।

একেবারে অবাক হওয়ার মতো ঘটনা নয়। এমনই তো হওয়ার কথা, তার মন বলে। আর সে জন্যই সে দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ, যাবে কি যাবে না– সেই চিন্তা মগজের ভিতরে ওলটপালট করে। তবে বেশিক্ষণ চিন্তা করতে হয় না। সে জানিয়ে দেয়, না মিহিন, আমি এখন যেতে পারবো না। অফিসে জরুরী কাজ ফেলে এসেছি। তোমার মাকে গিয়ে বলো, যেন টেলিফোনে আমার সঙ্গে কথা বলেন।

কথা ক'টা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করেই সামনের দিকে হাঁটতে শুরু করে। নিজের ওপর রাগ, বিরক্তি দুইই তার মনের ভিতরে দাপাদাপি করে– কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না, খামোকা সে ছোটাছুটি করে মরছে। মেরির কথা মন থেকে হটাবার জন্যই সে দ্রুত পা ফেলে সামনের দিকে।

তার অনুমান হয়, মেরির বোধহয় তাকে দেখতে ইচ্ছে হয়েছিলো– বোধহয় কথাও বলতো। কিন্তু লাভটা কী হতো তাতে? তার মনের ভিতরে প্রশ্ন ফুঁসে ওঠে। সেখানে কে একজন বলে, নতুন কথা আর কী বলতো, সেই প্যানপ্যানানি হতো– সেই ভালো লাগার কথা স্মরণ করা কিংবা সেই অনুযোগ– তুমি কি ভুলে গেছো আমাকে? একেবারেই ভুলে গেছো?

খানিক হাঁটবার পর রায়হান রিকশায় ওঠে। তারপর মতিঝিল কলোনি এলাকায় পৌঁছতে পৌঁছতে এক সময় খেয়াল হয় যে মেরির কথা সে আর ভাবছে না। আর তাতেই নিজেকে সে বেশ হালকা বোধ করে। সে অফিসে যায় না। ছোটে মাহফুজের চেম্বারে। খবরটা মাহফুজকে জানানো দরকার যে, সাক্ষীটাক্ষী যোগাড় করা তার পক্ষে সম্ভব হবে না।

কিন্তু চেম্বারে মাজফুজকে পাওয়া যায় না। শোনে, ও বিকেলে পার্টির মিটিংয়ে গেছে, সে-ই যে গেছে তারপর আর আসে নি, কখন ফিরবে কিছুই জানায় নি। তার এ্যাসিস্ট্যান্ট তরুণটি জানায়, মনে হয় না স্যার শিগগির ফিরবেন– পার্টির মিটিং কেমন হয় তা তো স্যার জানেন; তর্ক-বিতর্ক একবার আরম্ভ হলে কি সহজে থামে? আর এখন তো মুভমেন্ট চলছে, মিটিং শেষ হতে দেরি হবে স্যার, আপনার কী মনে হয়? মুভমেন্ট তো বেশ জোরদার হয়ে উঠেছে,তাই না?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

রাজনীতি নিয়ে আলাপ করবে, এমন মনের অবস্থা তখন রায়হানের নেই। সে কিছু বলে না। মিনিট পনেরো অপেক্ষা করার পর সে ওঠে। তরুণ উকিলটি বেজায় নাছোড়, সে ফের সামনে এসে দাঁড়ায়। বলে, স্যার একটু বসুন, আপনি তো ভিতরের খবরাখবর নিশ্চয়ই জানেন। অপোজিশন-এর ইউনিটি কি সত্যি সত্যি হচ্ছে, এরশাদ কি ক্ষমতা ছাড়বে ? যদি ছাড়ে তো দেরি করছে কেন ? এতো মারামারি আর হাঙ্গামা হতে দিচ্ছে কেন ?

রায়হানের হাসি পায় তরুণ এ্যাডভোকেটটির কথা শুনে। বলে, এরশাদ চলে গেলে আপনার কী লাভ ? আপনার আয় বাড়বে ? বেশি মামলা পাবেন ? নাকি ফী বাড়াতে পারবেন ? বরং আমার তো মনে হয় এরশাদ ক্ষমতায় থাকলেই উকিলদের সুবিধা। হাঙ্গামা বাড়ার কারণে মামলা মোকদ্দমা বেশি হচ্ছে।

না না স্যার, এ আপনি কী বলছেন ? ল'ইয়ারদেরই বেশি দায়িত্ব এসব ব্যাপারে। তরুণটি প্রতিবাদ করতে থাকলে রায়হান বেরিয়ে পড়ে।

রাস্তায় নেমে সে ডাইনে বাঁয়ে তাকায়। আর নিজেকে জিজ্ঞেস করে, রায়হান আলী, এবার কোন দিকে ? অফিসে যাবে ? নাকি প্রেসক্লাবে ?

মন কোনো দিকেই সায় দেয় না। কোনো কিছু হচ্ছে না তার। মাঝখানে ঝুলন্ত হয়েই তাকে থাকতে হবে ? কেনো দিকেই তার যাবার উপায় নেই ? ভাগ্য তাকে ঝুলিয়ে রেখে দিয়েছে, জমি কিনেছে, কিন্তু সাক্ষী নেই। চাকরি করছে, কিন্তু প্রমোশন নেই– এমপি বলছে, সব ঠিক হয়ে যাবে, কিন্তু কিছুই ঠিক হচ্ছে না। হ্যাঁ আর না-এর মাঝখানে সে ঝুলন্ত– হ্যাংগিং অবস্থাতেই থাকতে হবে তাকে। কিন্তু কতোদিন ? সে জানে না। টিল ডেথ কি ? বিধাতা বোধহয় তেমনই কোনো রায় দিয়ে রেখেছে। সে ফাঁসির আসামীর মতোই মঞ্চে দাঁড়িয়ে আছে। একদিকে হ্যাঁ, আর অন্যদিকে না– এই ঝুলন্ত অবস্থাতেই তাকে থেকে যেতে হবে যতোদিন মারা না পড়ছে।

পরের দিন বেলা এগারোটার দিকে অফিসে ঢুকতে গিয়ে তাকে দাঁড়িয়ে পড়তে হয়। দেখে সাভার থানার সেই দালালি করা সিপাইটা দারোয়ানের সঙ্গে বারান্দার বেঞ্চে বসে গল্প করছে। রায়হানকে দেখে সে ত্বরিৎ উঠে দাঁড়ায়। তারপর দাঁত কেলিয়ে বলতে শুরু করে। স্যার আমি আপনার জন্য সেই কুন সকাল থিকা অপেক্ষা করতেছি, আমি আবুল খায়ের স্যার, আমারে চিনছেন তো ?

রায়হান লোকটার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে। তার বেশ অবাক লাগে লোকটার সাহস দেখে। ক্রিমিনালদের হয়ে দালালি করার জন্য পুলিশের লোক খবরের কাগজের অফিসে পর্যন্ত চলে আসবে, এ তো কল্পনাও করা যায় না। সে মুখোমুখি জিজ্ঞেস করে, আপনি তো সাভার থানার লোক, ঠিক না ?

জ্বি, লোকটা ফের দাঁত বের করে কৃতার্থের হাসি হাসে ? এমন ভঙ্গি করে, রায়হান তাকে চিনতে পারায় সে যেন বর্তে গিয়েছে। বলে, আপনে তো স্যার কুনো খবর নিলেন না, তাই আমারেই আসতে হইল– একখান খবর আছে।

লোকটাকে কাচুমাচু করতে দেখে রায়হানের রাগ হয় আবার হাসিও পায়। সে সামান্য আগ্রহী হয়। বলে, কী খবর ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

একটু যে বাইরে আসন লাগে। আবুল খায়ের ডাইনে বাঁয়ে তাকিয়ে বলে, এইখানে বলা কি ঠিক হইবো?

না, বাইরে যাবার দরকার নেই, রায়হান চোখে চোখ রেখে বলে, যা বলার এখানেই বলুন।

লোকটি খানিক গাঁইগুঁই করার পর আসল কথায় আসে। বলে, কথা হইল কি, স্যার খামাখামা লস দিয়া কুনো লাভ নাই, মামলা মোকদ্দমা শুরু হইয়া গেছে। কবে ফয়সালা হইবো, তার ঠিক নাই, কোর্ট আদালত উকিল সাক্ষী লইয়া দৌড়াদৌড়ি, টাকা-পয়সা খরচ তো কম না– এই সব চিন্তা কইরা আমরা ভাবতাছি আপোসে একটা হেস্তনেস্ত হওন ভালো। আপনে যদি ট্যাকা দিতে না পারেন, তাইলে আপনে ট্যাকা লইয়া জমিন ছাইড়া দেন।

কী রকম? রায়হান জিজ্ঞেস না করে পারে না।

জমিন বেইচ্যা দিয়েন আর কি?

কতো দাম দেবে?

এই ধরেন পঞ্চাশ/বাইট হাজার, আবুল খায়ের হাসতে হাসতে বলে।

রীতিমতো রাগ হয় রায়হানের।

বলে, আপনাকে কে পাঠিয়েছে? হারিস আলি?

কইতে পারেন। আবুল খায়ের ঘাড় চুলকাতে চুলকাতে আড় চোখে তাকিয়ে বলে, যদি কন হারিস আলি, তো হারিস আলিই, আবার যদি কন ইউনিয়নের চেয়ারম্যান, তো চেয়ারম্যান। ওসি সাবের নামও কইতে পারেন, তিনিও আমারে কইছেন একটা ফয়সালা কইরা দিতে, এমপি সাবের নাকি হুকুম।

রায়হান কখনও যা করে না, জীবনে কখনও করে নি, সেই কাণ্ডটা করে বসলো। সে রাস্তার দিকে হাত তুলে দেখিয়ে বললো, এক্ষুনি এখান থেকে চলে যাবেন, না, গেলে লোক ডেকে আপনাকে পেটাবো।

অমন ধমক খাওয়ার পরও আবুল খায়ের থাকে। বলে, খামাখামা আপনে রাগ করেন ক্যান? আমি তো খারাপ কিছু কই নাই। আপনেরে হেল্প করতে আইছি, আর আপনে আমারে খেদাইয়া দিতেছেন। একটু থেমে ফের সে বলে, ভালো কামের আইজকাল মূল্য নাই বুঝছেন স্যার? আপনের আম ছালা ব্যাকই তো গেছে, ভাবছিলাম, আপনের বিপদে যদি একটু সাহায্য করণ যায়– তো দেহি আপনে উল্টা বুঝেন, আমি আর কী কমু, খালি বুইজ্যা লন যে আপনে কামখান বুদ্ধিমানের মতোন করলেন না– আমি গেলাম।

লোকটা গেট দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার পরও অনেকক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে রইলো রায়হান। বুঝতে পারে না। কাজটা ঠিক হলো, নাকি সে ভুল করলো। কারণ মামলা মোকদ্দমা করেই হোক কিংবা মাস্তান-গুণ্ডা ভাড়া করেই হোক, জমিটা তো উদ্ধার করতে হবে আর তাতে পয়সা খরচ তো তাকে করতেই হচ্ছে। অবশ্যি তারপরও ফলাফল কী দাঁড়াবে, সেটা সে জানে না– তাহলে? এমন অবস্থায় ২৫/৩০ হাজার দিয়ে একটা ফয়সালার চেষ্টা করতে আপত্তি কী ছিলো। মানুষটাকে অমনভাবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

তাড়িয়ে না দিলেও সে পারতো। কথাটা চিন্তা করে তার বেশ খারাপ লাগে। কিন্তু বেশিক্ষণ না– ওসব চিন্তা করে মন খারাপ করার মতো সময় থাকলে তো। সম্পাদক সাহেব দু'দিনের ছুটিতে চিটাগাং গেছেন। যাবার সময় কেয়ারটেকার সরকার সম্পর্কে একটা পোস্ট লিখতে বলে গেছেন। হারুন সাহেবও এমন একটা অনুরোধ করেছেন। কারণ কেয়ারটেকার সরকারের দাবিতে রীতিমতো আন্দোলন চলছে কতোদিন হয়ে গেলো, অথচ 'গণ একতা' পত্রিকার এ ব্যাপারে কোনো মতামত নেই। এটা কি ভালো কথা? সুতরাং ও ব্যাপারে কিছু করা হোক। কিন্তু করবেটা কে? ছাই ফেলতে ভাঙা কুলোই হোক আর অগতির গতিই হোক। লোক বলতে তো একজন।

রায়হান প্রথমে দায়িত্বটা নিতে চায় নি। কারণ ঐ দাবিটাই তার পছন্দ নয়। কোনো সময় বোধহয় তার মন্তব্য হারুন সাহেব শুনেছিলেন, আর তাতেই ঝামেলাটা তার ঘাড়ে এসে পড়লো। আসলে কেয়ারটেকার সরকারের আইডিয়াটাকেই তার নিজের কাছে গোলমেলে লাগে। একদিক থেকে দেখলে মনে হয় কেয়ারটেকার সরকারের ধারণাটাই অগণতান্ত্রিক। একটা নির্বাচিত সরকারের টার্ম শেষ হওয়ার আগে ক্ষমতা তুলে দেবে অনির্বাচিত সরকারের হাতে। আর সেই অনির্বাচিত আর অগণতান্ত্রিক সরকারের কাজ হবে পরবর্তী নির্বাচন করা তারপর নির্বাচিত নতুন সরকারের হাতে ক্ষমতা তুলে দেয়া। বর্তমান সরকার নির্বাচনে কারচুপি করে চলেছে তার জন্যই কেয়ারটেকার সরকার এর ব্যবস্থা। কিন্তু ঐ কেয়ারটেকার সরকারের কর্তা ব্যক্তিরা বা তাদের লোকেরাও যে কারচুপির প্রশ্রয় দেবে না, তার নিশ্চয়তা কে দেবে? সরাসরি ঘুষ না খাক, প্রশ্রয় পাওয়া লোকেরা ক্ষমতায় এলে কেয়ারটেকার সরকারের লোকেরা যে সুযোগ-সুবিধা নেবে না তারই বা গ্যারান্টি কোথায়? তাছাড়া সরকারী কাজকর্মের ব্যাপারটা তো বিরাট। থানা পুলিশ কিংবা প্রশাসনের মধ্যে যে বিদায়ী স্বৈরাচারী সরকারের পেটোয়া লোক থাকবে না, তারই বা নিশ্চয়তা কীভাবে পাওয়া যাবে? কিংবা নির্বাচন কমিশনের লোকেরা যে কোন রাজনৈতিক দলের পক্ষে কাজ করবে না, তারই বা গ্যারান্টি কে দেবে? এই সব প্রশ্ন তার মগজে মাঝে মাঝেই পাক দিয়ে ওঠে। কিন্তু ফের যখনই সরকারী দলের নানান কীর্তির ঘটনা মনে পড়ে– মনে পড়ে সাধারণ মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। গুণ্ডা মাস্তানদের দিয়ে যেসব ঘটনা ঘটাচ্ছে সরকারী দলের লোকেরা তখন আর যুক্তিটুক্তি দাঁড় করাতে পারে না।

তার জমিটা যে হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে সেও তো সরকারের লোকজনের জন্যই, তাহলে? সে একটা জিনিস হাড়ে হাড়ে বুঝছে কেয়ারটেকার সরকার হোক কি অন্য কিছু হোক– এরশাদ সরকারের যাওয়া চাই। এ ব্যাপারে হারুন সাহেবের সঙ্গে আলাপ হয়েছে, তখন সে নিজের কথাটা বলতে বাকি রাখে নি। হারুন বলেছেন, যা ভাবছেন, ওটাই লিখুন। এখন সব কাগজেই লেখালেখি হচ্ছে বিষয়টা নিয়ে। আমরা লিখবো না কেন?

আব্দুল্লাহর সঙ্গে একদিন কথা হয়েছিলো, তো দেখলো, সে তো এককাঠি ওপরে। তার ধারণা কেয়ারটেকার সরকারের তত্ত্ব তৃতীয় বিশ্বে গণতন্ত্র বিকাশের ক্ষেত্রে একটা নতুন ধাপ। পুরো ধাপ না হলেও একটা নতুন ডাইমেনশন তো বটেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

নিজের চিন্তার কথাটাই সে লেখে– পক্ষে বিপক্ষের যুক্তি সবই তোলে। আর তাতে লেখাটা বড় হয়ে যায়। একই দিনে আবার আমানউল্লাহ সাহেবেরও একটা পোস্ট যাবার কথা। তাঁর লেখাটাও আকারে বেশ বড়। আমানউল্লাহ যেহেতু সিনিয়র লোক, সুতরাং তাঁর লেখাটাই আগে যাওয়া উচিত। কিন্তু দেখা গেলো, রায়হানের লেখাটা যাতে আগে ছাপানো হয় সে ব্যাপারে আমানউল্লাহ সাহেবেরই উৎসাহ বেশি।

তিনি রায়হানের লেখার প্রুফটা হাতে নিয়ে একেবারে রায়হানের কামরায় ঢুকে পড়েন। তারপর মহাউল্লাসে বলতে শুরু করেন– আরে ভাই আপনি করেছেন কী, এ্যাঁ? কেয়ারটেকার সরকারের বেলুনটাকে যে আপনি ফুটো করে দিয়েছেন। আহা কী মোক্ষম কথা! কী উপমা! ওস্কা যাকেই বানানো হোক, সর্ষের মধ্যে ভূত থাকলে অবস্থা তো থেকে যাবে একই রকম– যথা পূর্বং তথা পরং, আহা কী কথা!

উল্লাসটা বেশিক্ষণ থাকে না, একটু শান্ত হয়ে জিজ্ঞেস করেন, তা ভাই আপনার জমির কী হলো? ফয়সালা হয়ে গেছে?

আরে নাহ্ কিসের ফয়সালা হবে, রায়হানের গলার স্বরে রীতিমতো বিরক্তি প্রকাশ পায়। সে বলে, জবর দখল করেছে যে লোক, সেই এখন আমার বিরুদ্ধে ইনজাংশনের মামলা ঠুকে দিয়েছে। যাতে আমি ঐ জমিতে ঢুকতে না পারি।

আপনি বলেন কী? আমানউল্লাহর কাছে বোধহয় ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়। বলেন, এ তো একেবারে দিনে ডাকাতি। আপনি কাউকে জানান নি? লোকাল এমপিকে জানান নি? আপনার নিজে গিয়ে দেখা করা উচিত ছিলো।

রায়হান হাসে। বলে, দেখা করেছিলাম, তাঁর কথামতো লোকাল ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যানের কাছেও গিয়েছিলাম।

কিছু হয় নি?

হ্যাঁ হয়েছিলো, রায়হান ফের হাসে। বলে, থানার ওসি দু'পক্ষকে ডেকেছিলেন, কিন্তু ওখানেই হারিস আলী জানিয়ে দিলো যে, সে একটা মামলা ঠুকে দিয়েছে আর তাতে ফয়সালা যা হবার কোর্টেই হবে– থানার ওসি ঐ কথা শুনে বুড়ো আঙুল মুখে পুরে চুষতে শুরু করলেন, ব্যস ওখানেই কিসসা খতম।

রায়হানের শেষ বিদ্রূপ আমানউল্লাহ গায়ে মাখেন না। চুপচাপ কিছু যেন চিন্তা করেন, তারপর জানতে চান, এমপি সাহেব উপজেলা চেয়ারম্যানের কাছে যেতে বলেন নি?

না, রায়হান মাথা নাড়ায়। বলে, বললেও আমি যেতাম না, ওখানেও তো একই খেলা দেখতে হতো। উপজেলা চেয়ারম্যান কি গুণ্ডা মাস্তানের খেলা খেলেন না?

আমানউল্লাহ ভ্রূ কুঁচকে থাকেন কিছুক্ষণ আর ঐ অবস্থাতেই বলেন, মনে হয় ওখানে পার্টির মধ্যে গ্রুপিং আছে, বুঝলেন, তাই এমপি সাহেব উপজেলা চেয়ারম্যানকে ইনভলভ করতে চান নি। আমি দেখছি হোম মিনিস্টারকে ধরা যায় কি না– একজন সাংবাদিকের জমি গায়ের জোরে দখল করে নেবে? ব্যাপারটা এতোই সোজা? দেখুন আপনি, শেষ পর্যন্ত কী হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

সরকারের সমর্থক অমন একজন মানুষের মুখে আশার কথা শুনেও রায়হান উৎসাহবোধ করে না। সে মূল কথায় ফিরে যায়। হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলে, কপিটা দিন, আমি ম্যাটার কিছুটা কমিয়ে দিই– তাহলে আপনার আমার দু'জনের লেখারই জায়গা হয়ে যাবে।

আমানউল্লাহ মাথা নাড়ান। বলেন, আপনি কী বলছেন পাগলের মতো। এ লেখার একটি শব্দও বাদ দেয়া যাবে না, বুঝলেন ? পিপল মাস্ট নো দ্য ট্রুথ, দে শুড থিংক উইথ লজিক– শুধু ইমোশন দিয়ে কাজ হয় ? বলুন ? এরশাদকে তোদের পছন্দ হয় না, তো যা পাবলিককে মবিলাইজ কর, এসব উদ্ভট আইনের কথা কেন তুলছিস ? ঐ পর্যন্ত বলে আমানউল্লাহ কামরা থেকে বেরিয়ে যান। আর যেতে যেতে বোধহয় নিজেকেই বলেন, নাহ্ হতাশ হওয়ার কারণ নেই– সব ঠিক হয়ে যাবে।

রায়হান খানিকটা বোকা বনে যায় ভদ্রলোকের মন্তব্য শুনে। সে কী ভেবে ঐ রকমের একটা পোস্ট লিখেছে আর ভদ্রলোক তার মানে করছেন কী। তার খানিক চিন্তাও হয়। তার ওপর সরকারী দলের ছাপ না পড়ে যায়– আর তেমন কিছু হলে তার ঝামেলা বাড়বে বৈ কমবে না। এখন তো তবু নতুন পুরাতন সবাই দেখা হলে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে দুটো কথা বলে, ঐ ছাপ পড়ে গেলে তার দিকে কেউ ফিরেও তাকাবে না বরং এরশাদের দালাল বলে তার দিকে আঙুল তুলে অন্য লোককে দেখাবে।

তার এ সব চিন্তার মাঝখানে এক সময় টেলিফোন বেজে ওঠে। রিসিভার কানে তুলতেই যে গলার স্বর শুনতে পায় তাতে তার শরীর মন দুই-ই এক সঙ্গে থমকে ওঠে। কি অদ্ভুত কাণ্ড– মেরি টেলিফোনে কথা বলছে।

মেরি অনুযোগ করে বলে, তোমাকে ডাকতে পাঠালাম তো তুমি এলে না। কী করি, শেষে বাসায় টেলিফোন করলাম তো বাসাতেও তুমি নেই। তোমার স্ত্রী ধরলেন, তাঁর সঙ্গেই কথা বললাম অগত্যা, কী করি বলো ? তোমার সঙ্গে তো আমার সব সম্পর্ক চুকেবুকে গেছে, তাই না ? তো শোনো– যে জন্য টেলিফোন করছি, ফুলবাড়িয়ার ঐ জমি তুমি রাখতে পারবে না। শুধু তুমি কেন, ঐ এলাকার জমি কেউই রাখতে পারবে না, তোমার জমির চারপাশের অন্যান্য জমিও নানা ছলছুতোয় ফেলে মালিকের কাছ থেকে কেড়ে নেয়া হবে– গোটা এলাকায় ইন্ডাস্ট্রিয়াল জোন গড়ে তোলার কথা হচ্ছে। যারা জমি হাতিয়ে নিচ্ছে তারা চড়াদামে বিক্রি করবে বিদেশী ইনভেস্টরদের কাছে। যে লোক আমাদের জমি কিনেছে। সে তো এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে রয়েছেই। এমনকি আমাদের সাদেক সাহেবও ওদের সঙ্গে ভিড়েছে। ও কোনোদিন তোমার পক্ষ হয়ে মামলায় সাক্ষী দিতে যাবে না। যেসব গুণ্ডা মাস্তান জমি দখল করছে তাদের পিছনে আছে ওখানকার চেয়ারম্যান, থানা পুলিশের কিছু লোক ওদের সাহায্য করছে, তার সঙ্গে আছে পলিটিক্যাল সাপোর্ট, বুঝেছো ? তুমি ও জমি বিক্রি করে দাও। যা দাম বলছে, তাতেই রাজি হয়ে যাও। এমনিতেই তোমার শরীর ভালো না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

অতো ঝামেলা পোহাবার মানে হয় না, আমার কথা শুনতে পাচ্ছো, জমিটা বেচে দাও– এবার ফোন রাখলাম, ভালো থেকো।

রায়হান খুব ধীরে রিসিভারটা নামিয়ে রাখে। তারপর একই ভাবে বসে থাকে অনেকক্ষণ। তার অবাক লাগে, মেরি কেন এভাবে তাকে টেলিফোন করলো ? যা বললো, তা যদি সত্যি হয়ে থাকে, তাহলে বুঝতে হবে, মেরি চায় না যে তার ক্ষতি হোক। কিন্তু কেন ? তার মনের ভিতরে প্রশ্ন জাগে, কেন মেরি চায় না তার ক্ষতি হোক!

প্রশ্নটা তাকে ধাঁধার মধ্যে ফেলে দেয়। উল্টো কথাও তার মনে হয়। সন্দেহ হয় জমিজমা যারা দখল করে নিচ্ছে, তাদের পক্ষেও তো মেরি কাজ করতে পারে। তার জমিটা যাতে সহজেই ওরা হাতিয়ে নিতে পারে, সেই জন্যই মেরি ফোন করেছে। না হলে যে দাম বলছে, তাতেই জমিটা ছেড়ে দেয়ার পরামর্শ কেন ?

বাসায় ফিরে দেখে সারাটা বাসা অসম্ভব রকম চুপচাপ। রঞ্জু বাদে সবাই বাসায়। কিন্তু তবু সাড়াশব্দ বলে কিছু নেই। টেলিভিশনও চলছে না, বসার ঘর অন্ধকার। ওদিকে মঞ্জু টুকু দু'জনের ঘরেই বাতি জ্বলছে, ওরা বোধহয় পড়াশোনা করছে। কিন্তু নিঃশব্দে। দরজা খোলার সময় মোমেনার মা বললো, আপার শরীলডা মনে হয় খারাপ। ঐ কথা ক'টি বলেই সে কোথায় যে উধাও হলো, বোঝা গেলো না। বসার ঘরের বাতি রায়হানকেই জ্বালাতে হলো। সন্দেহ জাগলো মনে, বীথির শরীর কি বেশি খারাপ ? ক্লান্ত শরীরটা সোফার ওপর এলিয়ে দিয়ে সে টুকুকে ডাকে। টুকু জানায়, আম্মার বোধহয় মন ভালো নেই। বারান্দায় বসে আছেন। খানিকবাদে কাপড়চোপড় বদলে মুখহাত ধুয়ে ফের বসার ঘরে এসে বসলে বীথি সামনে এসে দাঁড়ায়। তারপর খুব শান্ত গলায় বলে, বারান্দায় চলো, কথা আছে।

রায়হানের অদ্ভুত লাগে বীথির কাণ্ড দেখে। অমন গম্ভীর আর শান্ত, চোখেমুখে গভীর বেদনার অমন ছায়া– খুব কম দেখেছে সে। বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালে বীথি বলে, বসো তুমি। বসবার সময় সে ঘাড়ে হাত রেখে রায়হানকে বসিয়ে দেয়। স্ত্রীর এমন ঘনিষ্ঠ আচরণ বহুদিন সে দেখে নি। তারপর চুপচাপ মুখোমুখি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবার পর বীথি জানায়, আজ মেরি টেলিফোন করেছিলো বিকেল বেলা।

আমি জানি, কথাটা প্রায় মুখ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিলো, কিন্তু শব্দ দুটোকে রায়হান বেরুতে দেয় না।

তোমাকে খুঁজছিলো, বীথি খুব নিচু গলায় শব্দ দুটো উচ্চারণ করে। তারপর কিছুক্ষণ চুপ হয়ে থাকার পর ফের বলে, ফুলবাড়িয়ার জমিটা রাখা যাবে না– সে কথা, তোমাকে বলতে বলেছে। আরও বললো, জমিটা যতো শিগগির পারা যায় বিক্রি করে দেয়া ভালো। কোন এক হায়দার সাহেবের কাছে ওরা ওদের জমি বিক্রি করেছে। ঐ ভদ্রলোক আমাদের জমিটাও কিনতে চান, মামলা মোকদ্দমাসুদ্ধই।

হুঁ, রায়হান লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে। বলে, ঐ কথা সে আমাকেও বলেছে।

সে কি ! বীথি যেন চমকে ওঠে। জানতে চায়, তুমি ওদের বাসায় গিয়েছিলে ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

না, টেলিফোনে কথা বললো।

অফিসে ?

হ্যাঁ।

কী বললো ?

ঐ তোমাকে যা বলেছে! জানালো, হায়দার সাহেব আর তার কয়েকজন বন্ধু মিলে ঐ এলাকার সব জমি কিনে নিচ্ছে। ওদের সঙ্গে সাদেক সাহেবও আছে– ও জমি আমি কিছুতেই রাখতে পারবো না– গুণ্ডা মাস্তান লাগিয়ে হোক, ভয় দেখিয়ে হোক, লোভ দেখিয়ে হোক– ও জমি ওরা নেবেই। তাই ও জমি বিক্রি করে দেয়াই ভালো।

আর কিছু বলে নি ? বীথি জিজ্ঞেস করে। বলে, ও যে হাসপাতালে যাচ্ছে কাল, তা বলে নি ?

হ্যাঁ, বললো, হঠাৎ যেন মনে পড়েছে, এমন ভঙ্গিতে রায়হান জানায়। বলে, সাদেক সাহেবও অমন কী যেন বলেছিলো সেদিন।

অসুখটা কী, বলেছে ? বীথি জানতে চায়।

না, তা তো বলে নি।

রায়হান স্মরণ করার চেষ্টা করে। তারপর বলে, কেন, তোমাকে বলেছে ? খারাপ কিছু ?

হ্যাঁ, বীথি জানায়। বলে, ওর ক্যান্সার। কলকাতায় গিয়েছিলো, ওখান থেকে ওর স্বামী ফিরিয়ে এনেছে।

সে কি ? রায়হান বুকের ভিতরে প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খায়।

তারপর বেশ কিছুক্ষণ কথা হয় না, দু'জনে সামনা-সামনি চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে।

আবছা আলোতে বীথির মুখ দেখতে পায় রায়হান। দেখে, বীথি তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। কী দেখে, সেই জানে। তারপর খুব ধীরে ধীরে বলে, কয়েকদিন আগে তুমি ওদের বাসায় গিয়েছিলে, তাই না ?

হ্যাঁ, রায়হান স্বীকার করে।

কিন্তু মেরির সঙ্গে দেখা করো নি কেন ?

আমি তো গিয়েছিলাম সাদেক সাহেবকে সাক্ষী দেয়ার জন্য রাজি করাতে।

কিন্তু তোমাকে ডাকার জন্য তো ও মেয়েকে রাস্তায় পর্যন্ত পাঠিয়েছিলো, পাঠায় নি ?

হ্যাঁ। রায়হান স্বীকার করে। তারপর বলে, কিন্তু তখন কীভাবে ফিরে যাই। আমার তাড়া, অফিসে কাজ ফেলে গিয়েছিলাম। তাছাড়া ততোক্ষণে অনেকখানি পথ চলেও এসেছিলাম।

বীথি লম্বা একটা নিঃশ্বাস ফেলে। তারপর বলে, তোমরা পুরুষ মানুষরা বিচিত্র জীব, বুঝলে ? তোমাদের মনের মধ্যে অনেক ফিলিংস আল্লাহ্ দেন নি। অনেক নরমাল ইমোশন তোমরা ফীলই করতে পারো না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ঐ পর্যন্ত কথা হয় তখনকার মতো। খানিক পর খাবার টেবিলে বসে সবাই। সেখানে অন্যান্য দিনের মতো কথাবার্তা হয় না– ছেলেদের সঙ্গেও না। চুপচাপ খাওয়া দাওয়ার পাট শেষ হয়ে যায়। থালাবাসন টেবিলেই পড়ে থাকে। বীথি জানায়, মোমেনার মা তুলবে সকালে এসে।

তারপর বিছানা। দু'দিকে দু'জনে শোয় রোজ এবং তখনও কথা হয় না। তারপর কে যে কখন ঘুমোয়, নাকি আদৌ ঘুমোয় না। তা কেউ জানে না। কীভাবে জানবে?

একজনের খবর অন্যজন জানতে পারলে তো।

তারপর এক সময় দু'জনই দেখতে পায় যে, সকাল হয়ে গেছে।

রায়হান বিশ্রী রকমের মানসিক পীড়নের মধ্যে পড়ে যায়। বারবার তার মনের ভিতর থেকে প্রশ্ন উঠতে থাকে, সে যা ভেবে এসেছে মেরি সম্পর্কে, সবই কি ভুল?

তার ধারণা হয়েছিলো তার জন্য মেরির যে টান তার পুরোটাই শারীরিক। তার স্বামী সংসার ছেড়ে তার কাছে চলে আসতে চাওয়ার ব্যাপারটাও সিরিয়াস কিছু ছিলো না। ওটা তাকে বাজিয়ে দেখার জন্য হতে পারে কিংবা মজা করার জন্যও হতে পারে। তার এসব ধারণা কি তাহলে ভুল? মেরি কি আসলে সত্যি সত্যি তাকে ভালোবেসে ছিলো? আর সেজন্যই মরণের মুখোমুখি দাঁড়িয়েও রায়হানের ক্ষতি হতে দিতে চায় না?

কথাটা যতোবার মনে হয়, ততোবার তার বুকের ভিতরে অচেনা অজানা একটা বেদনা আর সেই সঙ্গে একটা অপরাধবোধ ভারী বোঝার মতো চেপে বসে। মেরির কথা যখন ভাবে, তখন নিরাবরণ শরীর নয়, তার হাসিতে উজ্জ্বল মুখখানাই বারবার মনের মধ্যে দেখতে পায়। আর তখন তার মনে হয়, মেরির ওপর সে অন্যায় করেছে– তার সঙ্গে সম্পর্কটা অমনভাবে চুকিয়ে দেয়া তার উচিত হয় নি– কথাবার্তা হতো না, দেখা হতো না, তাতে কি? ভালোবাসাটা তো মনের মধ্যে রাখতে পারতো। কিন্তু ভালোবাসা তো দূরের কথা। সে মেরিকে খারাপ মেয়েমানুষ ভাবতো। মেরি যে তার ভালো চাইতো, এখনও ভালো চায়, তার প্রমাণ তো তার ফোনে কথা বলা– বিপদে যেন সে না পড়ে, সেজন্য মেরি তাকে সাবধান করে দিয়েছে। এমনকি কথা শেষ হলে দিব্যি বললো– ভালো থেকো। আর সে নিজে? অমন একটা শুভেচ্ছার কথাও তো তার মুখ দিয়ে বের হয় নি।

অফিস থেকে সে দুপুর বেলা টেলিফোন করে শাজাহানপুরে মেরির বাসায়– কিন্তু ওদিকে কেউ রিসিভার তোলে না। তাতে একটু চিন্তাও হয় তার, ও বাড়িতে কি লোকজন কেউ নেই? তারা কোথায় গেলো? বিকেলের দিকে আবার করে। তখন অনেক্ষণ পর কাজের মেয়েটি রিসিভার তুলে জানায় যে, বিবি সায়েব হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন, বাসার সবাই হাসপাতালে আর সায়েব অফিস থেকে এখনও ফেরেন নি।

কোন হাসপাতালে তুমি জানো না?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

মেয়েটি জ্বে না বলে ফোন রেখে দিলে, রায়হান হতাশ হয়ে পড়ে। তাহলে কি মেরির সঙ্গে তার আর কখনোই দেখা হবে না ?

এদিকে বীথি কিন্তু দুপুর নাগাদ সব খবরই যোগাড় করে ফেলে। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ক্যান্সার ওয়ার্ডে মেরি সাদেকের ভর্তি হওয়ার কথা ছিলো কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওয়ার্ডে ভর্তি না হয়ে ভর্তি হয়েছেন কেবিনে। মহিলার অবস্থা ভালো নয়, চিকিৎসা শুরু হতে এখনও দু'তিন দিন দেরি। এসব খবর বীথি জানতে পারে রঞ্জুর কাছ থেকে। ওর এক বন্ধু নাকি সাদেক সাহেবদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। এসব খবর পাওয়ার পর আর সঙ্কোচ করে নি বীথি, দেরিও না। বিকাল নাগাদ রিকশা নিয়ে সোজা হাসপাতালে পৌঁছে গেছে। গেটে রঞ্জু অপেক্ষা করছিলো। সে মাকে নিয়ে তিন তলার ২১ নম্বর কেবিনে চলে আসে। একটি অল্পবয়সী ডাক্তারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয় রঞ্জু। বলে, মা, এ হচ্ছে হুমায়ুন, আমরা এক সাথে পাস করে ইন্টার্নি করছি– সাদেক সাহেবের বড় মেয়ের সঙ্গে এর বিয়ের কথা পাকা হয়ে রয়েছে।

কেবিনে বাইরের আলো যথেষ্ট ছিলো, তবু বাতি জ্বলছিলো। মেরি বিছনায় শোয়া। উজ্জ্বল মুখ ছিলো। এখন সেখানে পোড়া ছাইয়ের মতো রং মাখানো। চোখ দু'টি কোটরে, হনুর হাড় দেখা যায়, দুই গালের ওপরে উঁচু হয়ে উঠেছে।

বীথি কাছে গিয়ে দাঁড়ালে প্রথমে চিনতে পারে না। তারপর নজর স্থির করে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ। শেষে মেরির শীর্ণ মুখে হাসি ফোটে। বলে, আপা, আপনি ? বীথি এগিয়ে গিয়ে মেরির একখানা হাত নিজের মুঠোর মধ্যে নিয়ে মৃদু চাপ দেয়। পরে জিজ্ঞেস করে, আজ সকালে এসেছেন, তাই না ?

না আপা, গতরাতেই আসতে হয়েছে। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিলো খুব। বীথি বারবার করে মেরির মুখের দিকে তাকায়। টেলিফোনে গলার স্বর শুনে কিন্তু মনে হয় নি যে মানুষটা এতো কাহিল হয়ে পড়েছে।

একলা এসেছেন ? মেরি এক সময় পাল্টা জিজ্ঞেস করে। তার প্রশ্ন শুনে বীথির মনে একটু ঘা লাগে। মেরি কি রায়হানের সঙ্গেও দেখা করতে চায় ? নাকি সে আশা করছিলো রায়হানও আসবে। তবে সে বিচলিত হয় না বরং স্থির থাকে এবং হাসে। বলে, একলা এলে কি হবে, আমি তো এ হাসপাতালে একলা নই।

কথাটা বলেই সে মুখ ফিরিয়ে রঞ্জুকে ডাকে।

রঞ্জু পাশে এসে দাঁড়ালে বলে, এ আমার বড় ছেলে রঞ্জু। এখন ইন্টার্নি।

মেরি খুশি হয় রঞ্জুর পরিচয় জেনে। বলে, ওমা তাই নাকি! এটি আপনার ছেলে ? কি আশ্চর্য, এ তো আমাদের হুমায়ুনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ওদিকে ততোক্ষণে বেঞ্চের অন্যদিকে এসে দাঁড়িয়েছে চন্দনা, আর তার পাশে হুমায়ুন।

তবে ওরা দাঁড়ায় না বেশিক্ষণ। ওদের এক রকম বেরই করে দেয় মেরি। বলে, আমরা একটু কথা বলবো, তোমরা আমাদের একটু একা থাকতে দাও।

ঐ কথা শুনে সবাই বেরিয়ে গেলে মেরি বীথির হাত ধরে বলে, আপা আমাকে মাফ করে দিন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

কিসের মাফ! বীথি ভয়ানক বিব্রত বোধ করে। বলে, আপনি এসব কী বলছেন?

হ্যাঁ ঠিকই বলছি আপা, আমি বাঁচবো না, খুব শিগগিরই মারা যাবো, আমার ফ্যামিলির কেউ জানে না। কলকাতার ডাক্তারদের বলাবলি করতে শুনেছি আমি, আমার সারা শরীরে ক্যান্সার ছড়িয়ে গেছে, এখন ফুসফুসে বাসা বেঁধেছে– কেমোথেরাপি দেবে এখানে। কিন্তু আমি জানি, তাতে কোনো কাজ হবে না।

একটু থেমে ফের নিঃশ্বাস নিয়ে বলে মেরি, আপা আপনি এতো ভালো– আমাকে মাফ করে দিন আপা– আপনার অতো সুন্দর একটা সংসার ভেঙে যেতে বসেছিলো আমার জন্য।

আপনি চুপ করুন তো? ওসব পুরনো কাসুন্দি ঘেঁটে কোনো লাভ আছে?

মেরির মনে আবেগ ভর করে। সে বলতে থাকে, আপা আপনি ভালো, আপনার স্বামী ভালো– কিন্তু জানেন, আমি ভালো নই, আমার স্বামী ভালো নয়– আমি একজন নষ্ট পুরুষ মানুষের নষ্ট মেয়েছেলে– আমি কোনো স্বামীর স্ত্রী নই আপা, যাকে আমার স্বামী বলে জানে সবাই, সে একটা নষ্ট পুরুষ মানুষ– সে আমাকে প্রথম থেকেই নষ্ট করে দিয়েছে।

বীথি কী বলবে বুঝতে পারে না, এমন পরিস্থিতিতে সে কখনও পড়ে নি– মেরির কপালে আর মাথায় সে হাত বোলায় আর সান্ত্বনা দেয়। বলে, ওসব কথা বলবেন না। কেন ভাবছেন অতো পুরনো কথা? ওতে কী লাভ?

সেদিন হাসপাতাল থেকে বাসায় ফিরতে ফিরতে বীথির রাত হয়ে যায়। রিকশায় বসে যেতে যেতে যতোবার মেরির কথা ভাবে ততোবার রায়হানের কথা মনে হয়। আর তখন সে মনে মনে বলে, তুমি কাজটি ভালো করো নি। কিন্তু যখন মনের ভিতর থেকে উল্টো প্রশ্ন জাগে, কোন কাজের কথা বলছো? তখন সে আর জবাব খুঁজে পায় না। তখন রায়হানের ওপর অদ্ভুত আর জটিল ধরনের রাগ হতে থাকে তার।

সেদিন রাতে সে বিছানার একধারে পড়ে থাকে না, অন্যধারে রায়হানকেও থাকতে দেয় না। গলা জড়িয়ে ধরে মানুষটাকে টেনে এনে দু'জনে বিছানার মাঝখানে হয়। শুধু মাঝখানেই হয় না, হয় ঘনিষ্ঠ আর মুখোমুখি। বহুকাল পরে ঐ অবস্থায় বীথি হাসাতালে যা যা দেখেছে, যেসব কথা হয়েছে মেরির সঙ্গে, সব সে একটা একটা করে বলে। বলা শেষ হলে সে রায়হানের চোখের দিকে তাকিয়ে বলে, এবার তোমার কথা বলো, সব কিছু বলবে, আমি সমস্ত কিছু শুনতে চাই।

রায়হানের মুখে তখন কথা নেই। মনের ভিতরটা ভীষণ এলোমেলো, সত্যি কি মেরি মরে যাচ্ছে? এতো শিগগির? তার মনের একদিকে যদি অনুশোচনা তো অন্যদিকে সমবেদনা– একদিক যদি গ্লানিতে বিবর্ণ তো অন্যদিক ভালোবাসায় আলোকিত। একদিকে যদি ঘৃণা আর আত্মধিক্কার তো অন্যদিকে সান্ত্বনা আর মমতা। শুধু নিজের মনের ভেতরে নয়, সে ঐসব অনুভূতি আর আবেগ বীথির দু'হাতের স্পর্শেও টের পায়। তার দু'চোখের ভেতরে দেখতে পায়, তার গলার স্বরে ধ্বনিত হতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

শোনে। সে বীথিকে বলে, ওসব পুরনো কথা শুনে কী লাভ বলো? ওসব শোনা মানেই তো কষ্ট পাওয়া– আমি যখনই ভাবি মেরির সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতার কথা, তখনই আমার নিজেকে ঘেন্না লাগে।

বীথির দুই বাহু রায়হানের গলায় জড়ানো ছিলো। রায়হানের ঐ কথায় তার দু'বাহুর বাঁধন শিথিল হয়ে খসে পড়ে। তার মন বলতে শুরু করে, এ তো সে নয়, এ অন্যলোক। এর ওপরে তোকে নির্ভর করতে হয়, এ তোর সংসারের কর্তা, এর সঙ্গে তোকে সংসার করতে হয়, সবই ঠিক। কিন্তু এ তো তোর স্বামী নয়। যতোই জড়িয়ে ধর, যতোই শরীরের সঙ্গে শরীর মিলিয়ে দে, সেই লোককে কি পাস, বল পাস? এখন পাচ্ছিস?

বীথির দু'বাহু রায়হানের গলা ফের জড়িয়ে ধরে না, সে বলবার মতো কথাও খুঁজে পায় না। বিছানার ধারে, সেই আগের জায়গায়, কখন যে সে সরে যায় নিজেই বুঝতে পারে না।

তিরিশ

কয়েকদিন ধরে মঞ্জু লেখাপড়ায় খুব মনোযোগী। তবে দুঃখ এই যে, নিয়মিত ক্লাস করতে পারে না। কারণ ক্লাস কোনোদিন হয়, কোনোদিন হয় না। খালি মিছিল আর মিছিল, কখন যে কারা মিছিল বের করছে তার ঠিক-ঠিকানা নেই। সব সময় কানে স্লোগান এসে লাগে। স্বৈরাচার নিপাত যাক– গণতন্ত্র মুক্তি পাক, আমাদের এক দাবি– এরশাদ তুই কবে যাবি? আপোস না সংগ্রাম–সংগ্রাম সংগ্রাম, এই রকম সব স্লোগান। খুব বেশি চিৎকার আর হৈ হল্লা হয় কোনোদিন, কোনোদিন চিৎকার আর হৈ হল্লা কম হয়। কিন্তু তাহলে কী, মিছিল আর স্লোগান বন্ধ থাকে না।

হামিদ কিছুদিন লুকিয়ে থাকার পর ফিরে এসেছে। এখন মেসে থাকে না– ফজলুল হক হলে থাকে তার এক বন্ধু কবিরের গেস্ট হয়ে। সেও লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত। ধরা পড়ার ভয়ে সে দূরে কোথাও যায় না, ইউনিভার্সিটি এলাকায় থাকে। কারণ এদিকের পুলিশ টুলিশ আন্ডারগ্রাউন্ড পার্টির লোক খোঁজ করে না। লাইব্রেরি বন্ধ থাকে না সেটা তার জন্য বাঁচোয়া। কোনো ভাবে একবার লাইব্রেরিতে ঢুকে বই খুলে বসতে পারলেই হলো– তারপর বাইরের সমস্ত কিছু ভুলে থাকতে আর অসুবিধা হয় না। দু'জনে পাশাপাশি বসে। তাতে নতুন কিছু জানা যায়। একজন নতুন কিছু পেলে অন্যজনকে ডেকে দেখায়।

একদিন হামিদ সঙ্গে করে একটি মেয়েকে নিয়ে আসে। বলে, তোকে খুঁজছিলো তাই ডেকে আনলাম। অগত্যা কথা বলার জন্য বাইরে এসে দাঁড়াতে হয়। মেয়েটি মুখোমুখি তাকিয়ে বলে, আমাকে চিনতে পারেন?

মেয়েটির প্রশ্ন করার ধরন দেখে মঞ্জু বেশ অপ্রস্তুত বোধ করে। ইতস্ততঃ ভঙ্গিতে বলে, আমি ঠিক ধরতে পারছি না। কোথায় যেন–

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

কেন, তিমলির সঙ্গে আমাকে দেখেন নি ? মেয়েটি তেজী স্বরে বলে, ক'দিন আগেও তো আমি তিমলির সঙ্গে ছিলাম– যেদিন আপনার নাক ফাটিয়ে দিয়েছিলো মাস্তানরা।

মঞ্জুকে তারপরও হাবার মতো তাকিয়ে থাকতে দেখে মেয়েটি হাসে। বলে, ঠিক আছে. প্রথম দিন তিমলির সঙ্গে দেখা হওয়ার ঘটনাটা স্মরণ করুন। সেই যে তেঁতুল তলায় কাঠবিড়ালি দেখতে দেখতে কথা হয়েছিলো– তিমলি আপনাকে গণ্ডার বলেছিলো. মনে পড়ে ?

মঞ্জু এবার হেসে ওঠে। বলে, কিন্তু সেদিন যে মেয়েটি তিমলির সঙ্গে ছিলো, তার চোখে তো চশমা ছিলো না, ছিলো কি ?

মেয়েটি হাসে। বলে, না ছিলো না, চশমা পরে নিতে হয়েছে– একটু থেমে ফের বলে. আমার নাম নওশিন, তিমলি আমাকে পাঠিয়েছে।

মঞ্জুর অবাক লাগে। বলে, কেন ? আপনাকে কেন পাঠিয়েছে ? ওর কি অসুখ ?

মেয়েটি আবারও হাসে। বলে, না অসুখ টসুখ নয়। একখানা চিঠি এসেছে ওর কাছে। চিঠিখানা নাকি আপনাকে দেখানো দরকার কিন্তু ও নিজে দেখাতে চায় না, তাই–

মঞ্জু চিঠিখানা হাতে নিয়ে খামের ওপর একপলক নজর রাখে। দেখে, রাখির হাতে লেখা, তিমলির নাম এবং ঠিকানা। সে বুঝতে পারে না, তিমলির চিঠি তাকে কেন পড়তে হবে। খামের ভিতর থেকে চিঠিটা বের করতে গেলে নওশিন বাধা দেয়। বলে, এখানে না, তিমলি আপনাকে চিঠিটা একাকী পড়তে বলেছে। আমি গেলাম– কথাটা বলেই নওশিন রাস্তার দিকে হাঁটতে শুরু করে দেয়। এমন হঠাৎ করে মেয়েটা চলে যায় যে, মঞ্জু অবাক হওয়ারও সময় পায় না। সে বোকার মতো তার চলে যাওয়াটা দেখে।

নওশিন অমনভাবে হঠাৎ বিদায় নেওয়াতে মঞ্জুর অবাক হওয়ার কথা। সে কিছুটা অবাক যে হয় না– তাও নয়। কিন্তু তখন চিঠির ভিতরে কী, তা জানার জন্য কৌতূহল এতো বেশি জেগে ওঠে যে, সদ্য আলাপ হওয়া মেয়েটির আচরণ নিয়ে ভাববার অবকাশ থাকে না। দেয়ালে হেলান দিয়ে মঞ্জু খাম থেকে চিঠিখানা বের করে ফেলে। চিঠির আরম্ভেই তিমলিকে সম্বোধন, তেঁতুল সই বলে। নিজের কুশল জানানোর পর কলেজ জীবনের স্মৃতি নিয়ে কিছু কথা। তারপরই লেখা, আমি বোধহয় আর তোকে চিঠি লিখতে পারবো না। আমাকে কলকাতার বাইরে চলে যেতে হবে– খুব সম্ভব বোম্বেতে থাকবো– বাবা মা-ও ঢাকায় আর থাকবেন না। দমদমের কাছে আমাদের বাড়ি তৈরির কাজ চলছিলো, এখন শেষ। ঢাকার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক এবার পুরোপুরি চুকে যাবে– ওখানকার কিছু মানুষ খুব খারাপ ব্যবহার করেছে আমাদের সঙ্গে– তুই তো সবই জানিস। কিন্তু তবু ভাবতাম, তোর মতো বন্ধু যেখানে আছে, নজরুল স্যারের মতো মানুষ যেখানে আছে– তাছাড়া মঞ্জুর মতো ছেলের ভালোবাসাও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

তো আমি পেয়েছি– সেই ঢাকায় আমি ফিরে যাবো। কিন্তু কৌশিকের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর, এখন দেখছি, আমার ঢাকায় ফেরা তো হবেই না– এমন কি, তোর সঙ্গেও বোধহয় সম্পর্ক রাখতে পারবো না। কৌশিকরা তিন পুরুষ ধরে বোম্বেতে থাকে খুবই রিলিজিয়াস– গোঁড়াও বলতে পারিস। বাংলাদেশে খাঁটি হিন্দু আছে এমন কথা ওরা বিশ্বাস করতে চায় না। মঞ্জুকে বলে দিস, ও যেন আমাকে আর চিঠি ফিটি না লেখে–

মঞ্জু এই পর্যন্ত পড়ে। তারপর আর পড়ে না। না, তার মনের ভিতরে খুব বেশি কষ্ট হয় না– তবে খারাপ একটু যে লাগে না তা নয়। মুখে কখনও উচ্চারণ না করলেও সে মনে মনে ঠিকই জানতো, শেষ পর্যন্ত এমনই কিছু ঘটনা ঘটবে। তবু ক্ষীণ আশা হতো, ওর বাবা মা যখন এখানে আছেন, তখন রাখি এক সময় অবশ্যই ফিরে আসবে। কিন্তু সমীরণ কাকা যে কলকাতার শহরতলী এলাকায় বাড়ি বানাচ্ছেন সে খবরটা তো তার জানা ছিলো না। তার এখন মনে হয়, ঐ খবর সমীরণ কাকার পরিচিত লোকেরা কেউ-ই জানে না। তার ধারণা, রাখিও জানতো না– জানলে কোনো না কোনো ভাবে ঠিকই তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়তো খবরটা।

লাইব্রেরির দেওয়ালে হেলান দিয়ে চিঠিখানা পড়ছিলো। পড়া শেষ হবার পরও সে একইভাবে দাঁড়িয়ে রইলো, শুধু নজরটা চিঠির পৃষ্ঠা থেকে সরিয়ে আকাশের দিকে মেলে রাখা। ঠিক ঐ সময় টিএসসি থেকে একটা মিছিল বেরুবার আয়োজন হচ্ছিলো। মিছিলটা যখন বেরুবার মুখে, ঠিক তখনই আবার এসএম হল আর জহুরুল হক হল থেকে আরও দুটো মিছিল জুটলো। তারপর তিনটে মিছিল এক হয়ে ফের কার্জন হলের দিকে চলতে শুরু করলো। থেকে থেকেই স্লোগান হচ্ছিলো। গণতান্ত্রিক শক্তি– এক হও এক হও, স্বৈরাচার নিপাত যাক–গণতন্ত্র মুক্তি পাক।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মঞ্জু দেখছিলো। তার মনের ভিতরে তখন রাখির কথা ছেয়ে রয়েছে। তবু মনের ভিতরে কেউ যেন খোঁচাও দিচ্ছিলো, কী হলো, তুই যাবি না ? ফেরদৌসের কথা ভুলে গেছিস ? রাখিকে কেন ঢাকা ছেড়ে চলে যেতে হলো ? তোর নাক যে ভেঙে দিয়েছে দু'দুবার, তাও তোর গায়ে লাগে না ? তোর বাবার কেনা জমি যে হাতিয়ে নিয়েছে, সেটাও কিছু না ? তুই কি কাপুরুষ ?

মিছিলটা ওদিকে ক্রমেই লম্বা হচ্ছিলো, কোন কোন দিক থেকে যে ছাত্ররা এসে মিছিলের পিছন দিকে জুটছে তার কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। মিছিলের এক মাথা বোধহয় দোয়েল চত্বর পর্যন্ত পৌঁছে গেছে ওদিকে, আর ঠিক ঐ সময় ও পিছনে তিমলির গলা শুনলো।

কী ব্যাপার, তুমি মিছিলে গেলে না ? এভাবে এখানে দাঁড়িয়ে কেন ?

মঞ্জু মুখ না ফিরিয়ে হাসে। বলে, এমনি, যেতে ইচ্ছে করছে না।

নওশিন এসেছিলো ?

হ্যাঁ, মঞ্জু হাতে ধরা চিঠিখানা দেখায়, তারপরও একইভাবে আকাশের দিকে মুখ তুলে দাঁড়িয়ে থাকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

তুমি তাহলে সত্যি সত্যি মিছিলে যাচ্ছো না ?

না।

কেন ?

তুমিও তো যাচ্ছো না। মঞ্জু মুখ না ফিরিয়েই বলে।

আমি তো কখনোই যাই না, তুমি তো জানো, আমার বাবা একজন বড় রকমের সরকারী আমলা।

বাহ্, আমলাদের ছেলেমেয়েরা কি মিটিং মিছিল করে না ?

হয়তো করে, কিন্তু আমার ভালো লাগে না।

তিমলির ঐ কথার পর মঞ্জু আর কিছু বলে না। মিছিলের স্লোগান উত্তাল হয়ে তখন পথঘাট দালানকোঠা আর বাগবাগিচা সমস্ত কিছু কাঁপিয়ে দিচ্ছে।

তিমলি খানিক পর মুখোমুখি তাকায়। বলে, চলো আমরা এখান থেকে যাই। মঞ্জু মুখ ফিরিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে বলে, নাহ্ আমার কোথাও যেতে ইচ্ছে করছে না।

তাহলে চলো, ঐ গাছতলায় বসি, তিমলি প্রস্তাব করে। মঞ্জু কোনো জবাব দেয় না। তোমার মনে খুব কষ্ট হচ্ছে, তাই না ?

তিমলির গলার স্বরে সহানুভূতি গাঢ় শোনা যায়। মঞ্জু মুখ ফেরালে দেখে তিমলি তার মুখের দিকে ভারী কোমল ভঙ্গিতে তাকিয়ে রয়েছে। তার দু'চোখের ভিতরে গভীর সমবেদনার ছায়া।

তুমি বরং ওকে একটা চিঠি লেখো, তিমলি খুব শান্ত গলায় বলে।

নাহ্, চিঠি কেন লিখবো! মঞ্জু খুব ধীরে মাথাটা ডাইনে বাঁয়ে হেলাতে হেলাতে বলে। তারপর হঠাৎ হেসে ওঠে। তারপর তিমলির দিকে তাকিয়ে বলে, তোমার কী হয়েছে ? বাসায় যাবে না ?

তিমলি হাসে। বলে, হ্যাঁ যাবো, তবে এক্ষুণি না, একটু পরে–

কথাটা বলেই সে মঞ্জুর হাত ধরে টানে। বলে, চলো, আমরা শাহবাগের দিকে যাই– ওদিকে কোথাও বসে চা খাবো– তারপর পার্কে ঢুকে লেকের ধারে কিছুক্ষণ বসে থাকবো, দেখো, তোমার ভালো লাগবে– কখন বিকেল হয়ে যাবে টেরই পাবে না।

মঞ্জু লাইব্রেরির দিকে পা বাড়ায়। বলে, আমি যাই, বই খাতার ব্যাগটা নিয়ে আসি। রীডিং রুমে গিয়ে দেখে, টেবিলের ওপর তার ব্যাগটা ঠিকই আছে, কিন্তু পাশের সিট খালি, হামিদ চলে গেছে। মঞ্জুর অবাক লাগে, হামিদ চলে গেলো, কিন্তু জানিয়ে যাবে না, এ কেমন কথা!

তিমলি পিছন পিছন এসে মঞ্জুর পাশে দাঁড়িয়েছিলো। বললো, তোমার ঐ বন্ধুটি বোধহয় তোমার ওপর খুব চটে গেছে–

মঞ্জু কোনো কথা না বলে রীডিং রুম থেকে বেরিয়ে আসে। বর্ষা শেষের মেঘ ভাঙা রোদের দুপুর তখন বড় বেশি ঝলমল করছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

একত্রিশ

দুপুর গড়ানো বেলায় হাসপাতালের ভিতরে একটা গা এলানো ভাব থাকে, রোগীদের খাওয়া দাওয়া শেষ হওয়ার পর কেউ ঘুমিয়ে পড়ে, কারও চোখে তন্দ্রা জড়ানো থাকে। রোগীর সঙ্গে যারা থাকে, তাদেরকেও চেয়ারের পিঠে অথবা দেওয়ালে হেলান দিয়ে গা এলিয়ে দিতে দেখা যায়। গেটে, করিডরে কিংবা ওয়ার্ডে– কোথাও ভিড় নেই।

২১নং কেবিন খুঁজে পেতে একটুও দেরি হয় না। কারণ রঞ্জুর বন্ধু মনিরের সঙ্গে করিডরেই দেখা হয়ে যায়। সেই হাত তুলে দেখিয়ে দেয়। তারপর জানতে চায়, ঐ কেবিনে আপনার চেনা কেউ আছেন?

হ্যাঁ, রায়হান জানায়, বলে, আমাদের চেনাজানা মিসেস সাদেক ওখানে আছেন। মনির প্রথমে যেন ঠিক চিনতে পারে না। তারপর কিছু স্মরণ হওয়াতে বলে, হুমায়ুনের আত্মীয় কি ওঁরা?

রায়হান হুমায়ুনকে ঠিক চিনতে পারে না। বলে, আমি হুমায়ুনকে ঠিক চিনতে পারছি না– তবে শুনেছি, তোমাদের ক্লাসমেট একটি ছেলে ওদের দেখাশোনা করে।

হ্যাঁ, ওই তো হুমায়ুন– তাহলে ঠিকই আছে, আপনাকে এ ২১ নম্বরেই যেতে হবে। রায়হানকে নব ঘুরিয়ে দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। কারণ ঘরের ভিতরটা বেশ অন্ধকার। ঐ সময় সে মেরির গলা শুনতে পায়। দরজার উল্টো দিকে জানালা দিয়ে আসা আলো চোখে পড়ার কারণে সে ভালো দেখতে পাচ্ছিলো না। মেরির গলা শুনে সে নিশ্চিন্ত হলো। না, সে ঠিক জায়গাতেই এসেছে।

মরিয়ম তখনও প্রশ্ন করে। আপনি কে? কাকে চান আমি এখান থেকে ভালো দেখতে পাচ্ছি না, প্লীজ আপনার নাম বলুন।

তখন রায়হান আরও দু'পা এগিয়ে গিয়ে বলে, আমি এসেছি– আমি! চিনতে পারছো না?

মেরি আধশোয়া অবস্থায় ছিলো, ঐ অবস্থাতেই মাথাটা শুধু বোধহয় ডান দিক হেলায়। তারপর খুব নিচু গলায় বলে, তুমি তাহলে এলে! এসো এখানে বসো। মেরি মাথা হেলিয়ে বিছানার পাশে রাখা টুলটা ইঙ্গিতে দেখায়।

কেবিনের বাতি কেন নেভানো রায়হান বুঝতে পারে না। জিজ্ঞেস করে, তুমি কি ঘুমোচ্ছিলে? বাতি নেই কেন?

এমনি। অস্পষ্ট হাসে। বলে, বাতিটা জ্বললে আমার ভালো লাগে না– তাছাড়া বারান্দার দিক থেকে তো কিছুটা আলো এমনিতেই আসে খামোকা সর্বক্ষণ বাতি জ্বালিয়ে রাখার কী দরকার! তুমি ভালো ছিলে?

রায়হান জবাব না দিয়ে বাতিটা জ্বালিয়ে দেয়। তারপর মেরির মুখের দিকে তাকায়। দেখে, মুখের উজ্জ্বল তাজা ভাবটা একেবারেই উধাও, তার বদলে সারা মুখে কালো ছায়া। চোখ দুটো যেন আপনা থেকে বন্ধ হয়ে যেতে চাইছে। গাল বসে হনুর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

হাড় উঁচু হয়ে উঠেছে। কণ্ঠায় হাড়ের ওপরে খোদল, হাত দু'খানি খুবই শুকনো আর ফ্যাকাশে দেখায়। ওর হাত বরাবরই গোল ছিলো, বালা দু'খানি প্রায় আঁটো হয়ে লেগে থাকতো কব্জির কাছে। এখন কব্জি থেকে কনুই পর্যন্ত ঢলঢল করছে। আঙুলগুলো যেন মুঠো করে বাঁধা কতকগুলো কাঠি।

তোমার যখন হার্টে পেইন হয়, তখন খুব কষ্ট পাও, তাই না? আমার পেটে ব্যথা শুরু হলে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে চায়।

রায়হান কিছু বলে না, শুধু মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। তার কেবলই মনে হচ্ছে, এই কি মেরি? ও কি এমন ছিলো কখনও? এই মেরিকে কি সে চেনে? ওর দুচোখের ভেতরে কী দেখতে পায় সে বলতে পারবে না। তবে মনে হয় মেরি তার জন্য অস্তিত্বের সবটুকু সমবেদনা যেন চোখের দৃষ্টিতে এনে জড়ো করে রেখেছে।

মেরি বলে, তোমার বউ এসেছিলো পরশু দিন, ওর মুখে শুনলাম, তুমি খুব দৌড়াদৌড়ি করছো ফুলবাড়িয়ার জমিটার জন্য। ও জমি তুমি রাখতে পারবে না– সাদেক সাহেবের মুখে যা শুনি, তাতে মনে হয়, হায়দার সাহেবরা অন্য কাউকে ও এলাকায় থাকতে দেবে না– তুমি ও জমির কথা ভুলে যাও।

একটু থেমে নিজের মনে যেন হাসে মেরি। বলে, অবশ্যি বাড়ির স্বপ্ন ভোলা খুবই মুশকিল– ওখানে বাড়ি বানিয়ে ছেলে বউ নিয়ে বসবাস করবে এমন স্বপ্ন খুব দেখতে তাই না? আমিও দেখতাম– কিন্তু দেখলাম, ওসব স্বপ্ন বাস্তব করা যায় না– আমি তো শুনছি পুরো এলাকাটাই হবে ইন্ডাস্ট্রিয়াল জোন– ওসব জমির নতুন মালিকরা পরে চড়া দামে জমি বিক্রি করবে ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টদের কাছে, ঐ ব্যবসায় সাদেকও ঢুকে পড়েছে বলে মনে হয়– এসব কথা ওদের আলোচনা থেকেই আমি শুনেছি। ও জমির আশা তুমি ছেড়ে দাও।

ওসব কথা বাদ দাও, রায়হান বলে।

তাহলে কোন কথা বলবো? মেরি তার শীর্ণ হাত বাড়িয়ে রায়হানের হাত ধরে। আর তাতেই রায়হান রীতিমতো শিউরে ওঠে। বলে আরে! তোমার গায়ে তো দেখছি রীতিমতো জ্বর।

ও কিছু না, খুব মলিন হাসি ফোটে মেরির মুখে। বলে, তোমার হাত ধরে থাকতে আমার খুব ইচ্ছে করছে।

রায়হান প্রসঙ্গ বদলাবার জন্য জানতে চায়, দুপুর বেলা তোমার কাছে কেউ থাকে না?

হ্যাঁ থাকে, চন্দনা ক্লাস করতে যায়, তাই সব সময়ের জন্য একজন দাই রাখা হয়েছে– ও বেচারা খাওয়া-দাওয়া করতে গেছে।

সাদেক সাহেব কখন আসেন?

রায়হানের প্রশ্ন শুনে মেরি হাসে। বলে, ওর সময় কোথায়? খুব ব্যস্ত থাকে আজকাল, তবে একেবারে যে আসে না, তা নয়, যেমন আজ বোধহয় আসবে। কারণ গত দু'দিন আসে নি। কথা বলতে বলতে মেরি যেন একটু অন্যমনস্ক হয়। তারপর ফের হঠাৎ বলে ওঠে, খালি আমিই কথা বলছি– এবার তুমি কথা বলো, আমি শুনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

রায়হানের বাঁ হাত তখনও মেরির ডান হাতের মুঠোর মধ্যে ধরা। তার কিছুই মনে আসছে না, সে কোন কথা বলবে ? মেরির সঙ্গে তো অন্য কথা সে আগে বলে নি– ছেলেদের কথা, কিংবা অফিসের কথা বা রাজনীতির কথা অথবা দেশের অবস্থার কথা– এসব নিয়ে কথা দু'জনার মধ্যে কখনোই হয় নি। সে বলবার মতো কথা খুঁজে পায় না।

তবে সে মেরিকেই বারবার করে দেখে। তার চুল উঠে যাওয়া মাথা আর কালশিটে পড়ে যাওয়া কপাল দেখে, গর্তে ঢোকা চোখের কোল আর ঘোলাটে চোখ দেখে, কালো হয়ে আসা শুকনো আর ভাঁজ পড়া দুই গাল দেখে। শুধু দেখে, কিছু বলে না।

অনেকক্ষণ হাতখানা ধরে রেখেছিলো মেরি, তারপর এক সময় তার হাতের মুঠো শিথিল হয়ে রায়হানের হাত খসে পড়ে। তার কী যে হয় ঐ মুহূর্তে, রায়হান মেরির কপালে হাত রাখে। আর সঙ্গে সঙ্গে মেরি কপাল থেকে রায়হানের হাত সরিয়ে দেয়। বলে, তুমি ওভাবে আমার কপালে হাত রেখো না, আমার কষ্ট হয়।

রায়হান মনের ভিতরে যেন চাবুকের ঘা খায়। সে দু'খানি হাতই কোলের ওপর মুঠো করে রাখে।

মেরি বলে, তুমি রাগ করো না। তুমি অমন করলে আমার বাঁচার সাধ নতুন করে জেগে উঠবে– তাতে আমার মরতে খুব কষ্ট হবে, বুঝেছো ? আর–

বলতে বলতে মেরি থেমে যায়। আর তাতে রায়হানের আবেগ সব রকমের সংযম আর বিবেচনার বাধা পার হয়ে যায়। সে মেরির হাত ধরে সাগ্রহে বলে, থামলে কেন ? কী বলতে চাইছিলে ?

না থাক।

কেন, থাকবে কেন, তুমি বলো।

বলছিলাম, মেরি চোখে চোখ রাখে, বলে, তুমি আর আমার কাছে এসো না, তুমি এলেই আমি যে মরে যাচ্ছি সেটা বেশি করে মনে পড়ে আর তাতে আমার কষ্টটা বাড়ে। এই মুহূর্তে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে, বিশ্বাস করো– আমি মরতে চাই না।

আহা ওসব কথা কেন বলছো ? তোমার অসুখ হয়েছে চিকিৎসা হচ্ছে, অসুখ সেরে যাবে– এই তো ব্যাপার। মেরি দাঁতে ঠোঁট কামড়ে ধরে, কিছুই বলে না।

রায়হান দেখতে পায় মেরির দু'চোখের পাতা ভিজে উঠেছে দু'ফোঁটা পানিও গড়িয়ে পড়লো দু'গাল বেয়ে। রায়হান অমন অবস্থায় কী বলে সান্ত্বনা দেবে, ভেবে পায় না। একেকবার মনে হয় তার চলে যাওয়া উচিত। ফের মনে হয়, এমন অবস্থায় মেরিকে একলা রেখে সে কীভাবে যায়।

মেরি চোখ মুছে স্বাভাবিক হওয়ার জন্যই বোধহয় বলে, তোমার ছেলেটিকে খুব ভালো লাগে আমার! ইশ্ খালা আম্মা বলে যখন ডাকে– ইশ্। মনটা একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে যায়। আর এতো সিরিয়াস। যেন অন্য কেউ নয়, আমি ওর খুব আপনজন– ওই তো সেদিন সাদেকের সঙ্গে দেখা করার জন্য অপেক্ষা করেছিলো সমস্তটা দিন– কী নাকি জরুরী কথা আছে, আমার সামনে বলবে না– কিন্তু যাকে বলবে সে যে অন্যকে বলবে না, সেটা তো ও জানে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বলতে বলতে হাসে মেরি। বলে, ভারী মিষ্টি ছেলে তোমার রঞ্জু। কথাটা অন্য কিছু না, আমার যে ক্যানসার হয়েছে, টিউমারে ম্যালিগন্যান্সি খুব বেশি, এইসব কথা আর কি। তাড়াতাড়ি রোগী নিয়ে বোম্বেতে যাওয়া দরকার এই পরামর্শও ওরই দেওয়া।

কথাটা বেচারি অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে থেকে সন্ধ্যার দিকে সাদেক এলে তখন তাকে বলে, আমার সামনে বলে নি। দরজার ওপাশে বলেছিলো, তাতে এমন চ্যাচামেচি শুরু করে দেয় সাদেক, যে ছেলে পালাতে পথ পায় না। খবরটা চন্দনা জানতে পারে, সেও বাপের সঙ্গে ঝগড়া করে– ফলে আমার জানতে আর কিছুই বাকি থাকে না। চন্দনার আব্বার ধারণা আমার ওসব কিছুই হয় নি– খামোকা নাকি ছোকরা ডাক্তারগুলো ভয় পাইয়ে দিচ্ছে। বাঝো কেমন মানুষ সাদেক, ওকে বোকা বলবে, না শয়তান বলবে, চিন্তা করে দেখো।

মেরির কথা শেষ হয়ে যায়। কিন্তু তারপরও ওর হাসি থামে না।

আর ঐ সময় কেবিনের দরজা খুলে চন্দনা আর একটি তরুণ ভিতরে এসে ঢোকে।

চন্দনা সালাম ঠিকই দেয়, কিন্তু তার মুখে হাসি ফোটে না, বরং অস্বাভাবিক রকম গম্ভীর হয়ে ওঠে। সে জিজ্ঞেস করে, মা বুয়াটা আসে নি, তাই না?

সঙ্গী তরুণটির দিকে মুখ ফিরিয়ে সে ফের বলে, দেখো কেমন মানুষ তুমি জুটিয়ে দিয়েছো, দুপুরের খাবার খেতে ওর দু'আড়াই ঘণ্টা লাগে।

তরুণটি রায়হানের দিকে বারবার তাকাচ্ছিলো। রায়হান অনুমান করে এ নিশ্চয়ই সেই ছেলে যার সঙ্গে চন্দনার বিয়ে হতে যাচ্ছে।

মেরি তরুণটিকে কাছে ডেকে বলে, ইনি রায়হান সাহেব, সাংবাদিক।

তরুণটি হাসে। বলে, বুঝেছি বুঝেছি আর বলতে হবে না, রাজিব তো আমাকে কখনো বাসায় নিয়ে যায় নি। তাই সামনাসামনি দেখা হয় নি– চাচা, রাজিবকে তো পাবেন না, ও এখনও ওটিতে– ইউনিভার্সিটি এলাকায় দুই গ্রুপে খুব গোলাগুলি হয়েছে, পাঁচজন উণ্ডেড– তিনজনের অবস্থা খুবই খারাপ।

রায়হান খবরটা শুনে একটু কৌতূহলী যে না হয়, তা নয়। কিন্তু মুখে, কিছু প্রকাশ করে না। মনের মধ্যে একটা প্রশ্নও ওঠে, মঞ্জু কি ইউনিভার্সিটিতে গেছে আজ? সে চন্দনার দিকে নজর তুলে জানতে চায়, ইউনিভার্সিটিতে আজ ক্লাস হয়েছে তোমাদের?

চন্দনা মাথাটা অল্প নাড়ায়। রায়হান লক্ষ্য করে মেয়েটা কেমন যেন বিরক্ত হচ্ছে। সে তখন ওঠে। মেরিকে বলে, আজ তাহলে যাই– পরে আবার কথা হবে।

কেবিন থেকে বের হয়ে আসে বটে, কিন্তু কেমন যেন আচ্ছন্নতার মধ্যে থাকে সে। ঐ আচ্ছন্নতার মধ্যেই করিডর দিকে হাঁটে। সিঁড়ি দিয়ে নামে, কোনো বাহনে ওঠার কথা তার মনে জাগে না। মনের ভিতরে কেউ বারবার প্রশ্ন করতে থাকে, মেরি একেবারে মরে যাবে? শিগগির মরে যাবে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

দোয়েল চত্বরের কাছে পৌছালে তার ঘোরটা কাটে। ওখানে দেখা হয় রিপোর্টার সালেহউদ্দিনের সঙ্গে। সে রিকশায় চেপে যাচ্ছিলো। রায়হানকে দেখে সে রিকশাটা থামায়। জিজ্ঞেস করে রায়হান ভাই এদিকে কোথায় এসেছিলেন?

রায়হান ডাক শুনে থমকে দাঁড়ায়। ঐ মুহূর্তে স্লোগানের আওয়াজ তার কানে আসে। স্বৈরাচারের চামড়া–খুলে নেবো আমরা, আওয়াজটা শুনে সে পিছনে তাকায়। দেখে, মেডিক্যাল গেটের কাছে ভিড়। তার ধাঁধা লাগে, ঐ ভিড়টা কি আগেও ছিলো? যখন সে গেট দিয়ে বেরুচ্ছিল?

সালেহউদ্দিন ফের বলে, রায়হান ভাই কাউকে খুঁজছেন?

না, রায়হান সালেহউদ্দিনের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসে। বলে, না কাউকে খুঁজছি না, তুমি কোথায় যাচ্ছো?

কেন, অফিসে।

চলো, আমিও যাচ্ছি। রিকশায় উঠলে সালেহউদ্দিন বলে, ইউনিভার্সিটি এলাকার খবর শুনেছেন?

হ্যাঁ, শুনলাম, রায়হান জানায়, দুই গ্রুপে নাকি খুব গোলাগুলি হয়েছে?

হ্যাঁ, ঐ খবরটাই জানতে গিয়েছিলাম।

কী জানলে? দুই গ্রুপ কারা কারা? ছাত্রলীগ আর ছাত্রদল?

না, আর সেটাই ইন্টারেস্টিং, সরকারী দল ছাত্রসমাজের ক্যাডাররা জিয়া হল দখল করতে এসেছিলো। সেখানে প্রথমে লাগে ছাত্রদলের সঙ্গে। আর একই সঙ্গে পিছনে জহুরুল হক হলের দিক থেকে হামলা করে ছাত্রলীগের ছেলেরা। সরকারী দলের ক্যাডাররা দু'দিক থেকে আক্রমণের মাঝখানে পড়ে সমানে গুলি চালিয়ে কোনো রকমে পিছু হটে পালায়, না হলে আজ সব ক'টা নির্ঘাত মারা পড়তো– বেশ কয়েকজন জখম হয়েছে। তবে মারা যাবার কোনো খবর পাওয়া যায়নি। রমনা পার্কের পাশ দিয়ে রিকশা যাবার সময় পার্কে ঢোকার গেটটা দেখিয়ে সালেহউদ্দিন বলে, এই দিক দিয়ে নাকি সরকারী দলের ক্যাডাররা এসেছিলো– আবার এই দিক দিয়েই নাকি পালিয়েছে।

রায়হানের হাসি পায় খবরটা শুনে। বলে, পার্কের ওপারেই তো মন্ত্রীপাড়া, ওখানে শেলটার নিতে গেছে কিনা খোঁজ নিয়েছো?

সালেহউদ্দিনও হাসে। বলে, না রায়হান ভাই, মন্ত্রীদের অতো সাহস হবে বলে মনে হয় না।

একটু থেমে সালেহউদ্দিন ফের বলে, আচ্ছা আপনার এমনকি মনে হচ্ছে যে, অপোজিশনের মধ্যে খুব শিগগির ইউনিটি হবে?

আজকের ঘটনা দেখে কী মনে হয়? রায়হান পাল্টা জিজ্ঞেস করে।

আমার তো মনে হচ্ছে ইউনিটির আর দেরি নেই। শুনে এলাম ছাত্রসমাজের সাপোর্টারদের আজ রাতেই সব হল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে– একজন তো বললো, ওদের অনেকেই হল ছেড়ে চলে গেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

একটু থেমে ফের বলে সালেহউদ্দিন, ওদিকে গতকাল চট্টগ্রামে নাকি খুব জোর ক্ল্যাশ হয়েছে, ওখানেও একই অবস্থা, সরকারী দলকে মার খেয়ে পিছু হটতে হয়েছে। রায়হান অবাক হয়। বলে, খবরটা তুমি ঠিক জানো ?

বাহ্ জানবো না! অফিসে গেলে আপনিও জানতে পারবেন– কেন, আপনার কি বিশ্বাস হচ্ছে না !

না, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথা নয়, রায়হান জানায়। বলে, এই তো কিছুদিন আগের কথা, তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে, সম্মিলিত বিরোধী দলের মিছিলের ওপর পুলিশ গুলি চালালে বেশ কয়েকজন লোক মারা যায়– এখন এরই মধ্যে কী ঘটে গেলো যে সরকারী দলকে পিছু হটতে হলো, পুলিশ ওদের পাহারা দিয়ে রাখতে পারলো না ?

তার মানে, আপনি বলতে চাইছেন, পুলিশ এখন আর কোঅপারেট করতে চাইছে না সরকারের সঙ্গে ?

কেন, এমন কি হতে পারে না ?

রায়হানের পাল্টা প্রশ্ন শুনে সালেহউদ্দিন কিছুক্ষণের জন্য চুপ হয়ে যায়। তার মনের ভিতরে যে চিন্তা ঘোঁট পাকিয়ে উঠেছে সেটা তার চোখমুখ দেখলেই বোঝা যায়। তবু সালেহউদ্দিন বলে ঠিক আছে, ধরে নিলাম, পুলিশ সাপোর্ট দিলো না। কিন্তু আর্মি ? আর্মিও কি গভমেন্টকে সাপোর্ট দেবে না ?

দিতে কি বাধ্য ? যদি না দেয় ? এটা তো ন্যাশনাল ডিফেন্সের কোনো ব্যাপার নয় বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের ব্যাপারও নয়। রায়হানের কথা শুনে সালেহউদ্দিন বেশ যেন চিন্তায় পড়ে যায়। বলে, তাহলে তো রায়হান ভাই, হিসাবটা বেশ তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে আসছে, এদের আয়ু আর বেশিদিন নেই– দেয়ার ডেজ আর নাম্বারড।

অফিসে নিজের কামরায় গিয়ে বসার পরও মনের এলোমেলো অবস্থাটা কাটিয়ে উঠতে পারে না রায়হান। হাসপাতাল থেকে বেরুবার পরে মেরির কথাই তার সারা মনে ছেয়ে ছিলো। সালেহউদ্দিনের সঙ্গে দেখা হওয়ায় তার সঙ্গে এক রিকশায় আসতে আসতে মন কিছুক্ষণের জন্য অন্যদিকে গেলে কী হবে, নিজের কামরায় একাকী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফের মেরির চিন্তা সমস্ত মন জুড়ে জেগে ওঠে।

হাসপাতালের বিছানায় শোয়া অবস্থায় তার হাত ধরে মেরি যা যা বলেছে প্রতিটি কথা তার এক এক করে মনে পড়ে। আর ঘুরে ঘুরে একটা কথাই মনে হয় যে, মেরি সম্বন্ধে খারাপ ধারণা করা তার একদম উচিত হয় নি। ভালোবাসতে চাওয়া বা ভালোবাসা আশা করা নিশ্চয়ই কোনো অপরাধ নয়। ও যা যা করেছে, তার সঙ্গে সবই তো ভালোবাসা পাওয়ার জন্য। একটি মেয়ের জীবনে একজন স্বামী এলো, কিন্তু সেই স্বামী ভালোবাসতে জানে না। সেটা কী জিনিস তাও বোঝে না। টাকার জন্য প্রমোশনের জন্য নিজের বউকে অবলীলায় অন্যের কাছে পাঠায়। এমন যদি অবস্থা হয়, তখন ঐ মেয়ের মনের অবলম্বন বলে কি কিছু থাকবে। স্বামী যদি অন্যকে তুষ্ট করার জন্য বউকে ব্যবহার করে তাহলে সেই বউয়ের মন কি স্বাভাবিক থাকতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

পারে ? থাকা সম্ভব ? অমন অবস্থায় ঐ মেয়ের যদি কোনো পুরুষ মানুষকে ভালো লেগে যায়, কি পছন্দ হয় বা তাকে সে বিশ্বাস করে আর সেজন্য তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে চায় এবং শেষ পর্যন্ত তাকে ভালোবাসে, একেবারে দেহমন, আশা হতাশা আনন্দ বেদনা সমস্ত কিছু দিয়ে ভালোবাসে। তাহলে তাকে কীভাবে আর কোন যুক্তিতে অপরাধী বলা যাবে।

আসলে মেরি তখন হাতখানা মুঠোর ভেতরে ধরে রেখে শুধু কথাই বলে নি– সে তখন কাঁদছিলো। সারাটাক্ষণ কেঁদে যাচ্ছিলো। সে কান্না হয়তো বাইরে প্রকাশ পায় নি, চোখ দিয়ে পানি হয়ে বেরিয়ে গালের উপর দিয়ে গড়িয়ে পড়ে নি কিংবা গলার স্বর হয়ে বেরিয়ে আসে নি, তবু আসলে সে কেঁদেই যাচ্ছিলো– ওটা কান্না ছাড়া অন্য কিছু নয়। জীবনে প্রভাবিত হওয়ার কান্না, ব্যর্থ হওয়ার কান্না। জীবনে পূর্ণ হতে না পারার কান্না।

রায়হানের নিজেকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছে করে। কেউ যেন তাঁর মনের ভেতরে বলে, ছি! রায়হান ছি! অহেতুক সে মেরি সম্পর্কে উল্টোপাল্টা খারাপ ধারণা করে রেখেছিলো। ওর সম্পর্কে কী না ভেবেছে সে! মেরি নিমফো, মেরি নিজের বায়না করা জমিটা হাতছাড়া যাতে না হয়ে যায় সেই জন্য তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি করেছিলো, এমনকি এখনও যে রায়হান জমিটা বিক্রি করতে চলেছে তাও স্বামীকে সস্তা দামে সেটা পাইয়ে দেবার জন্য। তার যতো চেষ্টা মেরির আচরণ আর কথাবার্তার মধ্যে কতো রকমের যে দূরভিসন্ধি আবিষ্কার করেছে তার হিসেব নেই। ছি! রায়হান ছি!

নিজেকে সে ধিক্কারের পর ধিক্কার দিতে থাকে।

মেরির চিন্তা মন থেকে কিছুতেই সরাতে পারে না।

যতোই চেষ্টা করে ততোই চিন্তাটা মনের ওপর জাঁকিয়ে বসে।

একবার মেরি যে সাদেককে ডিভোর্স করার কথা ভেবেছিলো, সত্যি সত্যি যদি ডিভোর্স করতো, তাহলে কী হতো ? রায়হান নিজের মনের দিকে তাকায়। কিন্তু ঠিক উত্তরটা তার মনের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে না। সে নিজে কি মেরিকে বিয়ে করতে পারতো ? একবার মনে হয় পারতো, পরে মনে হয়, না পারতো না। প্রথম তো বীথি অনুমতি দিতো না, আর যদি দিয়েও দিতো, তাহলেও সে মেরিকে বিয়ে শেষ পর্যন্ত করতো না। কীভাবে করতো, ছেলেমেয়েরা ছিলো না ? জীবনকে পূর্ণ করতে চাওয়ার জন্য যে ভালোবাসা আঁকড়ে ধরতে চেয়েছিলো মেরি, সেই ভালোবাসা আসলে কি মেরির জীবনকে পূর্ণ করতে পারতো ?

ছেলেমেয়েরা ছিলো না মাঝখানে ? তাহলে ?

তাছাড়া এদিকে বীথির তো কোনো দোষ ছিলো না। তার জীবন নষ্ট করার তো কোনো রকম অধিকার কারুর নেই– আর তার ছেলে তিনটির কী হতো ? ওদের জীবন নষ্ট করার অধিকারও কি কারুর আছে ? তাহলে ?

তাহলে জীবনে ভালোবাসা পাওয়ার কোনো উপায় ছিলো না মেরির। একটা মেকি জীবন আর মেকি সংসারই তার ভাগ্যে লেখা ছিলো বলে রায়হানের মনে হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

কোনো কিছুতেই মেরির ভাগ্য বদলানোর সম্ভাবনা ছিলো না। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মেরির সম্পর্ক কেমন, সেটা সে জানে না, তবে তার অনুমান সেখানেও ফাঁক এবং ফাঁকি কম নেই।

ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সম্পর্ক যে স্বাভাবিক নয় সে খবর তো নিজের মুখেই জানালো মেরি, যে তার দেখা শোনা করার জন্য খালি চন্দনাই আসে। অন্যরা আসে না। তাহলে ? তাহলে শেষ পর্যন্ত কী দাঁড়াচ্ছে ? রায়হানের খুব খারাপ লাগে মেরির কথা চিন্তা করতে করতে। শেষ পর্যন্ত মনে হয়, মেরির জীবন বলে আসলে কিছুই ছিলো না। ওর মরণ আরও আগে হয়ে গিয়েছিলো, অসুস্থ হয়ে পড়ার অনেক আগে থেকেই।

দেখতে দেখতে বাইরে বিকেল গড়িয়ে যায়। কিন্তু রায়হানের হাতে কলম আর ওঠে না। এদিকে একটা পোস্ট লেখার কথা আজ। বিষয়ও ঠিক করা আছে, কিন্তু লেখাটা সে আরম্ভই করতে পারছে না। ঘুরে ফিরে মেরির কথাই মনের মধ্যে ভিড় জমিয়ে থেকে যাচ্ছে।

দেশের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা নিয়ে লেখার জন্য তাকেই দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। আমানউল্লাহ, জাহিদ, দু'জনেরই দাবি এমন একটা পোস্ট রায়হান ভাইকেই লিখতে হবে। তাছাড়া হারুন সাহেবেরও ফেরার সময় হয়ে এসেছে– উনি এলে তো একেবারে হুকুম দিয়ে লেখাবেন। তার চাইতে নিজের থেকে আগেভাগে লেখাটা লিখে শেষ করা ভালো নয় কি ?

অমন চিন্তা ভাবনা করে দায়িত্বটা সে নিয়েছিলো। এখন কীভাবে সামাল দেবে তাই ভেবে উঠতে পারে না। সারাটা দুপুর তো কাটলো মেরির চিন্তা নিয়ে।

আসলে এতো ঘটনা ঘটছে একটার পর একটা। সে কোনটা নিয়ে লিখবে ? এমনিতে এক কথায় তো বলে দেওয়া যায় যে দেশের অবস্থা ভালো নয়– যতো আন্দোলন বাড়ছে, দেশের অবস্থা ততোই খারাপ হয়ে চলেছে। দেশের মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। শহরগুলোতে অবাধে মাস্তানি আর গুন্ডাবাজি চলছে। কলেজ ইউনিভার্সিটিতে ক্লাস হচ্ছে না, এক সপ্তাহ দু'সপ্তাহ বাদ বাদই হরতাল– কিন্তু সরকারের সরে দাঁড়াবার কোনো রকম লক্ষণ কেউ দেখছে না।

দেশের আইনজীবীরা স্বৈরাচারের সমালোচনা করে বিবৃতির পর বিবৃতি দিচ্ছেন। সুপ্রীম কোর্টের বার এসোসিয়েশন তো একেবারে খোলাখুলি সরকারের বিপক্ষে দাঁড়িয়ে গেছে– ওদিকে ডাক্তারদের সংগঠন বিএমএ নিজেদের দাবি দাওয়া নিয়ে একটার পর একটা কর্মসূচী পালন করে চলেছে। অল্প কিছুদিন আগে নার্সদের ধর্মঘট হয়ে গেছে। তার আগে ধর্মঘট হয়েছে ইন্টার্নী ডাক্তারদের। ওদিকে শোনা যাচ্ছে স্কুল শিক্ষকরাও তাদের দাবি-দাওয়া নিয়ে পথে নামবে। এদিকে তিন জোটের সরকার হটানোর আন্দোলনের একটার পর একটা কর্মসূচী আর অন্যদিকে পেশাজীবী আর শ্রমিক-কর্মচারীদের বিক্ষোভ আর আন্দোলন। সব মিলিয়ে দেশের অবস্থা যে চূড়ান্ত রকমের বিপর্যয়ের মুখোমুখি হতে চলেছে– এই বক্তব্যটাই সে তার পোস্ট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

এডিটোরিয়ালে তুলে ধরতে চায়। কিন্তু হলে হবে কী, চিন্তাগুলোকেই সে মগজের ভেতরে গোছাতে পারে না। কারণ যা ঘটছে, তার পেছনে তো নানান ধরনের দল আর গ্রুপের টানাপোড়েন। আন্দোলনের মধ্যে এক গ্রুপ আর এক গ্রুপের ওপর দিয়ে টেক্কা মারতে চায়। যেমন বিএমএ'র মধ্যে তিন জোটেরই সমর্থক আছে। সেক্রেটারি যদি পাঁচ দলের তো প্রেসিডেন্ট সাত দলের– আগের কমিটিতে সেক্রেটারি ছিলো আট দলীয় জোট– এর একজন আওয়ামী লীগার। বার এসোসিয়েশনে সরকারের সমর্থক কম নেই। কিন্তু সবই নিচের আদালতে। হাই কোর্ট আর সুপ্রীম কোর্ট– সরকারের সমর্থক খুঁজেই পাওয়া যায় না। যদিও ব্যারিস্টার মওদুদ বাংলাদেশের ভাইস প্রেসিডেন্ট।

পেশাজীবীদের আন্দোলন সরকারী কর্মচারীদের ইউনিয়নগুলোকেও রাস্তায় নামিয়ে দিতে শুরু করেছে। ওদিকে পরিবহন শ্রমিক, মিল-কারখানা শ্রমিকদের ধর্মঘট রাস্তা অবরোধ এখন তো একের পর এক হয়েই চলেছে। তাহলে অবস্থাটা দাঁড়াচ্ছে কেমন ? সর্বত্রই ধর্মঘট আর আন্দোলন– মিল কারখানায় উৎপাদন বন্ধ। বিদেশে এক্সপোর্ট-এ ভাঁটা। দেশের ভেতরে মাল চলাচল হচ্ছে না। এমন অবস্থা কি চলতে পারে ? না চলতে দেয়া উচিত ?

কেয়ারটেকার সরকারের কথা অবশ্যি সবাই বলে না। তবে বর্তমান সরকারের অধীনে নির্বাচন হলে যে সেটা অর্থহীন নির্বাচন হয়ে দাঁড়াবে সে ব্যাপারে কারও দ্বিমত নেই।

শেষ পর্যন্ত রায়হান চিন্তাটাকে গুছিয়ে তুলতে পারলো না। লেখাটা শেষ পর্যন্ত এলোমেলোই থেকে গেলো। তবু ঐ এলোমেলো লেখা শেষ করতে করতেই প্রায় সন্ধ্যা। জাহিদ কেন অতোক্ষণ পর্যন্ত অফিসে ছিলো, সে জানে না। লেখাটা আমানউল্লাহ সাহেবের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে সে মিনিট পাঁচেক বসে ছিলো। ঐ সময় জাহিদ এসে রুমে ঢুকলো। বললো, রায়হান ভাই, লেখাটা কিন্তু নন কমিটাল হয়ে গেলো।

রায়হান জবাবে হাসে। বলে, তাই ?

হ্যাঁ। আপনি ফের একবার চোখ বুলিয়ে দেখুন, আপনি ধর্মঘট মিছিল এসব যেন সাপোর্ট করতে চাইছেন না।

হ্যাঁ। ঠিকই তো, রায়হান উৎসাহ দেখাতে দেখাতে বলে, তুমি ঠিক ধরেছো। ওসব প্রোগ্রাম ডিসকারেজ করা দরকার–

বাহ্ ওসব না করলে আন্দোলন হবে ? অত্যাচারী সরকারকে সরানো যাবে ?

কেন, সরকারকে যদি সরাতেই চাও, তাহলে সরকার যেমন অস্ত্র নিয়ে দাঁড়ায়, তোমরাও তেমনি অস্ত্র নিয়ে দাঁড়াও।

জাহিদ চোখ গোল গোল করে রায়হানের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে তারপর কী ভেবে রুম থেকে বেরিয়ে যায়। ওর বেরিয়ে যাওয়ার ভঙ্গিটা দেখে রায়হান খুব হাসে একচোট। তারপর বাসায় ফেরার জন্য ওঠে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

তার ঠিক ঐ মুহূর্তে টেলিফোনটা বেজে ওঠে। রিসিভার কানে তুললে মাহফুজের গলা শুনতে পায়। সে জানায়, মামলার শুনানির তারিখ একমাস পিছানোর জন্য যে দরখাস্ত দেওয়া হয়েছিলো তা মঞ্জুর হয় নি– তবে জজ সাহেব একেবারে নিরাশ করেন নি, এক সপ্তাহের সময় দিয়েছেন। আমার কাজ তো আমি এদিকে করলাম, মাহফুজ কথা বলতে বলতে থেমে যায়। বলে, তোমার খবর কি ? সাক্ষী যোগাড় হলো ?

রায়হান খুব শান্ত গলায় জবাব দেয়। বলে, সাক্ষী যে আমার পক্ষে যোগাড় করা সম্ভব হবে না সে কথা তো তোমাকে সেদিনই জানিয়ে দিয়েছি।

বাহ্ সুন্দর! মাহফুজ রীতিমতো ক্ষোভ প্রকাশ করে। বলে, ওসব ভাবের কথা বলে লাভ নেই, বুঝলে যেখানকার যা নিয়ম, তা মেনে চলতে হবে।

না ভাই সাক্ষীটাক্ষী যোগাড় করতে পারবো না, রায়হান সোজাসুজি জানায়।

তাহলে বলো মামলাটা তুমি চালাতে চাও না, তাই না ?

হ্যাঁ, সে তুমি যা বোঝো। একটু থেমে রায়হান ফের বলে, মামলা চালাতে না পারা গেলে চালাবে না, সাক্ষী না যোগাড় করতে পারলে আর কী উপায় বলো ? চেষ্টা করে তো দেখলাম, সাক্ষী তো আর বানাতে পারবো না।

ঐ কথা শুনে মাহফুজ হেসে ওঠে। সে হাসতে হাসতে বলে, ঠিক আছে, তুমি কাল পারলে একবার সকাল দশটার দিকে কোর্টে এসো, কোর্ট এলাকা থেকেই সাক্ষী খুঁজে নেয়া যাবে।

তার মানে ? রায়হান অবাক হয়।

আহা এসো একবার, তাহলেই দেখতে পাবে।

মাহফুজ ফোন নামিয়ে রাখে। রায়হান ধাঁধার মধ্যে পড়ে যায়। মাহফুজকে তো সে বুদ্ধিমান মানুষ বলে মনে করে– সেকি অচেনা আর আলগা মানুষকে শিখিয়ে পড়িয়ে সাক্ষী দেওয়াবে ?

রায়হানের বিরক্তি লাগে মাহফুজের প্রস্তাব শুনে। সে খোলাখুলি জানিয়ে দেয়। বলে, শোনো মাহফুজ, আমার কেনা ঐ জমি দখলের পেছনে যারা আছে, তাদের বিরুদ্ধে আমার মতো সাংবাদিক কিংবা তোমার মতো উকিল কিছুই করতে পারবে না– এ খবর কি তুমি জানো ?

মাহফুজ এবার যেন খানিক গম্ভীর হয়, ফোনে তার নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যায় কিন্তু কথা শোনা যায় না। বোধহয় কিছু ভেবেও নেয় সে। তারপর বলে, ঠিক আছে তুমি যা বলছো, সে ব্যাপারে সামনাসামনি কথা হওয়া ভালো– একবার তুমি কোর্ট এলাকায় এসে দেখো, কী করা যায় আর কী করা যায় না– জমি দখল করা এতো সোজা নয়, বুঝেছো ?

একটু থেমে ফের বলে মাহফুজ, একটা কথা কিন্তু মনে রাখতে হবে, সময় পাওয়া গেছে মাত্রই সাত দিনের।

সেপ্টেম্বর প্রায় শেষ। সন্ধ্যার পর রাস্তায় বেরুলে বেশ ঠাণ্ডা বাতাস লাগে গায়ে। মতিঝিলের রাস্তা ফাঁকা না হলেও দক্ষিণের বাতাস ঠিকই ভেতরে ঢুকে জামার পিঠ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ফুলিয়ে দিচ্ছে। রায়হান হাঁটতে হাঁটতে একবার মাথাটা পেছনে হেলিয়ে আকাশ দেখে নেয়। আকাশে মেঘ নেই। কিন্তু তারাগুলো কেমন মলিন আর ঝাপসা দেখাচ্ছে। তার মানে, বাতাসের ওপরের স্তরে হয় পেট্রল মবিলের ধোঁয়া, নইলে ধুলো, কিংবা দুই-ই এক সঙ্গে মিলে আকাশটাকে ময়লা করে রেখেছে। রায়হানের পুরনো কথা মনে পড়ে যায়। তখন সবে চাকরিতে ঢুকেছে। সদরঘাটের কোর্ট এলাকা থেকে মিল্লাত অফিসের কাজ সেরে। শাজাহানপুরের বাসায় ফেরার সময় কালো আকাশের বুকে ঝকঝকে তারা দেখতে দেখতে পথ হাঁটতো– এখন সে যেমন ওয়ারিতে যাবার পথে করছে। কিন্তু তারাগুলোকে আর ঝকঝকে দেখতে পাচ্ছে না। শুধু কি এইটুকুই পার্থক্য ? আর পার্থক্য নেই ? সে নিজেকে শুধায়। আগে সদরঘাট থেকে ফিরতো শাজাহানপুর, তারপর কিছুদিন ফিরলো মতিঝিল থেকে কমলাপুর, এখন ফিরছে মতিঝিল থেকে ওয়ারি। এরপর সে অফিসের কাজ সেরে কোন এলাকায় ফিরবে ? কোথায় হবে তার বাসার ঠিকানা ? সে তো পাকা কোনো ঠিকানা করতে পারলো না, তার ছেলেরা কি পারবে ?

খুব ছেলেবেলায় সে বাবাকে বলতে শুনতো, আরে জায়গা জমি কারও থাকবে না– লাঙ্গল যার, জমি তার হয়ে যাবে– লেখাপড়া শেখো, বিদ্যা অর্জন করো– এমন দিন আসছে যখন শুধু ঐ বিদ্যাটুকুই থাকবে, আর কিছু থাকবে না। কথার কথা হয়তো বলতেন, তিনিও জানতেন না যে দশটা বছর পেরোতে না পেরোতে তাঁর মুখের কথা ফলে যাবে। সমস্ত ফেলে তাঁকে চলে আসতে হয়েছে বর্ডারের এপারে পাকিস্তানে। এসে দিনাজপুরে একটা বাড়ি কিনতে পেরেছিলেন শুধু। কিন্তু ঐ বাড়িতে ছাদের নিচে বিছানায় শুয়ে মরতে পারেন নি। তাঁকে মরতে হয়েছে রাস্তায়, পাকিস্তান আর্মির গুলি খেয়ে। তবু সম্ভবত বাবার একটা সান্ত্বনা ছিলো যে, একটা বাড়ি তিনি ছেলেমেয়েদের মাথা গোঁজার ঠাঁই হিসেবে রেখে যাচ্ছেন, কিন্তু তার নিজের বেলাতে কি হবে ? বাড়ি করার মতো কোনো রকম সঙ্গতি সে জোটাতে পারলো না। আগে টাকা যোগাড় হলেই সব হয়ে যেতো। কিন্তু এখন ? এখন তো দেখছে, সম্পত্তি বলতে শুধু টাকাই বোঝায় না। টাকার সঙ্গে আরও কিছু বোঝায়।

হাঁটতে হাঁটতে মাহফুজের কথাটা ফের মনে হয়। সে মামলাটা চালাতে চায়, বোধহয় তার বিশ্বাস, মামলায় সে জিতবে। সাক্ষী বানানো হলেও তার অসুবিধা হবে না। মাহফুজের স্বভাব সেই আগের মতোই রয়ে গেছে বলে তার মনে হয়। যা সে দেখছে সেটাকেই সে আসল বলে ভাবে। আর মনে করে, যেটা সে দেখছে সেটাই সব। তার পাশে বা পেছনে কিছু নেই। ছাত্র জীবনের কথা মনে পড়ে রায়হানের। ১৯৫৭/৬৮ সালের দিকেও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কিছু বললে সে ভীষণ ক্ষেপে যেতো– মাথা ঝাঁকিয়ে টেবিল চাপড়ে চিৎকার করতো। বলতো, ইয়েস পাকিস্তান হ্যাজ কাম টু স্টে– সোহরাওয়ার্দী আছেন মাথার ওপরে। ডেমোক্র্যাসির -াব চাইতে বড় খুঁটি, বুঝলে ? তোমরা যা-ই বলো, আমি কোনো চিন্তা করি না– তোমাদের লুঙ্গি পরা মাওলানা তো ইণ্ডিয়ার দালাল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

অমন কথা যখন বলতো, তার অল্প কিছুদিন পরই আইয়ুব খানের মার্শাল ল'জারি হয়ে যায়- তখন আর ওর মুখে কথা নেই- তখনও সে ইকবাল হলেই ছিলো, ল'পরীক্ষা দ্বিতীয়বার দিচ্ছে। আর ওদিকে রায়হানরা তখন লুকিয়ে বেড়াচ্ছে শহরের এ কোণে কখনও, কখনও আবার ও কোণে। ঐ রকম সময়েও দেখা হয়েছিলো- তখন ফের তার পুরনো চিন্তা চাঙ্গা হয়ে উঠেছে- বলেছিলো, আইয়ুব খান পাকিস্তানকে বাঁ চয়ে দিয়েছে. এখন ডেমোক্র্যাসি আবার চালু হয়ে যাবে। অমন ঘটনা আরও ঘটেছে মাহফুজকে নিয়ে। রায়হানের খুব স্পষ্ট মনে আছে। আইনজীবীরা সম্ভবত মিছিল বের করেছিলো। মিছিল শেষ করে কয়েকজন তরুণ উকিল প্রেসক্লাবে এসেছিলো। ওদের সঙ্গে মাহফুজও ছিলো। কথায় কথা উঠলো, ইয়াহিয়া খান শেখ সাহেবের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে কিনা। ব্যস, মাহফুজ উত্তেজিত হয়ে উঠলো। চিৎকার করে বলতে শুরু করলো, আলবৎ ক্ষমতা ছাড়বে। বঙ্গবন্ধুর হাতে তাকে ক্ষমতা দিতে হবে- না দিয়ে যাবে কোথায় ? দেশে আইন নেই ?

তার মনে হয়, মাহফুজ একই রকম রয়ে গেছে, এতো বছর ধরে এতো ঘটনা ঘটে যাবার পরও। চোখের সামনে যা আছে, সেই জিনিসই শুধু দেখতে পায়। সেই জিনিসের আড়ালে কী আছে, তা তো দেখেই না, এমনকি কল্পনাও করতে পারে না।

বাসায় ফিরলে বীথি চিরকুটে লেখা একটা টেলিফোন নাম্বার হাতে দেয়। জানায়, কে এক সাদেক সাহেব ফোন করেছিলেন। তোমাকে ফোন করতে বলেছেন, আজই যত রাত হোক উনি কথা বলবেন।

রায়হান ফোন নাম্বারটা চোখের সামনে ধরে। সাদেক লোকটা কে, মনে মনে খুঁজতে থাকলে. বীথি কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করে, এ কোন সাদেক, মেরির স্বামী ?

বুঝতে পারে না রায়হান। কারণ যে ফোন নাম্বার চিরকুটে লেখা, সেটা মেরিদের ফোন নাম্বার নয়।

সে ফোন করলে অচেনা গলার আওয়াজ আসে। যখন সাদেক সাহেবের নাম বলে, তখন ভদ্রলোক নাম জানতে চান। রায়হান নিজের নাম জানালে ভদ্রলোক খুব খুশি হয়ে ওঠেন। বলেন, আমার নাম হায়দার, আপনার সঙ্গে একবার আমার দেখা হয়েছিলো, আপনার কি মনে আছে ?

রায়হানের জবাব দিতে দেরি হলে ভদ্রলোক নিজেকে পরিচিত করানোর জন্য নিজের থেকেই বলেন, আমি ফুলবাড়িয়া আপনার জমির পাশের জমিটা কিনেছি। এখন কি মনে পড়ছে আমাকে ? কথা ছিলো সাদেক সাহেব আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেবেন- তো ভালোই হলো, আপনি নিজেই যোগাযোগ করে ফেললেন, আমার সৌভাগ্য বলতে হবে।

ঐ পর্যন্ত বলে একচোট খ্যা খ্যা করে হাসেন ভদ্রলোক, তারপর বলেন, ভাইসাব আপনের জমির কী ব্যবস্থা করলেন, সেইটা জানার জন্যই আলাপ করতে চাইতে ছিলাম- আপনে কি মামলা মোকদ্দমা চালাবেন, না কি আপোসে মিটমাট কইরা ফালাবেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

কী রকম ? রায়হান খুব শান্ত গলায় জানতে চায়।

মানে, এই আর কি, আপনে কিছু দিয়া থুইয়া অগো বিদায় কইরা দিলেন, পুরা কেস মিটমাট হইয়া গেলো।

কতো দিতে হবে ? রায়হানের গলা তখনও শান্ত।

কতো আর! লোকটার গলায় তুচ্ছতাচ্ছিল্যের ভাব। বলে, এই ধরেন সত্তর/আশি হাজার দিলেই চলে।

জমিখানার মোট দাম কিন্তু এক লাখ টাকা, তা কি জানেন ?

রায়হানের কথা শুনে হায়দার সাহেব ফের হেসে ওঠেন। বলেন, ঐ সব কথা কইয়া কুনো লাভ নাই ভাইসাব, ঐ দাম তো ধরেন তিন বছর আগের। যখন জমির বায়না হইছিলো। আর যখন জমি রেজিস্ট্রি করেন, তখনই তো ঐ জমির দাম দেড় লাখ পৌনে দুই লাখ হইয়া গেছে– আপনেরা তো খুব সস্তায় দাও মারছেন– সাদেক ভাই কেমুন মাল তা তো জানেন। খুব লাভ করছে– বুঝছেন ভাইসাব ? হায়দারের অমন কথার পর রায়হান সোজাসুজি জানতে চায়, ঐ ব্যাপারে কি আপনিই আলাপ করবেন ?

একজন হইলেই হয়, হায়দার জানায়। তারপর বলে, কিন্তু আপনের মনের ইচ্ছা কী, সেইটা তো আগে জানা দরকার।

আমি ঐ সত্তর-অশি হাজার টাকা দেবো না– কেন দেবো ?

তাইলে ? হায়দারের গলা একটু যেন চড়া শোনা যায়।

তাইলে কী ? রায়হান পাল্টা জিজ্ঞেস করে।

তাইলে কন যে মামলাই চলবে।

হ্যাঁ, মামলাই চলবে, রায়হান খুব স্পষ্ট উচ্চারণ করে বলে।

এইটা তো ভাইসাব রাগের কথা কইলেন, আপনে শিক্ষিত মানুষ। মানী লোক। আমরা চাই আপনের য্যান কুনো অসম্মান না হয়– আপনে একটু চিন্তা কইরা দ্যাখেন ভাইসাব, মামলা কতো বছর চলবে তার কুনো ঠিক-ঠিকানা নাই। তার খরচও তো কম না, আপনে ঠাণ্ডা মাথায় একটু চিন্তা করেন– আর একখান কথা। হায়দার একটু থামে। তারপর বলে, কথা সিরিয়াস কিছু না। আমি কই কি, বিষয়টা নিয়া মুখোমুখি আলাপ হইলে ভালো হয়, আমরা আসি একবার রাপনের কাছে ? নাকি আপনে আসবেন ?

ভদ্রলোকের হেঁয়ালি ভরা কথা শুনে রায়হানের বিরক্তি লাগে। সে বলে ওঠে, হায়দার সাহেব, একটু খোলাসা করে বলুন তো, ঘটনাটা কী ? কেন আমাকে আপনাদের দরকার পড়ছে ?

আহা ভাইসাব। আপনে রাগ করতাছেন ক্যান, টেলিফোনে সেই আলাপ তো করা যায় না– বুঝেনই তো টাকা পয়সার ব্যাপার। তবে আপনে যখন শুনতে চান, তাই একটু আভাস দিয়া রাখি। আপনি ইচ্ছা করলে ঐ জমি ভালো দামে বিক্রি করতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

পারেন– আমাদের কাছে খরিদ্দার আছে– এই পর্যন্ত বললাম আর কি, এখন আপনের মর্জি– বাকি যা বলার, সব আমরা সাক্ষাতেই বলবো।

বীথি মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রায়হানের কথা শুনছিলো। আর যা শুনতে পাচ্ছিলো তাতে বিষয়টা কিছু আন্দাজও করতে পারছিলো। রায়হান ফোনের রিসিভারটা নামিয়ে রাখলে সে জিজ্ঞেস করলো, কার সঙ্গে কথা বললে ? সাদেক সাহেব ?

না, হায়দার– যে লোক সাদেকের জমি কিনেছে।

বীথি বোধহয় আশা করছিলো রায়হান গোটা ব্যাপারটা খুলে বলবে, কিন্তু রায়হান আর কিছু না বলাতে সে কৌতূহল প্রকাশ না করে পারলো না। জানতে চাইলো, সত্তর/আশি হাজার টাকা চাইছে কেন ?

রায়হান ভ্রূ কুঁচকে বিরক্ত হয়ে বলে, আর বলো না– এ হচ্ছে নতুন ব্যবসা। ল্যান্ড গ্র্যাবিং-এর ব্যবস্থা। হারামজাদারা নানান কায়দা কৌশল করে জমি হাতাতে চায়– আর আমাদের মতো লোককে এই সব হীনিয়াস বাস্টার্ডদের পাল্লায় পড়তে হচ্ছে– ওরা নাকি ব্যবস্থা করছে– যাতে জবরদখলকারীরা জমি ছেড়ে চলে যায়– আর সেজন্য আমাকে ঐ সত্তর/আশি হাজার টাকা দিতে হবে।

বীথি স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। যা শুনলো তাতে বিরক্তি ক্ষোভ রাগ অপমান সব এক সঙ্গে গুলিয়ে ওঠে মনের ভেতরে। কিন্তু ঐ গোলানো আবেগ বাইরে বেরুতে পারে না। তার আগেই স্বামীর ক্লান্ত মুখখানা তার নজরে পড়ে এবং অনেকক্ষণ ধরে সে রায়হানের মুখখানা দেখে। আর তার মনের ভেতরে কষ্ট লাগে। মনে হয়, কী ঝামেলাই না পোহাতে হচ্ছে অসুস্থ মানুষটাকে। এই অবস্থায় তার পাশে দাঁড়াবার মতো কেউ নেই। সে নিজেও নেই, অথচ তারই কথা ছিলো পাশে থাকার।

বীথির মনের ভেতরে আবেগ টলমল করে কিন্তু সেটা সে বাইরে প্রকাশ করতে পারে না। কারণ জানে, যদি সে ঘনিষ্ঠ হয়ে কিছু করতে যায়, তাহলে রায়হান তা বিশ্বাস করবে না, তার কাছে ব্যাপারটা অস্বাভাবিক লাগবে। এমনকি উল্টো কিছু সন্দেহ করে বসতে পারে।

সন্দেহের কথাটা তার মনে আসে বটে, কিন্তু সন্দেহটা যে কী হতে পারে সেটা সে ভেবে আবিষ্কার করতে পারে না।

চুপচাপ সে দূর থেকে মানুষটাকে দেখে শুধু।

রায়হান ওদিকে কাপড়-জামা ছেড়ে লুঙ্গি গেঞ্জি পরে, মুখ-হাত ধোয়, তারপর চা দেওয়া হলে চুপচাপ বসে বসে চা খায়। শেষে বসার ঘরের বারান্দায় রাখা চেয়ারের ওপর গিয়ে বসে।

বীথি ঘরের ভেতরে দরজার আড়ালে অপেক্ষা করে। তার কেবলি মনে হয়, এই হয়তো তাকে ডাকবে রায়হান। কিন্তু মুহূর্তের পর মুহূর্ত চলে যায়– রায়হানের দিক থেকে ডাক আর আসে না। বীথি লক্ষ্য করে, রায়হান নিজের ভেতরে যেন ডুবে রয়েছে, আকাশের দিগন্ত রেখার দিকে তার চোখ দু'টি মেলে ধরা।

ঐ একই অবস্থায় রায়হানকে দেখতে দেখতে বীথি এক সময় এক পা দু'পা করে এগিয়ে যায়। মনের দিক থেকে বাধা পায়, অভিমান বুকের ভেতরে ফুঁসে ওঠে। কেউ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

যেন আড়াল থেকে বলে ওঠে– এই মানুষটা যে অন্য মেয়ে মানুষের কাছে যেতো, অন্য মেয়ে মানুষকে বিয়ে করতে চেয়েছিলো, তোর মনে নেই ? যার হাত ধরে তুই বেরিয়ে এসেছিলি বাবা-মায়ের আশ্রয় থেকে, যাকে তুই বিশ্বাস করেছিলি, মনপ্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছিলি, সেই মানুষ তোর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, প্রতারণা করেছে, তুই কি সে সব ভুলে যেতে চাস ?

এই সব রাগ আর ক্ষেভের কথা তার মনের ভেতরটা তোলপাড় করতে থাকে মনের মধ্যে বাধা তৈরি করে, তবু তার দু'টি পা একটু একটু করে সামনের দিকে এগোতে থাকে এবং এক সময় চেয়ারের পেছনে দাঁড়ায়। তার হাত এগিয়ে যায়– রাতের অন্ধকার দিগন্তের দিকে তাকিয়ে থাকা নিশ্চুপ মানুষটার কাঁচাপাকা চুল ভর্তি মাথায় হাত রাখার জন্য বোধহয়। কিন্তু পারে না, হাত-পা দেহ এগিয়ে গেলে কী হবে, মনে যে বাধা ? সেটা তো তখনও দাঁড়ানো। পরে শেষ পর্যন্ত কী হবে বলা মুশকিল কিন্তু ঐ মুহূর্তে পারে না। কারণ ঠিক ঐ সময় রায়হান উঠে ঘুরে দাঁড়ায় এবং অবাক হয়। বলে, তুমি এখানে ? কী কাণ্ড! আমি তোমাকে ডাকতে যাচ্ছিলাম– বলতে বলতে রায়হান ফের চেয়ারে বসে পড়ে। তারপর স্ত্রী'র হাত ধরে তাকে মুখোমুখি দাঁড় করায়। বলে, তোমার সঙ্গে আমার আলাপ করা দরকার, কী যে করবো, বুঝতে পারছি না।

বীথিকে তখন বহুকাল আগের মতো ছেলেমানুষিতে পায়। অমন গম্ভীর হয়ে সিরিয়াস কথা বলার জন্য ভনিতা করতে দেখে সে হাসি চাপতে পারে না। অনেককাল আগে, যখন দু'জনে একাকী হতো, তখন সিরিয়াস কিছু বলার সময় ওর চেহারায় কেমন একটা বেমানান গাবলু গাবলু ভাব দেখা যেতো– সেই ভাবটা বীথি রায়হানের মুখে দেখতে পায়।

রায়হান বুঝতে পারে না। অপ্রস্তুত হয়ে বলে, কী হলো তোমার, অমন পাগলের মতো হাসছো কেন ? যা বলতে যাচ্ছি সেটা শোনো আগে– যা বলবো তা কিন্তু মোটেও হাসির কথা নয়।

বীথি মুখ গম্ভীর করে মাথাটা একবার ঝাঁকায়। তারপর বলে, ঠিক আছে, আর হাসবো না। বলো, কী বলবে।

কথা অন্য কিছু নয়– তুমি বোধহয় শুনেছো যে ফুলবাড়িয়ার জায়গাটা আমাদের হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে।

বীথি স্বামীর মুখোমুখি তাকায়, আবছা হলেও রায়হানের মুখে সে হেরে যাওয়া ক্লান্ত আর অসহায় একটা ভাব দেখতে পায় আর তাতে কষ্ট হয় তার। যদি কপালে না থাকে, তাহলে আর কী করা যাবে।

না কপালের কথা নয় এটা। রায়হান শান্ত গলায় খুব ধীরে ধীরে বলে, যদি অস্ত্রবাজ মাস্তান ভাড়া করে পাল্টা ব্যবস্থা নিতে পারতাম, তাহলে অবস্থাটা এমন হতো না– গোটা ব্যাপারটা স্রেফ দুর্বলতার– তারা ভয় দেখাচ্ছে, যাতে কেউ মামলায় সাক্ষী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

দিতে না যায়। যার কাছ থেকে রেজিস্ট্রি করে জমি কেনা হয়েছে সেই কুতুবউদ্দিন আর তার ছেলেও সাক্ষী দিতে সাহস পাচ্ছে না। স্থানীয় কোনো লোককেই পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না– এদিকে যার সঙ্গে মিলে একই দিনে রেজিস্ট্রি করে জমি কেনা হয়েছে, সেই সাদেক সাহেবও সাক্ষী দিতে পারবেন না বলে জানিয়ে দিয়েছেন। ওঁর পার্টনার হায়দার সাহেব বরং উল্টো প্রস্তাব দিচ্ছেন, হয় জমিটা বিক্রি করে দিই, নইলে দখলকারীদের হাতে সত্তর বা আশি হাজার টাকা দিয়ে তাদের আপোষে বিদায় করি। ওদিকে মাহফুজ কিন্তু মামলাটা চালিয়ে যেতে চায়, তার বিশ্বাস, মামলায় শেষ পর্যন্ত সে জিতে যাবে। কিন্তু আমার মনে হয়, মামলায় জিতলেও জমির দখল সহজে পাওয়া যাবে না। কারণ গুণ্ডা, মস্তান তো রয়েছে সামনে, কিন্তু তাদের পেছনে আছে পলিটিক্যাল ফোর্স, পুলিশ আর ব্লাকমানি অলারা। এদের দাপট কখনও কমবে বলে মনে হয় না– এই হলো অবস্থা।

রায়হান কথা শেষ করে জানতে চায়, বলো এখন কী করি আমি ? আবার যে জমি কিনতে পারবো, তা মনে হয় না– তুমি কী বলো, জমিটা ছেড়ে দেবো ?

বীথি খুব মনোযোগ দিয়ে স্বামীর কথা শোনে, তারপর বলে, ও ব্যাপারে কি আমি কিছু জানি যে বলবো ? খামোকা আমাকে জিজ্ঞাসা করছো তুমি– যারা দখল করেছে তাদের চিনি না, দেখি নি। যাদের সাক্ষী দেওয়ার কথা ছিলো, তাদেরকেও চিনি না এমনকি মাহফুজ সাহেবের সঙ্গেও আমার আলাপ হয় নি কখনও। আর আইন কানুনের আমি বুঝিটাই বা কী ? তোমার যা ভালো মনে হয়, তাই করো। রঞ্জু বড় হয়েছে ওকে জিজ্ঞেস করো। ও তো তোমার সঙ্গে জমি জায়গার ব্যবস্থা করার জন্য ইভিয়াতে গিয়েছিলো।

রায়হান হাসে। বলে, রঞ্জু তো প্রথম দিন থেকেই বলছে, ও জমি ছেড়ে দাও– ওকে জিজ্ঞেস করে কী হবে ? তোমার খুব শখ ছিলো নিজের বাড়ি করার– সেই জন্য তোমাকেই জিজ্ঞেস করছি– আমি এখন কী করি।

বীথি ঐ কথার পর আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়ায়– চেয়ারের পিঠে এক হাত রেখে বলে, মামলায় তো অনেক ঝামেলা পোয়াতে হয়– ছোটাছুটি, দৌড়াদৌড়ি আছে– দুশ্চিন্তা আছে– তোমার শরীরে কুলাবে, বলো ?

তাহলে জমিটা ছেড়ে দেবো ? নাকি ওদের দাবি মতো সত্তর/আশি হাজার টাকা আবার ঐ জমিতে ঢালবো ?

বীথি সঙ্গে সঙ্গে রায়হানের কথার জবাব দিতে পারে না। তার চিন্তা হয়, কী বলবে ? টাকাটা হয়তো রায়হান কষ্ট করে যোগাড় করতে পারবে। কারণ এখন অফিসে তার দাম বেশ বেড়েছে। চাইলে ব্যাংক থেকেও ধার টার নিতে পারবে। না পারলে তার গয়নাগুলো তো রয়েছেই, কিন্তু কথা যে টাকা যোগাড়ের নয়, সেটা সে বোঝে। এরই মধ্যে সে রায়হানের কাঁচাপাকা চুলের ওপর নজর রাখে একবার। হঠাৎ স্মরণ হয়, মানুষটা খুব তাড়াতাড়ি বুড়ো হয়ে যাচ্ছে– একেকদিন দেখতে এতো কাহিল লাগে যে বলার কথা নয়– এই মানুষকে নতুন করে ঝামেলায় জড়াতে দেওয়া যায় ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

তার মাথা ডাইনে বাঁয়ে নড়ে। না, উচিত নয়– তার শরীর আর মন একসঙ্গে বলে ওঠে।

তখন তার মুখ দিয়ে খুব অস্পষ্ট স্বরে কথা বের হয়। বলে, না অতো ঝামেলার মধ্যে যাওয়ার দরকার নেই। রঞ্জু তো নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে গেছে। দু'টা বছর দেখতে দেখতে কেটে যাবে। ততোদিনে মঞ্জুও দাঁড়িয়ে যাবে– ছোট ভাই টুকুর দায়িত্ব কি রঞ্জু নিতে পারবে না ? খুব পারবে।

বলতে বলতে কখন যে তার হাত রায়হানের মাথার ওপর গিয়ে পড়ে এবং চুল ছুঁয়ে ছুঁয়ে সামনে পেছনে যায় আর আসে– সে খেয়াল করতে পারে না। ঐ ঘনিষ্ঠ বেভুল সময়টা কতোক্ষণের, সে জানে না। কিন্তু কীভাবে যেন বহুকাল আগের একটা নিবিড় সময় যে ফিরে এসেছে তার কাছে, সেটা সে খুব ভালো করে টের পায়। আর সে জন্যই হাতটা সরিয়ে নেয় না। বরং আঙুল দিয়ে মানুষটার মাথার চুলে বিলি দিতে শুরু করে।

রায়হান হঠাৎ এক সময় মাথাটা ঝাঁকায় একবার। তারপরই উঠে দাঁড়ায়। বীথির ঘাড়ে হাত রেখে বলে, চলো খেতে দেবে, যা হবার হবে– আর ঝামেলা ভালো লাগে না। কিন্তু মুশকিল কী জানো ? যতোবার জমিটা ছেড়ে দেওয়ার কথা ভাবছি, ততোবারই নিজেকে অপমানিত মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে, কেউ যেন রাস্তার মোড়ে লোকজনের সামনে আমার গালে ঠাস ঠাস করে চড় মারছে।

বীথি পেছন থেকে রায়হানের ঘাড়ে হাত রেখে ঘরের ভেতরে নিয়ে আসে। পুরনো যে নিবিড় সময়টা আজ রাতে তার কাছে এসেছে সেটা সে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে রাখতে চায়। ঐ রকম অদ্ভুত একটা ঘোর লাগা অবস্থায় সে ছেলেদের খেতে ডাকে।

সবাইকে নিয়ে সে খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকোয় এবং সংসার গুছিয়ে রেখে বিছানায় যায়। অন্যান্য রাতের মতো বিছানার দুই প্রান্তে দু'জনে থাকে না– বীথিই থাকতে দেয় না এবং বহুকাল পরে সে স্বামীকে আকর্ষণ করে। শেষে প্রৌঢ় পুরুষের দীর্ঘ রমণ সে প্রাণভরে উপভোগ করে।

পরের দিনই সকালে বেলা ন'টার দিকে দরজায় বেল বেজে ওঠে। রায়হান দরজা খুললে সাদেক সাহেব আর হায়দার সাহেবকে দেখতে পায়। তাদের সঙ্গে আবার স্যুটকেস জাতীয় একটা জিনিস হাতে ঝোলানো অবস্থায় একটা লোককেও দাঁড়ানো দেখে। তাদের ঘরে এনে বসানো হলে এটা সেটা নানান কথা বলতে শুরু করে, দু'জনেই। যেমন রাজনৈতিক গোলমালটা বোধহয় চরমে উঠতে যাচ্ছে, কিংবা মিলিটারি রুল বলে তো এখন কিছু নেই, তবু কেন অপোজিশন মিলিটারি রুল চলছে বলে অভিযোগ তোলে। হায়দার বলে, এরশাদ লোকটার সবই ভালো, শুধু মেয়েছেলে দেখলে যে পাগল হয়ে যায়, সেটাই সমস্যা।

কিছুক্ষণ এই রকম কথা হয়। রায়হান বারবার ঘড়ির দিকে তাকায় আর তাই দেখে হায়দার হাসতে হাসতে বলেন, ভাইসাব ঘড়ির দিকে চাইয়া কুনো লাব নাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

আমরা যে কথা বলতে আইছি সেইটা শ্যাষ না করে যাবো না। যদি বাইরে কুনো কাম থাকে তো টেলিফোনে জানায় দেন যে, আপনার যাইতে দেরি হবে।

হায়দার ঐ পর্যন্তই বলে, কিন্তু মূল কথায় যায় না। মূল কথাটা পাড়েন সাদেক সাহেব। বলেন, আমরা আসছি আপনার ডিসিশনটা জানতে, জমিটা রাখার জন্য কি মামলা চালিয়ে যাবেন, না কিছু দিয়ে থুয়ে আপোস করবেন, নাকি একেবারে ছেড়ে দিবেন। যদি ছেড়ে দেন তাহলে আপনাকে দেড় লাখ টাকা দেওয়া হবে। তবে যদি আপোস করেন, তা হলে অবশ্য ভিন্ন কথা। ও ব্যাপারে লেনদেন কী হবে তা ফাইনালি আমরা বলতে পারবো না। আর যদি মামলা মোকদ্দমা চালিয়ে যেতে চান, তাহলে তো আমাদের কিছু করার নাই।

রায়হান সাদেক সাহেবের দিকে তাকিয়ে থাকে, দু'বছর আগে প্রথম যখন দেখে মানুষটাকে তখন অর্ধেকটা শরীর অবশ, মুখ দিয়ে কথা বের হয় না। খালি গোঙানির আওয়াজ বেরুতো গলা দিয়ে। তারপর গত বছর বন্যার সময় মীরপুরে যখন দেখেছিলো তখনও বগলের নিচে ক্র্যাচে ভর দিয়ে বাম পা খানা মাটিতে ঘষটে ঘষটে হাঁটতে দেখেছে। তবে হ্যাঁ, নিজের হিসেবটা ও বরাবর বুঝতো– যখন গোঙাতো তখন যেমন, তেমনি যখন খোঁড়াতো তখনও।

কি ভাই, আপনি কিছু বলেন।

সাদেক তাগিদ দিলে রায়হান হাসে। বলে, আপনি কী দাম নিয়েছেন আপনার জমি বিক্রির সময়?

তার প্রশ্নের উত্তর সাদেককে দিতে হয় না। দেয় হায়দার। বলে, ভাইসাব যে কী বলেন, দুইটা কেস কি এক হইল? উনির জমি তো বেদখল ছিলো না, জমিতে মামলাও ছিলো না, সবকিছু ছিলো কিলিয়ার– এখন আপনের জমিন যে কিনবো তারে তো দখলকারীদের সাথে টাকা-পয়সা দিয়া ফয়সালা করতে হবে– হবে না, বলেন?

অবুঝ কোনো ছেলেমানুষকে যেন বোঝাচ্ছে, লোকটার মুখে অমন হাসি দেখা যায় সাদেক ওদিকে ভ্রূ কুঁচকে রায়হানের মুখের দিকে তাকায়। তাকানোর রাগী ভঙ্গিটা দেখে মনে হয় লোকটা যেন তার গালে চড় মারতে চাইছে। রায়হান তখন হায়দারকে বলে, আপনি তো অনেক বেশি দামে বিক্রি করবেন, ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টদের কাছেও চড়া দাম হাঁকবেন। আর রিয়েল এস্টেটের জন্য যারা চাইবে, তাদের কাছেও– ঠিক কিনা সাদেক সাহেবই বলুন?

রায়হানের ঐ কথা শুনেই সম্ভবত সাদেকের মুখের চেহারা বদলে যায়। বলে, আমি কেমন করে জানবো, বলুন? ওঁরা কী করবেন না করবেন, তা কি বলেছেন কাউকে? আমাকে রিকোয়েস্ট করেছেন, আপনার জমিটা যেন ওদের কাছে বিক্রির ব্যবস্থা করে দিই– সেই রিকোয়েস্টের জন্য আমাকে আসতে হয়েছে।

ভদ্রলোক সাফাই গাওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু আসলে যে ডাহা মিথ্যা কথা বলছে তা তাঁর চোখমুখের ভাব দেখেই বোঝা যাচ্ছিলো। আরও বোধহয় কিছু বলতো সাদেক সাহেব। তার আগেই হায়দার বলে ওঠে, আহা অতো কথার কী দরকার ভাইসাব,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

আপনের কিছু বলার থাকলে বলেন। আমরা বুঝে দেখি, অন্য আলাপ পরে করা যাবে।

রায়হান হায়দারের মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, আমাকে দু'লাখ টাকা দিতে হবে।

হায়দার একটু যেন চমকায়, তারপর সাদেকের মুখের দিকে তাকিয়ে দুই মুহূর্ত কিছু যেন ভাবে। তারপর বলে ফেলে, ঠিক আছে। দুই লাখই পাবেন। সঙ্গের লোকটিকে ডেকে বলে, বসির, তুমি বায়নানামা টাইপ করো।

বলতে বলতে পকেট থেকে ৫০০ টাকা নোটের দুটা তাড়া বের করে। বলেন, আজ এক লাখ দিতেছি। এক সপ্তা পরে রেজেষ্টির সময় বাকি এক লাখ পাবেন। রায়হান বেকুব বনে যায় হায়দারকে অমনভাবে টাকা বের করতে দেখে।

ওদিকে ততোক্ষণে দলিল লেখক বসির মিয়া টাইপ মেশিনের বাক্সটা টেবিলে তুলে তার ডালা খুলে একখানা দলিলের কাগজের ওপর টপ টপ আওয়াজ তুলে টাইপের কাজ শুরু করে দেয় এবং আশ্চর্য, হায়দার দাগ নম্বর, খতিয়ান নম্বর, পরচা সব গড়গড় করে মুখস্থ বলে যেতে থাকে– সাবেক আর হাল দুই ধরনের নম্বরই সে বলে।

কাগজটা টাইপ হয়ে গেলে, রায়হানের হাতে দেয়া হয়। সাদেক বলেন, পড়ে দেখুন রায়হান সাহেব, ঠিক হয়েছে কি-না।

আর একজন যে সাক্ষী লাগে। হায়দার স্মরণ করিয়ে দেয়। বলে, ভাবিসাবরে ডাকেন ভাইসাব–

বীথি আড়ালে হলেও কাছাকাছিই ছিলো। শুধু সে নয়, মঞ্জুও তখন বাসায়। বীথির তখনও থ' হয়ে থাকার ভাবটা কাটে নি। এতো তাড়াহুড়ো করে এসব কী হচ্ছে, তার মাথায় কিছুই ঢুকছিলো না। কেবলই মনে হচ্ছিলো, কাজটা বোধহয় ঠিক হচ্ছে না। সে রীতিমতো দিশেহারা বোধ করছিলো। একবার ভাবে রায়হানকে ডেকে টাকাগুলো ফিরিয়ে দিতে বলে– ফের মনে হয়, না টাকা তো এক সময় না এক সময় নিতেই হবে– তাছাড়া জমিটা যখন এমনিতেই হাতছাড়া হতে বসেছে, তখন টাকাটা ফিরিয়ে দিয়ে কী লাভ, টাকার পরিমাণ তো একেবারে কম নয়। তবু মনের অস্বস্তি যায় না। এ সময় হঠাৎ তার রঞ্জুর কথা মনে হয়। সে ওরই মধ্যে রঞ্জুকে টেলিফোন করে। রঞ্জুকে পায় না তবে ওটি'র অন্য একজন ডাক্তার জানায়, ও এলে আপনার কথা বলবো, আপনি তো খালাম্মা– তাই না ?

বীথি ফোন নামিয়ে রেখে ফের দরজার পাশে দাঁড়ায়। আর ঠিক ঐ সময় ডাক। ঘরের ভিতরে ঢুকলে তিনজন লোকই উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান দেখায়– সালামও দেয় বেশ বিনয়ের সঙ্গে। সাদেক সাহেব হাসতে হাসতে বলেন, আমার নাম তো শুনেছেন, আমি সাদেক, আমার ওয়াইফকে আপনি হাসপাতালে দেখতে গিয়েছিলেন।

বীথি অল্প হাসে। তারপর জিজ্ঞাসা করে, উনি এখন কেমন আছেন ?

কেমন আর থাকবে বলেন, ক্যানসারের রোগী, বুঝেনই তো, কখন যায়, তারই অপেক্ষা আর কি। তবে দু'দিন ধরে একটু ভালো। আপনার কথা সেদিন খুব বলছিলো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

সবাইকে– তা যাক ওসব কথা। সাদেক প্রসঙ্গ বদলে ফেলেন। বলেন, আপনাকে শেষ পর্যন্ত টেনে আনতে হলো, রায়হান ভাইয়ের বোধহয় ইচ্ছা ছিলো না, তবু।

বীথি গম্ভীর হয়ে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর বলে, আপনারা কাজটা কেন তাড়াহুড়ো করে করছেন, বুঝতে পারছি না। আমাদের একটু চিন্তাভাবনা করার সময় কেন দিলেন না বলুন তো?

আর ঐ সব কথা বলে লাভ নাই ম্যাডাম, হায়দার সাহেব দাঁত বের করে হাসতে হাসতে বলেন, ভাইসাব বায়নার টাকা নিয়া নিছেন। এখন শুধু নাম সইটা বাকি। আপনি শুধু সাক্ষী রইলেন, আর কিছু না।

বলতে বলতে বীথির দিকে কাগজখানা এগিয়ে দিলে বীথি সেটা হাতে নিয়ে চোখ বুলাতে আরম্ভ করে। আর ঠিক ঐ মুহূর্তে মঞ্জুর ডাক– আম্মা ভাইয়ার ফোন, শিগগির আসুন।

বীথি উঠে টেলিফোন ধরতে যায়। প্রথমেই সে খবরটা রঞ্জুকে জানায়। বলে এতো তাড়াহুড়ো কেন করছে বুঝতে পারছি না। শেষে তোর আব্বা বিপদে না পড়ে যায়। তুই একবার আসতে পারবি?

রঞ্জু তখন বলে, না না পারবো না– আপনি যখন টেলিফোন করেন, তখন আমি মিসেস সাদেকের কেবিনে ছিলাম, সেই জন্য আমাকে পাননি। উনি অল্প কিছুক্ষণ আগে মারা গেছেন।

সেকি!

বীথির মুখ দিয়ে কথা বেরুতে চায় না। তবু বলে, মহিলা জীবনে খুব কষ্ট পাচ্ছিলেন, ওঁর জন্য ভালোই হলো। বীথি ছেলেকে বলে। পারলে একবার বাসায় আসিস।

টেলিফোন নামিয়ে রেখে বসার ঘরে ফিরে এসে দেখে, সাদেক আর হায়দার খুব জোর আলাপ জুড়ে দিয়েছেন। থেকে থেকে হেসে উঠছেন– চোখে মুখে খুশি যেন ছলকে ছলকে উঠছে। বীথি একনজর দু'জনকে দেখে সোফায় বসে টেবিলের ওপর রাখা কাগজখানাতে সই করে। লক্ষ্য করে ইতিমধ্যে রায়হানেরও সই দেয়া হয়ে গেছে। সই দেয়া হয়ে গেলে সে উঠে দাঁড়ায়। তারপর সাদেক সাহেবের দিকে তাকিয়ে বলে, আপনার এখন বাসায় যাওয়া দরকার। কথাটা বলেই সে রায়হানের দিকে তাকিয়ে বলে, চলো, আমাদেরকেও এখন বেরুতে হবে। মেরি মারা গেছে।

কে মারা গেছে, কে? কার কথা বললেন? হায়দার আগ্রহী হয়ে জানতে চাইলে বীথি সাদেক সাহেবের দিকে তাকিয়ে বলে, ওঁর স্ত্রী।

সে কি? হায়দার অবাক হয়ে সাদেকের দিকে তাকান। তারপর বলেন, হঠাৎ এভাবে–

হায়দার কথা শেষ করতে পারেন না।

সাদেক চারদিকে তাকিয়ে কী দেখেন তিনিই জানেন। ঐ পরিস্থিতিতে খুব যে অপ্রস্তুত হন তা নয়। আমতা আমতা করে শুধু বলেন, ক্যানসারের রোগী, বুঝতেই তো পারেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ভদ্রলোক কথা বলতে বলতে একটুখানি নিঃশব্দে হাসেনও। রায়হানের অতিথি বিদায় করার সৌজন্যটুকু পর্যন্ত থাকে না। বীথি ফের বলে, চলো আমরা যাই।

রায়হান থ' হয়ে তাকিয়ে থাকে সাদেক সাহেবের দিকে। তার কাছে অবিশ্বাস্য লাগে, স্ত্রী মারা যাবার খবর শুনেও মানুষটা অমন ভাবে হেসে হেসে কথা বলছে কীভাবে। দেখে, খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে সাদেক বাঁ পা খানা টেনে টেনে হেঁটে বসার ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ির মুখে ঘুরে দাঁড়ালো। তারপর হাত তুলে বিদায় নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে আরম্ভ করলো।

খুব যে তাড়া আছে তার ভাবে ভঙ্গিতে তা মনে হলো না। বরং হায়দার সাহেবকেই ব্যস্ত হয়ে উঠতে দেখা গেলো। তাকেই বলতে শোনা গেলো, এখন কই যাইবেন ? হাসপাতাল, না বাসায় ?

সাদেক কি জবাব দিলো শোনা গেলেও স্পষ্ট বোঝা গেলো না। দু'জনে ততোক্ষণে বোধহয় সিঁড়ির শেষ ধাপে নেমে গেছে।

রায়হানের হাতে তখনও টাকার তাড়া দুটো ধরা। ঐ অবস্থাতেই সে বীথিকে জিজ্ঞেস করে, তুমি কি এখনই বেরুবে ? হাসপাতালে যাবে, না ওদের বাসায় ?

স্বামীর চোখেমুখে খানিকটা দিশেহারা ভাব আর হাতে ধরা টাকার বান্ডিল দুটো তার চোখে পড়ে। তাতে মনের ভিতরে মৃত্যু সংবাদের ভার চেপে থাকা সত্ত্বেও স্বামীর হাবভাব দেখে তার হাসি পেয়ে যায়। অদ্ভুত মানুষ। হাতে যে এতোগুলো টাকা ধরা রয়েছে সেই হুঁশ হারিয়ে বসে আছে। সে হুঁশিয়ার না করে পারে না। বলে, হাতের ওগুলো কি হাতেই ধরে থাকবে, না কি কোথাও রাখবে। রায়হানের হুঁশ হয় এবং সে দু'হাতে ধরা নোটের বান্ডিল দুটো চোখের সামনে তুলে ধরে দু'মুহূর্ত কী যেন চিন্তা করে, তারপর পাল্টা জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা বলো তো, এগুলো এখন কোথায় রাখা যায় ? বাসায় রাখবো, না কি ব্যাংকে রেখে আসবো।

প্রশ্নটা করার সময় স্ত্রীর চোখের ওপর চোখ পড়ে তার। আর তাতেই কি না কে জানে, সে বলে, আজ বরং বাসাতেই থাক, কি বলো ? কাল সকালে না হয় ব্যাংকে রেখে আসবো।

আবার কাল কেন ? বীথি আপত্তি জানায়। বলে, কতোক্ষণ লাগবে ব্যাংকে রেখে আসতে ? মঞ্জুকে সঙ্গে নিয়ে যাও, এখনই রেখে এসো।

কিন্তু তুমি যে বলছিলে মেরিদের বাসায় যাবে ?

হ্যাঁ যাবো, বীথি জানায়। বলে ব্যাংক থেকে ফিরে আসতে তোমার আর কতোক্ষণ লাগবে। এখন বারোটা, একটা দেড়টার দিকে রওনা হয়ে যাবো।

মঞ্জুকে ডাকা হলে দেখা গেলো সে যেন তৈরি হয়েই ছিলো। চুপচাপ বাপের সঙ্গে রিকশায় উঠলো। রায়হান প্রথমটা খেয়াল করে নি। রিকশা গলির মুখে পৌঁছলে খেয়াল করলো ছেলে যেন একটু বেশি বেশি গম্ভীর। বড় রাস্তার মোড়ে ট্রাফিক জ্যামের মধ্যে রিকশাটা আটকে গেলে মঞ্জু বলে উঠলো, আব্বা কাজটা কিন্তু ঠিক হলো না।

রায়হান প্রথমে বুঝতে পারে না। ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, কোন কাজের কথা বলছো ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

জমিটা ওভাবে ছেড়ে দেয়ার কথা বলছি আমি– কিছু বাজে লোক, চোর গুণ্ডা, ওরা থ্রেট করছিলো বলে, আমরা ভয় পেয়ে জমিটা ছেড়ে দেবো ? এটা কি ঠিক ?

রায়হানের বিরক্তি লাগে ছেলের মুখে অমন কথা শুনে। তার এই ছেলেটা একটু যেন বেশি বোঝে, সব কিছুতেই ওর ডেঁপোমি। সে পাল্টা জানতে চায়– জমিটা ছেড়ে না দিয়ে কী করার ছিলো, কতোদিন মামলা চালাতাম ? মামলা চালাতে খরচ লাগে না ? মামলা জিতলেও যে জমির দখল পাওয়া যেতো তার তো কোনো গ্যারান্টি ছিলো না। বাপের মুখে বিরক্তি দেখে মঞ্জু নজর রাস্তার পাশে সরিয়ে নেয়, কেমন টানটান ঘাড় বাঁকা ভাবটা তার চোখেমুখে থেকেই যায়। গোঁ ধরা আড়ষ্ট ভঙ্গিটা তার বসার মধ্যেও থাকে।

রিকশা গুলিস্তানের কাছাকাছি হলে মঞ্জুর মুখ দিয়ে ফের কথা বেরিয়ে আসে। বলে, আমরা তো মাস্তানদের দাপট দেখে ভয় পেয়ে গেলাম। কিন্তু ওদের দাপট আর কয়দিন থাকতো বলো ? এই সরকার যতোদিন আছে, ততোদিনই তো। তুমি তো ভালো করে জানো যে এদের আয়ু আর বেশিদিন নেই, খুব শিগগির এরা উল্টো পড়বে, তখন ঐসব টাইগার কাসেম আর লায়ন হাসেমদের খুঁজে পাওয়া যাবে ? আরও কিছুদিন দেরি কি আমরা করতে পারতাম না ?

রায়হান ছেলের মুখের দিকে তাকায় আর মনে মনে হিসাব করে, কতো যেন বয়স হলো মঞ্জুর ? উনিশ, নাকি কুড়ি ? উনসত্তরের নভেম্বরে ওর জন্ম, রায়হানের খুব স্পষ্ট মনে আছে। বঙ্গোপসাগরের শেল্টাল এরিয়া জুড়ে সেই ভয়ঙ্কর টর্নেডোর কথা কে ভুলতে পারে, ঢাকা শহরের ওপর দিয়েও থেমে থেমে দমকা বাতাস ঝাপটা মেরে যাচ্ছিলো। বীথিকে নিয়ে হাসপাতালে যাবার সময় তার জামাকাপড় একেবারে ভিজে গিয়েছিলো। বেবিট্যাক্সির মাথার ওপরকার প্লাস্টিকের ছাউনিটা ছিলো ছেঁড়াফাড়া। বীথি ব্যথায় কঁকাতে কঁকাতেই বলছিলো, তুমি যে ভিজে যাচ্ছো। আহা, কোথাও থামতে বলো না।

রায়হানের সব একসঙ্গে মনে পড়ে যায়। ঐ রকম দুর্যোগের দিনে যে ছেলের জন্ম তার জন্মদিনের কথা কি কোনো মা বাবা ভুলতে পারে ? '৬৮/৬৯-এর আইয়ুব-মোনেম শাসন উচ্ছেদ করার উত্তেজনা থিতিয়ে আসছে তখন। ভোট জয় করার নতুন উত্তেজনা তখন জাগিয়ে তোলা হচ্ছে– ওর মধ্যেও যে গুণ্ডা মাস্তানরা দিব্যি ঠাঁই করে নিচ্ছিলো, সেটা তো দেখেও দেখে নি কেউ। মোনেম খানের দল ছেড়ে অল্প কয়েকজন বাদে প্রায় সবাই-ই তো অন্যান্য দলে ঠাঁই পেয়ে গিয়েছিলো।

ঐ ঘটনার কথা বলতে গিয়েও রায়হান বলে না। কারণ বললেও ছেলে বুঝবে না অথবা বুঝতে চাইবে না। '৭১/৭২ সালে ওর বুঝবার বয়স হয় নি। '৭৪/৭৫-এর ঘটনা কিছু কিছু মনে থাকতে পারে। সেই ছেলেকে কীভাবে বোঝাবে যে গুণ্ডা মস্তানদের বরাবর মাথায় তোলা হয়েছে– কবে যে শুরু হয়েছিলো ঠিক মতো বলা যায় না, কিন্তু প্রক্রিয়াটা বরাবর ছিলো– ওটা বন্ধ হয় নি কখনও, বন্ধ করা সম্ভব ছিলো না– এই খবরটা কি ছেলে জানে ? কেউ কি ওকে বলেছে যে গুণ্ডা মাস্তানদের হাতে না রাখলে ক্ষমতায় যাওয়া যায় না ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

মনে ইতস্ততঃ ভাব থাকলেও শেষ পর্যন্ত রায়হান ছেলেকে জানায় ব্যাপারটা। বলে, সরকার বদল হলেই যে তাদের সাঙ্গোপাঙ্গো গুন্ডা মাস্তানরা পালিয়ে যাবে, এমন ধারণা তোমার কেন হচ্ছে ? ওদের পালাবার দরকারই হবে না। কারণ নতুন যারা ক্ষমতায় আসবে তারাও ঐ একই গুণ্ডা মাস্তানদের আদর করে নিজেদের দলে ভিড়াবে। তুমি দেখো নি, কিংবা দেখলেও হয়তো বোঝো নি যে, যারা ডেমোক্রেসি ধ্বংস করে ডেমোক্রেসির জন্য চিৎকার করতো রাস্তায় রাস্তায়, তারাই পরে প্রতিপক্ষের দিকে গুণ্ডা লেলিয়ে দিয়েছে– কোনো কোনো জায়গায় নিজেরাই হামলা করেছে লাঠিসোটা নিয়ে। ক্রিমিনালাইজেশন অফ পলিটিক্স বলে একটা কথা আছে। আমাদের দেশে ঐ ক্রিমিনালাইজেশনের প্রসেসটা চালু করেছে, শুরু করেছে, তারাই– সুতরাং যা ভাবছো তোমরা, তা হবে না, গুণ্ডা মাস্তানরা ঠিকই থেকে যাবে, চাই কি তাদের দাপট আরও বেড়ে যেতে পারে।

বাবার মুখে অমন ব্যাখ্যা শোনার পর মঞ্জু নিজের অভিজ্ঞতার সঙ্গে কথাগুলো মেলায়– এসব যতোই মেলায় ততোই মনের ক্ষোভ কাটতে থাকে তার। কারণ রাখির সর্বনাশ করেছিলো যে আবু সাবু তাদের আগে একসময় জাতীয় ছাত্র সমাজের ছেলেদের সঙ্গে ঘুরতে দেখতো। এখন তো দেখেছে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের মিছিলে সামনের দিকে থাকে। টাটা আর বাবুলকে তো ক'দিন আগেও সংগ্রামী ছাত্র জোটের মিছিলে দেখেছে। আব্বা যা বললেন, অমন কথা তো হামিদকেও সে বলতে শুনেছে। মঞ্জুর মন আর শরীরে যে টানটান ভাবটা ছিলো সেটা ক্রমে সহজ হয়ে আসে।

এদিকে রঞ্জু বাসায় এসে দেখে মা একাকী জানালার পাশে দাঁড়িয়ে আছে।

ছেলেকে দেখতে পেয়ে বীথির মনের ওপরকার চেপে থাকা ভাবটা সরে যায়। একটু অবাক হয়েই বলে, কী ব্যাপার, তুই বললি আসতে পারবি না। আবার যে এসে গেলি ?

রঞ্জু মায়ের প্রশ্নের জবাব না দিয়ে পাল্টা জিজ্ঞেস করে, ওরা চলে গেছে ?

হ্যাঁ।

দাম টাম ঠিক ? টাকা দিয়েছে ?

হ্যাঁ, এই তো ঘন্টাখানেক হলো, বায়নানামায় সই নিলো, তারপর এক লাখ টাকা দিয়ে গেলো, তোর আব্বা ঐ টাকা নিয়ে ব্যাংকে গেছেন।

দলিল কি আগে থেকে লেখা ছিলো ওদের কাছে ?

না, বীথি বলতে বলতে হেসে ওঠে। বলে, ডীড রাইটার তো নয়, দেখলাম ডীড টাইপিস্ট। লোকটা সঙ্গে করে টাইপ মেশিন নিয়ে এসেছিলো। মিনিট পাঁচেক বোধ হয় লাগলো দলিলটা টাইপ করতে।

সঙ্গে আরও লোক ছিলো ?

হ্যাঁ, তোকে বলি নি ? ওমা, সাদেক সাহেব প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বসে ছিলেন পাশে।

সাদেক সাহেব! রঞ্জুর মনে বোধহয় খটকা লাগে। সে জিজ্ঞেস করে, কোন সাদেক সাহেব আম্মা ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

আরে ঐ লোকই। যার কথা তোর মনে হয়েছে।

উনি এখানে ছিলেন, আর ওদিকে ওরা খুঁজে খুঁজে হয়রান। সকাল থেকেই ওঁকে খোঁজা হচ্ছে, সকাল থেকেই মহিলার শ্বাসকষ্ট আরম্ভ হয়ে যায়– ভদ্রলোক নাকি দু'দিন ধরে স্ত্রীকে দেখতে যান নি।

বলতে বলতে থেমে গিয়ে দু'মুহূর্ত কিছু যেন ভাবে রঞ্জু। তারপর নিজেকে বলার মতো করে বলে, অমন একটা অদ্ভুত আর এ্যাবনরমাল লোকের সঙ্গে আব্বার কীভাবে যে যোগাযোগ হয়েছিলো, ভাবতে অবাক লাগে।

রঞ্জু অনেকক্ষণ মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে থাকে। বীথি ছেলের ঘাড়ে হাত রেখে বলে, তোর আব্বার বোধহয় মন খারাপ, জমিটা বিক্রি করার একটুও ইচ্ছে ছিলো না ওঁর।

মায়ের মুখোমুখি তাকায় রঞ্জু। বলে, তোমার বুঝি খুব ইচ্ছে ছিলো ? রঞ্জু মায়ের বুক ভাঙা নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পায়।

বীথি বলে, মানুষ নিজের ফ্যামিলির জন্য পাকাপোক্ত একটা ঠাঁই চায়– আমিই তোর আব্বাকে বলতাম। ওঁর জমি কেনার কি বাড়ি বানাবার ব্যাপারে আগ্রহ দেখতাম না। ওঁদের এক সময় বহু জায়গা-জমি ছিলো। পার্টিশনের ধাক্কায় সব কপালের বাইরে চলে গেছে। সেই জন্যই বোধহয় বাড়িঘর কিংবা জমি জমার ব্যাপারে ওঁর আগ্রহ ছিলো না– আমিই জোর করতাম। আর সেই জন্যই জমিটা কেনা হয়েছিলো। শেষে এভাবে জমিটা ছেড়ে দিতে হলো– মন খারাপ না হয়ে পারে ?

জমি বিক্রির ব্যাপারে আপনার সঙ্গে আলাপ হয় নি ?

ছেলের প্রশ্নের জবাবে বীথি জানায়, হ্যাঁ আমাকে তো খুলে বলেছেন। কেন জমিটা রাখা যাবে না– আমি ওসব শুনি নি। আমার খারাপ লাগছিলো। অমন অসুস্থ শরীর নিয়ে মামলা মোকদ্দমার ঝামেলা কতোদিন পোয়াবেন ?

মা-ছেলেতে কথা হতে হতেই মঞ্জুকে ফিরে আসতে দেখা যায়। ওকে একা আসতে দেখে বীথির বুকের ভিতরটা ধড়াস করে ওঠে। সে দূর থেকেই চিৎকার করে। কি খবর ? তোর আব্বা কোথায় ?

মঞ্জু সঙ্গে সঙ্গে জবাব না দিয়ে চুপচাপ উপরে উঠে আসে। তারপর বলে, ব্যাংকে আমানউল্লাহ সাহেবের সঙ্গে দেখা, দু'জনে মিলে কী যেন কথা হলো, তারপর ভদ্রলোকের সঙ্গে আব্বা অফিসে চলে গেলেন।

মায়ের প্রশ্নের জবাব দিয়ে সে বড় ভাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, তুমি ভার্সিটি এলাকার খবর জানো ?

রঞ্জু জবাব দিতে পারে না, বরং উল্টো জিজ্ঞেস করে, কেন, ওদিকে আজ কিছু হয়েছে ?

একজন ছাত্র নাকি পুলিশের গুলিতে মারা গেছে ?

ভাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রঞ্জু পাল্টা জিজ্ঞেস করে, ছাত্রকে পুলিশ গুলি করে মেরেছে, এটা কি একটা ঘটনা আজকাল ?

ছোট ভাইয়ের মুখের দিকে নজর রেখে সে উঠে দাঁড়ায়। মাকে ডেকে বলে, আম্মা, আমি এখন যাই– একজনকে আমার জায়গায় ডিউটিতে লাগিয়ে রেখে এসেছি,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

আমাকে খুঁজতে পারে। আর যদি সত্যি সত্যি ইউনিভার্সিটি এলাকায় গোলাগুলি হয়ে কেউ মারা গিয়ে থাকে, তাহলে তো স্যার আমাকে নিশ্চয়ই খুঁজবেন।

মঞ্জুও বড় ভাইয়ের সঙ্গে বের হয়। বলে, তোর সঙ্গে আমিও যাবো। কার্জন হলে আমার দরকার আছে।

তুই আবার ওদিকে আজ কেন যাবি? বীথি ছেলের মুখের দিকে সরাসরি তাকায়। বলে, তোর ক্লাস হচ্ছে না। তাছাড়া নিজেই বললি, ওদিকে গোলাগুলি হয়েছে– আজ ওদিকে যাওয়ার কি দরকার?

না আম্মা, আমার দরকার আছে, আর গোলমালটা তো আর্টস বিল্ডিং-এ, আমাদের কার্জন হলে তো কিছু হচ্ছে না। বীথি যথেষ্ট জোরে বাধা দিতে পারে না, দুই ছেলেই এক সঙ্গে বেরিয়ে যায়। তার মনের ভিতরে খটকাটা লেগেই রয়েছে। রায়হানকে সেই একরকম জোর করে ব্যাংকে পাঠিয়েছে, ফিরে এলে দু'জনে মেরিদের বাসায় যাওয়ার কথা, অথচ মানুষটা এভাবে অফিসে চলে গেলো? তার বিশ্বাস হতে চায় না। কারণ মেরিদের বাসায় যাওয়ার তাগিদটা তার দিক থেকেও কম ছিলো না। সে তো টাকাগুলো বাসায় রেখেই রওনা হতে চাইছিলো। তাহলে কি মানুষটার মনের ভিতরে গভীর শোক জেগে উঠেছে? তাই অফিস যাবার ছুতো দেখিয়ে একা থাকতে চায়?

মনের ভিতরে খটকাটা বেশ নাড়াচড়া শুরু করে দেয়। নানান কথা বীথির মনে ঘোঁট পাকাতে থাকে। একেকবার মেরির স্বামী সাদেক সাহেবের কথা মনে হয় আর অবাক লাগে তার দুনিয়ায় এমন মানুষও তাহলে আছে, নিজের স্ত্রী মরতে বসেছে অথচ স্বামীটি জমি বেচা-কেনার দালালি করে বেড়াচ্ছেন। মানুষ কীভাবে এমন আচরণ করতে পারে, তার মাথায় ঢোকে না। পাশাপাশি যখন রায়হানের কথা মনে হয়, তখন সে স্বস্তি বোধ করে। যাক, রায়হানের যতো দোষই থাক, সে অন্তত সাদেকের মতো অমানুষ নয়। তার মন আছে, মায়ামমতা স্নেহ ভালোবাসা আছে, সমবেদনা সহানুভূতি আছে। সে তো নিজের চোখে স্পষ্ট দেখলো আজ, মেরি মারা যাবার খবরটা শোনার পর থেকে কেমন দিশেহারা হয়ে গিয়েছিলো মানুষটা।

বীথির চিন্তা থমকে দাঁড়ায়। হ্যাঁ, দিশেহারা হতে সে দেখেছে। কিন্তু সেটা কি শুধুই সমবেদনা আর সহানুভূতির কারণে? নাকি আরও অন্য কিছু ছিলো রায়হানের মনে? সে কি এখনও মেরিকে ভালোবাসে? আর সেজন্যেই সে অমন দিশেহারা হয়ে গিয়েছিলো? আর যখন সুযোগ পেলো, তখন একাকী হওয়ার জন্য অফিস যাবার ছুতোয় স্ত্রীকে এড়িয়ে গেলো?

চিন্তাটা খুব জোরালো হয় না। কিন্তু তার মনের ভিতর থেকেই কেউ যেন বলতে থাকে, হতে পারে না কি এমন? এমন ঘটনা কি অসম্ভব? এই ধরনের চিন্তা মনে আসছে শুধু মেয়েলি ঈর্ষা থেকে?

মনের ভিতরে অমন প্রশ্ন ঘোঁট পাকাতে থাকলে সে এক সময় নিজের মনকে শাসন করার জন্য রায়হানের অফিসে ফোন করে। রায়হানকে পায় না, তবে তাকে জানানো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

হয় যে, রায়হান স্যার এমডি'র রুমে জরুরী মিটিং-এ বসেছেন, এখন কথা বলা যাবে না, মেসেজ থাকলে বলুন, আমরা তাঁকে জানিয়ে দেবো, নইলে পরে কল করুন।

খবরটা জানার পর বীথির বুকের ভিতর থেকে লম্বা নিঃশ্বাস বের হয়ে আসে। আর একই সঙ্গে তার ভিতরকার বীথি ধিক্কার দিতে থাকে ছি বীথি, ছি! তুই এতো নিচু কথা চিন্তা করিস ? রায়হান তো তোর কাছে শেষ পর্যন্ত কিছুই লুকোয় নি, তবু তুই তাকে সন্দেহ করিস! ছি!

বত্রিশ

রায়হানের মনের ভিতরে মেরির চিন্তাটা ক্রমেই জেঁকে বসছিলো– খুব খারাপ লাগছিলো তার। কিছুতেই ভুলতে পারছিলো না যে মেরি একটা সুস্থ আর স্বাভাবিক জীবন চেয়েছিলো, আর সেজন্যে সে তার মতো একজন সংসারী মানুষকে অবলম্বন হিসাবে ধরতে চেয়েছিলো– ভালোও বেসেছিলো তাকে। যতোবার কথাটা মনে হয়, ততোবার বুকের ভিতরে অদ্ভুত ধরনের একটা কষ্ট হয়। চেষ্টা করেও মগজ থেকে চিন্তাটাকে সরিয়ে দিতে পারে না। মেরিকে যে অনেক পুরুষ মানুষের কাছে পাঠানো হয়েছিলো, তার সেক্স-এর চাহিদা বেশি ছিলো, সে সাদেকের অনেক কাজ করে দিয়েছে নিজের শরীর ব্যবহার করে– এসব কথা সে স্মরণ করে, তবু কাজ হয় না– বুকের ভিতরকার কষ্টটা থেকেই যায়। ওরই মধ্যে আবার কাগজের পলিসি কী হবে তাই নিয়ে পরামর্শ !

অফিসে পৌছেই শুনলো অফিসের লোকদের হারুন সাহেব জানিয়ে রেখেছেন রায়হান অফিসে এলেই যেন তাঁকে খবর দেওয়া হয়।

খবরটা দেওয়ার সময় আমানউল্লাহ সাহেব রায়হানের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকবার চেষ্টা করেন। বলেন, আপনাকে খুব খুঁজছিলেন, আমার ওপর হুকুম ছিলো আপনাকে বাসা থেকে নিয়ে আসার।

হারুন সাহেবের কামরায় ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে পিয়নকে দরজা বন্ধ করে বাইরে দাঁড়াতে বলা হয়। হারুন সাহেব হুকুম দেন, কাউকে ঢুকতে দেবে না, যতো দরকারই হোক।

ভদ্রলোককে বেশ চিন্তিত মনে হয়, মুখে চোখে গম্ভীর ভাব। আমানউল্লাহ পরিবেশটা হালকা করার জন্য বললেন, ওঁর বাসা পর্যন্ত যেতে হয় নি। ব্যাংকে গিয়েছিলাম, ওখানে দেখা হয়ে গেলো, ব্যস ধরে নিয়ে এলাম।

হারুন সাহেব, শুধু বললেন, হুঁ– থ্যাংক য়্যু। তারপর আসল কথা পাড়লেন। বললেন, আমরা তো সরকারকে অন্ধভাবে সমর্থন কখনও করি নি, তারপরও আমরা আগের পজিশন থেকে সরে এসেছি– এখন আমরা নিউট্রালিটি মেনটেইন করে চলেছি– সরকারের কী অবস্থা তা তো বুঝতেই পাচ্ছেন। এমনিতেই তো নানান ধরনের বাধা আর নিষেধের হুকুম আসে। এদিকে তো ঘটনার পর ঘটনা ঘটেই চলেছে। ছাত্রছাত্রীদের ওপর হামলার পর হামলা হচ্ছে, দুর্নীতির নানান কেচ্ছা শোনা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

যাচ্ছে আর মেয়ে মানুষ নিয়ে যা শুরু করেছেন প্রেসিডেন্ট তাতে তো বিদেশীদের কাছে মুখ দেখানোই যায় না। কোনো রকম প্রতিবাদ করতে দেয়া হয় না– কেউ কোনো রকম টু শব্দ করলেই মাস্তান বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ে, এমন অবস্থায় কি আমরা টোন ডাউন করে নিউট্রালিটি মেনটেইন করবো। না কি প্রতিবাদের ভাষা ব্যবহার করবো ? সরকার বিরোধী স্ট্যান্ড নেওয়াতে কিন্তু ঝুঁকি আছে, সেটাও মনে রাখতে হবে।

প্রায় যেন বক্তৃতা। হারুন সাহেবের কথা আরও আছে তা বোঝা যাচ্ছিল। কিন্তু তিনি থামলেন কেন, তা আন্দাজ করতে পারে না রায়হান। হারুন সাহেব তাঁর কথা থামিয়ে একবার এর মুখের দিকে, একবার ওর মুখের দিকে তাকান। মিনিট খানেক পর আমানউল্লাহ সাহেবের দিকে তাকিয়ে বলেন, আপনি কী বলেন ? সরকার বিরোধী স্ট্যাণ্ড কি আমরা নেবো ?

আমানউল্লাহ মাথা হেলিয়ে সামনের দেয়ালের দিকে নজর রেখে বলেন, এ ব্যাপারে আমি আর কী বলবো– তবে আমরা যে পলিসিই নিই, ভবিষ্যতের কথা ভেবে সেটা নিতে হবে। এখন তো সরকারী বিজ্ঞাপন পাওয়া যাচ্ছে, আমাদের পলিসি বদল হলে কি সেটা পাওয়া যাবে ? যদি না পাওয়া যায়, তাহলে টিকে থাকার জন্য অন্য কি ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে, সেটাও ভেবে দেখা দরকার। আমাদের কাগজের পলিসি বদলাতে হলে আরও স্টাডি করা দরকার, এ সরকারকে ফেলে দেয়ার জন্য কাজ করলাম, বেশ ঠিক আছে, কিন্তু পরে যে সরকার আসবে তারা যে এখনকার যারা আছে, তাদের চাইতেও খারাপ হবে না, তা কি বলা যাচ্ছে ?

হারুন সাহেব হাসেন। বলেন, ভাই সাহেব, আপনি সিনিয়ার মানুষ, আপনাকে কী বলি, তবে আপনি কিন্তু খোলাখুলি বলছেন না আপনার মতটা কী, সরকারের বিপক্ষে আমরা লিখবো কিনা ? একটু থেমে ফের বলেন, দেখুন তো সম্পাদক সাহেবের কাণ্ডটা। সেই যে এক মাসের ছুটি নিয়ে গেলেন, তারপর আর ফিরবার নাম নেই, খবর দিয়েছেন, উনি এখন এ্যারিজোনায় মরুভূমি ভ্রমণের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করছেন, চিন্তা করুন। অভিজ্ঞ মানুষ, দেশে এখন অস্থির অবস্থা, ওঁর মতামত কতো কাজে লাগতো, তো উনিই রইলেন বাইরে।

বলতে বলতে রায়হানের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেন, রায়হান ভাই, আপনার মত শুনতে চাই।

রায়হানের মনে তখন বেশ বিরক্তি আর ক্ষোভ। এই রকম পরামর্শ করার জন্য তাকে ধরে আনা হয়েছে– এ ধরনের আলোচনা তো চা খেতে খেতেও হতে পারে। সদ্য মারা যাওয়া একজন মানুষের ছেলেমেয়েদের সান্ত্বনা দিতে যাওয়ার কথা তার অথচ এদিকে শুরু হয়েছে খাজুরা আলাপ। তার একেকবার মনে হচ্ছিলো বলে দেয় যে কাগজের মালিক লাভ-লোকসানের হিসাব করেই ঠিক করবে সরকারের বিরুদ্ধে লিখবে না পক্ষে লিখবে– লাভ কিসে, সেটা দেখেই পলিসি তৈরি হবে– খামোকা আলগা কথা বলে কোনো লাভ আছে ?

কথাটা সে বলতে চেয়েও পুরো বলে না। শুধু জানায়, আমার মত যদি জানতে চান, তাহলে আমি প্রফেশনালি কথা বলবো, সরকার পছন্দ করুক বা না করুক, আমি জার্নালিস্ট, যা দেখছি তাই আমি লিখবো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বাহ্ সেজন্য যদি কাগজ বন্ধ হয়ে যায় তাহলে লিখবেনটা কোথায়? আমানউল্লাহ সাহেব হাসতে হাসতে বলেন, ওগুলো সব নীতিবাক্য, বুঝলেন? আসল জার্নালিজম তা নয়, আপনাকে টিকে থেকে তারপর লড়াই করতে হবে।

রায়হান হাসে। বলে, কি জানি, হয়তো হবে, ভবে যা বুঝি তা হলো, সাংবাদিক হিসাবে আমার একটাই দায় আর দায়িত্ব আর সেটা পিপলকে সত্যি কথাটা জানানো।

আপনার কি মনে হয়, খবরের কাগজ সব সময় সত্যি কথা বলে? বলতে পারে? আমানউল্লাহ মুখোমুখি তাকিয়ে প্রশ্নটা তোলেন।

না বলে না, রায়হান স্বীকার করে। বলে, সব সময় বলতে পারে না, কিন্তু চেষ্টাটা থাকে– যতোরকম সেন্সরই থাক, সাংবাদিকরা কোনো না কোনোভাবে সত্যি কথাটা বলবার চেষ্টা করে। এ দেশেই এর বহু উদাহরণ আছে।

ব্যাপারটা তর্কাতর্কির দিকে যাতে না যায় সেজন্যে হারুন সাহেব হাত তুলে দু'জনকেই থামিয়ে দেন। বলেন, এখানে তর্ক করার জন্য আমরা বসি নি। একটা সমস্যা সামনে আসছে বলেই আপনাদের ডেকেছি– শুনলাম কড়া ধরনের সেন্সরশিপ আসছে। অপোজিশন যদি আন্দোলন ব্যাপক করতে চায়, তাহলে এমারজেন্সি পর্যন্ত দিয়ে দিতে পারে। আজকের কথাই ধরুন না কেন, পুলিশ ছাত্রদের মিছিলের ওপর গুলি চালিয়ে একটি ছেলেকে মেরে ফেলেছে, কিন্তু ডেডবডিটা তুলে নিতে পারে নি, ছাত্ররা লাশ তুলে নিয়ে কোথায় যে লুকিয়ে রেখেছে তা খুঁজে পাচ্ছে না পুলিশ; তাই বারবার করে ফোন আসছে, আমাদের রিপোর্টার লাশটা দেখেছে কি না। আমরা তো জানি, লাশটা সে নিজে দেখে তারপর রিপোর্ট লিখছে কিন্তু আমরা টেলিফোনে ঐ প্রশ্নের জবাবে বারবার না বলছি, কারণ যদি স্বীকার করি যে লাশটা রিপোর্টার দেখেছে, তাহলে জানতে চাইবে, কোথায় দেখেছে? আর সেটা যদি জানানো হয়, তাহলে ছাত্রদের পরের সব প্রোগ্রাম ভেস্তে যাবে। এখন বলুন, ঐ রিপোর্ট ছাপা হবে, নাকি হবে না? আমরা কী করবো, এমন ঘটনা ঘটতে থাকলে?

প্রশ্নটা করে হারুন সাহেব আমানউল্লাহ সাহেবের দিকে তাকান। আমানউল্লাহ আবার আড়চোখে রায়হানের দিকে দেখেন, কী দেখেন তিনিই জানেন।

পুলিশের গুলিতে ছাত্র মারা যাওয়ার খবরটা শোনার পর থেকে রায়হানের মনে একটা প্রশ্ন থেকে থেকেই মাথা তুলছিলো। সরকার কি আসলেই মারমুখী হয়ে উঠছে? কিন্তু কেন? এতো হঠাৎ করে কেন? নূর হোসেনকে মারবার পর যা ঘটে চলেছে তার জের তো এখনও কাটে নি– কিছু কি ইতিমধ্যে হয়েছে তাহলে ভেতরে ভেতরে? ছাত্রদের দিক থেকে কি বড় রকমের কিছু হতে যাচ্ছে বলে সরকারের আশঙ্কা? বড় আন্দোলনের তো একটাই শর্ত– ঐক্য হলেই তো বড় আন্দোলন হয়ে যায়– সেই ঐক্য কি হতে চলেছে? যদি সেটা হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে বিরোধী দলগুলোর ঐক্য হতে আর দেরি কেন হবে? সে আমানউল্লাহ সাহেবের মুখের দিকে পাল্টা তাকায়। এই তো কয়েকদিন আগেই আব্দুল্লাহর সঙ্গে কথা বলতে বলতে খুব জোর গলায় বলেছিলেন, ওসব ঐক্য টৈক্য হবে না, বুঝলেন? আপনারা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন– মহিলার যেখানে নেতৃত্ব, সেখানে ঐক্য হতে পারে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

অমন গলা উঁচিয়ে দন্ত দেখানো কথা শোনাচ্ছিলেন, আজ সেই মানুষই কেমন গুটিসুটি মেরে বসেছেন আর মিনমিন করে কথা বলছেন।

রায়হানের মনে সন্দেহ জাগে, তাহলে কি ঐক্যজাতীয় কিছু হয়ে গেছে ? আর সরকারও সেই জন্য খবরের কাগজগুলোর গলা শক্ত হাতে চেপে ধরতে চাইছে ?

কী হলো ভাই, একটা কিছু মতামত দিন ! হারুন সাহেবকে অমন উঁচু গলায় তাগিদ দিতে দেখে, রায়হানের হাসি পেয়ে যায়। বলে, এখানে আর মতামত দেওয়ার কী আছে– যা ঘটছে তার সবই তো আমরা সবাই দেখতে পাচ্ছি, যদি ছাত্রদের মধ্যে ঐক্য হয়ে যায়, তাহলে অপোজিশন-এর মধ্যেও ঐক্য হয়ে যাবে, আর সেটা হলে, এই সরকার আর কীভাবে টিকবে ? তখন তো শুধু সময়ের ব্যাপার, দু'দিন না হলে দু'সপ্তাহ, কিংবা খুব জোর হলে দু'মাস! এখন যদি সরকারের পক্ষে থাকতে চান, তাহলে দু'মাস পরে কী করবেন, সেটা চিন্তা করুন।

আমানউল্লাহ সাহেব জোর করে হাসেন। মাথা দোলাতে দোলাতে বলেন, ব্যাপারটা অতো সহজ নয় রায়হান সাহেব– যতো সহজে হিসাবটা দেখছেন, আসলে ওটা তা নয়– এদেশে ছাত্ররা আন্দোলন করুক, আর পলিটিক্যাল পার্টিরা করুক, শুধু শহরের আন্দোলনে কিছুই হবে না। পাকিস্তান আমল থেকে দেখছি আমরা, ঢাকা শহরে গুলি খেয়ে ছাত্র মরেছে। পাবলিক মরেছে। লেবার মরেছে। আন্দোলন দু'চারদিন হয়ে শেষ পর্যন্ত ঝিমিয়ে পড়ে ফুরিয়ে গেছে।

'৫২ সালে কী হয়েছিলো তা আমরা দেখেছি। ১০/১২ দিনের মধ্যেই তো সব ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিলো। '৫৪ সালের ইলেকশনের পর কী হয়েছে তাও আমাদের দেখা আছে। যারা ঐ ইলেকশনে জিতে ক্ষমতায় গিয়েছিলো তারা থাকতে পেরেছিলো কয়দিন ? যারা মুসলিম লীগ করতো, তারাই তো ক্ষমতায় টিকে গেছে। আইয়ুব খানের হাত ধরে তারা ক্ষমতার একেবারে জাঁকিয়ে বসে– তারপর কতো আন্দোলন, কতো মিছিল, কতো হরতাল– তাতে কি সরকার পড়ে গিয়েছিল ?

হারুন সাহেব শুনতে শুনতে এদিক ওদিক তাকাচ্ছিলেন। আমানউল্লাহ সাহেবের কথা শেষ হতেই বলে উঠলেন, তখন তখনই পড়ে নি, সেটা ঠিক, কিন্তু এক সময় ঐ আন্দোলনের জন্যই পড়লো। আর যখন পড়লো, তখন শুধু সরকার নয়, পাকিস্তান রাষ্ট্রটাই মুখ থুবড়ে পড়ে একেবারে নিকেশ হয়ে গেলো।

তা হয়েছে। আমানউল্লাহ সাহেব দমতে চান না। বলেন, সরকার, রাষ্ট্র যা-ই হোক, ঘটনা তো শাসকরা ঘটায়– শাসকদের শ্রেণীগত অবস্থানটা দেখতে হবে– এখনকার সরকারকে সমর্থন করলে, পরে যারা ক্ষমতায় আসবে তারা আগের সরকারের সমর্থকদের বাদ দেবে, এমন মনে হয় না– কারণ শ্রেণী তো একটাই, তারা ক্ষমতায় যাওয়ার পর পরই আমাদের সাপোর্ট চাইবে। সুতরাং এখনই সরকারের বিরুদ্ধে যাওয়াটা ঠিক হবে বলে মনে হয় না– চিন্তা করে দেখুন– মাসে ৫০ হাজার টাকার মতো আমরা সরকারী বিজ্ঞাপন পাই।

হারুন সাহেব মাথা নাড়ান। বলেন, এসব আপনি কী বলছেন আমান সাহেব ? শাসকদের বিরোধিতা করেও তো কতো লোক নিজেদের আখের গুছিয়ে নিয়েছে, নেয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

অমন গলা উঁচিয়ে দম্ভ দেখানো কথা শোনাচ্ছিলেন, আজ সেই মানুষই কেমন গুটিসুটি মেরে বসেছেন আর মিনমিন করে কথা বলছেন।

রায়হানের মনে সন্দেহ জাগে, তাহলে কি ঐক্যজাতীয় কিছু হয়ে গেছে ? আর সরকারও সেই জন্য খবরের কাগজগুলোর গলা শক্ত হাতে চেপে ধরতে চাইছে ?

কী হলো ভাই, একটা কিছু মতামত দিন ! হারুন সাহেবকে অমন উঁচু গলায় তাগিদ দিতে দেখে, রায়হানের হাসি পেয়ে যায়। বলে, এখানে আর মতামত দেওয়ার কী আছে– যা ঘটছে তার সবই তো আমরা সবাই দেখতে পাচ্ছি, যদি ছাত্রদের মধ্যে ঐক্য হয়ে যায়, তাহলে অপোজিশন-এর মধ্যেও ঐক্য হয়ে যাবে, আর সেটা হলে, এই সরকার আর কীভাবে টিকবে ? তখন তো শুধু সময়ের ব্যাপার, দু'দিন না হলে দু'সপ্তাহ, কিংবা খুব জোর হলে দু'মাস! এখন যদি সরকারের পক্ষে থাকতে চান, তাহলে দু'মাস পরে কী করবেন, সেটা চিন্তা করুন।

আমানউল্লাহ সাহেব জোর করে হাসেন। মাথা দোলাতে দোলাতে বলেন, ব্যাপারটা অতো সহজ নয় রায়হান সাহেব– যতো সহজে হিসাবটা দেখছেন, আসলে ওটা তা নয়– এদেশে ছাত্ররা আন্দোলন করুক, আর পলিটিক্যাল পার্টিরা করুক, শুধু শহরের আন্দোলনে কিছুই হবে না। পাকিস্তান আমল থেকে দেখছি আমরা, ঢাকা শহরে গুলি খেয়ে ছাত্র মরেছে। পাবলিক মরেছে। লেবার মরেছে। আন্দোলন দু'চারদিন হয়ে শেষ পর্যন্ত ঝিমিয়ে পড়ে ফুরিয়ে গেছে।

'৫২ সালে কী হয়েছিলো তা আমরা দেখেছি। ১০/১২ দিনের মধ্যেই তো সব ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিলো। '৫৪ সালের ইলেকশনের পর কী হয়েছে তাও আমাদের দেখা আছে। যারা ঐ ইলেকশনে জিতে ক্ষমতায় গিয়েছিলো তারা থাকতে পেরেছিলো কয়দিন ? যারা মুসলিম লীগ করতো, তারাই তো ক্ষমতায় টিকে গেছে। আইয়ুব খানের হাত ধরে তারা ক্ষমতার একেবারে জাঁকিয়ে বসে– তারপর কতো আন্দোলন, কতো মিছিল, কতো হরতাল– তাতে কি সরকার পড়ে গিয়েছিল ?

হারুন সাহেব শুনতে শুনতে এদিক ওদিক তাকাচ্ছিলেন। আমানউল্লাহ সাহেবের কথা শেষ হতেই বলে উঠলেন, তখন তখনই পড়ে নি, সেটা ঠিক, কিন্তু এক সময় ঐ আন্দোলনের জন্যই পড়লো। আর যখন পড়লো, তখন শুধু সরকার নয়, পাকিস্তান রাষ্ট্রটাই মুখ থুবড়ে পড়ে একেবারে নিকেশ হয়ে গেলো।

তা হয়েছে। আমানউল্লাহ সাহেব দমতে চান না। বলেন, সরকার, রাষ্ট্র যা-ই হোক, ঘটনা তো শাসকরা ঘটায়– শাসকদের শ্রেণীগত অবস্থানটা দেখতে হবে– এখনকার সরকারকে সমর্থন করলে, পরে যারা ক্ষমতায় আসবে তারা আগের সরকারের সমর্থকদের বাদ দেবে, এমন মনে হয় না– কারণ শ্রেণী তো একটাই, তারা সরকারের সমর্থকদের বাদ দেবে, এমন মনে হয় না– কারণ শ্রেণী তো একটাই, তারা ক্ষমতায় যাওয়ার পর পরই আমাদের সাপোর্ট চাইবে। সুতরাং এখনই সরকারের বিরুদ্ধে যাওয়াটা ঠিক হবে বলে মনে হয় না– চিন্তা করে দেখুন– মাসে ৫০ হাজার টাকার মতো আমরা সরকারী বিজ্ঞাপন পাই।

হারুন সাহেব মাথা নাড়ান। বলেন, এসব আপনি কী বলছেন আমান সাহেব ? শাসকদের বিরোধিতা করেও তো কতো লোক নিজেদের আখের গুছিয়ে নিয়েছে, নেয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

নি ? বলুন ? আর খবরের কাগজ তো মানুষই চালায়– কায়দা মতো বিরোধিতা আর কায়দা মতো সহযোগিতা করে দাঁড়িয়ে যায় নি কোনো কোনো কাগজ ? ওসব পুরনো কথা বাদ দিন, এখন কী করা উচিত আমাদের, তাই বলুন ?

রায়হানের বিরক্তি লাগছিলো অহেতুক ভ্যাজর ভ্যাজর করতে। কারণ তার তো ভালো মতো জানা যে, সরকারের অবস্থা যদি নড়বড়ে হয়ে গিয়ে থাকে, আর সেটা জানতে পারে, তাহলে কাগজের মালিক রাতারাতি সরকারের বিরুদ্ধে চলে যাবে। আর যদি বোঝে যে, সরকারের খুঁটি শক্ত আছে, তাহলে সরাসরি সরকারের বিরুদ্ধে কিছুতেই যাবে না– আলাপ-পরামর্শ যতোই করা হোক।

আমানউল্লাহ কিছু বলেন না। ওদিকে রায়হানের বিরক্তিটা বাড়ে। সে ঘড়ির দিকে তাকায়, বারোটা বাজতে দেরি নেই, প্রায় এক ঘণ্টা ধরে তাকে একটা অর্থহীন বকবকানির মধ্যে পড়তে হয়েছে। মনের ভেতরে মেরিদের বাসায় যাবার তাগিদটা তখনও সে অনুভব করছে। মাঝখানে হারুন সাহেবের মুখে পুলিশের গুলিতে ছাত্র মারা যাওয়ার খবরটা শোনার পর কিছুক্ষণ বোধহয় ওটা চাপা পড়ে গিয়েছিলো। তার মনে পড়ে, বাসায় বীথি তার জন্য অপেক্ষা করে আছে।

সে উঠতে চায়। বলে, আমাকে এখন উঠতে হবে, আমার একজন আত্মীয় মারা গেছেন–

সে কি! মারা গেছেন! হারুন-আমানউল্লাহ দু'জনই অপ্রস্তুত হয়ে পড়েন। বলেন, সে কথা আগে বলেন নি কেন ? কী রকম একটা অন্যায় হয়ে গেলো, এটা আপনার ঠিক হয় নি।

আমানউল্লাহ'র মুখের দিকে তাকিয়ে হারুন ফের বলেন, আপনার ওঁকে ধরে আনা ঠিক হয় নি।

আমানউল্লাহ আমতা আমতা করে বলেন, আমি তো বুঝতে পারি নি। ব্যাংকে গিয়েছিলাম, দেখি কাজ সেরে উনিও বেরুচ্ছেন– সঙ্গে ওঁর ছেলে। বললাম, এমডি সাহেব যেতে বলেছেন, আমি গাড়ি নিয়ে আপনার বাসায় যাচ্ছিলাম– তো দেখলাম উনি কিছু বললেন না। চুপচাপ গাড়িতে উঠে বসলেন। ছেলেটি অবশ্যি ওঁকে ছাড়তে চায় নি।

না না, এ ঠিক হয় নি। হারুন সাহেবকে রীতিমতো বিব্রত হতে দেখা যায়। বলেন, রায়হান ভাই, বিশ্বাস করুন, আমার খুব খারাপ লাগছে– তবু বলছি, আপনার সাথে আলাপ করাটা খুব দরকার ছিলো– আপনার কথায় বোঝা গেলো, এখন আমাদের ইন্ডিপেন্ডেন্ট থাকতে হবে, যতোদূর পারা যায়। আমার নিজের মনেও অমনই চিন্তা কাজ করছিলো– এখন আমার মনে হচ্ছে, জিহাদ হত্যার ব্যাপারটা আন্দোলনের টার্নিং পয়েন্ট হয়ে যেতে পারে– আমার মনে হচ্ছে, জিহাদের লাশ ছুঁয়ে সব দল স্বৈরাচার উচ্ছেদের শপথ নিতে পারে।

রায়হান বুঝতে পারে না। ভদ্রলোক ঠাট্টা করছেন, নাকি সত্যি সত্যি মনের কথা বলছেন। সে হারুন সাহেবের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর আবার বলে, আমি কিন্তু এবার সত্যি সত্যি যাবো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

হারুন সাহেব শশব্যস্ত হয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান। বলেন, হ্যাঁ অবশ্যই যাবেন। আমি বলে দিচ্ছি ড্রাইভার আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসুক।

রায়হান হাসে। বলে, না অতো ব্যস্ত হওয়ার দরকার নেই, আপনি তো জানেন, কাছেই আমার বাসা।

ঘর থেকে বেরিয়ে আসার সময় লক্ষ্য করে, আমানউল্লাহ সাহেবও পেছন পেছন আসছেন।

ভদ্রলোক পেছন থেকে বলে ওঠেন, কাজটা কি ঠিক হলো?

রায়হান কোনো জবাব না দিয়ে তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে নেমে একেবারে সোজাসুজি রাস্তায় গিয়ে রিকশায় ওঠে।

বাসায় পৌঁছে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে ঘড়ি দেখে রায়হান– বেলা প্রায় একটা। তারপর বীথির তৈরি হতে যা দেরি। মিনিট পনেরোর মধ্যেই দু'জনে বেরিয়ে পড়ে। শোবার ঘরে তালা দেওয়া হলেও বীথির মন খুঁতখুঁত করে। কারণ কাজের মানুষ মোমেনার মা ছাড়া বাসায় তখন আর কেউ নেই। টুকুর তো ফিরতে ফিতে বিকেল। এদিকে মঞ্জু যে কখন ফিরবে, কে জানে!

রায়হান আশ্বস্ত করার জন্য বলে, অতো চিন্তার কী হয়েছে– খুব একটা দেরি তো আমাদের হবে না– গিয়ে হয়তো দেখবো, লাশের গোসল দেওয়া হয়ে গেছে, গোরস্তানে রওনা হলেই আমরা চলে আসবো।

খুব সহজ আর স্বচ্ছন্দভাবে রায়হান কথাটা বলে বটে– কিন্তু ভেতরে ভেতরে তার মন অস্থির হয়ে ওঠে। রিকশায় বীথির পাশে বসে যেতে যেতে মেরির সঙ্গে এক রিকশায় চেপে যাওয়ার কথা তার মনে পড়ে। আর তাতেই বিচিত্র ধরনের একটা অনুভূতি জেগে ওঠে। যে নারী তার সারা জীবনের সঙ্গিনী তাকে সঙ্গে নিয়ে সে চলেছে এমন এক মৃত নারীকে শেষ বিদায় জানাতে, যে কিছু কালের জন্য তার সঙ্গিনী হয়েছিলো। বীথির শরীরের উত্তাপ, তার মাংসল কমনীয়তা, তার গাঢ় স্পর্শ স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিলো, মৃত নারীটির দেহের উত্তাপ, তার মাংসল কমনীয়তা এবং প্রগাঢ় স্পর্শ।

কেউ যেন তখন তার মনের ভেতরে প্রশ্ন করে যাচ্ছিলো, কতোদিন তোমাদের সম্পর্ক ছিলো মনে আছে? মনে পড়ে, কতোবার তোমরা মিলিত হয়েছিলে?

সে উত্তর খুঁজে পায় না। বীথির সঙ্গে মিলনের যেমন হিসেব নেই। সেই রকমই তার হিসেব নেই মেরির সঙ্গে মিলনেরও। মেরি যে তাকে সত্যি সত্যি ভালোবেসেছিলো সেই কথাটা বারবার ঘুরে ফিরে তার মনে পড়ে। কিন্তু হলে হবে কী, ঐ স্মৃতিও বড় জ্বালার। কারণ একই সঙ্গে তার মনের ভেতরকার অপরাধবোধটাও তো নড়েচড়ে ওঠে। বীথির পাশে বসে, তার দেহলগ্ন হয়ে থেকে, তার শরীরে গন্ধ-স্পর্শ-উত্তাপ নিতে নিতেও সে কীভাবে মেরির সঙ্গে মিলিত হবার ঘটনা স্মরণ করতে পারছে? তাহলে শুধু দেহে নয়, মনের দিক থেকেও কি সে লম্পট? এই বহুচারিতাই কি তার স্বভাব? নাকি সব পুরুষ মানুষই তার মতো লম্পট আর বহুচারী?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

হারুন সাহেব শশব্যস্ত হয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান। বলেন, হ্যাঁ অবশ্যই যাবেন। আমি বলে দিচ্ছি ড্রাইভার আপনাকে পৌছে দিয়ে আসুক।

রায়হান হাসে। বলে, না অতো ব্যস্ত হওয়ার দরকার নেই, আপনি তো জানেন, কাছেই আমার বাসা।

ঘর থেকে বেরিয়ে আসার সময় লক্ষ্য করে, আমানউল্লাহ সাহেবও পেছন পেছন আসছেন।

ভদ্রলোক পেছন থেকে বলে ওঠেন, কাজটা কি ঠিক হলো?

রায়হান কোনো জবাব না দিয়ে তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে নেমে একেবারে সোজাসুজি রাস্তায় গিয়ে রিকশায় ওঠে।

বাসায় পৌছে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে ঘড়ি দেখে রায়হান– বেলা প্রায় একটা। তারপর বীথির তৈরি হতে যা দেরি। মিনিট পনেরোর মধ্যেই দু'জনে বেরিয়ে পড়ে। শোবার ঘরে তালা দেওয়া হলেও বীথির মন খুঁতখুঁত করে। কারণ কাজের মানুষ মোমেনার মা ছাড়া বাসায় তখন আর কেউ নেই। টুকুর তো ফিরতে ফিতে বিকেল। এদিকে মঞ্জু যে কখন ফিরবে, কে জানে!

রায়হান আশ্বস্ত করার জন্য বলে, অতো চিন্তার কী হয়েছে– খুব একটা দেরি তো আমাদের হবে না– গিয়ে হয়তো দেখবো, লাশের গোসল দেওয়া হয়ে গেছে, গোরস্তানে রওনা হলেই আমরা চলে আসবো।

খুব সহজ আর স্বচ্ছন্দভাবে রায়হান কথাটা বলে বটে– কিন্তু ভেতরে ভেতরে তার মন অস্থির হয়ে ওঠে। রিকশায় বীথির পাশে বসে যেতে যেতে মেরির সঙ্গে এক রিকশায় চেপে যাওয়ার কথা তার মনে পড়ে। আর তাতেই বিচিত্র ধরনের একটা অনুভূতি জেগে ওঠে। যে নারী তার সারা জীবনের সঙ্গিনী তাকে সঙ্গে নিয়ে সে চলেছে এমন এক মৃত নারীকে শেষ বিদায় জানাতে, যে কিছু কালের জন্য তার সঙ্গিনী হয়েছিলো। বীথির শরীরের উত্তাপ, তার মাংসল কমনীয়তা, তার গাঢ় স্পর্শ স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিলো, মৃত নারীটির দেহের উত্তাপ, তার মাংসল কমনীয়তা এবং প্রগাঢ় স্পর্শ।

কেউ যেন তখন তার মনের ভেতরে প্রশ্ন করে যাচ্ছিলো, কতোদিন তোমাদের সম্পর্ক ছিলো মনে আছে? মনে পড়ে, কতোবার তোমরা মিলিত হয়েছিলে?

সে উত্তর খুঁজে পায় না। বীথির সঙ্গে মিলনের যেমন হিসেব নেই। সেই রকমই তার হিসেব নেই মেরির সঙ্গে মিলনেরও। মেরি যে তাকে সত্যি সত্যি ভালোবেসেছিলো সেই কথাটা বারবার ঘুরে ফিরে তার মনে পড়ে। কিন্তু হলে হবে কী, ঐ স্মৃতিও বড় জ্বালার। কারণ একই সঙ্গে তার মনের ভেতরকার অপরাধবোধটাও তো নড়েচড়ে ওঠে। বীথির পাশে বসে, তার দেহলগ্ন হয়ে থেকে, তার শরীরে গন্ধ-স্পর্শ-উত্তাপ নিতে নিতেও সে কীভাবে মেরির সঙ্গে মিলিত হবার ঘটনা স্মরণ করতে পারছে? তাহলে শুধু দেহে নয়, মনের দিক থেকেও কি সে লম্পট? এই বহুচারিতাই কি তার স্বভাব? নাকি সব পুরুষ মানুষই তার মতো লম্পট আর বহুচারী?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

তবে মেরির চিন্তা তার মনকে বেশিক্ষণ দখল করে রাখতে পারে না। মতিঝিল কলোনির পাশ দিয়ে যাবার সময় দেখে, কয়েকজন তরুণের একটা মিছিল স্লোগান দিতে দিতে দক্ষিণমুখো চলেছে। শাজাহানপুরের দিকে মোড় ঘুরবার সময় আরও একটা মিছিল চোখে পড়লো। এ মিছিলটা বড়, তবে স্লোগান একই– জিহাদ ভাইয়ের রক্ত– বৃথা যেতে দেবো না, স্বৈরাচারীর চামড়া–খুলে নেবো আমরা, স্বৈরচার নিপাত যাক– গণতন্ত্র মুক্তি পাক।

রিকশাঅলা কোনো কথা বলে নি। হঠাৎ বলে উঠলো, আইজ কিন্তু খবর আছে স্যার, খুব হাঙ্গামা হতে পারে।

কেন, আজ কিছু হয়েছে? রায়হানের মুখ দিয়ে কৌতূহলী প্রশ্নটা বেরিয়ে যায়।

হয় নাই মাইনে? রিকশাঅলা সোৎসাহে বলতে থাকে, সকাল থিকাই তো দেহি হাঙ্গামা হইতাছে, কখনো হুনি তোপখানার মোড়ে, কখনো হুনি জিপিও'র মোড়ে। একজন তো কইলো মতিঝিল বিমান অফিসের বগলেও মানুষ মরছে– কেউ কয় পুলিশে মারছে, কেউ কয় পুলিশের গুলিতে মরে নাই, সরকারী দলের মাস্তান গো কাম– আর ইনভার্সিটির দিক যে কী হইতেছে, কেউ কইতে পারে না– ক্যামনে কইবো। ওই দিক যাইতে পারলে তো!

রায়হানের বিশ্বাস হতে চায় না। কারণ শহরে এতো বড় ঘটনা ঘটে যাবে আর সে কিছুই জানবে না? যখন সে অফিসে বসে মিটিং করছিলো, তখন তো তার খবরটা জানার কথা। সে স্মরণ করার চেষ্টা করে, যখন সে বেরিয়ে আসছিলো তখন কি নিউজ টেবিলে কাউকে দেখেছিলো? কিংবা রিপোর্টারদের মধ্যে কাউকে? তার কিছুই স্মরণে আসে না। আব্দুল্লাহ কিংবা সালেহউদ্দিন থাকলে নিশ্চয়ই কথা হতো– তার মানে তারা তখনও এসে পৌছায় নি। মনের ভিতরে এলোমেলো চিন্তা পাক খায়। আর ঐ অবস্থায় সে সাদেক সাহেবের বাসার সামনে গিয়ে পৌছায়।

গেটের সামনে রাস্তার ওপর বেশ কয়েকখানা গাড়ি দেখা যায়। কিন্তু লাশ বইবার ট্রাক চোখে পড়ে না। তাহলে কি লাশ গোরস্তানে চলে গেছে? রায়হানের সন্দেহ হয়।

সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতে উঠতে একজন বয়স্ক পুরুষ মানুষের ভাঙা গলায় চিৎকার করে কাঁদার আওয়াজ কানে আসে। লোকটা নাটকের ডায়লগের মতো বলছে, এভাবে কেন যাবে এ্যাঁ? তাহলে আমাকে বাঁচিয়ে তুললো কেন? নিজে চলে যাবার জন্য? কেন এভাবে ফাঁকি দিলো? ওরে না কেঁদে কী করবো? আমার ঘরের লক্ষ্মী চলে গেলো রে-ওহ্ হো হো! আল্লাহ্ তুমি আমাকে নিলে না কেন?

বীথির কৌতূহল জাগে। একেকবার মনে হচ্ছে সাদেক সাহেবের গলা। কিন্তু ক্ষের এও মনে হচ্ছে, সাদেক সাহেবের তো ভেঙে পড়ার কথা নয়। চোখের সামনেই তো দেখা গেছে স্ত্রীর মৃত্যু সংবাদ ভদ্রলোক কীভাবে নিলেন– তাহলে কে কাঁদে অমন করে?

রায়হানেরও অবাক লাগে। এ বাড়িতে এমন হায় হায় করে কাঁদবার মতো বয়স্ক মানুষ আর কে আছে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ওপর তলার বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালে দেখতে পায় গোসল শেষে কাফন পরিয়ে মেরির লাশ বারান্দার মেঝেতে খাটের ওপর রাখা হয়েছে। পাশে জায়নামাজে বসে একটি তরুণ কোরান তেলাওয়াত করছে আর বারান্দার ডান দিকের ঘরে সাদেক সাহেব থেকে থেকে দু'হাত তুলে বুক চাপড়াচ্ছেন আর বিলাপ করতে করতে কাঁদছেন।

বীথির বিশ্বাস হাতে চায় না। সে নিচু গলায় বলে, কী ব্যাপার। উনি যে এতোখানি ভেঙে পড়বেন, তখন তো মনে হয় নি !

রায়হান কিছু বলে না। সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা অনেকক্ষণ ধরে দেখে। এদিকে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই বীথি এক সময় ভিতরের দিকে চলে যায়। সেদিকে মেয়েরা দাঁড়িয়ে ছিলো। বীথি সেখানে চেনামুখ বলতে শুধু চন্দনাকে দেখতে পায়। একটি মেয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরে রেখেছিলো– তার চোখের পানিতে ভেজা গাল আর চন্দনার মতো চেহারা দেখে অনুমান করতে অসুবিধা হয় না যে এটি মেরির ছোট মেয়ে মিহিন। চন্দনার কাছে গিয়ে দাঁড়ালে সে বীথির দিকে একবার মুখ তুলে তাকায়, কিছু বলে না। বীথি তার ঘাড়ে সান্ত্বনার হাত রাখলে একটু যেন কেঁপে ওঠে। ব্যস, ঐ পর্যন্তই, কারুর মুখ দিয়েই হা-হুতাশ বের হয় না।

ঐভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই বীথি মহিলাদের মধ্যে কারুর কারুর দীর্ঘ নিঃশ্বাস, নিচু স্বরে আল্লাহ্ মাফ করো উচ্চারণ, আবার তারই ফাঁকে ফাঁকে পুরুষদের ভিড় থেকে বনানী বা আজিমপুর, নাকি কাছাকাছি কোথাও, এই রকম কৌতূহলী প্রশ্ন শুনতে পায়। ঐ সময় চন্দনার বোনটির কী যেন হয়। সে ছুটে গিয়ে রায়হানের ডান বাহুতে গাল চেপে ধরে ফোঁপাতে আরম্ভ করে। বীথির অবাক লাগে, মেরির ছোট মেয়ের সঙ্গেও কি রায়হানের আদরের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিলো ?

ওদিকে সাদেক সাহেবের আহাজারি ঘরের দেয়ালে দেয়ালে আছড়ে পড়ছে তখনও। চন্দনার দিকে তাকিয়ে বীথি বলে, তোমার আব্বা দেখছি খুবই ভেঙে পড়েছেন, তোমার ভাইরা কোথায় ? ওঁর কাছে এখন ছেলেমেয়েদের মধ্যে কারুর থাকা দরকার।

চন্দনা কিছু বলে না। এমনকি ঘুরেও তাকায় না। বীথি মেয়েটির মনের অবস্থা আন্দাজ করতে পারে। নিজের মায়ের মৃত্যুর কথা মনে পড়ে। তখন অবশ্যি সে ছোট, বুঝবার বয়স হয় নি, তবে দুই বুবুকে প্রায়ই নিঃশব্দে কাঁদতে দেখে তার খুব কান্না পেতো। সে আর কোনো কথা না বলে চন্দনার কাছ থেকে সরে আসে।

রায়হানের পাশে গিয়ে দাঁড়ালে সে নিচু গলায় জানতে চায়, লাশ বিদায় হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে ?

তার আগে যাওয়া কি ঠিক হবে ? বীথি পাল্টা জিজ্ঞেস করে প্রথমে। তারপর বলে, সাদেক সাহেবকে কেউ সামলায় না কেন ? ভদ্রলোক তো অসুস্থ হয়ে পড়বেন!

রায়হান মিহিনের কানের কাছে মুখ নামিয়ে নিচু গলায় বলে, তোমার ভাইয়ারা কোথায় ? তোমার আব্বাকে কেউ গিয়ে ধরুক–

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ওপর তলার বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালে দেখতে পায় গোসল শেষে কাফন পরিয়ে মেরির লাশ বারান্দার মেঝেতে খাটের ওপর রাখা হয়েছে। পাশে জায়নামাজে বসে একটি তরুণ কোরান তেলাওয়াত করছে আর বারান্দার ডান দিকের ঘরে সাদেক সাহেব থেকে থেকে দু'হাত তুলে বুক চাপড়াচ্ছেন আর বিলাপ করতে করতে কাঁদছেন।

বীথির বিশ্বাস হাতে চায় না। সে নিচু গলায় বলে, কী ব্যাপার। উনি যে এতোখানি ভেঙে পড়বেন, তখন তো মনে হয় নি!

রায়হান কিছু বলে না। সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা অনেকক্ষণ ধরে দেখে। এদিকে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই বীথি এক সময় ভিতরের দিকে চলে যায়। সেদিকে মেয়েরা দাঁড়িয়ে ছিলো। বীথি সেখানে চেনামুখ বলতে শুধু চন্দনাকে দেখতে পায়। একটি মেয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরে রেখেছিলো– তার চোখের পানিতে ভেজা গাল আর চন্দনার মতো চেহারা দেখে অনুমান করতে অসুবিধা হয় না যে এটি মেরির ছোট মেয়ে মিহিন। চন্দনার কাছে গিয়ে দাঁড়ালে সে বীথির দিকে একবার মুখ তুলে তাকায়, কিছু বলে না। বীথি তার ঘাড়ে সান্ত্বনার হাত রাখলে একটু যেন কেঁপে ওঠে। ব্যস, ঐ পর্যন্তই, কারুর মুখ দিয়েই হা-হুতাশ বের হয় না।

ঐভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই বীথি মহিলাদের মধ্যে কারুর কারুর দীর্ঘ নিঃশ্বাস, নিচু স্বরে আল্লাহ্ মাফ করো উচ্চারণ, আবার তারই ফাঁকে ফাঁকে পুরুষদের ভিড় থেকে বনানী বা আজিমপুর, নাকি কাছাকাছি কোথাও, এই রকম কৌতূহলী প্রশ্ন শুনতে পায়। ঐ সময় চন্দনার বোনটির কী যেন হয়। সে ছুটে গিয়ে রায়হানের ডান বাহুতে গাল চেপে ধরে ফোঁপাতে আরম্ভ করে। বীথির অবাক লাগে, মেরির ছোট মেয়ের সঙ্গেও কি রায়হানের আদরের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিলো?

ওদিকে সাদেক সাহেবের আহাজারি ঘরের দেয়ালে দেয়ালে আছড়ে পড়ছে তখনও। চন্দনার দিকে তাকিয়ে বীথি বলে, তোমার আব্বা দেখছি খুবই ভেঙে পড়েছেন, তোমার ভাইরা কোথায়? ওঁর কাছে এখন ছেলেমেয়েদের মধ্যে কারুর থাকা দরকার।

চন্দনা কিছু বলে না। এমনকি ঘুরেও তাকায় না। বীথি মেয়েটির মনের অবস্থা আন্দাজ করতে পারে। নিজের মায়ের মৃত্যুর কথা মনে পড়ে। তখন অবশ্যি সে ছোট, বুঝবার বয়স হয় নি, তবে দুই বুবুকে প্রায়ই নিঃশব্দে কাঁদতে দেখে তার খুব কান্না পেতো। সে আর কোনো কথা না বলে চন্দনার কাছ থেকে সরে আসে।

রায়হানের পাশে গিয়ে দাঁড়ালে সে নিচু গলায় জানতে চায়, লাশ বিদায় হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে?

তার আগে যাওয়া কি ঠিক হবে? বীথি পাল্টা জিজ্ঞেস করে প্রথমে। তারপর বলে, সাদেক সাহেবকে কেউ সামলায় না কেন? ভদ্রলোক তো অসুস্থ হয়ে পড়বেন!

রায়হান মিহিনের কানের কাছে মুখ নামিয়ে নিচু গলায় বলে, তোমার ভাইয়ারা কোথায়? তোমার আব্বাকে কেউ গিয়ে ধরুক–

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

মিহিনের চাপা স্বরে তীক্ষ্ণ জবাব বের হয়। বলে, আব্বা অমনই, ওঁর কিছু হয় নি– এখন কেমন কাঁদছে, কিন্তু গত দু'দিন মায়ের কাছে যায় নি, মা কতো খুঁজেছিলো! বলার সময় মিহিনের চোখেমুখে কান্না, ক্ষোভ, রাগ স্পষ্ট আর একাকার হয়ে ফোটে।

বীথির খুব মায়া লাগে মিহিনকে দেখে। সে মেয়েটিকে কাছে টেনে নেয় আর খুব আদর করে ঘাড়ে মাথায় পিঠে হাত বোলাতে থাকে।

ঐ সময় সামনের দু'জন লোক সরে গেলে কাফন পরানো খাটে শোয়ানো মেরির লাশ রায়হানের সামনাসামনি হয়ে পড়ে। রায়হান দেখে মুখখানি খোলা রাখা হয়েছে, তাছাড়া সর্বাঙ্গ শাদা কাফনে মোড়া। রায়হান লাশের নিমিলিত চোখ, মসৃণ কপাল, কালো বাঁকানো ভুরু, পাণ্ডুর গাল দু'টি কালচে ঠোঁট দু'খানি– সব এক এক করে দেখে। ঐ কপালে কি সে কখনও হাত রেখেছিলো? নাকি চুমু খেয়েছিলো? তার ঠিক মনে পড়ে না। তবে ঐ ঠোঁট দু'খানি দিয়ে যে মেরি তীব্র চুমু খেতো সেটা তার স্পষ্ট মনে পড়ে এবং তাতে নিজের অনুভূতির খুব ভেতরে বিচিত্র রকমের একটা শিরশিরানি যে জেগে উঠতে চাইছে, সেটাও সে টের পায়। আর তখনই কে একজন বলে ওঠে, দেরি হচ্ছে কেন? ওদিকে রাস্তায় মিছিল বেরিয়েছে। পুলিশের সঙ্গে দাঙ্গা-হাঙ্গামা হচ্ছে, দেরি করা ঠিক নয়।

কে একজন পাশ থেকে জানতে চায়, কিসের মিছিল ভাই? আজ কি হরতাল ছিলো?

আরে ভাই খুব খারাপ অবস্থা ইউনিভার্সিটি এলাকায়, গুলিস্তানের পর আর ওদিকে গাড়িটাড়ি যেতে পারছে না।

রায়হানের মনে খটকা লাগে। সত্যিসত্যি কি রাস্তায় রাস্তায় হাঙ্গামা শুরু হয়ে গেছে? বড় রকমের গোলমাল কি শুরু হয়ে গেলো?

ওদিকে মেরির দু'ছেলেকে ব্যস্ত হয়ে ওপরে উঠে আসতে দেখা গেলো। সঙ্গে তাদের কয়েকজন বন্ধুবান্ধব। দেখতে দেখতে খাটিয়া সুদ্ধ লাশ মানুষের ঘাড়ে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে ডুকরে উঠলো দু'মেয়ের কান্না। লাশটা ওদিকে খুব ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামানো হলো। তারপর আর থামাথামি নেই। সোজা ট্রাকের ওপর উঠলো লাশ। সঙ্গে সঙ্গে ট্রাকের ইঞ্জিনও হয়ে গেলো চালু।

শাদা কিস্তি টুপি মাথায় মেরির বড় ছেলেটি এগিয়ে এসেছিলো রায়হানের কাছে। জানতে চেয়েছিলো, আপনি কি গোরস্তানে যাবেন?

জবাবে কিছু বলার আগেই পাস থেকে হুমায়ুন বলে ওঠে, না না, ওনার যাওয়া ঠিক হবে না, অসুস্থ মানুষ।

ব্যস, ঐ কথাই মেরিদের বাড়িতে শোনা শেষ কথা। রায়হানের মনের ভিতরটা তখন হঠাৎ যেন ফাঁকা হয়ে গিয়েছে– কোনো কিছুই ভাববার মতো সেখানে নেই। বীথি হাত ধরে টেনে তাকে রাস্তায় নিয়ে যায়।

রিকশার জন্য অপেক্ষা করতে করতে বীথি বলে, এই তো মানুষের জীবন– বয়স তো বোধহয় পঁয়তাল্লিশও হয় নি– এরই মধ্যে সব কিছু ফুরিয়ে গেলো। ছেলেমেয়ে, স্বামী-সংসার, মায়া-মমতা, ভালোবাসা ঘেন্না– সব কিছু এখন অর্থহীন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

কথাগুলো নিজেকেই শোনাচ্ছিলো বীথি। নিজের কথা শুনতে শুনতে সে কয়েকবারই স্বামীর মুখের দিকে তাকায়। কিন্তু তার ভাবলেশহীন মুখ দেখে কিছুই আন্দাজ করতে পারে না যে কোন চিন্তায় মানুষটার মন ডুবে রয়েছে। একবার মনে হয়, মেরির শোকে মানুষটা এখন আচ্ছন্ন আর সে জন্যই এমন গম্ভীর আর চুপচাপ। কিন্তু পরক্ষণে মনে হয়, না তা নয়, কথা না বললে কী, সে তো দিব্যি ডাইনে বাঁয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে, মুখখানা অবশ্যি গম্ভীর, কিন্তু সেখানে তো শোক বা বিষাদের কোনো চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। বরং কপালে ভ্রূর ওপরে থেকে থেকে ভাঁজ পড়তে দেখা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে, অন্য কোনো সমস্যা নিয়ে চিন্তায় ব্যস্ত।

কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফের এও মনে হয়, তাহলে কি মেরির সঙ্গে ওর গভীর কোনো সম্পর্ক গড়ে ওঠে নি? তাই তার মারা যাওয়ার ঘটনাটা মানুষটার মনে বড় রকমের কোনো প্রতিক্রিয়া তৈরি করছে না? নাকি পুরুষ মানুষ মাত্রেরই একই রকম স্বভাব? প্রিয়জনের মৃত্যু তাদের মনে খুব বেশি রকমের আঘাত দেয় না– তাদের কাতর করতে পারে না। ফের সে নিজের অতীতের কথা স্মরণ করে। মা মারা যাওয়ার সময় আব্বাকে কিন্তু কাঁদতে দেখে নি, পরেও না, কিন্তু এক বিধবা মহিলার সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আব্বার এক বন্ধু বাসায় এলে ঘাড়ে ধাক্কা মেরে তাকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিলেন, সেই দৃশ্যটা সে কখনও ভুলতে পারে না। তাহলে কোনটা ঠিক? শোকে কাতর হওয়াটা? নাকি বাইরে থেকে নির্বিকার থাকাটা? বীথি নিশ্চিত হতে পারে না।

সে এক সময় স্বামীর ঘাড়ে হাত রেখে জিজ্ঞেস করে, এই, এতো কী ভাবছো তুমি? কথা বলছো না কেন?

রায়হান যেন একটু চমকে ওঠে। তারপর মুখ ফিরিয়ে বলে, না তেমন কিছু ভাবছি না– অদ্ভুত লাগছে আমার, সকাল বেলা থেকে কী কী ঘটনা ঘটে চলেছে চিন্তা করো তো?

বীথি মনে মনে হিসাব করে এবং তারও অদ্ভুত লাগে। কথাটা মিথ্যা নয়, নাটকীয় সব ঘটনা ঘটে চলেছে সকাল থেকে। প্রথম তো হায়দার আর সাদেক সাহেবের আগমন আর হঠাৎ করে জমি বিক্রির বায়না আর লেনদেন, ওরই মাঝখানে আবার মেরির মারা যাবার খবর। তারপর মেরিদের বাসায় গিয়ে শোনা গেলো যে, পুলিশের গুলিতে ছাত্র মারা গেছে আর শহরে হাঙ্গামা শুরু হয়ে গেছে– এখন বাসায় ঠিক মতো পৌঁছানো যাবে কিনা কে জানে। আর বাসায় যাওয়ার পরও নতুন কোনো খবর শুনতে হবে কি না তারইবা ঠিক কী?

মনের ভেতর অস্পষ্ট একটা আশঙ্কার ছায়া দুলতে আরম্ভ করে। মঞ্জুটা বাসায় ফিরেছে কি না কে জানে। অবশ্যি কার্জন হলে সাধারণত গোলমাল হয় না, সে নিজের মনকে বোঝায়। কিন্তু মনের আর এক দিকে কে একজন বলে ওঠে, কিছু যদি হয়? আর্টস বিল্ডিংয়ের গোলমাল কার্জন হলের দিকে কি নেমে আসতে পারে না?

মঞ্জুটা যে কেন বেরুলো, এই ছেলেটা আমাকে বড্ড জ্বালায়!

বীথির মুখ দিয়ে আপনা থেকেই দুশ্চিন্তার কথাটা বেরিয়ে যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

কথাগুলো নিজেকেই শোনাচ্ছিলো বীথি। নিজের কথা শুনতে শুনতে সে কয়েকবারই স্বামীর মুখের দিকে তাকায়। কিন্তু তার ভাবলেশহীন মুখ দেখে কিছুই আন্দাজ করতে পারে না যে কোন চিন্তায় মানুষটার মন ডুবে রয়েছে। একবার মনে হয়, মেরির শোকে মানুষটা এখন আচ্ছন্ন আর সে জন্যই এমন গম্ভীর আর চুপচাপ। কিন্তু পরক্ষণে মনে হয়, না তা নয়, কথা না বললে কী, সে তো দিব্যি ডাইনে বাঁয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে, মুখখানা অবশ্যি গম্ভীর, কিন্তু সেখানে তো শোক বা বিষাদের কোনো চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। বরং কপালে ভ্রূর ওপরে থেকে থেকে ভাঁজ পড়তে দেখা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে, অন্য কোনো সমস্যা নিয়ে চিন্তায় ব্যস্ত।

কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফের এও মনে হয়, তাহলে কি মেরির সঙ্গে ওর গভীর কোনো সম্পর্ক গড়ে ওঠে নি? তাই তার মারা যাওয়ার ঘটনাটা মানুষটার মনে বড় রকমের কোনো প্রতিক্রিয়া তৈরি করছে না? নাকি পুরুষ মানুষ মাত্রেরই একই রকম স্বভাব? প্রিয়জনের মৃত্যু তাদের মনে খুব বেশি রকমের আঘাত দেয় না– তাদের কাতর করতে পারে না। ফের সে নিজের অতীতের কথা স্মরণ করে। মা মারা যাওয়ার সময় আব্বাকে কিন্তু কাঁদতে দেখে নি, পরেও না, কিন্তু এক বিধবা মহিলার সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আব্বার এক বন্ধু বাসায় এলে ঘাড়ে ধাক্কা মেরে তাকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিলেন, সেই দৃশ্যটা সে কখনও ভুলতে পারে না। তাহলে কোনটা ঠিক? শোকে কাতর হওয়াটা? নাকি বাইরে থেকে নির্বিকার থাকাটা? বীথি নিশ্চিত হতে পারে না।

সে এক সময় স্বামীর ঘাড়ে হাত রেখে জিজ্ঞেস করে, এই, এতো কী ভাবছো তুমি? কথা বলছো না কেন?

রায়হান যেন একটু চমকে ওঠে। তারপর মুখ ফিরিয়ে বলে, না তেমন কিছু ভাবছি না– অদ্ভুত লাগছে আমার, সকাল বেলা থেকে কী কী ঘটনা ঘটে চলেছে চিন্তা করো তো?

বীথি মনে মনে হিসাব করে এবং তারও অদ্ভুত লাগে। কথাটা মিথ্যা নয়, নাটকীয় সব ঘটনা ঘটে চলেছে সকাল থেকে। প্রথম তো হায়দার আর সাদেক সাহেবের আগমন আর হঠাৎ করে জমি বিক্রির বায়না আর লেনদেন, ওরই মাঝখানে আবার মেরির মারা যাবার খবর। তারপর মেরিদের বাসায় গিয়ে শোনা গেলো যে, পুলিশের গুলিতে ছাত্র মারা গেছে আর শহরে হাঙ্গামা শুরু হয়ে গেছে– এখন বাসায় ঠিক মতো পৌঁছানো যাবে কিনা কে জানে। আর বাসায় যাওয়ার পরও নতুন কোনো খবর শুনতে হবে কি না তারইবা ঠিক কী?

মনের ভেতর অস্পষ্ট একটা আশঙ্কার ছায়া দুলতে আরম্ভ করে। মঞ্জুটা বাসায় ফিরেছে কি না কে জানে। অবশ্যি কার্জন হলে সাধারণত গোলমাল হয় না, সে নিজের মনকে বোঝায়। কিন্তু মনের আর এক দিকে কে একজন বলে ওঠে, কিছু যদি হয়? আর্টস বিল্ডিংয়ের গোলমাল কার্জন হলের দিকে কি নেমে আসতে পারে না?

মঞ্জুটা যে কেন বেরুলো, এই ছেলেটা আমাকে বড্ড জ্বালায়!

বীথির মুখ দিয়ে আপনা থেকেই দুশ্চিন্তার কথাটা বেরিয়ে যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

রায়হানের মনের ভিতরটা তখনও শূন্য, সে কিছুই ভাবছিলো না। পুলিশের গুলিতে ছাত্র মারা যাওয়ার কথা না। মেয়ির লাশ গোরস্থানে নিয়ে যাওয়ার ঘটনা না, তার মৃত মুখের শান্ত ছবি না, এমনকি রাস্তায় দেখা তরুণদের মিছিলের কথাও না। বীথির কথার মধ্যে ছেলের জন্য আশঙ্কা প্রকাশ পেলেও সেটা তার মনে কোনো রকম সাড়া জাগায় না।

তেত্রিশ

ওদিকে রঞ্জু ছোট ভাইকে ডাক্তারদের বসার ঘরে রেখে সেই যে ওটি'র ভেতরে ঢুকেছে, তারপর আর বেরুবার নাম নেই। মঞ্জু একাকী ডাক্তারী ম্যাগজিন ঘেঁটে চলেছে সেই তখন থেকে। দু'ভাই এক রিকশায় চেপে আসার সময় কার্জন হলের কাছাকাছি পৌঁছলে হামিদের সঙ্গে দেখা। হামিদই জানায়, ইউনিভার্সিটি চত্বরে ছাত্রদের সব দল একসঙ্গে জিহাদের লাশ ছুঁয়ে শপথ নিতে যাচ্ছে। ঐ কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে মঞ্জু নেমে যাচ্ছিল রিকশা থেকে। রঞ্জু হাত ধরে থামায়। বলে, আমিও যাবো– শুধু একটু ওটি'র ইনচার্জকে বলে যাবো। ভাইয়ার কথামতো হাসপাতালে আসতে হলো। তারপর এই দশা তার। বসে রয়েছে তো বসেই রয়েছে। মেডিক্যাল জার্নালের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে হাতের আঙুলে ব্যথা ধরে গেলো, তবু ভাইয়ার পাত্তা নেই। বাইরে বেরিয়ে একজন ওয়ার্ডবয়কে খোঁজ নিতে বললে লোকটা একমুখ হেসে জানালো, অস্থির হইলে কাম হইবো, কন ? কইছে যখন, তখন দেরী হইবো না, অক্ষণই আইয়া পড়বো– আপনেরে বসতে কইছে, আপনে বইসা থাকেন।

মঞ্জু কব্জি ঘুরিয়ে ঘড়ি দেখে। সে বাসা থেকে বেরিয়েছে আসলে তিমলির জন্য। পরশু দিন নওশিন একটা চিরকুট এনে তার হাতে দিয়েছিলো। তাতে তিমলির হাতে লেখা ছিলো মাত্র কয়েকটা শব্দ– পরশুদিন দুপুর দু'টার দিকে তোমাদের ডিপার্টমেন্টে আসবো, জরুরী কথা আছে।

চিরকুটটার ওপর নজর বোলাতে বোলাতে সে একটু অবাক হয়, বেশ কিছুদিন হলো, তিমলি তার সঙ্গে দেখা করে না। সে নওশিনের মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলো, ও কোথায় ?

কিছুক্ষণ আগে চলে গেলো, নওশিন জানায়। বলে, তোমার জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছিলো।

চিরকুটখানা উল্টেপাল্টে দেখতে দেখতে সে বলেছিলো, এরকম চিরকুট কেন ? টেলিফোনে কথা বলতে পারে না ? আমাকে না হয় ফোনে কথা বলতে নিষেধ করেছে, আমি তো ওকে নিষেধ করি নি।

নওশিন তার নতুন চশমা আঙুল দিয়ে চেপে ঠিকমতো বসাতে বসাতে মুখ টিপে হাসে একটু, তারপর বলে, তোমরা ছেলেরা কেন যে এতো বোকা বুঝি না– আরে টেলিফোনেই যদি কথাবার্তা বলতে পারতো, তাহলে কি অমন চিরকুট পাঠিয়ে খবর দিতো, না অতোক্ষণ ধরে হা-পিত্যেশ করে বসে থাকতো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

আসলে সে এতো তাড়াতাড়ি বেরুতো না। আব্বা ব্যাংক থেকে আমানউল্লাহ সাহেবের সঙ্গে অফিসে চলে গেলে সে হাঁটতে হাঁটতে বাসায় ফিরছিলো, ঐ ফেরার পথে একটা মিছিল যেতে দেখে। মিছিলটা বড় নয়, খুব জোর জনা পঁচিশ-তিরিশেক তরুণ হবে– কিন্তু তা হলে কী, খুব রাগী ছিলো ওদের ভাবভঙ্গি, আর গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে স্লোগান দিচ্ছিলো। ঐ মিছিল দেখেই কি না কে জানে, রাস্তার মানুষ নানান কথা বলাবলি করছিলো আর ওরই মধ্যে সে খবরটা পায় যে, পুলিশের গুলিতে একটি ছাত্র মারা গেছে। খবরটা জানতে পারার সঙ্গে সঙ্গে তিমলির লেখা চিরকুটখানার কথা তার মনে পড়ে। গোলাগুলি আর হাঙ্গামার মধ্যে পড়লে তিমলির কী দশা হবে, সেটা কল্পনা করে সে মনে মনে ঠিক করে, একটা-দেড়টা নাগাদ সে কার্জন হলে পৌছে যাবে। যদি গিয়ে দেখে যে তিমলি আসে নি, তো ভালো। আর যদি আসে, তো কথাবার্তা শেষ করে ওকে বাসায় পৌছে দেবে।

মেয়েটা যে কী ভাবে নিজেকে! মঞ্জুর একেক সময় রাগ হয়। অতো ঢং করার কী দরকার! দু'জনার সম্পর্ক যে শুধু বন্ধুত্বের মধ্যে থেমে নেই, সেটা যেন আর কেউ বুঝতে পারে না। রাখির সঙ্গে যে তার সম্পর্ক হয়েছিলো সেটা ভুলতে না পারার জন্যই সে পাগলামিটা করে। নতুন সম্পর্ক যে আপনা থেকে গড়ে উঠেছে মঞ্জুর সঙ্গে, সেটা সে স্বীকার করতে চায় না। তো ঠিক আছে, করলো না স্বীকার। ফোন করতে নিষেধ করে দিয়েছে– কথা বলতে গেলে পাশ কাটায়। সবই ঠিক আছে, সে আজকাল ফোনও করে না। গায়ে পড়ে কথাও বলতে যায় না কিন্তু তাতেই যদি ঝামেলা মিটতো তাহলে তো কথা ছিলো না। আর্টস বিল্ডিংয়ের ছাত্রী তুমি, কার্জন হলে তোমার এতো কী কাজ থাকে যে রোজ আসো ? মুখোমুখি হলে না দেখার ভান করো– আবার ডিপার্টমেন্টে গিয়ে খোঁজ নাও কেন, মাহিব রায়হান এসেছে কি না ?

সে মনে মনে ঠিক করে রেখেছে, দেখা হলেই জানতে চাইবে, তাকে একদিন বাসায় নিয়ে যাবে কি না ? বাড়ির লোকজনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবে কি না, সে দেখতে চায়, সে উত্তর দিচ্ছে। কিন্তু যেভাবে আটকা পড়েছে, তাতে কখন ছাড়া পাবে কে জানে। সে বারবার ঘড়ি দেখে। একটা প্রায় বেজে গেলো। ওয়ার্ডবয় লোকটি আবার এসে সামনে দাঁড়ায়। বলে, আপনের ভাইয়ের কাম শ্যাষ– অক্ষণই আইবো। ধরেন পাঁচ মিনিট বড়জোর।

ওরই মধ্যে প্যাসেজে লোকদের আলাপ করতে শোনে। একজন বলে, খামাখা ছাত্রগুলি ক্যান যে মরতাছে কিচ্ছু বুজি না– কন, এইডা একটা কথা হইল, তরা কসম খাইবি না শপথ লইবি তার জন্য লাশ ক্যান দরকার ? এ্যাঁ ? এইডা কেমুন রাজনীতি তগো! ভেজানো দরজার ওপাশে লোকটার কথা শেষ হওয়ার আগেই আর এক লোক ধমকে ওঠে। বলে, ওই মিয়া, হাসপাতালের ভিৎরে এইসব কিয়ের প্যাঁচাল হ্যাঁ ? এরশাদের দালালি করবার চাও তো রাস্তায় বাইরাও, হাসপাতালের ভিৎরে এই সব কী কও ? দ্যাহো না, কতো গ্যারাইম্যা মানুষ তোমার চারোদিকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

আসলে সে এতো তাড়াতাড়ি বেরুতো না। আব্বা ব্যাংক থেকে আমানউল্লাহ সাহেবের সঙ্গে অফিসে চলে গেলে সে হাঁটতে হাঁটতে বাসায় ফিরছিলো, ঐ ফেরার পথে একটা মিছিল যেতে দেখে। মিছিলটা বড় নয়, খুব জোর জনা পঁচিশ-তিরিশেক তরুণ হবে– কিন্তু তা হলে কী, খুব রাগী ছিলো ওদের ভাবভঙ্গি, আর গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে স্লোগান দিচ্ছিলো। ঐ মিছিল দেখেই কি না কে জানে, রাস্তার মানুষ নানান কথা বলাবলি করছিলো আর ওরই মধ্যে সে খবরটা পায় যে, পুলিশের গুলিতে একটি ছাত্র মারা গেছে। খবরটা জানতে পারার সঙ্গে সঙ্গে তিমলির লেখা চিরকুটখানার কথা তার মনে পড়ে। গোলাগুলি আর হাঙ্গামার মধ্যে পড়লে তিমলির কী দশা হবে, সেটা কল্পনা করে সে মনে মনে ঠিক করে, একটা-দেড়টা নাগাদ সে কার্জন হলে পৌঁছে যাবে। যদি গিয়ে দেখে যে তিমলি আসে নি, তো ভালো। আর যদি আসে, তো কথাবার্তা শেষ করে ওকে বাসায় পৌঁছে দেবে।

মেয়েটা যে কী ভাবে নিজেকে! মঞ্জুর একেক সময় রাগ হয়। অতো ঢং করার কী দরকার! দু'জনার সম্পর্ক যে শুধু বন্ধুত্বের মধ্যে থেমে নেই, সেটা যেন আর কেউ বুঝতে পারে না। রাখির সঙ্গে যে তার সম্পর্ক হয়েছিলো সেটা ভুলতে না পারার জন্যই সে পাগলামিটা করে। নতুন সম্পর্ক যে আপনা থেকে গড়ে উঠেছে মঞ্জুর সঙ্গে, সেটা সে স্বীকার করতে চায় না। তো ঠিক আছে, করলো না স্বীকার। ফোন করতে নিষেধ করে দিয়েছে– কথা বলতে গেলে পাশ কাটায়। সবই ঠিক আছে, সে আজকাল ফোনও করে না। গায়ে পড়ে কথাও বলতে যায় না কিন্তু তাতেই যদি ঝামেলা মিটতো তাহলে তো কথা ছিলো না। আর্টস বিল্ডিংয়ের ছাত্রী তুমি, কার্জন হলে তোমার এতো কী কাজ থাকে যে রোজ আসো ? মুখোমুখি হলে না দেখার ভান করো– আবার ডিপার্টমেন্টে গিয়ে খোঁজ নাও কেন, মাহিব রায়হান এসেছে কি না ?

সে মনে মনে ঠিক করে রেখেছে, দেখা হলেই জানতে চাইবে, তাকে একদিন বাসায় নিয়ে যাবে কি না ? বাড়ির লোকজনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবে কি না, সে দেখতে চায়, সে উত্তর দিচ্ছে। কিন্তু যেভাবে আটকা পড়েছে, তাতে কখন ছাড়া পাবে কে জানে। সে বারবার ঘড়ি দেখে। একটা প্রায় বেজে গেলো। ওয়ার্ডবয় লোকটি আবার এসে সামনে দাঁড়ায়। বলে, আপনের ভাইয়ের কাম শ্যাষ– অক্ষণই আইবো। ধরেন পাঁচ মিনিট বড়জোর।

ওরই মধ্যে প্যাসেজে লোকদের আলাপ করতে শোনে। একজন বলে, খামাখা ছাত্রগুলি ক্যান যে মরতাছে কিছু বুজি না– কন, এইডা একটা কথা হইল, তরা কসম খাইবি না শপথ লইবি তার জন্য লাশ ক্যান দরকার ? এ্যাঁ ? এইডা কেমুন রাজনীতি তগো! ভেজানো দরজার ওপাশে লোকটার কথা শেষ হওয়ার আগেই আর এক লোক ধমকে ওঠে। বলে, ওই মিয়া, হাসপাতালের ভিৎরে এইসব কিয়ের প্যাঁচাল হ্যাঁ ? এরশাদের দালালি করবার চাও তো রাস্তায় বাইরাও, হাসপাতালের ভিৎরে এই সব কী কও ? দ্যাহো না, কতো গ্যারাইম্যা মানুষ তোমার চারোদিকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ধমক খেয়ে প্রথম লোকটা বোধহয় কিছু বলে, কিন্তু মঞ্জু সেদিক কান দিতে পারে না। কারণ ঠিক ঐ মুহূর্তেই দরজা মেলে ধরে রঞ্জু তাকে ডাক দেয়। বলে, চল, এবার যাই।

মঞ্জুর মুখ দিয়ে ক্ষুব্ধ স্বর বেরিয়ে আসে। বলে, হুঁ! এতোক্ষণে সময় হলো। আমাকে এভাবে কেন বসিয়ে রেখেছিলি ? কোনো মানে হয় ?

পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে রঞ্জু বলে, কী করবো বল ? ইমার্জেন্সি থেকে ডাক এসে গেলো। বারো জন উভেড– চিন্তা কর, ওদের মধ্যে আবার দু'জনের অবস্থা খুবই ক্রিটিক্যাল। একজনের গুলি লেগেছে পেটে, আর একজনের পেলভিসের ডান দিকে। অল্পের জন্য কিডনিটা বেঁচে গেছে, অমন অবস্থায় ওদের রেখে কীভাবে বেরুনো যায় ? আসতে হয়তো পারতাম। কিন্তু সেটা কি ঠিক হতো ?

দ্রুত পা চালিয়ে দু'ভাই গেটে পৌছায়। তারপরই রিকশায় উঠে পড়ে। দেখে রাস্তায় লোকজন কম। এ পথে বাস এমনিতেই কম চলাচল করে– তারা যাওয়ার সময় একটাও দেখলো না, ট্রাকও না। রিকশা আর বেবি চলছে, তবে তার সংখ্যাও কম।

রঞ্জু জখমি ছেলেদের কাছে শোনা ঘটনার বৃত্তান্ত এক এক করে ভাইকে শোনায়। বলে, ওরা নিজেরাই উদ্যোগ নেয়, সংগ্রাম পরিষদের ছাত্ররা যেমন ছিলো, তেমনি ছিলো ছাত্রঐক্যের ছেলেরাও। প্রথমে সরকারী দলের কয়েকটা মাস্তান হামলার চেষ্টা করে, ওদের ধাওয়া করে কয়েকজন সামনের দিকে ছুটে গেলে হঠাৎ পুলিশ কয়েকটা টিয়ার গ্যাসের শেল ছোঁড়ে। তাতে পাল্টা ইটের টুকরা ছুঁড়তে থাকে ছেলেরা। ধোঁয়ায় অন্ধকার, ছোটাছুটি, চিৎকার শুরু হয়ে যায়– এরই মধ্যে আবার পুলিশ কয়েক রাউন্ড গুলিও চালায়। কিন্তু তাতেও ওরা পিছু হটে নি। রাস্তাতেই ছিলো সবাই, জখমি ছেলেদের নিজেরাই সরিয়ে দেয়, এমনকি জিহাদের লাশও– পুলিশ লাশ নিতে এসে আর খুঁজে পায় নি।

মঞ্জু শুনতে শুনতে সামনের দিকে তাকায়। রিকশা তখন ব্রিটিশ কাউন্সিল ছাড়িয়ে এসেছে। এখানেই কি টিয়ার গ্যাসের শেল পড়েছিলো ? সে রাস্তার পিচে হলদে রঙের ছোপ ছোপ দাগ খোঁজে। রক্তও নিশ্চয়ই ঝরেছে এখানেই কোথাও। আর যে ইটগুলো ছেলেরা ছুঁড়েছিলো, সেগুলো ? সেগুলো কোথায় ?

মঞ্জু চলন্ত রিকশা থেকেই ঝুঁকে পড়ে। রাস্তার বুকে টিয়ার গ্যাসের শেল ফাটার দাগ। রক্তের নিশান আর ছাত্রদের ছোঁড়া ভাঙা ইটের টুকরাগুলো খুঁজে খুঁজে দেখতে চায়।

ইউনিভার্সিটি গেটের কাছাকাছি হামিদের সঙ্গে ফের দেখা হলে দুই ভাই-ই রিকশা থেকে নেমে পড়ে। খানিক দূরে আবার মনিরও ছিলো। তাকে দেখতে পেয়ে মঞ্জু এগিয়ে যায়। ইউনিভার্সিটি চত্বরের পুরোটাই ছাত্রছাত্রীতে ভর্তি। একটা মিছিল এসে পৌছলো দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই। হামিদ বলে, ৮ দলের সব নেতাই আসবেন। এদিকে ৭ দলের নেতারা তো একে একে আসছেন, কেউ বাদ যাবেন বলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

মনে হয় না। ৫ দলের নেতাদের মধ্যে কয়েকজনকে তো প্রায় সর্বক্ষণই দেখা যাচ্ছে।

হামিদ ফের বলে, তখন যে বলেছিলাম সে খবরটা গুজব নয়, আসলেই সব দল আর গ্রুপের ছাত্রনেতারা শহীদ জিহাদের কফিন ছুঁয়ে স্বৈরশাসন উৎখাতের শপথ নেবে। এ ধরনের শপথ নেওয়ার কথা আগে কিন্তু শোনা যায় নি, ব্যাপারটা কিন্তু পিপলের মনকে ভীষণভাবে নাড়া দেবে। মঞ্জু লক্ষ্য করে হামিদ কথা বলতে বলতে রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে উঠেছে।

রাস্তায় ভিড়ের মধ্যেও মেয়েদের একটা দলকে দেখা যায়। মঞ্জু ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে, দুটো বাজতে দেরি নেই। সে মেয়েদের জটলাটার দিকে নজর তুলে দেখে, যদি চেনাজানা কাউকে চোখে পড়ে।

হামিদ পাশ থেকে জিজ্ঞেস করে, তুই কি কাউকে খুঁজছিস।

নাহ্, এমনি দেখছি।

তার জবাব হামিদ শুনতে পায় কিনা বোঝা যায় না। হঠাৎ মঞ্জু নওশিনকে দেখতে পেয়ে তার দিকে এগিয়ে যায়।

তিমলির কথা জিজ্ঞেস করা হলে নওশিন মাথা নাড়তে নাড়তে বলে, ও বোধহয় আজ আসে নি, এলে তো নিশ্চয়ই দেখতাম– তাছাড়া কীভাবে আসবে। যা অবস্থা এদিকে।

কিন্তু তুমি তো দিব্যি চলে এসেছো।

বাহ্ তোমাকে তিমলি বলে নি ? আমি তো মাসখানেক হলো চলে এসেছি হলে, বাড়িতে থাকলে কি আর আসতে পারতাম! মিরপুর কি কাছে ?

নওশিন আরও বোধহয় কিছু বলতো, কিন্তু ঠিক ঐ সময় একটি মেয়ে এসে তাকে ডেকে নিয়ে গেলো আর একদিকে।

হামিদ দু'পাশে দুই বন্ধুকে নিয়ে তখনও দাঁড়িয়ে। ওদিকে কোন এক ছাত্রনেতা বক্তৃতা করছিলো।

হামিদ শুনতে শুনতে বিরক্ত হয়ে বলে, এরা কী যে করে, কাণ্ডজ্ঞান বলে যদি কিছু থাকতো ? এখন আর বক্তৃতা দেওয়ার মানে হয় ? মানুষের মন এখন কোনদিকে সেটা কি কারুর অজানা ? এখন এ্যাকশন চাই, এ্যাকশন– এদের কি নতুন কোনো প্রোগ্রাম নেই। নতুন প্রোগ্রামের কথা বলুক।

অমন কথা বলার কারণেই কি না কে জানে, কয়েকটি তরুণ তাকে ঘিরে ধরে, তখন অগত্যা মঞ্জুকে ঐ ভিড় থেকে সরে আসতে হয় সে বড় ভাইকে খোঁজে।

রাস্তায় পুলিশের টহল নেই, তবে মাথায় হেলমেট আঁটা আর বন্দুকের নল তাক করা পুলিশে ভর্তি ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে জায়গায় জায়গায়। ঐ সময় চারদিকে নজর করে দেখতে দেখতেই ছাত্রদের একটা জটলা তার চোখে পড়ে আর সেখানে সে সাবুকে দেখতে পায়। সঙ্গে সঙ্গে সে দাঁড়িয়ে যায়। দেখে, সাবু কয়েকটি অল্পবয়সী ছেলেকে হাত নেড়ে নেড়ে কী যেন বোঝাচ্ছে, সে যে রাজনীতির কথা বলছে, তা তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

মনে হয় না। ৫ দলের নেতাদের মধ্যে কয়েকজনকে তো প্রায় সর্বক্ষণই দেখা যাচ্ছে।

হামিদ ফের বলে, তখন যে বলেছিলাম সে খবরটা গুজব নয়, আসলেই সব দল আর গ্রুপের ছাত্রনেতারা শহীদ জিহাদের কফিন ছুঁয়ে স্বৈরশাসন উৎখাতের শপথ নেবে। এ ধরনের শপথ নেওয়ার কথা আগে কিন্তু শোনা যায় নি, ব্যাপারটা কিন্তু পিপলের মনকে ভীষণভাবে নাড়া দেবে। মঞ্জু লক্ষ্য করে হামিদ কথা বলতে বলতে রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে উঠেছে।

রাস্তায় ভিড়ের মধ্যেও মেয়েদের একটা দলকে দেখা যায়। মঞ্জু ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে, দুটো বাজতে দেরি নেই। সে মেয়েদের জটলাটার দিকে নজর তুলে দেখে, যদি চেনাজানা কাউকে চোখে পড়ে।

হামিদ পাশ থেকে জিজ্ঞেস করে, তুই কি কাউকে খুঁজছিস।

নাহ্, এমনি দেখছি।

তার জবাব হামিদ শুনতে পায় কিনা বোঝা যায় না। হঠাৎ মঞ্জু নওশিনকে দেখতে পেয়ে তার দিকে এগিয়ে যায়।

তিমলির কথা জিজ্ঞেস করা হলে নওশিন মাথা নাড়তে নাড়তে বলে, ও বোধহয় আজ আসে নি, এলে তো নিশ্চয়ই দেখতাম– তাছাড়া কীভাবে আসবে। যা অবস্থা এদিকে।

কিন্তু তুমি তো দিব্যি চলে এসেছো।

বাহ্ তোমাকে তিমলি বলে নি ? আমি তো মাসখানেক হলো চলে এসেছি হলে, বাড়িতে থাকলে কি আর আসতে পারতাম! মিরপুর কি কাছে ?

নওশিন আরও বোধহয় কিছু বলতো, কিন্তু ঠিক ঐ সময় একটি মেয়ে এসে তাকে ডেকে নিয়ে গেলো আর একদিকে।

হামিদ দু'পাশে দুই বন্ধুকে নিয়ে তখনও দাঁড়িয়ে। ওদিকে কোন এক ছাত্রনেতা বক্তৃতা করছিলো।

হামিদ শুনতে শুনতে বিরক্ত হয়ে বলে, এরা কী যে করে, কাণ্ডজ্ঞান বলে যদি কিছু থাকতো ? এখন আর বক্তৃতা দেওয়ার মানে হয় ? মানুষের মন এখন কোনদিকে সেটা কি কারুর অজানা ? এখন এ্যাকশন চাই, এ্যাকশন– এদের কি নতুন কোনো প্রোগ্রাম নেই। নতুন প্রোগ্রামের কথা বলুক।

অমন কথা বলার কারণেই কি না কে জানে, কয়েকটি তরুণ তাকে ঘিরে ধরে, তখন অগত্যা মঞ্জুকে ঐ ভিড় থেকে সরে আসতে হয় সে বড় ভাইকে খোঁজে।

রাস্তায় পুলিশের টহল নেই, তবে মাথায় হেলমেট আঁটা আর বন্দুকের নল তাক করা পুলিশে ভর্তি ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে জায়গায় জায়গায়। ঐ সময় চারদিকে নজর করে দেখতে দেখতেই ছাত্রদের একটা জটলা তার চোখে পড়ে আর সেখানে সে সাবুকে দেখতে পায়। সঙ্গে সঙ্গে সে দাঁড়িয়ে যায়। দেখে, সাবু কয়েকটি অল্পবয়সী ছেলেকে হাত নেড়ে নেড়ে কী যেন বোঝাচ্ছে, সে যে রাজনীতির কথা বলছে, তা তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ভঙ্গিতে স্পষ্ট বোঝা যায়। মঞ্জু ডাইনে বাঁয়ে তাকিয়ে দেখে কিন্তু আবুকে খুঁজে পায় না। অথচ ক'দিন আগে পর্যন্ত দু'জনকে মানিকজোড়ের মতো সর্বত্র একসঙ্গে দেখা যেতো। আবুকে দেখতে না পেলেও বছর দেড়েক আগে ঘাড়ের ওপর পাওয়া ভারী জিনিসের আঘাতটা ঠিকই তার স্মরণ হয়। তেমনি মাস পাঁচেক আগে তার নাকের হাড় ভেঙে যাওয়ায় ব্যাথাটাও সে স্পষ্ট টের পায়, আর তাতে আবু সাবুর সঙ্গী হাবিবকেও ঐ ভিড়ের মধ্যে দেখতে পাবে বলে তার অনুমান হয়।

দু'মিনিট দাঁড়িয়ে ওদের কথা শোনার চেষ্টা করে। যতটুকু শোনে, তাতে মনে হয়, বক্তৃতার ভাষা আর উচ্চারণের ভঙ্গি মোটামুটি আয়ত্ত করে ফেলেছে সাবু। তার মানে নেতা হতে আর দেরি নেই। চাই কি সামনের ইলেকশনে যে কোনো দলের টিকেট পেয়ে পার্লামেন্টের মেম্বারও হয়ে যেতে পারে। কিছুক্ষণ এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করতে করতেই মাইকে ঘোষণা শোনা যায় যে শেখ হাসিনা আসছেন এবং সব দলের ছাত্রনেতারা এখনই জিহাদের কফিন ছুঁয়ে স্বৈরাচার উৎখাতের শপথ নেবে।

মঞ্জু আর দাঁড়ায় না। তার নিজেকে দারুণ ক্লান্ত লাগে। সে বাসার দিকে পা বাড়ায়। ঐ সময় তিমলির ওপর তার খুব রাগ হয়।

ক্লান্ত পায়ে হাঁটতে হাঁটতে সে ফেরে। তিমলির ওপর রাগটা ক্রমেই বাড়তে থাকে। মনে মনে ঠিক করে, দেখা হলে সে খোলাখুলি জিজ্ঞেস করবে, তার সঙ্গে এমন ফাজলামি সে কেন করলো?

তাতে যদি বন্ধুত্ব না থাকে তো না থাকবে।

রাস্তায় লোকজন খুবই কম, রিকশাও চলছে দু'টি একটি, টিএসসি'র মোড় ছাড়িয়ে সোজা দক্ষিণের রাস্তা ধরে সে মুখ নিচু করে হাঁটে। আজ অক্টোবরের দশ, তবু রোদের তেজ এখনও বেশি। কিছুক্ষণ হাঁটার পর হঠাৎ শাড়ির ঘের এবং এক জোড়া স্যান্ডেল পরা পা সে দেখতে পায় আর তখনই কানে আসে কয়েকটি শব্দ, এতোক্ষণে সময় হলো?

নজর তুললে সে তিমলির মুখ দেখে এবং অবাক হয়। বলে, তুমি কীভাবে এলে?

কেন, যেভাবে মানুষ আসে?

ইউনিভার্সিটি এলাকায় এতো গোলাগুলি, তবু তুমি এলে?

না এসে কী করি বলো! তিমলি ডাইনে বাঁয়ে তাকিয়ে নিয়ে বলে, তোমাকে আসার জন্য চিঠি পাঠিয়েছি। এদিকে এই রকম অবস্থার খবর পেলাম ১২টার দিকে, ফোন করলাম তো তোমাদের কাজের লোক জানিয়ে দিলো, বাসায় কেউ নেই, কখন ফিরবে জানি না। শেষে কী করি, এক ফাঁকে বেরিয়ে পড়লাম। অবশ্যি মা জিজ্ঞেস করেছিলেন ইউনিভার্সিটিতে গোলমাল, তুই কোথায় যাচ্ছিস? তো মিথ্যে কথা বলতে হলো। বললাম, আজিমপুর, সাদিয়ার কাছে। সাদিয়াকে তো চেনো, আমার ক্লাসমেট। ঠিক দেড়টার সময় পৌঁছেছি, তারপর অপেক্ষা করছি তো করেই চলেছি। তোমাদের ডিপার্টমেন্ট খোলা ছিলো, বেয়ারা এক সময় তালা লাগিয়ে দিয়ে চলে গেলো। একটি ছেলে আর একটি মেয়ে গাছতলায় প্রেমের আলাপ জুড়েছিলো, এক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

সময় তারাও চলে গেলো, কিন্তু তোমার পাত্তা নেই। আড়াইটা পর্যন্ত অপেক্ষা করার পর সন্দেহ হলো, নওশিন স্লিপটা কি তোমার হাতে দিয়েছে? সন্দেহটা ক্রমেই বাড়তে থাকে, ওদিকে কার্জন হল একেবারে সুমসাম হয়ে উঠেছে ততোক্ষণে– একা থাকতে ভয় লাগছিলো, তাই বেরিয়ে পড়লাম।

বলতে বলতে তিমলি এক সময় থেমে যায়, আর মঞ্জুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। মঞ্জু লক্ষ্য করে তিমলির পরনে আজ হালকা সবুজ রঙের শাড়ি, সাদা, নকশি করা জামা, শরৎ শেষের রোদে বেশ ঘেমে উঠলেও আজ ওকে অন্যরকম লাগেছে। একটু যেন বেশি শান্ত, বেশি স্নিগ্ধ, বেশি কোমল।

তিমলির সঙ্গে আবার উল্টো দিকে হাঁটে মঞ্জু। জিজ্ঞেস করে, এদিকে কোথায় যাবে এখন?

ভারী মিষ্টি হাসি ফোটে তিমলির মুখে। বলে, তার আমি কী জানি। তোমার খবর নেওয়ার জন্য নওশিনের কাছে যাচ্ছিলাম, মাঝপথে তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো, এখন তুমি জানো, কোথায় আমাকে নিয়ে যাচ্ছো।

কিন্তু আমিই তো তোমার কাছে যাচ্ছিলাম, তুমি জরুরী কথা বলবে, আর আমাকে তা শুনতে হবে– এখন তো তুমিই আমাকে নিয়ে চলেছো।

তিমলি দাঁড়িয়ে যায়। বলে, ঠিক আছে, তাহলে চলো কোথাও বসি।

দু'জনে আর্ট কলেজের বকুল তলায় গিয়ে বসে। জায়গাটা একেবারে নির্জন নয়, দূরে দূরে ছবি আঁকতে দেখা যাচ্ছে কয়েকটি ছেলেমেয়েকে, এমনকি বকুল তলার বাঁধানো বেদীর ওপরেও দু'টি ছেলেমেয়েকে গভীর আলাপে মগ্ন দেখা যায়। মঞ্জুর অবাক লাগে। সামান্য কিছু দূরে অন্যায়ের প্রতিবাদী একজন তরুণের লাশ ছুঁয়ে কয়েক শ' তরুণ স্বৈরাচার উৎখাতের শপথ নিচ্ছে আর এখানে কেমন নিরিবিলি স্নিগ্ধ গাছের ছায়ায় ছেলেমেয়েরা ছবি আঁকছে। মন দেওয়া-নেওয়ার আলাপ করছে। সেই নিজেও শামিল হয়েছে ওদের সঙ্গে। যদিও সে একটু আগের ঐ শপথ নেওয়ার অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলো। দুটো একেবারে আলাদা জগৎ। আর অবাক কাণ্ড, দুটো জগতেরই পাশাপাশি অস্তিত্ব আছে। এক জগৎ থেকে আরেক জগতে যাওয়া-আসাও করা যায়। নওশিন আর তিমলি ঘনিষ্ঠ বন্ধু, কিন্তু আশ্চর্য ঘটনা এই যে, দু'জন একই সময়ে দুই জগতে রয়েছে।

গাছের ছায়ার নিচে বসার পর কোন দিক থেকে যেন হালকা এক ঝলক বাতাস এসে দু'জনের গায়ে মাথায় পরশ বুলিয়ে দিয়ে গেলো। মঞ্জুকে অন্যমনস্ক দেখে তিমলি। জিজ্ঞেস করে, কী ভাবছো?

মঞ্জু মাথা ঝাঁকিয়ে তিমলির মুখের দিকে তাকায়। বলে, না,কিছু না– এবার বলো কেন ডেকেছো? তোমার জরুরি কথাটা কি?

তিমলি কী বলবে ভেবে পায় না যেন, এমন ভাব করে। তার চোখে মুখে বিব্রত হওয়ার ভাব ফোটে। শেষে বলে, না তেমন কিছু না, এমনি– অনেক দিন কথা হয় না, তাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

সময় তারাও চলে গেলো, কিন্তু তোমার পাত্তা নেই। আড়াইটা পর্যন্ত অপেক্ষা করার পর সন্দেহ হলো, নওশিন স্লিপটা কি তোমার হাতে দিয়েছে? সন্দেহটা ক্রমেই বাড়তে থাকে, ওদিকে কার্জন হল একেবারে সুমসাম হয়ে উঠেছে ততোক্ষণে– একা থাকতে ভয় লাগছিলো, তাই বেরিয়ে পড়লাম।

বলতে বলতে তিমলি এক সময় থেমে যায়, আর মঞ্জুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। মঞ্জু লক্ষ্য করে তিমলির পরনে আজ হালকা সবুজ রঙের শাড়ি, সাদা, নকশি করা জামা, শরৎ শেষের রোদে বেশ ঘেমে উঠলেও আজ ওকে অন্যরকম লাগেছে। একটু যেন বেশি শান্ত, বেশি স্নিগ্ধ, বেশি কোমল।

তিমলির সঙ্গে আবার উল্টো দিকে হাঁটে মঞ্জু। জিজ্ঞেস করে, এদিকে কোথায় যাবে এখন?

ভারী মিষ্টি হাসি ফোটে তিমলির মুখে। বলে, তার আমি কী জানি। তোমার খবর নেওয়ার জন্য নওশিনের কাছে যাচ্ছিলাম, মাঝপথে তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো, এখন তুমি জানো, কোথায় আমাকে নিয়ে যাচ্ছো।

কিন্তু আমিই তো তোমার কাছে যাচ্ছিলাম, তুমি জরুরী কথা বলবে, আর আমাকে তা শুনতে হবে– এখন তো তুমিই আমাকে নিয়ে চলেছো।

তিমলি দাঁড়িয়ে যায়। বলে, ঠিক আছে, তাহলে চলো কোথাও বসি।

দু'জনে আর্ট কলেজের বকুল তলায় গিয়ে বসে। জায়গাটা একেবারে নির্জন নয়, দূরে দূরে ছবি আঁকতে দেখা যাচ্ছে কয়েকটি ছেলেমেয়েকে, এমনকি বকুল তলার বাঁধানো বেদীর ওপরেও দু'টি ছেলেমেয়েকে গভীর আলাপে মগ্ন দেখা যায়। মঞ্জুর অবাক লাগে। সামান্য কিছু দূরে অন্যায়ের প্রতিবাদী একজন তরুণের লাশ ছুঁয়ে কয়েক শ' তরুণ স্বৈরাচার উৎখাতের শপথ নিচ্ছে আর এখানে কেমন নিরিবিলি স্নিগ্ধ গাছের ছায়ায় ছেলেমেয়েরা ছবি আঁকছে। মন দেওয়া-নেওয়ার আলাপ করছে। সেই নিজেও শামিল হয়েছে ওদের সঙ্গে। যদিও সে একটু আগের ঐ শপথ নেওয়ার অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলো। দুটো একেবারে আলাদা জগৎ। আর অবাক কাণ্ড, দুটো জগতেরই পাশাপাশি অস্তিত্ব আছে। এক জগৎ থেকে আরেক জগতে যাওয়া-আসাও করা যায়। নওশিন আর তিমলি ঘনিষ্ঠ বন্ধু, কিন্তু আশ্চর্য ঘটনা এই যে, দু'জন একই সময়ে দুই জগতে রয়েছে।

গাছের ছায়ার নিচে বসার পর কোন দিক থেকে যেন হালকা এক ঝলক বাতাস এসে দু'জনের গায়ে মাথায় পরশ বুলিয়ে দিয়ে গেলো। মঞ্জুকে অন্যমনস্ক দেখে তিমলি। জিজ্ঞেস করে, কী ভাবছো?

মঞ্জু মাথা ঝাঁকিয়ে তিমলির মুখের দিকে তাকায়। বলে, না,কিছু না– এবার বলো কেন ডেকেছো? তোমার জরুরি কথাটা কি?

তিমলি কী বলবে ভেবে পায় না যেন, এমন ভাব করে। তার চোখে মুখে বিব্রত হওয়ার ভাব ফোটে। শেষে বলে, না তেমন কিছু না, এমনি– অনেক দিন কথা হয় না, তাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

মঞ্জুর খুব ইচ্ছে হয় বলে যে, কথা তো সে নিজেই বন্ধ করে দিয়েছে। কাছাকাছি হওয়ার পরিস্থিতি হলে এড়িয়ে যায়। টেলিফোনে পর্যন্ত কথা বলতে নিষেধ করে দিয়েছে। কথাগুলো তার মনে হয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত মুখ দিয়ে সে বের করে না।

একটা কথা জিজ্ঞেস করবো ? তিমলি মঞ্জুর চোখের ওপর চোখ রাখে।

মঞ্জু রাস্তার দিকে নজর মেলে ধরে বলে, একটা কেন দশটা জিজ্ঞেস করতে পারো।

আচ্ছা, রাখি তোমাকে পরে আর চিঠি লিখেছে ?

মঞ্জু একটু অবাক হয়। বলে, রাখি কেন চিঠি লিখবে, যা লেখার সে তো তার শেষ চিঠিতেই লিখে পাঠিয়েছিলো তোমার কাছে, তুমি ভুলে গেছো।

না ভুলি নি, তিমলি জানায়। বলে, ওর যে ছেলেটির সঙ্গে বিয়ে হবার কথা ছিলো সেই বিয়েটা শেষ পর্যন্ত হয় নি– ওর মা আমাকে বললেন।

সেকি! ওঁরা ফিরে এসেছেন ? মঞ্জুর কাছে অবিশ্বাস্য লাগে।

হ্যাঁ, সে তো প্রায় মাস দুই তিন হয়ে গেলো। রাখির বাবা তো ফিরে এসে পুরনো চাকরিতে জয়েনও করেছেন, তুমি জানো না ?

একটু থেমে ফের বলে তিমলি, শুনলাম ওঁরা রাখিকে ঢাকায় ফিরিয়ে আনার কথা ভাবছেন।

তো ? মঞ্জুর ভ্রূ আপনা থেকে কুঁচকে ওঠে খানিকটা।

সে তিমলির চোখে চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, তুমি কি এই খবরটা জানবার জন্য ঘটা করে অমন একখানা স্লিপ পাঠিয়েছিলে ?

মঞ্জুর চোখমুখের ভাব দেখে তিমলি খানিকটা অপ্রস্তুত হয়। বলে, তোমার হয়তো খারাপ লাগছে আমার মুখ থেকে খবরটা শুনছো বলে, বোধহয় রাগও হচ্ছে আমার ওপর। কিন্তু বুঝে দেখো ব্যাপারটা তো আমার জানা দরকার ?

কোন ব্যাপারটা ?

রাখির সঙ্গে তোমার এ্যাফেয়ারটা কী ধরনের ছিলো, ও তো খোলাখুলি বলতো, তোমাকে ও ভালোবাসে, কিন্তু তুমি ? তোমার কাছ থেকে তো কখনও খোলাখুলি অমন কথা আমি শুনি নি।

মঞ্জু হেসে ওঠে। বলে, মুখ থেকে শোনো নি, তাই বলে কি আমাদের সম্পর্কটা কেমন ছিলো তাও বোঝো নি ?

তিমলির ভ্রূ কুঁচকে ওঠে। বলে, হ্যাঁ বুঝেছিলাম যে তুমি ওকে ভালোবাসতে, তোমার সম্পর্কটা শুধুমাত্র বন্ধুত্বের ছিলো না। কিন্তু যখন ওর চলে যাওয়ার খবরটা পেলাম, তখন কিন্তু তোমাকে মন খারাপ করতে আমি দেখি নি– এমন কি ওর শেষ চিঠি যেটা পাই, যার মধ্যে তোমাকে ওর কাছে চিঠি লিখতে বারণ করে দেয়। সেই চিঠি পড়ার পরও তুমি যে খুব কষ্ট পেয়েছিলে তাও আমার মনে হয় নি বরং দেখতাম তুমি নর্মালই আছো, ক্লাস করছো, লাইব্রেরিতে নোট টুকছো, আমাদের সঙ্গে দিব্যি কথা বলছো– যাকে ভালোবাসা যায়, সে যদি লেট ডাউন করে, সেটা কি সহ্য করা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

যায় ? আমার মনে হতো, তোমার সঙ্গে ওর যে সম্পর্কটা গড়ে উঠেছিলো সেটা ভালোবাসার নয়। তুমি সত্যি করে বলো, রাখিকে কি তুমি ভালোবেসেছিলে ?

মঞ্জু অমন প্রশ্ন শুনে সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিতে পারে না। কিছুক্ষণ তিমলির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর জানায়, হ্যাঁ।

ওর জন্য জীবন দিতে পারতে ?

মঞ্জু মাথা নাড়তে নাড়তে বলে, আমি ও ব্যাপারে কিছু বলতে পারবো না। অমন ধরনের চিন্তা কখনও আমার মাথায় আসে নি।

কিন্তু তুমি তো দু'দুবার গুন্ডাদের হাত থেকে ওকে বাঁচাতে গিয়েছিলে ?

হ্যাঁ গিয়েছিলাম, মঞ্জু স্বীকার করে।

সেটা কি ভালোবাসার জন্য নয় ?

মঞ্জু এবারও একই রকম অনিশ্চিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ায়। বলে, আমি ঠিক জানি না মিলি, কখনও ভেবে দেখি নি, তবে আমার মনে হয়, কোনো মেয়ে বন্ধুর ওপর হামলা হলে যে কোনো ছেলে ঐ হামলা ঠেকাতে যাবে– ভালোবাসা থাকলেও না থাকলেও– ওতে ভালোবাসা প্রমাণিত হয় না।

তিমলি লক্ষ্য করে, মঞ্জু তাকে নতুন নামে ডাকলো।

কিন্তু ও ব্যাপারে সে কিছু বললো না, তার মন মঞ্জুর যুক্তি মানতে চায় না। সে ফের যুক্তি তোলে। বলে, তাহলে যখন তোমার সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করলো রাখি, তখন যে তোমার কষ্ট হয়েছিলো এমন তো কখনো দেখি নি।

কষ্টটা কি বাইরে দেখা যায় ?

হ্যাঁ যায়, তিমলি বলে, খুব আপনজন যারা, তারা ঠিকই দেখতে পায়। তোমার আব্বা কষ্ট পেলে তোমার আম্মা সেটা দেখতে পান। তোমার ভাই কষ্ট পেলে সেটা তোমার চোখ এড়াতে পারে না, তুমি কষ্ট পেলে সেটা নিশ্চয়ই তোমার মায়ের চোখে পড়তো। আর তিনি খোঁজ খবর করতেন, বলো, করতেন না ?

হ্যাঁ করতেন। মঞ্জু স্বীকার করে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করতে ছাড়ে না। বলে, এতো সব কথা বলে তুমি কী প্রমাণ করতে চাইছো ? তুমি কি নিজেকে বোঝাতে চাইছো যে রাখির সঙ্গে আমার যে সম্পর্কটা ছিলো সেটা ভালোবাসার নয় ? নাকি তার উল্টোটা ? বলো, তোমার কোনটা দরকার ? কোনটা হলে চলে ?

মঞ্জুর কথা শুনে তিমলির মনের ভিতরে বোধ হয় ঘা লাগে। সে বলে, না কোনোটারই আমার দরকার নেই। চলো, ওঠা যাক এবার। অনেকক্ষণ হলো বাড়ি থেকে বের হয়েছি।

মঞ্জু ঐ মুহূর্তে কী দেখে তিমলির চোখে মুখে সে-ই জানে। সঙ্গে সঙ্গে সে দু'হাত দিয়ে তিমলির একখানা হাত ধরে রাখে, উঠে দাঁড়াতে দেয় না। বলে, সরি, মিলি সরি, কথাটা আমার ওভাবে বলা উচিত হয় নি, তুমি মাফ করে দাও, প্লী-ই-ইজ।

তিমলি মুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে রাখে কিছুক্ষণ। তারপর আঁচল দিয়ে বোধহয় চোখ মোছে। শেষে বলে, তোমার কাছ থেকে আমার যা জানার ছিলো, তা জানা হয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

যায় ? আমার মনে হতো, তোমার সঙ্গে ওর যে সম্পর্কটা গড়ে উঠেছিলো সেটা ভালোবাসার নয়। তুমি সত্যি করে বলো, রাখিকে কি তুমি ভালোবেসেছিলে ?

মঞ্জু অমন প্রশ্ন শুনে সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিতে পারে না। কিছুক্ষণ তিমলির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর জানায়, হ্যাঁ।

ওর জন্য জীবন দিতে পারতে ?

মঞ্জু মাথা নাড়তে নাড়তে বলে, আমি ও ব্যাপারে কিছু বলতে পারবো না। অমন ধরনের চিন্তা কখনও আমার মাথায় আসে নি।

কিন্তু তুমি তো দু'দুবার গুন্ডাদের হাত থেকে ওকে বাঁচাতে গিয়েছিলে ?

হ্যাঁ গিয়েছিলাম, মঞ্জু স্বীকার করে।

সেটা কি ভালোবাসার জন্য নয় ?

মঞ্জু এবারও একই রকম অনিশ্চিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ায়। বলে, আমি ঠিক জানি না মিলি, কখনও ভেবে দেখি নি, তবে আমার মনে হয়, কোনো মেয়ে বন্ধুর ওপর হামলা হলে যে কোনো ছেলে ঐ হামলা ঠেকাতে যাবে– ভালোবাসা থাকলেও না থাকলেও– ওতে ভালোবাসা প্রমাণিত হয় না।

তিমলি লক্ষ্য করে, মঞ্জু তাকে নতুন নামে ডাকলো।

কিন্তু ও ব্যাপারে সে কিছু বললো না, তার মন মঞ্জুর যুক্তি মানতে চায় না। সে ফের যুক্তি তোলে। বলে, তাহলে যখন তোমার সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করলো রাখি, তখন যে তোমার কষ্ট হয়েছিলো এমন তো কখনো দেখি নি।

কষ্টটা কি বাইরে দেখা যায় ?

হ্যাঁ যায়, তিমলি বলে, খুব আপনজন যারা, তারা ঠিকই দেখতে পায়। তোমার আব্বা কষ্ট পেলে তোমার আম্মা সেটা দেখতে পান। তোমার ভাই কষ্ট পেলে সেটা তোমার চোখ এড়াতে পারে না, তুমি কষ্ট পেলে সেটা নিশ্চয়ই তোমার মায়ের চোখে পড়তো। আর তিনি খোঁজ খবর করতেন, বলো, করতেন না ?

হ্যাঁ করতেন। মঞ্জু স্বীকার করে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করতে ছাড়ে না। বলে, এতো সব কথা বলে তুমি কী প্রমাণ করতে চাইছো ? তুমি কি নিজেকে বোঝাতে চাইছো যে রাখির সঙ্গে আমার যে সম্পর্কটা ছিলো সেটা ভালোবাসার নয় ? নাকি তার উল্টোটা ? বলো, তোমার কোনটা দরকার ? কোনটা হলে চলে ?

মঞ্জুর কথা শুনে তিমলির মনের ভিতরে বোধ হয় ঘা লাগে। সে বলে, না কোনোটারই আমার দরকার নেই। চলো, ওঠা যাক এবার। অনেকক্ষণ হলো বাড়ি থেকে বের হয়েছি।

মঞ্জু ঐ মুহূর্তে কী দেখে তিমলির চোখে মুখে সে-ই জানে। সঙ্গে সঙ্গে সে দু'হাত দিয়ে তিমলির একখানা হাত ধরে রাখে, উঠে দাঁড়াতে দেয় না। বলে, সরি, মিলি সরি, কথাটা আমার ওভাবে বলা উচিত হয় নি, তুমি মাফ করে দাও, প্লী-ই-ইজ।

তিমলি মুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে রাখে কিছুক্ষণ। তারপর আঁচল দিয়ে বোধহয় চোখ মোছে। শেষে বলে, তোমার কাছ থেকে আমার যা জানার ছিলো, তা জানা হয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

গেছে। এবার আমি বাড়ি যাবো। ১৫ তারিখ থেকে এমনিতেই পূজার ছুটি আরম্ভ হচ্ছে, তোমার সঙ্গে আমার এমনিতেই দেখা হচ্ছে না কিছুদিন। ছুটি শেষ হওয়ার পরও দেখা হবে বলে মনে হয় না।

মঞ্জু বোকা হয়ে যায় তিমলির কথা শুনে। শুধু বলে, তার মানে ?

মানে খুবই সহজ, আমাকে বড় ভাই আমেরিকা নিয়ে যেতে চান। আমি ডিসিশন নিতে পারিনি– সেই জন্যই তোমার সঙ্গে আলাপ করা দরকার ছিলো– আলাপ তো হলো, এখন ডিসিশন নিতে আর কোনো অসুবিধা নেই।

মঞ্জু তিমলির দিকে তাকিয়ে থাকে। প্রথম দিন যে মেয়েটিকে দেখেছিলো সেই তিমলি আর তেমনটি নেই। কথায় কথায় খোঁচা মারতো, ঠাট্টা করতো, স্পষ্ট কথা বলতে কোনো সঙ্কোচ ছিলো না, চলাফেরায় ছিলো বেপরোয়া ভাব। সেই তিমলি দেখতে দেখতে কীভাবে বদলে গেলো, আর তার সঙ্গে কীভাবে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলো, নিজেই বলতে পারবে না। আর সেই তিমলি আজ বলছে, ওর সঙ্গে আর দেখা হবে না– এমন অবস্থায় সে কী করতে পারে ? রাখির সঙ্গে বন্ধুত্ব থাকার সুবাদে দু'জন কাছাকাছি হয়েছিলো– এখন তো রাখির অস্তিত্ব বলতে যে তার মনের মধ্যে কিছুই নেই, সেটা তিমলির অজানা নয়, তবু সেই রাখিই এখন বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। মঞ্জুর অদ্ভুত লাগে, যে রাখি নিজে সম্পর্ক ত্যাগ করেছে, যার সঙ্গে কোনো যোগাযোগ নেই, অথচ সেই রাখিই শেষ পর্যন্ত বাধা হয়ে দাঁড়ালো ?

তিমলি মিনিট খানেক দাঁড়ায় তারপর। শেষে 'আমি চলি' বলে রাস্তার ফুটপাথে নেমে দ্রুত পা ফেলে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। মঞ্জু পিছনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তিমলির চলে যাবার দৃশ্যটা দেখে। কিছুদূর যাবার পর রিকশা পেয়ে তাতে উঠে বসে তিমলি, তারপর আর তাকে দেখা যায় না।

মঞ্জু কতোক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলো বলতে পারবে না ? একসময় সে স্লোগানের আওয়াজ শোনে আর তাতে তার ঘোর ভাঙে। দেখে, একটা বড় মিছিল আসছে। তরুণদের সংখ্যা বেশি, বয়স্ক লোকও আছে। মনে হয়, অনেক দূর থেকে আসছে মিছিলটা। ঘামে ভেজা মুখ, শরতের হেলে পড়া রোদে চকচক করছে, জামার হাতাগোটানো মুষ্টিবদ্ধ হাত ওপরের দিকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে গলা ফাটিয়ে সমস্বরে চিৎকার করে স্লোগান দিচ্ছে সবাই– স্বৈরাচার নিপাত যাক, শহীদ নূর হোসেন অমর হোক, জাহিদ হত্যার বিচার চাই। স্বৈরাচার নিপাত যাক– গণতন্ত্র মুক্তি পাক, সামরিক শাসন– ধ্বংস হোক। মুহূর্মুহু স্লোগানের আওয়াজ আর অসংখ্য লোকের পদপাতের শব্দে মঞ্জুর চিন্তাভাবনা গুলিয়ে যায়। তার পায়ের পেশীতে পেশীতে বিচিত্র ধরনের টান লাগে, রক্তধারার স্পন্দনও কেমন যেন দ্রুততর হয়ে ওঠে, গলার স্বরতন্ত্রীতেও কাঁপন লাগে। ফলে গলা দিয়ে যেমন আপনা থেকে স্লোগান বেরিয়ে যায়, তেমনই পা দু'খানিও অসংখ্য পায়ের পদপাতের সঙ্গে তাল দিতে দিতে মিছিলে শামিল হয়ে যায়।

মঞ্জুর এখন দুই কাজ। হাসপাতালের দু'বেলা ডিউটি আর বিএমএতে অফিসের কাজ দেখা। তার ওপর আবার বিসিএস পরীক্ষার জন্য তৈরি হওয়ারও একটা ব্যাপার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

আছে, তবে সেটা নিয়মিত কাজের মধ্যে সে ধরে না। যদিও একেক দিন তাকে লাইব্রেরিতে গিয়ে বসতে হয়।

লাইব্রেরিতে হঠাৎ একদিন শাহনির সঙ্গে দেখা। শাহনিই সামনে এসে দাঁড়ায়। বলে, তুমি নাকি ইন্টার্নিশিপ আরও ছ'মাস কন্টিনিউ করবে?

কেন, তুমি করবে না? রঞ্জু পাল্টা জিজ্ঞেস করে।

নাহ্, কী দরকার, প্রাইভেট হাসপাতালে তো কাজ নিয়ে ফেলেছি।

বাহ্ খুব লাকি তুমি, রঞ্জু খুশি হয়েছে এমন ভাব দেখায়। তারপর জিজ্ঞেস করে, আরমানও কি কোথাও ঢুকেছে?

ও মা, তুমি জানো না? শাহনি যেন একটু অবাক হয়। বলে পরশু দিন তো ও আমেরিকা চলে গেছে। ওর মামার কাছে। ওখানে হায়ার ডিগ্রী নেবে।

তুমি গেলে না?

দেখি! শাহনি জানালা দিয়ে বাইরে তাকাতে তাকাতে বলে, তার গলার স্বরে অনিশ্চিত একটা ভাব ফোটে।

রঞ্জুর কেমন সন্দেহ হয়। বলে, তোমরা সদ্য বিয়ে করেছো এখন এভাবে ছাড়াছাড়ি থাকাটা ঠিক নয়, তুমিও যাচ্ছো তো?

বোধহয়, শাহনি অনিশ্চিত ভঙ্গিতে বলে, কপালকে নিজের ইচ্ছামতো বানানো যায় না। যায় কি?

শাহনির কথা শুনে রঞ্জুর বুকের ভিতর ধক্ করে ওঠে। সে জিজ্ঞেস করে, তুমি এখন আরমানদের বাড়িতে আছো তো?

শাহনি মাথা নাড়ায়। বলে, না আমি আমার চাচার বাসায় থাকি এখন।

কেন?

শাহনি ম্লান হাসে। বলে, এমনি, মনে করো আমার শখ।

কয়েক মুহূর্ত পর মাথা নিচু করে শাহনি ফের বলে, রঞ্জু, আমার জীবনে শেষ পর্যন্ত কী হবে আমি জানি না।

শাহনি রাস্তার দিকে চলে যায়, আর রঞ্জু অনেকক্ষণ পর্যন্ত ওর দিকে তাকিয়ে থাকে।

রায়হানকে খবরটা প্রথমে দেয় সালেহউদ্দিন। টেলিফোনে জানায়, রায়হান ভাই, দামামা বোধহয় বাজলো।

কি রকম? রায়হান না হেসে পারে না।

নজরুলের গানের একটা কলি সে টেলিফোনেই গুন গুন করে। বাজিছে দামামা বাঁধরে আমামা দুনিয়ার যতো মুসলমান।

মুসলমান আমামা বাঁধলে তোমার কি?

শুনুন, তিন জোটের যৌথ বিবৃতি যাচ্ছে প্রেস-এ, তাতে প্রধান পয়েন্ট তিনটা, এক. এরশাদ বিদায় হও, যাওয়ার আগে তিন জোটের নির্বাচিত লোককে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান করে তার হাতে ক্ষমতা দিয়ে দাও। দুই. প্রেসিডেনশিয়াল ফর্ম থাকবে না, সভারেইন পার্লামেন্ট থাকবে এবং সরকারও হবে পার্লামেন্টারি ফর্মের।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

আছে, তবে সেটা নিয়মিত কাজের মধ্যে সে ধরে না। যদিও একেক দিন তাকে লাইব্রেরিতে গিয়ে বসতে হয়।

লাইব্রেরিতে হঠাৎ একদিন শাহনির সঙ্গে দেখা। শাহনিই সামনে এসে দাঁড়ায়। বলে, তুমি নাকি ইন্টার্নিশিপ আরও ছ'মাস কন্টিনিউ করবে?

কেন, তুমি করবে না? রঞ্জু পাল্টা জিজ্ঞেস করে।

নাহ্, কী দরকার, প্রাইভেট হাসপাতালে তো কাজ নিয়ে ফেলেছি।

বাহ্ খুব লাকি তুমি, রঞ্জু খুশি হয়েছে এমন ভাব দেখায়। তারপর জিজ্ঞেস করে, আরমানও কি কোথাও ঢুকেছে?

ও মা, তুমি জানো না? শাহনি যেন একটু অবাক হয়। বলে পরশু দিন তো ও আমেরিকা চলে গেছে। ওর মামার কাছে। ওখানে হায়ার ডিগ্রী নেবে।

তুমি গেলে না?

দেখি! শাহনি জানালা দিয়ে বাইরে তাকাতে তাকাতে বলে, তার গলার স্বরে অনিশ্চিত একটা ভাব ফোটে।

রঞ্জুর কেমন সন্দেহ হয়। বলে, তোমরা সদ্য বিয়ে করেছো এখন এভাবে ছাড়াছাড়ি থাকাটা ঠিক নয়, তুমিও যাচ্ছো তো?

বোধহয়, শাহনি অনিশ্চিত ভঙ্গিতে বলে, কপালকে নিজের ইচ্ছামতো বানানো যায় না। যায় কি?

শাহনির কথা শুনে রঞ্জুর বুকের ভিতর ধক্ করে ওঠে। সে জিজ্ঞেস করে, তুমি এখন আরমানদের বাড়িতে আছো তো?

শাহনি মাথা নাড়ায়। বলে, না আমি আমার চাচার বাসায় থাকি এখন।

কেন?

শাহনি ম্লান হাসে। বলে, এমনি, মনে করো আমার শখ।

কয়েক মুহূর্ত পর মাথা নিচু করে শাহনি ফের বলে, রঞ্জু, আমার জীবনে শেষ পর্যন্ত কী হবে আমি জানি না।

শাহনি রাস্তার দিকে চলে যায়, আর রঞ্জু অনেকক্ষণ পর্যন্ত ওর দিকে তাকিয়ে থাকে।

রায়হানকে খবরটা প্রথমে দেয় সালেহউদ্দিন। টেলিফোনে জানায়, রায়হান ভাই, দামামা বোধহয় বাজলো।

কি রকম? রায়হান না হেসে পারে না।

নজরুলের গানের একটা কলি সে টেলিফোনেই গুন গুন করে। বাজিছে দামামা বাঁধরে আমামা দুনিয়ার যতো মুসলমান।

মুসলমান আমামা বাঁধলে তোমার কি?

শুনুন, তিন জোটের যৌথ বিবৃতি যাচ্ছে প্রেস-এ, তাতে প্রধান পয়েন্ট তিনটা, এক. এরশাদ বিদায় হও, যাওয়ার আগে তিন জোটের নির্বাচিত লোককে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান করে তার হাতে ক্ষমতা দিয়ে দাও। দুই. প্রেসিডেনশিয়াল ফর্ম থাকবে না, সভারেইন পার্লামেন্ট থাকবে এবং সরকারও হবে পার্লামেন্টারি ফর্মের।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

কালাকানুন বাতিল করতে হবে। ইমিডিয়েটলি পার্লামেন্ট নির্বাচন দিতে হবে। সালেহউদ্দিন শেষ কথা বলে, দেখবেন মুসলমানরা আমামা বাঁধলো বলে, কান পাতলে দামামার আওয়াজও শুনতে পাবেন।

সত্যি সত্যি দুপুরের মধ্যেই প্রেস রিলিজের কপি নিউজ সেকশন-এ এসে গেল। তরুণ সাংবাদিকরা খবরটা পেয়ে হৈ হৈ করে উঠলো।

রায়হান লক্ষ্য করে, তরুণদের উচ্ছাস কেমন যেন বেড়েই চলেছে। কিন্তু সে নিজে মনের ভেতরে কোনো সাড়া অনুভব করে না। তার মনের ভিতরে সংশয় পাক খায়। আসলেই কি সত্যিসত্যি সুদিন আসবে ? প্রশ্নটার কোনো জবাব সে কোনো দিকে খুঁজে পায় না। আমানউল্লাহ নিউজ টেবিলের হল্লা শুনে বারান্দায় এসে দাঁড়ান। রায়হানকে দেখে বলেন, কী যে পাগলামি শুরু করেছে এরা– আরে বাবা আর্মি আছে না ? পলিটিক্যাল পার্টিরা মামাবাড়ির আব্দার করবে, আর তাই পেয়ে যাবে ? এ্যাঁ ? এ্যাতো সোজা ? দেখিস, পেছনে কারা আসছে– পালাতে তখন দিশা পাবি না।

গলা নামিয়ে রায়হানের কানে কানে বলেন, ২৫ তারিখে তো সেনাবাহিনী দিবস– ঐ দিনই দেখবেন কী হয়।

রায়হান হাসে, বলে, কী আর হবে। আন্দোলন তো রোজই হচ্ছে। কালকেই দেখবেন, রাস্তায় কতো মিছিল বেরিয়েছে। তিন জোটের বিবৃতি সমর্থন সবাই করবে।

দু'দিন পর দেখা গেলো সামরিক বাহিনী বিরোধী দলকে হরতালের কর্মসূচী না দেয়ার জন্য অনুরোধ করেছে। এবং দেখা গেলো, সত্যি সত্যিই সেদিন কোনো হরতাল-মিছিল হলো না। তবে সেদিন ইউনিভার্সিটি এলাকায় প্রায় দু'তিন ঘণ্টা জুড়ে গোলাগুলি চলে ? সরকারী দলের জাতীয় ছাত্র সমাজের ক্যাডারদের সঙ্গে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ছেলেদের ঝগড়া লাগে। আর তাতেই ধুন্ধুমার কাণ্ড বেধে যায়। জাতীয় ছাত্র সমাজের ক্যাডাররা শেষ পর্যন্ত ইউনিভার্সিটি এলাকা ছেড়ে পালায়।

পরের দিন আবার গোলাগুলি। ঐ ইউনিভার্সিটি এলাকাতেই। জিরো পয়েন্টে শহীদ নূর হোসেন চত্বরে ছাত্ররা সমাবেশ করে ফিরছিলো। কার্জন হলের কাছে ঐ মিছিলের ওপর গুলি চালায়। টিএসসি'র সামনে থেকে পুলিশ মিছিল হটাতে যায়। ব্যস লেগে যায় হাঙ্গামা। নিমাই হত্যার প্রতিবাদে ছাত্রলীগ বিক্ষোভের ঘোষণা দেয়। সভার সভাপতি ডাক দেয়, ছাত্ররা সবাই যেন পরের দিন বাঁশের লাঠি হাতে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসে।

মঞ্জু তখন টিএসসি এলাকায় ছিলো। পাশে ছিলো হামিদ। ছাত্রলীগের সভাপতির ঐ ডাক শুনে সে খুব এক চোট হাসে। বলে, বুর্জোয়া পলিটিক্সের এই এক লিমিটেশন। কবেকার তেভাগা আন্দোলনের প্রোগ্রাম নিচ্ছে হাফ সেঞ্চুরি পরে। তাও রুরাল এরিয়ার প্রোগ্রাম দিচ্ছে আরবান এরিয়াতে। বুদ্ধির বহরখানা দেখো।

মঞ্জুর জানা ছিলো না বাঁশের লাঠির তত্ত্বটা। হামিদ তার ঘটনাগুলো বর্ণনা করে। তেভাগা আন্দোলনের সময় পার্টি থেকে ডাক দেয়া হয়েছিলো কৃষকরা যেন চার হাত লম্বা লাঠি নিয়ে আন্দোলনে শামিল হয়। তো পুলিশের রাইফেল-মেশিনগানের সামনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

কি বাঁশের লাঠি নিয়ে দাঁড়াতে পারে গরিব কৃষক ? তবু কৃষক লড়াইয়ে নামলো। মেয়েরা শুকনো মরিচের গুঁড়ো মেশানো গরম পানি হামলাকারী পুলিশের মুখে ছুঁড়ে রাইফেল কেড়ে নিয়েছে। পুরুষরা তীরধনুক দিয়ে যুদ্ধ করেছে। আর অন্য দিকে দাদা কমরেড আর দিদি কমরেডরা পুলিশের দিকে দু'হাত বাড়িয়ে দিয়ে সিকিউরিটি প্রিজনার হয়ে গেছে।

মঞ্জু শোনে আর অবাক হয়। শুনতে শুনতেই তার মনে হয়, যতো কিছুই হোক, লড়াইটা তো বাস্তব, সেটা তো চালাতে হবে, সুতরাং বাঁশের লাঠি আনার প্রোগ্রামটার কোনো মূল্য নেই এমন কিন্তু আমার মনে হয় না।

হামিদ হাসে, দেখা যাক কী ফল দাঁড়ায়। হামিদ বিদায় নেয়ার সময় বলে, কাল কি আসবি ?

হ্যাঁ। শিওর, আসবো না মানে ? না এসে কি তুই নিজেও থাকতে পারবি ? বাঁশের লাঠি দিয়ে কী রকম খেলা হবে, দেখবি না ?

মঞ্জু বাসায় ফিরে শোনে আব্বা দুপুর বেলা খেতে আসেন নি। মা ইস্কুল থেকে ফিরে এসে দেখেন মোমেনার মা একা ভাত বেড়ে রেখে অপেক্ষা করছে।

অফিসে ফোন করে বীথি। অফিস থেকে জানায় রায়হান স্যার এমডি'র রুমে মিটিং করছেন, বের হতে দেরি আছে।

ঘন্টা খানেক পর ফের টেলিফোন করা হলে তখন জানায়, এই মাত্র উনি বেরিয়ে গেলেন, প্রেসক্লাবের দিকে গেছেন।

মিটিং আর আলোচনা, আলোচনা আর সিদ্ধান্ত। সব সেরে বাসায় যখন ফেরে তখন সন্ধ্যা পার হয়ে গেছে। বীথি টুকুর হোমওয়ার্ক নিয়ে বসেছে।

বীথি জিজ্ঞেস করে, মঞ্জু বলছিলো আগামীকাল নাকি ইউনিভার্সিটির দিকে খুব গোলমাল হবে ? হরতাল টরতাল ডাকে নি তো কেউ ?

রায়হান মাথা নাড়ায়। বলে নাহ্ রোজ রোজ কি হরতাল হবে না কি ? আর হলে সেটা মানুষ কেন মানতে যাবে ?

কি জানি বাপু তোমরা কী করো, তোমরাই জানো, আমরা তো ইস্কুলে পূজার ছুটি বাড়িয়ে দিয়েছি। এখন যতো পারো গণ্ডগোল করো তোমরা। ছেলেপুলেদের মা-বাবা সামলাবে, আমাদের এখন আর কোনো দায়িত্ব রইলো না।

সকাল বেলা একটু মেঘলা ভাব ছিলো আকাশে। শরতের শেষ ভোরের বাতাসে একটু হিমহিম ভাব। রঞ্জুর ঘুম ভোরের দিকেই ভেঙে যায়। দরজা খুলে বারান্দায় বেরুলে একদিকে আতিককে দেখে অন্যদিকে মাসুদকে দেখে। ঠেলা গাড়িতে বাঁশ নিয়ে যেতে দেখে আতিক বলে, দেখেছো, কেমন সরু সরু বাঁশ নিয়ে যাচ্ছে ? নিশ্চয়ই কালকের ছাত্রদের মিটিংয়ের জের। আজ বোধহয় বাঁশের দাম খুব বেড়ে গেছে।

মাসুদ বোধহয় খবরটা জানতো না। সে একটু অবাক হয়। জানতে চায়, কেন ? হঠাৎ বাঁশের দাম বাড়বে কেন ?

বাহ্ জানো না, বাঁশের লাঠি নিয়ে যেতে বলেছে ছাত্রলীগের নেতারা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

কি বাঁশের লাঠি নিয়ে দাঁড়াতে পারে গরিব কৃষক ? তবু কৃষক লড়াইয়ে নামলো। মেয়েরা শুকনো মরিচের গুঁড়ো মেশানো গরম পানি হামলাকারী পুলিশের মুখে ছুঁড়ে রাইফেল কেড়ে নিয়েছে। পুরুষরা তীরধনুক দিয়ে যুদ্ধ করেছে। আর অন্য দিকে দাদা কমরেড আর দিদি কমরেডরা পুলিশের দিকে দু'হাত বাড়িয়ে দিয়ে সিকিউরিটি প্রিজনার হয়ে গেছে।

মঞ্জু শোনে আর অবাক হয়। শুনতে শুনতেই তার মনে হয়, যতো কিছুই হোক, লড়াইটা তো বাস্তব, সেটা তো চালাতে হবে, সুতরাং বাঁশের লাঠি আনার প্রোগ্রামটার কোনো মূল্য নেই এমন কিন্তু আমার মনে হয় না।

হামিদ হাসে, দেখা যাক কী ফল দাঁড়ায়। হামিদ বিদায় নেয়ার সময় বলে, কাল কি আসবি ?

হ্যাঁ। শিওর, আসবো না মানে ? না এসে কি তুই নিজেও থাকতে পারবি ? বাঁশের লাঠি দিয়ে কী রকম খেলা হবে, দেখবি না ?

মঞ্জু বাসায় ফিরে শোনে আব্বা দুপুর বেলা খেতে আসেন নি। মা ইস্কুল থেকে ফিরে এসে দেখেন মোমেনার মা একা ভাত বেড়ে রেখে অপেক্ষা করছে।

অফিসে ফোন করে বীথি। অফিস থেকে জানায় রায়হান স্যার এমডি'র রুমে মিটিং করছেন, বের হতে দেরি আছে।

ঘন্টা খানেক পর ফের টেলিফোন করা হলে তখন জানায়, এই মাত্র উনি বেরিয়ে গেলেন, প্রেসক্লাবের দিকে গেছেন।

মিটিং আর আলোচনা, আলোচনা আর সিদ্ধান্ত। সব সেরে বাসায় যখন ফেরে তখন সন্ধ্যা পার হয়ে গেছে। বীথি টুকুর হোমওয়ার্ক নিয়ে বসেছে।

বীথি জিজ্ঞেস করে, মঞ্জু বলছিলো আগামীকাল নাকি ইউনিভার্সিটির দিকে খুব গোলমাল হবে ? হরতাল টরতাল ডাকে নি তো কেউ ?

রায়হান মাথা নাড়ায়। বলে নাহ্ রোজ রোজ কি হরতাল হবে না কি ? আর হলে সেটা মানুষ কেন মানতে যাবে ?

কি জানি বাপু তোমরা কী করো, তোমরাই জানো, আমরা তো ইস্কুলে পূজার ছুটি বাড়িয়ে দিয়েছি। এখন যতো পারো গণ্ডগোল করো তোমরা। ছেলেপুলেদের মা-বাবা সামলাবে, আমাদের এখন আর কোনো দায়িত্ব রইলো না।

সকাল বেলা একটু মেঘলা ভাব ছিলো আকাশে। শরতের শেষ ভোরের বাতাসে একটু হিমহিম ভাব। রঞ্জুর ঘুম ভোরের দিকেই ভেঙে যায়। দরজা খুলে বারান্দায় বেরুলে একদিকে আতিককে দেখে অন্যদিকে মাসুদকে দেখে। ঠেলা গাড়িতে বাঁশ নিয়ে যেতে দেখে আতিক বলে, দেখেছো, কেমন সরু সরু বাঁশ নিয়ে যাচ্ছে ? নিশ্চয়ই কালকের ছাত্রদের মিটিংয়ের জের। আজ বোধহয় বাঁশের দাম খুব বেড়ে গেছে।

মাসুদ বোধহয় খবরটা জানতো না। সে একটু অবাক হয়। জানতে চায়, কেন ? হঠাৎ বাঁশের দাম বাড়বে কেন ?

বাহ্ জানো না, বাঁশের লাঠি নিয়ে যেতে বলেছে ছাত্রলীগের নেতারা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বাঁশের লাঠি দিয়ে কী হবে ? মাসুদ বুঝতে পারে না। বলে, মাথা ফাটাবে কারোর।

বাঁশ দিয়ে কি শুধু মাথাই ফাটায় ? আতিক হাসতে হাসতে বলে, কোনো কোনো জায়গা দিয়ে তো ঢোকানোও হয়– হয় না ?

হাসাহাসি হয় কিছুক্ষণ। তারপর রঞ্জু তৈরি হয়। সাড়ে আটটা নাগাদ সে উউটিতে চলে যায়। ঘন্টা দেড়েক পরই কে যেন বলে, মিলন ভাইকে গুলি করেছে।

তারপর হুলস্থুল কাণ্ড ঘটে যায়। কে, কোথায়, কখন, এখন কোথায় ? কোন হারামজাদা ? এই সব শব্দ মুহূর্মুহু শোনা যেতে লাগলো, প্যাসেজের একদিক থেকে আর একদিকে মানুষ দৌড়ানোর টানা আওয়াজ হয়ে চললো অনেকক্ষণ ধরে। রঞ্জুও বেরুলো। মিলন ভাইয়ের ওপর গুলি চালানো হয়েছে। কেউ বলে, ছাত্র সমাজের কাজ, মাইক্রোবাসে করে আসে। কেউ বলে, না সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের ভিতরে এসে বসে ছিলো। গাছের আড়াল থেকে গুলি করে– গুলিটা করে পেছন থেকে। নানান ধরনের অনুমান আর অনুমান। রঞ্জু ছুটে বেরুলো পিজির বিএমএ অফিসের দিকে। কেননা ওখানেই মিলন ভাইয়ের মিটিং করতে যাওয়ার কথা। শাহনি কাছে ছিলো, সে হাত ধরে টেনে থামায়। বলে, কোথায় যাচ্ছো পাগলের মতো, ও দিকেও তো গোলাগুলি হতে পারে।

রঞ্জু কোনো কথা না বলে জোরে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে প্রায় দৌড় দেয় একটা।

কিন্তু লাভ হয় না, ওখানে ডাক্তার জামালকে পাওয়া যায়। কে একজন বলে, জামাল ভাই আল্লাহ বাঁচিয়ে দিয়েছেন– আপনিই নাকি ওদের টার্গেট ছিলেন। জামাল বলেন, এখানে মিটিং হবে না, মিটিং হবে ঢাকা মেডিক্যাল-এ।

বাইরে তখন দিগন্ত কাঁপানো স্লোগান, ঢাকা মেট্রোপলিটন সিটি ভয়ানক রাগে জ্বলে জ্বলে উঠছে। গাড়ি জ্বালানো ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখা যাচ্ছে চারদিকের আকাশে। রায়হান জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে কিছুক্ষণ দেখে তারপর মনে মনে পুরনো অভিজ্ঞতার সঙ্গে মেলায়। একই রকম দেখতে লাগে তার। '৬৯-এ এমনই তো দেখেছিলো সে। সময় কি তাহলে এসে গেলো সালেহউদ্দিনের দামামা কি সত্যি সত্যি বেজে উঠলো।

সে নিচে নেমে আসে। রিপোর্টারদের মধ্যে মাত্র একজন ফিরেছে। সাজিদ ঘটনার বয়ান দিতে দিতে ঘেমে উঠেছে ইতিমধ্যে। কে ? কারা ছিলো গুলি করার পেছনে ? প্রশ্নটা একজনের না বহুজনের বোঝা যায় না। সাজিদ বলে, তখন তো টিএসসির সামনে অনেক ছেলে। মাইক্রোবাসে করে এসেছিলো। মাইক্রোবাসটাকে ধাওয়া করে তারা। তখন পাল্টাগুলি করে, সবই ছররা গুলি, বহু ছেলে জখম হয়েছে। মাইক্রোটাকে ধরতে পারে নি। নাজিমউদ্দিন রোডের দিকে কোন গলির ভেতরে নাকি ঢুকে গেছে।

বিএমএ'র মিটিং হয়েছে সেই ঘরে যার পাশের ঘরে ডাক্তার মিলনের লাশ রাখা ছিলো। হ্যাঁ মেডিক্যাল কলেজেই– সেখানে সিদ্ধান্ত হয় আলমের হত্যার জন্য দায়ী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

স্বৈরাচারী প্রেসিডেন্ট, তাকে অপসারিত না করা পর্যন্ত সারাদেশে ডাক্তাররা কর্মবিরতি পালন করবে। হ্যাঁ, ছাত্রদের সঙ্গে ডাক্তাররাও মিছিলে নেমে গেছে। ঐ সময় কে একজন বলে ওঠে, সুপ্রীম কোর্ট থেকে আইনজীবীরাও মিছিল নিয়ে রাস্তায় নেমে পড়েছেন।

সাজিদের কথা শেষ হওয়ার আগেই নতুন পিয়ন মনু মিয়া চিৎকার করতে করতে ঢোকে, কেহ বাদ নাই, ইস্কুলের ছাত্রগো মিছিলটা দেইখা আহেন। পুরানা ঢাকার ইস্কুল কলেজ কোর্টমোর্ট সব বন্ধ। এইদিক এলিফ্যান্ট রোডে তো যুদ্ধ চলতাছে, পুলিশ জানি কারে ধরতে গেছে, ধরতে পারে নাই।

আরে আমরা এখনে কী করছি, চলো আমরাও বের হয়ে পড়ি। আব্দুল্লাহ বলে, রায়হান ভাই, চলুন, আপাতত প্রেস ক্লাব পর্যন্ত যাওয়া যাক। ওখানে গিয়ে তারপর সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে কী করা যায়। এই যে রাস্তায় নামছি, এবার কিন্তু আর ফেরাফিরি নেই। ইউনিয়নের লীডারদের আপনি বলে দেবেন।

বেরিয়ে পড়তে দেরি হয় না একটুও। মিনিট দশেকের মধ্যে মিছিল স্লোগান ঠিক ঠিক মতো শুরু হয়ে যায়। মাঝ পথে দৈনিক 'যুগের আলো' পত্রিকার সাংবাদিকদের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। পল্টনের মোড়ের কাছাকাছি দেখা যায় আরও একটা মিছিল আসছে। বাচ্চা বাচ্চা ইস্কুলের ছেলেরা গিছিল নিয়ে বেরিয়েছে। আরে! ওটা কে ? রায়হান চোখ কচলে দেখে, কী কাণ্ড, টুকুও মিছিলের মধ্যে এসে জুটেছে ! রায়হান পা ফেলে আর ছেলের দিকে তাকায়, ছোট ছোট হাত মুঠো করে শূন্যে ছুঁড়ছে। স্লোগান দিতে দিতে রোদ লাগা ফর্শা মুখ রীতিমতো লাল হয়ে উঠেছে।

রায়হান মাথা নিচু করে পা ফেলে আর রাস্তায় পীচ দেখে। '৬৯-এও সে মিছিলে ছিলো এই রকমভাবেই। তখন সে একা মিছিলে ছিলো আজ তার কিশোর ছেলেও মিছিলে আছে, ওর বড় দুই ভাইও নিশ্চয়ই মিছিল করছে। কিন্তু মিছিলের শেষে কী হয়েছে ? '৬৯-এর পর কী ? না '৭১। কিন্তু তারপরে ? তারপরও তো মিছিল হয়েছে– অথচ যারা মিছিল করেছিলো, তারা এখনও করছে। তাদের ছেলেপুলেরাও করছে। কিন্তু মিছিল করার দরকার ফুরোচ্ছে না– যাদের হটাবার জন্য আন্দোলন আর মিছিল তারা কিন্তু হটছে না। নানান কায়দায় ঠিকই পুরনো আসনে জাঁকিয়ে বসছে।

প্রেসক্লাবের কাছাকাছি মিছিল পৌঁছলে দেখে সালেহউদ্দিন ক্যামেরা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করে, সালেহ, বুড়ো হয়ে গেলাম তবু মিছিল করে চলেছি আরও কতোদিন করতে হবে বলতে পারো ?

সালেহউদ্দিন হাসে। বলে, যতোদিন বেঁচে আছেন, ততোদিন করতে হবে। আপনার পর আমরা আছি, আমাদের পরে আমাদের ছেলেরা আছে, কিন্তু মিছিল থামানো যাবে না– বলুন যাবে ? মিছিল থামিয়ে দিলে কি আমরা বাঁচবো ?

রায়হান হাসে। বলে, না বাঁচবো না। কথাটা বলার পর পরই সে ডান পা খানা সামনের দিকে ফেলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

স্বৈরাচারী প্রেসিডেন্ট, তাকে অপসারিত না করা পর্যন্ত সারাদেশে ডাক্তাররা কর্মবিরতি পালন করবে। হ্যাঁ, ছাত্রদের সঙ্গে ডাক্তাররাও মিছিলে নেমে গেছে। ঐ সময় কে একজন বলে ওঠে, সুপ্রীম কোর্ট থেকে আইনজীবীরাও মিছিল নিয়ে রাস্তায় নেমে পড়েছেন।

সাজিদের কথা শেষ হওয়ার আগেই নতুন পিয়ন মনু মিয়া চিৎকার করতে করতে ঢোকে, কেহ বাদ নাই, ইস্কুলের ছাত্রগো মিছিলটা দেইখা আহেন। পুরানা ঢাকার ইস্কুল কলেজ কোর্টমোর্ট সব বন্ধ। এইদিক এলিফ্যান্ট রোডে তো যুদ্ধ চলতাছে, পুলিশ জানি কারে ধরতে গেছে, ধরতে পারে নাই।

আরে আমরা এখনে কী করছি, চলো আমরাও বের হয়ে পড়ি। আব্দুল্লাহ বলে, রায়হান ভাই, চলুন, আপাতত প্রেস ক্লাব পর্যন্ত যাওয়া যাক। ওখানে গিয়ে তারপর সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে কী করা যায়। এই যে রাস্তায় নামছি, এবার কিন্তু আর ফেরাফিরি নেই। ইউনিয়নের লীডারদের আপনি বলে দেবেন।

বেরিয়ে পড়তে দেরি হয় না একটুও। মিনিট দশেকের মধ্যে মিছিল স্লোগান ঠিক ঠিক মতো শুরু হয়ে যায়। মাঝ পথে দৈনিক 'যুগের আলো' পত্রিকার সাংবাদিকদের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। পল্টনের মোড়ের কাছাকাছি দেখা যায় আরও একটা মিছিল আসছে। বাচ্চা বাচ্চা ইস্কুলের ছেলেরা গিছিল নিয়ে বেরিয়েছে। আরে! ওটা কে? রায়হান চোখ কচলে দেখে, কী কাণ্ড, টুকুও মিছিলের মধ্যে এসে জুটেছে! রায়হান পা ফেলে আর ছেলের দিকে তাকায়, ছোট ছোট হাত মুঠো করে শূন্যে ছুঁড়ছে। স্লোগান দিতে দিতে রোদ লাগা ফর্শা মুখ রীতিমতো লাল হয়ে উঠেছে।

রায়হান মাথা নিচু করে পা ফেলে আর রাস্তায় পীচ দেখে। '৬৯-এও সে মিছিলে ছিলো এই রকমভাবেই। তখন সে একা মিছিলে ছিলো আজ তার কিশোর ছেলেও মিছিলে আছে, ওর বড় দুই ভাইও নিশ্চয়ই মিছিল করছে। কিন্তু মিছিলের শেষে কী হয়েছে? '৬৯-এর পর কী? না '৭১। কিন্তু তারপরে? তারপরও তো মিছিল হয়েছে– অথচ যারা মিছিল করেছিলো, তারা এখনও করছে। তাদের ছেলেপুলেরাও করছে। কিন্তু মিছিল করার দরকার ফুরোচ্ছে না– যাদের হটাবার জন্য আন্দোলন আর মিছিল তারা কিন্তু হটছে না। নানান কায়দায় ঠিকই পুরনো আসনে জাঁকিয়ে বসছে।

প্রেসক্লাবের কাছাকাছি মিছিল পৌঁছলে দেখে সালেহউদ্দিন ক্যামেরা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করে, সালেহ, বুড়ো হয়ে গেলাম তবু মিছিল করে চলেছি আরও কতোদিন করতে হবে বলতে পারো?

সালেহউদ্দিন হাসে। বলে, যতোদিন বেঁচে আছেন, ততোদিন করতে হবে। আপনার পর আমরা আছি, আমাদের পরে আমাদের ছেলেরা আছে, কিন্তু মিছিল থামানো যাবে না– বলুন যাবে? মিছিল থামিয়ে দিলে কি আমরা বাঁচবো?

রায়হান হাসে। বলে, না বাঁচবো না। কথাটা বলার পর পরই সে ডান পা খানা সামনের দিকে ফেলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

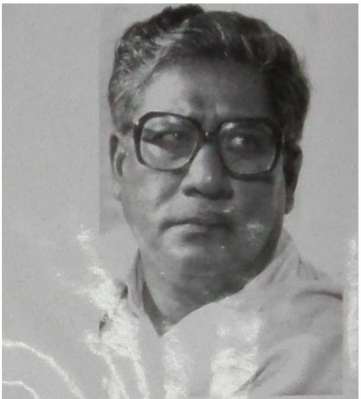

বিগত চার দশক জুড়ে স্বদেশের অতীত, সমকাল নগর ও গ্রাম এবং মানব অস্তিত্বের সমগ্রতাকে সাহিত্যের ভাষ্যে ধারণ করার দুরূহ কাজে নিয়োজিত রয়েছেন এদেশের শীর্ষ স্থানীয় লেখক শওকত আলী। তাঁর লেখায় মানুষ প্রকৃতি ও সময় মেশামেশি হয়ে থাকে। জীবনের জায়মান বাস্তবতাকে যেমন ধারণ করেন, তেমনি একই নিষ্ঠা ও আন্তরিকতায় ভবিষ্যত স্বপ্নের দিকেও তিনি দৃষ্টিপাত করেন। বড় মমতা দিয়ে তিনি গড়ে তোলেন তাঁর গল্প ও উপন্যাসের কুশীলবদ। তারা পাঠকের ভালবাসা আর সমবেদনা কেড়ে নেয় অতি সহজেই।

ছোটগল্প রচনায় মৌলিক অবদানের জন্য বাংলা একাডেমী পুরস্কার লাভ করেন ১৯৬৮তে। মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক উপন্যাস 'যাত্রা' রচনার জন্য বাংলাদেশ লেখক শিবির তাঁকে স্মৃতি পুরস্কার প্রদান করেন ১৯৮৫তে। ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার জন্য সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন দু'বার, 'মহাকালের রথযাত্রা' এবং 'নিষ্কণ্টক নায়নের দিন' এর ১৯৯২তে 'নিষ্কণ্টক নায়ন'। বাংলা উপন্যাস রচনায় অবদানের জন্য রাষ্ট্রীয় পুরস্কার একুশে পদকে ভূষিত হন ১৯৯১-এ। এছাড়া সাহিত্যে মৌলিক অবদানের জন্য তাঁকে অজিত গুহ পুরস্কার দেওয়া হয় ১৯৮৪ তে। আলাওল পুরস্কার ১৯৮৯ এবং সৈয়দ গোলাম মরতুজা স্মৃতি পুরস্কার ১৯৯৮তে তাকে দেওয়া হয়। শওকত আলীর জন্ম ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৬-এ পশ্চিম বঙ্গের রায়গঞ্জে, তাঁদের পুরুষানুক্রমিক বাস্তুভিটায়।

তিনি শহীদ বুদ্ধিজীবী ডাক্তার খোরশেদ আলী সরকার ও মরহুমা সালেমা খাতুনের দ্বিতীয় পুত্র।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম